উপন্যাস সমগ্র

৭

হুমায়ূন আহমেদ

উৎসর্গ

''একদিন পৃথিবীব পথে আমি ফলিযাছি; আমাব শবীব
নবম ঘাসেব পথে হাঁটিযাছে; বসিযাছে ঘাসে''

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুব বহমানকে শ্রদ্ধা

সপ্তম খণ্ডের সূচি

অমানুষ

প্রস্তাবনা

স্কুল ছুটি হওয়া মাত্র বাচ্চা ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে এল। তার বয়স ছ সাত—ভারি মিষ্টি চেহারা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। ছেলেটি তার সবুজ রঙের রেইন কোটের হুড উঠিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। উত্তর দিকের দু নম্বর গেটে তাদের ড্রাইভার এঞ্জেলো গাড়ির দরজা খুলে অপেক্ষা করছিল। ছেলেটি উঠে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। এঞ্জেলো আজ অন্য দিনের চেয়েও দ্রুত চালাচ্ছে। এত তাড়া কীসের তার? ছেলেটি হঠাৎ দারুণ অবাক হল। যে গাড়ি চালাচ্ছে সে এঞ্জেলো নয়। ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'তুমি কে?' লোকটি জবাব দিল না। ততক্ষণে গাড়ি হাইওয়েতে এসে পড়েছে। তেমন ট্রাফিক নেই, গাড়ি চলছে উল্কার মতো।

ছেলেটির নাম পাপিনো মেচেটি। এইমাত্র তাকে অপহরণ করা হল। পোর্ট সিটি কার্সিকায় গত দুমাসে এটি হচ্ছে চতুর্থ শিশু অপহরণ।

১

মেয়েটির মধ্যে কিছু একটা আছে যা পুরুষদের অভিভূত করে দেয়। রূপের বাইরে অন্য কিছু।

অসামান্য রূপসী মেয়েদেরকেও প্রায় সময়ই বেশ সাধারণ মনে হয়। এই মেয়েটি সেরকম নয়। এবং সে নিজেও তা জানে।

মেয়েটির চোখ দুটি ছোট-ছোট এবং বিশেষত্বহীন। গালের হাড় উঁচু হয়ে আছে, ছোট্ট কপাল কিন্তু তবু কী অদ্ভুত দেখতে! কী মোহময়ী।

তার পরনে সাধারণ কালো রঙের একটি লম্বা জামা। পিঠের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় মেয়েটির গায়ের রং ঈষৎ নীলাভ। দেখলেই হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে।

মেয়েটি প্রকাণ্ড জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে ছিল। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই সে কিছু ভাবছে কিনা। এই জাতীয় মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বোঝা যায় না। এদের চোখ সাধারণত ভাবলেশহীন হয়ে থাকে।

'মা মণি!'

মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল এ্যানি এসে ঢুকেছে। এ্যানির পায়ে ঘাসের শ্লীপার। চলাফেরা নিঃশব্দ।

'এ্যানি?'

'কি, মামণি?'

'তোমাকে বলেছি না ঘরে ঢুকতে হলে জিজ্ঞেস করে ঢুকবে?'

এ্যানি লজ্জিত ভঙ্গিতে চোখ বড়-বড় করে মার দিকে তাকিয়ে বইল। মেয়েটি অবিকল মায়ের মতো দেখতে। শুধু চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল আরো গভীর।

'এ্যানি, তুমি এগারয পড়েছ, এখন তোমার অনেক কিছু শিখতে হবে, ঠিক না?'

'জ্বি মা।'

'এখানে আমি তোমার বাবাব সঙ্গেও থাকতে পারতাম। পারতাম না?'

'পারতে।'

'আমাদের অনেক ব্যাপাব আছে যা তোমার দেখা বা শোনা উচিত নয।'

এ্যানির গাল লাল হযে উঠল। সে মাযের দিকে সবাসবি তাকাতে পাবল না।

'কিছু বলবাব জন্যে এসেছিলে, এ্যানি?'

'হুঁ।'

'বলে ফেল।'

'মা, ঘরে বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। বড্ড একা-একা লাগে। আমি আবার স্কুলে যেতে চাই।'

'তুমি তো একা থাকছ না। মিস মাবিযাটা আছেন। আছেন না?'

'মিস মারিযাটাকে আমার ভালো লাগে না। মা, আমি স্কুলে যেতে চাই।'

'বললেই তো যেতে পাবছ না। তোমাব নিরাপত্তার ব্যাপাবে আমি নিশ্চিত না হযে তোমাকে স্কুলে পাঠাব না। যাও, এখন শুযে পড়গে।'

এ্যানি তবু দাঁড়িযে বইল। রুন বড্ড বিবক্ত হল। তাব গলাব স্ববে অবশ্যি সেই বিবক্তি প্রকাশ পেল না। 'এ্যানি, তুমি আব কিছু বলবে?'

'আমি স্কুলে যেতে চাই, মা।'

'সে কথা তো আমি একবাব শুনেছি। আবাব বলছ কেন? যাও ঘুমুতে যাও। একই কথা বাব বাব শুনতে ভালো লাগে না।'

এ্যানি নিঃশব্দে চলে গেল। রুন মেযেব দিকে তাকিযে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। তার মেয়েটি অসামান্য রূপসী হযেছে। এবকম রূপবতীদেব অনেক বকম ঝামেলাব মধ্যে বড় হতে হয। তাব নিজের যখন মাত্র দশ বছব বযস তখন তার মুখে রুমাল বেঁধে তাকে জোব করে ... । না, এইসব নিযে তাব এখন আর ভাবতে ভালো লাগে না। রুন অল্প খানিকটা মার্টিনি ঢেলে গ্লাস হাতে করে সিঁড়িব কাছে আসতেই দেখল ভিকিব গাড়ি এসে ঢুকছে।

ভিকি ব্যবসাব ব্যাপাবে রোম গিযেছিল। তাব আবো দুদিন পবে ফেবাব কথা। রুন অবশ্যি মোটেই অবাক হল না। ভিকি প্রাযই এবকম করে। অসমযে এসে উপস্থিত হয। রুনের বিষযে তাব কিছু সন্দেহ আছে। অসমযে এসে দেখতে চায রুনের সঙ্গে পুরুষ মানুষ কেউ আছে কিনা। রুন হাসিমুখে বলল, 'আগেই এসে পড়লে যে?'

'কাজ হয নি তাই ফিবে এলাম।'

'ডিনার দিতে বলব?'

ভিকি ক্লান্ত স্বরে বলল, 'খেযে এসেছি। ব্যবসাব অবস্থা খুব খাবাপ যাচ্ছে রুন।'

'ম্যার্টিনি তৈরি করে দেব? অলিভ আছে।'

'দাও।'

মার্টিনির গ্লাসটি এক চুমুকে শেষ করল ভিকি। তার মানে সে কোনো একটি বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত। ব্যবসা নিয়ে? কিন্তু ব্যবসা তো তাব অনেক দিন থেকেই খারাপ যাচ্ছে। এটা তো নতুন কিছু নয়।

'রুন।'

'শুনছি, বল।'

'বস। সামনের চেযারটাতে বস। তোমার সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু কথাবার্তা বলা দরকার। জরুবি।'

রুন বসল না। আরেক গ্লাস মার্টিনি তৈবি কবে পাশে এসে দাঁড়াল। ভিকি গম্ভীর স্ববে বলল, 'তোমাকে খবচ কমাতে হবে, রুন। অনেকটাই কমাতে হবে।'

রুন খিলখিল করে হেসে উঠল।

'হাসির কথা না। এই পেইন্টিংটি আমি রোমে যাবার পব কিনেছ তুমি। ওব দাম কত?'

'খুব সস্তা। নয় লক্ষ লীবা।'

ভিকিব মুখ পলকেব জন্যে ছাই হযে গেল।

'নয় লক্ষ লীবা!'

'হুঁ। কাব আঁকা দেখতে হবে তো, মেতিস! অদ্ভুত না? মেতিস এ ছবি আর আঁকে নি। তোমাব ভালো লাগছে না?'

ভিকি বহু কষ্টে বাগ সামলাল। বেগে গেলে রুনেব সঙ্গে তর্ক কবা অসম্ভব। রুনকে বোঝাতে হবে ঠাণ্ডা মাথায, পবিষ্কার যুক্তি দিযে। 'রুন, দযা কবে একটা জিনিস বুঝতে চেষ্টা কর। আমাব অবস্থা ভালো না। খাবাপ। খুবই খারাপ।'

'কী রকম খাবাপ?'

'এ বছরও লোকসান দিযেছি। এদিকে ব্যাংকেব কাছে বিবাট বড় দেনা।'

'কত বড়?'

'প্রায এক কোটি লীবা।'

রুন নিঃশব্দে হাসল। ভিকি ভেবে পেল না এই অবস্থায এমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কেউ হাসে কী কবে।

'হাসছ কেন?'

'তোমার নার্ভাস অবস্থা দেখে।'

'বাস্তবকে বুঝতে শেখ, রুন। প্লিজ।'

রুন হাসিমুখে সামনেব চেযাবটায বসল। 'এমন অবস্থা তোমাব হল কেমন করে? তোমাদেব এতদিনেব সিল্ক ইন্ডাস্ট্রির হঠাৎ কবে এমন ভগ্নদশা হল কেন?'

ভিকি ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আমাদের মেশিনপত্র সমস্তই পুবনো। আমাদেব নতুন স্পিনিং মেশিন কিনতে হবে। "খবাটস" জাতীয মেশিন। নতুন মেশিন না বসালে আমবা হংকং-এব চীনাদেব সঙ্গে পাবব না। ওরা এখন অর্ধেক খবচে চমৎকাব সিল্ক দিচ্ছে বাজাবে।'

'কিনলেই হয নতুন মেশিন।'

'টাকা পাব কোথায? ব্যাংক থেকে লোন নিতে হবে। তার জন্যে গ্যারান্টি দবকাব। সেজন্যেই বলছি খবচপত্র কমাও।'

'হংকং-এর চীনাদের জন্যে আমার জীবনযাত্রা বদলাতে হবে?'

'বদলাতে বলছি না, খরচপত্র কমাতে বলছি।'

রুন উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। ভিকি দেখল সে ক্লসেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাপড় খুলে ফেলছে। ভিকি চোখ ফেরাতে পারছে না। যত দিন যাচ্ছে — রুনের বয়স কমছে। রুন হালকা সুরে বলল, 'চল, ঘুমুতে যাই।'

'বস একটু। রাত বেশি হয় নি।'

গায়ে কোনো কাপড় নেই অথচ কী সহজ ভঙ্গিতে রুন চলাফেরা করছে! ভিকি একটু চিন্তিত বোধ করল। রুন তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে চাইছে। নিশ্চয়ই কোনো একটা কারণ আছে। কী হতে পারে সেটি?

রুন একটি সিগারেট ধরিয়ে ভিকির সামনের চেয়ারটায় বসল। নরম স্বরে বলল, 'এ্যানি স্কুলে যেতে চাইছে।'

'যাক। যাওয়াই তো উচিত।'

'মেয়র‍্যানদের মেয়ের মতো ওকেও যদি কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়, তখন?'

ভিকি বিরক্ত হয়ে বলল, 'মেয়র‍্যানরা হচ্ছে ইটালির সবচে' ধনী পরিবার। ওদের মেয়েদের কিডন্যাপ করে দু কোটি লীরা ওদের মুক্তিপণ চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার কী আছে?'

রুন গম্ভীর স্বরে বলল, 'তোমার যে কিছু নেই তা তো আর যারা কিডন্যাপ করে তারা জানে না। আমি নিজেও তো জানতাম না তোমার এই অবস্থা।'

ভিকি একটি সিগারেট ধরাল। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। রুনের সঙ্গে তর্ক করতে হলে মাথা শান্ত রাখতে হয়। ভিকি ধীর স্বরে বলল, 'রুন, যারা কিডন্যাপিং করছে তারা মাফিয়ার লোকজন, তা তো জান?'

'জানি।'

'মাফিয়ারা সমস্ত খোঁজখবর রাখে। কার কী অবস্থা তা তাদের অজানা নয়, বুঝতে পারছ? কাজেই তুমি নিশ্চিন্তে এ্যানিকে স্কুলে পাঠাতে পার।'

রুন উঠে দাঁড়াল। কী চমৎকার একটি শরীর! কে বলবে এই মেয়েটির বয়স চল্লিশ? সিলিংয়ের নরম আলো যেন ঠিকরে পড়ছে তার গায়ে। জলকন্যার মতো লাগছে। রুন গম্ভীর গলায় বলল, 'সুইজারল্যান্ডে একটি চমৎকার স্কুল আছে। জেনেভার কাছে। অনেক ইটালিয়ান ছেলেমেয়ে সেখানে পড়ে। আমি এ্যানিকে সেই স্কুলে দিতে চাই। টেযাবদের ছোট মেয়েটি ভর্তি হয়েছে সেখানে। চমৎকার স্কুল।'

ভিকি স্তম্ভিত হয়ে গেল। এসব কী বলছে সে! দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বলল, 'আসল জিনিসটাই তুমি বুঝতে পারছ না। আমার টাকা নেই। মেয়েকে সুইজারল্যান্ডে রেখে পড়ানো আমার সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া এ্যানিরও ভালো লাগবে না। এতদূরে সে একা-একা থাকতে পারবে না।'

'একা-একা থাকবে কেন? আমিও থাকব। একটা এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করব জেনেভার কাছে। তুমি হপ্তায় হপ্তায় এসে দেখে যাবে। প্লেনে মাত্র এক ঘণ্টা লাগে।'

'এতক্ষণ আমি কী বলেছি তা তুমি বুঝতে চেষ্টা পর্যন্ত কর নি, রুন। টাকা কোথায় আমার?'

রুন পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'এখানকার বাড়িটা বিক্রি করে ফেল। এত সুন্দর বাড়ি, প্রচুর দাম পাবে। সেই টাকার অর্ধেক দিয়ে জেনেভায় একটা বাড়ি কেনা যায়।'

ভিকি থেমে থেমে বলল, 'আমার এই বাড়িটিও ব্যাংকের কাছে মর্টগেজড। আমার ধারণা ছিল তুমি তা জান।'

রুন উত্তর দিল না। উঠে গিয়ে আরেকটি সিগারেট ধরাল। ভিকি বলল, 'এ্যানিকে মিলানের স্কুলেই যেতে হবে। এই হচ্ছে শেষ কথা।'

'বেশ, সে যাবে মিলানের স্কুলে। তুমি তাব নিবাপত্তার ব্যবস্থা কর।'

'নিরাপত্তার ব্যবস্থা? তার মানে?'

'ওর একটা বডিগার্ড বেখে দাও। এখন তো সবাবই আছে। নিখমুদের দু মেয়ের জন্যেই বডিগার্ড আছে।'

'রুন, তুমি কি জান কত খবচের ব্যাপার সেসব?'

'আমি জানি না। জানতেও চাই না। তুমি যদি রুনেব বডিগার্ডেব ব্যবস্থা না কব তাহলে ওকে আমি সুইজারল্যান্ডে নিয়ে যাব।'

'রুন, বডিগার্ড বাখা মানেই সবাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবা। সবাই ভাববে, ওদেব অনেক টাকাপযসা।'

রুন হাসিমুখে বলল, 'ভাবলে অসুবিধে কী?'

'রুন, প্লিজ একটা জিনিস দেখ। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ইটালিতে স্কুলে যায় যাদেব বাবা-মা আমাদেব চেয়ে অনেক ধনী, কিন্তু তাদেব ছেলেমেয়েদেব জন্যে কোনো বডিগার্ড নেই।'

'না থাকুক। আমাব কিছুই যায আসে না। ওরা তো আব আমাব ছেলেমেয়ে না।'

'আমাব অসুবিধেটা তুমি দেখছ না। একটা বাড়তি খবচ। শুধু-শুধু একটা ঝামেলা।'

রুন দৃঢ়স্বরে বলল, 'আজকাল সব ছেলেমেয়েদের জন্যে বডিগার্ড আছে। এবেডোসেব আছে, টুবেল্লাব আছে, এমন কি কেযোলিনদের পর্যন্ত আছে।'

ভিকি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ব্যাপাবটা এতক্ষণে পবিষ্কার হযেছে। বডিগার্ড একটি মর্যাদার মাপকাঠি হযে দাঁড়িয়েছে। দামি একটা গযনার মতো। রুন ভিকিব গলা জড়িয়ে ধবে বলল, 'তুমি একবাব এতরাব সঙ্গে কথা বল। সে নিশ্চযই তোমাব টাকাপযসাব ঝামেলা মেটাবাব ব্যাপারে সাহায্য কববে। ও তো অনেককেই বুদ্ধি দেয।'

ভিকি উত্তব দিল না। রুনেব এই দূব সম্পর্কেব ভাইটিকে সে সহ্য কবতে পাবে না। তার ধারণা, রুনের সঙ্গে ঐ ভাইটির গোপন মেলামেশা আছে। এই ভাইটিব কথা উঠলেই রুনের মধ্যে একটা গদগদ ভাব দেখা যায। রুন আরেকবার বলল, 'বুঝলে ভিকি, তুমি এতরার সঙ্গে কথা বল। সে তোমাকে চমৎকার বুদ্ধি বাতলাবে।'

রুন এসে ভিকির কোলে বসে পড়ল। গলা জড়িয়ে ধবে বলল, 'আর গম্ভীর হয়ে থাকার দরকার নেই। হাস এবাব।'

ভিকি হাসতে পাবল না। টেনে টেনে বলল, 'বডিগার্ডের ব্যাপাবটি নিযে তুমি কি এতরাব সঙ্গে কথা বলেছ?'

'উঁহুঁ।'

ভিকির মনে ক্ষীণ একটি আশা হল। যদি এতরাকে দিযে রুনকে বোঝানো যায তাহলে হযতো কাজ হবে। এতবা যদি বলে— বডিগার্ড রাখার ব্যাপাবটি হাস্যকব তাহলে রুন নিশ্চযই শুনবে। ভিকি আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

এ্যানির ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

সে একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে নিচে নেমে এল। কী আশ্চর্য, বাগানে বেতের চেয়ারে বাবা বসে আছেন। সে চেঁচিয়ে ডাকল, 'বাবা!'

'কি রে বেটি? এত সকালে ঘুম ভেঙেছে?'

'হুঁ।'

'ভালো ঘুম হয় নি রাতে?'

'না। দুঃস্বপ্ন দেখেছি, বাবা।'

'কী দেখেছিস?'

এ্যানি জবাব দিল না। ভিকি মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, 'দেখেছিস একটা প্রকাণ্ড দৈত্য তাড়া করছে। তাই না?'

এ্যানি হাসল কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। সে যে দুঃস্বপ্ন দেখেছে সেরকম দুঃস্বপ্নের কথা কাউকে বলা যায় না। নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে হয়; সবচে' প্রিয় যে বান্ধবী তাকেও বলা যায় না।

এ্যানির একটু মন খারাপ হল। তার যত বয়স বাড়ছে ততই গোপন জিনিসের সংখ্যা বাড়ছে। যেমন এতরা চাচার কথাই ধরা যাক। ইদানীং এতরা চাচা তাকে দেখলেই আদর করবার ছলে জড়িয়ে ধরেন। মুখে কি মিষ্টি-মষ্টি কথা, 'আরে আমাদের এ্যানির মনটা খারাপ কেন? কী হয়েছে আমাদের এ্যানির?'

এ্যানি পরিষ্কার বুঝতে পারে এ সবই হচ্ছে ভান। এতরা চাচাকে এখন আর একটুও ভালো লাগে না। সেদিন এসে মাকে বলল, 'ওয়াল্ট ডিজনীর একটি মুভি হচ্ছে, এ্যানিকে দেখিয়ে আনব বলে ভাবছি।'

মা মহাখুশি। হাসতে-হাসতে বলল, 'বেশ হয়। বেচারী একা-একা থাকে। নিয়ে যাও।'

এ্যানি বলল, সে যাবে না। তার মুভি দেখতে ভালো লাগে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্যি যেতে হল। মায়ের অবাধ্য হবার সাহস তার নেই।

'মুভি হল' অন্ধকার হতেই এতরা চাচা তার কোমর জড়িয়ে ধরলেন। এ্যানি স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ করল মাঝে মাঝে সেই হাত নিচে নেমে যাচ্ছে। এইসব কথা কাকে বলবে সে? মাকে? মা নিশ্চয়ই উল্টো তার ওপর রাগ করবেন। কারণ এতরা চাচাকে মা খুব পছন্দ করেন। এটাও এ্যানির ভালো লাগে না। এতরা চাচা সময়ে অসময়ে আসে বাড়িতে। মা তাকে নিয়ে দক্ষিণের গেস্ট হাউসে চলে যান। গেস্ট হাউসে গিয়ে দরজা বন্ধ করার কী মানে? এমন কী কথা তার সঙ্গে যা দরজা বন্ধ করে বলতে হয়?

ভিকি দেখল এ্যানি গম্ভীর হয়ে বসে আছে। সে হালকা স্বরে বলল, 'আমার মামণি এত গম্ভীর কেন?'

এ্যানি চাপা স্বরে বলল, 'এখানে চুপচাপ বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে না, বাবা। আমি স্কুলে যেতে চাই।'

'খুব শিগগিরই যাবে মা।'

'কবে?'

'তোমার মা চাচ্ছেন তোমার জন্যে এক জন বডিগার্ড রাখতে। এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। যদি না রাখলে চলে তাহলে তুমি এই হপ্তা থেকে যেতে পারবে। আর যদি রাখতে হয় তাহলে একটু দেরি হবে।'

এ্যানি মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'বডিগার্ড রাখলে খুব মজা হবে, বাবা।'

'মজা কীসের?'

'ঐ লোকটি কেমন বন্দুক-টন্দুক হাতে নিয়ে থাকবে। ভাবতেই আমার মজা লাগছে, বাবা।'

'মামণি, এর মধ্যে মজার কিছু নেই। সমস্ত ব্যাপারটি হাস্যকর। খুবই হাস্যকর।'

'আমার কাছে তো বেশ লাগছে, বাবা।'

ভিকি কিছু বলল না। এ্যানি বলল, 'তুমি কি চা খাবে? চা আনব তোমার জন্যে?'

'চা বানাতে পার তুমি?'

'হুঁ, খুব পারি।'

'বেশ তো, খাওয়া যাক এক কাপ চা।'

এ্যানি হাসিমুখে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। ভিকির একটু মন খারাপ হল। এ্যানি এখানে খুব নিঃসঙ্গ। ভিকি তাকে সময় দিতে পারে না। রুনও পারে না। মেয়েটির কোনো সঙ্গীসাথী নেই।

'চা ভালো হয়েছে, বাবা?'

'চমৎকার হয়েছে।'

'মনে হচ্ছে একটু বেশি কড়া হয়েছে।'

'আমার কড়া চা পছন্দ।'

এ্যানি হাসিমুখে বলল, 'আমি যদি বলতাম চা বেশি হালকা হয়েছে তা হলে তুমি বলতে আমার হালকা চা পছন্দ ঠিক না বাবা?'

'তা ঠিক।'

ভিকি, এ্যানি দুজনেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

রেস্টুরেন্টটি ছোট কিন্তু শহরের নামি রেস্টুরেন্টগুলির মধ্যে এটি একটি। এরা ইটালি শহরে সবচে' ভালো "প্রসকিউটু" (কচি বাছুরের গোশ্‌ত) রান্না করে — এ ধরনের একটি কথা চালু আছে। ভিকি প্রসকিউটু পছন্দ করে না কিন্তু তবু এখানে এসেছে; কারণ এতরার এ রেস্টুরেন্টটি খুব প্রিয়, সে প্রায় রোজই এখানে লাঞ্চ খেতে আসে।

ভিকি বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকবার পর এতরা এসে উপস্থিত। চমৎকার একটি নীল রঙের শার্টের উপর হালকা গোলাপি একটি টাই পরেছে এতরা। কে বলবে এই লোকটির বয়স চল্লিশের ওপর!

'দেরি করে ফেললাম নাকি, ভিকি?'

'না, খুব দেরি না।'

'লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছ?'

'এখনো দেই নি। কী খেতে চাও তুমি?'

এতরা হাসিমুখে বলল, 'আমার বাঁধা মেনু- ভিটেলো টনাটু, প্রসকিউটু এবং এক বোতল বারগুণ্ডি।'

বারগুণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়ে এতরা ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, 'এখন বল, তোমার সমস্যাটা কী?'

ভিকি ইতস্তত করতে লাগল। নিজের সমস্যা অন্যের কাছে বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এতরার যত দোষই থাকুক, ওর মাথাটা খুব পরিষ্কার। তাছাড়া, ওর ভালো 'কানেকশন' আছে। প্রচুর লোকজনের সঙ্গে ওর চেনাজানা।

'কী ব্যাপার, চুপ করে আছ যে? বল।'

'তুমি বোধহয় জান না আমার ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে।'

'ঠিক জানি না বললে ভুল হবে। তবে কতটা খারাপ তা জানি না।'

'বেশ খারাপ।'

'এত খারাপ হল কী করে?'

ভিকি জবাব দিল না। এতরা বলল, 'আমার কাছে ঠিক কী পবামর্শ তুমি চাও?'

'আমার যা দরকার তা হচ্ছে মোটা অংকের কিছু টাকা।'

'মোটা অংকের টাকা জোগাড় করা তোমার জন্যে কঠিন হবাব কথা নয। তোমাব স্ত্রীর প্রচুর টাকা আছে।'

'আমি ওর কাছে হাত পাততে চাই না।'

'বুঝলাম। স্ত্রীর কাছে হাত না পাতাই ভালো, তাতে দাম কমে যায।'

এতরা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি ব্যাংকে চেষ্টা করেছ? তোমাব যা নামডাক, তাতে ব্যাংক থেকে সহজেই মোটা টাকার লোন পাবে। ভবাডুবি না হওযা পর্যন্ত ব্যাংক তোমাকে টাকা দেবে। তুমিও সেটা জান, জান না?'

ভিকি উত্তর দিল না। এতরা বলল, 'তুমি কি চেষ্টা কবেছ?'

'বিশেষভাবে করি নি।'

'তাহলে কর। টাকার সমস্যা কোনো সমস্যা নয। অন্তত তোমাব জন্যে নয। তুমি চাইলে আমি দু এক জন ব্যাংকারের সাথে কথা বলতে পাবি। অবশ্যি আমি তাব কোনো প্রয়োজন দেখি না। তোমাকে সবাই চেনে।'

'আমাকে না। আমার বাবাকে চেনে।'

'একই কথা। তোমার বাবাকে চিনলেই তোমাকে চেনা হয। এখন বল, তোমাব আসল প্রবলেম কী? তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তোমাব মনে আবো কিছু আছে।'

ভিকি আরেকটি বারগুণ্ডিব বোতলের অর্ডাব দিযে চুপ কবে বইল। যেন ভাবছে সমস্যাটি বলা ঠিক হবে কিনা।

'চুপ করে আছ কেন, বলে ফেল।'

ভিকি দীর্ঘ সময় নিযে বডিগার্ড সংক্রান্ত সমস্যাটি বলল। এতবা হাসি-হাসি মুখে শুনল। তার ভাব দেখে মনে হল, সে খুব মজা পাচ্ছে। ভিকি বলল, 'এখন বল, আমাব কী করা উচিত।'

'একটা বডিগার্ড রাখ। এ-ই একমাত্র সমাধান।'

ভিকি বড্ড বিরক্ত হল। এতরা এই কথা বলবে তা সে ভাবে নি। তাব ধাবণা ছিল বডিগার্ড রাখার হাস্যকর দিকটি এতরাব চোখে পড়বে। এতবা একটি সিগাবেট ধবিযে গম্ভীর হয়ে বলল, 'বডিগার্ডেব ব্যাপারটি এখন রুনেব একটি প্রেস্টিজেব ব্যাপাব হযে দাঁড়িয়েছে। রুনকে আমি যতটুকু জানি তাতে মনে হচ্ছে বডিগার্ড না বাখা পর্যন্ত সে শান্ত হবে না। এক জন বুদ্ধিমান স্বামীর প্রধান কাজ হচ্ছে স্ত্রীকে শান্ত বাখা।'

'কিন্তু এত টাকা আমি পাব কোথায?'

'রীতিমতো প্রফেশনাল লোক রাখলে অনেক টাকা লাগবে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু তোমার তো আর প্রথম সারির লোকের প্রযোজন নেই, ঠিক না?'

'ঠিক।'

'কাজেই কোনো রকম একজন কাউকে কয়েক মাসের জন্যে রেখে দাও। রুন শান্ত হলেই ছাড়িয়ে দাও, ব্যস চুকে গেল।'

'এরকম লোক কোথায় পাওয়া যায়?'

'এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই পাওয়া যাবে। আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি জোগাড় করে দেব। আগামী হপ্তায় তুমি তোমার বডিগার্ড পাবে। ঠিক আছে?'

ভিকি কিছু বলল না। এতরা উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল, 'আরো কোনো সমস্যা আছে? থাকলে বলে ফেল।'

'না, আর কিছু নেই।'

'তাহলে এই কথা রইল। সোমবার তুমি বডিগার্ড পাবে। এখন তাহলে উঠি। চমৎকার লাঞ্চের জন্যে ধন্যবাদ। আর শোন ভিকি, তুমি মুখ এমন হাঁড়ির মতো করে রাখবে না। একটু হাস। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি গভীর সমুদ্রে পড়েছ।'

এতরা বেরিয়ে গেল। ভিকি নিজের মনে বলল, 'আমি গভীর সমুদ্রেই পড়েছি। অতলান্তিক জলে।'

এতরা তার কথা রাখল। হপ্তা শেষ হবার আগেই একজন বিদেশি মানুষ এসে হাজির।

'তোমার সঙ্গে বন্দুক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখাতে পার?'

লোকটি জ্যাকেটের পকেট থেকে একটি ছোট রিভলভার বের করল। ভিকি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল সেটার দিকে।

'কি নাম এটির?'

'বেরেটা-৪৮।'

ভিকি শিশুর মতো আগ্রহে রিভলভারটি হাতে তুলে নিল। কী সুন্দর! ছিমছাম। ছোট্ট একটি জিনিস।

'এর লাইসেন্স আছে?'

'আছে।'

'তুমি এই জাতীয় রিভলভার আগে ব্যবহার করেছ?'

'করেছি।'

'এর মধ্যে কি গুলি ভরা আছে?'

'আছে।'

'কী সর্বনাশ! তুমি আগে বলবে তো?'

ভিকি সাবধানে রিভলভারটি নামিয়ে রাখল। শুকনো গলায় বলল, 'তোমার কাগজপত্র কি আছে দেখি।'

লোকটি কাগজপত্রের একটি চামড়া বাঁধানো ফাইল নামিয়ে রাখল। ভিকি প্রথমবারের মতো পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল লোকটির দিকে।

লোকটি ইটালিয়ান নয়। বিদেশি। গায়ের চামড়া কালো। পুরু ঠোঁট। বড়-বড় চোখ। অদ্ভুত এক ধরনের কাঠিন্য আছে। কোথায় সে কাঠিন্যটি তা ধরা যাচ্ছে না। ভিকি নিচু স্বরে বলল, 'তুমি কি কখনো মানুষ মেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

ভিকির গা শিরশির করে উঠল।

'কতজন মানুষ মেরেছ?'

'এর উত্তর জানা কি সত্যি প্রয়োজন?'

'না–না, উত্তর না দিলেও হবে। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

ভিকি ফাইল খুলল।

নাম ঃ জামশেদ হোসেন

বয়স ঃ ৫৫

ভিকি অনেকক্ষণ নামটির দিকে তাকিয়ে রইল। কী অদ্ভুত নাম!

'তোমার দেশ কোথায়?'

'ফাইলে লেখা আছে। ফাইল খুললেই পাবে।'

হ্যাঁ, লেখা আছে ফাইলে। পরিষ্কার সব লেখা। লোকটি কথাবার্তা বেশি বলতে চায় না। এটা ভালো। বডিগার্ড এ রকমই হওয়া উচিত। ভিকি পড়তে শুরু কবল।

জাতীযতা ঃ বাংলাদেশী

'সেটি আবার কোন্ দেশ?'

'ইন্ডিযা ও বার্মার মাঝামাঝি ছোট একটা দেশ।'

' তোমাব পাসপোর্ট আছে? ইটালিতে যে আছ তাব কাগজপত্র আছে?'

'আছে।'

'কী ধরনের কাগজপত্র?'

লোকটি গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমি ফ্রেনচ লিজিওনে দীর্ঘদিন ছিলাম। তারপব কিছুদিন ছিলাম ইটালিযানদেব সঙ্গে জিরান্ডায, আলজিযার্সে। আমাব কাগজপত্র সেই সূত্রে পাওযা।'

ভিকি অবাক হযে বলল, 'আলজিয়ার্সে কীসে ছিলে?'

'ফার্স্ট প্যারাট্রুপ বেজিমেন্টে।'

'বল কী! তুমি বাংলাদেশেব লোক হযে লিজিওনে ঢুকলে কী কবে?'

লোকটি জবাব দিল না। ভিকি বলল, 'লিজিওনে ঢোকাব আগে তুমি কোথায ছিলে?'

'অনেক জাযগায ছিলাম। আমি একজন ভাড়াটে সৈনিক, মিঃ ভিকি। যে পযসা দিযেছে — আমি তাব জন্যেই যুদ্ধ করেছি। আমি কোথায ছিলাম, কি ছিলাম সেসব জিজ্ঞেস করার কোনো প্রযোজন আছে বলে মনে করি না। আমাকে যদি তোমাব পছন্দ হয তাহলে বাখতে পাব। পছন্দ না হলে বিদেয হব।'

ভিকি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পাবল না। এতবা এই লোকটিকে পাঠিযেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিক লোক পাঠায় নি। অবস্থা যা তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই লোক খাঁটি পেশাদার লোক। ভিকি নিঃশব্দে কাগজপত্র পড়তে লাগল।

অসাধারণ লিজিওনারী হিসেবে তাঁকে পরপব দুবাব অর্ডাব অব ভেলব দেযা হয...

ভিকি বড়ই অবাক হল। এতরা এই লোকটিকে পাঠানব আগে আরো দুজনকে পাঠিয়েছিল। ভিকি তাদেব সঙ্গে দু একটি কথা বলেই বিদেয করে দিয়েছে। সে দুজন রাস্তার গুণ্ডা ছাড়া কিছুই না। কেউ জীবনে কখনো বন্দুক ধরেছে কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। বডিগার্ড হিসেবে ওদেব রাখলে রুন রেগে আগুন হত, বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই লোকটি অদ্ভুত। ভিকি বলল, 'তুমি কফি খাবে?'

'না।'

'খাও না। খাও। ভালো কফি।'

লোকটি চুপ করে রইল। ভিকি কফি আনতে বলে নিচু স্বরে জানাল, 'তোমাকে আমাব পছন্দ হযেছে। কিন্তু একটি কথাব জবাব দাও। এত কম টাকায তুমি কাজ করতে রাজি হচ্ছ কেন?'

লোকটি কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'মিঃ ভিকি, আমি একজন এলকোহলিক। বডিগার্ড হিসেবে আমার কোনোই মূল্য নেই এখন। বয়স হয়েছে। শরীর নষ্ট হয়ে গেছে।'

ভিকি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'মিঃ এতরা আমাকে বলেছেন তোমার যেনতেন একজন লোক হলেই চলে। প্রফেশনাল লাগবে না।'

'তা ঠিক। আসলে আমার স্ত্রীর চাপে পড়েই একজন বডিগার্ড রাখতে হচ্ছে। আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করার কোনো কারণ নেই। স্ত্রীদের চাপে পড়ে আমাদের অনেক কিছুই করতে হয়। ভালো কথা, তুমি কি বিবাহিত?'

'না।'

'ভালো, খুব ভালো।'

লোকটি নিঃশব্দে কফি খেয়ে যাচ্ছে। ভিকি বলল, 'ইয়ে, তুমি কি বড় রকমের এলকোহলিক?'

'হ্যাঁ।'

'মাতাল হয়ে যাও?'

'না।'

'আরেকটি কথা তোমাকে বলা দরকার। এমন হতে পারে যে তিন মাস পর তোমাকে আমার দরকার হবে না। এতরা নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছে সেটা।'

'হ্যাঁ, বলেছে।'

'আরেকটি কথা। তোমাকে রাখব কিনা সেটি নির্ভর করছে আমার স্ত্রীর ওপর। বুঝতে পারছ, ওর জন্যেই তোমাকে রাখা।'

'বুঝতে পারছি।'

'চল, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই। অবশ্যি তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমার নামটি যেন কি?'

'জামশেদ। জামশেদ হোসেন।'

'অদ্ভুত নাম। এর অর্থ কী?'

'আমার জানা নেই।'

রুন অবাক হয়ে বিদেশি লোকটির দিকে তাকাল। লম্বা। রোগা। একটু যেন কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার চুল সাদা-কালো, ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। পরনে কালো রঙের একটি জ্যাকেট, জ্যাকেটের মাঝখানের বোতামটি নেই। তবে জ্যাকেট এবং ট্রাউজার দুটিই বেশ পরিষ্কার। রুন কঠিন স্বরে বলল, 'তুমি তো ইটালিয়ান নও।'

'না।'

ভিকি বলল, 'ইটালিয়ান না হলেও চমৎকার ইটালিয়ান বলতে পারে।'

রুন বলল, 'তোমার বয়সও অনেক বেশি।'

'হ্যাঁ। পঞ্চান্ন।'

ভিকি হড়বড় করে বলল, 'বয়স হলেও এই লাইনে সে এক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কাগজপত্র দেখলেই বুঝবে। আজকাল এই লাইনে অভিজ্ঞ লোক পাওয়া খুব মুশকিল।'

রুন বলল, 'তোমার দেশ কোথায়?'

'বাংলাদেশ।'

'সেটি আবার কোথায়?'

উত্তর দিল ভিকি, 'বার্মা এবং ইন্ডিয়ার মাঝামাঝি একটি ছোট্ট দেশ। রুন, তুমি বরং মিঃ জামশেদের কাগজপত্রগুলো দেখ।'

রুন বলল, 'তুমি কি আজ থেকে কাজে লাগতে পারবে?'

'হ্যাঁ।'

'দোতলার একটি ঘরে তুমি থাকবে। এ্যানিকে স্কুলে নিয়ে যাবে এবং ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তোমার সঙ্গে বন্দুক আছে?'

'আছে।'

'এস, তোমাকে ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।'

রুন বেরিয়ে গেল। জামশেদ গেল তার পিছু-পিছু। ভিকি সোফায় বসে ঘামতে লাগল। রুন ফিরে এসে একটা ঝগড়া বাধাবে, জানা কথা। এসেই চিৎকার শুরু করবে, 'এই বুড়ো হাবড়াকে কোত্থেকে ধরে এনেছ?'

কিন্তু সে রকম কিছুই হল না। রুন ফিরে এসে শান্ত স্বরে বলল, 'লোকটিকে আমাব পছন্দ হযেছে। তবে...'

'তবে কি?'

'লোকটির দিকে তাকালে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।'

'বিদেশি লোক, তাই।'

'না, তা নয। অন্য এক ধরনের অস্বস্তি। অস্বস্তি ঠিক না। ভয বলতে পাব।'

ভিকি অবাক হযে বলল, 'কী আশ্চর্য, ভয লাগবে কেন?'

'জানি না কেন। শুধু মনে হচ্ছিল একটি পেশাদাব খুনী। কত লোককে যে মেবেছে কে জানে।'

ভিকি চুপ কবে বইল। রুন বলল, 'লোকটির চোখ দেখেছ? পাথবেব তৈরী বলে মনে হয়। ঠিক না?'

'আমি বুঝতে পারছি না কী বোঝাতে চাচ্ছ তুমি।'

'ওর মনে দযা-মায়া-বহম বলে কিছু নেই।'

'এ রকম লোকই তো তুমি চেযেছিলে, রুন।'

রুন চিন্তিত মুখে বলল, 'তা অবশ্য ঠিক।'

'স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ভিকি। বড় ঝামেলা চুকেছে। মাস দু এক পব বিদেয কবে দিলেই হবে। এই টাইপের লোকদের নিজের ঘরে রাখা ঠিক না। তাছাড়া বিদেশি লোক। বিদেশিদের বিশ্বাস করতে নেই।'

৩

'মিস মারিযাটা, আমাদেব ঘরে যে নতুন একজন মানুষ এসেছে তাকে তুমি দেখেছ?'

'না।'

'আমিও দেখি নি। সে কিন্তু বিদেশি, মিস মাবিযাটা।'

'তুমি পড়ায় মন দিচ্ছ না, এ্যানি।'

'আজকে আমার পড়তে ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছা না করলেও পড়তে হবে।'

এ্যানিকে এলজাব্রার বই খুলতে হল। সে দু তিনটা অঙ্ক শেষ করেই বলল, 'মিস মারিয়াটা, ঐ বিদেশি কিন্তু ভয়ঙ্কর লোক। ফটাফট গুলি করে মানুষ মারে।'

'মানুষ মারা যদি তার কাজ হয় তাহলে তো মারবেই। সবারই তার নিজের-নিজের কাজ করতে হয়। ঠিক না?'

'হ্যাঁ ঠিক। ওর কাজ কিন্তু মানুষ মারা না। ওর কাজ হচ্ছে আমাকে দুষ্ট লোকের হাত থেকে রক্ষা করা। সে রকম কোনো লোক দেখলেই সে একেবারে শেষ করে দেবে। দ্রুম্ দ্রুম্।'

মিস মারিয়াটার মধ্যে কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। সে আবার পড়াতে শুরু করল। এ্যানি ছাড়া পেল সন্ধ্যার আগে-আগে। এবং ছাড়া পাওয়া মাত্র ছুটে গেল দোতলায়। লোকটির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেকক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়েও এ্যানি কিছুই শুনল না। লোকটি অসময়ে ঘুমুচ্ছে নাকি? এ্যানি দরজায় টোকা দিতেই ভারি গলায় লোকটি কথা বলল, 'কে?'

'আমি কি তোমার ঘরে আসতে পারি?'

খুট করে দরজা খুলে গেল।

'আমার নাম এ্যানি।'

কোনো উত্তর নেই। লোকটি তাকিয়ে আছে শুধু।

'আমি কি তোমার ঘরে একটু বসতে পারি?'

লোকটি দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। এ্যানি হাসিমুখে বলল, 'তোমাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। আমার কথা বলার লোক নেই।'

লোকটি ভারি স্বরে বলল, 'বাচ্চাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না। বাচ্চাদের আমি পছন্দ করি না।'

এ্যানি স্তম্ভিত হয়ে গেল। থেমে-থেমে বলল, 'আমি বাচ্চা নই। আমার বয়স এপ্রিল মাসে বার হবে।'

লোকটি কথা বলল না। এ্যানি বলল, 'আমি যদি কিছুক্ষণ তোমার ঘরে বসি তাহলে কি তুমি বিরক্ত হবে?'

'হ্যাঁ।'

এ্যানির চোখে প্রায় জল এসে পড়ছে। সে বহু কষ্টে নিজেকে সামলাল। লোকটি মৃদু স্বরে বলল, 'একটি জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে, এ্যানি। আমি নতুন কেনা কোনো খেলনা না। আমাকে রাখা হয়েছে তোমার নিরাপত্তার জন্যে, এইটুকুই আমি দেখব, এর বেশি না। যদি এ জিনিসটি পরিষ্কার বুঝতে পার তাহলে তা তোমার জন্যেও ভালো, আমার জন্যেও ভালো।'

এ্যানি ধরা গলায় বলল, 'তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছ?'

'হ্যাঁ।

এ্যানির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। রুন এসে ঢুকল তার কিছুক্ষণ পর। সে ইতস্তত করে বলল, 'এ্যানি খুব কাঁদছে।'

লোকটি জবাব দিল না। রুন বলল, 'আমার এই মেয়েটি খুব সেনসেটিভ। ওর সঙ্গে ভাব করতে হবে খুব ধীরে–ধীরে। একবার ভাব হলেই বুঝবে খুব মিষ্টি মেয়ে ও।'

'মিসেস রুন, আমি তোমার মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে আসি নি। ওসব আমি পারি না। আমার দ্বারা ওসব হয় না।'

'ও।'

'তোমরা যে কাজের জন্যে আমাকে রেখেছ। সে কাজ আমি ঠিকমতো করতে চেষ্টা করব, এর বেশি আমার কাছে কিছু আশা করবে না।'

রুন আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু লোকটি আর কথা বলল না। রুন ভাবল, এই বিদেশি লোকটিকে রাখা হয়তো ঠিক হয় নি।

মিস মারিযাটাও একই কথা বলল, 'বিদেশিদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই, মিসেস রুন।'

মিস মারিয়াটার অবশ্যি সব কিছুই বাড়াবাড়ি। সে গলা খাদে নামিযে বলেই ফেলল, 'কোনো একদিন হযতো দেখা যাবে এই লোকই তোমাদের গুলি কবে মেবে বেখে পালিয়েছে।'

রুন বিরক্ত হযে বলেছে, 'আমাদের মাববে কেন?'

'মিসেস রুন, ওদেব কোন কারণ–টারণ লাগে না, ওবা হচ্ছে 'বর্ন কিলাব'। ওবা স্বাভাবিক মানুষ না, মিসেস রুন।'

কথাটি একেবারে মিথ্যা নয। ভাড়াটে সৈনিকবা অস্বাভাবিক মানুষ তা বলাই বাহুল্য। বন্য পশুর মতো জীবন কাটিযে হঠাৎ কবে কেউ পোষ মানে না। এব পিছনে নিশ্চযই কোনো রহস্য আছে।

'মিসেস রুন, লোকটাকে বিদেয কবে দিন।'

'দেখা যাবে কি কবা যায। আমাব কাছে তেমন কিছু খাবাপ মনে হচ্ছে না।'

'ভালোও তো মনে হচ্ছে না, ঠিক না?'

রুনের মনে একটি কাঁটা বিঁধে বইল। অস্পষ্ট সন্দেহেব একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা।

'হ্যালো, রুন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এতরা।'

'হ্যালো, এতবা।'

'নতুন বডিগার্ড কি কাজ শুরু কবেছে?'

'হ্যাঁ, কবেছে।'

'পছন্দ হযেছে তোমাব?'

রুন জবাব দিল না। এতবা বলল, 'হ্যালো, জবাব দিচ্ছ না কেন?'

রুন ইতস্তত কবে বলল, 'ভালোই তো।'

'এ্যানিব পছন্দ হযেছে?'

'পছন্দ হওযা–হওযিব কী আছে? বডিগার্ডের সঙ্গে তাব সম্পর্ক কী? স্কুলে নিযে যাবে আবার ফিরিযে নিযে আসবে। ব্যস।'

এতরা গলাব স্বব একধাপ নামিযে ফেলল, 'শোন, একটা প্রবলেম হযেছে।'

'কী প্রবলেম?'

'আমি এজেন্সিতে খোঁজ নিযেছিলাম। আমার মনে হচ্ছে লোকটিকে রাখা ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'ও একজন ডেঞ্জারাস লোক। আগে বুঝতে পারি নি।'

রুন শান্তস্বরে বলল, 'এরকম কাজের জন্যে তো ডেঞ্জাবাস লোকই দবকাব।'

'তা দরকার; তবু আমার মনে হচ্ছে একে ছাড়িয়ে দেয়া ভালো। আমি সন্ধ্যাবেলা এসে আলাপ করব। তুমি থাকছ তো?'

'হাঁ, থাকব।'

'ভিকি থাকবে?'

হ্যাঁ, সেও থাকবে।'

এতরার মনে হল রুন খানিকটা নিবাশ হল।

'আচ্ছা, আমি আসব সন্ধ্যায়।'

লাঞ্চের সময় রুন দেখল এ্যানি অস্বাভাবিক গম্ভীর। কিছুই প্রায় মুখে দিচ্ছে না।

'রান্না পছন্দ হচ্ছে না তোমাব, এ্যানি?'

'পছন্দ হবে না কেন — বেশ ভালো বান্না।'

'তবে খাচ্ছ না কেন?'

'আমাব ভালো লাগছে না।'

রুন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'লোকটা কি তোমাকে কোনো কড়া কথা বলেছে?

'না।'

'ওব ঘব থেকে বেব হযে তুমি খুব কাঁদছিলে, তাই জিজ্ঞেস কবছি।'

'এমনি কাঁদছিলাম। ও আমাকে কোনো কড়া কথা বলে নি।'

রুন অবাক হযে বলল, 'লোকটিকে তোমাব পছন্দ হযেছে, নাকি?'

'হ্যাঁ, পছন্দ হযেছে।'

এ্যানি স্পষ্টস্ববে আবাব বলল, 'লোকটিকে আমাব ভালুকেব মতো লাগে, মা। প্রকাণ্ড একটা বুড়ো ভালুক।'

'এই ভালুক কিন্তু তুলো ভবা ভালুক না যে সাবাদিন কোলে কবে ঘুবে বেড়াবে। এই ভালুকেব ধাবালো নখ আছে।'

এ্যানি খিলখিল কবে হেসে ফেলল।

'হাসছ কেন?'

'এমনি হাসছি।'

'কাবণ ছাড়া হাসা এবং কাবণ ছাড়া কান্না এসব মোটেই ভালো লক্ষণ না। কাল থেকে তুমি রীতিমতো স্কুলে যেতে শুরু কববে। লোকটি নিযে যাবে এবং নিযে আসবে। ওব সঙ্গে বেশি মিশতে চেষ্টা কববে না। এই লোকটি মেলামেশা বেশি পছন্দ করে না।'

'তুমি লোকটি-লোকটি বলছ কেন মা? ওব একটি নাম আছে। জামশেদ। [illegible] জামশেদ বলবে।'

'ঐসব বিদেশি নাম আমাব মুখে আসে না।'

'চেষ্টা কবলেই আসবে। বল আমাব সঙ্গে — জামশেদ।'

'বলেছি তো বিদেশি নাম আমি উচ্চারণ কবতে পাবি না।

'মা, ওকে যদি আমি বুড়ো ভালুক বলি, তাহলে কি ও বাগ কববে?'

'জানি না। তুমি বড্ড বাজে কথা বল।'

'মিস মাবিয়াটা বলছিলেন, বুড়ো ভালুক নাকি ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন কবতে পাবে।'

'এ রকম বলার কাবণ কি?'

'মিস মারিযাটাব এরকম মনে হচ্ছে। আমার কিন্তু তা মনে হয না, মা।'

'মনে না হলেই ভালো।'

'আমার কাছে মনে হয়, বুড়ো ভালুক খুব একটা চমৎকার মানুষ।'

রুন উঠে পড়ল। বসে থাকলেই এ্যানির বকবকানি শুনতে হবে। বড্ড বেশি কথা বলছে সে। মোটেই ভালো লক্ষণ নয়।

গাড়ি চলছে থার্ড এভিন্যু দিয়ে।

পেছনের সিটে এ্যানি বসে আছে। তাব সঙ্গে দূরত্ব রেখে বসেছে জামশেদ। জামশেদ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দু পাশের পথ-ঘাট লক্ষ করছে। সুবিধাজনক জায়গাগুলি দেখবার চেষ্টা। যেসব জায়গায় হঠাৎ করে হামলা হতে পারে। অত্যন্ত ব্যস্ত রাস্তা। এখানে গাড়িব উপব হামলা চালানোর সম্ভাবনা খুবই কম। যদি কিডন্যাপিং-এর চেষ্টা হয তবে তা হবে স্কুলেব আশপাশে। ব্যস্ত রাস্তায় নয। তবু রাস্তা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

জামশেদ তাব হাঁটুর উপর মেট্রোপলিটান ম্যাপটি বিছিযে দিল। লাল পেন্সিল দিযে দাগ দিতে লাগল থার্ড এভিন্যুতে কটি এক্সিট আছে তার ওপব। পেট্রোল পাম্প কটি আছে তাও দেখতে হবে। বড় ভ্যান জাতীয় গাড়ি লুকিযে বাখার সবচেযে সহজ জাযগা হচ্ছে পেট্রোল পাম্প। নষ্ট হযে গেছে এই অজুহাতে প্রকাণ্ড একটা গাড়ি সেখানে দীর্ঘ সময ফেলে রাখা যায। এতে কারোব মনে কোনো রকম সন্দেহ জাগে না।

স্কুল পর্যন্ত তিনটি পেট্রোল পাম্প দেখা গেল। জামশেদ ড্রাইভাবেব দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল। 'স্কুলে যাবাব তো অনেকগুলি পথ আছে। তুমি কি সব সময থার্ড এভিন্যু দিযে যাও?'

'হ্যাঁ। এই রাস্তায ট্রাফিক কম।'

'এর পর থেকে কখনো পবপব দুদিন এক বাস্তায যাবে না। আমাদেব এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন কেউ আগে থেকে বুঝতে না পারে আমবা কোন্ রাস্তায় যাব।'

'ঠিক আছে। আমি একেক দিন একেক রাস্তায যাব।'

জামশেদ ইতস্তত কবে বলল, 'বওনা হবাব আগে আমাকে জিজ্ঞেস কববে কোন্ রাস্তা। আমি বলে দেব। তুমি কিছু ঠিক কববে না।'

ড্রাইভারটি আহত স্বরে বলল, 'আমি কুড়ি বছব ধবে এদেব গাড়ি চালাচ্ছি। তুমি আমাকেও বিশ্বাস কবছ না?'

'না। আমি কাউকে বিশ্বাস কবি না।'

'যে কাউকে বিশ্বাস কবতে পারে না তাব পৃথিবীতে বাস করা কষ্টকব। পৃথিবীতে বাস করতে হলে মানুষকে বিশ্বাস করতে হয।'

জামশেদ ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'যে বাস্তায তোমাব যেতে ইচ্ছা হয সে রাস্তাতেই যাবে।'

'ধন্যবাদ। তুমি আমাকে তাহলে বিশ্বাস কবতে পাবছ?'

'না। আমি তো বলেছি আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।'

'ও।'

সিসিলিয়ান ড্রাইভার অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে পড়ল।

এ্যানি সারাপথে চুপচাপ বসে ছিল। একটা কথা জানবার জন্যে তার খুব ইচ্ছা করছিল। লোকটির হাতে এরকম একটি লম্বা কাটা দাগ কোথেকে হল? দুহাতেই গভীব দাগ। যেন কেউ একটা ধাবালো কিছু দিযে কব্জির নিচ থেকে দুটি হাত কেটে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। এ্যানি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেসই কবে ফেলল, 'মিঃ জামশেদ, আমি কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

কোনো উত্তর নেই।

'শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'কর।'

'তোমার হাতে কী হয়েছে?'

'আলজিয়ার্সে আমি একবাব গ্রেফতাব হযেছিলাম, তখন হাত কেটে গিয়েছিল।'

'কাবা তোমাকে গ্রেফতাব কবেছিল?'

উত্তর নেই।

'তাবা কি তোমাকে মাবধব কবেছিল?'

'হ্যাঁ, কবেছিল।'

এ্যানি ভযে-ভযে হাত বাড়িযে জামশেদেব হাতেব কাটা দাগ স্পর্শ কবল। জামশেদ কঠিন ভঙ্গিতে হাত সবিযে নিল। রুক্ষ স্ববে বলল, 'কেউ আমাব গাযে হাত বাখলে আমার ভালো লাগে না। আব কখনো গাযে হাত দেবে না। আব শুধু-শুধু প্রশ্ন কববে না। মনে বাখবে কথাটা। আমাব এসব ভালো লাগে না।'

এ্যানি জানালা দিযে বাইবে তাকাল। তার চোখ ছাপিয়ে জল আসছে। সে চায় না কেউ দেখে ফেলুক। কেউ দেখে ফেললে বড় লজ্জাব ব্যাপাব হবে।

'শোন, এ্যানি। কাঁদবে না। কাঁদবাব মতো কিছু হয নি। অকাবণে কান্না আমি সহ্য কবতে পাবি না।'

এ্যানি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'তুমি কখনো কাঁদ না?'

উত্তব নেই।

'যখন আমাব মতো ছোট ছিলে তখনো কাঁদ নি।'

জামশেদ থেমে-থেমে বলল, 'পৃথিবীটা খুব ভালো জাযগা নয। অনেক বকমেব দুঃখ-কষ্ট আছে পৃথিবীতে। এখানে ছোটখাটো ব্যাপাব নিযে কেঁদে বুক ভাসালে হয না। তুমি যখন বড় হবে তখন জানবে অনেক কুৎসিত ও কদর্য ব্যাপাব হয এখানে।'

এ্যানি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'তুমি আমাকে যত ছোট ভাবছ আমি তত ছোট না। আমি অনেক কুৎসিত ব্যাপাবেব কথা জানি কিন্তু আমি কাউকে সেসব বলতে পাবি না। আমাব কোনো বন্ধু নেই।'

দোতলাব লবিতে বসে জামশেদ কফি খাচ্ছিল। মাবিযা নামেব যে মেযেটি কফি নিযে এসেছে সে কিছুক্ষণ গল্প জমাবাব চেষ্টা কবেছে কিন্তু তা সঙ্গত কাবণেই জমে নি। জামশেদেব সঙ্গে কখনো গল্প জমে না।

জামশেদ চাবদিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছিল। বাড়িটি সেবকম সুবক্ষিত নয। চাবদিকেব দেযাল নিচু। যে কেউ অনাযাসে দেযাল টপকাতে পারবে। তাব ওপব কলাপ্সেবল গেটটিতে বেশিব ভাগ সমযই তালা থাকে না। ভিকির সঙ্গে এই বিষযে কথা বলতে হবে। তিনটি জিনিস করা দরকার। দেযাল কমপক্ষে তিন ফুটেব মতো বাড়াতে হবে এবং গেটে সর্বক্ষণ তালা দেযাব ব্যবস্থা কবতে হবে। এবং একটি ভালো জাতেব কুকুবেব ব্যবস্থা কবতে হবে।

জামশেদ কফি খেতে-খেতে ভাবল, শবীব যদি আগের মতো থাকত তাহলে এসবের দরকার হত না। কিন্তু শরীর আগেব মতো নেই, নষ্ট হযে গেছে। এখন এক ধবনেব আলস্য বোধ হয়। দারুণ ক্লান্তি লাগে। মাঝে-মাঝে দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে। কেউ কি এখনো আছে সেখানে যে তাকে চিনতে পারবে? এ জাতীয ভাবনা ইদানীং তাব হয। তখনই তাকে নেশা করতে হয়। সস্তা ধরনের নেশা, ঝাঁঝালো ব্লাক নাইট কিংবা টক বাম।

লিভার অতি দ্রুত পচিয়ে ফেলবার মহৌষধ। লিভারটিকে সুস্থ রেখেই বা কী লাভ। জীবন ফুরিয়ে আসছে। ঘণ্টা বেজে গিয়েছে, কান পাতলে শোনা যায়। এ সময়ে কোনো কিছুর জন্যেই কোনো মমতা থাকে না।

জামশেদ উঠে দাঁড়াল। মারিয়া সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'কফিপটে আরো কফি আছে। খেতে চাইলে ঢেলে নাও।' জামশেদ তার উত্তরে কিছু বলল না। সে নিজের ঘরে চলে এল। এ ঘরের জানালাগুলো ছোট-ছোট। অর্থাৎ ঘরটি ভৃত্যশ্রেণীর লোকদের জন্যে। তাতে কিছুই যায় আসে না। ঘরটি প্রশস্ত এবং লাগোয়া বাথরুম আছে। বাথরুমটি ঝকঝকে পরিষ্কার। তাছাড়া বুক শেলফ আছে একটি, প্রচুর ইংরেজি পেপার-ব্যাক সেখানে। বই পড়ার তার তেমন অভ্যেস নেই। তবু মাঝে-মধ্যে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

'তুমি হাততালি দেবে, মারিয়া। তোমার হাততালির সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়াব। শব্দ করে হাততালি দেবে।'

জামশেদ তাকিয়ে দেখল এ্যানি লনে দৌড়াতে শুরু কবেছে। সিঁড়িব কাছে কোমবে হাত দিয়ে মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। জামশেদ অবাক হযে লক্ষ করল মেযেটি বেশ ভালো দৌড়াচ্ছে। দেখে যতটা দুর্বল মনে হয় ততটা দুর্বল নয় সে। বেশ ভালোই ছুটছে। তবে স্টার্টিং হচ্ছে না। মেয়েটির রিফ্লেক্স এ্যাকশন ভালো না। অনেকখানি সময় নষ্ট করছে শুরুতেই। জামশেদের হঠাৎ ইচ্ছে হল নিচে নেমে যেতে, আব ঠিক তক্ষুনি এ্যানি চেঁচিয়ে বলল, 'মিঃ জামশেদ, আমি স্কুল স্পোর্টসে নাম দিয়েছি। ওযান হানড্রেড মিটাব।'

জামশেদ জানালার পাশ থেকে সরে এল। তার এখন স্যুটকেস খুলে কনিয়াকেব বোতলটি বেব করার ইচ্ছা হচ্ছে। প্রবল ইচ্ছা। জামশেদ ঘবেব দরজা বন্ধ কবে স্যুটকেস খুলল। নিচে এ্যানি খুব হৈচৈ করছে। চেঁচিয়ে বলছে, 'মারিযা, তোমাকেও দৌড়াতে হবে আমার সঙ্গে। একা-একা দৌড়াব নাকি? উহুঁ, তা হচ্ছে না।' মাবিযা স্প্যানিশ ভাষায কী যেন বলল। তার উত্তরে এ্যানি গলা কাঁপিযে হাসতে লাগল। জামশেদের কাছে মনে হল- এ্যানি মেয়েটি বেশ ভালো।

8

ভিকি একটি দুঃসংবাদ পেযেছে।

ওরিযেন্ট মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ম্যানেজার টেলিফোন কবে বলেছে — এক কোটি লীরা ঋণ আপাতত দিতে পারছে না ওরা। তবে নতুন স্পিনিং মেশিন কেনা হলে সেই মেশিন বন্ধক রেখে কিছু দেযা যেতে পারে।

ভিকি আকাশ থেকে পড়ল। খবরটি অপ্রত্যাশিত। ওবিযেন্ট মার্কেন্টাইল ব্যাংকেব ম্যানেজারের সঙ্গে খোলাখুলি কথা হয়েছিল। যোগাযোগ এতরার করে দেয়া। ম্যানেজাব বলেছিল, ঋণ পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। হঠাৎ করে এরকম হল কেন কে জানে।

ভিকি কী করবে ভেবে পেল না। সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি বিক্রি করে দেয়াই সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি। সিনথেটিক কাপড়ের ব্যবসাতে যাওয়াই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু তার জন্যে যে সাহস দরকার সে সাহস ভিকির নেই। তাদের তিন-পুরুষের ব্যবসা হচ্ছে সিল্ক নিয়ে। সিল্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। ডুবলেও সিল্কের মধ্যেই ডুবতে হবে।

'হ্যালো, এতরা?'
'হুঁ। কী ব্যাপার, এই সাত সকালে?'
'ওরিয়েন্ট মার্কেন্টাইল লোন দিচ্ছে না।'
'বল কী!'
'হ্যাঁ। আজকেই কথা হযেছে।'
'কি জন্যে দিচ্ছে না কিছু বলেছে?'
'না।'
'আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করে জানব।'
ভিকি ক্লান্ত স্বরে বলল, 'এখন আমার কী করণীয সেটা বল।'

'বিদেশি ব্যাংকগুলোব সঙ্গে যোগাযোগ কবা উচিত। ওদেব 'হার্ট' অনেক বড়। ঋণ চাইলে এত ধানাইপানাই করে না। তুমি আমেরিকান এক্সপ্রেসেব সঙ্গে যোগাযোগ কব। মিঃ ওলিভার লরেন্স নামে এক ভদ্রলোক আছেন সেখানে। ওর সঙ্গে কথা বল।'

'দেখি।'

'দেখাদেখিব কিছু নেই। আজকেই যোগাযোগ কব। আচ্ছা, একটা কথা, মিলান শপিং মলে তোমাব একটা ঘর আছে না?'

'আছে।'
'সেটাও কি মর্টগেজড্?'
'হ্যাঁ।'
'কোন্ ব্যাংক?'
'সিটি ব্যাংক।'

'তোমাব অবস্থা তো করুণ বলেই মনে হচ্ছে। যাক, ঘাবড়াবাব কিছু নেই। একটা কিছু হবেই। ব্যাংক ছাড়াও তো ঋণ দেবাব লোক আছে।'

ভিকি শংকিত গলায বলল, 'আমি ব্যাংক ছাড়া বাইবেব কোনো লোন নিতে চাই না।'
'না চাওয়াই উচিত। ইন্টাবেস্টের বেট খুবই চড়া।'
' সেজন্যে না। মাফিযাদেব সঙ্গে জড়াতে চাই না।'
এতবা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'জলে নামলে কুমিবেব সঙ্গে ভাব বাখাই ভালো।'
'এতবা, ভাব বেশি কবতে চাই না।'
'আচ্ছা-আচ্ছা, ঠিক আছে। ভিকি?'
'শুনছি।'

'এই বোববাবে বাচ্চাদেব জন্যে একটা মেলা হচ্ছে। সার্কাস, ম্যাজিক-শো এইসব হবে — চিলড্রেন্স নাইট। একটা বড় জাহাজ ভাড়া কবেছে ওবা। জাহাজের মধ্যেই সব ব্যবস্থা। তুমি, এ্যানি এবং রুন এদেব নিযে ঘুরে আস। মন ভালো থাকবে।'

'আমি এই কদিন কোথাও বেরুব না।'
'এ্যানিব ভালো লাগত।'
'তুমি যেতে চাইলে এ্যানিকে নিযে যেতে পাব। আমি কোথাও নড়ব না।'

মিঃ ওলিভার লরেন্স লোকটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী। সে ভিকিব ঋণেব কাগজপত্র সব হাসিমুখে দেখল। কফি খাওযাল। মিডল ইস্টের সমস্যা নিযে দীর্ঘ আলোচনা কবে শেষ পর্যাযে বলল, 'মিঃ ভিকি, ইটালিযানরা পারতপক্ষে বিদেশি ব্যাংকেব কাছে লোন চায না। এদিক দিযে তারা খুব জাতীযতাবাদী। বিদেশি ব্যাংকেব কাছে ওরা তখনি আসে যখন দেশি ব্যাংক ওদের ঋণ দেয না। কথাটা কি ঠিক নয?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'আপনাকে স্থানীয় ব্যাংকগুলো লোন দিচ্ছে না কেন, মিঃ ভিকি?'

ভিকি সরাসরি কোনো জবাব দিতে পারল না। লরেন্স ওলিভার হাসিমুখে বলল, 'আমার মনে হয় পিওর সিল্ক থেকে আপনার সরে আসা উচিত। পিওর সিল্কের বাজার ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।'

ভিকি চুপ করে রইল। লরেন্স ওলিভার বলল, 'আপনাদের যে পারিবারিক নামডাক আছে তার ওপর নির্ভর করেই আমরা আপনাকে লোন দিতে রাজি আছি, তবে আপনাকে পিওর সিল্ক থেকে সরে আসতে হবে।'

ভিকি ক্লান্ত স্বরে বলল, 'তা সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয় কেন?'

'মিঃ লরেন্স, সিল্ক ব্যবসা আমাদের অনেক দিনের ব্যবসা। আমার দাদা ছিলেন রাস্তাব ছোকরা। সিল্ক ব্যবসা করেই তিনি কোটিপতি হযেছিলেন। তিন–পুরুষের সেই ব্যবসা আমি নষ্ট করব তা হয় না।'

লরেন্স ওলিভার মৃদু হাসল।

'আপনি হাসছেন কেন?'

'হাসছি কারণ আপনি ব্যবসাব জন্যে ফিট নন। আপনি সেন্টিমেন্টাল।'

'সেন্টিমেন্টাল হওয়া কি খুব দোষের?'

'না, তা নয়। কিন্তু ব্যবসায়ীর জন্যে খাবাপ।'

ভিকি চুপ করে গেল।

'আমি দুঃখিত যে কিছু করতে পাবছি না। তবে আপনি যদি ব্যবসাব ধাবা বদলাতে চান তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমি নিশ্চযই সাহায্য কবব।'

ভিকি মৃদু স্বরে বলল, 'তা সম্ভব নয।'

রুন ত্রিশ হাজার লীরা দিয়ে নতুন একটি ড্রেস কিনেছে। অনেকটা জাপানি কিমোনোর মতো দেখতে। হালকা সবুজ বঙের ওপর নীল নকশা। ঘবে আনাব পব তাব মনে হল, ঘন সবুজের ওপর ঘন নীল নকশাব যে ড্রেসটি ছিল সেটিও সন্ধ্যাবেলাব জন্যে চমৎকার। রুন সেটাও কিনে আনল। একই ডিজাইনের উপর আবো দুটো ড্রেস ছিল। সে দুটোও কিনে ফেলবে কিনা এই বিষযে সে ঠিক মনস্থির কবতে পারল না। সবগুলি কিনে ফেলবার পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, তাহলে তাকে দেখে অন্য কেউ আব একই ডিজাইনের পোশাক সঙ্গে সঙ্গে কিনতে পারবে না। আর না কেনার পেছনে যুক্তি হচ্ছে, 'ভিকি রাগ করবে।'

ভিকি অবশ্যি রাগ কবল না, ভাবলেশহীন চোখে তাকিযে দেখল। রুন হালকা গলায বলল, 'খবচ একটু বেশি পড়ে গেল, কিন্তু দেখ না, এত চমৎকার ডিজাইন রোজ রোজ পাওয়া যায় না। আব সবুজ বঙের গাম্ভীর্যটুকু দেখ। চোখ ফেবানো যায না। তুমি খুশি হয়েছ তো?'

'হ্যাঁ, হয়েছি।'

'না, ঠিক খুশি হও নি। একটু বাগ তোমার মধ্যে আছে। কিন্তু আমি ড্রেসটা গাযে দিয়ে আসি, দেখবে কী অদ্ভুত লাগে। ভালো কথা, ঐ লোকটা তোমাব সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুব নাকি জরুরি।'

'কোন্ লোকটা?'

'আমাদের বডিগার্ড। ওর নাম মনে থাকে না আমাব।'

'কী চায সে?'

'আমি জানি না। আমাকে কিছু বলে নি।'

'বেশ, ডাক।'

ভিকি মন দিয়ে ওর কথা শুনল। লোকটি ঘরের চারদিকের দেয়াল তিন ফুট উঁচু করতে চায়, একটি কুকুর রাখতে চায়।

'মিঃ ভিকি, তোমার বাড়ি খুবই অরক্ষিত। যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তবে তা তোমার বাড়িতেই ঘটবে।'

'জামশেদ, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। আমার মেয়েকে কেউ কিডন্যাপ করবে না। তোমাকে আমি রেখেছি শুধু আমার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য। তুমি তার কাছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতীক।'

'এই কথা তুমি কিন্তু আমাকে আগে বল নি।'

'এখন বললাম। এখন থেকে জেনে রাখ।'

'ও।'

'এখানে থাকতে তোমার কেমন লাগছে?'

জামশেদ জবাব দিল না।

ভিকি বলল, 'এ্যানি অবশ্যি খুব খুশি। তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে।'

জামশেদ অবাক হয়ে তাকাল। তাকে পছন্দ করবার তেমন কোনো কারণ নেই। বরং অপছন্দ হবারই কথা।

'তোমাকে ও কি বলে ডাকে জান? বুড়ো ভালুক।'

'বুড়ো ভালুক?'

'তোমাকে নাকি ওর বুড়ো ভালুকের মতো লাগে।'

'ও।'

'আমার মেয়েটিকে কেমন লাগে তোমার? চমৎকার না?'

'শিশুদের আমি ঠিক পছন্দ করি না, মিঃ ভিকি। ওদেরকে আমার কখনোই ভালো লাগে না।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'পছন্দ না করবার কারণ কী?'

'আছে হয়তো কোনো কারণ। আমি ঠিক জানি না। কারণ নিয়ে কখনো ভাবি নি।'

৫

রুন দারুণ বিরক্ত হল।

একজন লোক আগ্রহ করে নিতে চাইছে, কিন্তু মেয়েটা যাবে না। এর মানে কী? কত রকমের মজার ব্যবস্থা আছে। সারারাত জেগে সার্কাস-টার্কাস দেখবে, তা না, এ্যানি মুখ গোঁজ করে আছে।

'কেন যাবে না, এ্যানি?'

'আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো না লাগার কী আছে এখানে?'

'বললাম তো আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'সার্কাস দেখতে তোমার ভালো লাগে না?'

এ্যানি চুপ।

'পুতুল নাচ দেখতে ভালো লাগে না?'

কোনো জবাব নেই।

'তার ওপর প্যান্টোমাইম আছে।'

এ্যানি টেনে-টেনে বলল, 'তুমি যদি যাও তাহলে আমি যাব।'

রুন বিরক্ত স্বরে বলল, 'আমি তোমার কোনো অজুহাত শুনতে চাই না। তুমি যাবে এবং হাসিমুখে যাবে। একটা লোক এত টাকা খরচ করে টিকিট এনেছে, না সে যাবে না। দিনরাত ঘরে বসে থেকে তোমার এরকম হয়েছে।'

'মা। আমি কোথাও যেতে চাই না।'

'এ ব্যাপারে আমি আর কথা বলতে চাই না। তুমি তোমার কাপড় গুছিয়ে রাখ। সন্ধ্যাবেলা এতরা চাচা তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

এ্যানি তার বাবাকে গিয়ে ধরল, 'বাবা, আমি ঐ জাহাজে যেতে চাই না।'

'কেন, মা?'

'আমার ভালো লাগছে না।'

'শরীর খারাপ?'

'না, শরীর ঠিকই আছে।'

'তাহলে কি মন খারাপ?'

'হুঁ।'

'মন খারাপ হলে তো যাওয়াই উচিত। তাহলে মন ভালো হবে। তাছাড়া বহু টাকা খরচ করে তোমার এতরা চাচা টিকিট কেটেছেন। সেটা দেখতে হবে না?'

'আমার একটুও ইচ্ছা করছে না বাবা।'

'ইচ্ছা না কবলেও আমাদের অনেক কিছু করতে হয। তুমি না গেলে তোমাব মা খুব রাগ করবেন। তোমার মা বাগ করলে কী অবস্থা হয তা তুমি জানই। জান না?'

'জানি।'

'যাও মা, ঘুরে আস। বেশ লাগবে তোমার। তখন মনে হবে কেন যে আগে আসতে চাই নি।'

রাত দশটার পর জামশেদ দরজা বন্ধ কবে দেয। আজকেও কবে দিয়েছে। স্যুটকেস খোলা হযেছে। হুইস্কির পেট মোটা বোতল বের হযেছে। বোতলের মুখ খুলবাব আগেই দরজায় আলতো করে টোকা পড়ল।

'কে?'

কোনো জবাব নেই। জামশেদ বোতলটা ব্যাগে ঢুকিযে ফেলল।

'কে?'

কোনো উত্তর নেই। জামশেদ দরজা খুলে দেখে ঘাসেব স্লিপাব পাযে দিযে এ্যানি দাঁড়িয়ে আছে শুকনো মুখে।

'কী ব্যাপার?'

'আমি তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।'

'কথাটা সকালে বললে হয় না?'

'না।'

'এস, ভেতরে এসে বল।'

এ্যানি নিঃশব্দে ভেতরে এল। জামশেদ দেখল মেয়েটির চোখ ফোলা। নিশ্চয় দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদছে।

'কী বলবে বল?'

'কাল সন্ধ্যায় এতরা চাচা আমাকে একটা জাহাজে নিয়ে যাবে। সেখানে সারারাত ধরে সার্কাস-টার্কাস হবে।'

এ্যানি দম নেযার জন্য থামল। জামশেদ কিছুই বলল না।

'আমি সেখানে যেতে চাই না।'

'ও।'

'ঐ লোকটা ভালো না। আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি। আমি আগের মতো ছোট না।'

'তুমি তোমার বাবা-মাকে বলেছ?'

'বলেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয নি।'

'তুমি কি বলেছ এতরা চাচা লোকটি খারাপ?'

'না।'

এ্যানি ফুঁপিযে উঠল। জামশেদ ভারি গলায বলল, 'যাও, ঘুমুতে যাও। অনেক রাত হযেছে। নাও, এই তোযালেটা দিযে চোখ মোছো।'

এ্যানি চোখ মুছে শান্ত স্বরে বলল, 'শুভরাত্রি, মিঃ জামশেদ।'

'শুভরাত্রি।'

এতরা এসে পড়ল পাঁচটার মধ্যেই। তার গাযে চমৎকার একটা সার্জের কোট। পিঠে বাটিকের কাজ করা চামড়ার একটা ব্যাগ।

'এ্যানি, তৈরি তো?'

রুন বলল, 'হ্যাঁ, তৈরি হচ্ছে। আর ঝামেলার কথা বল কেন, হঠাৎ করে বলছিল সে যাবে না। তার নাকি ভালো লাগছে না।'

'কী আশ্চর্য, ভালো লাগছে না কেন? কোথায, এ্যানি কোথায?'

'সাজগোজ করছে।'

'যাচ্ছে তো এখন?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছে।'

'যাক, তাও ভালো।'

এ্যানি লাল রঙের একটি ম্যাক্সি জাতীয ড্রেস পরেছে। ড্রেসটির জন্যেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, এ্যানিকে বেশ বড়-বড় লাগছে— পনের-ষোল বছরের তরুণীর মতো। রুন অবাক হযে বলল, 'বাহ্ চমৎকার লাগছে তো! গালে কি তুমি রুজ দিযেছ, এ্যানি?'

'নাহ্!'

'রুজ ছাড়াই গাল এমন লাল দেখাচ্ছে? আশ্চর্য তো! এতরা, দেখ, আমার মেযেকে দেখ। পরীর মতো লাগছে না?'

'হুঁ, তা লাগছে। মেযে মাযের মতোই হযেছে।'

গেটের পাশে জামশেদ দাঁড়িয়েছিল। এতরা এ্যানিকে নিযে গেটের কাছে আসতেই সে বলল, 'মিঃ এতরা, এ্যানিকে যে তুমি জাহাজে নিচ্ছ, সেখানকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি তো কিছু জানি না।'

'তোমার জানার কোনো দরকার আছে কি?'

'আছে। আমাকে বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে এ্যানির নিরাপত্তার জন্যে। কাজেই এ্যানি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।'

এতরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলে কী এই উজবুক!

'আমি একে নিয়ে যাচ্ছি এটা কি যথেষ্ট নয়?'

'না, মিঃ এতরা। মোটেই যথেষ্ট নয। আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।'

এতরা দেখল, লোকটির কালো চোখ পাথরের মতো কঠিন। এ যাবেই সঙ্গে, এতে ভুল নেই।

এ্যানির ফ্যাকাসে ঠোঁটে হঠাৎ যেন রক্ত ফিরে এসেছে। সে মনে হচ্ছে অন্যদিকে তাকিয়ে হাসি গোপন করতে চেষ্টা করছে।

'তোমাকে সঙ্গে নেয়ার জন্যে কোনো বাড়তি টিকিট নেই।'

'তাহলে আজকের যাওয়াটা বাতিল করতে হবে।'

'আমার মনে হয় একটা ছোট ব্যাপারকে এখানে অনেক বড় করে দেখা হচ্ছে।'

'আমার তা মনে হয না, মিঃ এতরা।'

এতরা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল। জামশেদ শান্ত স্বরে বলল, 'চেষ্টা কবলে এখনো হয়তো আরো একটা টিকিট জোগাড় করা যেতে পারে।'

'এত সময় আমার নেই। আমি একজন ব্যস্ত মানুষ।'

'তাহলে বরং অন্য কোনো দিন হবে।'

এতরা জবাব দিল না।

ভিকি অনেক বাতে ঘুমোতে এসে দেখে রুন জেগে আছে। ব্যাপাবটি অস্বাভাবিক। রুন এত রাত পর্যন্ত জাগে না। রাত জাগলে তার চোখের নিচে কালি পড়ে। এটি সে হতে দেয় না। শরীর ঠিক রাখবার জন্যে অনেক কঠিন নিযম মেনে চলে সে।

ভিকি বলল, 'কী ব্যাপার, এখনো জেগে আছ যে? দেড়টা বাজে।'

'তোমার জন্যে জেগে আছি।'

'কিছু হয়েছে নাকি?'

'ঐ লোকটার চাকরি নট্ করে দাও।'

'কার চাকরি নট্ করব?'

'জামশেদ না কি যেন নাম— এ্যানির বডিগার্ড।'

'ব্যাপারটা কী?'

'অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার কবেছে সে।'

'কার সঙ্গে? তোমার সঙ্গে?'

'না, এতরার সঙ্গে। এতরা ভীষণ রেগে গেছে।'

ঘটনাটা খুলে বলল রুন। ভিকি গম্ভীব হযে বলল, 'এটা বলাব জন্যেই তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে আছ?'

'ঘটনাটা তোমার কাছে খুব সাধারণ মনে হচ্ছে? এত বড় অপমান কবল সে এতরাকে। শেষ পর্যন্ত এতরা এ্যানিকে রেখে গেল!'

'এতরার অপমানিত বোধ করার তো কোনো কারণ নেই। লোকটি তাব ডিউটি করেছে।'

'ডিউটি? কীসের ডিউটি?'

'এ্যানির নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখার ডিউটি। লক্ষ্য রাখা — যাতে কেউ এ্যানিকে কিডন্যাপ না করে।'

রুন রেগে গিয়ে বলল, 'কে কিডন্যাপ করবে এ্যানিকে?'

'আমার তো সেই প্রশ্নই ছিল। কিন্তু তখন তুমিই আমাকে অন্য রকম বুঝিয়েছ।'

'বেশ, আমি ভুল করেছি।'

'বডিগার্ডেব ভূত তোমাব ঘাড় থেকে নেমেছে?'

রুন জবাব দিল না।

'বডিগার্ডের আর তাহলে প্রয়োজন নেই?'

'না।'

'খুব ভালো।'

'এখন বল কবে তাড়াচ্ছ লোকটাকে?'

'বললেই তো আব হুট কবে তাড়ানো যায না। চাকবি থেকে ববখাস্ত করতে হলে খুব ভালো কারণ থাকতে হবে। নযতো ইউনিযনেব ঝামেলায় পড়ব।'

'কিন্তু চাকবি দেবাব সময তো তুমি বলেছিলে টেম্পোবাবি এ্যাপযেন্টমেন্ট, বল নি?'

'হ্যাঁ, তা বলেছি। কিন্তু টেম্পোবারি এ্যাপযেন্টমেন্টেও তিন মাস শেষ হবাব আগে নোটিশ দেয়া যায না। তুমি এত ব্যস্ত হযে উঠলে কেন?'

'এতরা খুবই বাগ কবেছে।'

'একে তো এতবাই জোগাড় করে এনেছিল।'

'এতবা আমাকে বলেছে ঐ লোকটি না বিদেয হওয়া পর্যন্ত সে এ বাড়িতে আসবে না।'

'না আসুক। তাব আসতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?'

'তাব মানে? কী বোঝাতে চাচ্ছ তুমি?'

'কিছুই বোঝাতে চাচ্ছি না। ভোব হোক–তখন দেখা যাবে। এখন ঘুমাও। অসংখ্য ঝামেলা আমাব মাথায। এইসব সামান্য ব্যাপাব নিযে হৈচৈ কবতে ভালো লাগছে না।'

'তোমাব আবার কী ঝামেলা?'

'ব্যাংক থেকে লোন পাওযা যাচ্ছে না।'

'একটা থেকে না পাওযা গেলে অন্যটা থেকে পাওযা যাবে।'

ভিকি কথা না বাড়িযে ঘুমুতে গেল। রুন মাথাব চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, 'ঐ লোকটা মনে হয এলকোহলিক। মাবিযা জানালা দিযে দেখেছে বাতেব বেলা বোতল নিযে বসে ও।'

'একটু–আধটু ড্রিংক তো সবাই কবে।'

'তা কবে, কিন্তু কেউ দবজা–টবজা লাগিযে তো কবে না! আমি এ বাড়িতে কোনো মাতালকে রাখব না।'

'সকাল হোক, আলাপ কবে ঠিক কবব কি কবা যায। এখন দযা কবে ঘুমুতে যাও।'

টুকটুক কবে টোকা পড়ছে দবজায।

জামশেদ ভারি স্ববে বলল, 'কে?'

'আমি। আমি এ্যানি।'

'কী চাই?'

'আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।'

'ঠিক আছে। এবার যাও।'

'আমি তোমার জন্যে কয়েকটা গোলাপ ফুল এনেছিলাম।'

'ফুল লাগবে না। তুমি যাও।'

এ্যানি তবুও দীর্ঘ সময দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মারিযা কফিব পেযালা হাতে বাইরে বেরিয়ে দেখল এ্যানি চুপচাপ দাঁড়িযে আছে। ব্যাপারটা তার ভালো লাগল না।

একটা ভয়ংকর লোকের দরজার সামনে ভোরবেলায় ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকাটা চট করে চোখে লাগে। ব্যাপারটা রুনকে বলতে হবে। মারিয়া ডাকল, 'এ্যানি।'

'হ্যালো, মারিয়া।'

'কী করছ একা-একা?'

'কিছু করছি না।'

'ফুল কার জন্যে?'

এ্যানি হাসিমুখে বলল, 'বুড়ো ভালুকের জন্যে।'

'হঠাৎ ফুল কেন? কোনো বিশেষ কারণ আছে?'

'আছে। তোমাকে বলা যাবে না।'

মারিযার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। ব্যাপারটা তার মোটেও ভালো লাগছে না।

জামশেদকে একদিনের ছুটি দেযা হয়েছে।

তার ছুটির প্রযোজন ছিল না তবু নিতে হল। ভিকি বার বাব বলল, 'ঘুরেটুবে আস। সারাক্ষণ ঘরে বন্দি হযে থাকার দরকাব নেই। এ্যানির স্কুল নেই, সে বাড়িতেই থাকবে।'

জামশেদের যাবার তেমন জাযগা নেই। মিলান শহবটিকে সে খুব ভালো চেনে না। দশ বৎসর আগে এখানের অলিগলি চেনা ছিল। এখন আর নেই। দশ বৎসব খুব দীর্ঘ সময়, এই সমযে খুব চেনা জিনিসও অচেনা হযে যায।

রাস্তাঘাট বদলে গেছে। শহর অনেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে। ড্রেলকা নদীব দুপাশে বস্তি জাতীয় যেসব ঘরবাড়ি ছিল তার কোনো চিহ্নও নেই। আকাশ-ছোঁযা দালান উঠেছে দুপাশে। প্রশস্ত ছয় লেনেব রাস্তা। ঝলমলে নিযন আলো।

সন্ধ্যার আগে-আগে জামশেদ একতলা একটা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল। রেস্টুরেন্টটি শহরের উপকণ্ঠেব একটি দবিদ্র অঞ্চলে। অল্প আলোব একটি বাতি জ্বলছে। সে আলোতে বেস্টুরেন্টেব নাম অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে– "পিজা এন্ড লাসানিযা হাউস'। লেখাটি ইংরেজিতে।

রেস্টুরেন্ট ফাঁকা। এক কোণায একটি বুড়ো মতো ভদ্রলোক ঝিমুচ্ছে। অন্য প্রান্তে একটি অল্পবযসী মেয়ে একা-একা বসে আছে। মেযেটি ঘনঘন ঘড়ি দেখছে। নিশ্চযই কারো জন্যে অপেক্ষা কবছে সে।

কাউন্টাবে অল্পবযস্ক একটি ছোকবা বসে আছে। জামশেদ কাউন্টাবেব দিকে এগিযে গেল, 'আমি একজন আমেরিকানের খোঁজ কবছি, তাব নাম বেন ওযাটসন।'

ছেলেটি সন্দেহভবা দৃষ্টিতে তাকিযে রইল। থেমে-থেমে বলল, 'কী জন্যে খোঁজ করছেন?'

'ও আমার পরিচিত।'

'বেন এখানে নেই।'

'সে এখানেই আছে। কখন আসবে সে?'

'জানি না।'

'আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'ইচ্ছে হলে করুন।'

জামশেদ একটি অন্ধকার কোণা বেছে নিল বসবাব জন্যে। কাউন্টাবেব ছেলেটি এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু খাবে? ভালো পিজা আছে।'

'না।'

'কনিযাক আছে। দেব?'

'দিতে পার।'

'লীরা আছে তো তোমার কাছে?'
'আছে।'
'এখানে আগে দাম দিতে হয।'
জামশেদ হাজার লীরার একটা নোট বেব করল। ছেলেটি নোট হাতে নিতে-নিতে বলল, 'বেন ওয়াটসনেব সঙ্গে তোমার কী দবকাব?'
'আছে একটা দবকার।'
'তুমি কি পুলিশেব লোক?'
'না।'
জামশেদ লক্ষ কবল মস্তান ধরনের একটি ছেলে এসে ঢুকেছে। ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছে না — টলছে। ছেলেটি গিযে দাঁড়িযেছে মেযেটিব টেবিলেব সামনে। নিশ্চযই কোনো ঝামেলা বাধাতে চায। জামশেদ কান খাড়া কবল।
'মিস, আমি কি তোমার টেবিলে বসতে পাবি?'
'আমি এক জনের জন্যে অপেক্ষা কবছি। তুমি দযা কবে অন্য টেবিলে বস।'
'যার জন্যে অপেক্ষা কবছ সে তো আসছে না।'
'আসবে।'
'যখন আসবে তখন ছেড়ে দেব।'
জামশেদ লক্ষ কবল মেযেটিব মুখ ফ্যাকাসে হযে উঠছে। মেযেটি উঠে দাঁড়াল।
'উঠছ কেন?'
'আমি অন্য কোথাও বসব।'
'কেন, আমাকে পছন্দ হচ্ছে না?'
'পছন্দ-অপছন্দেব কথা না। আমি বাড়ি চলে যাব।'
'এখনই বাড়ি যাবে কেন? বাত তো মাত্র শুরু।'
কাউন্টাবেব ছেলেটি বলল, 'এ্যাই, ঝামেলা কববে না।'
'ঝামেলা?'
'এটা মাতলামিব জাযগা না।'
'কি, তুই আমাকে মাতাল বললি?'
'মাতাল-টাতাল বলি নি। যাও, অন্য কোথাও যাও।'
'এইখানে এই মেযেব হাত ধবে বসে থাকব, দেখি কোন শালা কি বলে।'
লোকটি পকেট থেকে আধ হাত লম্বা একটি ছোবা বেব করল। মেযেটিব মুখ রক্তশূন্য হযে গেল। বুড়ো ভয পেযে উঠে দাঁড়িযেছে। সে এই ঝামেলায থাকতে চায না। কাউন্টাবেব ছেলেটিও ভয পেযেছে।
জামশেদ উঠে এগিযে গেল। খুব ঠাণ্ডা স্ববে বলল, 'মেযেটিকে ছেড়ে দাও।'
'কেন? তুই ফুর্তি করতে চাস?'
'ওব হাত ছাড়!'
মাতালটা হাত ছেড়ে দিল কিন্তু নিমিষেই বাঁ হাতে ছোরাটা তুলল। তোলাব ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে — ছোবা সে অতীতে অনেকবার ব্যবহাব কবেছে। আজকেও কববে। কাবণ মদের প্রভাবে তাব বুদ্ধি ঘোলা হযে গেছে।
জামশেদ দ্রুত ভাবতে চেষ্টা কবল। ছোকরা লেফ্ট হ্যান্ডাব কিনা তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অনেক সময প্রতিপক্ষকে ধোঁকায ফেলবাব জন্যে এই কাণ্ডটি কবা হয। আক্রমণেব ঠিক আগের মুহূর্তে ছোরা চলে আসে ডান হাতে।
জামশেদ একদৃষ্টে মাতালটির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা কবতে লাগল। অপেক্ষাব মতো কষ্টকর কিছুই নেই। তা ছাড়া বযসের জন্যে ইন্দ্রিয আগেব মতো সজাগ বাখা যায না।

জামশেদের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমল। এগিয়ে আসছে... এখন ঝাঁপিয়ে পড়বে। যা ভাবা গিয়েছিল তাই, সে তার ডান হাতটিই ব্যবহাব করবে। ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যেই বাঁ হাতে রেখেছে ছুরি। ছুরি হাতবদল হবার আগ-মুহূর্তেই কিছু একটা করতে হবে।

মেয়েটি কুলকুল করে ঘামছিল। সে দেখল, ছুরি হাতে বাঘের মতো বয়স্ক লোকটাব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাতালটি। মেয়েটি চোখ বন্ধ করে ফেলল। চোখ মেলে যে দৃশ্য দেখল তার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। দেখল — বয়স্ক লোকটি নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। চার-পাঁচ ফুট দূরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে মাতালটি। খুব সম্ভব তার নাক ভেঙে গেছে। গলগল করে রক্ত পড়ছে। সে দারুণ অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে বয়স্ক লোকটিকে।

জামশেদ তার টেবিলে ফিরে আসতেই ছেলেটি দৌড়ে এল।

'স্যার, ভালো কনিযাক আছে, দেব?'

'না।'

'টাকা লাগবে না।'

'না। আমি এখন উঠব।'

'স্যার, আপনি যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবেন, তাহলে বেনেব সঙ্গে দেখা হবে। বেন ওযাটসন একটার দিকে আসবে।'

জামশেদ উঠে দাঁড়াল।

'স্যার, একটু যদি বসেন।'

'না। এখন আমি যাব।'

'বেন ওযাটসনকে আপনার কথা কি বলব?'

'কিছু বলতে হবে না।'

'আপনার নাম?'

'আমার নাম বলার কোনো প্রযোজন নেই।'

'আপনি কি আবার আসবেন?

'হ্যাঁ আসতে পারি। না-ও আসতে পাবি।'

জামশেদ বেস্টুরেন্ট থেকে বেব হযেই মেযেটিকে দেখতে পেল। সে খুব সম্ভব জামশেদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। জামশেদকে বের হতে দেখেই দ্রুতপাযে এগিয়ে এল। 'আমি আপনাকে ধন্যবাদ দেবাব জন্যে অপেক্ষা কবছিলাম।'

'ধন্যবাদ দেবার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আমি কি আপনার নাম জানতে পাবি?'

জামশেদ সে কথার উত্তব না দিযে মৃদুস্বরে বলল, 'মেযেদেব এত বাতে একা-একা বাইরে থাকাটা ঠিক না।'

'আমি আমার এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমাব বন্ধু একজন পুলিশ অফিসার।'

'ও।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। শুভ রাত্রি।'

'শুভ রাত্রি।'

রুন কখনো সকালে উঠতে পারে না।

নটার সময় বেড-টি খেযে সে খবরেব কাগজ পড়তে বসে। খেলাধুলা এবং আইন-আদালত এই দুটি অংশ পড়তে-পড়তে দশটা বেজে যায়। রোজই সে দাঁত ব্রাশ করতে যায় দশটার পর।

আজ একটি বিচিত্র কারণে রুটিনেব ব্যতিক্রম হল। শেষরাতেব দিকে রুন একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখল। যেন সে এবং এ্যানি সমুদ্রেব ধাবে বেড়াতে গিয়েছে। কিন্তু এ্যানির গায়ে কোনো কাপড় নেই। সে খুব বিরক্ত হযে বলছে, 'এইসব কী অসভ্যতা, এ্যানি! ছি!'

ঠিক তখন এ্যানি ভয় পাওযা স্বরে বলল, 'মা, পালাও! ওরা আমাদেব ধবতে আসছে!'

রুন চমকে পিছনে ফিবে দেখল তিনটি বদ্ধ উন্মাদ ছুটে আসছে তাদের দিকে। ওদেব গাযেও কোনো কাপড় নেই। রুন দৌড়াতে শুরু কবল। কিন্তু এ্যানি সেবকম দৌড়াতে পাবছে না। পাগলগুলো শেষ পর্যন্ত এ্যানিকে ধরে ফেলল। রুন শুনলো, এ্যানি প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, 'জামশেদ, আমাকে বাঁচাও।'

রুন এই সময জেগে উঠল। পবপব দুপেগ ব্রান্ডি খেযে বাইবে এসে দেখল ভোব হযেছে। এ্যানি জগিং স্যুট পবে দৌড়াচ্ছে বাড়িব সামনেব খোলা মাঠটায। রুন একবাব ভাবল এ্যানিকে ডাকে। কিন্তু ডাকল না। বেলিং-এ ভব দিযে তাকিযে বইল, স্বপ্নেব ঘোব তাব তখনো কাটে নি। এখনো গা কাঁপছে।

রুন দেখল জামশেদ নিচে নেমে যাচ্ছে। হাত ইশাবা কবে ডাকছে এ্যানিকে। কী যেন বলছে। উপব থেকে ঠিক শোনা যাচ্ছে না। রুন নিচে নেমে এল। জামশেদ ভাবি গলায উপদেশ দিচ্ছে এ্যানিকে।

'তুমি ভালোই দৌড়াচ্ছ, কিন্তু শুরুটা ভালো হচ্ছে না। দৌড়ে শুরুটাই আসল। ঠিক সময শুরু কবতে হবে। সমস্ত ইন্দ্রিয সজাগ বাখতে হবে।'

এ্যানি বলল, 'তুমি কি আমাকে শেখাবে? আমি জানি আমি ভালো দৌড়াতে পাবি কিন্তু শুরুটা আমাব সত্যি-সত্যি খাবাপ।'

রুন দেখল জামশেদ গম্ভীব হযে আছে। এই লোকটি কি সহজ হতে জানে না?

'আমাকে তুমি শেখাবে? প্লিজ।'

'হ্যাঁ, শেখাব। এস আমাব সঙ্গে।'

রুন লক্ষ কবল এ্যানিব সমস্ত চোখ-মুখ উজ্জ্বল হযে উঠেছে। এসব মোটেই ভালো লক্ষণ নয। মেযেটি ক্রমে-ক্রমেই অপবিচিত এই ভযঙ্কব লোকটিব দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

রুন ভিকিকে টেলিফোন কবল দুপুবে। ভিকি টাকাপযসাব কী একটা সুবাহা কববাব জন্যে বোমে গিযেছে। গতকালই ফেবাব কথা ছিল, ফেবে নি।

'হ্যালো, ভিকি?'

'হ্যাঁ। কী ব্যাপাব?'

'গতকাল বাতে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। শোন, কী দেখলাম...'

ভিকি ভ্রূ কুঁচকে শুনতে লাগল। লং ডিসটেন্স কল। প্রচুব বিল উঠবে। কিন্তু উপায নেই, শুনতেই হবে।

স্বপ্নেব কথা ভিকিকে দশ মিনিট ধবে শুনতে হল। সবশেষে রুন বলল, 'আমাব খুব ভয লাগছে।'

'ভযেব কিছু নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই।'

'হোক স্বপ্ন...তুমি আজকেই চলে আসবে।'

'আমি আসতে পাবছি না। টাকার কোনো ব্যবস্থা কবতে পাবি নি।'

'কবে আসবে?'

'দেখি।'

টেলিফোন রেখে দেয়ার আগে ভিকি বলল, 'বড্ড ঝামেলায় পড়ে গেছি। তুমি কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পার নাকি, রুন?'

'আমি ... আমি কোথেকে করব?'

'তোমার তো অনেক গয়না-টয়না আছে।'

রুন জবাব না দিয়ে টেলিফোন রেখে দিল। ভিকি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

রুন আজ কিছু কেনাকাটা করবে বলে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু মত বদলাল। দুঃস্বপ্ন দেখার পর তার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না। সে ঠিক করল আজ সারাদিন সে ঘরেই থাকবে। আজ রান্না করলে কেমন হয়? অনেকদিন কোনো রান্নাবান্না করা হয নি। কিন্তু রান্না করার ইচ্ছাটা স্থাযী হল না। রুন টিভি খুলে টিভির সামনে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর টিভি দেখতেও ভালো লাগল না। সমস্ত দিন ঘরে বসে থাকাটা এমন ক্লান্তির ব্যাপাব তা তার জানা ছিল না। দুপুরের দিকে অতিষ্ঠ হয়ে সে এতরাকে টেলিফোন করল, 'এতরা, তুমি কি সন্ধ্যার পর আসতে পার?'

'নিশ্চযই পারি। কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার কিছু নয়, গল্পগুজব করা যাবে।'

'বাইরে কোথাও খেতে চাও? বন্‌ভিলে চমৎকাব একটা রেস্টুরেন্ট আছে।'

'না, আজ আমি কোথায়ও বেরুব না ঠিক করেছি।'

এতরা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ভিকি ফেরে নি?'

'নাহ্।'

'কবে ফিরবে জান?'

'আমি ঠিক জানি না। কাল ফিরতেও পারে।'

'ভিকি তো শুনলাম দারুণ ঝামেলায পড়েছে।'

'কী ঝামেলা?'

'ওর একটি সিল্ক কাবখানা শুনলাম বন্ধ হয়ে গেছে।'

রুন অবাক হয়ে বলল, 'কই আমি তো কিছু জানি না!'

'তোমাকে কিছু বলে নি?'

'না।'

'আচ্ছা আমি এসে বলব।'

রুনের একটু মন খারাপ হল। ভিকি তাহলে সত্যি-সত্যি বড় রকমের ঝামেলায পড়েছে। তাকে সাহায্য করা উচিত। রুন ইচ্ছা কবলেই তা পারে। মোটা অঙ্কেব টাকা রুনের আছে। তার নিজস্ব টাকা। এবং টাকা যে আছে তা ভিকি নিজেও জানে না। রুনেব বাবা বলে দিযেছিল, 'কিছু-কিছু জিনিস স্বামীদেব জানতে নেই। একটি হচ্ছে স্ত্রীদেব ব্যাংক ব্যালেন্স। তোমার টাকাটা হচ্ছে তোমার দুঃসময়েব জন্যে — ভিকিব দুঃসমযেব জন্যে নয়।'

রুন বলেছিল, 'কিন্তু বাবা, ধরো ভিকি একেবারে নিঃস্ব হযে পড়ল...তখন?'

'তখন তুমি ওকে ছেড়ে চলে আসবে।'

বাবার কথা এখন মনে না রাখলেও চলবে। বাবা মাবা গেছে, কাজেই খববদাবি করবার জন্যে ছুটে আসবে না। রুন তার ব্যাংকে টেলিফোন করল, 'আমি মোটা অঙ্কেব কিছু টাকা তুলতে চাই।'

'কতদিনের মধ্যে?'

'এক সপ্তাহ।'

'ক্যাশ হলে পারা যাবে না।'

'ক্যাশ নয়, ক্রসড চেক করে দিলে হবে। পারা যাবে?'

'কোন্ কারেন্সি?'

'ইটালিয়ান হলেই হবে। পারা যাবে?'
'যাবে। তবে আপনার একটি চিঠি লাগবে।'
'বেশ। চেক রেডি করে রাখুন।'
'আপনার ঠিকানায় পাঠাব?'
'না, শুধু রেডি করে রাখুন।'

রুন টাকার পরিমাণ এবং ক্রস্‌ড চেকের নাম বলল। ব্যাপারটা যে এত সহজে হবে তা ধারণা ছিল না। সুইস ব্যাংকগুলি খুব এফিসিয়েন্ট।

এতরা এল রাত নটার দিকে। রুন হালকা গোলাপি একটি স্কার্ট পরে বসে ছিল লবিতে। এতরা হাসিমুখে বলল, 'আমরা যত বুড়ো হচ্ছি তুমি ততই রূপসী হচ্ছো।'

রুন তরল গলায় হাসল। এতরা রুনের কাঁধে হাত রাখল। কাঁধে সে হাত স্থায়ী হল না, নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল, রুন কিছু বলল না। লবি অন্ধকার, কেউ কিছু দেখছে না। এতরা হালকা গলায় বলল, 'ভিকি বেচারা মহাবিপদে পড়েছে।'

রুন বলল, 'ঠিক কত টাকা হলে সে বিপদ থেকে মুক্তি পায়?'
'কেন জিজ্ঞেস করছ?'
'জানবার জন্যে।'
'সাময়িক মুক্তি, না চিরকালের জন্যে মুক্তি?'
'চিরকালের জন্যে মুক্তি।'
'অনেক টাকার ব্যাপার। ওয়ান মিলিয়ন ইউএস ডলার।'
'এত টাকা?'
'হ্যাঁ। সে ঝামেলাটা পাকিয়েছে বড় করেই।'

এতরা রুনের জামার হুক খুলতে চেষ্টা করল। রুন তেমন বাধা দিল না। একবার শুধু অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'আহ্ কী করছ?'

'কিছুই করছি না রুন।' এতরা আরো এগিয়ে এল।
রুন বলল, 'ভিকি একটি অপদার্থ, তবু মনে হয় আমি ওকে পছন্দ করি।'
'তা হয়তো কর।'
'ইদানীং বেচারা ঘুমাতে পারছে না। আমি ওকে সাহায্য করতে চাই।'

এতরা রুনের কথা ঠিক শুনতে পায় নি। সে জামার হুকটি খুলে ফেলেছে। জলপরীর মতো একটি অর্ধনগ্ন নারী পাশে থাকলে কথাবার্তায় মন দেয়া যায় না। এতরা সে রাতটা এখানেই কাটাল।

এ্যানিদের স্কুলে আজ বার্ষিক স্পোর্টস। এ্যানি তার বাবা এবং মা দুজনের জন্যে দুটি টিকিট এনেছে। ভিকি বলেছে — সে যেতে পারবে না, তার প্রচুর ঝামেলা। রুন হ্যাঁ-না কিছুই বলে নি। খুব সম্ভবত সেও যাবে না। রোদে বসে থাকলে রুনের মাথা ধরে। তাছাড়া যেদিন স্পোর্টস ঠিক সেদিনই হোটেল শেরাটনে গোলাপ ফুলের প্রদর্শনী হচ্ছে। এই প্রদর্শনীটি অন্য প্রদর্শনীগুলোর চেয়ে আলাদা। চিত্রতারকাদের বাড়ির গোলাপ প্রদর্শনী। এতরা দুটি টিকিট জোগাড় করেছে। বাচ্চা-কাচ্চাদের দৌড়-ঝাঁপ দেখার চেয়ে হোটেল শেরাটনে যাওয়া বহুগুণে শ্রেয়। কিন্তু সেন্টিমেন্টের ব্যাপার আছে। এ্যানির এই স্পোর্টস

নিয়ে খুব আগ্রহ। দু-তিন মাস আগে থেকেই বলে রেখেছে, যেতেই হবে। এখন তাকে 'না' বলাটাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু রুন ঠিক করে ফেলল ব্যাপারটা ঝুলিয়ে না রেখে মিটিয়ে ফেলাই ভালো। রাতের খাবার টেবিলে রুন প্রসঙ্গটা তুলল। 'এ্যানি, তোমার স্পোর্টস কবে?'

'সতের তারিখ। তোমাকে তো বলেছি আগে।'

'তুমি কীসে-কীসে আছ?'

'একশ মিটার দৌড়।'

'আর কিছুতে না?'

'না। তুমি যাচ্ছ তো মা?'

রুন ইতস্তত করে বলল, 'খুব চেষ্টা করব আমি। কিন্তু...'

'অর্থাৎ যাচ্ছ না। আমি আগেই জানতাম যাবে না।'

'এর মানে কী? তুমি আগেই জানতে মানে?'

'মানে কিছু নেই। তোমরা কেউ যাবে না তা আমি আগেই জানতাম।'

এ্যানি থালা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'ডিনার শেষ কর, এ্যানি।'

'আমার ক্ষিধে নেই।'

'এ্যানি, তোমার বয়স হচ্ছে। এখন তুমি আর ছেলেমানুষ নও। সবার সুবিধা-অসুবিধা তোমার বুঝতে পারা উচিত।'

'এ্যানি জবাব না দিয়ে ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে। মারিয়া টেবিল থেকে থালা সরাতে-সরাতে বলল, 'এ্যানি এবার একশ মিটার স্পোর্টসে প্রাইজ পাবে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম। ঐ লোকটি খুব ভালো শেখায়।'

'দৌড়ানোর মধ্যে আবার শেখানোর কী আছে?'

'তা জানি না, তবে লোকটি যত্ন করে শেখাচ্ছে।'

রুন গম্ভীর হয়ে গেল। মারিয়া হঠাৎ বলল, 'লোকটি খুব খারাপ না ম্যাডাম।'

'খারাপ হবে কেন?'

'না, মানে লোকটি এ্যানিকে পছন্দ করে।'

রুন চোখ তুলে তাকাল। মারিয়া কফি ঢালতে ঢালতে বলল, 'এ্যানির যে রাতে জ্বর এল, সে রাতে একবার সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে — জ্বর কত?'

'তাই বুঝি?'

'হুঁ। ওর কাছ থেকে তা আশা করা যায় না, ঠিক না ম্যাডাম?'

জামশেদ সারা দুপুর একটি বই পড়তে চেষ্টা করছে—'দি ইয়েলো নাইট'। পড়া মোটেও আগাচ্ছে না। অভ্যেস না থাকলে যা হয়। বইটির কভারে লেখা আছে 'এই সত্যি ভূতের গল্প, কেউ যেন রাতে না পড়ে। যাদের ব্লাড-প্রেসার বা হার্টের অসুখ আছে তারা যেন ভুলেও এ বই না পড়ে।' জামশেদ বহু কষ্টে ধীরে-ধীরে এগুচ্ছে এবং যতই এগুচ্ছে, ততই তার মেজাজ খারাপ হচ্ছে। এমন সব আজগুবি জিনিসও লেখা হয় এবং লোকজন কিনে এনে পড়ে। একটি একুশ বছরের মেয়ের সঙ্গে প্রতিরাতে একটি পিশাচ এসে ঘুমায়। গাঁজাখুরিরও সীমা থাকা দরকার। জামশেদ বই বন্ধ করে বিরক্ত মুখে বারান্দায় চলে এল। তার প্রচণ্ড তৃষ্ণাবোধ হচ্ছে। এমন তৃষ্ণা যা সময়-অসময় মানে না। হঠাৎ জেগে উঠে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু এখন যদি দরজা বন্ধ করে বোতল খুলে বসে

তাহলে আর নিজেকে সামলানো যাবে না। জামশেদ প্রাণপণে তৃষ্ণা ভুলে থাকতে চেষ্টা করল। ব্যস্ত থাকলে কাজ হবে হয়তো — সে নিচে নেমে এল। লনের একপ্রান্তে এ্যানি বসে ছিল। তার বসার ভঙ্গিটি অদ্ভুত — যেন কাঁদছে। এবং কান্না লুকানোব চেষ্টা করছে। জামশেদ একবার ভাবল তাকে ডাকবে না। তবু ডাকল। এবং আশ্চর্য, ডাকল খুব নরম স্বরে, 'কী করছ, এ্যানি?'

'কিছু কবছি না।'

'কাঁদছিলে নাকি?'

এ্যানি তার জবাব না দিয়ে বলল, 'তুমি কি কাল আমাব স্পোর্টস দেখবে, না গাড়িতে বসে থাকবে?'

'লোকজনের ভিড় আমাব পছন্দ হয না। আমি গাড়িতে থাকব।'

জামশেদেব কথা শেষ হবাব আগেই এ্যানি প্রায ছুটে চলে গেল। সাবা বিকেল এবং সাবা সন্ধ্যা তাব আর দেখা পাওয়া গেল না।

বাত দশটায জামশেদ বান্নাঘবে উঁকি দিল। মাবিযাব বিস্ময়েব সীমা বইল না। জামশেদকে কখনো এখানে আসতে দেখা যায না। সে অবাক হয়ে বলল, 'কি, কফি খাবে? কফিব জন্যে এসেছ?'

'না। এ্যানি কোথায?'

'ঘুমোতে গেছে।'

'ঘুমিযে পড়েছে?'

'না, এখনো ঘুমায নি। আমি দুধ নিযে যাব। দুধ খেযে শোবে।'

'জেগে আছে তাহলে?'

'হ্যাঁ। কী ব্যাপাব? কিছু বলবে এ্যানিকে?'

'তুমি এ্যানিকে বলবে যে আমি ওব স্পোর্টস দেখতে যাব।'

মাবিযা বলল, 'আমি এক্ষুনি ওকে বলছি।'

'এক্ষুনি বলাব দবকাব নেই।'

মাবিযা বলল, 'আমি খুব খুশি হযেছি যে তুমি যাচ্ছ। ঈশ্বব তোমাব মঙ্গল করুক। এ্যানি মেযেটি খুব নিঃসঙ্গ।'

জামশেদ জবাব দিল না। গম্ভীব মুখে উপবে উঠে এল।

একশ মিটাব দৌড় হচ্ছে তিন নম্বব ইভেন্ট। এ্যানি খুব না[illegible] হয়ে গেছে। সব মিলিযে প্রতিযোগী পাঁচজন। এদেব মধ্যে নিন্তি নামেব মেযেটি হরিণেব মতো দৌড়ায।

মাঠে নামবাব আগে জামশেদ বলল, 'যখন দৌড়াতে শুরু কববে তখন একটি জিনিসই শুধু খেযাল বাখবে — সামনেব লাল ফিতা। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'ভয লাগছে?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আমি হেবে যাব।'

'কাউকে তো হাবতেই হবে।'

'আমাব হাবতে ভালো লাগে না।'

স্টার্টিং ফাযার হতেই এ্যানি বিদ্যুতেব মতো ছুটল। জামশেদ হাসল — চমৎকাব স্টার্টিং! অপূর্ব!! এ্যানি নিমেষেব মধ্যে প্রতিযোগীদেব পেছনে ফেলে দিল। কিন্তু অঘটন ঘটল — এ্যানি হুমড়ি খেযে পড়ে গেল! একটা হাহাকাব উঠল দর্শকদেব থেকে। এ্যানিব আশাহত চোখের সামনে প্রতিযোগীরা ছুটে বেবিযে গেল! লাফিয়ে উঠল জামশেদ — 'উঠে দাঁড়াও। দৌড়াও! বোকা মেযে, দৌড়াও!'

এ্যানি উঠে দাঁড়িয়েছে। জামশেদ তৃতীয়বার চেঁচাল, 'দৌড়াও।' এ্যানি ছুটতে শুরু করল। পৌঁছাল সবার শেষে।

এ্যানি কাঁদতে-কাঁদতে দর্শকদের প্যাভিলিয়নের দিকে আসছে। জামশেদ এগিয়ে গেল। একটি ছোট্ট শিশুর মতো এ্যানি জামশেদকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল।

বাড়ি ফেরার পথে জামশেদ বলল, 'আমি খুব খুশি হয়েছি যে পড়ে যাবার পরও তুমি উঠে দাঁড়িয়েছ এবং দৌড়াতে শুরু করেছ।'

'তাতে কিছুই যায় আসে না।'

'তাতে অনেক কিছুই যায় আসে, এ্যানি।'

এ্যানি ফ্রকের হাতায় চোখ মুছল। জামশেদ বলল, 'পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। খুব অল্প কিছু মানুষ উঠে দাঁড়াতে পারে।'

এ্যানি চাপা স্বরে বলল, 'ওরা এসে পৌঁছায় সবাব শেষে।'

'আপাতদৃষ্টিতে এ রকম মনে হয। সত্যিকাব অর্থে ওরাই কিন্তু জযী।'

এ্যানি জবাব দিল না। জামশেদ বলল, 'সমুদ্রেব দিকে যেতে চাও, এ্যানি? ওখানে বালির উপর বসে আইসক্রিম খাওযা যেতে পারে। কি, চাও যেতে?'

'চাই।'

'এস আজকের দিনটি আমবা খুব ফুর্তি কবে কাটাই। মিউজিযামে গেলে কেমন হয়?'

'মিউজিযাম আমাব ভালো লাগে না।'

'তাহলে চল চিড়িযাখানায যাওযা যাক। চিড়িযাখানা ভালো লাগে?'

'লাগে।'

'যাবে?'

'হুঁ।'

এ্যানি তাকিযে দেখল, বুড়ো ভালুকেব পাথবেব মতো চোখ দুটি কোনো এক আশ্চর্য উপাযে তরল হযে যেতে শুরু করেছে।

ভিকি পরপব দুরাত ঘুমাতে পাবে নি। এক সপ্তাহেব মধ্যেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হবে। সিল্কের ব্যবসা গুটিযে ফেলাব সিদ্ধান্ত। তিন-পুরুষেব একটা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত হঠাৎ নেযা যায না। এর জন্য অনিদ্রায কাতব হতে হয।

রুন দেখল, ভিকি রাত নটার দিকে ড্রাইভারকে গাড়ি বের করে আনতে বলছে।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'একটা কাজে যাচ্ছি।'

'টাকার জোগাড় করতে?'

'না। ওটা আর জোগাড় হবে না।'

'আশা ছেড়ে দিয়েছ মনে হচ্ছে?'

ভিকি জবাব দিল না। রুন বলল, 'একটা কাজ কবলে কেমন হয? আমাকে ভালো একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাও না।'

ভিকি নিঃশব্দে টাইযের নট বাঁধতে লাগল।

'কি, কথার জবাব দিচ্ছ না যে? চল না সমুদ্রের ধারে যে একটা চাইনিজ বেস্টুবেন্ট আছে সেখানে গিয়ে লবস্টার খেয়ে আসি?'

ভিকি ক্লান্ত স্বরে বলল, 'রুন, তুমি বুঝতে পারছ না আমি একটা দারুণ সমস্যাব মধ্যে আছি। এমনও হতে পারে যে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে লবস্টার আর কোনোদিনই আমরা খেতে পারব না।'

রুন হাসিমুখে বলল, 'কিন্তু এমন তো হতে পারে যে হঠাৎ করে তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।'

'আমার বেলা হঠাৎ করে কিছু হয় না।'

'একেবারে আশা ছেড়ে দেয়া ঠিক না। চল, যাই।' রুন ভিকির হাত ধরল।

'প্লিজ, রুন! আমাকে বিরক্ত করো না। খুব খাবাপ সময় যাচ্ছে।'

'সময ভালোও তো হযে যেতে পারে। কথা শোন আমার।'

ভিকি কোনো কথা শুনল না। বিরক্ত–মুখে নিচে নেমে গেল। তাব বেশ মাথা ধবেছে। রুনেব ন্যাকামি শুনতে এতটুকুও ভালো লাগছে না।

এতবা চোখ কপালে তুলে বলল, 'এ কী চেহারা হযেছে তোমাব!'

ভিকির চেহাবা সত্যি খাবাপ হযেছে। বুড়োটে দেখাচ্ছে। চোযাল ঝুলে পড়েছে। চোখের দৃষ্টিও নিষ্প্রভ। এতবা সরু গলায বলল, 'একেবাবে ভেঙে পড়েছ মনে হচ্ছে?'

'তা ভেঙেছি। সেটাই স্বাভাবিক। নয কি?'

'না। তোমাব যা হচ্ছে তা খুব অস্বাভাবিক। তুমি কোনো সমাধানেব দিকে না তাকিযে অন্যদিকে তাকাচ্ছ।'

'সমাধান কিছু নেই।'

এতবা মিটিমিটি হাসল। হাসিমুখেই বলল, 'চমৎকাব একটি ডিনাবেব অর্ডাব দাও ; সেই সঙ্গে জার্মান কিছু হোযাইট ওযাইন আনতে বল। তোমাকে সমাধান দিচ্ছি।'

ভিকিব কোনো ভাবান্তব হল না। সে সিগাবেট ধবিযে ভাবলেশহীন চোখে তাকিযে বইল। এতবা খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, 'প্রথম শ্রেণীব সমাধান আছে আমাব কাছে ; ঠাণ্ডা মাথায শুনতে হবে।'

'বল, শুনি।'

'বলছি। তাব আগে নার্ভগুলো ঠাণ্ডা কবাবাব জন্যে এক পশলা মার্টিনি হোক। মার্টিনি উইথ অলিভ।' এতবা হাতেব ইশাবায ওযেট্রেসকে ডাকল।

'কী তোমাব সমাধান ?'

'বলছি। শর্ত হচ্ছে সবটা বলা শেষ না হওযা পর্যন্ত তুমি কোনো প্রশ্ন কবতে পাববে না। প্রথমে কোনো সাড়াশব্দ না কবে শুনবে। ঠিক আছে ?'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে শুরু কবছি।'

এতবা লম্বা একটা চুমুক দিল মার্টিনিতে। নিচু স্ববে বলতে শুরু কবল, 'তুমি নিশ্চযই জান, ইংল্যান্ডেব একটি ইনস্যুবেন্স কোম্পানি অদ্ভুত–অদ্ভুত সব ইনস্যুবেন্স পলিসি বিক্রি কবে। জান তো?'

'জানি।'

'ওবা ইদানীং একটা নতুন ইনস্যুবেন্স পলিসি বিক্রি কবতে শুরু ধনী বাবা-মা–বা তাদের সন্তানদেব নিরাপত্তা

'তাই নাকি? জানতাম না–তো ?'

'ইনস্যুবেন্স কববার পব যদি ইনস্যুব করা ছেলেমেযেবা কিডন্যাপ্ড্ হয তাহলে কিডন্যাপাবদেব দাবি অনুযাযী সব টাকা ইনস্যুবেন্স কোম্পানি দিযে দেয। বুঝতে পাবছ?'

'পারছি।'

এতরা আবেকটি ডবল মার্টিনিব অর্ডাব দিযে বলল, 'এতক্ষণ যা বললাম তা হচ্ছে তোমার সমস্যার সমাধান।'

'তার মানে?'

'ব্যস্ত হয়ো না। বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

ভিকি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এতরা সহজ ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'তুমি এ্যানির জন্যে ঐ একটি পলিসি কিনবে। এক মিলিয়ন ডলারের একটি পলিসি। তাবপর কিছু দুষ্টলোক এ্যানিকে চুরি করে এক মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ দাবি করবে। ইনস্যুরেন্স কোম্পানি এক মিলিয়ন ডলার দেবে তা তো বুঝতেই পারছ। সেখান থেকে পাঁচ লাখ ডলার পাবে তুমি আর বাকিটা যাবে কিডন্যাপের ব্যবস্থা যারা করবে তাদের হাতে।'

ভিকি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। এতরা হাসিমুখে বলল, 'পরিকল্পনার দায়িত্বে যাবা থাকবে তারা সবাই খুব বিশ্বাসী। আমার নিজের লোক বলতে পার।'

ভিকি কোনো জবাব দিল না।

'অবশ্যি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির কিছু বিধিনিষেধ আছে। যেমন পলিসি বিক্রি কববাব আগে ওদের দেখাতে হবে যে তুমি তোমার মেয়ের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা কবেছ। যেমন ওর জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার বডিগার্ড আছে। বাড়িতে পাহাবাদার কুকুর আছে। বুঝতে পারছ?'

ভিকি কিছু বলল না, চুপচাপ বসে বইল। এতরা বলল, 'ডিনারের অর্ডার দেযা যাক, কি বল? এমন মনমরা হয়ে গেলে কেন?'

'তোমাব সমাধানটি আমার পছন্দ হয নি।'

'ভালো। পছন্দ যে হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আমবা নতুন সমাধানেব কথা চিন্তা করব। তবে ভিকি, এতক্ষণ আমবা যে কথাবার্তা বললাম তা যেন তৃতীয কোনো প্রাণী জানতে না পাবে।'

'জানবে না।'

'রুনকেও বলবে না।'

'এতরা, আমি আমার নিজস্ব ব্যাপারগুলোর কথা ঘবে বলে বেড়াই না।'

'গুড। আর শোন, যদি তোমার মনে হয আমার পরিকল্পনাটি প্রথম শ্রেণীর তাহলে বিনা দ্বিধায আমাকে জানাবে। বুঝতে পাবছি এ্যানিব নিবাপত্তাব বিষযেই তুমি বেশি চিন্তিত। এ্যানিকে আমি আমার নিজেব মেয়ের মতোই দেখি। ওব নিবাপত্তাব যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয়া হবে বলাই বাহুল্য।'

ভিকি গম্ভীর মুখে ডিনারের অর্ডাব দিল। ডিনার ছিল সাদামাঠা। কিন্তু ডিনাব শেষে প্রচুর ড্রিংকসের ব্যবস্থা হল। এবং এক সময ভিকি বলল, 'তুমি যে পবিকল্পনাব কথা বলছ তার পেছনে তোমার কী স্বার্থ?'

'আমার দুটি স্বার্থ। বন্ধুর উপকার হবে। তাছাড়া, আমিও কিছু টাকা পাব। দশ হাজাব ডলার। বিরাট কিছু নয়, তবে মন্দও নয়।'

ভিকি হঠাৎ বলল, 'আমি রাজি আছি।'

'ভালো। আমি জানতাম তুমি রাজি হবে।'

ভিকি উত্তর দিল না।

'কোনো রকম ঝামেলা ছাড়া এত বড় একটা দান একমাত্র জুযার টেবিলেই পাওযা সম্ভব।' এতরা টেনে-টেনে হাসতে লাগল। 'আরেক রাউন্ড হবে?'

ভিকি জবাব দিল না।

'আরেক রাউন্ড হোক। ভিকি, তোমাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে। ফূর্তিব জন্যে কোথাও যেতে চাও? দুটি স্প্যানিশ মেয়ে আছে, আমার পরিচিত। অপূর্ব! এবং বিশেষ পাবদর্শী!'

'ফূর্তির জন্যে আমি কখনো বাইবে যাই না।'

'ঠিক ঠিক। খুবই ঠিক।'

এতবা হাতেব ইশারায ওযেট্রেসকে ডাকল। সে মনে হল কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত।

৭

জামশেদের ঘবে মৃদু নক হল। অন্ধকাব কাটে নি এখনো। এত ভোবে কে আসবে? জামশেদ ঘড়ি দেখল, ছটা বাজতে এখনো দশ মিনিট বাকি।

'কে?'

'আমি। আমি এ্যানি।'

'কী ব্যাপাব?'

'আমি তোমাকে শুভ জন্মদিন জানাতে এসেছি।'

'কীসেব শুভ জন্মদিন?' জামশেদ বিবক্ত মুখে গাযে রোব জড়াল। দবজা খুলল অপ্রসন্ন মুখে।

এ্যানি হাসিমুখে একটা প্যাকেট হাতে দাঁড়িযে আছে। সে ক্ষীণ স্ববে বলল, 'ভেতরে আসব ?'

'না।'

এ্যানি ইতস্তত কবতে লাগল। জামশেদ ভাবি স্ববে বলল, 'আমাব জন্মদিন কবে তা আমি কেন, আমাব বাবা-মাও জানেন না।'

'কিন্তু আমি যে তোমাব কাগজপত্রে দেখলাম ৪ঠা জুলাই তোমাব জন্মদিন।'

'একটা কিছু লিখতে হয — সেজন্যেই লেখা। বুঝতে পাবছ?'

'পাবছি।'

'হাতে ওটা কি জন্মদিনেব উপহাব ?'

'হুঁ।'

'ঠিক আছে, দাও।'

এ্যানি মৃদু স্ববে বলল, 'তোমাব জন্মদিন কবে তা কেউ জানে কেন?'

'অনেকগুলি ভাইবোন আমবা — কাব কবে জন্ম এসব নিযে মাথা ঘামাবাব সময আমাব বাবা-মাব ছিল না।'

'কজন ভাইবোন ?'

জামশেদেব ভ্রূ কুঞ্চিত হল। সে একবাব ভাবল জবাব দেবে না। কিন্তু জবাব দিল।

'নজন। দুটি বোন।'

'তুমি ক নম্বব ?'

'চাব। আব কিছু জিজ্ঞেস কববে?'

এ্যানি হালকা স্ববে বলল, 'জন্মদিনে এমন বাগি গলায কথা বলছ কেন?'

'তোমাকে তো বলেছি আজ আমাব জন্মদিন নয।'

'তুমি তো জান না কবে সেটা। এমন তো হতে পাবে আজই সেই দিন।'

'তাতে কিছু আসে যায না।'

এ্যানি অস্পষ্টভাবে হাসল।

'কী এনেছি তোমাব জন্যে খুলে দেখবে না?'

জামশেদ প্যাকেট খুলে ফেলল।

'এটা একটা ভিডিও গেম। তুমি তো একা-একা থাকতে পছন্দ কর, সেজন্যে কিনেছি। একা-একা খেলতে পারবে। কী করে খেলতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে।'

'তুমি হাত-মুখ ধুয়ে আস, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। আজকে আমি তোমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করব।'

জামশেদ কিছু বলল না। এ্যানি হাসিমুখে বলল, 'আমাদের দুজনের ব্রেকফাস্ট আজ এখানে দিয়ে যাবে। এবং তোমার জন্মদিন উপলক্ষে আজ খুব চমৎকার ব্রেকফাস্ট তৈবি হচ্ছে।'

জামশেদ হাত-মুখ ধুতে গেল। বাথরুম থেকে বেরুতেই চোখে পড়ল ভিকি লনে একা-একা হাঁটছে। এত ভোরে ভিকি কখনো ওঠে না। জামশেদের মনে হল, ভিকি যেন একটু বেশিরকম বিচলিত। জামশেদের সঙ্গে ভিকির একবার চোখাচোখি হল। ভিকি বাঁ হাত উঠিয়ে কী যেন বলল ঠিক বোঝা গেল না।

সাত কোর্সের একটি স্প্যানিশ ব্রেকফাস্ট তার টেবিলে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাজানো। এ্যানি কফিপট থেকে কফি ঢালছে। জামশেদ ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। এ্যানি বলল, 'তুমি কিন্তু একবাবও বল নি — থ্যাঙ্ক ইউ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'এর মধ্যে একটি জিনিস আমার তৈরী। কোন্‌টি বলতে পাববে ?'

'তুমি রান্না করতে পার ?'

'না। মাবিয়া বলে দিযেছে ; আমি বান্না কবেছি।'

জামশেদ কফিব পেযালায চুমুক দিল। এ্যানি আবাব বলল, 'আজ কিন্তু তুমি বাগ করতে পারবে না। আজ আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে।'

জামশেদ জবাব দিল না।

এ্যানি একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি জানি তুমি আমাকে একটুও পছন্দ কব না। আমি এলেই বিরক্ত হও। তবু আজ আমি অনেকটা সময় তোমার ঘরে বসে থাকব।'

'ঠিক আছে।'

'এবং তোমাকে নিযে বিকেলে 'মল্‌'-এ সপিং কবতে যাব। আমি বাবাকে বলে রেখেছি।'

এ্যানির কথা শেষ হবার আগেই দবজায ছাযা পড়ল। ভিকি এসে দাঁড়িযেছে।

'মিঃ জামশেদ, শুভ জন্মদিন।'

জামশেদ শুকনো স্বরে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'এ্যানি তোমার জন্মদিন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই হৈচৈ করছিল।'

জামশেদ ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'তুমি কি ভেতবে এসে আমাদেব সঙ্গে এক কাপ কফি খাবে?'

'না, ধন্যবাদ। আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই।'

জামশেদ ঘর থেকে বেবিয়ে এল। ভিকি বাবান্দার একপ্রান্তে সবে গেল। সিগাবেট ধরাল একটি। জামশেদের মনে হল, লোকটি বিশেষ চিন্তিত। সিগারেট ধরাবাব সময তাব হাত কাঁপছিল। এর কারণ কী?

'বল, কী বলবে?'

'না, তেমন কিছু নয।'

ভিকি অস্পষ্টভাবে হাসল। জামশেদ বলল, 'তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।'

'না, চিন্তিত না। চিন্তিত হবার কী আছে ?'

ভিকি রুমাল বের কবে কপালের ঘাম মুছল। ফ্যাকাসেভাবে হেসে বলল, 'এবাব বেশ গরম পড়বে, কি বল?'

জামশেদ জবাব দিল না। ভিকি ইতস্তত কবে বলল, 'তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। ইযে, মানে — তেমন জরুবি কিছু নয।'

'বল।'

'ধব যদি এমন পরিস্থিতি হয যে তুমি দেখছ কেউ এ্যানিকে কিডন্যাপ কবার চেষ্টা কবছে, তখন আমার মনে হয সবচেয়ে ভালো হবে তুমি যদি চুপচাপ থাক।'

'কেন ?'

'না, মানে — তুমি যদি গুলি কবতে শুরু কব তাহলে বুলেট এ্যানিব গাযে লাগাব আশঙ্কা, ঠিক না?'

'আশঙ্কা যে একেবারে নেই তা নয। তবে ভিকি, আমাকে বাখা হযেছে এ্যানিব নিবাপত্তাব জন্যে, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'তুমি নিশ্চযই আশা কব না এবকম পবিস্থিতিতে আমি মূর্তিব মতো দাঁড়িযে থাকব।'

'না-না, তা কেন? তা তো হতেই পাবে না।'

ভিকি আবেকটি সিগাবেট ধবিযে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। জামশেদ বলল, 'তুমি কি কোনো কিছু নিযে চিন্তিত?'

'না-না, চিন্তিত হব কেন?'

ভিকি দুর্বলভাবে হাসল। জামশেদ ব্যাপাবটা ঠিক বুঝতে পাবল না।

ভিকি কিছু-একটা নিযে বিশেষভাবে চিন্তিত।

রুনেব চোখেও ব্যাপাবটা ধবা পড়ল। সাধাবণত এসব ছোটখাটো জিনিস তাব চোখে পড়ে না। কিন্তু পবিবর্তনটি হঠাৎ এবং স্পষ্ট। চোখে না পড়ে উপায নেই। তাব ওপব কদিন আগে ভিকি দুটি প্রকাণ্ড এ্যালসেশিযান কুকুব কিনে এনেছে। এব কাবণও বোধগম্য নয। ভিকি কুকুব পছন্দ কবে না। হঠাৎ কবে কুকুবেব প্রতি তাব এ বকম প্রেমেব কারণ কী? রুন কোনো ব্যাপাব নিযে বেশিক্ষণ ভাবতে পাবে না। তবু সে এ ব্যাপাবটি নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা কবল। ভিকিকে সে ঠিক ভালো না বাসলেও পছন্দ কবে। স্বামী হিসেবে সে চমৎকাব। এবং যতদূব মনে হয মাঝে-মাঝে জুয়াব টেবিলে বসা ছাড়া তার অন্য কোনো বদভ্যেস নেই।

রুন বিকেলে একটু বিশেষ সাজসজ্জা কবল। এ জাতীয পোশাকে কুমাবী মেযেদেবকেই ভালো লাগে। কিন্তু রুনকে এখনো কুমাবী মেযে বলেই ভ্রম হয। রুন বড় একটি খাম হাতে নিযে ভিকিব ঘবে উঁকি দিল।

'হ্যালো, ভিকি।'

'হ্যালো।'

'কী ব্যাপাব, তুমি দেখি একেবাবে মাছেব মতো হযে গেছ।'

ভিকি জবাব দিল না। রুন সামনেব চেযাবটিতে বসতে-বসতে বলল, 'খুব সম্ভব গত বাতে তোমাব ঘুম হয নি। চোখ লাল। ব্যাপাবটা কী আমি জানতে চাই।'

'তেমন কিছু না।'

'বিজনেস নিযে চিন্তিত?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো সুবাহা হয নি?'

'না।'

'বুদ্ধিমান এতবা কোনো বুদ্ধি দিতে পাবল না?'

ভিকি ঈষৎ চমকাল। কিছু বলল না। রুন গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

ভিকি চোখ তুলে তাকাল।

'আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেব। কিন্তু একটি শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'তুমি তোমার মুখে যে ভয়াবহ চিন্তার মুখোশ পরে আছ এটি পুড়িয়ে ফেলতে হবে।' কথাটা বলে রুন খিলখিল করে হেসে উঠল। আর ঠিক তখন টেলিফোন এল..। বালজাক এভিন্যুর মোড়ে এ্যানিকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ছোটখাটো একটি খণ্ড প্রলয় হয়ে গেছে সেখানে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে তিনজন মারা গেছে। সংখ্যা এর চেয়ে বেশিও হতে পারে।

এক মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ চেয়ে প্রথম টেলিফোনটি এল রাত এগারটায়।

এগারটা পঁচিশে সেন্ট্রাল হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এল... জামশেদ নামের যে দেহরক্ষীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। নিকট-আত্মীয়স্বজনদের খবর দেয়া প্রয়োজন।

এ্যানির অপহরণ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে 'লা বেলে' পত্রিকায়। রিপোর্টটিতে এক জন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য আছে। মধ্যবয়স্ক এই স্কুল-শিক্ষকটি ঘটনার সময় কফি শপে কফি খাচ্ছিলেন। তাঁর চোখের সামনেই সমস্ত ব্যাপারটি ঘটল। তাঁর প্রতিবেদনটি ছিল এ রকম :

'আমি যেখানে বসে কফি খাচ্ছিলাম — আইসক্রিম পার্লারটি ছিল তার সামনে। জুলাই মাসের গরমের জন্যেই খোলা উঠানে কফির টেবিল বসানো হয়েছিল। আমি আমার এক বান্ধবীর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। ঘনঘন তাকাচ্ছিলাম রাস্তার দিকে।

'চারটা ত্রিশ মিনিটে নীল রঙা একটি ছোট্ট পনটিয়াক এসে আইসক্রিম পার্লারে থামল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল অত্যন্ত রূপসী একটি বালিকা। বালিকাটি কাউন্টারে আইসক্রিমের অর্ডার দিয়ে যখন অপেক্ষা করছিল তখন আমি লক্ষ করলাম একটি প্রকাণ্ড সবুজ রঙের ওপেল গাড়ি আইসক্রিম পার্লারের পশ্চিম দিকে থামল।

তিনটি লোক নেমে এল গাড়ি থেকে। দুজন ছুটে গেল মেয়েটির দিকে, তৃতীয়জন ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগল। তার হাতে হালকা একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছিল। গুলি ছুড়বার আগ পর্যন্ত আমি তা লক্ষ করি নি।

গুলির শব্দ আসামাত্র চারদিকে ছোটাছুটি শুরু হল। আমি নিজেও উঠে দাঁড়ালাম। কফি শপের মালিক চেঁচিয়ে বলল — সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ুন। বিপদের সময় কারোর কিছু মনে থাকে না। আমারও থাকল না। আমি দৌড়ে খোলা রাস্তায় এসে পড়লাম। তখন বাচ্চা মেয়েটিকে দুজন ওপেল গাড়িটির দিকে টেনে নিচ্ছে এবং মেয়েটি চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে। যে দুজন মেয়েটিকে টানছে তাদের একজন মেয়েটির গালে চড় কষাল। এই সময় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখলাম মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম কালো রঙের একটি মানুষ ওদের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মানুষটির বাঁ হাতে একটি পিস্তল।

এই সময়ে সবুজ ওপেল গাড়িটি থেকে আরো দুজন লোক বন্দুক হাতে লাফিয়ে নামল। কালো লোকটি ছুটন্ত অবস্থাতেই গুলি ছুড়ল। এ রকম অব্যর্থ হাতের নিশানা কারোর থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না। লোক দুটিকে নিমিষের মধ্যে লুটিয়ে পড়তে দেখলাম।

কালো লোকটি বুনো মোষের মতো ছুটছিল। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। সবুজ গাড়িটির দরজা খুলে লম্বা চুলের এক ব্যক্তি কয়েক পশলা গুলি করল কালো লোকটিকে। আমি দেখলাম কালো লোকটি উবু হয়ে পড়ে গিয়েছে।'

'লা বেলে' পত্রিকাটিতে দুটি ছবি ছাপা হয়েছে। একটি এ্যানির অন্যটি জামশেদের। জামশেদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অসম্ভব সাহসী এই লোকটি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সেন্ট্রাল হাসপাতালে তাকে রাখা হয়েছে কড়া পুলিশ নিরাপত্তায়। ডাক্তাররা ইতিমধ্যে দুবার তাঁর ফুসফুসে অস্ত্রোপচার করেছে। তৃতীয় দফা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। সেন্ট্রাল হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের সচিব জন নান বলেছেন, জামশেদ সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চলছে।

এ্যানির ছবির নিচে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে এ্যানি ভিকি হচ্ছে বিখ্যাত সিল্ক ব্যবসায়ী এ্যারন ভিকির নাতনী। তার বয়স বার বছর। এবং তার মুক্তির জন্যে এক মিলিয়ন ইউএস ডলার মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে।

এ্যানির যে ছবিটি ছাপা হয়েছে সেটি তার গত জন্মদিনের ছবি। মাথায় হ্যাপি বার্থডে টুপি। মুখ ভর্তি হাসি। ছবিটিতে এ্যানিকে দেবশিশুর মতো লাগছে।

বেন ওয়াটসন খবরটি দুবার পড়ল। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। ছবিটিতে যে কালোমতো লোকটিকে দেখা যাচ্ছে সে যে 'জামস্' এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের ছাড়াছাড়ি হয় লিসবনে, প্রায় পনের বছর আগে। পনের বছর দীর্ঘ সময়। এই সময়ের মধ্যে পুরনো অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে, শুধু 'জাম্‌স'–এর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

বেন ওয়াটসন "লাসানিয়া ও পিজা হাউস" থেকে বেরুল রাত এগারটায়। তার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ন। জামস বড় ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। তার পাশে দাঁড়ানো উচিত।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বেন ওয়াটসনকে জানাল, রোগীর অবস্থা ভালো নয় এবং যেহেতু রোগী ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে সেহেতু দেখা হবে না। বেন ওয়াটসন সারারাত হাসপাতালের লাউঞ্জে বসে কাটাল। জাম্‌স বোধহয় এ যাত্রা টিকবে না।

ভোরবেলায় জানা গেল, ফুসফুসে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তৃতীয় অপারেশন হল ভোর সাতটায়।

৮

এক মিলিয়ন ইউ এস ডলার পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ইনস্যুরেন্স কোম্পানি স্যুটকেস ভর্তি করে দশ ডলারের নোটের বান্ডিল যথাসময়ে দেয়ায় কোনো রকম ঝামেলা হয় নি। স্যুটকেস ভর্তি ডলার এতবাকে দেয়া হয়েছে। এবং টাকা দেবার এক ঘণ্টার ভেতর ভিকি টেলিফোন পেয়েছে যে এ্যানিকে রাত নটার আগেই ফোরটিন্‌থ্ এভিন্যুর মোড়ে একটি কমলা রঙের সিডান গাড়ির (যার নম্বর এফ ২৩৪) পেছনের সিটে পাওয়া যাবে। ওরা টেলিফোনে এ্যানির গলাও শুনিয়েছে। এ্যানি বলেছে, সে ভালো আছে এবং কেউ তার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করে নি। এ্যানি জামশেদের কথাও জানতে চেয়েছে। জামশেদ এখনো বেঁচে আছে শুনে খুশি হয়েছে।

ভিকি সন্ধ্যা থেকেই ফোরটিন্থ্ এভিন্যুর মোড়ে দাঁড়িয়েছিল। রাত এগারটা বেজে গেল। কারোর দেখা পাওয়া গেল না।

সে বেশ কযেকবার এতরাকে টেলিফোন করল। কেউ ফোন ধরল না। ভিকির বুক কাঁপতে লাগল। রাত যতই বাড়তে লাগল, এক ধরনের শীতল ভীতি তাকে কুঁকড়ে দিতে লাগল। এ্যানি বেঁচে আছে তো? আদরের এ্যানি, ছোট্ট এ্যানি সোনা!

ঠিক কঘণ্টা পার হয়েছে এ্যানির মনে নেই। সে মনে রাখার চেষ্টাও করে নি। চিন্তা করতে পারছে না। অনেক কিছুর মতো চিন্তা করবার শক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। কোনো স্মৃতি নেই মাথায। শুধু মনে আছে বুড়ো ভালুক ডান হাতে পিস্তল নিয়ে দৈত্যেব মতো ছুটে আসছিল। কী ভয়াবহ কিন্তু কী চমৎকাব ছবি। এক সময ছবিটি নষ্ট হয়ে গেল... জামশেদ গড়িযে পড়ল মাটিতে।

'এ্যাই মেযে, কিছু খাবে?'

'বলেছি তো আমি কিছু খাব না।'

'ঠিক আছে।'

এ্যানি লক্ষ করল লোক তিনটি তাব সঙ্গে মোটামুটি ভদ্র ব্যবহাব কবছে। প্রথম তাকে নিযে গেছে শহরের বাইরে, একটা ছোট্ট একতলা বাড়িতে।

সে বাড়িতে বুড়োমতো একজন লোক বসে ছিল, এ্যানিকে দেখেই সে ফুঁসে উঠে বলল, 'এর জন্যে আমাব সেবা তিনটি মানুষ মারা গেছে?'

এ্যানিব সঙ্গেব লোকটি তাব উত্তবে বিদেশি ভাষায বুড়োকে কী কী যেন সব বলল। এ্যানি কিছুই বুঝল না। এ্যানিবা সেখানে ঘণ্টাখানেক থেকে আবার রওনা হল। এ্যানিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল একটি বদ্ধ ওযাগনে কবে। কোথায যাচ্ছে, এ্যানি কিছুই বুঝতে পাবল না। এ্যানিব সঙ্গে যে বেঁটেমতো লোকটি ছিল সে এক সময বলল, 'তুমি ছাড়া পাবে শিগগিরই। ভযের কিছু নেই।'

এ্যানির ঠোঁট টেপ দিযে আটকানো, সে এর জবাবে কিছু বলতে পাবল না। লোকটি থেমে-থেমে বলল, 'মেযে হিসেবে তুমি অত্যন্ত লোভনীয। কিন্তু কড়া নির্দেশ আছে, আমাদের কিছুই কববার নেই।'

যাত্রাবিবতি হল একটি হোটেল জাতীয স্থানে। এ্যানিকে বলা হল হাতমুখ ধুযে নিতে।

এ্যানি মাথা নাড়ল। সে কিছুই করতে চায না। হঠাৎ বেঁটে লোকটি এসে প্রকাণ্ড একটি চড় কষাল। এ্যানি হতভম্ব হযে গেল। সে নিঃশব্দে হাত-মুখ ধুযে এল। বাথরুমেব আযনায দেখল তাব বাঁ গাল লাল হযে ফুলে উঠেছে।

টয়লেট থেকে বেরুতেই বেঁটে লোকটা বলল, 'এখন থেকে যা বলব শুনবি। নযতো সেফ্‌টিপিন দিয়ে তোব চোখ গেলে দেব।'

এ্যানি বহু কষ্টে কান্না সামলাল। এখান থেকেই ওবা এ্যানিব বাবাকে টেলিফোন করল। এবং এক সময এ্যানিকে বলল বাবাব সঙ্গে কথা বলতে।

'মামণি, তুমি ভালো আছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কবছে না তো?'

'না।'

এ্যানি শুনল তাব বাবা কাঁদতে শুরু কবেছে। সে কোনোদিন তাব বাবাকে কাঁদতে শোনে নি। তার বুক ব্যথা করতে লাগল। টেলিফোন কেড়ে নেযা হল এই সময। বেঁটে

লোকটা বলল, 'তোমাকে আমবা পাশেব ঘবে রেখে যাব। চিৎকার চেঁচামেচিতে কোনো লাভ হবে না — কেউ শুনতে পাবে না। তোমার হাত-পা অবশ্যি বাঁধা থাকবে। বুঝতে পাবছ ?'

'পারছি।'

'তবে ভযেব কিছু নেই। ঘণ্টা দু একেব মধ্যে তুমি ছাড়া পাবে। ঠিক আছে?'

এ্যানি জবাব দিল না।

'তুমি কি কিছু খাবে ?'

'না।'

'ভালো।'

লোকগুলো উঠে দাঁড়াতেই এ্যানি বলল, 'আমাব সঙ্গে যে কালো বঙের এক জন ছিল, তাকে তোমবা গুলি কবেছ, সে কি বেঁচে আছে?'

'জানি না।'

'এটা কোন্ জাযগা?'

'তা দিযে তোমাব কোনো প্রযোজন আছে বলে মনে হয না।'

'তোমবা কি আমাকে মেবে ফেলবে? আমাব এক বন্ধুকে ধবে নিযে মেবে ফেলেছিল।'

লোকগুলো হেসে উঠল — যেন খুব একটা মজাব কথা।

ডঃ জন নানেব ধাবণা ছিল না যে এবকম গুরুতব আহত এক জন মানুষ সেবে উঠতে পাবে। তিনি বেন ওযাটসনকে বললেন, 'আপনাব এই বন্ধুটিব জীবনীশক্তি অসাধাবণ। এবং আমাব মনে হচ্ছে সে সেবে উঠবে।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তাব। সে কি আগেব মতো চলাফেবা কবতে পাববে ? '

'তা বলা কঠিন।'

'আমি কি ওব সঙ্গে কথা বলতে পাবি?'

'আপনাব বন্ধু কথা বলতে পাববে কিনা জানি না। তবে আপনি দেখা কবতে পাবেন।'

'হ্যালো, জাম্‌স। চিনতে পাবছ?'

জামশেদ উত্তব দিল না। তাব চোখে অবশ্যি কযেকবাব পলক পড়ল।

'ডাক্তাব বলছে তুমি সেবে উঠবে। তুমি কি আমাব কথা বুঝতে পাবছ?'

জামশেদ মাথা নাড়ল।

'খুব খষ্ট হচ্ছে ?'

জামশেদ চুপ কবে বইল।

'অবশ্যি কষ্ট হলেও তুমি স্বীকাব কববে না, তোমাকে আমাব চিনতে বাকি নেই। হা-হা-হা।'

নার্স এসে বেন ওযাটসনকে সবিযে নিযে গেল। যাবাব আগে সে ফুর্তিবাজেব ভঙ্গিতে বলল, 'আমি থাকব হাসপাতালেব আশপাশেই, কোনো চিন্তা নেই।'

জামশেদেব ভাবলেশহীন মুখেও ক্ষীণ একটি হাসিব বেখা দেখা গেল।

জামশেদেব জবানবন্দি নেবাব জন্যে পুলিশেব যে অল্পবযস্ক অফিসাবটি লাউঞ্জে বসে ছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে অনেকবাব চলে যেতে বলল। বোগীব কথা বলাব মতো অবস্থা নয। গুলি লেগেছে দু জাযগায, ডান ফুসফুসেব নিচের অংশে এবং তলপেটে। তলপেটেব জখমটিই হযেছে মাবাত্মক। ভাগ্যক্রমে বুলেট ছিল বত্রিশ ক্যালিবাবেব। এরচেয়ে ভাবি কিছু হলে আব দেখতে হত না। বোগী যে এখন পর্যন্ত ঝুলে আছে তার

কারণ লোকটির অসাধারণ প্রাণশক্তি। কথা বলার মতো অবস্থা তার আদৌ হবে কিনা কে জানে। কিন্তু পুলিশ অফিসারটি দিনে চার–পাঁচবার করে আসছে। ডাক্তার 'দেখা হবে না' বলা সত্ত্বেও বসে থাকছে।

তৃতীয় দিনে সে রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার অনুমতি পেল। ডাক্তার জন নান বার বার বললেন, 'খুব কম কথায় সারবেন। মনে রাখবেন, লোকটি গুরুতর অসুস্থ।'

জামশেদ চোখ মেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল পুলিশ অফিসারটির দিকে।

'আজ কি একটু ভালো বোধ করছেন ?'

জামশেদ মাথা নাড়ল।

'আপনি জানেন না, যে–তিনটে লোক মারা গেছে তাদের ধরবার জন্য পুলিশ বাহিনী গত চার বছর ধরে চেষ্টা করছে। এরা মাফিয়া চক্রের সঙ্গে জড়িত। এই লোক তিনটির নামে গোটা দশেক খুনের মামলা আছে। এরা বন্দুক চালাতে দারুণ ওস্তাদ। অবশ্যি আপনি নিজেও এক জন ওস্তাদ।'

জামশেদ ম্লান হাসল। থেমে–থেমে বলল, 'ওরা আমার জন্যে প্রস্তুত ছিল না বলে এরকম হয়েছে। ওরা কোনো প্রতিরোধ আশা করে নি।'

'তা ঠিক। ওরা কল্পনাও করে নি অব্যর্থ নিশানার এক জন কেউ লাফিয়ে পড়বে।' পুলিশ অফিসার হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'আমার স্ত্রী আপনাকে চিনতে পেরেছে। আপনার ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। সেটা দেখে চিনল। একবার আপনি তাকে সাহায্য করেছিলেন। আপনার কি মনে আছে?'

জামশেদ কিছু মনে করতে পারল না।

'একবার এক রেস্টুরেন্টে একটা মাতালের পাল্লায় পড়েছিল সে। আপনি তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন।'

'মনে পড়েছে।'

'আমরা এই ঘটনার কিছুদিন পরই বিয়ে করি। আমার স্ত্রীর খুব ইচ্ছা ছিল বিয়েতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করার, কিন্তু আপনার ঠিকানা আমরা জানতাম না।'

জামশেদ ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। পুলিশ অফিসার বলল, 'আপনাকে অনেক জিজ্ঞেস করার আছে। কিন্তু এখন আর বিরক্ত করব না। শুধু এতটুকু বলে যাচ্ছি যে আপনার নিরাপত্তার জন্যে ভালো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দুজন সশস্ত্র পুলিশ আপনাকে পাহারা দিচ্ছে।'

জামশেদ ক্লান্ত স্বরে বলল, 'মেয়েটির খোঁজ পাওয়া গেছে ?'

'না, এখনো পাওয়া যায় নি। মেয়ের বাবার বিশেষ অনুরোধে পুলিশ খোঁজখবর করছে না। আমারাও মেয়েটির নিরাপত্তার কথা ভেবে চুপ করেই আছি।'

'টাকা দেয়া হয়েছে? আপনি কিছু জানেন?'

'আমার যতদূর মনে হচ্ছে টাকা দেয়া হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারছি না। মেয়ের বাবা আমাদের পরিষ্কার কিছু বলছেন না।'

৯

এ্যানির মনে হল হাত–পা বাঁধা অবস্থায় সে অনন্তকাল ধরে এখানে পড়ে আছে। সে মনে–মনে অনেকবার বলল — আমি কাঁদব না। কিছুতেই কাঁদব না। কিন্তু বার বার তার চোখ ভিজে উঠতে লাগল।

রাত কত হয়েছে কে জানে। ঘরে কোনো ঘড়ি নেই। কোনো রকম সাড়াশব্দও আসছে না। নিশ্চয়ই জনমানবশূন্য কোনো জায়গা। বাড়িতে একা-একা নিজের ঘরে ঘুমুতেও ভয় লাগত তার। মাঝরাতে যতবার ঘুম ভাঙত ততবার ডাকত, মারিয়া, মারিয়া! যতক্ষণ পর্যন্ত না মারিয়া সাড়া দিচ্ছে ততক্ষণ তার ঘুম আসত না। মনে হত নিশ্চয়ই খাটের নিচে ভূত-টুত লুকিয়ে আছে।

আশ্চর্য, সে রকম কোনো ভয় লাগছে না। লোকগুলো চলে যাবার পর বরং ভয় অনেক কম লাগছে। বেঁটে লোকটি সারাক্ষণ কীভাবে তাকাচ্ছিল তার দিকে। বেশ কয়েকবার গায়ে হাত দিয়েছে। ভাবখানা এরকম, যেন অজান্তে হয়েছে। একবার এ্যানি বলে ফেলল, 'আপনার হাত সরিয়ে নিন।'

বেঁটে লোকটা হাত সরিয়ে নিল, সঙ্গের দুজন হেসে উঠল হা-হা করে। বেঁটে তখন অত্যন্ত কুৎসিত একটা কথা বলল। এমন কুৎসিত কথা কেউ বলতে পারে?

পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। কেউ ধরছে না। আবার বাজছে, আবার বাজছে। চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল এ্যানি। অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখল সে।.... যেন জামশেদ এসেছে এ ঘরে। তার হাতে ভয়ালদর্শন একটি অস্ত্র। জামশেদ বলছে, 'মামণি, এ্যানি, তুমি শুধু একটি একটি করে মানুষ আমাকে চিনিয়ে দেবে। তারপর দেখ আমি কী করি। আমি হচ্ছি জামশেদ। বন্ধুরা আমাকে কি ডাকে জান? বুড়ো ভালুক। আমি ভালুকের মতোই ভয়ংকর— হা-হা-হা।'

এ্যানির ঘুম ভেঙে গেল। এ্যানি অবাক হয়ে দেখল দরজা খুলে এতরা চাচা ঢুকছেন। এটাও কি স্বপ্ন? না, স্বপ্ন নয় তো। সত্যি-সত্যি তো এতরা চাচা! এ্যানি দেখল এতরা চাচার হাসি-হাসি মুখ। এতরা চাচা এ্যানির মুখের টেপ খুলে দিয়ে নরম গলায় বললেন, 'কি চিনতে পারছ তো?'

এ্যানি ফুঁপিয়ে উঠল।

'খুব ঝামেলা গেছে, না? ইস্, হাতে দেখি দাগ বসে গেছে। কাঁদে না। দুষ্টু মেয়ে, কাঁদে না।'

এতরা কাছে টেনে নিল এ্যানিকে। 'ভয়ের আর কিছুই নেই। সব ঝামেলা মিটেছে।'

'আপনি কি আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন?'

'তোমার কী মনে হয়?'

এ্যানি এতরার কাঁধে মাথা রাখল।

'তোমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।'

বলতে-বলতে এতরা এ্যানির বুকে তার বাঁ হাত রাখল। এ্যানি কয়েক মুহূর্ত কিছু বুঝতে পারল না। এতরা চাচা কি ডান হাতে তার জামার হুক খোলার চেষ্টা করছে?

এ্যানি সরে যেতে চেষ্টা করল ; কিন্তু তার আগেই এতরা তাকে প্রায় নগ্ন করে ফেলল। এ্যানি বুঝতে পারছে একটি রোমশ হাত তার প্যান্টির ভেতর ঢুকে যাচ্ছে...।

প্যান্টি খুলে ফেলতে এতরাকে মোটেই বেগ পেতে হল না। সে নরম স্বরে বলল,- 'তোমাকে একটুও ব্যথা দেব না। দেখবে ভালোই লাগবে তোমার।'

এ্যানি চিৎকার বা ছোটাছুটি কিছুই করল না। সে তার অসম্ভব সুন্দর নগ্ন শরীর নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এতরা যখন টেনে তাকে তার কোলে বসাল তখন শুধু সে ফিসফিস করে তার মাকে ডাকতে লাগল।

ভিকি টেলিফোনে প্রায় কেঁদে ফেলল। 'হ্যালো এতরা, হ্যালো।'

'শুনছি।'

'কই, ওরা তো আমার এ্যানিকে ছাড়ছে না!'

'এত অস্থির হচ্ছ কেন?'

'অস্থির হব না, কী বলছ তুমি?'

'শোন ভিকি, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এখন। সমস্ত ব্যাপারটাই জট পাকিয়ে গেছে, বুঝতে পারছ না?'

'না আমি বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, তুমি ক্যাফে ইনে চলে আস। টেলিফোনে সব বলা যায় না।'

'এ্যানি বেঁচে আছে তো?'

'আরে তুমি বলছ কী এসব?'

ভিকি এবার গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল।

'হ্যালো, ভিকি তুমি চলে আস ক্যাফে ইনে। আমি থাকব সেখানে। ভালো কথা, রুন কেমন আছে? সে নিশ্চযই খুব বিচলিত?'

'ওকে ট্রাংকুলাইজার দিয়ে রাখা হযেছে।'

'ঠিক আছে, তুমি চলে এস।'

ক্যাফে ইনে বেন্টিলা পোর্টের লাগোযা ছোট্ট একটি কফি শপ। সাবা দিন কফি এবং পটেটো চিপ্‌স বিক্রি হয়। সন্ধ্যাব পর দুতিন ঘণ্টার জন্যে ফ্রাযেড লবস্টাব পাওযা যায। ভিড় হয সন্ধ্যার পর। বসাব জাযগা পাওয়া যায না।

ভিকি এসে দেখল, এতবা একটা ছোট্ট কামবা বিজার্ভ কবে তার জন্যে বসে আছে। এতরার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। ভিকি এসে বসল কিন্তু দীর্ঘ সময কোনো কথা বলতে পাবল না। এতরা বলল, 'কিছু খাবে? হট সস দিযে লবস্টাব চলবে? মেক্সিকান বেসিপি। চমৎকাব।' ভিকি ঠাণ্ডা গলায বলল, 'আমাব মেযে কোথায?'

'তুমি এমনভাবে জিজ্ঞেস কবছ যাতে মনে হয তোমাব মেযেকে আমি লুকিযে রেখেছি।'

'তুমি জান না সে কোথায আছে?'

'আমি কী কবে জানব?'

'সে কোথায আছে তাব কিছুই জান না?'

'না। তবে তোমাকে বলেছি ওদেব সঙ্গে আমাব যোগাযোগ আছে।'

ভিকি ক্লান্ত স্ববে বলল, 'আমি সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশকে জানাতে চাই।'

'সেটা তোমার ইচ্ছা। একটা কথা আমাব মনে হয তুমি ভুলে যাচ্ছ— মূল পবিকল্পনাতে তুমিও আছ। পুলিশ তা ঠিক পছন্দ কববে না। এবং সবচেযে অপছন্দ কববে তোমার স্ত্রী রুন।'

এতরা একটি সিগাবেট ধরাল। আড়চোখে ভিকির দিকে তাকিযে বলল, 'ধব এখন যদি তোমার মেয়ের কিছু হয, পুলিশ সবার আগে ধরবে তোমাকে।'

'আমার মেয়ের কিছু হয মানে?'

'কথার কথা বলছি। কিছুই হবে না, মেযে ঘরে ফিরে আসবে। তুমি বৃথাই এতটা ভেঙে পড়ছ।'

ভিকি চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

এতবা বলল, 'মনে হচ্ছে মূল পরিকল্পনাব একটু অদল বদল হযেছে। ওদেব তিনটি লোক মারা গেছে। বাছা বাছা লোক। এটা তো মূল পরিকল্পনায ছিল না। ওদেব দিকটা তো তোমাকে দেখতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা জট পাকিযে গেছে।'

ভিকির চোখ দিযে পানি পড়তে লাগল।

'জিনিসটা যে এরকম দাঁড়াবে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। তোমার ঐ বেকুব বডিগার্ড যেভাবে গুলি ছুড়ছিল তাতে এ্যানির মারা পড়ার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। ভাগ্যক্রমে গুলি লাগে নি।'

ভিকি উঠে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার, যাচ্ছ নাকি?'

'হুঁ।'

'বস আরো খানিকক্ষণ।'

'না।'

'পুলিশের কাছে সব খুলে বলবে বলে ঠিক করেছ নাকি?'

'আমি কিছুই ঠিক করি নি।'

ভিকি বাড়ি ফিরে গেল না। একা-একা ঘুরে বেড়াল দীর্ঘ সময়। তারপর হঠাৎ কি মনে করে চলে গেল হাসপাতালে। অসময়ে তাকে হাসপাতালে ঢুকতে দেবার কথা নয়, কিন্তু আশ্চর্য সে জামশেদের সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনেই তাকে ঢুকবার পাস দেয়া হল।

লবিতে যে পুলিশ অফিসার বসে ছিল সে এগিয়ে এল, 'আপনি নিশ্চয়ই ভিকি?'

'হ্যাঁ।'

'জামশেদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে কি আমি আপনাকে দু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'আমি খুব ক্লান্ত। আমি কোনো আলোচনায় এই মুহূর্তে যেতে চাই না।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। পরে কথা বলব। আমি এ্যানি অপহরণের তদন্তকারী দলের এক জন সদস্য।'

'ও।'

'যান, আপনি ভেতরে চলে যান। জামশেদ সতের নম্বর কেবিনে আছে। ভালোই আছে।'

'ধন্যবাদ।'

ভিকি মৃদুস্বরে বলল, 'এখন কি শরীর ভালো?'

জামশেদ মাথা নাড়ল। 'ভালো।'

'আমি আগেও একবার এসেছিলাম। তোমার তখন জ্ঞান ছিল না'

'আমি জানি। আমি খবর পেয়েছি।'

'হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া পাবে?'

'আরো সপ্তাহ খানেক লাগবে।'

'তারপর কী করবে কিছু ঠিক করেছ?'

'না।'

ভিকি চুপচাপ হয়ে গেল। জামশেদ তাকে নীরবে লক্ষ করতে লাগল। ভিকি একসময় বলল, 'তোমার এখানে সিগারেট খাওয়া যেতে পারে? কেউ কোনো আপত্তি করবে না তো?'

'নাহ্।'

ভিকি সিগারেট ধরাল। টানতে লাগল অপ্রকৃতিস্থের মতো। জামশেদ বলল, 'তুমি মনে হচ্ছে এখনো কোনো খবর পাও নি।'

'কীসের খবর?'

'তুমি বাড়ি ফিরে যাও।'

'কী হয়েছে?'

জামশেদ বলল, 'একটা খারাপ সংবাদ আছে তোমার জন্যে।'

'এ্যানি কি মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কখন খবর পাওয়া গেল?'

'আধ ঘণ্টা আগে।'

'ও।'

ভিকি উঠে দাঁড়াল। জামশেদ বলল, 'এ্যানিব ডেড বডি পাওয়া গেছে একটি গাড়িব লগেজ কেবিনে।'

'ও।'

'ভিকি, আমি একটি কথা তোমাকে বলতে চাই। তোমার সঙ্গে কিছুদিন হযতো আমার দেখা হবে না।'

'বল।'

'আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেযে শরীর সারাবার জন্যে অনেক দূবে কোথাও যাব। তারপর আবার ফিরে আসব।'

'ও।'

'ফিরে আসব প্রতিশোধ নেবার জন্যে। আবার আমাদের দেখা হবে।'

ভিকির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। জামশেদ তাকিযে বইল। তাব চোখ পাথরেব চোখের মতো। সে চোখে ভালবাসা, স্নেহ, মমতা এই জাতীয অনুভূতির কোনো ছাযা পড়ে না। সে মৃদুস্বরে দ্বিতীয়বার বলল, 'আমি আবাব ফিরে আসব।'

১০

রাত প্রায় দুটোব দিকে এতরার শোবার ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। এত বাতে অকাজে কেউ ফোন করে না, নিশ্চযই জরুরি কিছু। এতরা বিছানা ছেড়ে উঠে এল। সে প্রায ঘুমিয়েই পড়েছিল। টেলিফোনের শব্দে জেগেছে।

'হ্যালো, আমি এতরা — কাকে চান?'

'আপনাকেই চাই।'

'আপনি কে বলছেন ?'

ওপাশ থেকে সাড়া পাওযা গেল না। কিন্তু গলার আওযাজ শুনে মনে হয বিদেশি কেউ। ভাঙা ভাঙা ইটালিয়ান বলছে।

'হ্যালো, কে আপনি ?'

'আমি কে সেটা জানা কি খুব প্রযোজন ? তাবচে, ববং কী জন্যে টেলিফোন কবেছি সেটা বলে ফেলি।'

'আমাকে কিছু বলতে হলে আগে আপনাব পরিচয দিতে হবে। রাতদুপুবে এভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায় না। কে আপনি?'

ওপাশের লোকটি সে প্রশ্নের জবাব দিল না। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, 'বার বছবেব এ্যানি নামের কোনো মেয়েকে চেনেন?'

'আপনি কে?'

'বার বছরের ঐ মেয়েটির খুব রহস্যময় মৃত্যু হয়েছিল।'

'কে আপনি?'

'আমি ঐ মেয়েটির একজন বন্ধু। আমার নাম জামশেদ। চিনতে পারছেন?'

এতরা একবার ভাবল টেলিফোন নামিয়ে রাখে। কিন্তু তাতে লাভ হবে কি? ঐ লোকটি আবার টেলিফোন করবে।

'রহস্যময় কিছু তো আমি জানি না। মেয়েটি মারা পড়েছে কিডন্যাপারদের হাতে। এবং আমি যতদূর জানি ওর মৃত্যুর জন্যে তুমি বহুলাংশে দায়ী। তুমি ছিলে মেয়েটার দেহরক্ষী। তুমি তাকে রক্ষা করতে পার নি। ঠিক না?'

'ঠিক।'

'আজ তার মৃত্যুর পর বন্ধু সেজেছ ? এবং রাতদুপুরে টেলিফোন করে আমাকে বিরক্ত করছ ?'

'তা অবশ্যি করছি। এবং করার একটি কারণ আছে।'

'কী কারণ?'

'কারণ হচ্ছে — আমার ধারণা মেয়েটির মৃত্যুর সঙ্গে তোমার যোগ আছে। হ্যালো... টেলিফোন রেখে দিচ্ছ নাকি?'

'না।'

'আমি তোমাকে এর জন্যে খানিকটা শাস্তি দিতে চাই।'

'তুমি কোত্থেকে টেলিফোন করছ?'

'কেন পুলিশে খবর দিতে চাও? সেটা মনে হয় খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শোন, এতরা —।'

এতরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। লোকটি নিশ্চয়ই আবার টেলিফোন করবে। পুলিশকে বলা দরকার যাতে পুলিশ কলটি কোত্থেকে করা হচ্ছে তা ধরতে পারে। পাবলিক বুথ থেকে করা হলে ধরা যাবে না। তবে জানা যাবে কলটি কোন্ এরিয়া থেকে আসছে।

এতরা নাম্বার ডায়াল করল ; তবে পুলিশের কাছে নয়। হাসপাতালে। সিটি হসপিটাল।

'রিসিপশান, আমি একজন রোগী সম্পর্কে জানতে চাই। আমি খুবই উদ্বিগ্ন।'

'এক্ষুনি জেনে দিচ্ছি।'

'ওর নাম জামশেদ। বিদেশি।'

'বেড নাম্বার এবং কেবিন নাম্বার?'

'সেটা ঠিক বলতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, ধরে থাকুন। ডিউটি রেজিস্টার দেখে বলছি।'

এতরা টেলিফোন কাঁধে নিয়েই নিজের জন্য একটি মার্টিনি বানাল। ওদের নাম খুঁজে বের করতে সময় লাগবে।

'হ্যালো, সিটি হসপিটাল।'

'বলুন শুনছি।'

'আপনি যে রোগীর কথা জানতে চেয়েছেন সে তো ডিসচার্জ নিয়ে চলে গেছে।'

'ও, তাই বুঝি? করে?'

'আজ সকালেই।'

'ধন্যবাদ। যাবার সময় কোনো ফরওয়ার্ডিং এড্রেস রেখে গেছে কি? চিঠিপত্র এলে যাতে ঐ ঠিকানায় পাঠানো যায়?'

'না, এরকম কিছু নেই।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

এতরা টেলিফোন রেখে দিল। ব্যাপারটি ক্যানটারেলাকে জানানো উচিত? ক্যানটারেলা মাঝারি ধরনের বস। মাঝারি ধরনের হলেও তার যোগাযোগ ভালো। বিশেষ করে কিছুদিন ধরেই ভিকানডিয়ার সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক যাচ্ছে। প্রথম দিকে এটাকে সবাই গুজব বলেই মনে করত। কারণ ভিকানডিয়া মাঝারি ধরনের কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না। কিন্তু এটা গুজব নয়। সত্যি।

এতরা ঘড়ি দেখল। দুটো ত্রিশ। রাত অনেক হয়েছে। তবু ক্যানটাবেলাকে পাওযা যাবে। রাত দুটো পর্যন্ত সে থাকে জুয়ার আড্ডায়। বাড়ি ফেরে তিনটায। ঘুমুতে যায চারটায়। ঘড়ি ধরা কাজ। খানিক ইতস্তত করে টেলিফোন ডায়াল কবল।

'হ্যালো, কে?'

'আমি এতরা।'

'এতরা? এত রাতে কী ব্যাপার?'

'একটা সমস্যা হয়েছে আমার।'

'সমস্যা? কী সমস্যা?'

'জামশেদ নামের ঐ লোকটি আমাকে টেলিফোনে ভয় দেখিয়েছে।'

'একটা মেয়েকে তুমি রেপ কবে মেবে ফেলবে আব কেউ তোমাকে ভয দেখাতে পারবে না?'

এতরা শুকনো গলায় বলল, 'ব্যাপারটা সে রকম না।'

'সে রকম না মানে?'

'ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।'

'তাই বুঝি?'

ক্যানটারেলা উচ্চস্বরে হাসল। মদ খেযে টং হযে আছে নিশ্চযই। এতবা নিচু স্বরে বলল, 'ভিকানডিয়া বলেছেন তিনি ব্যাপাবটা সামলাবেন।'

'সামলানো তো হযেছে। হয নি ? কোনো পুলিশ বিপোর্ট হয নি। কেউ গ্রেফতাব হয নি। তোমার নাম পর্যন্ত কেউ জানে না। ঠিক কিনা?'

'হুঁ।'

'তাহলে চিন্তা করছ কেন ?'

'ঐ টেলিফোনটাব জন্যে চিন্তা কবছি।'

'শোন, এখন থেকে চলাফেবা কববাব সময বডিগার্ড নিযে চলাফেবা কববে। ব্যস। দু তিন জন লোক সাথে থাকলেই নিশ্চিন্ত।'

'আচ্ছা, তাই করব।'

'এতরা, একটা কথা।'

'বলুন।'

'বার বছরের এই মেয়েটিব সঙ্গে ঐ কর্ম করবাব সময তোমাব কেমন লেগেছিল? অভিজ্ঞতাটা কি আনন্দদায়ক ছিল?'

ক্যানটারেলা টেলিফোন ফাটিযে হাসতে লাগল। যেন খুব একটা মজাব কথা। এতবাব ইচ্ছা করছিল টেলিফোন নামিয়ে রাখতে কিন্তু তা কবা যাবে না। এমন কিছুই করা যাবে না যা ক্যানটারেলাকে রাগিয়ে দিতে পারে।

'হ্যালো, এতরা।'

'বলুন।'

'আমরা খারাপ লোক সবাই জানে। কিন্তু তুমি একটি নিম্নশ্রেণীর অপরাধী। কেঁচো জাতীয়। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'একজন অপরাধী অন্য অপরাধীকে বাঁচিয়ে রাখে। এইজন্যেই তোমাকে প্রোটেকশান দেযা হয়েছে।'

'এইসব কথা কি টেলিফোনে বলা ঠিক হচ্ছে?'

'কেন, পুলিশ শুনে ফেলবে? টেলিফোন কানে নিয়ে বসে থাকা পুলিশের কাজ নয়। আর তা ছাড়া পুলিশের বড়কর্তা এবং ছোট কর্তাকে কী পরিমাণ টাকা আমরা দেই সে সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে ?'

'না।'

'না থাকাই ভালো।'

ক্যানটাবেলা টেলিফোন নামিযে রাখল খট্ করে। বাকি রাতটা এতরা কাটাল না ঘুমিযে। পরপর চার গ্লাস বাম খেল এবং ভোববেলার দিকে বাথরুম বমি করে ভাসিযে দিল। দিনটি শুরু হচ্ছে খারাপভাবে।

মঙ্গলবার হচ্ছে এতরাব মাদাবস ডে। প্রতি মঙ্গলবার মাযেব কাছে তাকে ঘণ্টা তিনেক কাটাতে হয। দুপুবের লাঞ্চ খেতে হয। হাসিমুখে কথা বলতে হয। এবং মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয এব পরের রোববার থেকে সে নিযমিত চার্চে যাবে।

এই মঙ্গলবারেও বুড়িকে দেখা গেল বাড়িব সামনেব বাবান্দায ছেলেব জন্যে অপেক্ষা কবছে। বুড়ির মুখ অত্যন্ত গম্ভীব।

'এতরা, এত দেবি কেন আজকে?'

'বেশি দেরি তো নয়, মা। আধঘণ্টা।'

'আধঘণ্টাও অনেব সময। এগাবটার আগেই তোমাব আসাব কথা। এখন বাজে এগারটা চল্লিশ।'

'মা, আমি খুব দুঃখিত। আর দেরি হবে না।'

'কফি বানিযে রেখেছিলাম। জুড়িযে পানি হযে গেছে বোধ কবি।'

'কফি খাব না, মা।'

'কেন ? কফি খাবি না কেন ? শবীব খাবাপ নাকি ?'

'না শবীব ঠিকই আছে।'

'উহুঁ, শরীর ঠিক নেই। কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। দেখি, গাযের টেম্পাবেচার দেখি। এই তো জ্বর-জ্বর মনে হচ্ছে।'

'জ্বর নয। রোদেব মধ্যে গাড়ি চালিযে এসেছি — তাই গা গবম লাগছে।'

'এতবা, তুমি মিথ্যা কথা বলে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা কবছ। এটা ঠিক না। চাদব দিচ্ছি শুযে পড়।'

'মা, তুমি শুধু-শুধু ব্যস্ত হচ্ছ।'

'আমি মোটেই শুধু-শুধু ব্যস্ত হচ্ছি না। তোমাকে যা করতে বলছি, কব। আমাকে বাগিও না।'

এতবাকে চাদব গাযে দিযে শুযে পড়তে হল। বুড়ি বড় এক পেযালা কফি হাতে নিযে তার সামনে চেযার টেনে বসল।

'তুমি চার্চে যাওয়া শুরু করেছ ?'

এতরা জবাব দিল না।

'এখনো শুরু কর নি! ইদানীং তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। আমার মনে হয় তোমার চার্চে যাওয়া শুরু করা উচিত।'

'কী দুঃস্বপ্ন দেখছ ?'

'দেখলাম তুমি রাস্তা দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছ। তোমার গায়ে কোনো কাপড় নেই। তোমাকে তাড়া করছে এক জন মানুষ। ওর হাতে প্রকাণ্ড একটা ভোজালি।'

'যে তাড়া করছে সে কেমন লোক?'

'স্বপ্নের ভেতর সব কিছু এত স্পষ্ট দেখা যায় না। আমি শুধু ভোজালিটা দেখলাম।'

'লোকটা কি বিদেশি? গায়ের রঙ কেমন ?'

বুড়ি ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? তোমাব কি কোনো বিদেশির সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে ?'

'না, ঝামেলা হবে কেন? কফি দাও।'

বুড়ি কফি পারকুলেটর চালু করে তার ছেলেকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল। এতবা ঘামছে। চোখের দৃষ্টি অন্য রকম। নিশ্চযই কোনো ঝামেলায জড়িয়েছে।

১১

এঞ্জেল ফসিলো লোকটি খর্বাকৃতিব। চোখের মণি ঈষৎ সবুজাভ। দলের কাছে সে বিড়াল-ফসিলো নামে পরিচিত। বিড়ালেব একটি গুণ তার আছে — সে অসম্ভব ধূর্ত। মাফিয়াদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তির লোকজনই বেশি। এরকম ধূর্তের সংখ্যা কম। বস ভিকানডিযা তাকে একটু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন এই একটি মাত্র কারণেই। ধূর্ত মানুষ সাধারণত সাহসী হয না। ফসিলোও সাহসী নয। তবে তাব সাহসের একটা ভান আছে। অকাবণে মারপিট শুরু করে। কথা বলে অত্যন্ত উদ্ধত ভঙ্গিতে। যে কোনো বিপজ্জনক কাজে আগ বাড়িয়ে যাওযার উৎসাহ দেখায। সাহসের অভাব গোপন রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা কবে।

আজ এঞ্জেল ফসিলোকে খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। খুশির কাবণ বহস্যাবৃত। বস ভিকানডিয়াব সঙ্গে আজ বিকেলে কিছু কথাবার্তা হয়েছে। টেলিফোনে নয, মুখোমুখি। এইটি ফসিলোর খুশির কারণ হতে পারে। কারণ ভিকানডিযা তার ভিলায় কাউকে ঢুকতে দেন না এবং মুখোমুখি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। বসদের নানান রকম সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। নিজের লোকদেরও নিরাপদ দূরত্বে সবিযে রাখতে হয়। ভাগ্যবান কয়েকজনই শুধু অল্প সময়ের জন্যে তাঁর দেখা পায। ফসিলো সম্ভবত ভাগ্যবানদের দলে পড়তে শুরু করেছে। এটা খুশি হবার মতোই ঘটনা।

এঞ্জেল ফসিলো শিস দিতে-দিতে গাড়ি থেকে নামল। তার গাড়িটা ছোট। কালো রঙের টু-সিটার ডজ। অন্য সবার মতো দরজা লক করল না। কারণ গাড়ি চুরির মতো অপরাধ যারা করে তারা সবাই ফসিলোর টু-সিটারটা ভালোভাবে চেনে। এতে তারা হাত দেবে না।

ফসিলো গম্ভীর ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। এটি একটি নতুন নাইট ক্লাব। মেক্সিকান এক ব্যবসাযী এ মাসেই চালু করেছেন এবং অল্পদিনেব মধ্যেই জমিয়ে ফেলেছেন। প্রচুর ভিড় হচ্ছে। এত অল্প সময়ে নাইট ক্লাব জমে যাওয়ার মূলে দুটি মেক্সিকান যুবতী। এরা প্রত্যেকেই অসম্ভব রূপসী। প্রতি বাতেই তিনটে শো করে। নাচের শো। নাচেব পোশাক

বিচিত্র। সমস্ত গা ঢাকা থাকে কিন্তু সবার বাঁ স্তনটি থাকে নগ্ন। এই বিচিত্র পোশাক সবার কাছেই যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

ফসিলোকে ঢুকতে দেখেই নাইট ক্লাবের ম্যানেজার হাসিমুখে এগিয়ে এল।

'সিনোর ফসিলো যে! কী সৌভাগ্য! আসুন আসুন।'

ফসিলো ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। স্টেজ অন্ধকাব হয়ে আসছে। নাচ শুরু হবে এখুনি। ফসিলো মৃদুস্বরে বলল, 'এক বুক দেখিয়েই শুনলাম পুরুষদের পাগল করে দেয়া হচ্ছে।'

'হ্যা-হ্যাঁ সিনোর, দুটো খুলে দিলে কি আর রহস্য থাকে? সব রহস্যই হচ্ছে অর্ধেকে। এখন বলেন, কী দিয়ে আপনাব সেবা করতে পারি।'

'আমি কোথায় থাকি জানেন ?'

'জানব না, কী বলেন! ফমি ভিলায। ঠিক বলেছি তো?'

'ঠিক। ঐখানে আপনাদের নাচেব মেয়েদেন এক জনকে আজ রাতে পাঠাবেন।'

'কিন্তু, সিনোর, ওরা ঠিক ঐ ধবনের কাজ কবে না। ওরা আসলে নাচতেই এসেছে। ভদ্র পরিবারের মেয়ে, সিনোব।'

'আপনার শো শেষ হয কটায ?'

'এই ধরেন দুটায, কোনো-কোনো রাতে তিনটেও বেজে যায।'

'ঠিক আছে, তিনটের পবেই পাঠাবেন।'

ফসিলো তাব সবুজ চোখ দিয়ে অন্য রকম ভঙ্গিতে তাকাল ম্যানেজাবের দিকে। ম্যানেজাব সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। নিয়ম থাকেই ভাঙাব জন্যে। এখন বলুন কোন্‌টিকে পাঠাব। ভালোমতো দেখে-শুনে বলুন।'

'দেখাব সময নেই আমাব। যেটা সবচে' বোগা সেটাকে পাঠাবেন। বোগা মেয়েই আমাব পছন্দ।'

'কিছু পান কববেন না? খুব ভালো শেবী আছে।'

'নাহ্।'

'লক্ষ্য বাখবেন আমাদেব দিকে, সিনোব, আপনাদেব ভবসাতেই বিজনেস চালু কবা। হে-হে-হে।'

ফসিলো বেবিয়ে এল। বাত প্রায এগাবটা বাজে। বাড়ি ফেবাব আগে ঘণ্টা দুই জুয়া খেলা যেতে পাবে। ভাগ্য খুলতে শুরু কবেছে কিনা তা জুয়াব টেবিলে না বসা পর্যন্ত বলা যাবে না। মিবাণ্ডায একটি ভালো জুয়াব আসব বসে।

ফসিলো গাড়িব দবজা বন্ধ কবে চাবিব জন্যে পকেটে হাত দিতেই অনুভব করল, তাব ঘাড়েব কাছে ধাতব কিছু একটা লেগে আছে। কাঠ হয়ে বসে বইল ফসিলো।

পেছন থেকে ভাবি গলায কেউ একজন বলল, 'যেভাবে বসে আছ ঠিক সেভাবেই বসে থাক। এক চুলও নড়বে না।'

ফসিলো নড়ল না। ঘাড়ের পেছনে রিভলভারেব নল লেগে থাকলে এমনিতেই নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায।

'আমি যা বলব ঠিক তাই কববে। গাড়ি স্টার্ট দাও।' ফসিলো গাড়ি স্টার্ট দিল।

'মিলান বুলেভার দিকে এগিযে যাও। রোড নাম্বার ১২ দিয়ে এক্সিট নেবে। তোমার পেছনে যেটা ধরে আছি তার নাম বেরেটা থার্টি টু।'

দেখতে-দেখতে গাড়ি বার নম্বর রোডে গিয়ে হাইওযেতে এক্সিট নিল। ফসিলো মৃদুস্বরে বলল, 'তুমি যা করছ তার ফলাফল সম্পর্কে তোমাব ধারণা নেই সম্ভবত। তুমি বোধহয় জান না আমি কে।'

'তুমি এঞ্জেলো ফসিলো। বন্ধুরা তোমাকে বিড়াল–ফসিলো বলে।'

ফসিলোর কপালে বিন্দু–বিন্দু ঘাম জমল। হাত–পা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ফসিলো বুঝতে পারছে না লোকটি কী চায়। উদ্দেশ্য কী? সে বসেছে এমনভাবে যে রিয়ার ভিউ মিররে তাকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে বিদেশি। একটু টেনে কথা বলছে।

'সেন্ট জেনিংসে এক্সিট নেবে।'

ফসিলো সেন্ট জেনিংসে এক্সিট নিল। শেষ পর্যন্ত গাড়ি থামল পুরনো ধরনের একটি একতলা বাড়ির সামনে। কোথায় এসেছে ফসিলো মনে রাখতে চেষ্টা করছে। বাড়িটি হালকা হলুদ রঙের, টালির ছাদ। অনেকখানি জায়গা আছে সামনে। এসব খুঁটিনাটি লক্ষ করে লাভ কী? ফসিলোর মনে হল এ বাড়ি থেকে সে আর ফিরে যেতে পারবে না। নাইট ক্লাবের মেয়েটা হয়তো তার বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে। রোগা একটি মেয়ে, যার বয়স খুবই কম। হয়তো ষোল–সতের। ফসিলো বলল, 'তুমি কী চাও?'

লোকটি শীতল স্বরে বলল, 'বিশেষ কিছু না। কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

'এঞ্জেলো কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না।'

'সেটা দেখা যাবে।'

'শুয়োরের বাচ্চাদের কী করে শায়েস্তা করতে হয় তাও আমরা জানি।'

'জানলে ভালোই।'

কথা শেষ হবার আগেই ফসিলোর মাথায় প্রচণ্ড শব্দে রিভলভারের হাতল দিয়ে আঘাত করা হল। ব্যথা বোধ হবার আগেই ফসিলোর কাছে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

জ্ঞান হল অল্পক্ষণের মধ্যেই। চোখ মেলেই দেখল নাইলন কর্ড দিয়ে তাকে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে চেয়ারের সঙ্গে। সামনেই একটি কাঠের টেবিল। টেবিলের উপর দুটি পেতলের আট ইঞ্চি সাইজ পেরেক এবং বড় একটা হাতুড়ি। চেয়ারের উল্টো দিকে যে বসে আছে — ফসিলো তাকে চিনতে পারল। এই লোকটাকে সে আগে দেখেছে। বার বছরের সেই মেয়েটির বডিগার্ড ছিল।

'ফসিলো, আমাকে চিনতে পারছ?'

ফসিলো জবাব দিল না।

'নিশ্চয়ই আশা কর নি তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে?'

'কী চাও তুমি?'

'বলেছি তো কয়েকটি প্রশ্ন করব।'

'প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। এঞ্জেলো ফসিলোর মুখ থেকে কেউ কিছু বার করতে পারে না।'

'চেষ্টা করতে দোষ নেই, কি বল?'

ফসিলো জবাব দিল না। সে দ্রুত নিজের অবস্থাটা বুঝে নিতে চেষ্টা করছে। সামনে বসে থাকা লোকটা কথাবার্তা বলছে নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে। এমন একটা ব্যাপার ঘটছে কিন্তু তার মধ্যে কোনো রকম উত্তেজনা নেই।

'ফসিলো, এই পেতলের পেরেকটি দেখতে পাচ্ছ? এই পেরেকটি এখন আমি তোমার হাতের তালুতে ঢুকিয়ে দেব। তারপর প্রশ্ন শুরু করব। একেকটা প্রশ্ন করবার পর দশ সেকেন্ড সময় দেব। দশ সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর না পাওয়া গেলে একেটি করে আঙুল কেটে ফেলব।'

ফসিলো নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। এইসব কি সত্যি-সত্যি ঘটছে? নাকি কোনো দুঃস্বপ্ন? ফসিলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটা তার বাঁ হাত টেবিলের ওপর টেনে এনে মুহূর্তের মধ্যে পেরেক বসিয়ে দিল। হাত গেঁথে গেল টেবিলের সঙ্গে। ফসিলো শুধু দেখল একটি হাতুড়ি দ্রুত নেমে আসছে। পরক্ষণেই অকল্পনীয় ব্যথা। যেন কেউ হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাত ছিঁড়ে নিয়েছে। ফসিলো জ্ঞান হারাল।

ফসিলোর জ্ঞান ফিরতে সময় লাগল। তার অবস্থা ঘোর লাগা মানুষের মতো। এসব কি সত্যি-সত্যি ঘটছে? হাত কি সত্যি-সত্যি পেরেক দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে টেবিলে? ফুলে ওঠা হাত। হাতের উপর জমে থাকা চাপ-চাপ রক্ত দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। শুধু যখন একটু নড়াচড়াতেই অকল্পনীয় একটা ব্যথা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তখনই মনে হয় এটি সত্যি-সত্যি ঘটছে।

সামনের টেবিলে বসে থাকা লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট টানছে। যেন কিছুই হয় নি। লোকটির হাতে নোটবই আর কলম।

'ফসিলো, তোমাকে এখন প্রশ্ন করতে শুরু করব। মনে রাখবে প্রশ্ন করার ঠিক দশ সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর চাই। প্রথম প্রশ্ন, এ্যানিকে কিডন্যাপ করবার জন্যে কে পাঠিয়েছিল তোমাদের?'

'বস ভিকানডিয়া।'

'তোমরা কজন ছিলে?'

'পাঁচ জন। দুজনকে তুমি মেরে ফেলেছিলে।'

'যে তিন জন বেঁচে আছে তাদের এক জন তুমি। বাকি দুজন কে?'

'উইযি ও নিওরো।'

'ওদের কোথায় গেলে পাওয়া যাবে?'

ফসিলো চারটি ঠিকানা বলল। কখন গেলে ওদের পাওয়া যাবে তা বলল। ওদের সঙ্গে কি কি সব অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাও বলল।

'ঐ মেয়েটিকে তুমি রেপ করেছিলে?'

ফসিলো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

'কবার?'

ফসিলো উত্তর দিল না।

'বল কবার?'

'বেশ কয়েকবার।'

'তোমার সঙ্গীরাও?'

'হ্যাঁ।'

'এ রকম করবার নির্দেশ ছিল তোমাদের ওপর?'

'না। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই এলোমেলো হয়ে গেছে। র‍্যানসমের টাকার ব্যাপারে কি সব ঝামেলা হয়েছে। মেয়েটাকে বেশ কিছুদিন রাখতে হল। এর মধ্যে একদিন এতরা ওকে রেপ করল। আমরা ভাবলাম একবার যখন হয়েই গেছে... তার ওপর মেয়েটি ছিল অসম্ভব রূপসী।'

'মেয়েটির মৃত্যুর পর বস ভিকানডিয়া কী করল?'

'বস খুব রাগলেন।'

'শুধুই রাগলেন?'

'আমাদের প্রত্যেকের ত্রিশ হাজার লীরা করে পাওয়ার কথা। আমরা সেটা পাই নি।'

'বল, এখন তোমার বসের কথা বল।'
'কী জানতে চাও?'
'তুমি যা জান বল। ভিকানডিয়াই কি এখন সবচে' শক্তিশালী?'
'হ্যাঁ।'
'কারা–কারা ওর ডান হাত?'
ফসিলোর কথা জড়িয়ে যেতে শুরু করছে। হাতের ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। ফসিলো বলল, 'তুমি আমাকে নিয়ে কী করবে?'
'মেরে ফেলব।'
'কীভাবে মারবে?'
'তুমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছ, কাজেই তোমাকে সামান্য করুণা করব। কীভাবে তুমি মরতে চাও সেটা বল। সেই ভাবেই ব্যবস্থা করব।'
ফসিলো কিছু বলতে পারল না। তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল। আরো কিছুক্ষণ পর বেরেটা থার্টি টু থেকে একটি বুলেট ফসিলোর মাথার একটি বড় অংশ উড়িয়ে দিল।

'হ্যালো, তুমি কে?'
'চিনতে পারছ না? আমার নাম জামশেদ।'
'কী চাও তুমি?'
'তোমাকে একটা খবর দিতে চাই। এঞ্জেলো ফসিলোকে চেন?'
এতরা জবাব দিল না।
'ওকে মেরে ফেলা হয়েছে।'
'আমাকে এসব শোনাচ্ছ কেন?'
'ভাবলাম তোমার কাছে খবরটা ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে। তাছাড়াও আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই। এ্যানির কিডন্যাপিং পরিকল্পনাটি কি তোমার?'
এতরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। সে ভেবেছিল আবার রিং হবে। কিন্তু কেউ রিং করল না। শুধু দুপুরবেলা মায়ের টেলিফোন এল : এতরা ঐ স্বপ্নটা আমি আবার দেখেছি।
'কী স্বপ্ন ?'
'ঐ যে তুমি একটা রাস্তা দিয়ে উলঙ্গ হয়ে দৌড়াচ্ছ। আর তোমার পেছনে–পেছনে এক জন লোক ভোজালি নিয়ে ছুটে আসছে!'
'ও।'
'তুমি কি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছ ?'
'না।'
'চার্চে যাবার কথা মনে আছে ?'
'আছে, আছে।'
এতরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

রিনালো পুলিশের হমিসাইডের লোক। অনেক ধরনের বিকৃত মৃতদেহ দেখে তার অভ্যেস আছে ; তবু ফসিলোর লাশের সামনে সে ভ্রূ কুঁচকে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল। খুনটা করা হয়েছে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়। হাতের তালুতে পেরেক বসিয়ে দেবার ব্যাপারটি তাকে ভাবাচ্ছে... মাফিয়াদের দলগত বিরোধ শুরু হল? হলে মন্দ হয় না। নিজেরা–নিজেরা খুনোখুনি করে মরুক। কিন্তু ব্যাপারটা সে রকম নাও হতে পারে। ফসিলোর হাতে

বসানো পেরেক দেখে মনে হয় কেউ তার কাছ থেকে কথা আদায় কবতে চেয়েছে। কিন্তু ফসিলো এমন কোনো ব্যক্তি নয় যাব কাছে মূল্যবান খবব আছে। সে ভিকানডিযাব এক জন অনুগত ভৃত্য মাত্র।

রিনালো নোটবই খুলে দুটো পযেন্ট লিখে রাখল। এক, পেট্রোল পুলিশকে সতর্ক করে দিতে হবে। যদি এই খুনটা মাফিযাদেব দলগত বিবোধ থেকে হয়ে থাকে তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কিছু খুনোখুনি হবে। দুই, ভিকানডিযার কাছে যত টেলিফোন এখন থেকে, যাবে ও আসবে — সবগুলো পরীক্ষা কবে দেখতে হবে। এটা খুব জরুবি। দলেব কেউ মাবা পড়লে বসদেব টেলিফোনেব সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। অধিকাংশ কলই হয অর্থহীন ধরনের তবু তাব মধ্যেও অনেক খবরাখবব থাকে।

বিনালো সন্ধ্যার দিকে ভিকানডিযার ভিলায একটি টেলিফোন কবল। বিনালোকে জানানো হল ভিকানডিযা ঘবে নেই। কোথায আছে তাও জানা নেই। রিনালো বলল,

'আমি হমিসাইডের এক জন ইন্সপেক্টব, আমাব নাম বিনালো।'

'ও। আপনি ধরুন। দেখি উনি আছেন কিনা।'

ভিকানডিযাব মধুর গলা পাওযা গেল সঙ্গে সঙ্গে।

'কে বলছেন?'

'আমি রিনালো, হমিসাইড ইন্সপেক্টব।'

'বড় আনন্দিত হলাম। কিছু কি কবতে পাবি আপনাব জন্যে?'

'ফসিলো মাবা গেছে শুনেছেন?'

'কোন্ ফসিলো?'

'এঞ্জেলো ফসিলো।'

'মাবা গেছে? আহা! মৃত্যু বড় কুৎসিত জিনিস, মিস্টাব বিনালো।'

'তা ঠিক। খববটা কি আপনি আমাব কাছ থেকেই প্রথম শুনলেন, না আগেই শুনেছেন?'

'আগেই শুনেছি।'

'ভিকানডিযা, আপনি কি এই ধবনেব আবো মৃত্যুব আশংকা কবছেন?'

'মৃত্যু একটি বাজে ব্যাপাব, মিস্টাব বিনালো। কিন্তু আমবা সবাই মাবা যাই। তাই নয কি?'

'আপনি আমাব কথাব জবাব দেন নি। এই ধবনেব আরো মৃত্যুব আশংকা কবছেন কি?'

'আশা ও আশংকা এই দুটো জিনিস নিযেই তো আমবা সবাই বাঁচি।'

রিনালো টেলিফোন নামিযে বাখল। এই ধবনেব কথাবার্তা চালিযে যাওযা মুশকিল। এদিক দিযে ক্যানটারেলাব কথাবার্তা সহজ স্বাভাবিক। বাড়তি দার্শনিকতা নেই। প্রশ্নেব জবাব দিতে কোনো বকম দ্বিধা নেই।

'ক্যানটাবেলা, এই ধবনেব হত্যাকাণ্ড কি আবো হবে?'

'মনে হয না, মিঃ বিনালো। এটা দলগত কোনো বিবোধ নয।'

'আপনি কি এই ব্যাপারে পুবোপুবি নিশ্চিত?'

'মোটামুটিভাবে নিশ্চিত। বস ভিকানডিযাব বযস হযেছে, তিনি এখন সব বকম বিবোধ এড়িযে চলেন।'

'কাবো সঙ্গেই তাব কোনো বিবোধ নেই বলতে চান?'

'বিরোধ নেই তা নয, তবে যে কটা বড় ফ্যামিলি এখন আছে তাদেব সবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো।'

'তাহলে আপনার ধারণা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বড় ফ্যামিলির স্বার্থ জড়িত নয় ?'

'সে রকমই ধারণা। অবশ্যি আমার ধারণা ভুলও হতে পাবে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই আপনার?'

'আপাতত না।'

'ভালো কথা, মেয়েমানুষের ব্যাপারে আপনার উৎসাহ আছে ? আমার জানামতে কয়েকটি মেয়ে আছে, সঙ্গিনী হিসেবে ওদের তুলনা নেই। ভাবতীয় মেয়ে। জানেন তো ভারতীয় মেয়েরা কেমন মধুর স্বভাবের হয়?'

'এইসব বিষয়ে আমাব তেমন কোনো উৎসাহ নেই।'

'বলেন কী? পুলিশে চাকরি করলেই একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং হতে হবে এমন তো কোনো কারণ নেই। তাছাড়া যেসব মেয়ের কথা বলছি ওরা লাইসেন্সড গার্লস। বেআইনী কোনো ব্যাপার নেই।'

বিনালো টেলিফোন নামিযে রাখল। এক জন পুলিশ অফিসাবের সঙ্গে এই জাতীয কথাবার্তা বলার ব্যাপাবে ওদের কোনো দ্বিধা-সংকোচ নেই। এটাই আশ্চর্য। তাব চেযেও বড় আশ্চর্য, এদেব বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাঁড় কবানো যায না। কেউ ওদেব বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে না। প্রমাণ জোগাড় কবা যাবে না। এবা আইনের ধবাছোঁযার বাইবেব একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হযে পড়েছে।

রিনালো ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল।

১২

মেযেটির নাম নিমো। বযস সতেব-টতেব হবে কিন্তু দেখায আবো কম। বাত দশটাব মতো বাজে। এমন কিছু বাত নয কিন্তু চাবদিক চুপচাপ হযে গেছে। অঞ্চলটি শহবেব উপকণ্ঠে। লোক চলাচল কম। বাংলো প্যাটার্নেব এই বাড়িটিব চাবদিকে উঁচু দেযাল। দুজন রক্ষী পাহারা দেয পালা করে। এই বাড়িটিব সঙ্গে বাইবেব যোগাযোগ নেই বললেই হয। কিন্তু নিমোকে সে ব্যাপাবে খুব একটা উদ্বিগ্ন মনে হয না। এ বকম বন্দিজীবন মনে হয তার ভালোই লাগছে।

খুটখুট করে টোকা পড়ল দরজায।

নিমো বলল, 'কে?' কোনো জবাব পাওযা গেল না। উইযি এসে গেছে নাকি? উইযি সাধারণত রাত এগারটার দিকে এসে বাকি রাতটা কাটায। আজ একটু সকাল-সকাল এসে পড়ল নাকি? নিমো আবার বলল, 'কে উইয়ি?' খুটখুট করে দুবাব শব্দ হল কিন্তু কেউ জবাব দিল না। রক্ষীদের কেউ এসেছে কি? কিন্তু ওদের কি এত সাহস হবে? উইযিব কঠিন আদেশ আছে যেন বাড়ির কম্পাউন্ডেব ভেতব না ঢোকে। সে আদেশ অমান্য কববাব সাহস ওদের হবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে সবারই কি একটু-আধটু আদেশ অমান্য কবতে ইচ্ছে করে না? নিমোর তো সব সময়ই ইচ্ছা কবে। আচ্ছা, রক্ষীদেব কেউ যদি হয তাহলে দরজা খোলা মাত্র ওবা ভয়ানক অবাক হবে। ওরা নিশ্চয়ই স্বপ্নেও ভাবে নি সম্পূর্ণ নগ্নদেহের একটি মেযে দরজা খুলে দেবে। এ রকম দৃশ্য শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়। বাস্তবে দেখা যায় না। নিমো হাসিমুখে দরজা খুলে দিল।

দরজার ও-পাশে অপরিচিত একজন লোক বিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নগ্নদেহের নিমোকে দেখে তার কোনো ভাবান্তর হল না। ভারি গলায় বলল, 'অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করছি। খুবই লজ্জিত। কোনো রকম চেঁচামেচি করবে না।'

নিমো কোনো শব্দ করল না। লোকটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

নিমো মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার নাম কি?'

'জামস। জামশেদ।'

'তুমি কি চাও? আমার সঙ্গে কোনো টাকাপয়সা নেই।'

'আমি টাকাপয়সার জন্য আসি নি।'

'তাহলে কি জন্যে এসেছ? আমার সঙ্গে বিছানায় যাবার জন্যে?'

'না।'

নিমো দেখল লোকটা তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

'তুমি ঢুকলে কীভাবে?'

'ঢুকতে খুব একটা অসুবিধে হয় নি।'

নিমো দেখল লোকটার মুখে ছোট্ট একটি হাসি। এর মধ্যে হাসির কী আছে?

'কী চাও তুমি?'

'তোমার কাছে উইয়ি নামের যে লোকটি আসবে ওর মাথায় আমি বেরেটা থার্টি টু-র তিনটি বুলেট ঢুকিয়ে দেব। সে জন্যেই এসেছি।'

'উইয়ি যে এখানে আসে তা তো তোমার জানার কথা নয়।'

নিমো আবার লক্ষ করল, লোকটির মুখে হালকা একটু হাসি।

'উইয়িকে মারতে চাও কেন?'

'ও বার বছরের একটি মেয়েকে রেপ করে মেরে ফেলেছে। মেয়েটার নাম এ্যানি।'

নিমোর মুখ সাদা হয়ে গেল। কী বলছে এই লোক! নিমো চাপা স্বরে বলল, 'উইয়ি এ রকম হতেই পারে না।'

'তুমি কি উইয়ির স্ত্রী?'

'না। তবে আমরা শিগগিরই বিয়ে করব। তুমি হাসছ কেন? এর মধ্যে হাসির কী আছে?'

'তোমার মতো বেশ কয়েকটা মেয়ে আছে উইয়ির। ওদের সবাই হয়তো জানে উইয়ির সঙ্গে তাদের বিয়ে হবে।'

নিমো জবাব দিল না। লোকটি একটি সিগারেট ধরাল আর ঠিক তখনি বাড়ির সামনে—থামল বড় একটি গাড়ি। সিগারেট এসট্রেতে গুঁজে দিল লোকটি।

'এই মেয়ে, শোন। তুমি সব সময় যেভাবে দরজা খোল ঠিক সেইভাবেই খুলবে। খোলা মাত্রই চেষ্টা করবে প্রথম সুযোগেই দূরে সরে যেতে।'

'আর যদি দূরে না সরি? যদি উইয়িকে জড়িয়ে ধরে থাকি?'

'তাহলে তোমাদের দুজনকে গুলি করব।'

কী ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর। কোনো সন্দেহ নেই, এই লোক দুজনকে মারতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না। নিমো দেখল লোকটা দরজা বন্ধ করে বাঁ দিকের ড্রেসিং টেবিলের কাছে সরে গেছে। উইয়ির ভারি পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নিমোর ইচ্ছা হল প্রাণপণে চেঁচিয়ে উইয়িকে সাবধান করে। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরুল না। উইয়ি যখন দরজায় টোকা দিয়ে বলল, 'কোথায় আমার ময়না পাখি, দেখন হাসি' তখন সে অন্যদিনের মতোই দরজা খুলে দিল। উইয়ি ঘরে ঢুকল নিমোকে জড়িয়ে ধরে। আর সেই সময় একটি ভারি গলার স্বর শোনা গেল, 'ভালো আছো উইয়ি? আমাকে চিনতে পেরেছ আশা করি?'

উইয়ি নিমোকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত হাত ঢুকাল প্যান্টের পকেটে আর তখনই পরপর তিনবার গুলি হল।

নিমো কিছুই বুঝতে পারছে না। সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। সে দেখছে উইযির প্রকাণ্ড দেহটা খাটের পাশে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। বিদেশি লোকটা কী যেন বলছে তাকে। কী বলছে? সব কিছু অস্পষ্ট ধোঁয়াটে।

'এই মেয়ে, তুমি কাপড় পরে নাও। পুলিশ আসবে এক্ষুনি। ওদের সামনে এ বকম ন্যাংটো অবস্থায় বের হওয়া ঠিক হবে না।'

লোকটা বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে বের হযে গেল। খুব ছোটাছুটি হচ্ছে বাইরে। রক্ষী দুজন দৌড়ে আসছে সম্ভবত। উইযিব গাড়িতে যে একজন দেহরক্ষী সব সময থাকে সেও ছুটে আসছে। নিমোর মনে হল সে এখন প্রচুর গোলাগুলিব শব্দ শুনবে। কিন্তু সেরকম কিছুই শুনল না। সে কি জ্ঞান হারাচ্ছে? উইযির পড়ে থাকা বিরাট শরীবের দিকে তাকিযে মুখ ভর্তি করে বমি করল। গা গুলাচ্ছে। ঘরবাড়ি কেমন যেন দুলছে। নিমো দ্বিতীযবাব বমি করল।

১৩

রিনালোর অফিস ঘবটি ঠাণ্ডা। এযাবকুলাব আছে। তার ওপব একটি ফ্যান ঘুরছে। তবু নিমো ঘামতে লাগল।

পুলিশী ব্যাপাবে নিমোব কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। ভাসা-ভাসা একটি ধাবণা যে পুলিশ অফিসারবা নির্দয প্রকৃতিব হয এবং উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন কবে সহজেই ফাঁদে ফেলে দেয। কিন্তু এই অফিসারেব বয়স অল্প এবং সে প্রশ্ন কবছে খুবই আন্তবিক ভঙ্গিতে। কফি খেতে দিযেছে। কথা বলছে নবম গলায। যদিও কথাগুলো শুনতে তাব মোটেও ভালো লাগছে না।

'তুমি কি এক জন প্রোসটিটিউট?'

'না বলছ কেন? তুমি তো থাকছিলে বক্ষিতাব মতো। উইযিব হাতে পড়বাব আগেও অনেক পুরুষেব সঙ্গে থেকেছ। থাক নি?'

নিমো চুপ কবে বইল।

'তুমি কি জানতে উইযি পতিতাবৃত্তিব একটা বড় অংশ পরিচালনা কবে?'

'না।'

'উইযির সঙ্গে যেসব মেযেরা থাকে তাবা পবে বিভিন্ন বকম পতিতাবৃত্তিতে জড়িযে পড়ে বা পড়তে বাধ্য হয। এটা তুমি জানতে না?'

'জ্বি না। উইযি আমাকে বিযে কববে বলেছিল।'

'তা কি তুমি এখনো বিশ্বাস কর?'

'আমার বিশ্বাস--অবিশ্বাস উইযি বেঁচে থাকলে প্রমাণ হত। সেটা তো এখন প্রমাণ করবার কোনো পথ নেই।'

'যে লোকটা উইয়িকে মারল সে কি একজন বিদেশি?'

'হ্যাঁ।'

'কী করে বুঝলে?'

'টেনে–টেনে কথা বলছিল। তার চেহারাও বিদেশিদের মতো। নামটাও সে রকম।'
'সে তোমাকে তাব নাম বলেছে?'
'হ্যাঁ।'
'কি নাম?'
'আমার মনে নেই।'
'সে বলেছে এ্যানির মৃত্যুর জন্যে সে শাস্তি দিচ্ছে ?'
'হ্যাঁ।'
'আচ্ছা, সে কি তাব নাম জামশেদ বলেছে ?'
'আমার মনে পড়ছে না।'
'লোকটার কোনো বৈশিষ্ট্য তোমাব মনে পড়ে?'
'লোকটি খুবই ঠাণ্ডা মাথায সমস্ত ব্যাপাবটা ঘটাল। সে এতটুকুও উত্তেজিত ছিল না।'
'গুলি করবার আগে লোকটি কোনো কথাবার্তা বলেছে ?'
'বলেছে, কিন্তু আমাব মনে নেই।'
'এই জাতীয হত্যাকাণ্ড সে আবো কববে কিনা তা বলেছে ?'
'আমাব মনে পড়ছে না।'
'কফি খাও। কফি ঠাণ্ডা হযে যাচ্ছে।'
নিমো কফিতে চুমুক না দিযে তাব কপালেব ঘাম মুছল।

১৪

ভিকি খববের কাগজেব প্রথম পাতায ছাপা খববটাব অর্থ ঠিক বুঝতে পাবল না। তাকে দ্বিতীযবাব খববটি পড়তে হল। শিরোনাম হচ্ছে 'একক যুদ্ধ'। অসীম সাহসী এক জন প্রৌঢ়, যাব নাম জামশেদ, সে একাকী যুদ্ধ ঘোষণা কবেছে এমন সব অপবাধীব বিরুদ্ধে, যাদেরকে পুলিশ কিছুই বলে না বা বলবাব ক্ষমতা বাখে না। বেশ বড় খবর। সেখানে এ্যানিব মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে। এবং ভযংকব দুজন অপবাধী, যারা অল্প কিছুদিনেব ভেতব মাবা গেল, তাদের কথাও আছে। নিমো নামেব মেযেটাব ক্ষুদ্র একটি স[illegible] কারও আছে।

ভিকি দীর্ঘ সময চুপচাপ বসে বইল চেয়াবে। আজ ছুটির দিন। রুনকে নিযে তাব বে–ল্যান্ডে যাবার কথা। সেখানে একটি ছোট্ট কটেজ ভাড়া নেযা হযেছে। কিন্তু ভিকির আর যেতে ইচ্ছে কবছিল না। ইচ্ছা কবছিল, রুনকে পাশে বসিযে এ্যানিব পুবনো দিনের ছবিগুলো দেখে। কিংবা কববখানায গিয়ে এ্যানির ছোট্ট কবরটিতে কিছু ফুল দিযে আসে। ফুলেব সঙ্গে থাকবে এই খববেব কাগজটি — যেখানে অনাত্মীয একজন বিদেশির কথা আছে ; যে ছোট্ট এ্যানিব ভালবাসাব উত্তর দিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িযেছে! ভিকির চোখ দিযে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। রুন ঘবে ঢুকে অবাক হযে বলল, 'কী হয়েছে?'

'এই খববটা পড়।'

রুন নিঃশব্দে পড়ল। তার চেহারা দেখে মনে হল না তার কোনো ভাবান্তর হয়েছে। ভিকি মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বে–ল্যান্ডে যাবে আজ?'

'নাহ্।'

'কী কববে? সিমেট্রিতে যাবে ?'

'নাহ্।'

বলেই অনেক দিন পর গভীর ভালবাসায় রুন তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমার মেয়ে আর অন্ধকার কফিনে শুয়ে-শুয়ে কাঁদবে না। অন্তত এক জন তার ভালবাসার সম্মান রেখেছে। আমার মামণির আজ খুব আনন্দের দিন!'

রিনালো অফিসে এসেই শুনল তাকে কবার টেলিফোনে খোঁজ করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে অফিসে পৌঁছা মাত্রই যেন সে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে। বিশেষ প্রয়োজন। রিনালো দেখল নাম্বারটা অপিরিচিত। কে হতে পারে? ডায়াল ঘোরানোমাত্রই মধুব স্বব শোনা গেল, 'ভিকানডিয়া বলছি।'

'আমি রিনালো, কী ব্যাপার?'

'আজকের খবরের কাগজ দেখেছেন, মিঃ বিনালো?'

'হ্যাঁ।'

'বিশেষ কোনো খবর আপনাব চোখে পড়েছে কি?'

'কোন্‌টির কথা বলছেন? লাওসের হাঙ্গামা?'

'না। লাওস নিযে আমাব মাথা ব্যথা নেই। আপনি কি দেখেন নি খববের কাগজেব লোকরা কীভাবে এক জনকে হিবো বানিযে ছেড়ে দিযেছে?'

'জামশেদের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'দেখেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাকে টেলিফোন কববাব কাবণটা ঠিক ধবতে পাবছি না।'

'আপনার কি মনে হয না ব্যাপারটা নিযে একটু বেশি বাড়াবাড়ি কবা হচ্ছে?'

'আপনি ভুল জায়গায টেলিফোন কবছেন। আমি খববের কাগজেব লোক নই।'

'মিঃ বিনালো, আমি ঠিক জাযগাতেই টেলিফোন কবেছি।'

'তার মানে ?'

'আপনি নিশ্চযই লক্ষ কবেছেন কোনো কাগজেই এত বড় একটি হিবোব কোনো ছবি ছাপা হয নি। এবং আমি যতদূর জানি পুলিশ বিভাগ ছবি ছাপতে নিষেধ কবেছে।'

'পুলিশ বিভাগের স্বার্থ?'

'লোকটা বিদেশি। ছবি ছাপা হলেই সে পবিচিত হযে পড়বে। দ্রুত ধবা পড়বে। আপনারা চান না সে ধরা পড়ুক।'

'আপনার এ রকম অনুমানের কোনো ভিত্তি আছে কি?'

'কিছুটা আছে। আমবা ওব ছবি দিযে পত্রিকায বিজ্ঞাপন দিতে চেযেছিলাম। পত্রিকাওয়ালারা সেটা ছাপতে রাজি নয। "অপবাধীকে ধবিযে দিন" এই শিবোনামে বিজ্ঞাপন।'

'আপনাবা এই জাতীয বিজ্ঞাপন দিতে শুরু কবেছেন?'

'বিজ্ঞাপনটা দেযা হযেছিল উদ্বিগ্ন জনসাধারণের নামে।'

'ও, তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, মিঃ রিনালো। আমবাও জনগণ। ট্যাক্স দিযে বাস করছি।'

'মিঃ ভিকানডিযা।'

'বলুন।'

'আমার কেন জানি ধাবণা হচ্ছে, এই একটা লোকেব জন্যে আপনাবা কিছুটা বিচলিত হযেছেন।'

'মোটেই না। পত্রিকাওয়ালারা জিনিসটাকে একটা সেন্টিমেন্টাল রূপ দিতে চাচ্ছে -- সেখানেই আমার আপত্তি।'

'লোকটা কিন্তু খুব সহজ পাত্রও নয়, মিঃ ভিকানডিয়া।'

'আড়াল থেকে গুলি করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি দেখি না।'

'বাহাদুরি দেখানোর তার কোনো ইচ্ছাও বোধহয় নেই। ভালো কথা, আপনি এখনো হয়তো খবর পান নি, নিওরোর মৃতদেহ পাওয়া গেছে।'

'কী বলছেন!'

'নিওরো, যে এ্যানির কিডন্যাপিং-এ জড়িত ছিল, তার ডেডবডি পাওয়া গেছে। বুলেটের সাইজ থেকে মনে হয় সেটা বেবেটা থার্টি-টু জাতীয় অস্ত্র থেকে এসেছে।'

'কখন পাওয়া গেছে ডেডবডি?'

'অল্প কিছু আগে। ঘণ্টাখানেক হবে।'

বস ভিকানডিয়া দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বলল, 'আপনাকে খুব খুশি মনে হচ্ছে।'

'পুলিশের লোক সহজে খুশি হয় না, অখুশিও হয় না।'

'জামশেদকে ধরবার কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?'

'এসব পুলিশের ব্যাপার। ও নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ না করা ভালো।'

'আমার মনে হচ্ছে পুলিশ ওকে ধরবার কোনো রকম চেষ্টাই করছে না। করছে কি?'

বিনালো শব্দ করে হাসল। জবাব দিল না।

'হ্যালো, বিনালো।'

বিনালো টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

প্রতিটি প্রভাতী সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় নিওরোর মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হল। ছবি ছাপা হল এ্যানির। এ্যানির হত্যাকাণ্ড ও মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কীভাবে সাজা পাচ্ছে সে ধরনের বিবরণ লেখা হল। শুধু জামশেদের কোনো ছবি নেই। তার চেহারার কোনো বিবরণও নেই। একটি পত্রিকায় পোস্ট এডিটরিয়েল লেখা হল জামশেদকে নিয়ে। সম্পাদক লিখলেন — আমরা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া কখনো সমর্থন করি না। যারা আইন নিজের হাতে নেয় তারা আমাদের কাছে অপরাধী। কিন্তু যখন দেখি বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, আইন অপরাধীদের স্পর্শ করে না তখন ব্যথিত হই। সে সময় কোনো সাহসী মানুষ যদি আইন নিজের হাতে তুলে নেয় তখন তাকে সমর্থন না করলেও এক ধরনের শ্রদ্ধা ও মমতা বোধ করি তার জন্য। সে অপরাধী। কিন্তু অপরাধী হলেও তাকে ঘৃণা করতে আমাদের বিবেক সায় দেয় না। আমরা আশা করছি আমাদের জীর্ণ পুলিশ বাহিনী জামশেদের ঘটনা থেকে একটি বড় শিক্ষা গ্রহণ করবেন। তাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারা এ রকম হবে যেন আমাদেরকে অপরাধীদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে না হয়।

'লা বেলে' পত্রিকায় আরেকটি মজার খবর ছাপা হল। দুটি নাগরিক কমিটি বৈঠকে বসে ঠিক করেছে জামশেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা সব রকম সাহায্য দেবে। বৈঠকের শেষে তারা জামশেদের জন্যে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করেছে।

শহরে অনেক গাড়ি দেখা যেতে লাগল যাদের গায়ে নূতন ধরনের সব স্টিকার : 'জামশেদ, আমরা আছি তোমার সাথে।' 'তুমি চালিয়ে যাও, জামশেদ!' 'এই গাড়িটিতে জামশেদের জন্যে একটি আসন আছে।'

১৫

সকাল থেকেই মেঘ করেছিল।

দুপুরের দিকে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। এতরা একবার ভাবল আজ আর মার কাছে যাবে না। টেলিফোনে খোঁজ নেবে। এই ভাবনা অবশ্যি বেশি স্থায়ী হল না। আজ মঙ্গলবার মার কাছে না গেলেই নয়। এতরা বিরক্ত মুখে গাড়ি বের করতে বলল। দিনকাল এমন হয়েছে— হুট-হাট করে কোথায়ও যাওয়া যায় না। তিন চার জন দেহরক্ষী সঙ্গে রাখতে হয়। গাড়িতে বসতে হয় মাথা নিচু করে। সব সময় একটা আতঙ্ক। এ রকম অবস্থায় মানুষ থাকতে পারে? সবচেয়ে ভালো হয় মাসখানেকের জন্যে অন্য কোথাও চলে গেলে। এরমধ্যে নিশ্চয়ই সব ঝামেলা মিটে যাবে। একটি মাত্র মানুষ কী করে এরকম একটা ঝামেলা সৃষ্টি করে কে জানে। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। অবশ্যি ক্যানটাবেলা বলেছে তিন দিনের মাথায় লোকটিকে খুঁজে বের করা হবে। এবং জীবিত অবস্থায় চামড়া তুলে নিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হবে। ক্যানটাবেলার কথায় বিশ্বাস করা যায়, এরা ফালতু কথা কম বলে।

এতরা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই নিচে থেকে এক জন চেঁচিয়ে বলল, 'স্যার, আমরা তিন জনই কি সঙ্গে যাব?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কুকুর সামলাবার জন্যে কেউ থাকবে না। কুকুর দুটো কি চেইন দিয়ে আটকে রাখব?'

'রাখ। সব কিছুই আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে।'

এতরা ভ্রূ কুঞ্চিত করল। যে তিনজন দেহরক্ষী রাখা হয়েছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নস্তরের বলেই এতরার ধারণা। সারাক্ষণ কথাবার্তা বলছে। ফুর্তিবাজের ভঙ্গি। কোথায়ও যখন বের হয় — এমন ভাব করে যেন পিকনিকে যাচ্ছে। ইডিয়েটস। এতরা ভারি গলায় বলল, 'কুকুর বাঁধা হয়েছে?'

'জ্বি, স্যার।'

'ভালো করে বাঁধ। আর শোন, দিনের বেলা এরা যেন বাঁধা থাকে। এদের ছাড়বে সন্ধ্যা সাতটার পর। বুঝতে পারছ?'

'খুব পারছি, স্যার।'

এতরা বিষণ্ন ভঙ্গিতে নিচে নেমে এল। কুকুর দুটো তাকে দেখামাত্র গোঁ গোঁ শব্দে একটা রাগী আওয়াজ করল। এতরার ভ্রূ দ্বিতীয়বার কুঞ্চিত হল। এই কুকুর দুটোকে সে পছন্দ করে না। এদের শীতল চোখের দিকে তাকালেই এতরার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। এরকম একটা ভয়াবহ জীবকে মানুষের বন্ধু নাম দেয়ার কী মানে! এতরা ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। সময়টা তার খারাপ যাচ্ছে। যেসব জিনিস সে পছন্দ করে না তার চারপাশেই এখন সেসব জিনিস। অটোমেটিক অস্ত্র হাতে কয়েক জন নির্বোধ অথচ ভয়াবহ মানুষ। দুটো হিংস্র কুকুর যারা মনিবকে দেখে গোঁ গোঁ শব্দে গর্জন করে। কোনো মানে হয়?

এতরার মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখ হাসি-হাসি — এর মানে ঘরে কেউ লুকিয়ে নেই। তবু একটা ক্ষীণ সন্দেহ থেকে যায়। হয়তো সাব-মেশিনগান হাতে জামশেদ নামের কুকুরটা ঘাপটি মেরে বসে আছে রান্নাঘরে। বিচিত্র কিছুই নয়। ওই কুকুরটার পক্ষে সবই সম্ভব। এতরা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'তোমরা দুজন গিয়ে ভালো করে খুঁজে দেখবে, কেউ কোথায়ও লুকিয়ে আছে কিনা। তারপর গাড়িতে বসে না থেকে বাড়ির চারপাশে ঘুরবে। চোখ-কান খোলা রাখবে।'

'বৃষ্টি পড়ছে, সিনোর।'

'পড়ুক।'

দুজন গম্ভীর মুখে নেমে গেল। কী বিরক্তিকব অবস্থা! স্বাধীনভাবে চলাফেবা কবা যায না। সারাক্ষণ একটা দম বন্ধ কবা আতঙ্ক। এবকম কিছুদিন চললে বোধহয পাগল হযে যেতে হবে।

এতবাব মা ব্যাপাব-স্যাপাব দেখে খুবই অবাক। হচ্ছে কী এসব? তিনি কড়া গলায বললেন, 'তোমার হয়েছেটা কী?'

'কিছুই হয নি। একটু সাবধানে চলাফেবা কবছি। এতে অবাক হবাব কী আছে?'

'হঠাৎ করে এত সাবধানতাবই বা কী আছে?'

এতবা জবাব দিল না। মুখ কালো করে বসে বইল।

'আমাব মনে হয তোমাব ওজনও কমেছে। দশ পাউন্ড ওজন কমেছে।'

'ওজন ঠিকই আছে।'

'মোটেই ঠিক নেই। আমি ওজনেব যন্ত্র আনছি, মেপে দেখ।'

'থাক, মাপতে হবে না।'

'অবশ্যই হবে। কথাব ওপব কথা বলবে না। যা বলছি কব।'

বুড়ি ওজনেব যন্ত্র নিযে এল। দেখা গেল সত্যি-সত্যি আট পাউন্ড ওজন কম।

'সাত দিনে আট পাউন্ড ওজন কমেছে, এব মানে কী?'

'কমেছে আবাব বাড়বে। এ নিযে এত হৈচৈ কেন?'

'ইদানীং তোমাব কোনো শত্রু তৈবি হযেছে কি?'

'নাহ্।'

'ঠিক কবে বল।'

'দু এক জন হযতো আছে, সে তো সবাবই থাকে। দুষ্ট লোকেব অভাব আছে নাকি পৃথিবীতে?'

'তা ঠিক।'

বুড়ি কফি তৈরি কবতে লাগল। ক্রীম মেশাতে-মেশাতে আড়চোখে দু একবাব তাকাল ছেলেব দিকে। এতবাব চোখে কেমন যেন দিশাহাবা দিশাহাবা ভাব। বুড়ি কফির কাপ নামিযে বেখে বলল, 'পৃথিবীতে ভালো লোকও আছে।'

'আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। ঐ বিদেশি লোকটাব কথাই ধব।'

'কাব কথা বলছ!'

'ঐ যে জামশেদ না কী যেন নাম।'

এতবা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'ও ভালো লোক সে ধাবণা তোমাব হল কোত্থেকে?'

'সবাই তো বলছে!'

'সবাই মানে পত্রিকাওয়ালাবা বলছে। ওরা দিনকে বাত কবতে পাবে। একটা খুনী বদমাশকে স্বর্গীয দূত বানিযে দেয।'

'একটা বিদেশি লোক একা-একা যুদ্ধ করছে এটা তোমাব চোখে পড়ে না।'

এতরা কফির কাপে চুমুক দিযে মুখ বিকৃত কবল।

'কি, কথা বলছ না যে?'

'মানুষ মাবাটা কোনো স্বর্গীয দূতেব কাজ না।'

'যাদের মাবছে তাবা কি মানুষ? তারা তো পশুরও অধম।'

এতরা গম্ভীর হয়ে গেল। বাইরে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। বৃষ্টি দেখে মেজাজ আবো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বুড়ি বলল, 'আরেক কাপ কফি দেব?'

'না।'

'চিলি দিয়ে বিন রেঁধেছি, দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে।'

'উহুঁ, আমার কাজ আছে।'

'এই রকম আবহাওয়ায় আবার কীসের কাজ? দুর্যোগের দিনে কাজ থাকে শুধু দুষ্ট লোকের।'

'স্বর্গীয় দূতদের কোনো কাজ থাকে না?'

'তুমি মনে হয় কোনো কারণে লোকটার ওপর রেগে আছ?'

'না, রাগব কেন?'

'লোকটা স্বর্গীয় দূত হয়তো না, কিন্তু বিরল এক জন মানুষ। চার্চে ওর জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে।'

'প্রার্থনা করা হযেছে ?'

'হ্যাঁ।'

এতরা সরু চোখে তাকিয়ে রইল।

'কী প্রার্থনা করা হযেছে ?'

'প্রার্থনা করা হযেছে যাতে তার কোনো বিপদ–আপদ না হয।'

'এক জন ভযঙ্কব খুনীর নিরাপত্তাব জন্যে আজকাল তাহলে গির্জায প্রার্থনাও হয? পবিত্র খ্রিস্টান ধর্মের প্রচুর উন্নতি হযেছে দেখি।'

বুড়ি কিছু বলল না। রান্নাঘরে চলে গেল। লাঞ্চ সেবে বাড়ি ফিবতে–ফিরতে তিনটে বেজে গেল। মেঘ কেটে আকাশ পবিষ্কাব হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। আবামদাযক শীতলতা চারদিকে। এবকম দিনে ঘুমোতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ঘুমানো যাবে না। অনেক কাজ আছে। দেশের বাইবে চলে যাবাব একটা ব্যবস্থা না কবলেই নয। এ বকম আতঙ্কেব সঙ্গে সহবাস করা যায় না। এবচেযে পাসপোর্ট নিযে এক্ষুনি কোনো ট্রাভেল এজেন্সিতে যাওযা দরকাব। যদি সম্ভব হয তাহলে আজ বিকেলেই ইংল্যান্ড চলে যাওযা যায। এখানে আব কিছুদিন থাকলে সত্যি–সত্যি পাগল হযে যেতে হবে।

এতবা ঘরে ঢোকামাত্র তার সেক্রেটাবি বলল, 'স্যাব, আপনাকে এক্ষুনি মিঃ ভিকিব বাড়িতে যেতে হবে। খুব জরুরি।'

'ব্যাপার কী?'

'তা, স্যার, জানা যায নি। মিসেস রুন দুবার টেলিফোন করেছেন। শুধু বলেছেন খুব জরুরি।'

এতরার প্রথমেই মনে হল এটা একটা ট্র্যাপ। কেউ রুনেব মুখের ওপব পিস্তল ধবে টেলিফোন করিযেছে। সস্তা ধবনের ট্র্যাপ, বলাই বাহুল্য। অবশ্যি একটি কিন্তু থেকে যায। দিনে–দুপুরে এ রকম ফাঁদ পাতে না কেউ। ফাঁদ পাতা হয অন্ধকাবে।

'কী রকম জরুরি তাব কোনো আভাসও দেয নি কেউ ?'

'না, স্যার।'

'ঠিক আছে। গাড়ি বের করতে বল।'

'আরেকটি কথা, স্যার।'

'বল।'

'লয়েড ইনস্যুরেন্স থেকে দুজন লোক এসেছিলেন।'

'কী ব্যাপারে?'

'পরিষ্কার করে কিছু বলেন নি। তবে আমার অনুমান, মিঃ ভিকির মেয়ে এ্যানির নিরাপত্তা ইনস্যুরেন্স প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান। তারা আজ সন্ধ্যার পব আসবেন বলে গেছেন।'

'আমি সন্ধ্যার পর কারো সঙ্গে দেখা করি না। ওরা এলে ফিরে যেতে বলবে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

বেল টিপতেই রুন নিজে এসে দরজা খুলল। মনে হল সে এতক্ষণ এতবাব জন্যেই অপেক্ষা করছিল। রুনেব সাজসজ্জা সাধারণ তবু এতেই তাকে অপরূপ লাগছে। পারিবারিক চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ছাপ কোথাও নেই। একটু বোগা হয়েছে তাতে তার বয়স যেন আরো কম লাগছে। এতবা হালকা গলায় বলল, 'কেমন আছ, রুন ?'

'ভালো।'

'একটু মনে হয় ওযেট লুজ কবেছ।'

'তা কবেছি।'

'ভিকি কেমন আছে ?'

'ও ভালো নেই। ওর জন্যেই তোমাকে ডেকেছি।'

'কী হয়েছে ভিকিব ?'

'চল, নিজেই দেখবে।'

ভিকি বাবান্দায় একটি রকিং চেযারে দোল খাচ্ছিল। তার হাতে নেভানো একটা চুরুট। এতবা বলল, 'হ্যালো ভিকি!' ভিকি তাকাল একবার, তাকিযেই দৃষ্টি ফিবিয়ে নিল। এতবা বলল, 'শরীব ঠিক আছে তো, ভিকি?' ভিকি কোনো উত্তর দিল না। তার দৃষ্টি অস্বাভাবিক স্থির। যেন এ জগতেব কোনো কিছুব সঙ্গে তাব কোনো যোগ নেই।

রুন বলল, 'অবস্থাটা বুঝতে পাবছ ?'

'পাবছি, কবে থেকে এবকম হযেছে ?'

'গত রাত থেকে। হঠাৎ করেই অস্বাভাবিক গম্ভীব হযে পড়েছে। কাবো সঙ্গে কোনো কথাবার্তা নেই। কাল সাবা বাত ঘুমায নি। যতবার আমাব ঘুম ভেঙেছে, আমি দেখেছি সে বাবান্দায় বকিং চেযাবে বসে আছে।'

'ডাক্তার দেখিযেছ ?'

'না।'

'দেরি না করে ডাক্তার ডাকা উচিত।'

'আমি বড্ড ভয পাচ্ছি এতবা।'

'ভযেব কিছু নেই। ঠিক হযে যাবে।'

রুন ক্লান্ত স্বরে বলল, 'একটার পব একটা আঘাতে ওব এরকম হযেছে। ওব ব্যবসাটা সম্পূর্ণ নষ্ট হযেছে, জান বোধহয ?'

'না, জানি না।'

'সব জলে গেছে। লিও স্ট্রিটেব বাড়িটাও বিক্রি করতে হযেছে। বাড়ি মর্টগেজড্ ছিল, টাকাপযসাও তেমন পাওযা যায নি।'

এতরা চুপ করে রইল। রুন বলল, 'এস ভেতরে গিযে বসি। কফি খাবে ?'

'খেতে পাবি।'

'তোমাব নিজের স্বাস্থ্যও খুব খাবাপ হয়েছে।'

এতরা ক্ষীণস্বরে বলল, 'নানান ঝামেলা যাচ্ছে।'

'তোমার আবার ঝামেলা কীসের?'

এতরা চুপ করে গেল। রুন কফিব কাপ নামিযে রেখে স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'আমার ধারণা ছিল ভিকির প্রতি আমার প্রেমট্রেম কিছু নেই। ধারণাটা সত্যি নয়। ওকে আমি ভালবাসি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এ্যানির মৃত্যুর পর ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কাব হযেছে। ঠিক এই মুহূর্তে দুটো লোককে আমি ভালবাসি। একজন হচ্ছে ভিকি, অন্য জন হচ্ছে এ্যানিব বিদেশি দেহরক্ষী।'

এতরা কিছু বলল না। রুন থেমে–থেমে বলল, 'ঐ বিদেশি মানুষটার প্রতি আমরা খুব অবিচার করেছি। শেষের দিকে ওকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করেছি। বেশ কযেকবাব চেষ্টা করেছি ওকে চাকরি থেকে ছাড়িযে দিতে!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

এতবা একটা সিগাবেট ধবিযে সরু গলায বলল, 'ঐ বিদেশিব সঙ্গে কি এখন তোমাব কোনো যোগাযোগ আছে ?'

'না।'

'কখনো টেলিফোন কবেও কিছু বলে নি তোমাকে?'

'না। ওরা ভিন্ন ধরনের মানুষ এতবা। নিজেব বিশ্বাসেব জন্যে কাজ কবে। কাবো ধাব ধারে না।'

এতবা উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায বলল, 'আমাকে জরুবি কাজে ইংল্যান্ড যেতে হচ্ছে, রুন। হপ্তাখানেকেব মধ্যে আসব।' রুন কোনো জবাব দিল না। গেট পর্যন্ত এগিযে দিতে এল ঠিকই কিন্তু আগেব মতো যাবাব আগে জড়িযে ধবে চুমু খাওযার কোনো আগ্রহ দেখাল না।

রাত এগারটা ত্রিশ মিনিটে থাই এযাবলাইন্সেব একটি বিমানে কবে এতবা ইটালি ছেড়ে গেল।

রাত বারটার লেট নাইট বুলেটিনে জানানো হল, জামশেদ নামেব বিদেশি দেহরক্ষীটিকে পুলিশ পোর্ট সিটির এক বাড়ি থেকে গ্রেফতাব কবেছে। বাড়িটা শহব থেকে প্রায দেড়শ মাইল দূবে। ফ্রান্সেব সীমান্তে। ইটালি থেকে সে পালাতে চেযেছিল কিনা কে জানে।

১৬

বস ভিকানডিয়াকে রাত আটটার পর জাগাবার নিযম নেই। বছর তিনেক আগে যখন দুটো বড় পরিবারের ভেতর হঠাৎ করে যুদ্ধ বেধে গেল তখনি শুধু তাকে একবাব বাত তিনটেয ঘুম থেকে ডেকে তোলা হযেছিল। ভিকানডিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, 'সব মিলিযে এ পক্ষেব কজন মারা গেছে?' উত্তর শুনে ঘুমুতে গিযেছিল। ভঙ্গিটা এমন -- যেন কিছুই হয নি।

জামশেদের গ্রেফতার হবার খবর সে তুলনায় তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবব নয। কিন্তু তবু কি মনে করে যেন তাকে জাগানো হল। ভিকানডিযা খবব শুনে অত্যন্ত গম্ভীর হযে পড়ল। এটিও তার স্বভাববিরুদ্ধ। ভিকানডিযা কখনো গম্ভীব হয না। তাব বড় ছেলে এবং ছোট মেয়ের জামাই ক্যানটাবেলা পরিবারেব সাথে এক সংঘর্ষে নিহত হয। সে খবর পেযেও ভিকানডিযার কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন হয নি। সহজ স্বরে বলেছিল — 'যে মৃত্যু হঠাৎ করে আসে সে মৃত্যু-সংবাদ হচ্ছে সুসংবাদ। দীর্ঘদিন বোগ ভোগ কবে মবে অভাগারা।'

হযতো ভিকানডিযাব বযস হযে যাচ্ছে। বযস হলেই মন দুর্বল হয। তখন জামশেদেব মতো প্রায তুচ্ছ এক জন মানুষের গ্রেফতাবের সংবাদে মুখ অন্ধকাব হয।

ভিকানডিযা গরম এককাপ কড়া কফি দিতে বলল। ক্যানটাবেলাকে খবব দিতে বলল। বিশেষ জরুবি, যেন এখুনি চলে আসে।

ক্যানটাবেলাকে পাওয়া গেল না। যে কযেকটি জুযাব আড্ডায তাব যাতাযাত সেগুলোব কোনোটাতেই সে নেই। পতিতা পল্লীতে তাকে পাওযাব কথা নয। মেযেদেব ব্যাপাবে তাব উৎসাহ নেই। দুষ্ট লোকের ধাবণা, ক্যানটাবেলা পুরুষত্বহীন। এবকম হাতিব মতো জোযান একটি লোককে নিযে এ জাতীয অপবাদ কী কবে বটে কে জানে।

ভিকানডিযা বাত দুটোয আবাব খোঁজ কবল— ক্যানটাবেলাকে পাওযা গেছে কিনা। না, পাওযা যায নি। সব কটা নাইট ক্লাবে দেখা হযেছে। শহবেব ভেতবেব ব্রথেলগুলোতেও দেখা হচ্ছে। ভিকানডিযা গম্ভীব মুখে বলল, 'ফাজিনকে আসতে বল।'

ফাজিন ভিকানডিযাব ভাইযেব ছেলে। ভিকানডিযাব মৃত্যুব পব এ পবিবাবেব অনেক দাযিত্ব ফাজিনেব ওপব বর্তাবে। সেই হিসেবে ফাজিনেব গুরুত্ব অনেকখানি। ভিকানডিযা এমন সব জিনিস নিযে ফ.জিনেব সঙ্গে কথা বলেন যা কোনো মাফিযা বস কখনো কবে না। তাছাড়া ফাজিন ভিকানডিযাব বাড়িব একতলাতে থাকে। এটিও একটি অদ্ভুত ব্যাপাব। কোনো বস পবিবাবেব কোনো গুরুত্বপূর্ণ সদস্যেব সঙ্গে এক বাড়িতে থাকে না।

ফাজিন ঘুমোচ্ছিল। সে হাত-মুখ ধুযে কাপড় বদলাল। এত বাতে যখন তাকে ডেকে তোলা হযেছে তখন নিশ্চযই জরুবি কিছু হযেছে। হযতো এক্ষুনি বেরুতে হবে। তৈরি হযে যাওযাই ভালো।

'চাচা, আমাকে ডেকেছেন ?'

'হুঁ, বস। জামশেদ গ্রেফতাব হযেছে, শুনেছ ?'

'জ্বি।'

'এই প্রসঙ্গে তোমাব মতামত কী?'

ফাজিন বুঝতে পাবল না ঠিক কী জানতে চাচ্ছে ভিকানডিযা। জামশেদ গ্রেফতাব হযেছে, এর আবাব মতামত কী!

'মনে হচ্ছে এ-ব্যাপাবে তোমাব কোনো মতামত নেই।'

'আমি বুঝতে পাবছি না আপনি কী জানতে চাচ্ছেন।'

'বুঝতে না পাবাব তো কিছু নেই। আমি সহজ ইটালিযান ভাষাতেই প্রশ্ন কবছি। নাকি মাতৃভাষা ভুলে গেছ ?'

ফাজিন চুপ করে বইল। ভিকানডিযা গম্ভীর গলায বলল, 'সমস্ত ব্যাপাবটাই যে বানানো, তুমি বুঝতে পারছ না?'

'বানানো?'

'তোমাকে যতটা বুদ্ধিমান আমি ভাবতাম ততটা বুদ্ধিমান তুমি নও।'

ফাজিন চোখ নামিয়ে নিল। ভিকানডিয়া একটা চুরুট ধরিয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'সমস্ত ব্যাপারটাই পুলিশের একটা চাল। একটা বড় রকমের ধাপ্পাবাজি।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'যে লোকটিকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না ইটালিয়ান পুলিশ ফট করে তাকে গ্রেফতাব করে ফেলল? আমাদের পুলিশ এত কর্মদক্ষ কোনো কালেই ছিল না।'

'এ রকম একটা চাল দেবার পিছনে যুক্তিটি কী?'

'খুব সহজ যুক্তি। আমাদের বিভ্রান্ত করা। পুলিশের ভেতর কিছু-কিছু অর্বাচীন ছোকরা ঢুকে গেছে যারা আমাদের কেঁচোর মতো ঘেন্না করে। জামশেদকে গ্রেফতারেব খবর এইসব ছোকরারাই ছড়িয়েছে। যাতে আমরা অসতর্ক হই এবং আমবা আরো কযেক জন মারা পড়ি। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'ওরা দেখাতে চায যে মাফিয়ারা সর্বেসর্বা নয। আমার মনে হয ঐসব অর্বাচীন ছোকরাদের একটা শিক্ষা দেয়া দরকার।'

'কী রকম শিক্ষা দিতে চান ?'

'ওদের মধ্যে বিনালো নামে এক ছোকবা আছে যে নিজেকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলে মনে করে। তাকে নিশ্চয়ই চেন?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'ওর দুটো মেয়ে আছে — যমজ। ঐ দুটো মেযেব একটাকে কাল দুপুবেব আগেই মেরে ফেলবে এবং বিনালোকে টেলিফোন কবে মিষ্টি গলায বলবে ভবিষ্যতে যেন সে আরো সাবধানে কাজকর্ম করে। তাকে বলবে, সবাইকে সন্তুষ্ট বাখাব ক্ষমতা একটি ভালো ক্ষমতা।'

ফাজিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আপনি যা বলছেন তা কবা হবে, কিন্তু তা কবাব আগে আমাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত যে জামশেদেব গ্রেফতাবেব ব্যাপাবটা একটি ধাপ্পা। হযতো সে সত্যি-সত্যি গ্রেফতাব্ হযেছে।'

'সে গ্রেফতার হয নি। আব না হলেও কিছু যায আসে না। ঐ ছোকবাকে একটু ভড়কে দেযা দরকার।'

'ঠিক আছে। আমি কি এখন উঠব?'

'হ্যাঁ। রাতদুপুবে অকাবণে আমাব সামনে বসে থাকাব কোনো কাবণ দেখি না।'

জামশেদকে রাখা হযেছে কড়া পাহারায। কিন্তু তাকে মোটেই ভযাবহ মনে হচ্ছে না। বরং ফুর্তিবাজ ধবনের লোক বলেই মনে হচ্ছে। ক্রমাগত কফি খাচ্ছে, চুরুট টানছে। জিপসী মেয়েদের নিয়ে চমৎকাব অশ্লীল বসিকতা কবে সবাইকে হাসিযেছে। কে বলবে এই সেই ভযাবহ লোক। যে অফিসার তাকে গ্রেফতার কবেছে সে ক্রমেই চিন্তিত হতে শুরু করল। কোথাযও ভুল হয নি তো?

ভুল হবার কথা অবশ্যি নয। সে গভীব বাতে একটি টেলিফোন পেযে দলবল নিযে ছুটে গেছে। ফোন কলটা ছিল সংক্ষিপ্ত — জামশেদ অমুক ঠিকানায বাত কাটাবে। আপনাবা ঘণ্টাখানেকেব মধ্যে এলে তাকে ধবতে পাববেন। সে তখুনি নযজনেব একটি স্কোযাড নিয়ে গিয়েছে। আর সত্যি-সত্যি আউট হাউসে একজনকে পাওযা গেছে। কম্বল মুড়ি দিযে ঘুমোচ্ছিল।

তাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস কবা হল, 'কি নাম ?'

লোকটি বলল, 'জামশেদ।'

'দেশ?'

'বাংলাদেশ।'

'তুমিই কি সেই বিখ্যাত জামশেদ?'

'বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আমিই সেই লোক।'

'তোমাব সঙ্গে অস্ত্র–টস্ত্র কী আছে?'

'আপাতত একটা বার ইঞ্চি ড্যাগাব ছাড়া কিছু নেই।'

'তোমাকে গ্রেফতাব কবা হল।'

'ভালো কথা। এতে কি তোমাব প্রমোশনেব কোনো সুবিধা হবে ?'

গ্রেফতাবেব ঘটনাটা এক ঘণ্টাব ভেতব চাবদিকে ছড়িযে পড়ল। পুলিশ কমিশনাব বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেবাব জন্যে আদেশ দিলেন। পুলিশী তদন্ত সম্পূর্ণ না হওযা পর্যন্ত কোনো পত্রিকা, বেডিও বা টিভি ইন্টাবভ্যু যেন না দেযা হয সে বকম নির্দেশ দেযা হল। তদন্তকাবী অফিসাব হিসেবে নিযোগ কবা হল হমিসাইড ইন্সপেক্টব বিনালো ও কিনসিকে। এদেব পাঠান হল পোর্ট সিটিতে।

বিনালো এসে পৌছল ভোব ছটায। তাব সঙ্গে জামশেদেব কথাবার্তা হল এ বকম—

বিনালো : তুমি জামশেদ ?

জামশেদ : হ্যাঁ।

বিনালো : জামশেদ যখন হাসপাতালে ছিল তখন প্রাযই তাব সঙ্গে দেখা কবতে যেতাম আমি। তোমাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

জামশেদ : (নিশ্চুপ)।

বিনালো : তোমাব নাম কি?

জামশেদ : নিশ্চুপ।

বিনালো : এই কাণ্ডটি কেন কবেছ ?

জামশেদ : নিশ্চুপ।

বিনালো : তোমাব নিজেব বুদ্ধিতেই কবেছ, না অন্য কাবোব বুদ্ধিতে?

জামশেদ : নিজেব বুদ্ধিতে। আসল জামশেদকে সাহায্য কববাব জন্যে কবেছি।

বিনালো : তোমাব ধাবণা এতে তাব সাহায্য হবে?

জামশেদ : হ্যাঁ, আমাব তাই ধাবণা।

বিনালো : তুমি একটি মহাবেকুব। তুমি যে কী পবিমাণ জটিলতাব সৃষ্টি কবেছ সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধাবণা নেই।

বিনালো মহাবিবক্ত হযে উঠে দাঁড়াল। ঠিক তখনই এল টেলিফোন। মিহি সুবে একজন বলল, 'ভিকানডিযা আপনাকে গভীব সমবেদনা জানাচ্ছেন। এবং আশা কবছেন আপনি ভবিষ্যতে এমন কিছু কববেন না যাতে এ জাতীয দুঃখ আপনাকে আবো পেতে হয।'

বিনালো কিছুই বুঝতে পাবল না। তাব যমজ মেযেদেব একটি মারা গেছে গাড়িব নিচে চাপা পড়ে, এই খবর তখনো তার কাছে এসে পৌছায নি।

১৭

ক্যানটারেলা কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। এটা কি স্বপ্ন? না চোখে ভুল দেখছে? সন্ধ্যা থেকে এ পর্যন্ত তিন–চার পেগ হুইস্কি খেয়েছে শুধু। এতে তার কোনো নেশা হয় না। কিন্তু নেশা ছাড়া এ রকম একটি দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। ক্যানটারেলা দেখল তার সোফায় একজন কে বসে আছে। ঘর অন্ধকার। তবু বোঝা যাচ্ছে লোকটার হাত খালি নয়। লোকটি বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ ?'

'হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ?'

'ভালো। তুমি ভালো আছ, ক্যানটারেলা?'

'ভালোই আছি। এ জায়গার ঠিকানা কোথায় পেলে, জামশেদ?'

'বলছি। তার আগে তুমি পকেট থেকে তোমার ছোট্ট মিসিমার পিস্তলটা আমার পায়ের কাছে ফেলে দাও। অন্য কিছুই করতে চেষ্টা করবে না।'

ক্যানটারেলা পিস্তলটা বের করে ছুড়ে দিল। মৃদুস্বরে বলল, 'তুমি ওস্তাদ লোক, জামশেদ। সাহসী ও বুদ্ধিমান। দুটো জিনিস এক সঙ্গে হয় না। সাহসী লোকরা হয় বোকা। আমি বুদ্ধিমান, সে কারণেই আমার সাহস কম। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি এক পেগ হুইস্কি খেতে চাই। আমার চিন্তা করবার শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' ক্যানটারেলা অনুমতির অপেক্ষা না করেই দক্ষিণের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। ছোট্ট একটা ঘরোয়া ধরনের বার আছে সেখানে।

'জামশেদ, তুমিও কি একটু চেখে দেখবে ?'

'মদ খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

'এ রকম একটা পরিস্থিতিতে খাওয়া উচিতও নয়। ভালো কথা, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে ? কথাবার্তা খোলাখুলি হওয়া প্রয়োজন।'

জামশেদ ভারি গলায় বলল, 'না, তোমাকে আমি মারব না।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি অনেক খোঁজখবর নিয়েছ। কাজেই আমি নিশ্চিত ছিলাম এ্যানির অপহরণ এবং মৃত্যুর ব্যাপারে আমার ভূমিকার কথা তুমি জান।'

'আমি জানি।'

'কতটুকু জান?'

'আমি জানি তুমি প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা করেছ। এ্যানির মৃত্যুর খবর পেয়ে তুমি ছুটে গিয়েছিলে এতরাকে গুলি করে মারবার জন্যে। ভিকানডিয়া হস্তক্ষেপ না করলে এতরা সেই রাতেই মরত।'

'হ্যাঁ, তুমি অনেক খবরই রাখ। তবে আমি নিজে এতরাকে মারবার জন্যে যাই নি। লোক পাঠিয়েছিলাম। নিজের হাতে আমি মানুষ কখনো মারি নি। আমার সাহস কম।'

জামশেদ বলল, 'আমি কয়েকটি জিনিস তোমার কাছ থেকে জানতে চাই।'

'আমার মনে হয় না আমি তোমাকে কিছু বলব।'

'বলবে। আমি জানি মানুষের কাছ থেকে কী করে কথা আদায় করতে হয়।'

'তোমার কায়দাটা কী?'

'খুব সহজ কায়দা, ক্যানটারেলা। আমি চুলের কাঁটা দিয়ে তোমার বাঁ চোখটি উপড়ে তুলে ফেলব। আমার ধারণা তা করবার আগেই তুমি কথা বলা শুরু করবে।'

'তা ঠিক। সত্যি কথা বলতে কি আমি এখুনি কথা বলতে চাই। কী জানতে চাও?'

'মূল পরিকল্পনাটি কার ?'

'বস ভিকানডিযার। তবে পরিকল্পনাটা কার্যকরী করেছে ফাজিন। এরা দুজনেই ঘটনাব মূল নাযক। এতরা হচ্ছে খল নাযক।'

'এখন বল কীভাবে ভিকানডিযাকে হত্যা কবা সম্ভব। কীভাবে তাব কাছে যাওযা যায।'

'বলছি। তাব আগে তুমি কি দযা করে বলবে এ বাড়িব ঠিকানা কী করে পেলে? বস ভিকানডিযা এবং তাব লোকজনবা পর্যন্ত এ বাড়িব ঠিকানা জানে না। আমি যখন পালিযে থাকতে চাই তখনই শুধু এ বাড়িতে আসি।'

জামশেদ ভাবি গলায বলল, 'আমাকে এ শহরেব অনেকেই এখন সাহায্য কবতে চায। অচেনা লোকজনের কাছ থেকেও এখন আমি খববাখবর পাই।'

'তুমি খুবই ভাগ্যবান, জামশেদ। তবে আজ তোমাব ভাগ্যটা খাবাপ।'

ক্যানটারেলাব কথা শেষ হবাব আগেই জামশেদ ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কখন যে অন্ধকাবে দুজন মানুষ সিঁড়ি বেযে উঠে এসেছে জামশেদ কিছুই বুঝতে পাবে নি। ক্যানটাবেলা বলল, 'ওকে ভালো করে বেঁধে ফেল।'

'ঠিক আছে, স্যাব।'

'জ্ঞান আছে কি?'

'না, জ্ঞান নেই। নাক দিযে বক্ত পড়ছে।'

'নিচেব ঘরে নিযে বন্ধ করে বাখ। আব একজন ডাক্তাব ডাক।'

'ডাক্তার?'

'হ্যাঁ ডাক্তাব। কাবণ আমি এক জন ভদ্রলোক। আব একটি কথা, তোমরা আসতে এত দেবি কবলে কেন? আমি তো ঘবে মানুষ দেখেই বেল টিপলাম।'

'দেবি কবি নি, স্যাব। আমবা সঙ্গে সঙ্গেই এসেছি, সুযোগেব অপেক্ষা করছিলাম।'

'ভালো। খুব ভালো। তোমবা ভালো পুবস্কাব পাবে।'

ক্যানটাবেলা এগিযে গিযে খানিকটা নির্জলা হুইস্কি ঢালল গলায।

জামশেদেব জ্ঞান ফিবল ঘণ্টাখানেকেব মধ্যে। সে তাকাল চাবদিকে। ছোট্ট একটি ঘব। সে শুযে আছে বিছানায। তাব গাযে একটি পবিষ্কাব চাদব। মাথাব কাছে চল্লিশ পাওযাবেব একটি বাল্ব জ্বলছে। পাযেব কাছে ছোট্ট একটি টেবিলে এক জগ পানি। শক্ত লোহাব দবজা। ভাবি দুটো তালা ঝুলছে সেখানে। এ ঘব থেকে বেব হওযা সম্ভব নয। জামশেদ কযেকবার ডাকল, 'কেউ আছে এখানে?' কোনো সাড়া পাওযা গেল না। জামশেদ ঢকঢক করে পুবো জগ পানি খেযে ঘুমুতে গেল। বড় ঘুম পাচ্ছে।

ভিকানডিযাব সঙ্গে ক্যানটাবেলাব দেখা হয পবদিন সকাল দশটাব দিকে। ভিকানডিযা গর্জে উঠল 'কোথায ছিলে কাল সাবা বাত? সমস্ত শহব চষে ফেলা হযেছে তোমাব জন্যে!'

ক্যানটাবেলা চুপ করে বইল। ভিকানডিযা বলল 'ঘটনা খুব দ্রুত ঘটছে, বুঝতে পারছ তো?'

'পাবছি।'

'পুলিশ জানিযেছে ওবা যে লোকটাকে ধবেছে সে জামশেদ নয।'

'ভোববেলাব খববেব কাগজে তাই পড়লাম।'

'এখন আমাদেব কাজ কি বুঝতে পাবছ? যেভাবেই হোক জামশেদকে ধবা।'

ক্যানটাবেলা শান্ত স্ববে বলল, 'সে যদি এ শহবে থাকে তাহলে ধবা পড়বেই।'

'তোমার ধারণা সে এ শহবে নেই?'

'এ বিষযে আমাব কোনো ধাবণা নেই।'

'শহর থেকে বেরুবার সব ক–টা পয়েন্টে আমাদের লোক থাকবে। এবং আমাদের আরেকটি কাজ করতে হবে। জামশেদেব ছবি বড় করে ছাপিয়ে সমস্ত শহরময় ছড়িযে দিতে হবে।'

'ছবি পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ, ছবি জোগাড় হযেছে। ছবির নিচে লেখা থাকবে "ওকে ধরিযে দিন"।'

'তাতে কোনো লাভ হবে না। এ শহরেব লোকজন ওকে ধরিযে দেবে না।'

ভিকানডিয়া সরু গলায বলল, 'তোমাব বুদ্ধিবৃত্তির ওপব থেকে আমার আস্থা কমে যাচ্ছে। আমরা শুধু ছবিই ছাপব না। ছবির সঙ্গে এ–ও লিখে দেব, একে ধবিযে দিতে পারলে পঁচিশ হাজার ইউ এস ডলাব পুরস্কাব দেযা হবে। পুরস্কাবেব টাকাটা আমরা একটা ব্যাংকে জমা করে দেব। তাও লেখা থাকবে।'

ক্যানটাবেলা চুপ কবে রইল। ভিকানডিযা বলল, 'তোমাব ধাবণা এতে কাজ হবে?'

'হতে পারে।'

'সন্দেহ থাকলে টাকার পবিমাণ বাড়িযে পঞ্চাশ হাজাব ইউ এস ডলাব কবে দাও। টাকায সবই হয।'

'তা হয।'

'আমি এই ঝামেলাব দ্রুত নিষ্পত্তি দেখতে চাই।'

'আমবাও চাই, ভিকানডিযা।'

১৮

টুনটুন করে ডোর–বেল বাজছে।

এতরাব ভ্রূ কুঞ্চিত হল। কে হতে পাবে? বাত প্রায নটা। রুম সার্ভিস হবে না নিশ্চযই। দবজার পিপ–হোল দিযে যে লোকটিকে দেখা যাচ্ছে, সে বৃটিশ। অত্যন্ত ভদ্র চেহারা। এ তার কাছে কী চায?

এতবা দরজা খুলতেই বাইরে দাঁড়ানো লোকটি বলল, 'আপনাকে বিবক্ত করবাব জন্যে আন্তবিক দুঃখিত।'

'কে আপনি?'

'বলছি। তার আগে ভেতবে এসে বসতে পাবি কি?'

'আমাব পক্ষে বেশি সময দেযা সম্ভব নয। আমি আজ সকালেই ইংল্যান্ড এসে পৌছেছি। অসম্ভব ক্লান্ত।'

'আজ সকালে এসেছেন। কথা ঠিক নয, মিঃ এতবা। আপনি এসেছেন পবশু। আমি ভেতরে আসতে পারি?'

'আসুন।'

ভদ্রলোক ভেতরে এসেই বললেন, 'আমি হচ্ছি লয়েড ইনস্যুবেন্সের এক জন তদন্তকারী অফিসার। আমার নাম রেমণ্ড কীন।'

এতরা কিছু বলল না। লোকটি অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে সোফায বসে হাসিমুখে বলল, 'এ্যানি নামের একটি মেযের ইনস্যুরেন্স পলিসিব ব্যাপারে আপনাকে দু একটি কথা জিজ্ঞেস কবব। অবশ্যি আপনি যদি অনুমতি দেন।'

'আপনি কী করে জানলেন যে আমি এখানে আছি? আমার ঠিক এই মুহূর্তে এখানে থাকার কথা নয়।'

'মিঃ এতবা, এটা জানাব জন্যে আমাদেবকে শার্লক হোমস্ হবাব প্রযোজন হয না। আপনাব সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে দুজন গিযেছিলেন ইটালি। তাঁবা ট্রাভেল এজেন্টেব মাধ্যমে জেনেছে আপনি ইংল্যান্ডের টিকিট কেটেছেন। আমি তাই এখানকাব হোটেলগুলিতে খোঁজ কবেছি। আপনি যদি অন্য কোনো নামে হোটেল রিজার্ভেশন করতেন, তাহলে অবশ্যি আমাব পক্ষে খুঁজে বেব কবা সম্ভব হত না।'

'আমি অন্য নামে সিট রিজার্ভ কবব কেন ?'

'কথার কথা বলছি, মিঃ এতবা। অবশ্যি ইচ্ছা থাকলেও আপনি তা পাবতেন না; কাবণ হোটেল সিট রিজার্ভেশনেব সময বিদেশি নাগবিকদেব পাসপোর্ট দেখাতে হয।'

এতবা সিগারেট ধরাল। তাব কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমছে।

'মিঃ এতবা, এখন কি আমি দু একটা কথা জিজ্ঞেস কবতে পাবি?'

'না, এখন পাবেন না। আমি খুবই ক্লান্ত। আপনাকে কাল আসতে হবে। বাত নটা আলোচনাব জন্যে ভালো সময নয়।'

রেমন্ড কীন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'আমি কাল সকালে আসব। বিবক্ত কববাব জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত।'

'দশটাব পব আসবেন। আমি অনেক দেবি কবে উঠি।'

'আমি আসব ঠিক সাড়ে দশটায। ইটালি সম্পর্কে কিছু গল্পগুজবও কবা যাবে।'

'ইটালি সম্পর্কে গল্পগুজব কবাব কিছু নেই।'

'থাকবে না কেন? আমি দুদিন আগেব খবব জানি। সেখানে জামশেদ নামেব একটি লোক গ্রেফতাব হযেছে পুলিশেব কাছে। এ নিযে ইটালিতে তুমুল উত্তেজনা।'

এতবা চাপাস্বরে বলল, 'জামশেদ গ্রেফতাব হযেছে?'

'হ্যাঁ, হযেছে। আমবা জামশেদেব ব্যাপাবেও উৎসাহী। এ্যানিব ইনস্যুবেন্সেব ব্যাপারে তাকেও দবকাব। কাজেই আমবা ওব ব্যাপাবে খোঁজখবব বাখাব চেষ্টা কবছি। মিঃ এতবা।'

'বলুন।'

'আমাব কেন যেন মনে হচ্ছে আপনিও জামশেদেব ব্যাপাবে বেশ উৎসাহী।'

'না, আমি উৎসাহী নই। আমি উৎসাহী হব কী জন্যে ?'

'ও, সবি। আমাবই ভুল হযেছে। আচ্ছা, মিঃ এতবা, আমবা কাল ভোবে কথা বলব।'

'দশটাব পব।'

'ঠিক সাড়ে দশটায আমি আসব। গুড নাইট।'

এতবা টেলিফোনে রুম-সার্ভিসকে কফি দিতে বলল ; তাব দুমিনিট পবেই বলল কফি দেবাব প্রযোজন নেই। তাব কিছুই ভালো লাগছে না। তাব কেন জানি প্রচণ্ড ভয কবতে লাগল। ইংল্যান্ডে আসাব পবিকল্পনাটি কাঁচা। তাব উচিত ছিল দেশেই থাকা। দেশে নিবাপত্তার ব্যবস্থা আবো জোবদাব কবা যেত।

এখন ফিবে গেলে কেমন হয? কাল সকাল দশটার আগেই হাওযা হযে গেলে মন্দ হয না। ইনস্যুবেন্স কোম্পানিব ঐ ছাগলটিব সঙ্গে কোনো কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে না।

এতরা বাত তিনটায হোটেল ছেড়ে বেবিযে এল। ভোব সাড়ে চাবটায ফ্রান্সেব কনকর্ডের একটি টিকিট পাওযা গেছে। সেখান থেকে বাসে করে ইটালি চলে যাওযা যাবে। ভালো লাগছে না, কিছুই ভালো লাগছে না।

১৯

জামশেদ সমস্ত দিন শুয়ে রইল।

প্রচণ্ড খিদে। কিন্তু কোনো খাবার নেই। এক জগ পানি ছিল তা শেষ হয়েছে অনেক আগেই। জামশেদের শুয়ে থাকা কিংবা বসে বসে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। চুপচাপ বসে থাকার ব্যাপারটি খুবই বিবক্তিকব। জামশেদ ঘুমুতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘুম আসছে না। স্নায়ু উত্তেজিত। সে মনে মনে পরবর্তী পরিকল্পনা ঝালিয়ে নিতে গিয়ে বাধা পেল। পরবর্তী পরিকল্পনা করাও অর্থহীন। এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। অলৌকিক কোনো ব্যাপাব বা সৌভাগ্য এসব জিনিসে জামশেদেব বিশ্বাস নেই। কাজেই পরবর্তী কোনো পরিকল্পনা তৈরিব আগে বরং মৃত্যুব জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নেয়াই ভালো।

কী হয় মৃত্যুর পর? মৃত্যুব ওপাবেও কি কোনো জগৎ আছে? সুখী কোনো ভুবন? যেখানে কষ্ট নামক ব্যাপারটি নেই। ক্ষুধাব কষ্ট নেই। গ্লানি ও বঞ্চনার কষ্ট নেই। আনন্দ ও উল্লাসের একটি অপরূপ ভুবন। ভাবতে-ভাবতে জামশেদের ঘুম এসে গেল। অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখল সে।

যেন এ্যানি ছুটতে-ছুটতে আসছে, তাব বন্ধ ঘবের সামনে দাঁড়িযে বলছে, 'এই ভালুক, তুমি এখানে আটকা পড়ে আছ কেন?'

'বুদ্ধির দোষে আটকা পড়েছি।'

'এমন বোকা কেন তুমি?'

এ্যানি মাথা দুলিয়ে খুব হাসতে লাগল। বিনবিনে মিষ্টি গলাব হাসি। ঘুম ভেঙে উঠে বসল জামশেদ।

এখন কি দিন না বাত বোঝার উপায় নেই। ঘবে সব সময বাতি জ্বলছে। কোনো রকম শব্দ-টব্দও কানে এসে পৌঁছাচ্ছে না। ক্ষুধার তীব্রতাও ক্রমে-ক্রমে মবে যাচ্ছে। তাব মনে হচ্ছে এই ঘরে সে আছে আটচল্লিশ ঘণ্টাবও বেশি সময ধবে। ত্রিশ ঘণ্টা পাব হলে খিদে মরে যায। শুধু তৃষ্ণা থাকে। তৃষ্ণাও কমে আসে পঞ্চম দিনে।

না খেযে থাকাব অভিজ্ঞতা জামশেদেব আছে। একবাব সে এবং বেন ওযাটসন না খেযে সাতদিন ছিল। সেটা ছিল একটি ছেলেমানুষি ব্যাপাব। বেন ওযাটসন একদিন বলল, 'জাম্‌স, একটা বাজি ধবলে কেমন হয ?'

'কীসের বাজি ?'

'না খেযে থাকাব বাজি। কে বেশি সময থাকতে পাবে।'

'কত টাকা বাজি?'

'পঞ্চাশ ইউ এস ডলাব।'

'ঠিক আছে।'

বেন ওযাটসনের কাজই হচ্ছে বাজি ধবা। সব কিছুতেই সে একটা বাজি ধবে ফেলবে। এবং অবধাবিতভাবে হারবে। না খেযে থাকার বাজিতেও তাই হল।

ত্রিশ ঘণ্টাব মাথায ওযাটসন পঞ্চাশ ডলাবেব নোট এনে মুখ কালো কবে বলল, 'আবার হারলাম। এস এবার খানাপিনা কবা যাক।'

জামশেদ বলল, 'তুমি খাওযাদাওযা কব। আমি দেখতে চাই না-খেযে কতদিন থাকা যায়।'

'আর দেখাদেখি কি, তুমি তো জিতবেই।'

'বাজি-টাজি না। পরীক্ষা করতে চাই, না-খেযে কতদিন থাকা যায।'

জামশেদ ঝুলে রইল সাতদিন পর্যন্ত। বেন ওয়াটসন চিন্তায় চিন্তায় অস্থির। সামান্য বাজি ধরা থেকে এ কী ঝামেলায় পড়া গেল! শেষমেষ পাঁচশ ডলাব সাধাসাধি, যেন জামশেদ কিছু–একটা মুখে দেয়। ইস্, কী সব দিন গিয়েছে!

সে বিছানায় উঠে বসল। আবাব শুয়ে পড়ল। উঠে বসা এবং শুয়ে থাকা এ দুটি মাত্রই কাজ তার। প্রথম দিকে খানিক হাঁটাহাঁটি কবা যেত। এখন আব যায় না। শোয়ামাত্রই ঝিমুনি এসে গেল জামশেদেব। আব প্রায তাব সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল এ্যানি দবজাব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাব মুখ কেমন যেন বিষণ্ন। কথা বলছে টেনে টেনে।

'বুড়ো ভালুক।'

'উঁ।'

'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'তা হচ্ছে, এ্যানি।'

'মানুষেব এত কষ্ট কেন, বুড়ো ভালুক?'

'কি জানি এ্যানি।'

'আমি কাবোর কষ্ট দেখতে পাবি না। খুব কান্না পায।'

জামশেদের মনে হল এ্যানি কাঁদতে শুরু করেছে। সে হাত বাড়াল এ্যানিকে সান্ত্বনা দিতে, তখনি তন্দ্রা কেটে গেল। আবাব সেই আগেব ছোট্ট ঘর। চল্লিশ পাওয়ারেব হলুদ একটা বাতি। জামশেদেব পেটে পাক দিয়ে উঠল। বমি হবে বোধহয। হয, এ বকম হয। একটা সময আসে যখন শবীব বিদ্রোহ করতে শুরু করে। চোখ কিছু দেখতে চায না। পা চলতে চায না। মস্তিষ্ক স্থবিব হযে আসে। জামশেদ মেঝেতে বমি কবল।

বস ভিকানডিযা ঠাণ্ডা স্ববে বলল, 'একটা লোক হাওযা হযে যেতে পাবে না।'

ফাজিন জবাব দিল না।

'লোকটি নিশ্চযই কোন মন্ত্র–টন্ত্র জানে না। নাকি তোমবা বলতে চাও সে অলৌকিক ক্ষমতাধর কোনো মানুষ।'

সে খুব সম্ভব ইটালিতে নেই।

'ইটালিতে থাকবে না তো যাবে কোথায ?'

'ইটালিতে এমন কোনো জাযগা নেই যেখানে তাকে খোঁজা হয নি, আমাব ধাবণা সে জীবিত নেই।'

'এবকম ধাবণা হবাব কাবণ কি ?'

'কোনো কাবণ নেই, আমাব মনে হচ্ছে এবকম।'

'কাবণ ছাড়াই যাবা বিভিন্ন জিনিস ভাবে ওবা ছাগল সম্প্রদাযভুক্ত বলেই আমি মনে কবি।'

ফাজিন কিছু বলল না। ভিকানডিযা তিক্ত স্ববে বলল, 'ওব বন্ধু ওযাটসন কী বলছে?'

'ও কিছুই বলছে না।'

'বলাবাব চেষ্টা কবেছ ?'

'হ্যাঁ, করেছি। পেন্টাথল ইনজেকশন দিযে জিজ্ঞাসাবাদ কবা হযেছে। ও কিছু জানে না। জানলে বলত।'

'কী বলে সে?'

'সে বলে যে ওব সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেযে জামশেদ ওব সঙ্গে দু বাত ছিল।'

'সেই দু বাতে ওদেব মধ্যে কী কথাবার্তা হযেছে ?'

'বিশেষ কোনো কথাবার্তা হয নি। জামশেদ কথা বলে কম।'

ভিকানডিয়া চুরুট ধরাল। ফাজিন বলল, 'ওয়াটসনকে নিয়ে এখন কী করব?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? এইসব ছোট জিনিস নিয়ে কেন তোমরা আমাকে বিরক্ত কর? যদি দেখ ওকে ধরে রেখে আর কোনো লাভ নেই তাহলে আপদ বিদেয় কর। বস্তায় ভর্তি করে ফেলে দাও সমুদ্রে।'

ভিকির অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে। খাওয়াদাওয়া বন্ধ। রাতে ঘুমুতে পারে না। সমস্ত রাত বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকে। রুন দিশাহারা হয়ে গেল। ডাক্তাররা তেমন কিছু ধরতে পারেন না। মানসিক অসুস্থতার কোনো লক্ষণ নেই। ডাক্তারদের সঙ্গে কথাবার্তা সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো। কিন্তু রুনের সঙ্গে কথা বলার সময় কথা জড়িয়ে যায়। একটি কথা শুরু করে অন্য একটি কথায় চলে যায়। রুন কয়েকবার চেষ্টা করেছে ভিকিকে নিয়ে সুইজারল্যান্ডের দিকে যেতে। বাইরে গেলে হয়তো অন্য রকম হবে। আবার হয়তো ভিকি আগের মতো হয়ে উঠবে।

ভিকির ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে — তাতে কিছুই যায় আসে না। ব্যবসা আবার হবে। রুনের নিজের যথেষ্ট টাকা আছে। কোনো কিছু না করেই সে টাকায় নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। অবশ্যি পুরুষমানুষ বসে থাকতে পারে না। পুরষমানুষদের কিছু-একটা করতে হয়। কাজেই আবার যাতে ভিকি উঠে দাঁড়াতে পারে রুন সে চেষ্টা করবে।

'রুন।'

রুন দেখল ভিকি উঠে আসছে। পা ফেলছে এলোমেলোভাবে।

রুন এগিয়ে গিয়ে ভিকিকে ধরে ফেলল। 'একটা অন্যায় করেছি, রুন তোমাকে আজ সেটা বলতে চাই।'

রুন বলল, 'অন্যায় করে থাকলে করেছ। আমরা সবাই কখনো-না-কখনো ভুল করি।'

'আমি যা করেছি সেটা তোমার শোনা দরকার।'

'আমি কিছুই শুনতে চাই না। আমি চাই তুমি আগের মতো হও।'

'রুন প্লিজ, আমার কথা শোন।'

'না, কোনো কথা শুনতে চাই না আমি।'

রুন ভিকিকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরল। ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল ভিকি।

'জামশেদ তুমি কি বেঁচে আছ?'

২০

জামশেদ চোখ মেলল। পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। সব কেমন ঘোলাটে লাগছে।

'আমি ক্যানটারেলা। তোমার জন্যে খাবার এনেছি। নাও, খাও। প্রথম খাও ফলের রস। তারপর দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। শরীরে একটু শক্তি হোক; আমি আবার আসব।'

জামশেদ কথাবার্তাও ঠিক বুঝতে পারছে না। তবুও সে উঠে বসতে চেষ্টা করল।

'নড়াচড়া করবে না, শুয়ে থাক। আমি দুঃখিত যে তোমাকে ছ দিন না খেয়ে থাকতে হল। উপায় ছিল না। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেলেই তোমাকে ওরা খুঁজে বের করে ফেলত। তবে আমি জানতাম ছ দিনে তোমার কিছুই হবে না।'

ক্যানটারেলা কমলার রস জামশেদের মুখের কাছে ধরল। মৃদু স্বরে বলল, 'এক সঙ্গে বেশি খাবে না, অল্প কিছু মুখে দাও। তারপর কিছু সময় বিশ্রাম কর। আবার কিছু খাও। এক জন ডাক্তার নিয়ে এসেছি। সে বোধহয় তোমার শিরা দিয়ে কিছু খাবারদাবার ঢোকাবে।'

জামশেদের মনে হল ক্যানটারেলার পাশে যেন এ্যানি দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। সে যেন বলছে, 'খাও, বুড়ো ভালুক, খাও। এমন বোকার মতো তাকিয়ে থেক না।'

জামশেদ গ্লাসে চুমুক দিল।

'জামশেদ, এখন কি সুস্থ বোধ করছ?'

জামশেদ চোখ মেলল। ক্যানটারেলা দাঁড়িয়ে আছে। জামশেদ বলল, 'আজ কত তারিখ?'

'বার। বারই আগস্ট। তুমি কি এখন সুস্থ বোধ করছ ?'

'করছি।'

'ভালো, খুব ভালো। আরো বিশ্রাম নাও, আমি পরে আসব।'

'আমার যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে।'

'আরো হোক। একটু ব্রান্ডি খাবে? এতে স্নায়ু টানটান হয়ে ওঠে।'

'আমার স্নায়ু এমনিতেই টানটান।'

'ঠিক আছে তাহলে ব্রান্ডি খেতে হবে না। বিশ্রাম নাও। ডাক্তার বলেছে দিন দুয়েকের মধ্যে তুমি আগের ফর্মে ফিরে আসবে।'

জামশেদ ক্লান্ত স্বরে বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি চাও, আমি দ্রুত আগের ফর্মে ফিরে আসি।'

'হ্যাঁ, আমি চাই। তোমাকে আমার দরকার আছে। আজ রাতে একবার আসব। তখন বলা যাবে কেন দরকার।'

এতরা ইটালিতে ফিরে এসে হকচকিয়ে গেল। জামশেদ ধরা পড়ে নি। শুধু তাই নয়, সে নাকি বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ক্যানটারেলার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে। ক্যানটারেলার কথাবার্তাও অস্পষ্ট। কিংবা এতরা এখন আর আগের মতো চিন্তাভাবনা করতে পারে না বলেই সব কথাবার্তাই অস্পষ্ট মনে হয়। এদের দুজনের মধ্যে কথোপকথন ছিল এ রকম —

'এতরা, তুমি তো বলেছিলে তিন দিনের ভেতর ওকে ধরবে, তারপর চামড়া খুলে সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখবে।'

ক্যানটারেলা : বলেছিলাম নাকি?

এতরা : হ্যাঁ।

ক্যানটারেলা : লোকটি মন্ত্র-টন্ত্র জানে। বিপদের সময় ফস করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এতরা : কী বলছ এসব? ঠাট্টা করছ নাকি?

ক্যানটারেলা : ঠাট্টা ? না, আমি ঠাট্টা-ফাট্টা করি না।

এতরা : প্লিজ, ক্যানটারেলা, ঠাট্টা-তামাশা সহ্য করার ক্ষমতা এখন আমার নেই।

ক্যানটারেলা : না থাকারই কথা। কারণ তুমিই সম্ভবত নেক্সট টার্গেট।

এতরা : কী বলছ এসব!

ক্যানটারেলা : ঠিকই বলছি।

এতরা : তুমি পাগলের মতো প্রলাপ বকছ?

ক্যানটারেলা : হতে পারে। হওয়াই সম্ভব, হা-হা-হা।

এতরা : হাসছ কী জন্যে? এর মধ্যে হাসির কী হয়েছে?

ক্যানটারেলা : একটা পুরনো জোক মনে করে হাসছি। শুনতে চাও। একবাব একটা লোক নাপিতের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল (এই জায়গায় এতরা খট করে বিসিভাব নামিয়ে রাখল।)

পরপর দুরাত এতরার এক ফোঁটা ঘুম হল না। খুট করে কোনো শব্দ হতেই সে লাফিয়ে ওঠে। তার মনে সন্দেহ, গার্ডরা হয়তো পাহারা দেবাব নাম করে ঘুমাচ্ছে। সে প্রতি দুঘণ্টা পরপব নিচে নেমে যায খোঁজ নিতে। কোনো একটি কামরায বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় রাতে কড়া এক ডোজ লিব্রিযাম খেল। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। শেষ রাতেব দিকে তন্দ্রার মতো হল, কিন্তু সে তন্দ্রা বিভীষিকার তন্দ্রা, এতরা স্পষ্ট দেখল জামশেদ সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায এক হাতে একটি ধাবাল তলোযাব নিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। সে দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে। দুজনের দূবত্ব ক্রমেই কমে আসছে। এতরাব বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে, যেন এক্ষুনি ফেটে চৌচির হবে।

এতরা জেগে উঠে বিকট স্বরে কেঁদে উঠল। 'আহ্‌, বেঁচে থাকা কী কষ্টেব ব্যাপাব!'

'জামশেদ, তুমি কি এখন পুবোপুবি সুস্থ?'

'হ্যাঁ।'

'পাঞ্জা লড়বে এক হাত? দেখতে চাও সুস্থ কিনা?'

'নাহ্‌।'

'ঠিক আছে। তোমার জন্যে ভালো চুরুট আনিযে বেখেছি। হাভানা চুরুট, নাও।'

জামশেদ হাত বাড়িযে চুরুট নিল। শীতল স্ববে বলল, 'ক্যানটাবেলা, এখন বল কী বলতে চাও?'

'বলছি। তার আগে একটু মার্টিনি হলে কেমন হয ?'

'আমি এখন মদ খাই না।'

'ভালো। তোমাব জন্যে কফি দিতে বলি ?'

'বল।'

ক্যানটারেলা চুরুট ধরিযে হাসিমুখে বলল, 'তোমাকে ছোট্ট একটা গল্প বলতে চাই, জামশেদ।'

'গল্পে আমার কোনো আগ্রহ নেই, মিঃ ক্যানটাবেলা।'

'আগ্রহ না থাকলেও তোমাকে শুনতে হবে।'

জামশেদ তাকিয়ে বইল। ক্যানটাবেলা মৃদুস্বরে বলল, 'আমি যখন খুব ছোট তখন ভিকানডিয়া পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা বড় ধরনেব ঝামেলা শুরু হয। মাফিযা পরিবারগুলির ঝামেলাব নিষ্পত্তি কীভাবে হয তা হযতো তুমি জান। এক পরিবারকে শেষ হযে যেতে হয়। আমাদেবও অবস্থা হল সে বকম। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না দেখে আমার বাবা সন্ধির ব্যবস্থা করলেন। সন্ধির শর্তগুলির মধ্যে একটি হল — আমার মাকে যেতে হবে ভিকানডিযার ঘরে। বক্ষিতাব মতো। আমার মা বিশেষ রূপসী ছিলেন; ভিকানডিয়াব শুরু থেকেই মাব প্রতি আগ্রহ ছিল। পারিবারিক বিরোধেব এটিও একটি কারণ। গল্পটি তোমাব কেমন লাগছে, জামশেদ?'

জামশেদ জবাব দিল না। ক্যানটারেলা থেমে বলল, 'আমার মার বেশিদিন দুঃখ ভোগ কবতে হল না। অল্পদিন পরই তার মৃত্যু হল। আমরাও ধীরে-ধীরে সব ভুলে যেতে শুরু কবলাম। এক সময় বস ভিকানডিয়া আমাকে স্নেহ করতে শুরু করলেন। পুরাতন স্মৃতি কিছু আর মনে রইল না।

তারপর হঠাৎ একদিন তুমি এসে উদয় হলে। তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে পুরনো সব কথাবার্তা আমার মনে পড়তে শুরু করল। বিশেষ করে মনে পড়তে লাগল আমার মাকে। তিনি আমাকে কি ডাকতেন জান ? তিনি ডাকতেন 'নেংটো বাবা' বলে। কী রকম অদ্ভুত নাম, দেখলে?'

জামশেদ তাকিয়ে দেখল ক্যানটারেলাব চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ক্যানটারেলা ধবা গলায় বলল, 'জামশেদ, আমার শরীরটা হাতিব মতো। কিন্তু আমার সাহস নেই। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বলশালী কাপুরুষদের একজন। সেজন্যেই তোমাকে আমার প্রয়োজন।'

জামশেদের চুরুট নিভে গিয়েছিল। সে আবাব চুরুট ধবাল। ক্যানটাবেলা মৃদুস্বরে বলল, 'ভিকানডিয়ার প্রাসাদে ঢোকার ব্যবস্থা আমি করে দেব। বেরুবার ব্যবস্থা কবতে পাবব না। এটা হচ্ছে ওযান ওয়ে জার্নি। তুমি ঢুকতে পারবে, বেরুতে পাববে না।'

জামশেদ শান্ত স্বরে বলল, 'বেরুতে না পারলেও ক্ষতি নেই।'

'আমি সব ব্যবস্থা করে বেখেছি। বওনা হতে হবে আজ বাতেই।'

'আজ বাত ন-টায বিশেষ কাবণে ভিকানডিযার ঘবের সব বাতি হঠাৎ কবে নিভে যাবে।'

জামশেদ কিছু বলল না। ক্যানটারেলা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তুমি যদি ফিবে না আসতে পাব, তাহলে এতবাব ব্যবস্থা আমি কবব। তুমি এ ব্যাপাবে কিছু মাত্র চিন্তা কববে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে।'

'জামশেদ, আরেকটি কথা। যদি তুমি ফিবে না আসতে পার তাহলে তোমার ডেডবডি কি দেশে ফেবত পাঠাবার ব্যবস্থা করব ?'

'নাহ।'

'কাউকে কিছু বলতে হবে ?'

'নাহ্।'

'কোনো কিছুই বলার নেই তোমার?'

জামশেদ মৃদুস্বরে বলল : 'যদি সম্ভব হয় এ্যানির পাশে একটু জায়গা রাখবে। মেয়েটি বড্ড ভীতু। আমি পাহারায় থাকলে হয়তো শান্তিতে ঘুমুবে।'

ক্যানটারেলা তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

২১

গভীর রাতে এতরাব ঘুম ভেঙে গেল। ঝনঝন কবে টেলিফোন বাজছে। যেন ভয়াবহ কোনো খবর এসেছে টেলিফোনে। এতরা কাঁপা গলায বলল, 'হ্যালো।'

'এতরা, খবর শুনেছ?'

'কী খবর?'

'বস ভিকানডিযাকে খুন করা হয়েছে। কে করেছে বুঝতে পারছ তো?'

'কে? জামশেদ?'

'ঠিক ধরেছ। তবে তোমার জন্যে একটি সুখবর আছে। জামশেদও মারা যাচ্ছে। খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানেক টিকে থাকবে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।'

'একবার সিটি হাসপাতালে এসে দেখবে না কত লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে জমা হয়েছে এই বিদেশি মানুষটির খবর নিতে?'

'তুমি কে?'

'ইটালির সবচে বড়-বড় ডাক্তাররা ছুটে এসেছেন। তিনটি আলাদা-আলাদা মেডিক্যাল বোর্ড হয়েছে। এ রকম মরায় সুখ আছে, তাই না?'

'তুমি কে?'

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'না। তুমি কি ক্যানটারেলা ?'

টেলিফোন লাইন কেটে গেল। আবার দুঘণ্টা পর ঝনঝন করে বেজে উঠল।

'হ্যালো, এতরা।'

'হ্যাঁ। সুসংবাদ। জামশেদ মারা গেছে।'

'তুমি কে?'

'আমি ওর প্রেতাত্মা। জামশেদের মতো লোকগুলো মরেও মরে না। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।'

এতরা কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি ক্যানটারেলা?'

'না, আমিই জামশেদ। আমি আসছি।'

রাত চারটায় ছোট্ট একটি সাদা রঙের ওপেল গাড়ি এতরার বাসার সামনে থামল। ক্যানটারেলা নেমে এল গাড়ি থেকে। নিচের গার্ডরা কেউ তাকে আটকাল না। এতরা বারান্দায় বসে শুনল সিঁড়ি বেয়ে ভারি পায়ে কে যেন উঠে আসছে উপরে।

২২

ইস্টার্ন সিমেট্রিতে এ্যানি নামের মেয়ের কবরের পাশে এক জন বিদেশির কবর আছে। তার গায়ে চার লাইনের একটি ইটালিয়ান কবিতা। যার অর্থ অনেকটা এ রকম —

'এখানে এক জন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। তাকে শান্তিতে ঘুমুতে দাও।'

কবরটির পাশেই দুটি প্রকাণ্ড চেরী ফুলের গাছ। বসন্তকালে কবরটি সাদা রঙের চেরী ফুলে ঢাকা পড়ে থাকে। বড় চমৎকার লাগে দেখতে।

দারুচিনি দ্বীপ

'মা, আমার চশমা? আমার চশমা কোথায় মা?'

শুভ্র হাহাকার করে উঠল। শুভ্রর মা গাঢ় মমতা নিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। কী অদ্ভুত ভঙ্গিতেই না শুভ্র হাঁটছে। দু হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো হেলতে দুলতে এগোচ্ছে। তার সামনে চেযার। এক্ষুনি চেযারের সঙ্গে ধাক্কা খাবে।

'মা, আমার চশমা কোথায়?'

বলতে বলতে সে সত্যিই চেযাবেব সঙ্গে ধাক্কা খেল। শুভ্রব মা উঠে এসে ছেলেকে ধরে ফেললেন। শুধু ধবলেন না — চেযাবে বসিযে দিলেন। তাঁর মনটাও খারাপ হযে গেল। এত খারাপ শুভ্রর চোখ? চেয়ারের মতো বড় জিনিসও তার চোখে পড়ে না?

'কথা বলছ না কেন মা? চশমা কোথায়?'

'রাতে শোবার সময় কোথায ছিল?'

'বালিশের পাশে রেখেছিলাম। মাথার ডান দিকে। সব সময যেখানে বাখি।'

'তাহলে ওখানেই আছে।'

'নেই তো! আমি পাঁচ মিনিট ধবে খুঁজেছি।'

'চশমা ছাড়া তুমি কিছুই দেখ না?'

শুভ্র হাসিমুখে বলল, 'এক ধবনেব প্যাটার্ন দেখি মা। লাইট এন্ড ডার্কনেস। কোথাও বেশি আলো, কোথাও কম, কোথাও অন্ধকাব — এই বকম। খুব ইন্টাবেস্টিং।'

'এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কী আছে?'

'আছে। না দেখলে বুঝবে না। চশমা ছাড়া সব কিছুই এলোমেলো, এক ধরনেব ক্যাওস — ডিসঅর্ডার। চশমা পরা মাত্রই অর্ডার। তোমরা এইটা কখনো বুঝবে না।'

'ভাগ্যিস বুঝছি না। তোমাব মতো আবো এক জন থাকলে পাগল হযে যেতে হত। সারাক্ষণ চশমা, চশমা, চশমা। দিনে দশবার চশমা হারাচ্ছ। সারাক্ষণ চোখে দিযে রাখলেই পার, খুলে ফেল কেন?'

'বেশিক্ষণ অর্ডার ভালো লাগে না। চশমা খুলে ডিসঅর্ডারে চলে যাই। মা, এখন তুমি কি দয়া করে চশমাটা আনবে?'

তিনি চশমা আনতে গেলেন। বালিশের কাছে পাওয়া গেল না। পাওযা গেল সাইড টেবিলে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। কাল বাতে শুভ্র লাইট জ্বালিযেই ঘুমিযেছে। বিছানাব

উপর দুটো বই। একটার নাম Brief History of Time, মনে হচ্ছে ফিজিক্স-এর কোনো বই। অন্যটা রগরগে কোনো বই হবে। সম্পূর্ণ নগ্ন এক তরুণীর ছবি প্রচ্ছদে ছাপা। শুভ্র কি এই জাতীয় বই পড়তে শুরু করেছে? এই সব বই কি তার এখন ভালো লাগছে? সে কি বড় হয়ে যাচ্ছে? ঐতো মনে হয় সেদিন রাত দুপুরে তাঁর দরজায় ঠক ঠক করে কাঁপা গলায় বলল, 'মা আমি কি তোমার সঙ্গে ঘুমাতে পারি? আমার খাটের নিচে কে যেন শব্দ করছে?'

'কে শব্দ করছে?'

'বুঝতে পারছি না — ভূত হতে পারে। ভূতের মতো মন হল।'

'ভয় পেয়েছ?'

'হুঁ। খুব বেশি না — অল্প ভয় পেয়েছি।'

তিনি দরজা খুলে দেখলেন তাঁর ন বছর বয়সী শুভ্র ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তিনি হাত ধরার পরেও সেই কাঁপুনি থামল না।

'চল দেখে আসি কী আছে খাটের নিচে।'

'আমার দেখতে ইচ্ছা করছে না, মা।'

'ইচ্ছা না করলেও দেখতে হবে। ভূতপ্রেত বলে কিছু যে নেই এটা জানতে হবে না? এস।'

খাটের নিচে উঁকি দিতেই একটা বিড়াল বেব হযে এল। তিনি বললেন, 'শুভ্র বাবা, তুমি কি বিড়ালটা দেখতে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝতে পেরেছ যে এটা ভূত না?

'হ্যাঁ।'

'এখনো কি আমার সঙ্গে ঘুমাতে চাও?'

শুভ্র চুপ করে রইল। মার সঙ্গে ঘুমানোই তার ইচ্ছা, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পাবছে না। মার সঙ্গে ঘুমানোর অজুহাত এখন আর নেই।

'চুপ করে আছ কেন বাবা, বল এখনো আমার সঙ্গে ঘুমাতে চাও?'

'তুমি যা বলবে তাই...'

'আমার মতে তোমার নিজের-বিছানাতেই ঘুমানো উচিত। দুটি কারণে উচিত। প্রথম কারণ, এতে ভযটা পুরোপুরি কেটে যাবে। দ্বিতীয কারণ, মাসে একবার তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাতে পার। এ মাসের কোটা তুমি শেষ করে ফেলেছ। এখন যদি ঘুমাও সামনের মাসে ঘুমাতে পারবে না।'

শুভ্র কোনো কথা না বলে ছোট-ছোট পা ফেলে খাটের দিকে রওনা হল। যেন ছোট্ট একটা পুতুল হেলতে দুলতে যাচ্ছে। মাথা ভর্তি রেশমি চুল, ধবধবে সাদা মোমের শরীর, লালচে ঠোঁট। দেবশিশু, মর্ত্যের ধুলো কাদার পৃথিবীতে যেন ভুলক্রমে চলে এসেছে। তাব মাথা নিচু করে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তিনি অসম্ভব বিষণ্ণ হযে পড়লেন। ইচ্ছা কবল ছেলেকে আবার ডাকেন। তা সম্ভব না। একবার যা বলা হয়েছে তা ফিরিয়ে নেয়া ঠিক না। তাঁর একটিমাত্র সন্তান, তাকে তিনি ঠিকমতো মানুষ করবেন। অতিরিক্ত আদরে নষ্ট করবেন না।

সেই শুভ্র এখন এত বড় হয়েছে?

কত হল তার বয়স? বাইশ? কী আশ্চর্য!

সময় এত দ্রুত যায় ? বাইশ বছব তো অনেক দিন। তাঁর ছেলে জীবনেব তিন ভাগের এক ভাগ সময় এর মধ্যে শেষ করে ফেলেছে? এখন সে আগ্রহ বোধ করতে শুরু কবেছে

তরুণীদের প্রতি। তার বিছানায় নগ্ন তরুণীর ছবি আঁকা বই। খুবই স্বাভাবিক। বয়সের দাবি। একে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার কোনো পথ নেই।

আচ্ছা শুভ্রর এখন একটা বিয়ে দিলে কেমন হয়?

তার মতোই সুন্দর কোনো একটা বালিকা। খুব অল্প বয়স — পনের কিংবা ষোল। ছটফটে ধরনের একজন বালিকা, যে কথায় কথায় রাগ করবে। কথায় কথায় হাসবে। স্বামীর কোনো কথায় অভিমান করে ছাদে চলে যাবে। মুখ ঢেকে কাঁদবে। বৃষ্টির রাতে দুজনে ভিজবে। রাতের পর রাত পার করে দেবে গল্প করে। তিনি দূর থেকে দেখবেন। মুগ্ধ তরুণ-তরুণীর ভালবাসাবাসির মতো অপূর্ব দৃশ্য আর কিছু আছে?

তাঁর নিজের জীবনে এমন কিছু ঘটে নি। তাঁর স্বামী এস. ইয়াজউদ্দিন অনেকটাই রোবটের মতো। যিনি রাত দশটা কুড়ি মিনিটে দাঁত মাজতে যান। দশটা পঁচিশে আধগ্লাস পানি খেয়ে একটা সিগারেট ধরান। গুনে গুনে দশ বার সিগারেট টেনে দশটা তিরিশ মিনিটে বলেন — 'রেহানা ঘুমিয়ে পড়ি? তুমি কি শোবে, না দেরি হবে?'

এই রোবট-মানব কোনোদিন বৃষ্টিতে ভেজেন না।

বৃষ্টির পানি গায়ে লাগলেই তাঁর টনসিল ফুলে যায়। জোছনা রাতে কখনো ছাদে যান না। ছাদে উথালপাথাল বাতাস। সেই উথালপাথাল বাতাস গায়ে লাগলেই তাঁর মাথা ধরে।

মানুষটাকে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন বলা যেতে পারে। শেষ গন্তব্যের একটা স্টেশনে সে যাত্রা শুরু করেছে। মাঝপথে কত না সুন্দর সুন্দর স্টেশন! ট্রেন সেখানে থামছে না। ঝড়ের গতিতে পার হয়ে যাচ্ছে। গন্তব্যের দিকে যতই যাচ্ছে ততই তার গতিবেগ বাড়ছে। আজকাল রেহানার প্রায়ই ইচ্ছা করে কোনো একটা গ্রামের স্টেশন, সিগন্যাল ডাউন করে রেড লাইট জ্বালিয়ে ট্রেনটাকে থামিয়ে দিক। গন্তব্যে যে পৌছতেই হবে এমন তো কোনো কথা নেই।

'শুভ্র বাবা, এই নাও তোমার চশমা।'

'থ্যাংকস মা।'

'কাল রাতেও তুমি বাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছ।'

শুভ্র মিটিমিটি হাসল।

'কাল রাত কটা পর্যন্ত জেগেছ?'

'ঘড়ি দেখি নি মা। রাত দুটা কিংবা তিনটা হবে।'

'এমন কী পড়ছিলে যে রাত শেষ করে দিতে হবে?'

'খুব ইন্টারেস্টিং বই...শেষ না করে ঘুমাতে ইচ্ছা করছিল না।'

ফিজিক্সের কোনো বই?'

'উহুঁ। লাভ স্টোরি।'

'এস নাশতা খেতে এস।'

নাশতার টেবিলটা তিন জনের জন্যে বিশাল। ছোট আরেকটা টেবিল আছে, ইয়াজউদ্দিন সাহেবের সেই টেবিলটা পছন্দ নয়। দিনের মধ্যে একবারই তিনি শুধু সবার সঙ্গে বসেন —সেটা সকালের নাশতার সময়। বিশাল টেবিলের এক প্রান্তে তাঁর নির্দিষ্ট বসার চেয়ার আছে। মা এবং ছেলে বসে মুখোমুখি। ইয়াজউদ্দিন সাহেব নাশতা খেতে খেতে গল্প করেন। অল্প খানিকক্ষণ সময়ের জন্যে মনে হয় — মানুষটা বোধ হয় রোবট নয়।

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের প্রিয় খাবার এক বাটি মটরশুটি সিদ্ধ করে তাঁর সামনে দেয়া হয়েছে। খোসা ছাড়িয়ে তিনি মটরশুটি খাচ্ছেন। তাঁর ঠিক সামনে টি-পটে এক পট চা,

মোট তিন কাপ চা আছে। নাশতার টেবিলে তিনি আড়াই কাপের মতো খাবেন। তিনি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'শুভ্র তোমার কী খবর?'

শুভ্র হাসল, কিছু বলল না।

তিনি রেহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রেহানা শুভ্রকে আজ প্রিন্সের মতো লাগছে না?'

রেহানা বললেন, 'লাগছে। তবে.... '

'আবার তবে কী? তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে?'

'না।'

'তাহলে 'তবে' বললে কেন?'

'তুমি তো আমাকে কথা শেষ করতে দাও নি। কথা শেষ করতে দিলে তবে কেন বলেছি তা এক্সপ্লেইন করতাম।'

'সরি, কথা শেষ কর...'

'তবে বলেছি কারণ শুভ্রর সবচে' সুন্দর জিনিস তার চোখ। চশমার জন্যে তার চোখ কখনো দেখা যায় না। It's a pity.'

শুভ্র বলল, 'মা চুপ করতো। এই টপিকটা আমার কখনো ভালো লাগে না।'

ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'মানুষ হয়ে জন্মানোর সবচে' বড় সমস্যা কি জান শুভ্র? যে টপিকটি সে পছন্দ করে না, তাকে সেই টপিকটিই সবচে' বেশি শুনতে হয়। আমার কথাই ধর — পলিটিক্সে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমাকে সারাক্ষণ সেই পলিটিক্সের কথা শুনতে হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, শিল্পমন্ত্রী কিংবা পাটমন্ত্রী এই জাতীয় কোনো দপ্তব আমাকে নিতে হতে পারে। রেহানা কী বলছি , শুনছ?'

'শুনছি।'

'এই বিষয়ে তোমার কোনো মতামত আছে?'

'না।'

'তুমি কি চাও যে আমি পলিটিক্সে ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড হই?'

'তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না।'

'এরকম উঁচুগলায় কথা বলছ কেন? আমি চাই চায়ের টেবিলে সব সময় লাইভলি ডিসকাশন হবে।'

'তোমার চাওয়ামতো পৃথিবী চলবে এটাই বা ভাবছ কেন? আমার চাওযারও তো কিছু থাকতে পারে?'

'একটু আগে বলেছ আমাব কাছে তোমাব কিছু চাওযাব নেই। তুমি কি নিজেকেই নিজে কনট্রাডিক্ট করছ না?'

রেহানা কিছু বললেন না।

ইয়াজউদ্দিন দ্বিতীয় কাপ চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'বেহানা আমার সঙ্গে তর্ক কবতে এস না। তর্কে হারবে, মন খারাপ করবে। তর্কে হেরে যাওয়া খুবই অপমানজনক ব্যাপার।'

রেহানা টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন।

ইয়াজউদ্দিন শুভ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মাকে তোমার কাছে কেমন লাগে শুভ্র?'

'ভালো।'

'আরো গুছিয়ে বল। সাধারণ একটা এডজেকটিভ দিয়ে তো কিছু বোঝা যায় না। একশ নম্বর যদি থাকে তাহলে তুমি তোমার মাকে কত দেবে?'

'বিরানব্বুই থেকে তিরানব্বুই দেব।'

'আমাকে কত দেবে?'

'বললে তোমার হয়তো মন খারাপ হবে।'

'এত সহজে আমার মন খারাপ হয় না।'

'তোমাকে আমি দেব পঁয়তাল্লিশ।'

'তোমার ধারণা তোমার জাজমেন্ট ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'শুভ্র এত কম নম্বর আমি কিন্তু ডিজার্ভ করি না।'

'তুমি মন খারাপ করেছ বাবা। একটু আগে বলেছ তুমি মন খারাপ কর না।'

'মন খারাপ করি না এমন কথা বলি নি। বলেছি — এত সহজে মন খারাপ করি না। তুমি যে কথা বলছ তা সহজ না। এখন তুমি বুঝতে পারছ না। যে দিন বাবা হবে এবং যে দিন তোমার মুখের উপর তোমার ছেলে তোমাকে ফর্টি ফাইভ নম্বর দেবে সে দিন বুঝবে।'

'বাবা, আমি তোমাকে হার্ট করেছি। আই অ্যাম সরি।'

ইয়াজউদ্দিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'আমি যতটা হার্ট হয়েছি বলে দেখাচ্ছি ততটা হই নি। কারণ আমি জানি, তুমি আমাকে ঠিকমতো জাজ কর নি।'

'আমার জাজমেন্টে তেমন কিছু যায় আসে না।'

'তা-ও সত্যি। তুমি এখনো একজন বালক। তোমার বয়স বাইশ হয়েছে আমি জানি — কিন্তু এখনো বালক-স্বভাব ত্যাগ করতে পার নি। আশপাশের জগৎ সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। তোমার জগৎ হচ্ছে তোমার শোবার ঘর, তোমার পড়ার ঘর এবং এই বাড়ি — এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।'

শুভ্র তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ভারি কাচের আড়ালে তার চোখ। কাজেই শুভ্র কী ভাবছে বা কী ভাবছে না —কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে ভয় পাচ্ছে না — খানিকটা মজা লাগছে। বাবাকে এর আগে সে কখনো এমন রেগে যেতে দেখে নি।

'শুভ্র।'

'জ্বি।'

'তুমি কি সাইকেল চালাতে জান?'

'না।'

'না কেন বল তো?'

'এ বাড়িতে তো কোনো সাইকেল ছিল না, কাজেই .....'

'এ বাড়িতে তো গাড়ি আছে। গাড়ি চালাতে পার?'

'না।'

'সাঁতার জান?'

'না।'

'তুমি কিন্তু কিছুই জান না। তোমার জগৎ — অভিজ্ঞতাশূন্য ক্ষুদ্র জগৎ।'

'একেবারে ক্ষুদ্রও না। আমি প্রচুর পড়ি। বই পড়ে আমি লেখকদের অভিজ্ঞতা নিয়ে নেই।'

'ধার করা অভিজ্ঞতা কোনো অভিজ্ঞতা না।'

'তুমি কি আমার উপর খুব রাগ করেছ?'

'না, রাগ করি নি।'

'তাহলে এতসব কঠিন কঠিন কথা কেন বলছ? তোমাকে মাত্র পঁযতাল্লিশ নম্বর দিয়েছি বলে বলছ?'

'না। তুমি যদি আমাকে পঁচানব্বইও দিতে তাহলেও বলতাম। আগের থেকে প্ল্যান না করে আমি কিছু করি না। আজ সারা দিনে আমি কী কী করব তা এই কার্ডে লেখা আছে। দুই নম্বরে কী লেখা একটু পড়ে দেখ।'

শুভ্র পড়ল।

দুনম্বরে লেখা — 'শুভ্র'র সঙ্গে তার ভ্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলা।'

'আমার কথা বিশ্বাস হল শুভ্র?'

'তুমি আমার ভ্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছ না —।'

'যা বলছি তা হল প্রিলগ। মূল গানের আগে তবলার ঠুকঠাক হয়। এ হচ্ছে তবলার ঠুকঠাক। তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এস। দুজনের সামনেই কথা বলি।'

'মা কি আসবে?'

'না আসারই সম্ভাবনা। তবু বলে দেখ।'

রেহানা এসে বসলেন। স্বামীর দিকে একবারও তাকালেন না। তাঁর মুখ কঠিন। তিনি ছোট ছোট করে শ্বাস ফেলছেন।

ইয়াজউদ্দিন তাঁর চেয়ার ছেড়ে স্ত্রীর পাশের চেয়ারে এসে বসলেন। রেহানা আরো শক্ত হয়ে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন স্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ছেলের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি আরাম পাই না। কথা বলার সময় আমি তোমার চোখ দেখতে পাই না।'

'বাবা, চশমা খুলে ফেলব?'

'না, তার দরকার নেই। তোমার মা গত রাতে তোমাদের এক পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন — তোমরা কয়েক বন্ধু নাকি সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে জোছনা রাত কাটাবে?'

'হ্যাঁ।'

'খুবই ভালো কথা। কিন্তু আমার তো ধারণা তোমার কোনো বন্ধুবান্ধব নেই।'

'স্কুলে ওদের সঙ্গে পড়েছি।'

'স্কুলের পরেও যোগাযোগ ছিল?'

'খুব কম। মাঝেমধ্যে আসত।'

'আমার মনে হয় কোনো ধার-টারের প্রয়োজন হলে ওরা তোমার কাছে আসে।'

শুভ্র কোনো জবাব দিল না।

তিনি গলার স্বর স্বাভাবিকের চেয়ে এক ধাপ নিচে নামিয়ে বললেন, 'শুভ্র, দেশে এখন যে আন্দোলন চলছে — সেই বিষয়ে তোমার মত কী? গণতন্ত্রের আন্দোলনের কথা বলছি।'

শুভ্র বুঝতে পারল না — বাবা কেন হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টালেন। সে কোনো জবাব দেয়ার আগেই ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'গোটা আন্দোলনে তুমি এক দিনও বের হও নি। ছাত্ররা মিটিং-মিছিল করেছে, কার্ফ্যু ভেঙেছে, গুলি খেয়ে মরেছে — তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে ছিলে। কেন জানতে পারি?'

'আন্দোলনে যাওয়া তোমরা পছন্দ করতে না। আমি ওদের সঙ্গে যোগ দিলে তোমরা রাগ করতে। আমি তোমাদের রাগাতে চাই নি।'

'ঠিকই বলেছ, রাগ করতাম। আন্দোলন সবাইকেই করতে হবে তা না। তোমাকে তৈরী থাকতে হবে আরো বড় কাজের জন্য ..... '

শুভ্র হঠাৎ বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দেশে গণতন্ত্র আনার জন্যে আন্দোলন কি ছোট কাজ?'

তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তাঁকে খানিকটা বিরক্ত মনে হল। চোখের নিচের চামড়া একটু যেন কুঁচকে গেল। কপালে ভাঁজ পড়ল। অবশ্যি খুব সহজেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকালেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে হাতঘড়ি দেখলেন। এখনো তাঁর হাতে কুড়ি মিনিট সময় আছে। ছেলেব সঙ্গে কথা বলতে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগার কথা না। শুভ্র কথাব পিঠে কথা বলে না। কথাব পিঠে কথা বললে আবো বেশি সময় লাগত।

'শুভ্র।'

'জ্বি।'

'তোমার এই বন্ধুরা মিডলক্লাস ফ্যামিলিব ছেলে, তাই না?'

'জ্বি।'

'সাধাবণত হাইলি বোমান্টিক পবিকল্পনা মিডলক্লাস ফ্যামিলিব ছেলেমেয়েদেব মাথায় আসে। এই নিয়ে মাসেব পব মাস তারা আলোচনা কবে। প্ল্যান-প্রোগ্রাম হয, তাবপব এক সময সব ভেস্তে যায। বেশির ভাগ সময়ই ভাঙে অর্থনৈতিক কাবণে। আশা কবি তোমাদেবটা ভাংবে না।'

'না ভাংবে না। আসছে মঙ্গলবাব আমবা বওনা হচ্ছি। শুক্রবাব পূর্ণিমা। আমবা সেন্ট মার্টিনে গিয়েই পূর্ণিমা পাব।'

'ভেরি গুড। চাঁদেব আলোয দ্বীপে ঘোবাঘুরি কববে?'

'জ্বি।'

'ইন্টাবেস্টিং। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, যাদেব সঙ্গে যাচ্ছ তাবা কি তোমাব ভালো বন্ধু?'

'ওবা আমাকে খুব পছন্দ কবে।'

'আমাব মনে হয তুমি ভুল বলছ। ওবা তোমাব অর্থ বিত্ত এইসব পছন্দ কবে। তোমাব মধ্যে পছন্দ কবাব মতো গুণাবলি বিশেষ নেই। তুমি মজাব গল্প করতে পার না। আসর জমাতে পাব না। তুমি অত্যন্ত ইন্ট্রোভার্ট ধবনেব এক জন যুবক — যে এখনো বালকের খোলস ছাড়তে পারে নি।'

'তুমি কি আমাকে যেতে নিষেধ কবছ?'

'না। তোমাব বযস বাইশ, তুমি নিশ্চযই তোমাব ইচ্ছামতো চলতে পার। আমি শুধু সমস্যাগুলোর প্রতি তোমাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবছি। প্রথমেই বলি ভ্রমণ পরিকল্পনা কাগজে কলমে যতটা ইন্টাবেস্টিং বাস্তবে কখনোই তত ইন্টারেস্টিং হয না। দ্বীপে পৌঁছতে তোমাদের খুব কষ্ট কবতে হবে — এত কষ্ট সহ্য করাব ক্ষমতা তোমার নেই। দ্বীপে পৌঁছার পর শীতে কাবু হবে। বাথরুমেব অভাবে কাবু হবে। তুমি হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ করবে তোমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গও ততটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না। তাবা অশ্লীল সব রসিকতা করবে। তুমি তা-ও সহ্য করতে পাববে না।'

'তুমি মনে কবছ আমাব যাওয়া উচিত নয?'

'অবশ্যই তোমার যাওয়া উচিত। ছোট্ট একটা প্রবাল দ্বীপ। চাবপাশে সমুদ্র, আকাশে Full moon- খুবই একসাইটিং। তুমি যাবে তো বটেই। তুমি তোমাব মতো কবে যাবে। আমি কক্সবাজাবেব ডিসি সাহেবকে টেলিফোন করে দেব। এছাড়াও আরো কিছু লোকজনকে বলব — যাতে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনে যাবাব জন্যে ভালো জলযান থাকে। দ্বীপে চোর-ডাকাত থাকতে পারে। কাজেই সঙ্গে পুলিশ দবকার। খাবাব দাবারের ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। ক্ষুধা পেটে পূর্ণিমার চাঁদকে রুটিব মতো লাগে। কাব কথা যেন এটা?'

'সুকান্তর।'

'অবিকল এই রকম একটা কবিতার লাইন ইংরেজি কবিতায়ও পড়েছি Give me some salt, I will eat the moon" ..... পড়েছ এই কবিতা?'

'না।'

'ইংরেজি কবিতা তুমি পড় না?'

'না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠতে উঠতে বললেন — 'তুমি আজকের দিনটা চিন্তা কর। কাল সকালে আমাকে বলবে কী করতে চাও। যা করতে চাও তাই হবে। বাইশ বছরের যুবক ছেলের উপর আমি কিছুই ইম্পোজ করতে চাই না। অবশ্যি আরেকটি ব্যাপারও আছে। দেশের সব মানুষ যেখানে গণতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন করছে সেখানে তোমরা মজা করার জন্যে বেড়াতে যাচ্ছ এটা কেমন কথা?'

রেহানা বললেন, 'শুভ্র কখনোই কিছু চায় না। হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে — ঘুরে আসুক না।'

ইয়াজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, 'ওর কথা ওকেই বলতে দাও। শুভ্র, তুমি কি যেতে চাও?'

শুভ্র বলল, 'না।' বলেই দ্রুত নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। তার চোখে পানি এসে গেছে। বাবা-মাকে সে চোখের পানি দেখাতে চায় না।

ইয়াজউদ্দিন হাতের ঘড়ি দেখলেন। বিশ মিনিট পার হয়েছে। তিনি উঠে পড়লেন। রেহানাকে বললেন, 'ও মন খারাপ করে 'না' বলেছে। ওকে যেতে বল। ঘুরে আসুক। পৃথিবীর রিয়েলিটির সঙ্গে খানিকটা পরিচয় হোক।'

২

সঞ্জু বারান্দায় পাটি পেতে খেতে বসেছে।

তাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে খুব ক্ষুধার্ত। বড় বড় নলা বানিয়ে মুখে দিচ্ছে। সঞ্জুর মা ফরিদা তাঁর সামনেই বসে আছেন। অন্যদিন সঞ্জু খেতে খেতে গল্প করে আজ তাও করছে না।

ফরিদা অস্বস্তি বোধ করছেন। দ্রুত শূন্য হয়ে আসা থালার দিকে তিনি ভীত চোখে তাকিয়ে আছেন। ভাত আর নেই। থালার ভাত শেষ হয়ে গেলে আর দেয়া যাবে না। ছেলেটা কি ক্ষিধে-পেটে উঠবে? আজ ভাত কম পড়ল কেন? তিনি নিজে মেপে মেপে সাড়ে চার পট চাল দিয়েছেন।

সঞ্জু মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি খেয়েছ মা?'

তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, 'হুঁ।'

এটা বলতেও তাঁর লজ্জার সীমা রইল না। ফরিদা ক্ষিধে সহ্য করতে পারেন না। একেবারেই না। রান্না হওয়া মাত্র গরম গরম ভাত খেয়ে নেন। তখনো হয়তো তরকারি হয় নি, ডালটা শুধু নেমেছে।

সঞ্জুর ভাতের থালা প্রায় শূন্য। এক্ষুনি হয়তো সে বলবে — 'আর চারটা ভাত দাও তো মা।' ফরিদা মনে মনে বললেন, 'আল্লাহ, আজ যেন সে ভাত না চায়। খাওয়া শেষ করে যেন উঠে পড়ে।'

সঞ্জু ভাত শেষ করে ফেলেছে। পানির গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়েছে। ফরিদা চাপা স্বরে বললেন, 'খাওয়া হয়ে গেল?'

'হুঁ।'

'আর চারটা ভাত নিবি না?'

'না। পান থাকলে একটা পান দাও তো মা।'

ফরিদা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোর তো দেখি পান খাওয়া অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। তুই ছাত্র মানুষ। তোর কি দাঁত লাল করে পান খাওয়া ঠিক?'

'ঠিক না হলে দিও না।'

সঞ্জু হাত ধুতে উঠে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত ধুচ্ছে। মুখ ভর্তি করে পানি নিয়ে কুলি করে কলঘরের কাছে রাখা টবে ফেলার চেষ্টা করছে। ছেলেবেলার অভ্যাস। সব ভাইবোন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কুলি করে টবে পানি ফেলার চেষ্টা করবে। কুলির পানিতে উঠান মাখামাখি। কত বকা দিয়েছেন লাভ হয় নি। দশ বছর আগের টব এখনো আছে। গাছ বদল হয়েছে। শুরুতে ছিল গোলাপ গাছ, তারপর কয়েক বছর মরিচের গাছ, একবার ছিল টমেটোর গাছ — খুব টমেটো হয়েছিল সেবার। এখন আবার একটা গোলাপ গাছ। গাছ ভর্তি করে কলি এসেছে। এখনো ফুল ফোটে নি।

'সঞ্জু পান নে।'

সঞ্জু পান হাতে নিতে নিতে বলল, 'ভাত যদি চাইতাম তা হলে মা তুমি বিপদে পড়তে। ভাত তো আর ছিল না।'

ফরিদা বিব্রত গলায় বললেন, 'কে বলল ছিল না?'

'আমি বুঝতে পারি।'

'ইস কি আমার বুঝনেওয়ালা — আয় রান্নাঘরে নিজের চোখে দেখে যা।'

সঞ্জু হাসতে হাসতে বলল, 'এমনি বললাম।'

ফরিদা মুগ্ধ চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সঞ্জু হাসলেই তার গালে টোল পড়ে। দেখতে এমন মজা লাগে। ইচ্ছা করে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিতে। গালে টোল-পড়া মেয়েরা দুর্ভাগ্যবতী হয়, ছেলেদের বেলায় কি এসব কিছু আছে?

'দশটা টাকা দিতে পারবে মা?'

'সকালে না পাঁচ টাকা নিলি।'

'ঐটা বাস ভাড়াতেই শেষ। এখন যাব আদাবর, ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা।'

'এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবি?'

'উপায় কী মা। ফাইন্যাল প্ল্যানিং করতে হবে। সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাবার ব্লু প্রিন্ট আজ রাতে তৈরি হবে। আমাদের এই প্রজেক্টের নাম কি জান? প্রজেক্টের নাম হচ্ছে — প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপ।'

'দারুচিনি দ্বীপ কেন?'

'রোমান্টিক ধরনের একটা নাম দেয়া হল — এই আর কী? দুটো নাম সিলেকটেড হয়েছিল — 'প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপ' এবং 'প্রজেক্ট কালাপানি'। লটারিতে দারুচিনি দ্বীপ উঠে এল। এটা আমার দেয়া নাম।'

ফরিদা হালকা গলায় বললেন, 'কী যে তোদের কাণ্ডকারখানা। বেড়াতে যাবি তার আবার একটা নাম — প্রজেক্ট হেন, প্রজেক্ট তেন ....'

'এইসব তোমরা বুঝবে না মা। আর শুধু বেড়াতে যাচ্ছি তাতো না আরো ব্যাপার আছে।'

'আর কী ব্যাপার?'

'তোমাকে বলা যাবে না।'

সঞ্জু মার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'টাকা দিতে হবে মনে আছে তো মা?'

'মনে আছে।'

'এক হাজার টাকা। সবাই মিনিমাম এক হাজার নিচ্ছে। দিতে পারবে তো?'

'পারব।'

'লাস্ট মোমেন্টে যদি বল — টাকার জোগাড় হয নি। তাহলে সর্বনাশ।'

'কজন যাচ্ছিস?'

'এখনো ঠিক হয় নি। আজ ফাইন্যাল হবে। ইয়ে মা শোন — আমাদের সঙ্গে কয়েকটা মেয়েও হয়তো যাবে।'

কী বললি?'

'ওরা যেতে চাচ্ছে। আমরা নিব কিনা এখনো ঠিক কবি নি। নাও নিতে পারি। ওদের নেয়া মানেই যন্ত্রণা।'

ফরিদা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন।

সঞ্জু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'তুমি এমন করে তাকিযে আছ কেন? মেযেরা সঙ্গে গেলে কী অসুবিধা। ওরা আমাদের বন্ধুর মতো। এক সঙ্গে পড়ি। ওরা তো এখন স্টাডি ট্যুবে যায, একস্‌কারসানে যায। ছেলেদেব সঙ্গেই তো যায।'

'তখন তোদের স্যাররা সঙ্গে থাকেন। এখন যাচ্ছিস নিজেবা নিজেবা।'

'তাতে কী?'

'মেয়েগুলোর বাপ-মা যেতে দিবে?'

'দিবে না কেন?'

একটা প্রশ্ন ফরিদার মুখে চলে এসেছিল তিনি চট করে নিজেকে সামলে নিলেন। প্রশ্নটা করলে সঞ্জু যদি আবার কিছু মনে করে। যদি লজ্জা পায। প্রশ্নটা হল, মেযেগুলোর মধ্যে তোর পছন্দের কেউ আছে?

ফরিদার ধারণা আছে। তাঁব এত সুন্দব রাজপুত্রেব মতো ছেলে। মেযেদেব অনেকেই নিশ্চযই আগ্রহ করে তার কাছে আসে ভাব করার জন্যে। এদেব কাউকে কি সঞ্জু অন্যদেব চেয়ে আলাদা চোখে দেখে না? দেখাটাই তো স্বাভাবিক।

একবাব তিনি সঞ্জুব বইখাতা গোছাচ্ছেন, হঠাৎ সেখান থেকে নীল রঙেব একটা চিঠি বেরিযে পড়ল। তিনি পড়বেন না পড়বেন না ভেবেও শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললেন। রিংকু নামে একটা মেয়ে লিখেছে। সুন্দর গোটা গোটা হাতের লেখা, তবে খুবই ছোট দুলাইনের চিঠি।

> সঞ্জু,
> তুমি আমাকে এমন বোকা বানালে কেন?
> আমি ভীষণ, ভীষণ-ভীষণ বাগ করেছি।
>
> ইতি রাগান্বিতা
> রিংকু

ফরিদার খুব ইচ্ছা করছিল রিংকুকে সঞ্জু কী করে বোকা বানিয়েছিল সেটা জানতে। জানা হয় নি। লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারেন নি। তাছাড়া জিজ্ঞেস করলে সঞ্জু যদি বলে — 'মা, তুমি বুঝি লুকিয়ে আমার চিঠি পড়?'

রাগান্বিতা রিংকুর দুলাইনের চিঠি পড়ে ফরিদার খুবই ভালো লেগেছিল। চিঠি হবে এ রকম — এক লাইনের দুলাইনের, চট করে ফুরিয়ে যাবে। তারপরও মনে হবে ফুরাল না। রহস্য থেকে গেল। অবশ্যি রিংকুর চিঠির সম্বোধন আছে — সুপ্রিয়, সুজনেষু, দেবেষু ...।

সঞ্জু বলল, 'টাকাটা দাও মা চলে যাই।'

ফরিদা টাকা এনে দিলেন এবং মুখ ফসকে বলে ফেললেন, 'রিংকু কি তোদের সঙ্গে যাচ্ছে?'

সঞ্জু অবাক হয়ে বলল, 'রিংকু কে?'

ফরিদা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। সঞ্জু আবার বলল, 'কোন রিংকুর কথা বলছ? তিন জন রিংকু আছে আমাদের সঙ্গে। এক জন অনার্সে, দুজন সাবসিডিয়ারি ক্লাসে।'

ফরিদা দারুণ অস্বস্তি নিয়ে বললেন, 'ঐ যে মেয়েটা তোকে চিঠি লিখেছিল— দুলাইনের। তোর বই গোছাতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম।'

'ও আচ্ছা বুঝেছি — সাবসিডিয়ারির রিংকু। ওর সয়েল সায়েন্সে অনার্স। সাবসিডিয়ারিতে দেখা হয়। ফাজিলের চূড়ান্ত। না ও যাচ্ছে না। ও যাবে কেন?'

'মেয়েটা কেমন?'

'বললাম না, ফাজিল ধরনের। সবার সাথে ফাজলামি করে।স্যারদের সাথেও।'

'চেহারা কেমন?'

'চেহারা মন্দ না। নাক বোঁচা, আমরা তাকে ডাকি মিস খ্যাঁদা। ও মোটেই ক্ষেপে না। উল্টা হাসে। ও কী বলে জান মা? ও বলে আগে নাকি ওর নাক গ্রিকদের মতো খাড়া ছিল। কলেজে উঠার পর চাইনিজ খাওয়া ধরেছে। প্রতি সপ্তাহে এক দিন করে চাইনিজ খায়। এই জন্যেই তার নাক চাইনিজদের নাকের মতো হয়ে যাচ্ছে। ও বলে, সঞ্জু, খুব চিন্তায় আছি। নাক যে ভাবে বসে যাচ্ছে কোনদিন দেখব ফুটো বন্ধ হয়ে গেছে। তখন নিশ্বাস ফেলব কী করে?'

ফরিদা বললেন, 'তোকে নাম ধরে ডাকে?'

'নাম ধরে ডাকবে না? আমরা এক সঙ্গে পড়ি না?'

সঞ্জু মার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'রিংকুর বিয়ের কথা হচ্ছে। মার্চে বিয়ে হয়ে যাবে। সে কী বলেছে জান? বলেছে আমার সঙ্গে যাদের যাদের প্রেম করার ইচ্ছা তাদের জরুরি ভিত্তিতে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে তারা যেন মার্চের আগেই তা করে ফেলে।'

ফরিদা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

দিনকাল বদলাচ্ছে। তবে বড় বেশি দ্রুত বদলাচ্ছে। এত দ্রুত বদলানো কি ভালো? রিংকু মেয়েটার কাণ্ডকারখানা একই সঙ্গে তাঁর ভালো লাগছে, আবার ভালো লাগছে না।

'মা যাই। অনেকক্ষণ তোমার সাথে বক বক করলাম। রাতে কিন্তু ফিরতে দেরি হবে।'

'বেশি দেরি করলে তোর বাবা রাগ করবে।'

'বাবাকে খাইয়ে-দাইয়ে নটার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিও।'

সঞ্জুর বাবা সোবাহান সাহেব এজি অফিসে কাজ করেন।

সেকশান অফিসার।

আজ দুপুরে বাসায় চলে এসেছেন। লাঞ্চ খাবার পর হঠাৎ কেন জানি তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। বমি-বমি ভাব হতে লাগল। বাসায় এসে খানিকক্ষণ শুয়ে ছিলেন। এখন শরীর ভালো লাগছে। বাসায় ফেরার পথে দুটা খবরের কাগজ কিনেছিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সারা

দুপুর তাই পড়েছেন। খবরের কাগজ পড়া তাঁর নেশার মতো। আগে একটা কাগজ রাখা হত। খরচে পোষাচ্ছে না বলে গত তিন মাস ধরে রাখা হচ্ছে না। তবে প্রায়ই খবরের কাগজ কেনা হচ্ছে। আজ যেমন কেনা হল। না কিনে করবেনই বা কী? আমেরিকা – ইরাকের যুদ্ধের খবর পাবেন কোথায়? গোড়াতে তিনি ধরে নিয়েছিলেন সাদ্দাম লোকটা মহা গাধা। গাধা না হলে আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করে? এখন দেখা যাচ্ছে লোকটাকে যতটা গাধা মনে হয়েছিল ততটা গাধা না। সাত দিন তো যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে গেল। আমেরিকার সঙ্গে সাত দিন যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তো সোজা ব্যাপার না। মুসলমান হল, মাথা গরমের জাত—এই লোকটার দেখা যায় মাথা ঠাণ্ডা।

ফরিদা শোবার ঘরে ঢোকামাত্র সোবাহান সাহেব বললেন, 'ফরিদা এক কাপ চা দাও তো।'

'চায়ের সাথে আর কিছু খাবে? মুড়ি আছে। দিব?'

'দাও। আর শোন, মানিব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে কাকে দিলে, সঞ্জুকে?'

'হ্যাঁ।'

'অভ্যাস খারাপ করে দিচ্ছ। টাকা চাইলেই দিবে?'

'দশটা মোটে টাকা।'

'দশ টাকা মোটেই সামান্য না। দশ দিন যদি দশ টাকা করে দাও তাহলে কত হয়? একশ। একশ টাকায় দশ সের চাল পাওয়া যায়। তার উপর যুদ্ধ লেগে গেছে — থার্ড ওয়ার্ল্ড–ওয়ার। সারা পৃথিবীর অবস্থা কাহিল।'

'এইখানে তো আর যুদ্ধ হচ্ছে না?'

'না বুঝে কথা বলবে না। যুদ্ধের এফেক্ট সারা পৃথিবীতে পড়বে। অলরেডি পড়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কোথায় হয়েছিল? ইউরোপে। লোক মারা গেল কোথায়? বাংলাদেশে। লাখ লাখ লোক। এক জন দুজন না। এইবার মারা যাবে কোটিতে।'

ফরিদা বললেন, 'যাই তোমার চা নিয়ে আসি।'

'কথা শেষ করে নেই তারপর যাও। বস।'

ফরিদা বসলেন। শঙ্কিত মনেই বসলেন। এই মানুষটার বক্তৃতা দেবার অভ্যাস আছে। একবার বক্তৃতা শুরু হলে ঘণ্টা খানিক চলবে। প্রতিটি কথা শুনতে হবে খুব মন দিয়ে। কথার মাঝখানে এদিক–ওদিক তাকালেই মানুষটা রেগে যায়। অবশ্য বক্তৃতা সে শুধু তাঁর সঙ্গেই দেয়, অন্য কারো সঙ্গে একটি কথাও বলে না।

সোবাহান সাহেব খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমার মেয়েরা কোথায়?'

'মুনার বান্ধবীর জন্মদিন। সে দুবোনকে নিয়ে ঐখানে গেছে। ওরা গাড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে। রাতে সেখানে খাবে তারপর গাড়ি করে দিয়ে যাবে।'

'গাড়ি করে নিয়ে যাক আর হেলিকপ্টারে করেই নিয়ে যাক — যার বান্ধবীর দাওয়াত সে যাবে। গুষ্ঠিসুদ্ধো যাবে কেন? এইসব আমার পছন্দ না।'

'মাঝে মাঝে একটু–আধটু বেড়াতে গেলে কী অসুবিধা?'

'অসুবিধা আছে। এতে পাড়া–বেড়ানি অভ্যাস হয। দিনরাত খালি ঘুর ঘুর করতে ইচ্ছা করে। মেয়েদের জন্যে এটা ভালো না। আমাদের অফিসের করিম সাহেবের এক ছোট শালি বি, এ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। তার এ রকম পাড়া–বেড়ানি স্বভাব। হুট–হাট করে এখানে যায়, ওখানে যায়। এক দিন কোন বন্ধুর খোঁজে দুপুরে ছেলেদের এক হোস্টেলে গিয়ে উপস্থিত ... তারপর থাক বাকিটা আর বলতে চাই না....'

'শুনি না তারপর কী?'

'না থাক। সব কিছু শোনা ভালো না। যাও চা নিয়ে আস।'

চা এনে ফবিদা দেখলেন, 'মানুষটা বমি কবে সমস্ত ঘব ভাসিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বিছানায় বসে আছে। চোখ রক্তবর্ণ। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

ফরিদা ভীত গলায় বললেন, 'কী হয়েছে?'

সোবাহান সাহেব প্রায় অস্পষ্ট গলায বললেন, 'শবীবটা খুব খাবাপ লাগছে। নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে।'

'সে কী!'

তিনি পেটে হাত দিয়ে আবাব বমি করলেন।

এই কঠিন গম্ভীর মানুষটা অসুখ-বিসুখ একেবারেই সহ্য কবতে পাবে না। অল্প শবীব খাবাপেই শিশুর মতো হযে যায। আজ শরীবটা বেশি বকম খাবাপ। ফবিদা হাত-মুখ ধুইযে তাঁকে মেয়েদেব বিছানায শুইয়ে দিয়ে এসেছেন। নিজেব শোবার ঘব ধুয়ে মুছে মেয়েদের ঘবে যখন ঢুকলেন, তখন সন্ধ্যা মিলিযে গেছে। সোবাহান সাহেব কম্বল গায়ে দিযে হাত-পা গুটিযে শুযে আছেন। তাঁর গায়ে জ্বব। অন্ধকাব ঘবে ভনভন কবে মশা উড়ছে। ফবিদা মশাবি খাটিযে স্বামীব বিছানায উঠে এলেন। কোমল গলায বললেন, 'শরীরটা কি বেশি খাবাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

ফবিদা স্বামীব মাথা কোলে তুলে নিলেন। মাথায তাঁব মনটা ভবে যাচ্ছে। মানুষটাকে এখন একেবাবে শিশুব মতো লাগছে। কোলে মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে আছে। একটু নড়ছেও না।

'শরীব এখন কি একটু ভালো লাগছে?'

'হুঁ।'

'ঘুমাতে চেষ্টা কব। আমি মাথায হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

ফবিদা স্বামীব মাথায হাত বুলিযে দিতে দিতে কল্পনায সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড দেখতে লাগলেন। সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। চাবদিকেব পানি ঘন নীল। যে দিকে তাকানো যায নীল ছাড়া আব কিছুই নেই। সমুদ্রেব নীলেব সঙ্গে মিশেছে আকাশেব নীল। দ্বীপে কোনো জনমানব নেই, গাছপালা নেই। মরুভূমিব মতো ধু-ধু বালি। জোছনা বাতে সেই বালি চিক চিক করে জ্বলে।

সোবাহান সাহেব অস্পষ্ট স্বরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ফবিদা বললেন, 'ঘুম আসছে না?'

'না।'

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস কবি, সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে কি গাছপালা আছে?'

'হুঁ আছে।'

'তুমি গেছ কখনো সেখানে?'

'না।'

'তাহলে জান কী করে?'

সোবাহান সাহেব সেই কথাব জবাব না দিযে উঠে বসলেন। ক্ষীণস্বরে বললেন, 'আমাকে বাথরুমে নিয়ে যাও। আবার বমি আসছে।'

তাঁর জ্বর আরো বেড়েছে। চোখ হয়েছে রক্তবর্ণ।

ফরিদা তাঁকে ধরে ধরে বিছানা থেকে নামালেন। সোবাহান সাহেব বিড়-বিড় করে বললেন, 'ঘর একদম খালি। বাচ্চা-কাচ্চারা না থাকলে আমার ভালো লাগে না, এরা কখন আসবে?'

'এসে পড়বে।'

'সঞ্জু, সঞ্জু কোথায় গেছে?'

'বন্ধুর বাসায়।'

'সন্ধ্যার পর বন্ধুর বাসায় যাওয়া-যাওয়ি আমার পছন্দ না।'

'রোজ তো যায় না। মাঝেমধ্যে জরুরি কাজ থাকলে যায়।'

'কী জরুরি কাজ?'

ফরিদা চুপ করে রইলেন। সোবাহান সাহেব বললেন, 'বমি ভাবটা চলে গেছে। আমাকে শুইয়ে দাও।'

'মাথায় পানি ঢালব? অনেক জ্বর।'

'পানি ঢালতে হবে না।'

তিনি আবার বিছানায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন। একটি কম্বলে শীত মানছে না। গায়ের উপর আরেকটা লেপ দেয়া হল। পায়ে মোজা পরিয়ে দিয়ে ফরিদা শঙ্কিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একজন ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার। কাকে দিয়ে খবর দেয়াবেন? বাড়িওয়ালার ছেলেটাকে বললে সে কি এনে দেবে না?

'ফরিদা?'

'কি।'

'তোমার ছেলেমেয়েরা আমাকে এত ভয় পায় কেন? আমি কি কখনো এদের গায়ে হাত তুলেছি না উঁচু গলায় কোনো কথা বলেছি?'

'ভয় পায় না।'

'অবশ্যই পায়। কেউ আমাকে একটা কথা এসে বলে না। যা কিছু বলার বলে তোমাকে।'

'চুপ করে শুয়ে থাক।'

'শুয়েই তো আছি। মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হয়, ভাবি কী করেছি আমি?'

'গম্ভীর হয়ে থাক, এই জন্যে বোধ হয় একটু দূরে দূরে থাকে।'

'গম্ভীর হয়ে থাকলে অসুবিধা কী? একটা লোক যদি গম্ভীর হয়ে থাকে তাহলে তাকে কি কিছু বলা যাবে না?'

'ওরা ভাবে ওদের কথা শুনলে তুমি রাগ করবে তাই ....'

'এটা তো তুমিও ভাব।'

'আমি ভাবব কেন?'

'তুমি যদি না ভাব তাহলে সঞ্জুর জরুরি কথাটা আমাকে বললে না কেন? আমি রাগ করতে পারি এই ভেবেই তো তুমি বলছ না।'

ফরিদা চাপা অস্বস্তি নিয়ে বললেন, 'সঞ্জু তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যেতে চায়।'

'কোন জায়গায়?'

'সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড।'

'এটা শুনে আমি রাগ করব কেন? রাগ করার এখানে কী আছে? যুবক বয়স, এই বয়সে নানান জায়গায় ঘোরার ইচ্ছা তো হবেই। সঞ্জুর বয়স কত এখন?'

'তেইশ।'

'তেইশ বছর বয়সে আমি একা একা দার্জিলিং গিয়েছিলাম।'

'আমাকে তো কখনো বল নাই।'

'বাড়ি থেকে রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। শুধু বড় মামা জানত। বড় মামা — পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন।'

'রাগ করেছিলে কেন?'

'আমার বাবা ছিল খুব রাগী। রাগলে উনার মাথা ঠিক থাকত না। একবার রেগে গেলেন তারপর সব লোকজনের সামনে জুতোপেটা করলেন।'

'সে-কী! এমন কী করেছিলে যে জুতোপেটা করতে হল! এত বড় ছেলেকে জুতোপেটা করবে এটা একটা কথা হল। কেমন মানুষ উনি?

'বাবার সম্পর্কে এমন তাচ্ছিল্য করে কথা বলবে না। উনার রাগ ছিল বেশি। রাগ বেশি থাকা অপরাধ না। সঞ্জু যাচ্ছে কবে?'

'এখনো ঠিক হয় নাই। সামনের সপ্তাহে যাবে বোধ হয়।'

'ওর গরম কাপড় তো কিছু নাই। একটা স্যুয়েটার কিনে দিও। আর একটা মাফলার। সমুদ্রের তীরে খুব ঠাণ্ডা হওয়ার কথা। হু হু করে বাতাস। ফট করে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। কানে ঠাণ্ডা লাগে সবার আগে। আমার গরম চাদরটাও দিয়ে দিও।'

'আচ্ছা।'

'দেশ-বিদেশ ঘুরলে মন বড় হয়। কত কী দেখা যায়। শেখা যায়। আমার টাকা-পয়সা নাই। টাকা-পয়সা থাকলে দেশ-বিদেশে পাঠাতাম। দেশের ভিতর এখানে-ওখানে যেতে চায় — যাবে। এটা শুনে আমি রাগ হব কেন?'

ফরিদা স্বামীর মাথার চুল টানতে টানতে বললেন, 'দার্জিলিং তোমার কাছে কেমন লেগেছিল বল তো?'

'ভালো।'

'কেমন ভালো বল। শীতের সময় গিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'খুব শীত না?'

'হুঁ।'

'কতদিন ছিলে দার্জিলিঙে?'

সোবাহান সাহেব জবাব দিলেন না। মনে হল তার শরীর একটু যেন কেঁপে উঠল। ফরিদা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সোবাহান সাহেবের চোখ ভেজা। তিনি নিঃশব্দে কাঁদছেন।

৩

রানার বড় ভাইয়ের বাড়ি আদাবরে।

পাঁচ তলা হুলস্থুল ধরনের বাড়ি। যার একতলার দুটি ইউনিটে রানারা থাকে। বাকি চারতলা ভাড়া দেয়া হয়েছে। রানা মূলত এই বাড়ির একজন কেয়ারটেকার। পরপর তিন বার ইন্টারমিডিয়েট ফেল করবার পর রানার বড় ভাই — সাদেক আলি রানাকে একদিন

ডেকে পাঠান এবং খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে বলেন, 'পড়াশোনা তোকে দিয়ে হবে না — তুই বরং ব্যবসাপাতি কর।'

রানা সঙ্গে সঙ্গে 'হ্যাঁ–সূচক' মাথা নাড়ে এবং খুব নিশ্চিন্ত বোধ করে।

'আজকাল পয়সা হচ্ছে কনস্ট্রাকশনে, ব্রিক ফিল্ড একটা ভালোমতো চালাতে পাবলে লাল হয়ে যাবি। পারবি না?'

রানা আবার 'হ্যাঁ–সূচক' মাথা নাড়ে।

'আচ্ছা তাহলে তাই করব। পড়াশোনা তোর লাইন না। নাকি আরেকবার পরীক্ষা দিতে চাস? ভেবে বল। লাস্ট চান্স একটা নিবি?'

'না।'

'তিনে যার হয় না, চারেও তার হবে না। আচ্ছা যা ব্রিক ফিল্ড একটা কবে দেব — ইনশাআল্লাহ্।'

এইসব কথাবার্তা আজ থেকে ন মাস আগের। রানা মোটামুটি নিশ্চিত যে ব্রিক ফিল্ডেব রমরমা দিন তার আসছে। শুধু সময়ের ব্যাপার। গত ন মাসে বাড়ির কেয়ার টেকারেব দাযিত্ব তার ঘাড়ে চেপেছে। সে এই কাজ বেশ মন দিযে করছে। তিনতলাব ভাড়াটেব ইলেকট্রিক ফিউজ জ্বলে গিয়ে ফ্ল্যাট অন্ধকার — রানাকে দেখা যাবে টর্চ লাইট জ্বালিযে ফিউজ ঠিক করছে। দোতলার ভাড়াটে দেয়ালে পেইনটিং বসাবে। মিস্ত্রি ডেকে দেযালে ফুটো করার কাজেব পুরো দাযিত্বই তার। এইসব ছাড়াও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তার ডাক পড়ছে। চারতলাব ভাড়াটের ছেলেব আকিকা। দুটা খাসি আমিন বাজার থেকে কিনে আনা, মৌলানার ব্যবস্থা করা, আওলাদ হোসেন লেন থেকে কিসমত বাবুর্চিকে নিযে আসাব জটিল সব কাজ সে আনন্দ এবং আগ্রহের সঙ্গে করে।

রানার স্বভাব খুব মধুর। না হেসে কোনো কথা বলতে পারে না। যে যাই বলে তাই সে সমর্থন করে। কোনো ঝগড়াঝাটি শুরু হলে মধ্যস্থতাব জন্যে অসম্ভব ব্যস্ত হযে পড়ে। স্কুল এবং কলেজ জীবনের বন্ধুদের জন্যে তার মমতাব কোনো সীমা নেই। সে নিজে পড়াশোনা ছেড়ে দিযেছে কিন্তু অন্যদের পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা নিযে তাব চিন্তার শেষ নেই। অনার্স ফাইন্যাল পরীক্ষার সময সে তাব প্রতিটি বন্ধুব পবীক্ষা কেমন হযেছে তার খোঁজ প্রতিদিন নিযেছে। মোতালেবেব ফোর্থ পেপার খুব খাবাপ হযেছে। পেপার ক্র্যাশ করতে পারে শুনে সে দুশ্চিন্তায রাতে ভালো ঘুমাতেও পাবে নি।

রিং রোডের মাঝামাঝি একটা চাযের রেস্টুরেন্টে রানা বাকির খাতা খুলে রেখেছে। সেই বাকির খাতায় তার চার বন্ধুর নাম লেখা। দোকানদারকে বলা আছে — এই চার জন এবং এই চার জনের সাথে কোনো বন্ধুবান্ধব থাকলে তারাও বাকি খেতে পারবে। যা খেতে চায়, তাই।

রানার বন্ধুরা এই চায়ের দোকানেই রানাব সঙ্গে আড্ডা দেয। সপ্তাহে অন্তত এক দিন বিকাল তিনটা থেকে রাত দশটা–এগারটা পর্যন্ত আড্ডা চলে। বাত বেশি হযে গেলে দোকানেই পাটির উপর ঘুমিয়ে পড়ার ব্যবস্থা আছে। বালিশ এবং এক্সট্রা মশাবি বানা বাড়ি থেকে নিয়ে আসে; তবে বন্ধুদেব কখনো বাড়িতে নিতে পাবে না। রানাব বড় ভাই পছন্দ করেন না।

আজ চায়ের দোকানে সঞ্জু, তারেক এবং মোতালেব বিকেল পাঁচটা থেকে বসে আছে। রানার খোঁজ নেই। একটা কাজের ছেলে বলে গেছে — 'এক্ষণ আইব, আপনাগো চা–পানি খাইতে বলছে।'

রানার বন্ধুরা ইতোমধ্যে সবাই চার কাপ করে চা খেয়েছে। দশ টাকার পিঁয়াজু খেয়েছে। ডিমের অমলেট খেয়েছে। প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপ নিয়ে তুমুল আলোচনাও চলছে। তবে পুরোপুরি ফাইন্যাল করা যাচ্ছে না। সবাই একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে অথচ দুজন এখনো অনুপস্থিত। রানা এবং বল্টু। বল্টু থাকে বাসাবোতে। সে আসবে একটা টিউশ্যানি শেষ করে। আসতে-আসতে নটা বাজবে। রানা কেন আসছে না কে জানে। কোনো একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে।

রানার সমস্যা বেশ গুরুতর, তাদের টয়লেটের কমোডে কী যেন হয়েছে, হুড়-হুড় করে পানি বের হয়ে চারদিক ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্লাম্বার এক জনকে আনা হয়েছে, সে খানিকক্ষণ পর পর বিরস মুখে বলছে — 'কিছুই তো বুঝি না, পানি আহে কোন হান থুন?'

সাদেক আলি একতলার বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছেন এবং গজরাচ্ছেন, 'গাধাটা করে কী? সামান্য জিনিসও পারে না! পানিব মিস্ত্রি আনতে বললাম, রাস্তা থেকে কাকে ধরে নিয়ে এসেছে। কিছুই জানে না।'

পানির মিস্ত্রি এই কথায় অপমানিত বোধ করে কী বলেছিল, বানাব ভাই তাকে 'চুপ শুযোরের বাচ্চা' বলে ধাঁতানি দিয়েছেন।

মিস্ত্রির শরীর বন্য মহিষের মতো। ঘাড় গর্দানে এক হয়ে আছে। তাকে শুযোবেব বাচ্চা বলতে হলে যথেষ্ট সাহস লাগে। সাদেক আলির সাহস সীমাহীন। মাঝখানে ঘাবড়ে গেছে রানা।

মিস্ত্রি থমথমে গলায় বলল, 'আপনে যে আমাবে শুযোবের বাচ্চা কইলেন।'

সাদেক আলি বললেন, 'চুপ। আবার মুখে মুখে কথা। রানা দে তো এই হাবামজাদাব গালে একটা চড়। আমাকে কোশ্চেন করে। সাহস কত!'

এমন পরিস্থিতিতে বাড়ি ছেড়ে চাযেব দোকানে আসা সম্ভব না। বানা একবাব সাদেক আলির দিকে একবার পানির মিস্ত্রির দিকে তাকাচ্ছে।

সাদেক আলি আরেকবাব হুংকাব দিলেন, 'দাঁড়িযে দেখছিস কী, চড় দে।'

বানা সত্যি সত্যি চড় বসিযে দিল।

'প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপেব' ব্লু প্রিন্ট তৈবি প্রায শেষ।

দাযিত্ব ভাগ করে দেযা হযেছে, মোতালেব টাকা-পয়সার ব্যাপাবগুলো দেখবে, তাকে অর্থমন্ত্রী বলা চলে। জেনারেল ফান্ড থাকবে তার কাছে। জেনাবেল ফান্ড থেকে টাকা-পযসা সে-ই খরচ করবে। খাওযা-দাওয়া, নাশ্তা এইসব বিষযে কারো আলাদা কিছু করতে হবে না। সবাই একই ধরনের খাবার খাবে। একই নাশ্তা।

কল্যাণ মন্ত্রীর পোর্ট ফলিও সর্বসম্মতিক্রমে রানাকে তার অনুপস্থিতিতেই দেযা হযেছে। দলের সুখ-সুবিধা সে দেখবে। হোটেল খুঁজে বের করা, এক জাযগা থেকে অন্য জাযগায কীভাবে যাওয়া হবে এই সব ব্যবস্থা তার। ট্রেনের টিকিটও সে-ই কাটবে। সেন্ট মার্টিনে কীভাবে যেতে হবে তাও সে-ই খুঁজে বের করবে।

মোতালেব বলল, 'এন্টারটেইনমেন্টটা আমার হাতে ছেড়ে দে। গান-বাজনা দিয়ে হুলস্থূল করে দেব।'

তারেক বিরক্ত গলায় বলল, 'তুই গান জানিস না-কি?'

'ক্যাসেট প্লেয়ার নিচ্ছি। রবীন্দ্র সংগীতের ছটা ক্যাসেট নিচ্ছি।'

তারেক আরো বিরক্ত হয়ে বলল, 'যাচ্ছি এক ধরনের এক্সপিডিসনে — সেখানে রবীন্দ্র সংগীত? কুঁ কুঁ করে — 'সখী গো — ধর ধর।"

'টেগোরকে নিয়ে এই রকম ইনসালটিং কথা বললে কিন্তু ফাটাফাটি হয়ে যাবে। নাক বরাবর ফ্রি-স্টাইল ঘুসি খাবি।'

মোতালেব ক্রমাগত সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে গিয়ে সে সিগারেট ছেড়ে দেবে — কাজেই যতটা পারা যায় খেয়ে নেয়া। সে দশ মিনিটের মাথায় তৃতীয় সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বলল, 'এত বড় একটা আন্দোলনের মাথায় আমাদের কি যাওয়া উচিত? আবেকবার ভেবে দেখ সবাই।'

তারেক খুবই বিরক্ত হল। রাগী গলায় বলল, 'আন্দোলন নিয়ে তুই বড়-বড় বাত ছাড়বি না। গোটা আন্দোলনের সময় তুই ঘরে বসে ফিডার দিয়ে দুধ খেয়েছিস। আন্দোলন করেছি আমরা। পুলিশের বাড়ি খেয়ে মাথা ফাটিয়েছি। চারখান স্টিচ লেগেছে। এরশাদকে 'গেট আউট' করেছি — এখন খানিকটা আমোদ-ফুর্তি করা যায়।'

'আন্দোলন তো এখনো শেষ হয় নি।'

'ফিরে এসে করব। উইথ নিউ এনার্জি। এবশাদকে জেলখানায় নেযাব জন্যে লাঠি-মিছিল হবে। আমরা সবাই থাকব একেবারে ফ্রন্টে।'

সঞ্জু উঁচু গলায় বলল, 'চুপ কবতো — ইম্পর্টেন্ট কাজ বাকি আছে। দুটা ডিসিশান নিতে হবে। এক নম্বর — শুভ্র না-কি আমাদের সঙ্গে যেতে চাচ্ছে — ওকে নেয়া যাবে না।'

মোতালেব বলল, 'মাথা খারাপ ওকে কী জন্যে নেব? আন্ধাকে নিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত কোলে নিয়ে ঘুরতে হবে। পিসু করতেও তাব কমোড লাগে।'

সঞ্জু বলল, 'গোড়াতেই ওকে না করার দবকাব ছিল। তখন তো কেউ কিছু বললি না।'

'তখন ভেবেছিলাম নিজে থেকেই পিছিয়ে পড়বে। এইসব পুতুপুতু জাপানি ডল শুরুতে খুব উৎসাহ দেখায় শেষ পর্যন্ত যায় না।'

মোতালেব বলল, 'ওরটা আমার উপব ছেড়ে দে। আমি সামলাব।'

সঞ্জু বলল, 'তুই কীভাবে সামলাবি?'

'আমাদের আলটিমেট পরিকল্পনার কথা বললেই সে চোখ বড়-বড় কবে বলবে — আমি যাব না।'

মোতালেবের আলটিমেট পরিকল্পনা অবশ্যি এখনো দলেব অনুমোদন পায় নি। তবে সরাসরি কেউ এখন পর্যন্ত 'না' বলে নি। মেয়েরা যদি শেষ পর্যন্ত সঙ্গে যায় তাহলে এই পরিকল্পনার প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েরা সম্ভবত যাবে না। মেয়েরা সব ব্যাপারে শুরুতে খুব উৎসাহ দেখায়, তারপর যেই বাড়ি থেকে একটা ধমক খায় ওমনি সব ঠাণ্ডা।

মোতালেবের পরিকল্পনা হল — জোছনা রাতে ঠিক বাবটা এক মিনিটে প্রকৃতিব সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য সভ্যতার সমস্ত সংশ্রব বিসর্জন দিতে হবে অর্থাৎ জামাকাপড় সব খুলে আদি মানব হতে হবে। তারপর সমুদ্রের জলে নেমে যাওযা। প্রকৃতির পরিপূর্ণ অংশ হয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে জল থেকে উঠে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ছুটে যাওয়া হবে। বালিতে গড়াগড়ি করা হবে। আবার পানিতে নেমে যাওয়া। এরকম চলবে সারা রাত। ঠিক সূর্য উঠার পর পর সভ্য জগতে ফিরে আসা হবে। জামাকাপড় গায়ে দেযা হবে।

মোতালেবের পরিকল্পনাটা যেমন — বর্ণনাব ভঙ্গি তাবচে অনেক বেশি সুন্দর। সে হাত-পা নেড়ে গলার স্বর উঠা-নামা করে পুরো ব্যাপারটা এমন ভাবে বলল যে, কেউ

তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলতে পারল না, শুধু রানা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমরা নেংটো হয়ে দৌড়াদৌড়ি করব তখন যদি স্থানীয় লোকজন আমাদের পিটিয়ে দেয়।'

মোতালেব ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'স্থানীয় লোক? স্থানীয় লোক কোথায় পেলি তুই? সেন্ট মার্টিন হল একটা প্রবাল দ্বীপ। জনমানব নেই। ধু-ধু করছে বালি, নারকেল গাছ, পাম গাছের সারি। আধো অন্ধকার আধো আলো।'

'ঠাণ্ডা লাগবে না, শীতের সময়?'

'ঠাণ্ডা তো লাগবেই। আদিম মানবের ঠাণ্ডা লাগে নি? তাছাড়া স্যুয়েটার গায়ে দিয়ে পানিতে নামলে কি তোর ঠাণ্ডা কম লাগবে? যাই হোক, আমি আমার পরিকল্পনার কথা বললাম, তোরা যদি রাজি নাও হোস আমি একাই এগিয়ে যাব। যাকে বলে — একলা চল, একলা চল রে।'

রানা এবং বল্টু দুজন প্রায় এক সঙ্গেই চায়ের দোকানে ঢুকল। রানার ভাবভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে ভয়াবহ দুর্যোগ অতিক্রম করে এসেছে। এখনো নিজেকে পুরোপুরি সামলে উঠতে পারে নি। বল্টুকেও কেমন যেন বিপর্যস্ত লাগছে। বল্টু ছোটখাটো মানুষ, কোনো সমস্যা হলেই সে আরো ছোট হয়ে যায় বলে মনে হয়।

সে সঞ্জুর পাশে বসতে বসতে বলল, 'অবস্থা কেরোসিন। আনুশকা আমার বাসায় এসেছিল, বলেছে সব মিলিয়ে পাঁচ জন মেয়ে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।'

মোতালেব বলল, 'মাথা খারাপ নাকি। মেয়েদের আমরা সাথে নিচ্ছি না। নট এ সিংগেল ওয়ান।'

বল্টু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'সেই কথা এখন বলে লাভ কী? তোরা আগে কোথায় ছিলি? তখন গদগদ গলায় কেন বললি — তোমরা মেয়েরা যদি যেতে চাও, যেতে পার। নো প্রবলেম।'

'আমি কোনোদিন এই কথা বলি নি। মেয়েদের না নেয়ার পেছনে আমার একশ একটা যুক্তি আছে।'

'সেই একশ একটা যুক্তি তুই আনুশকাকে বুঝিয়ে বল।'

'আমি তার বাসায় গিয়ে যুক্তি বুঝিয়ে আসব? আমার এত দায় পড়ে নি।'

'বাসায় গিয়ে যুক্তি বুঝাতে হবে না। আনুশকা এখানে আসছে। আমি ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি — দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। তার আসার আগে-আগে একটা কথা আমি পরিষ্কার বলতে চাই — মেয়েদের সঙ্গে নেয়ার আমি ডেড এগেইনস্টে। যদি তাদেরকে নিতে চাও, নাও আমার নামটা কেটে বাদ দিয়ে দাও। আমার স্ট্রেইট কথা।'

সঞ্জু বলল, 'তোর এত আপত্তি কেন? যেতে চাচ্ছে যাক না। দল যত বড় হয় ততই তো ভালো।'

বল্টু কঠিন গলায় বলল, 'পাঁচটা মেয়ে সঙ্গে গেলে আমাদের ভেড়া বানিয়ে রাখবে। সারাক্ষণ ফরমাস, এটা কর, ওটা কর। জংলা জায়গায় যাচ্ছি — কোথায় বাথরুম, কোথায় কী! তারপর সুন্দর সুন্দর মেয়ে — ধর গুণ্ডা বা ডাকাত এ্যাটাক করে একটাকে ধরে নিয়ে গেল — তখন অবস্থা কী হবে? কিংবা ধর সমুদ্রে নেমেছে হঠাৎ ঢেউ এসে একটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। চোরাবালিতে আটকে গেল এক জন। তখন তোরা কী করবি আমাকে বল।'

কেউ কোনো কথা বলল না।

রানা আরেক দফা চায়ের কথা বলে এসে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমারও মনে হয় মেয়েদের নেয়া ঠিক হবে না। তবু যদি নিতেই হয় তাহলে একটা লিখিত আন্ডারটেকিং দিয়ে নিতে হবে। লেখা থাকবে আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।'

মোতালেব কড়া গলায় বলল, 'চুপ কর গাধা। যত দিন যাচ্ছে তুই ততই গাধা হচ্ছিস। ভদ্রসমাজে কথা বলার কোনো যোগ্যতা তোর নেই। আমাদের ডিসিশান মেকিং-এর সময় তুই দয়া করে একটা কথা বলবি না। নট এ সিংগেল ওয়ার্ড।'

আনুশকাদের কালো বিশাল গাড়ি চায়ের দোকানের সামনে এসে থেমেছে। আনুশকা যখন সন্ধ্যার পর চলাফেরা করে তখন ড্রাইভার ছাড়াও ড্রাইভারের পাশে এক জন থাকে। তার নাম মফিজ। আনুশকার দিকে নজর রাখাই যার একমাত্র কাজ। আনুশকা হাসিমুখে গাড়ি থেকে নামল। চাযের দোকানের সবাই ঘুবে তাকাল। অনেকক্ষণ কারো চোখে পলক পড়ল না। পলক না পড়ারই কথা। আনুশকার মতো রূপবতী সচরাচর চোখে পড়ে না।

চায়ের দোকানের মালিক উঠে দাঁড়িয়েছে — এমন কাস্টমার তার দোকানে আসে না। ইনি নিশ্চযই কাস্টমার না, অন্য কোনো ব্যাপার। আনুশকা দোকানেব মালিকের দিকে তাকিযে মিষ্টি গলায বলল, 'চিনি এবং দুধ ছাড়া এক কাপ চা দিতে পারেন?' বলেই অপেক্ষা করল না — এগিযে গেল দলটিব দিকে।

রানা অস্বস্তিব সঙ্গে বলল, 'এখানে রাতের বেলা আসাব কী দবকাব ছিল?'

আনুশকা বসতে বসতে বলল, 'কোনোই দরকার ছিল না, তবু আসলাম। যাবাব ব্যাপারটা চূড়ান্ত কবতে চাই। সব মিলিযে আমবা পাঁচ জন মেযে যাচ্ছি। তাদেব প্রতিনিধি হিসেবে আমি এসেছি।'

বল্টু অন্য দিকে তাকিযে বলল, 'আমবা তোমাদেব নিচ্ছি না।'

'আমিও তাই আন্দাজ কবছিলাম। কেন জানতে পাবি?'

'অনেক ঝামেলা।'

'কী কী ঝামেলা তা কি বলা যাবে?'

'একশ একটা ঝামেলা। তাব মধ্যে একটা বললেই তোমবা পিছিযে যাবে।'

'বল শুনি।'

'সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে কোনো বাথরুম নেই।'

'বাথরুম নেই?'

'না।'

'যদি না থাকে তোমরা একটা বাথরুম বানিযে দেবে।'

মোতালেব ক্রুদ্ধ গলায বলল, 'সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে আমরা বাথরুম বানানোব জন্যে যাচ্ছি?'

'কী জন্যে যাচ্ছ শুনি?'

'সেটা এখন তোমাকে এক্সপ্লেইন কবতে পাবব না। আমাদেব অনেক পবিকল্পনা আছে। মেয়েছেলে থাকলে সেখানে সমস্যা।'

'মেয়েছেলে-পুরুষছেলেব মধ্যে তফাতটা কী শুনি? পুরুষ হযেছ বলে তোমাদেব কি একটা লেজ গজিয়েছে?'

'তর্কাতর্কির কোনো ব্যাপার না — আসল কথা এবং ফাইন্যাল কথা তোমাদের আমবা নিচ্ছি না। আমরা স্বাধীনভাবে ঘুরব।'

'আমরা সঙ্গে থাকলে পরাধীন হযে যাবে? এইসব শিখেছ কোথেকে?

রানা বলল, 'তর্ক করার জন্যে তর্ক করলে তো লাভ হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা দেখ — এটা যদি পিক্‌নিক হত, ধর জয়দেবপুরে যাচ্ছি — সকালে যাব সন্ধ্যায় ফিরে আসব, তাহলে একটা কথা ছিল। ব্যাপারটা মোটেই পিক্‌নিক না। এক সপ্তাহের জন্যে যাচ্ছি।'

চা দিয়ে গেছে। চিনি-দুধ ছাড়া গাঢ় কালো রঙের খানিকটা তরল পদার্থ। যা দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়ার কথা। আনুশকা নির্বিকার ভঙ্গিতে তাতে চুমুক দিচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, চা খয়ে সে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছে।

মোতালেব বলল, 'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কর আনুশকা, তুমি সাত দিনের জন্যে আমাদের সঙ্গে যেতে চাও। অচেনা-অজানা জায়গায় রাতে-বিরাতে ঘুরবে। অথচ এই ঢাকা শহরেও তুমি সন্ধ্যাব পর একা চলাফেবা করতে পার না। তোমাব সঙ্গে একটা বিশাল গাড়ি থাকে। গাড়িতে ড্রাইভাব ছাড়াও এক জন বডিগার্ড থাকে। থাকে না?'

আনুশকা চায়ের কাপ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং শীতল গলায় বলল, 'গাড়ি বিদায় কবে আবাব আসছি। তোমাদেব সঙ্গে বাত বারটা পর্যন্ত গল্প কবব। তারপব একা একা বাসায় ফিবব।'

দলেব সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি কবল। সবাই দেখল আনুশকা ড্রাইভাবকে কী বলতেই হুস কবে গাড়ি বেবিয়ে গেছে। আনুশকা শান্ত মুখে ফিরে আসছে। যেন কিছুই হয় নি।

সে বসতে বসতে বলল, 'তোমবা কবে যাচ্ছ শুনি?'

'মঙ্গলবাব।'

'এই মঙ্গলবার?'

'হুঁ। বাতেব ট্রেনে যাব। চিটাগাং পৌছবে ভোববেলা। সকালে নাশতা খেয়ে বাসে ক'বে যাব কক্সবাজাব। এক বাত সেখানে থেকে পবদিন ভোরে রওনা হব টেকনাফ। অর্থাৎ টেকনাফ পৌছাচ্ছি বৃহস্পতিবাব দুপুবে। সেখানে কোনো একটা হোটেলে লাঞ্চ ক'বে নৌকা নিয়ে যাব সেন্ট মার্টিন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় পৌছব। সন্ধ্যাব পব আকাশে উঠবে পূর্ণ চন্দ্র।'

আনুশকা বলল, 'শেষবাবেব মতো জিজ্ঞেস কবছি। তোমবা আমাদেব নিচ্ছ কি নিচ্ছ না?'

সঞ্জু বলল, 'নিচ্ছি না।'

'ভেরি গুড। আমবা নিজেবা-নিজেবা যাব। একই সময়ে বও[illegible]ব। একই ট্রেনে যাব। টেকনাফও একই ভাবে পৌছব। এখন কি ব্যাপাবটা বুঝতে পাবছ?'

'এই পাগলামিব কোনো মানে হয়?'

'মানে না হলে কিছু কবাব নেই। আমার সিদ্ধান্ত আমি জানিয়ে গেলাম। এখন বাসায় যাচ্ছি। আমাব বাসায় সবাই বসে আছে। ওদেব খবব দিতে হবে।'

রানা বলল, 'গাড়ি তো ফেবত পাঠিয়ে দিয়েছ, চল তোমাকে বাসায় দিয়ে আসি।'

আনুশকা বাগী গলায় বলল, 'কাউকে বাসায় পৌছে দিতে হবে না। I can take care of myself.'

'কী মুশকিল তুমি একা যাবে নাকি?'

'অফকোর্স আমি একা একা যাব। আমাকে তোমরা ভেবেছ কী?'

'রিকশা বা বেবিট্যাক্সিতে তুলে দেই?'

'না, তাও তুলতে হবে না। আমি একা যাব।'

সবাইকে মোটামুটি হকচকিত করে আনুশকা বেরিয়ে গেল। যাবাব আগে ম্যানেজারকে চায়ের দাম দিয়ে গেল। ম্যানেজাব কিছুতেই দাম নেবে না। আনুশকা বলল, 'আবাব যখন

আসব, আপনার গেস্ট হিসেবে তিন কাপ চা খাব। আজকের দামটা রাখুন। আজ তো আমি আপনার গেস্ট না। আজ প্রথম পরিচয় হল। ভাই আপনার নাম কি?'

ম্যানেজার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, 'মোহম্মদ ইসমাইল মিয়া।'

'মোহম্মদ ইসমাইল মিয়া, যাই। খোদা হাফেজ।'

আনুশকাকে রিকশা বা বেবিট্যাক্সির জন্যে বেশিদূর হাঁটতে হল না। কারণ সে গাড়ি বিদায় করে নি। ড্রাইভারকে বলেছে গাড়ি শ্যামলী সিনেমা হলের কাছে নিয়ে রাখতে। ড্রাইভার তাই রেখেছে।

৪

ধানমণ্ডি তের নম্বরে আনুশকাদের বাড়ি।

বাড়িটা একতলা, অনেক উঁচু কম্পাউন্ড। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ছোট্ট একটা বাড়ি। গেট খুলে ভেতরে ঢুকলে হকচকিয়ে যেতে হয়। দেড় বিঘা জায়গার উপর চমৎকার বাড়ি। বাড়ির চেয়েও সুন্দর চারপাশের বাগান। দু জন মালি এই বাগানের পেছনে সারাক্ষণ কাজ করে। আনুশকার বাবা মনসুর আলি এদের কাজে পুরোপুরি খুশি নন। তিনি আরেকজন মালি খুঁজছেন যে গোলাপ বিশেষজ্ঞ। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এখনো কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই চমৎকার বাড়ি বৎসরের বেশির ভাগ সময় খালি পড়ে থাকে, কারণ বাড়ির মূল বাসিন্দা মাত্র দুজন। আনুশকা এবং তার বাবা। আনুশকার মা দশ বছর আগে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করেছেন। এখন স্থায়ীভাবে বাস করছেন অস্ট্রেলিয়ায়। একটিমাত্র মেয়ের প্রতি তাঁর তেমন কোনো আকর্ষণ আছে বলে মনে হয় না। চিঠিপত্র বা টেলিফোনে যোগাযোগ নেই বললেই হয়।

আনুশকার বাবা মনসুর আলি মানুষটি ছোটখাটো। তাঁর মুখ দেখলেই মনে হয়, জগৎ-সংসারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত আছেন। যদিও মানুষটি সদালাপী, অত্যন্ত ভদ্র। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কাটে সমুদ্রের উপর। পেশায় তিনি একজন নাবিক। বর্তমানে চেক জাহাজ "এনবিও কর্ণির" তিনি প্রধান চালক। তিনি যখন জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে থাকেন তখন আনুশকা বাড়িতে থাকে না। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে থাকে। বাড়িটা দু জন মালি, দু জন দারোয়ান, তিনটি কাজের মেয়ে এবং এক জন ড্রাইভারের হাতে থাকে। এরা ছাড়াও বাড়ি পাহারা দেয় একটি জার্মান শেফার্ড কুকুর। কুকুরটির বয়স এগার — অর্থাৎ সে তার আয়ু শেষ করে এসেছে। আর হয়তো বছর খানেক বাঁচবে। আজকাল জোছনা রাতে সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে ডাকে। কুকুরটার নাম — মেঘবতী। মেঘের মতো গায়ের রং হওয়ায় পুরুষ কুকুর হয়েও স্ত্রী জাতীয় নাম তাকে নিতে হয়েছে। নামকরণ করেছে আনুশকা। আনুশকার সঙ্গে মেঘবতীর তেমন ভাব নেই। মনসুর আলি সাহেবকে দেখলে মেঘবতীর আনন্দ এবং উল্লাসের সীমা থাকে না। সে যেন তখন তার যৌবন ফিরে পায়। একবার সে আনন্দে অভিভূত হয়ে মনসুর আলি সাহেবের জুতা কামড়ে ফালা ফালা করে ফেলেছিল।

আজো তাই হচ্ছে।

কোনো খবর না দিয়ে মনসুর আলি সাহেব উপস্থিত হয়েছেন। এয়ারপোর্ট থেকে বিকল্প ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসা। দারোয়ান গেট খুলে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তিনি

বললেন — 'সব ভালো?' দারোয়ান কিছু বলার আগেই মেঘবতী ছুটে এল। যে গতিতে সে ছুটে এল তা এগার বছরের কুকুরের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। মেঘবতী তার কুকুর-হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা একসঙ্গে প্রকাশের জন্যে ব্যস্ত। মানুষের মতো তার কোনো ভাষা নেই। সুমধুর সংগীত নেই।

মনসুর আলি সাহেব হাত বুলিয়ে মেঘবতীকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। সে শান্ত হচ্ছে না। আরো অস্থির হয়ে পড়েছে।

হৈচৈ শুনে বারান্দায় চারটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ভীত চোখে গেটের দিকে তাকিয়ে আছে। এরা আনুশকার চার বান্ধবী — নইমা, নীরা, ইলোরা এবং জরী। তারা এসেছে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাবার ব্যাপারে কথা বলতে। আজ রাতটা তারা এ বাড়িতে থাকবে। হৈচৈ করবে।

মনসুর আলি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'ইদ্রিস এরা কারা?'

ইদ্রিস বলল, 'আপার বান্ধবী।

'আনুশকা কি বাসায় নেই?'

'জ্বে না, গাড়ি লইয়া গেছেন, সাথে মফিজ দারোয়ান আছে।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা।'

মনসুর আলি এগিয়ে গেলেন। মেয়ে চারটি আরো জড়োসড়ো হয়ে গেল।

মনসুর আলি বললেন, 'মারা তোমরা কেমন আছ?'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

তিনি হাসিমুখে বললেন, 'আমি আনুশকার বাবা। হঠাৎ চলে এসেছি। আজ বুঝি তোমাদের পার্টি?'

নইমা বলল, 'স্লামালিকুম চাচা।'

'ওয়ালাইকুম সালাম মা এস ভেতরে যাই। বাইরে ঠাণ্ডা। তোমাদের একা রেখে আনুশকা কোথায় গেল?'

'ও এক্ষুনি এসে পড়বে।'

তারা বসার ঘরে একসঙ্গে ঢুকল। মনসুর আলি বললেন, 'মারা তোমরা একটু বস। তোমাদের এক নজর ভালো করে দেখি। কি নাম তোমাদের মা?'

তারা নাম বলল।

সবার শেষে নাম বলল জরী। বলেই মনসুর আলিকে বিস্মিত করে দিয়ে কাছে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

তিনি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন। তাকিয়েই মনে হল — মেয়েটা বড় সুন্দর। তরুণী শরীরে বালিকার একটি স্নিগ্ধ মুখ। যে মুখের দিকে তাকালে মনে এক ধরনের বিষাদ বোধ হয়।

জরী সালাম করায় অন্য মেয়েদেরও এগিয়ে আসতে হল। মনসুর আলি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'মাঝে মাঝে আমি কোনো খবরাখবর না দিয়ে হঠাৎ চলে আসি। এবার এসেছি দশ দিনের জন্যে। এডেন বন্দরে আমার জাহাজের একটা টারবাইন নষ্ট হয়ে গেল। ওটা সারাতে কুড়ি দিনের মতো লাগবে। ভাবলাম ওরা টারবাইন সারাতে থাকুক, এই ফাঁকে আনুশকাকে দেখে আসি। আনুশকা ছাড়া, দেশে আসার আমার আরো একটা জরুরি কারণ ছিল — এরশাদ গভমেন্ট ফল করানোর চেষ্টা চলছে সেই খবর পাচ্ছিলাম, ভাবলাম নিজের চোখে দেখে আসি কী হয়। এই বয়সে আন্দোলনে তো আর অংশ নিতে পারব না, অন্তত উপস্থিত থাকি। আমরা যারা বাইরে

থাকি তারা দেশের জন্যে খুব ছটফট করি। আচ্ছা মা, তোমরা গল্প-টল্প কর। তোমবা কি ডিনার করে ফেলেছ?'

'জ্বি না।'

'বেশ, তাহলে ডিনারের সময় গল্প করব। আমি খানিকটা বিশ্রাম কবি। শবীরটা ভালো লাগছে না। যারা জাহাজ চালায় তারা আকাশ যাত্রা খুব অপছন্দ করে। আকাশে উঠলেই তাদের শরীর খারাপ করে।'

মনসুর আলি বিশ্রামের কথা বলে উঠলেন। কিন্তু বিশ্রাম নেবার কোনো লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। তিনি বাগানে চলে গেলেন। মালি এসে বাইবেব সবগুলো বাতি জ্বেলে দিল। বাইবে থেকে ফিরেই তিনি প্রথম যা দেখেন তা বাগান। বাগান দেখা হলে নিজের ঘরে ঢুকে পর পর তিন পেগ মার্টিনি খান। তারপর প্রায ঘণ্টাখানিক বাথটাবে শুযে স্নান করেন।

তিনি বাগানে হাঁটছেন।

ঘবেব কাজের মানুষগুলো অতি ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি কবছে। পানিব টাবে গবম পানি ভর্তি করা হচ্ছে। মার্টিনি তৈবি করা হচ্ছে। ঘবেব বিছানায নতুন চাদব বিছানো হচ্ছে। ধবধবে সাদা চাদর ছাড়া তিনি ঘুমাতে পাবেন না। শুধু বিছানাব চাদব নয, দবজা জানালার চাদর সবই হতে হয সাদা। এতে নাকি জাহাজ-জাহাজ ভাব হয। অন্য সময তাঁব ঘরের পর্দা থাকে বঙিন। তিনি এলেই সব পাল্টানো হয।

মনসুর আলি বাগানে হাঁটছেন। তাব পেছনে পেছনে আসছে মেঘবতী। মালি দুজন সঙ্গে সঙ্গে আছে। তাবা খানিকটা শঙ্কিত। মনসুব আলি কখনো কাবো সঙ্গে উঁচু গলায কথা বলেন না। তবু সবাই তাঁর ভযে তটস্থ হয়ে থাকে।

তিনি বাগান থেকেই লক্ষ কবলেন আনুশকাব গাড়ি ঢুকছে। দাবোয়ান খুব আগ্রহ নিয়ে তাকে কী সব বলছে। অবশ্যই তাঁব আসাব খবব। তিনি মালি দুজনেব দিকে তাকিয়ে নরম গলায বললেন, 'তোমবা এখন যাও।'

আনুশকা তার সঙ্গে দেখা কবাব জন্যে বাগানে আসবে।

তিনি চান না কন্যাব সঙ্গে দেখা হবাব সমযটায মালি দুজন থাকে। তিনি হাতেব চুরুট ফেলে মেযেব জন্যে অপেক্ষা কবতে লাগলেন।

আনুশকা গেটেব কাছেই গাড়ি থেকে নেমেছে। সে হালকা চালে কযেক পা এগুলো তারপর কী যেন হল, ঠিক যে গতিতে মেঘবতী ছুটে এসেছিল সেই গতিতে ছুটে এল। মেঘবতী যেমন করে তার ওপর ঝাঁপিযে পড়েছিল সেও তেমনি ঝাঁপিযে পড়ল। আনুশকা এখন আর একুশ বছব বযসী তরুণী নয। সে যেন ছ বছবেব বালিকা। বাবাকে জড়িযে ধরে ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদছে এবং কোটেব একটি অংশ চোখের জলে ভিজিয়ে ফেলছে।

কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে সে যে কথাগুলো বলছে তা হল, 'বাবা, তুমি খুব খাবাপ। বাবা, তুমি খুব খারাপ।'

মনসুর আলি মেযেব মাথায হাত বুলাতে বুলাতে নিচু গলায বলছেন, 'শান্ত হও মা, শান্ত হও।'

শান্ত হবার কোনো বকম লক্ষণ আনুশকাব মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, 'মা তোমার বন্ধুরা অপেক্ষা কবছে। তুমি ওদেব কোম্পানি দাও। আমাব খাবাব ব্যবস্থা কী কবছে একটু দেখ। শুঁটকি মাছ খেতে ইচ্ছা কবছে। ঘবে কি শুঁটকি মাছ আছে?'

আনুশকা চোখেব জল মুছে হাসিমুখে বলল, 'অবশ্যই আছে। আমি সব সময রাখি। তুমি হুট করে একদিন চলে আস। এসেই বিশ্রী জিনিসটা খেতে চাও।'

'মনটা শান্ত হয়েছে মা?'

'হযেছে।'

'যাও বন্ধুদেব কাছে যাও। তোমবা ডিনাব কবে নিও –– আমাব খেতে অনেক দেবি হবে।'

মনসুর আলি আরেকটা চুরুট ধরালেন। আনুশকা বলল, 'তুমি না গতবাব আমাব কাছে প্রতিজ্ঞা কবে গেলে সিগারেট ছেড়ে দেবে ?'

'সিগারেট তো মা ছেড়েই দিযেছি। সিগাবেট ছেড়ে আমি এখন চুরুট ধবেছি।'

'ভালো করেছ। কদিন থাকবে?'

'দশ দিন।'

'আমি কিন্তু মঙ্গলবাব এক জাযগায বেড়াতে যাচ্ছি।'

'আমিও কি যাচ্ছি?'

'না তুমি যাচ্ছ না। আমবা কিছু বন্ধু মিলে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড যাচ্ছি। জোছনা বাতে প্রবাল দ্বীপে ঘুরব।'

'বাহ্ ভালো তো। তোমাব যে সব বন্ধুদেব দেখলাম ওবা সবাই যাচ্ছে?'

'জবী ছাড়া সবাই যাচ্ছে।'

'ও যাচ্ছে না কেন?'

'ওকে তাব বাবা-মা যেতে দেবেন না। তাদেব ফ্যামিলি খুব কনজাবভেটিভ। কী বকম যে কনজাবভেটিভ চিন্তাই কবতে পারবে না। তাছাড়া কযেকদিন আগে তাব এনগেজমেন্ট হযেছে। তাব স্বামীব দিকেব লোকজনও যখন জানবে যে সে একদল ছেলেমেযেব সঙ্গে সেন্ট মার্টিন গেছে অমনি বিযে 'নট' হযে যাবে। আমবা অবশ্যি খুব চাপাচাপি কবছি।'

'এই বকম অবস্থায চাপচাপি না করাই তো ভালো মা।'

আনুশকা বাগী গলায বলল, 'না কবা ভালো কেন? সোসাইটি চেঞ্জ কবতে হবে না। মেযে হযেছি বলে কি আমবা ছোট হযে গেছি? আমবা কি চিনামাটিব পুতুল যে আমাদেব সাজিযে গুজিযে শো কেসে তালাবদ্ধ কবে বাখতে হবে? আমবা নিজেব ইচ্ছায কোনো কিছু কবতে পাবব না? কোথাও যেতে পাবব না? সব সময একটা আতঙ্ক নিযে থাকতে হবে?'

'তুমি তো মা বিবাট বক্তৃতা দিযে ফেলছ।'

'মাঝে-মাঝে বাগে আমাব গা জ্বলে যায বাবা। সত্যি রাগে গা জ্বলে ।'

মনসুব আলি হাসলেন। আনুশকা থমথমে গলায বলল, 'সব পুরুষেব উপব আমাব প্রচণ্ড বাগ বাবা। তোমাব উপবও বাগ। তুমি পুরুষ না হযে মেযে হলে খুব ভালো হত। বাবা আমি ভেতবে যাচ্ছি। দেখি জবীকে বাজি কবানো যায কিনা।'

জবীকে কিছুতেই কাযদা কবা গেল না। যে যাই বলে সে হেসে বলে –– 'পাগল, আমি একদল ছেলেমেযেব সঙ্গে এতদূব গেলে বঁটি দিযে কুপিযে আমাকে চাক চাক কববে।'

নীবা বলল, 'করুক না। আগেই ভযে অস্থিব হযে যাচ্ছিস কেন? আমাব ফ্যামিলি কি কম কনজাবভেটিভ? কলেজে যখন পড়তাম মা এসে কলেজে দিযে যেতেন, কলেজ থেকে নিযে যেতেন। একদিন আগে-আগে কলেজ ছুটি হযে গেলে বিকশা কবে বাসায চলে এসেছি — মাব কী বাগ। চিৎকাব কবছে — তোব এত সাহস? তোব এত সাহস?'

জবী বলল, 'খালা এখন তোকে যেতে দিচ্ছেন?'

'অফকোর্স দিচ্ছেন। আমি বলেছি — ইউনিভার্সিটি থেকে যাচ্ছি। দুজন স্যাব আমাদেব সঙ্গে যাচ্ছেন। এক জন পুরুষ স্যাব, এক জন মহিলা স্যাব।'

'মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছিস? যদি জানতে পারেন।'

'জানতে পারলে জানবে। আই ডোন্ট কেয়ার। আমি কাউকেই কেয়ার করি না আমি হচ্ছি সুনীলের প্রেমিকা।'

ক্লাসে নীরার নাম হচ্ছে — সুনীলের প্রেমিকা। নীরা নামের মেয়েকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচুর কবিতা ও গল্প আছে। নামকরণের এই হচ্ছে উৎস। নীরা যখন নতুন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করে — তখন ফিসফিস করে বলে, 'ভাই আমার নাম নীরা, আমি হচ্ছি সুনীলের প্রেমিকা। আমাকে চিনেছ তো?' নতুন মেয়েটি সাধারণত হকচকিয়ে বলে, 'চিনতে পারছি না তো।' তখন নীরা গলার স্বর আরো নামিয়ে বলে, 'সে কী, আমাকে নিয়ে সুনীল যে সব কবিতা লিখেছে তার একটাও তুমি পড় নি? ঐযে ঐ কবিতাটা —

'এ হাত ছুঁয়েছে নীরার হাত। আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি।'

এই কবিতাটা তো আমার এই রোগা কালো হাত নিয়ে লেখা। তখন নখগুলো বড় বড় ছিল। সুনীল আমার হাত ধরতেই নখের খোঁচায় তার হাত কেটে রক্ত বের হয়ে গেল। কী লজ্জা বল তো।' *

আনুশকা বলল, 'আয় খেতে খেতে গল্প করি। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। বাবা এখন খাবেন না। কাজেই খেতে খেতে ফ্রিলি কথা বলতে পারবি।'

নইমা বলল, 'অশ্লীল রসিকতা করা যাবে? একটা সাংঘাতিক অশ্লীল রসিকতা শুনেছি, তোদের না-বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। এমন জঘন্য রসিকতা এর আগে শুনি নি। জঘন্য কিন্তু এমন মজার — হাসতে হাসতে তোরা গড়াগড়ি খাবি।'

জরী করুণ মুখে বলল, 'তোর এই সব রসিকতা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগে।'

নইমা বলল, 'খারাপ কী আছে? ছ দিন পর তোর বিয়ে হচ্ছে — শুধু অশ্লীল রসিকতা? আরো কত কী শুনবি হাসবেন্ডের কাছে। আগে থেকে একটু ট্রেনিং থাকা ভালো না?'

'প্লিজ না, প্লিজ।'

ইলোরা বলল, 'তুই কানে তুলো দিয়ে রাখ জরী। আমি শুনব। আমার শুনতে ইচ্ছা করছে।'

নইমা বলল, 'গল্পটা হল হরিদ্বারের এক সাধুকে নিয়ে। সাধু চিরকুমার। এবং দিগম্বর সাধু। রাস্তায় রাস্তায় উদোম ঘুরে বেড়ায়....।'

এই পর্যন্ত বলতেই ইলোরা মুখে আঁচল দিয়ে হাসতে লাগল। সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল সবার মুখে ... গল্পটা সত্যি মজার। জরীও হেসে ফেলল। সচরাচর এই জাতীয় গল্পে সে হাসে না।

নইমা বলল, 'খেতে খেতে আরো দুটি গল্প শুনাব। সেই দুটি আরো মারাত্মক। আনুশকা, খাবার টেবিলে বয়-বাবুর্চি কেউ আসবে নাতো। এই সব গল্প ক্লোজ সার্কেলের বাইরে কেউ শুনলে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে।'

জরী খেতে বসল না।

সে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'তোমরা খাও, আমি চাচার সঙ্গে খাব। উনি একা খাবেন।'

---

* মূল কবিতায় আছে এ হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ। আমি কি এ হাতে কোন পাপ করতে পারি? নীরা নিজের সুবিধার জন্যে কবিতার লাইনটি একটু পাল্টে নিয়েছে।

আনুশকা বলল, 'বাবা একা-একা খেতেই বেশি পছন্দ করে। তুই খা তো আমাদের সঙ্গে। বাবার খেতে অনেক দেরি আছে।'

'দেরি হলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমার মোটেও ক্ষিধে পায় নি।'

ইলোরা বলল, 'তুই এত ঢং করছিস কেন? উনার মেয়ে উনাব সঙ্গে বসছে না আব তুই কিনা .... মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি। ঢং কবিস না তো।'

'ঢং কবছি না। আমার এখন খেতে ইচ্ছা কবছে না।'

নইমা বলল, 'ও আমাদের সঙ্গে খেতে বসছে না তাব মূল কাবণ কি জানিস? আমাদেব সঙ্গে বসলেই গল্প শুনতে হবে — এই তাব ভয়। এ রকম ভিক্টোবিয়ান মানসিকতা তুই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুবিতে কী কবে পেলি বল তো? তোব হাজবেন্ড যখন হাত বাড়িয়ে......'

জবী আতংকে নীল হয়ে বলল, 'তোব পায়ে পড়ি নইমা আব বলিস না।'

'সত্যি সত্যি পায়ে ধব — নয়তো সেনটেন্স শেষ কবব।'

জবী উঠে এসে নইমাব দুই হাত ধবল। করুণ গলায় বলল, 'লজ্জা দিস না নইমা, প্লিজ।'

নইমা বলল, 'আচ্ছা যা মাফ কবে দিলাম।'

নীবা বলল, 'আনুশকা আমাব ডানদিকে একটা খালি চেযাব বাখতে হবে।

আমি সব সময তাই কবি। সুনীল সেই চেয়াবে বসে। ওব একটা হাত থাকে আমাব কোলে।'

নইমা বলল, 'সেই হাত নিষ্ক্রিয না সক্রিয?'

সবাই খিলখিল কবে হেসে উঠল।

মনসুব আলি খেতে বসে খুব অবাক হলেন।

জবী মেয়েটি তাব সামনে প্লেট নিয়ে বসে আছে।

তিনি বললেন, 'মা, তুমি খাও নি?'

'জ্বি না চাচা। আমি আপনাব সঙ্গে খাব।'

'আমাব সঙ্গে খাবে?'

জবী নিচু গলায বলল, 'কেউ একা একা খাচ্ছে এটা দেখলে আমাব খুব খাবাপ লাগে চাচা।'

'আমি কিন্তু মা, সব সময একাই খাই। জাহাজে জাহাজে থাকি তো, কেবিনে খাবার দিয়ে যায।'

'সমুদ্র কি আপনাব ভালো লাগে চাচা?'

'যখন সমুদ্রে থাকি তখন ভালো লাগে না। কিন্তু সমুদ্র ছেড়ে ডাঙ্গায আসলেই খুব অস্থির লাগে। সমুদ্রেব এক ধবনেব নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষায সে ডাকে। সেই ভাষা বোঝাব জন্যে এক দিন দুদিন সমুদ্রে থাকলে হয না। বছবেব পব বছব থাকতে হয।'

জবী হালকা গলায বলল, 'চাচা আমি এখনো সমুদ্র দেখি নি। খুব দেখতে ইচ্ছা কবে।'

'ইচ্ছা কবাই তো স্বাভাবিক।'

'আমি মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে সমুদ্র স্বপ্নে দেখি।'

'ওদেব সঙ্গে গেলে দেখতে পাবতে। স্বপ্নেব সমুদ্রেব চেয়ে বাস্তবেব সমুদ্র অনেক বেশি সুন্দর। স্বপ্ন এবং কল্পনা এই একটি জিনিসকে কখনো অতিক্রম কবতে পাববে না। মা তুমি ওদের সঙ্গে যাও।'

'আমার পক্ষে সম্ভব হবে না চাচা। বাবা-মা কিছুতেই রাজি হবে না।'

'ও আচ্ছা, আচ্ছা। বাবা-মার মত না থাকলে যাওয়া উচিত হবে না। সবচে ভালো হয় কী জান মা? সবচে ভালো হয় স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যদি প্রথম সমুদ্র দেখ।'

জরী কিছু বলল না।

তিনি বললেন, 'আনুশকা বলছিল তোমার নাকি এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে?'

জরী অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'জ্বি।'

'তাহলে বিয়ের পর ঐ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আমি বরং এক কাজ করব। ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে একটা চিঠি লিখে যাব। সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ঐ চিঠি তার কাছে নিয়ে গেলেই তোমাদেব দুজনের জন্যে সমুদ্রগামী জাহাজে ঘুরবার ব্যবস্থা করে দেবে। আমি দেশ ছেড়ে যাবার আগে আনুশকার কাছে চিঠি দিয়ে যাব।'

'থ্যাংক ইউ চাচা।'

'মাই ডিয়ার চাইল্ড, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। মা শোন, ডিনারেব সঙ্গে আমি একটু রেড ওয়াইন খাই, কুড়ি বছরের অভ্যেস। তুমি সামনে বসে আছ বলে অস্বস্তি বোধ করছি।'

'অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই চাচা। আপনি খান।'

'এখন বল, যে ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হল, সে কী করে?'

'ব্যবসা করে।'

'কীসের ব্যবসা?'

'কীসের ব্যবসা তা ঠিক জানি না। তবে তাদের অনেক টাকা-পযসা।'

'অনেক টাকা-পযসা কথাটা তুমি এমনভাবে বললে যাতে মনে হয অনেক টাকা-পযসা তোমার পছন্দ না।'

জরী চুপ করে রইল।

এখন সে আর ভাত মুখে দিচ্ছে না। শুধু মাখাচ্ছে।

তিনি কিছুক্ষণ মেযেটিব দিকে তাকিযে থেকে শান্ত গলায বললেন, 'মা ছেলেটিকে কি তোমার পছন্দ হয় নি?'

জরী বেশ স্পষ্ট স্বরে বলল, 'না।'

মনসুর আলি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। জরী আগের চেয়েও স্পষ্ট স্বরে বলল, 'তাকে আমার এতটুকুও পছন্দ হয নি।' বলে সে নিজেই বিস্মিত হল। সে তার মনেব এই কথাগুলো কাউকেই বলে নি। তাব মা-বাবাকে বলে নি। বান্ধবীদেব বলে নি। তার ডায়েরি, যেখানে অনেক গোপন কথা লেখা হয় সেখানেও এই প্রসঙ্গে একটি কথা লেখে নি। অথচ নিতান্ত অপরিচিত এক জন মানুষকে কত সহজেই না সে বলল। এই পৃথিবীতে কিছু-কিছু মানুষ আছে যাদেব কখনো অপরিচিত মনে হয না।

মনসুর আলি বললেন, 'একটা মানুষকে এক ঝলক দেখে বা এক দিন দুদিন দেখে তাব সম্পর্কে ধারণা তৈরি কবা ঠিক না। প্রায়ই দেখা যায শুরুতে একটা মানুষকে খারাপ লাগে, কিছুদিন পর আর লাগে না। অসম্ভব ভালো লাগতে শুরু করে। এই আমাকেই দেখ না কেন — আমাকে দেখে একটা কঠিন, আবেগহীন, রসকষবিবর্জিত মানুষ মনে হবে। আমি যে তা না সেটা বুঝতে হলে আমার সঙ্গে মিশতে হবে।'

জরী বলল, 'চাচা আপনাকে প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনি কেমন মানুষ। আমি এইসব খুব ভালো বুঝতে পারি।'

'অপছন্দের কথাটা তাহলে তুমি তোমার বাবা–মাকে বল।'

'উনাদের বলা সম্ভব না।'

'কেন সম্ভব না, জানতে পারি?'

'আমরা বড় চাচার সঙ্গে থাকি। আমাব বাবা কিছুই করেন না। উনি বড় চাচাব আশ্রিত বলতে পারেন। এই বিয়ে বড় চাচা ঠিক করেছেন, তাঁর বন্ধুর ছেলে। আমার না বলার কোনো উপায় নেই।'

'তোমার নিজের পছন্দের কোনো ছেলে কি আছে?'

'জ্বি না।'

'কী ধবনের ছেলে তোমাব পছন্দ বল তো শুনি। সব মেয়েব মনে স্বামী সম্পর্কে এক ধবনেব ধারণা থাকে। তোমার ধারণাটা জানতে ইচ্ছা কবছে।'

'ঐসব নিয়ে আমি কখনো ভাবি নি চাচা।'

মনসুর আলি সাহেবেব মনটাই খাবাপ হয়ে গেল। এই মেয়েটা তাঁর সঙ্গে খেতে না বসলেই ভালো হত। মেয়েটা তাঁব মন অসম্ভব খাবাপ কবে দিয়েছে। মন খাবাপ হলেই বক্তে শবীবেব ডাক প্রবল হয়ে উঠে। ভালো লাগে না। সমুদ্রেব কাছ থেকে তিনি এখন মুক্তি চান। মুক্তি।

আনুশকাদেব ঘবে এখন তুমুল ঝগড়া চলছে। ঝগড়া করছে নইমা এবং ইলোবা। ঝগড়াব কাবণ হচ্ছে ইলোবা নইমাকে ওয়েল ট্যাংকাব বলেছে। নইমাকে ওয়েল ট্যাংকাব আজ প্রথম বলা হল না। আগেও ফিসফিস কবে তাকে এই নামে ডাকা হয়েছে। তাব শবীরেব বিশালত্বের সঙ্গে নামটাব একটা যোগসূত্র আছে বলেই নইমা এই নাম সহ্য কবতে পাবে না।

নইমা এবং ইলোবাব বাকযুদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ ধবেই চলছে। আনুশকা একটু দূবে হাসি মুখে বসে আছে। নীবা আনুশকাব পাশে। তাবা দুজন ফিসফিস কবছে এবং চাপা হাসি হাসছে। নীরা বলল, 'আনুশকা আজকেব বাকযুদ্ধে কে জিতবে?'

আনুশকা বলল, 'ইলোরা। ওর সঙ্গে কথায় পাবা মুশকিল।'

'উঁহু। জিতবে নইমা। নইমা অশ্লীল ইংগিত কবে ইলোরাকে বাগিয়ে দেবে। বাগলে ইলোরার লজিক কাজ করে না। উল্টাপাল্টা কথা বলে। তুই নিজেই দেখ আস্তে আস্তে কেমন বাগাচ্ছে।'

'তুই কি আমাব সঙ্গে একশ টাকা বাজি বাখবি?'

'আচ্ছা বেশ একশ টাকা বাজি।'

বাজি রেখে দুজন আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে।

ইলোরা ঠাণ্ডা কথার প্যাঁচে নইমাকে ঘায়েল কবার চেষ্টা কবছে। নইমা কথা বলছে উঁচু গলায়। আনুশকা ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ কবে দিয়েছে যাতে আওযাজ বাইবে না যায়। আব কেউ যেন কিছু শুনতে না পায়।

ইলোরা বলছে, 'ওয়েল ট্যাংকার বলায় এত রাগিস কেন? ওয়েল ট্যাংকাব বললে তো তোকে অনেক কম বলা হয়। ফুলে ফেঁপে তুই যা হয়েছিস তোকে হিপোপোটেমাস ডাকা উচিত। তোব ঘাড় গর্দান সব এক হয়ে গেছে।'

'আমার ঘাড়গর্দান সব এক হয়ে গেছে?'

'হুঁ। তুই যখন রাস্তা দিয়ে যাস তখন আশপাশের লোকজন তোকে দেখে খুব আনন্দ পায়। এই রকম দৃশ্য তো সচরাচর দেখা যায় না।

'এই রকম দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না?'

'না। যতই দিন যাচ্ছে দৃশ্য ততই মজাদাব হচ্ছে। আচ্ছা ডেইলি তোর ওজন কত করে বাড়ে? এক কেজি না দু কেজি?'

'তোর নিজের ধারণা তুই রাজকুমারী?'

'আমাকে নিয়ে তো কথা হচ্ছে না। তোকে নিয়ে কথা হচ্ছে। তুই ওয়েল ট্যাংকাব কিনা তাই নিয়ে বিতর্ক।'

নইমা আর পারল না। হঠাৎ কেঁদে ফেলল। ছেলেমানুষের মতো হাউমাউ কবে কান্না।

আনুশকা নীবাকে বলল — 'দে টাকা দে। তুই বাজিতে হেরেছিস।'

নীরা ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। ওদের অতি প্রিয় এক জন বান্ধবী যে শিশুদেব মতো কাঁদছে ঐ দিকে তাদের কোনো নজর নেই।

জীবনের এই অংশটা বড়ই মধুব। আনুশকা উঠে গিযে ইংরেজি গান দিযে দিযেছে। সুব ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে —

Don't make my brown eyes blue.

নইমা চাপা স্বরে বলল, 'গান বন্ধ কর।'

আনুশকা বলল, 'গান বন্ধ করব কেন? তুই কাঁদছিস বলে আমাদেরও কাঁদতে হবে না-কি?'

ইলোরা এবং নীরা এক সঙ্গে হেসে উঠল, সেই হাসিতে নইমাও যোগ দিল।

নীরা বলল, 'তুই চট করে কেঁদে আমার একশ টাকা লস কবিযে দিলি। তুই জিতবি, এই নিয়ে একশ টাকা বাজি ছিল। তুই যত মোটা হচ্ছিস তোর বুদ্ধিও তত মোটা হচ্ছে।'

আবার সবাই হেসে উঠল।

নীরা বলল, 'রবীন্দ্র সংগীত দে ভাই, ইংরেজি ভালো লাগছে না।'

ইলোরা বলল, 'ফর গডস সেক, রবীন্দ্র সংগীত না। 'সখী ভালবাসি ভালবাসি' — এই সব গান আমার অসহ্য।'

অসহ্য হলেও উপায নেই। আনুশকা রাজেশ্ববী দত্তেব রেকর্ড খুঁজতে শুরু কবেছে।

আনুশকা বলল, 'শুরুর বাজনাটা শুনে কেউ যদি বলতে পাবিস এটা কোন গান তাহলে তাকে আমি পাঁচশ টাকা দেব। মন দিযে শোন'— রেকর্ড বাজতে শুরু কবেছে। সবাই চুপ করে আছে। সেতারের হালকা কাজ। কোন গান বোঝা যাচ্ছে না।

গান হচ্ছে। রাজেশ্বরী দত্তের কিন্নব কণ্ঠ ছড়িযে পড়ছে চারদিকে। চারটি তরুণী স্তব্ধ হযে বসে আছে।

যতবাব আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায বারে বাবে
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে ॥

আজ মঙ্গলবার।

ভোর সাতটা।

চায়ের টেবিলে শুভ্র এবং ইয়াজউদ্দিন সাহেব বসে আছেন। বেহানা নেই। তিনি রান্নাঘরে। ভাপা পিঠা বানানো হচ্ছে। তার তদারকি হচ্ছে। পিঠাগুলো কেন জানি কিছুতেই জোড়া লাগছে না। ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'আজই তো তোমাদের যাত্রা?'
শুভ্র মাথা নাড়ল।
'সব ঠিকঠাক আছে তো?'
'আছে।'
'রাতের ট্রেনে যাচ্ছ?'
'জ্বি।'
'টিকিট কাটা হয়েছে?'
'না। স্টেশনে গিয়ে কাটা হবে।'
'এডভান্স কাটা হল না কেন?'
'সবাই যাবে কিনা এখনো ফাইন্যাল হয় নি। যাদের যাবার কথা তার চেয়ে কয়েকজন বেশিও হতে পারে। আবার যাদের যাবার কথা তাদের মাঝখান থেকে কেউ কেউ বাদ পড়তে পারে।'
'অনেক আগে থেকেই তো প্রোগ্রাম করা। বাদ পড়বে কেন?'
'বল্টু বলছিল — সে যাবে কি যাবে না, তা মঙ্গলবার রাত আটটার আগে বলতে পারবে না।'
ইয়াজউদ্দিন সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'বল্টু? বল্টু মানে?'
'সয়েল সায়েন্সে পড়ে একটা ছেলে, আমার বন্ধু।'
'বল্টু নামের ছেলে তোমার বন্ধু?'
'ওর ভালো নাম অয়ন। লম্বায় খাটো বলে সবাই ওকে বল্টু ডাকে।'
'সবাই বল্টু ডাকে বলে তুমিও ডাকবে? তুমি নিজেও তো অসম্ভব রোগা। তোমাকে যদি কেউ যক্ষ্মা রোগী ডাকে তোমার ভালো লাগবে?'
'প্রথম কিছুদিন খারাপ লাগবে। তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে। তখন মনে হবে এটাই আমার নাম। তাছাড়া বল্টুর মতো আমারও নাম আছে।'
তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'তোমারও নাম আছে?'
'হ্যাঁ। বাংলা নববর্ষে সবাইকে খেতাব দেয়া হয়। আমাকেও দিয়েছে। এটা এক ধরনের ফান। এতে আপসেট হবার কিছু নেই।'
'তোমকে কী নামে ডাকে?'
'বাদ দাও বাবা, শুনলে তোমার হয়তো খারাপ লাগবে।'
'খারাপ লাগলেও আমি শুনতে চাই।'
'বন্ধুবান্ধবরা আমাকে ডাকে কানা-বাবা। চোখে কম দেখি তো, এই জন্যে।'
ইয়াজউদ্দিন শীতল গলায় বললেন, 'তোমাকে কানা-বাবা ডাকে?'
'জ্বি।'
'যারা তোমাকে কানা-বাবা ডাকে তাদের সঙ্গেই তুমি যাচ্ছ?'
শুভ্র চুপ করে রইল। সামান্য নাম নিয়ে বাবা এত রাগছেন কেন সে বুঝতে পারছে না। কত কুৎসিত নাম আছে। সেই সব নামের তুলনায় কানা-বাবা তো খুব ভদ্র নাম। মজার নাম।
ইয়াজউদ্দিন সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'কানা-বাবা নাম তোমাকে নববর্ষে খেতাব হিসেবে দেয়া হল?'
'না। এই নামটা এমনিতেই চালু হয়ে গেছে।'
'মনে হচ্ছে নাম চালু হয়ে যাওয়ায় তুমি খুব খুশি।'

'নামে কিছু যায় আসে না বাবা। আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে আছে বেশ মোটাসোটা। এই জন্যে তার নাম ওয়েল ট্যাংকার। আরেকটি খুব রোগা মেয়ে আছে, তার নাম সুতা ক্রিমি।'

'কী বললে সুতা ক্রিমি?'

'জ্বি।'

'এই নামে তাকে ডাকা হয়?'

'হ্যাঁ হয়।'

'সেও কি সুতা ক্রিমি ডাকায় তোমার মতোই খুশি?'

'না, সে খুব রাগ করে। কান্নাকাটি করে। এই জন্যে তাকে পুরো নাম ধবে ডাকা হয না, ছোট করে ডাকা হয়।'

'কী ডাকা হয় জানতে পারি?'

'তাকে আমরা ডাকি "সু–ক্রি"।'

'আমরা ডাকি মানে তুমি নিজেও ডাক?'

'না আমি কখনো ডাকি না। ওর আসল নামটা খুব সুন্দর। আমি ঐ নামেই ডাকি।'

'এর আসল নামটা কি?'

'নীলাঞ্জনা।'

ইযাজউদ্দিন সিগারেট হাতে বসে রইলেন। যে মেযের নাম নীলাঞ্জনা তাকে ক্লাসেব ছেলেরা ডাকছে সুতা ক্রিমি। কোনো মানে হয়?

'শুভ্র।'

'জ্বি।'

'নামকরণের বিষয় নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। শুনতেও চাচ্ছি না। তোমাকে কিছু উপদেশ দেবার জন্যে বসে আছি। উপদেশগুলো দেবার আগে একটা জিনিস জানতে চাই, যে সব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তুমি যাচ্ছ, তারা কি তোমাকে খুব আগ্রহ করে নিচ্ছে?'

'না। খুব আগ্রহ করে নিচ্ছে না। ববং ওবা চাচ্ছে আমি যেন না যাই।'

'এ রকম চাচ্ছে কেন?'

'ওদের ধারণা আমি চোখে দেখতেই পাই না। আমাকে নিযে ওরা বিপদে পড়বে। মোতালেব বলে আমার এক বন্ধু আছে, সে বলছে, 'শুভ্র তুই না গেলে ভালো হয। তুই যদি যাস তাহলে তোকে কোলে নিযে আমাদের ঘুরতে হবে।'

'মোতালেব কি তোমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

'হ্যাঁ। আমি তাই মনে করি। ওরা অবশ্যি তা করে না।'

'মোতালেব তোমাকে তুই তুই কবে বলে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমিও কি তাই বল?'

'না। আমি তুই বলতে পারি না।'

'আমার প্রথম উপদেশ হচ্ছে ওদের সঙ্গে মিশতে হলে ওদের মতো হযে মিশতে হবে। তুমিও তুই বলবে।'

'দ্বিতীয় উপদেশ কী?'

'দ্বিতীয় উপদেশ হচ্ছে দলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। সবাই তা পারে না। কেউ–কেউ পারে। তারা হচ্ছে ন্যাচারাল লিডার। তুমি তা নও। তোমার তেমন বুদ্ধি নেই,

অন্যদের মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা নেই। কিন্তু এসব ছাড়াও লিডারশিপ নেয়া যায়।'

'কীভাবে?"

'টাকা দিয়ে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কি ওদের সবাইকে টাকা দিয়ে বলব — এই নাও টাকা। এখন থেকে আমি তোমাদের লিডার। আমি যা বলব তাই শুনতে হবে।'

'ব্যাপারটা মোটামুটি তাই। তবে করতে হয় আবো সূক্ষ্মভাবে। যেমন ধর, তোমরা সবাই যখন স্টেশনে উপস্থিত হলে — টিকিট কাটা নিয়ে কথা হচ্ছে। থার্ড ক্লাসে যাওয়া হবে না সেকেন্ড ক্লাসে যাওয়া হবে — এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তখন তুমি বলবে — তোরা যদি কিছু মনে না করিস আমি একটা প্রথম শ্রেণীব পুরো কামবা রিজার্ভ করে বেখেছি। টিকিট কাটতে হবে না। আয় আমাব সঙ্গে। সবাই আনন্দে হৈহৈ করে উঠবে। খুব সূক্ষ্ম একটা প্রভাব তুমি ওদেব উপব ফেলবে।'

শুভ্র অবাক হযে বাবার দিকে তাকিযে বইল।

রেহানা পিঠা নিযে এসেছেন। তাঁকে খানিকটা লজ্জিত মনে হচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও পিঠাগুলো জোড়া লাগানো সম্ভব হয নি।

ইযাজউদ্দিন বললেন, 'এই বস্তুগুলো কী?'

'ভাপা পিঠা।'

'দযা করে এগুলো সামনে থেকে নিযে যাও।'

রেহানা পিঠাব থালা উঠিযে চলে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'ট্রেনে খাবারদাবাবে তুমি কিন্তু একটা পযসাও খরচ কববে না। সামান্য এক কাপ চা যদি খাও খুব চেষ্টা করবে যেন অন্য কেউ দাম দিযে দেয়।'

'আমি পুবো একটা প্রথম শ্রেণীর কামবা রিজার্ভ কবতে পাবি আব সামান্য চাযেব পযসা দিতে পারি না?'

'না পার না। যেই মুহূর্তে তুমি সব খরচ দিতে শুরু করবে সেই মুহূর্তেই বন্ধুদেব কাছে তুমি দুগ্ধবতী বোকা গাভী হিসেবে পরিগণিত হবে। যাকে সব সময দোহন কবা যায। এতে দলেব উপব কোনো প্রভাব তো পড়বেই না বরং তুমি সবাব হাসিব খোবাক হবে। সবাই তোমাকে নিযে হাসবে।'

শুভ্র এক দৃষ্টিতে বাবাব দিকে তাকিযে আছে। সে এক ধবনেব বিস্ময অনুভব কবছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'চিটাগাং থেকে কক্সবাজার তুমি ওদের ব্যবস্থামতোই যাবে। কিন্তু কক্সবাজার থেকে টেকনাফ যাবাব পথে আবাব মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা কববে। ঝকঝকে মাইক্রোবাস।'

'কীভাবে করব?'

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। ব্যবস্থা করা থাকবে। এতে যা হবে তা হচ্ছে সবাই জানবে তুমি ইচ্ছা কবলেই চমৎকার ব্যবস্থা কবতে পার। কিন্তু সেই ইচ্ছা তোমাব সব সময হয না। তোমার উপর এক ধরনের ভরসা তারা করতে শুরু করবে। তোমার প্রত্যক্ষ প্রভাব সবার উপর পড়তে শুরু কববে।'

'টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাবার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা পাওযা যায। ঐ সব নৌকা করেই তুমি যাবে, তবে নৌকা যদি ছোট হয এবং সমুদ্রে যদি ঢেউ বেশি থাকে তাহলে টেকনাফের বিডিআর ক্যাম্পে যাবে। ওদের একটা ট্রলাব আছে। যে ট্রলারের সাহায্যে ওরা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের বিডিআর আউট পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। ওদের খবর দেযা আছে। তুমি চাওয়া মাত্র ওরা তোমাকে সাহায্য করবে।'

শুভ্র বলল, 'বাবা আমি এসব কিছুই করতে চাই না।'
'চাও না?
'জ্বি না।'
'ভালো কথা। না চাইলে করতে হবে না। তবে রাতে ট্রেনের কামরা রিজার্ভ থাকবে এবং কক্সবাজারে হোটেল সায়মনের সামনে মাইক্রোবাস থাকবে। তুমি যদি মত বদলাও তাহলে এই সুবিধা নিতে পার।'
'আমি মত বদলাব না। আমি যেমন আছি তেমন থাকতে চাই বাবা। আমি কারোব উপর কোনো প্রভাব ফেলতে চাই না।'
'তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি হস্তক্ষেপ করব না — তবে ব্যবস্থা সবই থাকবে।'
টেলিফোনে রিং হচ্ছে। ইযাজউদ্দিন সাহেব উঠে গিযে টেলিফোন ধবলেন। হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে শোনা গেল,
'কে কানা-বাবা? তোর কাছে একস্ট্রা হ্যান্ড ব্যাগ আছে? আমাকে দিতে পাববি।'
ইযাজউদ্দিন সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'তুমি ধবে থাক। আমি কানা-বাবাকে দিচ্ছি।'
টেলিফোন করেছিল বল্টু। সে খট করে টেলিফোন নামিয়ে বাখল।

সঞ্জুর জিনিসপত্র গোছগাছ করা হচ্ছে।
গোছানোর কাজটা করছেন ফবিদা। সঞ্জু বলল, 'তুমি কষ্ট করছ কেন মা? দাও আমাকে দাও।'
ফরিদা ধমক দিলেন, 'তুই চুপ করে বস তো। চা খাবি? ও মুনা যা ভাইযাব জন্যে চা বানিয়ে আন। আমাকেও একটু দিস। আর তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে আয সে খাবে নাকি।'
সঞ্জু বলল, 'বাবা অফিসে যান নি?'
'না।'
'জ্বর তো কমেছে। জ্বর কমে নি?'
'হ্যা কমছে। তুই আজ চলে যাচ্ছিস — তাই অফিসে গেল না।'
'সে কী?'
সঞ্জুর সত্যি-সত্যি লজ্জা করতে লাগল। বাবা অফিসে না গিযে ঘরে বসে থাকাব সঙ্গে তার বেড়াতে যাবার সম্পর্কটা সে ঠিক ধরতে পারছে না।
ফরিদা বললেন, 'যা তুই তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে আয়।'
'আমি কী কথা বলব? বাবাকে দেখলেই আমার হার্ট বিট স্লো হযে যায।'
'কী যে তুই বলিস। উনি কি জীবনে তোদের বকা দিযেছেন নাকি উঁচু গলায একটা কথা বলেছেন?'
'তবু বাবাকে সাংঘাতিক ভয় লাগে মা। তুমি ঐ বদ-রঙা শালটা দিচ্ছ কেন?'
'তোর বাবা বলেছে সঙ্গে নিযে যেতে। নিয়ে যা। না নিলে উনি মনে কষ্ট পাবেন। আর শোন বাবা, যা উনার কাছে গিযে বস, একটু গল্প-টল্প কর।'

'কী গল্প করব বল তো?'
'গল্প না করলে না করবি। সামনে গিয়ে বস।'
সঞ্জু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে গেল।

সোবাহান সাহেব খবরের কাগজ পড়ছিলেন।
সঞ্জুকে ঢুকতে দেখেও খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন না। মৃদুস্বরে বললেন, 'বস।'
সঞ্জু বসল।
এমনভাবে বসল যেন বাবাব মুখোমুখি হতে না হয। সোবাহান সাহেব বললেন, 'সাদ্দামকে তোব কেমন মনে হয?'
প্রশ্নটি এতই অপ্রত্যাশিত যে সঞ্জু পুরোপুবি হকচকিযে গেল। সোবাহান সাহেব বললেন, 'স্কাড জিনিসটা তো দেখি খুবই মাবাত্মক।'
কিছু না বললে ভালো দেখায না বলেই সঞ্জু বলল, 'খুব মারাত্মক না। পেট্রিয়ট দিযে তো শেষ করে দিচ্ছে।'
'আবে না। এই সব ওযেস্টার্ন প্রেসেব কথাবার্তা। একটাও বিশ্বাস কববি না। সাদ্দাম সহজ পাত্র না। বুশেব কালো ঘাম বেব কবে দিযেছে। এই ঝামেলা হবে আগে জানলে সে মিডলইস্টেব ত্রিসীমানায আসত না।'
মিডলইস্টেব আলোচনায যাবাব কোনো রকম ইচ্ছা সঞ্জু অনুভব করছে না। অথচ সে বুঝতে পাবছে আলোচনায অংশগ্রহণ কবা খুবই উচিত। বাবা তাই চাচ্ছেন। কেমন বন্ধুর মতো গলায কথা বলছেন। যিনি তাঁব ছেলেমেযেদেব সঙ্গে কখনো কথা বলেন না তিনি যদি হঠাৎ বন্ধুব মতো আচবণ কবতে থাকেন তাহলে বিবাট সমস্যা হয।
মুনা চা নিযে আসায পবিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হল। কিছু একটা কবাব সুযোগ পাওযা গেছে। চা খাওযা নিযে ব্যস্ত থাকা যাবে।
চাযে চিনি হয নি। বিস্বাদ তিতকুট খানিকটা তবল পদার্থ, যাব উপর খুব কম হলেও চাবটা পিঁপড়া ভাসছে। মুনা, যতই দিন যাচ্ছে ততই গাধা হচ্ছে। বাবা সামনে না থাকলে ধমক দিযে দেযা যেত। এখন ধমক দেযাব প্রশ্নই ওঠে না। হাসি হাসি মুখ কবে চা খেযে যেতে হবে। মুড়ি ভিজিযে লোকজন যেমন চা খায তেমনি পিঁপড়া ভিজিযে চা খাওযা। সঞ্জু এক চুমুকে সব কটা পিঁপড়া খেযে ফেলল।
সোবাহান সাহেব বললেন, 'তোমাব মতো বযসে আমি একবার ঘুবতে বেব হযেছিলাম। দার্জিলিং গিযেছিলাম। বেনাপোল হযে কলকাতায। সেখান থেকে বাসে কবে শিলিগুড়ি।'
সঞ্জু চুপ করে বইল। সোবাহান সাহেব কোলেব উপব বালিশ টেনে নিযেছেন। এটা তাঁব দীর্ঘ আলাপেব প্রস্তুতি কিনা তা সঞ্জু বুঝতে পাবল না। বাবাব সব কথাবার্তাই সংক্ষিপ্ত, আজ কি তাঁকে কথা বলাব ভূতে পেযেছে? এত কথা বলছেন কেন?
'শিলিগুড়িতে একটা ধর্মশালায় এক বাত ছিলাম। ভাড়া কত জানিস? এক টাকা। ঐ ধর্মশালাতে থাকাই আমার কাল হল। সকালে উঠে দেখি টাকা পযসা সব চুরি হযে গেছে। পাযজামা পাঞ্জাবি গাযে দিযে কম্বলেব নিচে শুযেছিলাম। পায়জামা পাঞ্জাবি ছাড়া আর কিছুই নেই। হা-হা-হা।'
তিনি যে ভাবে হাসছেন তাতে মনে হচ্ছে ঐ সময়কার খারাপ অবস্থাটাও খুব মজার ছিল। যদিও মজার হবার কোনোই কারণ নেই। বিদেশে টাকা-পযসা চুবি হয়ে যাওযা তো ভযাবহ।

'তারপর কী হল শোন — আমার বিছানার পাশের বিছানায় ঘুমাচ্ছিলেন এক সাধুবাবা। তিনি বললেন, ক্যা হুয়া লেড়কা?

আমি বললাম, 'সব চুরি গেছে।'

'বাংলায় বললেন?'

'না বাংলায় বললে কী বুঝবে? আমি ভাঙ্গাচোরা হিন্দিতে বললাম "এক চোরানে সব লে কর ভাগ গিয়া।'

গল্পের এই পর্যায়ে মুনা ঘরে ঢুকে বলল, 'ভাইয়া বল্টু ভাই এসেছে। সঞ্জু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এখন বাবার সামনে থেকে উঠে যাবার একটা অজুহাত পাওয়া গেল। সে বলল, বাবা আমি একটু আসছি।'

বল্টু চুল কাটিয়েছে।

গায়ে মেরুন রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট। শার্ট নতুন কেনা হয়েছে। স্যুয়েটারে একটা ফুটো আছে বলে স্যুয়েটার পরেছে শার্টের নিচে। সঞ্জুকে দেখেই বলল, 'বিরাট কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হয়েছে। শুভ্রকে টেলিফোন করেছিলাম, ধরেছেন শুভ্রর বাবা। উনার গলা অবিকল শুভ্রর মতন। আমি বললাম, কে কানা বাবা নাকি? তোর কাছে এক্সট্রা হ্যান্ডব্যাগ আছে? কী অবস্থা দেখ তো।'

'উনি কী বললেন?'

'কী বললেন ভালো করে শুনতেই পারি নি। ভয়ে তখন আমার ব্রেইন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সঞ্জু তোর কাছে এক্সট্রা হ্যান্ডব্যাগ আছে?'

'না।'

'আমি একটা জোগাড় করেছি সেটার আবাব চেইন লাগে না।'

'তুই তো আর হীরা-মুক্তা নিয়ে যাচ্ছিস না। চেইন না লাগলেও কিছু না।'

'তা ঠিক।'

'তোর যাওয়া কি হবে? তুই যে বলেছিলি বাত আটটাব আগে বলতে পাববি না।'

'রাত আটটার সময় টাকা পাওযার কথা। যদি পাই তবেই যাওয়া হবে। না পেলে না। আমি প্রাইভেট টিউশ্যানি করি না? আমাব ছাত্রকে বলে রেখেছি। মানে ধাব হিসেবে চেযেছি। সে বলেছে জোগাড় কবে বাখবে। তোব টাকা জোগাড় হযেছে?'

'মার কাছ থেকে নিচ্ছি।'

'তুই সুখে আছিস। টাকা চাওযার লোক আছে। আমাব অবস্থাটা দেখ, ছাত্রেব কাছে টাকা ধার চাইছি।'

সঞ্জু বলল, 'চা খাবি?'

'না। ব্যাগের সন্ধানে বেব হব। সব রেডি রাখি যদি টাকা পাওয়া যায। তুই মুনাকে একটু ডাক তো। মুনা বলছিল নিউ মার্কেট যাবে। আমি ঝিকাতলা যাব, নিউ মার্কেটে ওকে নামিয়ে দেব।'

মুনার কথা বলতে গিয়ে বল্টুব বুক ধক ধক কবছিল। সব সময় মনে হচ্ছিল সঞ্জু আবার কিছু বুঝে ফেলছে না তো? সে অবশ্যি প্রাণপণ চেষ্টা করছে স্বাভাবিক থাকাব। কিন্তু মনের ভাব কতদিন আর গোপন থাকবে? মুনার কথা মনে হলে শরীরে কেমন যেন এক ধরনের কাঁপুনি হয। কথা বলতে গেলে কথা বেঁধে যায। কী যে সমস্যা হযেছে! সঞ্জু তাঁর প্রাণের বন্ধু। সে যদি তার মনের ভাব কোনোদিন জেনে ফেলে খুবই লজ্জার ব্যাপাব হবে। অবশ্যি সঞ্জু এখনো কিছুই বুঝতে পারে নি। সে যে এই বাড়িতে একটু সেজেগুজে আসে তাও লক্ষ করে নি।

তবে মুনার ব্যাপারটা সে এখনো কিছু বুঝতে পারছে না। বাচ্চা মেয়ে মাত্র সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে অথচ কথাবার্তার মারপ্যাঁচ অসাধারণ। প্রতিটি কথার দুটা তিনটা মানে হয়। কোন মানেটা রাখবে, কোনটা রাখবে না সেটাই সমস্যা।

রিকশায় উঠেই বল্টু রিকশাওয়ালাকে বলল, 'হুড তুলে দাও তো।'

মুনা বলল, 'হুড তুলতে হবে কেন?'

'কে কী মনে করে।'

মুনা বলল, 'মনে করা–করির কী আছে? ভাইবোন রিকশা করে যাচ্ছি।'

বল্টুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। ভাইবোন মানে? এসব কী বলছে মুনা? বল্টু মুখের মন খারাপ ভাব আড়াল করার জন্যে সিগারেট ধরাল। মুনা বলল, 'বল্টু ভাই, আজ আপনাকে আরো বাঁটু বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপার কী বলুন তো? আপনি কি কোমরে টাইট করে বেল্ট পরেছেন?'

'তোমাকে কতবার বলেছি আমাকে বল্টু ভাই ডাকবে না। আমার ক্লাসের বন্ধুরা ডাকে সেটা ভিন্ন কথা। তুমি ডাকবে কেন?'

'মনের ভুলে ডেকে ফেলি। আর ভুল হবে না, এখন থেকে অয়ন ভাই ডাকব। আচ্ছা, অয়ন মানে কী?'

'ঐ ইয়ে, পর্বত।'

'আপনার মতো বাঁটু লোকের নাম পর্বত? আশ্চর্য তো।'

অয়নের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। মুনা বলল, 'আপনি সত্যি জানেন অয়ন মানে পর্বত?'

'জানব না কেন? নিজের নামের মানে জানব না?'

'উঁহু আপনি জানেন না। আমি চলন্তিকায় দেখেছি অয়ন হচ্ছে পথ। সূর্যের গতি পথ। অয়নাংশ মানে সূর্যের গতিপথের অংশ।'

অয়নের মনটা ভালো হয়ে গেল। এই মেয়ের মনে তার প্রতি সিরিয়াস ধরনের ফিলিংস আছে। ফিলিংস না থাকলে চলন্তিকা থেকে নামের মানে বের করত না। অবশ্যই ফিলিংস আছে। অবশ্যই।

'অয়ন ভাই।'

'কি?'

'আপনার নাম নয়ন হলে ভালো হত। আপনার চোখ সুন্দর।'

'কীযে তুমি বল!'

'তবে আলাদা–আলাদা করে দেখলে সুন্দর। দুটা চোখ একত্রে দেখলে মনে হয় একটা একটু ট্যারা। আপনি লক্ষ করেছেন?'

অয়ন কিছু বলল না। পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল, মুনার, তার প্রতি কোনো রকম আকর্ষণ নেই। ফাজলামি করে বেড়াচ্ছে। এর বেশি কিছু না। মাঝে–মাঝে আচমকা যে সব আবেগের কথা বলে তাও নিশ্চয়ই এক ধরনের রসিকতা। অল্পবয়সী মেয়েরা ক্রুর রসিকতা পছন্দ করে। বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি অসাধারণ রূপবতী হয় তাহলে তো কথাই নেই।

'মুনা, নিউ মার্কেটে এসে গেছে তুমি এখানে নাম, আমি এই রিকশা নিয়েই চলে যাব।'

'আমি একা–একা নিউ মার্কেটে ঘুরব? আপনি একটু আসুন না।'

অয়ন নেমে পড়ল। মেয়েটা তাকে পছন্দ করে না তাতে কী। সে তো করে। আরো খানিকটা সময় তো পাওয়া যাচ্ছে মুনার সঙ্গে থাকার। এটাই বা কম কী।

অয়ন গম্ভীর গলায় বলল, 'যা কেনার চট করে কেন, আমার কাজ আছে।'

'আমার পাঁচ মিনিট লাগবে।'

'পাঁচ মিনিটেই শেষ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, আমার হাতে ঘণ্টা খানিক সময় আছে।'

'পাঁচ মিনিটও আমার লাগবে না — তিন মিনিটে কেনা শেষ করে ফেলব।'

অয়ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। মনে-মনে আশা করতে লাগল তিন মিনিটে নিশ্চয়ই কেনাকাটা শেষ হবে না। মেয়েদের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। মুনা অসম্ভবই সম্ভব করল। দুমিনিটের ভেতর একটা প্যাকেট হাতে দোকান থেকে বের হয়ে বলল, 'চলুন যাই।'

'কেনা শেষ?'

'হুঁ।'

'এত তাড়াতাড়ি কী কিনলে?'

'আগে থেকে পছন্দ করা ছিল, শুধু টাকাটা দিলাম। এখন আপনি যেখানে যেতে চান — চলে যান, আমি আজিমপুবে রীতাদের বাসায যাব।'

'ইয়ে চা খাবে নাকি? এখানে একটা বেস্টুরেন্টে খুবই ভালো চা বানায।'

'ভালো চা আপনি খান। আমাব চা খাওযার শখ নেই। যাই কেমন? ও আচ্ছা ধরুন, আপনার জন্যে একটা চিঠি আছে।'

অয়ন বিস্মিত হযে বলল, 'চিঠি?'

'হ্যাঁ চিঠি। এই প্যাকেটটা রাখুন। এ বকম ট্যারা চোখে আমাব দিকে তাকিযে থাকবেন না। দেখতে বিশ্রী লাগছে।'

হতচকিত অযনের হাতে প্যাকেট এবং চিঠি দিযে মুনা ভিড়েব মধ্যে মিশে গেল। সংক্ষিপ্ত চিঠি। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা।

অয়ন ভাই,

'আপনি পুরো শীতকালটা হাফ হাতা একটা স্যুযেটাব (তাও ফুটো হওযা) পবে কাটালেন। এই একই স্যুযেটাব আপনি গত শীতেও পবেছেন। আমাব খুব কষ্ট হয়। আপনাকে ভালোএকটা স্যুযেটার উপহার দিলাম। সেন্ট মার্টিনে যখন যাবেন তখন এটা যেন গাযে থাকে।'

মুনা।

পুনশ্চ ঃ যতই দিন যাচ্ছে আপনি ততই বাঁটু হচ্ছেন। ব্যাপাব কী বলুন তো?

প্যাকেটের ভেতব হালকা আকাশি রং-এর একটা ফুল হাত স্যুযেটাব। যেন দূর আকাশের ছোট্ট একটা অংশ সাদা রঙেব পলিথিনের ব্যাগে ঢুকিয়ে বাখা হযেছে। অযনেব কেমন যেন লাগছে। জ্বর জ্বব বোধ হচ্ছে। শরীবে এক ধরনেব কম্পন। কেন জানি শুধ মার কথা মনে পড়ছে, পনের বছব আগে যিনি মাবা গেছেন তাঁর কথা হঠাৎ মনে পড়ছে কেন? যিনি খুব শখ করে তার নাম রেখেছিলেন 'অযন'। সেই মধুব নামে আজ আর কেউ তাকে ডাকে না। খাওয়ার শেষে কেউ বলে না, "অযন বাবা পেট ভরেছে? খেযেছিস ভালো করে?'

অয়নের চোখে পানি এসে গেছে।

সে সেই অশ্রুজল গোপন করার কোনো চেষ্টাই করল না। কিছু কিছু চোখের জলে অহংকার ও আনন্দ মেশা থাকে, সেই জল গোপন কবার প্রযোজন পড়ে না।

মুনা বাড়িতে পা দেযামাত্র ফরিদা ভীত গলায বললেন, 'পাউডারের কৌটায এক হাজাব টাকা ছিল। টাকাটা পাচ্ছি না — কী হযেছে বল তো?'

মুনা ফ্যাকাসে হযে গেল। ক্ষীণস্বরে বলল, 'সে কী।'

ফবিদা বললেন, 'আমাব তো মা হাত পা কাঁপছে এখন কী কবি?'

'ভালো করে খুঁজে দেখেছ? চল তো দেখি আমিও খুঁজি।'

ফরিদা বললেন, 'একটা ঠিকা ঝি রেখেছিলাম না? আমাব মনে হয ও-ই নিয়ে গেছে।'

'সে তো গেছে দশ দিন আগে এব মধ্যে তুমি খুঁজে দেখ নি?'

'না।'

'আজেবাজে জাযগায তুমি টাকা বাখ কেন মা? পাউডাবেব কৌটায কেউ টাকা বাখে? কোথায ছিল কৌটা?'

'কী হবে বল তো মুনা? সঞ্জুকে দেব টাকাটা। সেতো এখনি চাইবে।'

মুনাব মুখ ছাই বর্ণ হযে গেল। ভাইযা, ভাইযা যেতে পাববে না? সে টাকা চুবি কবেছে বলে তাব ভাইযা যেতে পাববে না? সে তো টাকা চুবিও কবে নি। ধাব নিযেছে। আগামী মাসেব মাঝামাঝি স্কলাবশিপেব পনেবশ টাকা পাবে। সে ঠিক কবে বেখেছিল টাকাটা পাওযা মাত্র সে পনেবশ টাকাই মাব কৌটায বেখে দেবে। মা এক দিন কৌটা খুলে অবাক হযে বলবেন, 'ও মুনা দুটা পাঁচশ টাকাব নোট বেখেছিলাম এখন দেখি পনেবশ টাকা। ব্যাপাবটা কী বল তো?'

সে বলবে, 'কী যে তুমি বল মা। টাকা কি আব ডিম দেয। তুমি পনেরশ বেখেছিলে।'

'উঁহু। আমি বেখেছি আমি জানি না?'

'তাহলে নিশ্চয ভৌতিক কাণ্ড। কোনো পবোপকাবী ভূত কিংবা পেত্নী হযতো বেখে গেছে।'

'তুই বাখিস নি তো?'

'আমি? আমি রাখব কীভাবে? আমি কি টাকা পাই? হেঁটে হেঁটে কলেজ কবি। লোকজনদেব ধাক্কা খেতে খেতে কলেজে যাওযা ফিরে আসা। কী যে বিশ্রী, তুমি তো জান না।'

ফবিদা বললেন, 'এখন কী কবি মুনা বল তো?'

মুনা বলল, 'বাবাব কাছে নেই?'

'উনাব কাছে থাকবে কোথেকে? উনি তো বেতন পেযেই সব টাকা আমাব কাছে এনে দেন।'

'তাহলে কি বড় মামাব অফিসে চলে যাব। বড় মামাকে বলব?'

ফরিদা অকূলে কূল পেলেন। আগ্রহ নিযে বললেন, 'তাই কব মা, তাই কব।'

মুনা ঘর থেকে বেরুতেই সঞ্জু বলল, 'টাকা তো মা এখনো দিলে না।'

ফবিদা বললেন, 'তুই যাবি সেই বাত দশটায এখন টাকা দিযে কী কববি?'

সঞ্জু শঙ্কিত গলায বলল, 'সত্যি কবে বল মা। টাকাব জোগাড় হযেছে?

'হয়েছে বে বাবা হযেছে।'

সঞ্জুর মুখ থেকে শঙ্কার ভাব পুরোপুরি দূর হল না। সে মার দিকে তাকিয়ে রইল। ফরিদার মুখ শুকনো। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন। হাসতে পারলেন না। কোনো রকমে বললেন, 'চা খাবি বাবা? চা বানিয়ে দেই?'

৭

জরী দোতলার বারান্দায় চুল এলিয়ে বসে আছে।

শীতকালে রোদে বসে থাকতে এমন ভালো লাগে! আজ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস ছিল। ভোরবেলাতেই বাবা বলে দিয়েছেন, 'যেতে হবে না।'

সে বলেছে, 'আচ্ছা।' কেন যেতে হবে না জিজ্ঞেস করে নি। এই বাড়িব কাবো সঙ্গেই কথা বলতে তার ইচ্ছা কবে না। বাবার সঙ্গে না, মাযেব সঙ্গে না, ছোট বোনেব সঙ্গেও না। তার প্রাযই মনে হয সে যদি হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা কবতে পাবত তাহলে কত চমৎকার হত! সিঙ্গেল সিটেড একটা রুম। সে একা থাকবে। নিজেব মতো কবে ঘবটা সাজাবে। তাকে বিরক্ত করাব জন্যে কেউ থাকবে না। দুপুর বাতে তাব ঘবে দবজা ধাক্কা দিয়ে মা বলবেন না — 'ও জরী তোব সঙ্গে ঘুমাব। তোর বাবা বিশ্রী ঝগড়া কবছে।' জরীকে দরজা খুলে বলতে হবে না, 'সে কী মা। কেঁদো না। দুপুব বাতে এ বকম শব্দ কবে কাঁদতে আছে? বাড়িব সবাইকে তুমি জাগাবে?'

'তোর বাবা আমাকে কুত্তী বলে গাল দিয়েছে।'

'চুপ কব মা, ছিঃ। গাল দিলেও কি নিজেব মেযেব কাছে বলতে আছে?'

'তোকে না বললে কাকে বলব?'

'অনেক কথা আছে কাউকেই বলতে হয না। আমি কি আমাব সব কথা তোমাকে বলি? কখনো বলি না। কোনোদিন বলবও না।'

এটা খুবই সত্যি কথা জবী তাব নিজেব কথা কাউকেই বলে না। মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে মনে হয 'এমন এক জন কেউ যদি থাকত যাকে সব কথা বলা যায।

রোদে বসে জবী তাই ভাবছিল। তাব হাতে একটা ম্যাগাজিন। মাঝে মাঝে সে ম্যাগাজিনেব পাতা উল্টাচ্ছে তবে সে কিছু দেখছেও না পড়ছেও না। হাতে একটা ম্যাগাজিন থাকার অনেক সুবিধা, কেউ এলে ম্যাগাজিন নিযে ব্যস্ত হযে যাওযা যাবে। কথাবার্তায় যোগ দিতে হবে না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস কবলে বলতে পারবে '— এখন একটা মজার জিনিস পড়ছি। পবে কথা বলব।'

জরীর মা মনোযাবা দোতলায উঠে এলেন। খানিকটা উত্তেজিত গলায বললেন, 'জামাই এসেছে। জামাই।'

জরী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাতে লাগল। যেন সে কিছু শুনতে পায নি।

'জামাই এসেছে। নিচে বসে আছে।'

জরী শীতল গলায় বলল, 'জামাই বলছ কেন মা? বিয়ে এখনো হয নি। বিযে হোক তারপর বলবে।'

'তুই শাড়িটা বদলে নিচে যা।'

'কেন?'

'তোকে নিয়ে বাইরে কোথায় যেন খেতে যাবে বলছে।'

জরী তাকিয়ে বইল। তাব খুব রাগ লাগছে। যদিও রাগ করাব তেমন কোনো কারণ নেই। এক মাস পর যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সে যদি তাকে নিয়ে এক দুপুবে বাইরে খেতে যেতে চায তাতে দোষ ধবার কিছু নেই। এটাই তো স্বাভাবিক।

মনোয়ারা বললেন, 'জামাই পবশু রাতেও এসেছিল। তুই তোর কোন এক বন্ধুব বাসায ছিলি। শুনে খুব রাগ করল।'

জবী বলল, 'বাগ করল মানে?'

'না রাগ না ঠিক, ঐ বলছিল আব কী — এই বযেসী মেয়েদেব বন্ধুবান্ধবদেব বাসায বাত কাটানো ঠিক না।'

'তুমি কী বললে?'

'আমি কী বলব? আমার সঙ্গে তো কথা হয নি, তোব বাবাব সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'বাবাকে সে উপদেশ দিল?'

'তুই সব কথাব এমন প্যাঁচ ধবিস কেন? উপদেশ না। কথার কথা বলেছে। আয় মা চট কবে শাড়িটা বদলে আয।'

'আমি যেতে পাবব না।'

'এটা কেমন কথা!'

'যেতে ইচ্ছা করছে না, মা।'

'তোব বড় চাচা নিচে বসে আছেন। উনি শুনলে বাগ করবেন।'

জবী উঠে দাঁড়াল। মনোযাবা বললেন, 'আয আমি চুলটা আঁচড়ে দেই। তুই শাড়িটা বদলা। গোলাপি জামদানীটা পব। তোব চাচীব মুক্তাব দুল জোড়া পববি? নিয়ে আসব?'

'নিয়ে এসো।'

মনোযাবা ছুটে গেলেন। মেযেকে অতি দ্রুত সাজিয়ে দিতে হবে, নযতো জবীব বড় চাচা রাগ কববেন। যাঁর আশ্রযে বাস করছেন তাঁকে বাগানো ঠিক হবে না। কিছুতেই ঠিক হবে না। আজ যদি তিনি বলেন, 'অনেক দিন তো হল এখন তোমবা নিজেবা একটা ব্যবস্থা দেখ।' তখন কী হবে? কোথায যাবেন তিনি? অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে কাব ঘবে উঠবেন?

জবী বেশ যত্ন কবে সাজল। কানে দুল পবল। চোখে হালকা কবে কাজল দিল। তাব চোখ এমনিতেও সুন্দব, কাজল দেযাব কোনোই প্রযোজন নেই। তবু কাজল দিলেই চোখে একটা হবিণ-হবিণ ভাব চলে আসে। অবশ্যি সে জানে বসাব ঘবের সোফায় বসে অতি দ্রুত যে লোকটি পা নাড়াচ্ছে সে ভুলেও তাব চোখেব দিকে তাকাবে না। পৃথিবীতে দু ধবনেব পুরুষ আছে। এক ধবনেব পুরুষ তাকায মেয়েদেব দিকে। চোখেব ভাষা পড়তে চেষ্টা কবে। অন্য দল তাকায শবীবেব দিকে। মনিরুদ্দিন আজ থ্রি পিস স্যুট পবে এসেছে। গা দিয়ে ভুবভুর কবে সেন্টেব গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই গন্ধেব সঙ্গে মিশেছে জর্দাব কড়া গন্ধ। তাব মুখভর্তি পান। পানেব লাল বসেব খানিকটা ঠোঁটেব উপব জমা হয়ে আছে। সে অতি দ্রুত পা নাড়াচ্ছে। জবীকে ঢুকতে দেখে সে তাকাল। সেই দৃষ্টি কযেকবাব পা থেকে মাথা পর্যন্ত নড়াচড়া কবল। জরীব চাচা বলল, 'বস মা।'

মনিরুদ্দিন বলল, 'চাচাজানেব সঙ্গে দেশেব অবস্থা নিয়ে কথা বলছিলাম। এই দেশে ভদ্রলোকেব ব্যবসা কবা সম্ভব না। যাবা জেনুইন ব্যবসা কবে তাদেব জন্যে এই দেশ না। দালালদেব জন্যে এই দেশ।'

জবীর চাচা বললেন, 'খুবই সত্য কথা।'

মনিরুদ্দিন বলল, 'কী আছে এই দেশে বলেন দেখি চাচাজান। সামান্য অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসার জন্যে যেতে হয় ব্যাংকক। চিকিৎসা বলে এক জিনিস এই দেশে নাই।'

'ঠিক বলেছ।'

'তারপর ধরেন এডুকেশন। এডুকেশনের 'এ'টাও এদেশে নাই।'

জরী মনে মনে বলল, 'এডুকেশনের 'ই' এ নয়।'

'পলিটিকসের কথা যদি ধরেন চাচাজান, তাহলে বলার কিছুই নাই।'

'খুবই সত্যি কথা।'

'বুঝলেন চাচাজান, পুরো বঙ্গোপসাগরটা যদি তেল হয়ে যায় তবু এই দেশের কোনো উন্নতি হবে না। দশজন লুটে-পুটে খাবে।'

'কারেক্ট।'

মনিরুদ্দিন উঠে দাঁড়াতে বলল, 'ওকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি।'

'আচ্ছা বাবা যাও।'

জরী উঠে দাঁড়াল। জর্দাব কড়া গন্ধে তাব মাথা ধবে গেছে। বমি-বমি লাগছে।

বাসার সামনে বিশাল লাল রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খাকি পোশাক এবং মাথায টুপিপবা এক জন ড্রাইভার।

মনিরুদ্দিন গাড়িতে উঠেই বলল, 'কুদ্দুস রবীন্দ্রসংগীত দাও তো। আমাব আবাব গাড়িতে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া কিছু ভালো লাগে না। আর শোন কুদ্দুস স্লো চালাবে।'

কুদ্দুস রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট চালু করল। মনিরুদ্দিন জবীব দিকে তাকিযে বলল, 'খানিকটা ঘুরাঘুরি করি।'

জরী বলল, 'জ্বি, আচ্ছা।'

'চীন-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ দেখেছ?'

'না।'

'কুদ্দুস ঐ খানে চল তো।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। পেছনেব সিটে এত জাযগা তবু সে বসেছে জবীব সঙ্গে গাযে গা লাগিয়ে। জরী এখন তার গাযের ঘামেব গন্ধ পাচ্ছে।

মনিরুদ্দিন তার ডান হাত জবীব হাঁটুর উপব বেখেছে। গানেব তালে তালে সেই হাতে তাল দিচ্ছে।

'পরশু দিন রাতে কোথায ছিলে?'

'আমার এক বন্ধুর বাসায।'

'উচিত না।'

'উচিত না কেন?'

'বন্ধুবান্ধব থাকা ভালো। গল্পগুজব কবাও ভালো। তাই বলে রাতে থেকে যাওযা ঠিক না।'

জরী প্রাণপণ চেষ্টা করছে পাশে বসে থাকা মানুষটিকে ভুলে গিযে গানে মন দিতে। যেন গানটিই সত্যি। আশপাশেব জগৎ সত্যি নয়। অরুন্ধতী হোম চৌধুবীর কী অপূর্ব গলা।

'মুখ পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয মনে —
ফিবেছ কী ফেব নাই বুঝিব কেমনে।।'

মনিরুদ্দিন একটি হাত জরীর কাঁধে তুলে দিয়েছে। পায়ের উপব থেকে সেই হাত কাঁধে উঠে এসেছে। জরী খুব চেষ্টা করছে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে। যা হবার হোক।

মনিরুদ্দিন অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'একটু এদিকে সরে বস তাহলেই ড্রাইভাব ব্যাকভিউ মিররে কিছু দেখবে না। এ বকম শক্ত হয়ে আছ কেন?'

মনিরুদ্দিন জরীব বুক স্পর্শ করল।

জরী শিউরে উঠল।

মনিরুদ্দিন অভয়ের হাসি হেসে বলল, 'গাড়ির কাচ টিনটেড। বাইবে থেকে কিছুই দেখা যায় না।'

জবী চেঁচিয়ে বলল, 'ড্রাইভাব সাহেব গাড়ি থামান। আমি নামব। থামান বলছি। এক্ষুনি থামান। এক্ষুনি।'

ড্রাইভাব আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি থামাল।

জবী হকচকিযে যাওয়া মনিরুদ্দিনেব দিকে তাকিযে শীতল গলায বলল, 'আপনি একটি কথাও বলবেন না। আমি এই খানে নেমে যাব। আপনি যদি বাধা দিতে চেষ্টা কবেন, আমি চিৎকার কবে লোক জড়ো কবব।'

'তুমি, তুমি যাচ্ছ কোথায?'

'আমি দারুচিনি দ্বীপে যাব।'

'কী বলছ তুমি? দারুচিনি দ্বীপ কী?'

'আপনি বুঝবেন না।'

জরী গাড়িব দবজা খুলে নেমে পড়ল।

জবী সন্ধ্যাব পব বাসায ফিবল।

জবীব মা সম্ভবত সাবাক্ষণই গেটেব দিকে তাকিযে ছিলেন। তিনি ছুটে এসে মেযেব হাত ধবে ভীত গলায বললেন, 'কী হযেছে বে মা, কী হযেছে?'

জবী সহজ গলায বলল, 'কিছু হয নি তো।'

'জামাই তোব বড় চাচাকে টেলিফোন কবেছিল। তুই নাকি বাগাবাগি কবে চলন্ত গাড়িব দবজা খুলে নেমে গেছিস। জামাইকে খাবাপ খাবাপ কথা বলেছিস। অপমান করেছিস। জামাই অসম্ভব রাগ কবেছে।'

'রাগ করলে কী আব কবা।'

'তোর চাচাও বাগ করেছে। খুবই বাগ কবেছে। বসে আছে তোব জন্যে।'

জবী বলল, 'মা তোমাব কাছে টাকা আছে? আমাকে দেবে। আমি পালিযে যাব মা।'

'কী বলছিস পাগলেব মতো? আয ভেতবে আয। কী হযেছে বল তো। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিযে নেমে গেলি কেন? যদি অ্যাকসিডেন্ট হত?'

'চলন্ত গাড়ি থেকে নামি নি।'

'হযেছিল কী?'

'কিছু হয নি।'

'তোব বাবা টেলিফোন আসাব পব থেকে ছটফট কবছেন। তাঁব অসুখ খুব বেড়েছে। আয, প্রথমে তোর বাবাব কাছে আয।'

জবীব বাবা হাঁপানিব প্রবল আক্রমণে নীলবর্ণ হযে গেছেন। বিছানায পড়ে আছেন চোখ বন্ধ করে। নিশ্বাস নেবাব চেষ্টায তাঁর বুক উঠা-নামা কবছে। নিশ্বাস নিতে পাবছেন না।

জরীর ছোট বোন বাবার মাথার কাছে মুখ কালো করে বসে আছে। জরী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল — এত কষ্ট, এত কষ্ট। এত কষ্টের কোনো মানে হয়? কোনো অর্থ হয়?

জরীর বাবা একবার চোখ তুলে তাকালেন। পরমুহূর্তেই চোখ বন্ধ করে আগেব মতোই ছটফট করতে লাগলেন। জরীর মা ফিসফিস করে বললেন, 'জামাইয়ের টেলিফোনের খবর শোনার পর শ্বাসকষ্ট শুরু হল।'

জরী এই ঘরে আর থাকতে পারছে না। এই কষ্ট দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়। সে এগিয়ে এসে বাবার মাথায় হাত রাখল। তিনি চোখ মেললেন এবং জরীকে অবাক করে দিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন। যেন মেয়েকে দেখে খুশি হয়েছেন।

জরী বলল, 'বাবা আমি ভালো আছি।'

তিনি মাথা নাড়লেন।

মনে হচ্ছে তাঁর কষ্ট খানিকটা কমে এসেছে। বুক আগের মতো উঠা-নামা করছে না। ওষুধ দেওয়া হয়েছিল সেই ওষুধ হযতো বা কাজ করতে শুরু করেছে। শ্বাসনালীর প্রদাহ কমার দিকে। জরী আবার বলল, 'বাবা আমি ভালো আছি।'

তিনি ইশারা করে সবাইকে চলে যেতে বললেন, এব অর্থ তাঁব কষ্ট এখন সত্যি সত্যি কমার দিকে। কষ্টটা কমলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন। সম্ভবত তাঁর ঘুম আসছে। সবাই ঘব খালি করে বের হয়ে এল।

জরীর বড় চাচা ইউসুফ সাহেব বসে আছেন থমথমে মুখে।

তাঁর সামনেই জরীর মা এবং জরী।

কথাবার্তা এখনো শুরু হয নি। ইউসুফ সাহেব চা খাচ্ছেন। কী বলবেন এবং কীভাবে বলবেন তা হযতো ঠিক কবছেন। মেযেটাব শান্ত মুখেব দিকে যতবাব তাকাচ্ছেন ততবারই তাঁর রাগ উঠে যাচ্ছে। এতবড় ঘটনাব পব মেযেটা এবকম শান্ত মুখে বসে আছে কী করে? সে ভাবে কী নিজেকে?

তিনি কিছু বলার আগেই জরী বলল, 'চাচা আমি ঐ লোকটাকে বিযে কবব না।'

ইউসুফ সাহেব জরীর সাহস ও স্পর্ধা দেখে চমকে গেলেন। তিনি বাগ সামলে নিচু গলায় বললেন, 'বিয়ে করবে, কি করবে না — এই কথা আমি জিজ্ঞেস করি নি। আগ বাড়িয়ে কথা বলছ কেন? কী ভাব নিজেকে? আমি যা জিজ্ঞেস করি তাব জবাব দেবে। কী হযেছিল যে তুমি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিযে নামলে?'

জরী চুপ করে রইল।

'তুমি যে ছেলেটাকে অপমান করলে তুমি এদেব ক্ষমতা জান? এদেব অর্থ বিত্তেব খবব রাখ? সে কী করেছে যে তাকে গালাগালি করে লাফ দিযে গাড়ি থেকে নামবে। চিৎকাব করে লোক জড়ো করবে?'

'আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করি নি।'

'তুমি বলতে চাও সে মিথ্যা কথা বলেছে? কথা বলছ না কেন? নাকি বলাব মতো কথা পাচ্ছ না?'

ইউসুফ সাহেব জরীকে তুই করে বলেন, আজ তুমি বলছেন। এতে বাগ প্রকাশ পাচ্ছে এবং দূরত্বও প্রকাশ পাচ্ছে।

'শোন জরী, মনির সব কথাই আমাকে বলেছে। কিছুই গোপন করে নি।'

'কী বলেছে?'

'তোমার সঙ্গে এই নিয়ে ডিসকাস করা উচিত না তবু তুমি যখন শুনতে চাচ্ছ তখন বলছি — সে তার ভাবি স্ত্রীর হাত ধরেছে — এটা এমন কী অপরাধ? আমি যতদূর জানি

তোমরা ক্লাসের ছেলের হাত ধরাধরি করে হাঁট। তখন অপরাধ হয় না? তারা কী পরিমাণ রাগ করেছে তা কি তুমি জান? মনির টেলিফোনে কাঁদছিল। মনিরের বাবা টেলিফোন করেছেন, মনিরের এক মামা পুলিশের এআইজি উনি টেলিফোন করেছেন। জিযার আমলে পাটমন্ত্রী ছিলেন যে ভদ্রলোক উনিও টেলিফোন করেছেন।'

জরীর মা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'এখন কী করা?'

ইউসুফ সাহেব বললেন, 'এইটা নিয়েই চিন্তা কবছি। মনিবেব বাবাব সঙ্গে কথা হল।'

জরী বলল, 'কী কথা হল?'

'তোমার তা শোনার দরকাব নেই। তুমি ঘরে যাও।'

জরী উঠে চলে গেল।

ইউসুফ সাহেব বললেন, 'মনিরের বাবা বলেছেন তাঁবা কাজী ডাকিযে বিয়ে পড়িয়ে দিতে চান। দেরি করতে চান না, কারণ ছেলে খুব মন খারাপ করেছে।'

জরীব মা বললেন, 'বিযের পর ওবা আমার মেয়েটাকে কষ্ট দিবে।'

'কষ্ট দিবে কী জন্যে? বিয়ে হযে গেলে সব সমস্যার সমাধান। আব একবার বিয়ে হযে গেলে কেউ কিছু মনে বাখবে না।'

'বিযে কখন হবে?'

'ওবা পঞ্জিকা-টঞ্জিকা দেখছে। যদি দিন শুভ হয আজ বাতেও হতে পাবে।'

'এইসব কী বলছেন ভাইজান!'

'চিন্তাভাবনা কবেই বলছি। চিন্তাভাবনা ছাড়া কাজ কবা আমার স্বভাব না। জবী যে কাণ্ড করেছে তারপব এ ছাড়া অন্য পথ নেই।'

'মেযেটার মত নাই।'

'বাজে কথা বলবে না। মত নাই আগে বলল না কেন? এনগেজমেন্টের আগে বলতে পাবল না? জবীকে এখন কিছু বলাব দবকাব নেই। ওদেব টেলিফোন আগে পাই, ওরা যদি আজ রাতে বিযেব কথা বলে তখন আমি জবীকে বুঝিযে বলব।'

জবীব মা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আবো কযেকটা দিন সময দিলে মেযেটা ঠাণ্ডা হত!'

'আমাব মতে আব এক মুহূর্ত সমযও দেযা উচিত না। সময দিলে ক্ষতি। বিবাট ক্ষতি। ওদেব কিছু না, ক্ষতি আমাদেব ..... ।'

ইউসুফ সাহেবেব কথা শেষ হবাব আগেই টেলিফোন এল। মনিরুদ্দিনেব বাবা টেলিফোন কবেছেন। সবাব সাথে কথা-টথা বলে ঠিক কবেছেন — বিয়ে আজ বাতেই পড়ানো হবে। বাত দশটাব মধ্যে বিযে পড়ানো হবে। এগাবটাব দিকে বব বৌ নিযে চলে যাবেন। সামনের সপ্তাহে হোটেল সোনাবগাঁযে বিসিপশন।

ইউসুফ সাহেব জবীব মাকে বললেন, 'তুমি তোমাব গুণবতী মেযেকে আমাব কাছে পাঠাও।'

'ভাইজান একটা বিষয যদি বিবেচনা কবেন।'

'সব দিক বিবেচনা কবা হযেছে। বিবেচনাব আব কিছু বাকি নেই।'

৮

মনসুর আলি সাহেব বাগানে গোলাপ গাছেব কাছে খুপড়ি হাতে বসেছিলেন। পাঁচটি গোলাপ এই গাছটায একসঙ্গে ফুটেছে। টকটকে লাল গোলাপ। মনে হচ্ছে গাছে যেন আগুন লেগে গেছে। গাছটা যেন আনন্দ, গর্ব এবং অহংকাবের সঙ্গে উঁচু গলায় বলছে,

'দেখ তোমরা আমাকে দেখ।'

এরকম একটা গাছের একটু যত্ন নিজের হাতে না করলে ভালো লাগে না। মনসুব সাহেব মাটি আলগা করে দিচ্ছেন। মাটির ফাঁকে ফাঁকে যেন গাছের জীবনদায়িনী নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে যেতে পারে।

মেঘবতী এগিয়ে এল। খুব ধীর পাযে আসছে। বেচারির শরীর ভালো না। কাল রাতে সে কিছুই খায় নি। খাবার খানিকক্ষণ শুঁকে নিজের জাযগায় চলে এসেছে। দুটি থাবার মাঝখানে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিনি মেঘবতীর দিকে তাকিয়ে হালকা গলায বললেন, 'আয় আয। দেখ ফুলের বাহার দেখ।'

মেঘবতী কাছে এসে তাঁর পাঞ্জাবির এক কোণ কামড়ে ধরে চুপ কবে বসে বইল। তিনি মাটি কুপিযে দিতে লাগলেন। বড় ভালো লাগছে। শীতের সকালের এই চমৎকাব রোদ, ফুলের গন্ধ, গা ঘেঁষে বসে থাকা প্রিয় প্রাণী। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দের যোগফল বিরাট একটি সংখ্যা। সেই সংখ্যা অসীমের কাছাকাছি।

মনসুর সাহেব খুপড়ি নামিযে পাঞ্জাবির পকেটে চুরুটেব জন্যে হাত দিলেন। মেঘবতী পাঞ্জাবির পকেট এখনো কামড়ে ধরে আছে।

'মেঘবতী, ছাড় তো দেখি, চুরুট নেব।'

মেঘবতী ছাড়ল না।

তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাঁর চোখে পলক পড়ল না। মেঘবতী মরে পড়ে আছে। মৃত্যুর আগে আগে সে কিছু একটা বলতে এসেছিল। বলতে পারে নি। পবম মঙ্গলময় ঈশ্বর তার হৃদয়ে ভালবাসা দিয়েছিলেন, মুখে ভাষা দেন নি। মৃত্যুর আগে আগে যে কথাটি সে বলতে এসেছিল, তা বলতে পারে নি। সে তার প্রভুব পাঞ্জাবিব পকেট কামড়ে ধরে অচেনা অজানার দিকে যাত্রা করেছে।

মনসুর সাহেব ভাঙ্গা গলায় ডাকলেন, 'আনুশকা। আনুশকা।' আনুশকাকে ডাকতে গিয়ে তার গলা ভেঙ্গে গেল।

আনুশকা ছুটে এল।

মনসুর সাহেব ভাঙা গলায় বললেন, 'তোমার মেঘবতীর গাযে একটু হাত রাখ মা।'

আনুশকা কয়েক পলক মেঘবতীর দিকে তাকিয়ে ছুটে গেল নিজের ঘরের দিকে।

এই বিশাল বাড়িতে সে ছিল নিঃসঙ্গ। মেঘবতী তাকে সঙ্গ দিযেছে। কত বাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে ভয পেয়ে ডেকেছে, 'মেঘবতী।'

ওমনি জানালার কাছে মেঘবতীর গর্জন শোনা গেছে। সে জানিযে গেছে — 'আছি আমি আছি। তোমার মা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছেন, তোমাব বাবা ঘুরছেন জাহাজে-জাহাজে। কিন্তু আমি আছি। আমি আমাব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকব। আমি পশু, আমি মানুষের মতো প্রিযজনদেব ছেড়ে যাওয়া শিখি নি।'

আনুশকা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মনসুর সাহেব আনুশকার মাথায হাত বুলিযে দিচ্ছেন।

'মা এমন করে কাঁদলে চলবে? রাত নটা বাজে। আজ না তোমাদেব দারুচিনি দ্বীপে যাবার কথা।'

'আমি কোথাও যাব না।'

'তাতো হয় না মা। তুমি না গেলে তোমাব বান্ধবীরা যাবে না। তোমাব একার কষ্টের জন্যে তুমি অন্যদের কষ্ট দিতে পার না। সেই অধিকার তোমাব নেই মা।'

'বললাম তো আমি যাব না।'

'তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ মা। মানুষ শুধু একার জন্যে বাঁচে না — মানুষ অন্যদের জন্যেও বাঁচে। এই খানেই মানুষ হয়ে জন্মানোর আনন্দ। এইখানেই মানুষ হয়ে জন্মানোর দুঃখ। মা ওঠ। তোমার বান্ধবীরা সব মুখ কালো করে বসে আছে।'

আনুশকা নড়ল না।

মনসুর সাহেব বললেন, 'তোমার মা যেদিন হঠাৎ করে এসে আমাকে বলল, আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে পারছি না। আমি চলে যাচ্ছি। সেদিনও আমি কিন্তু ঠিক সময়ে অফিসে গিয়েছি। মা, তুমি তো আমার মেয়ে। আমার মেয়ে না?'

'হ্যাঁ আমি তোমারই মেয়ে।'

'তাহলে তুমি ওঠ তো।'

আনুশকা উঠে বসল। মনসুর সাহেব বললেন, 'তোমার আনন্দ তুমি সবাইকে দেখাবে। দুঃখ কাউকে দেখাবে না। তোমার মা আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমি যে দুঃখ পেয়েছিলাম তা কি কখনো কাউকে দেখিয়েছি? আমার এত প্রিয় যে মেয়ে তার কাছে আজ মাত্র স্বীকার করলাম।'

আনুশকা চোখ মুছে বন্ধুদের কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'এখনো অনেক সময় আছে। চল তো সবাই ছাদে খানিকক্ষণ হৈচৈ করে আসি।'

[illegible] হাসিমুখে বললেন, 'এই যে তোর টাকা, গুনে দেখ এক হাজার আছে কিনা [illegible]'

তাঁর মুখে হাসি। তিনি মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারছেন না। মুনা তার বড় মামার কাছে চাওয়া মাত্র টাকা পেয়েছে। কোনো সমস্যা হয় নি।

'কি গুনে দেখলি না?'

সঞ্জু বলল, 'কী আশ্চর্য, গুনে দেখতে হবে কেন? ভাত দিয়ে দাও মা।'

'মাত্র আটটা বাজে। এখনি ভাত খাবি কি? তোর ট্রেন সেই তো রাত সাড়ে দশটা।'

'একটু আগে আগে যাওয়া দরকার। টিকিটের ঝামেলা আছে।'

'তোর বাবাও তো সঙ্গে যাবে।'

সঞ্জু বিস্মিত হয়ে বলল, 'বাবা যাবে মানে? তাঁর যাওয়ার দরকার কী?'

'যেতে চাচ্ছে যাক না। তুই বিরক্ত হচ্ছিস কেন?'

'সবাই বলবে কী? ট্রেনে তুলে দিতে বাবা চলে এসেছেন। আমি কী কচি খোকা নাকি? না মা, তোমার পায়ে পড়ি, যে ভাবেই হোক তুমি সামলাও। প্লিজ।'

'বেচারা এত আগ্রহ করে যেতে চাচ্ছে।'

'না মা, না, প্লিজ। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। এমনিতেই ওরা আমাকে 'খোকা বাবু' ডাকে।'

'খোকা বাবু ডাকে?'

'হুঁ। কেনইবা ডাকবে না। ইউনিভার্সিটির সব কটা পরীক্ষার সময় বাবা উপস্থিত।

হাতে কাটা ডাব। পরীক্ষা দিয়ে এসেই ডাব খেতে হবে। কী রকম লজ্জার ব্যাপার বল তো।'

'লজ্জার কী আছে? ডাবের পানিতে পেটটা ঠাণ্ডা থাকে।'

'উফ মা তুমি বুঝবে না। তুমি বাবাকে সামলাও।'

'আচ্ছা দেখি, বলে দেখি।'

মুনা এসে বলল, 'ভাইয়া বাবা তোমাকে ডাকছেন।'

সঞ্জু বাবার ঘরের দিকে রওনা হল। আবারো হয়তো খানিকক্ষণ ইরাকের যুদ্ধের কথা শুনতে হবে। বাবার ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকার কোনো মানে হয় না। বাবাব সঙ্গে তার বলার কোনো কথা নেই। মাঝে মাঝে সে মনেও করতে পারে না বাবাকে আপনি করে বলে না তুমি করে বলে। কলেজে যখন পড়ে তখন এক দিন বাবা তাকে ডেকে বললেন, 'তুই আজ আমার অফিসে একটা চিঠি নিয়ে যেতে পারবি?'

সঞ্জু বলল, 'জ্বি স্যার, পারব।'

সোবাহান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'স্যার বলছিস কেন?'

সঞ্জু কোনো জবাব দিতে পারে নি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

এখনো সে ঐদিনকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সোবাহান সাহেব বললেন, 'বোস।'

সঞ্জু বসল।

'টাকা পয়সা কী লাগবে বললি না তো।'

'মা টাকা দিয়েছে।'

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে, নে আরো দুশ টাকা বেখে দে।'

'লাগবে না বাবা।'

'রেখে দে।'

'লাগবে না। মা এক হাজাব টাকা দিয়েছে।'

সোবাহান সাহেবের মন একটু খারাপ হল। তিনি ভেবেছিলেন, বাড়তি দুশ টাকা পেয়ে ছেলে খুশি হবে। তিনি তার আনন্দিত মুখ দেখবেন।

'সঞ্জু তোর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ সিগারেট খায?'

সঞ্জু অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল। এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মানে কী সে বুঝতে পারছে না। সোবাহান সাহেব বিব্রত গলায বললেন, 'আমার অফিসের এক কলিগ ঐ দিন আমাকে এক প্যাকেট ডানহিল সিগারেট দিল। আমি তো সিগারেট ছেড়ে দিযেছি। প্যাকেটটা পড়ে আছে। তোর বন্ধুবান্ধবদের জন্যে নিযে যাবি? অবশ্য সিগারেট খাওযা ভালো না। বদভ্যাস।'

সঞ্জু মিথ্যা করে বলল, 'কেউ সিগারেট খায না বাবা।'

'ও আচ্ছা। তাহলে থাক। তোর ট্রেন তো সাড়ে দশটায?'

'জ্বি।'

'আমি তুলে দিয়ে আসব, কোনো অসুবিধা নেই। সাড়ে নটার দিকে বেরুলেই হবে।'

'আপনার যেতে হবে না বাবা।'

সোবাহান সাহেব আর কিছু বললেন না। পত্রিকা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। সঞ্জু বাবার ঘর থেকে বের হয়ে মনে মনে বলল, 'বাঁচলাম।'

১০

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন।

শুভ্র এসে বলল, 'বাবা আমি যাচ্ছি।'

ইয়াজউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এখন যাচ্ছ মানে? এখন বাজে রাত নটা। গাড়িতে স্টেশনে যেতে তোমার সময় লাগবে পাঁচ মিনিট।'

'আমাদের সবারই একটু আগে যাবার কথা। তাছাড়া আমি গাড়ি নিচ্ছি না, রিকশা করে যাচ্ছি।'

'রিকশা করে যাচ্ছ?'

'জ্বি।'

'কেন জানতে পারি?'

'নিজের মতো করে যেতে চাচ্ছি বাবা।'

'গাড়ি নিয়ে গেলে বুঝি পরের মতো করে যাওয়া হবে?'

শুভ্র কিছু বলল না।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'সত্যি করে বল তো, তুমি কি কোনো কারণে আমার উপর বিরক্ত?'

'বিরক্ত হব কেন?'

'প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর আমার পছন্দ না। তুমি আমার উপর বিরক্ত কি বিরক্ত না সেটা বল। হ্যাঁ অথবা না।'

'হ্যাঁ।'

ইয়াজউদ্দিন অনেকক্ষণ ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুভ্র হ্যাঁ বলেছে এটা বিশ্বাস করতে তাঁর সময় লাগছে।

'তুমি বিরক্ত কেন?'

'এখন তো আমার সময় নেই বাবা পরে গুছিয়ে বলব।'

'স্টেশনে যেতে তোমার লাগবে পাঁচ মিনিট।'

'আমি তো রিকশা করে যাচ্ছি।'

'রিকশাতেও কুড়ি মিনিটের বেশি লাগার কথা না।'

শুভ্র স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তোমার উপর কেন বিরক্ত সেটা বলতে আমার সময় লাগবে। আমি ফিরে এসে বলব।'

'অনেক দীর্ঘ কথাও খুব সংক্ষেপে বলা যায়। তিন পাতার যে রচনা তার সাবসটেন্স সাধারণত দুতিন লাইনের বেশি হয় না।'

শুভ্র বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমার উপর বিরক্ত কারণ তুমি আমাকে অবিকল তোমার মতো করতে চাও।'

'সব বাবাই কি তাই চায় না?'

'চাওয়াটা ঠিক না। এটা চাওয়া মানে ছেলেদের উপর চাপ সৃষ্টি করা। অন্যায় প্রভাব ফেলা।'

'আমি তোমার উপর অন্যায় প্রভাব ফেলছি?'

'চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ না।'

'মনে হচ্ছে মানুষ হিসেবে তুমি আমাকে তেমন পছন্দ কর না।'

'পছন্দ করি, কিন্তু তুমি সব সময় নিজেকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান মনে কর। এটা আমার পছন্দ না।'

'তোমার ধারণা আমি অন্যদের চেয়ে বুদ্ধিমান নই?'

'আমার তাই ধারণা বাবা। তুমি অন্যদের চেয়ে কৌশলী কিন্তু বুদ্ধিমান নও।'

'কীভাবে বুঝলে আমি বুদ্ধিমান নই?'

'এক জন বুদ্ধিমান মানুষ অন্যদের বুদ্ধি খাটো করে দেখে না। এক জন বোকা লোকই তা করে। তুমি সব সময় আমার বুদ্ধিকে খাটো করে দেখেছ। মাকে খাটো করে দেখেছ। আমি যে যথেষ্ট বুদ্ধিমান সেটা তুমি এখন বুঝতে পারছ — আগে না। এর আগ পর্যন্ত তোমার ধারণা ছিল আমি পড়ুয়া একজন ছেলে। বইপত্র ছাড়া কিছুই বুঝি না। আমি জগতের বাইরের এক জন মানুষ যে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাড়া আর কিছুই পারে না।'

'শুভ্র তুমি বস। তোমার সঙ্গে কথা বলি।'

'আমার তো সময় নেই বাবা।'

'এক কাজ করলে কেমন হয। আমি ববং তোমাব সঙ্গে বিকশা কবে যাই। অনেক দিন রিকশা চড়া হয না। যেতে যেতে কথা বলি।'

'আমি একাই যেতে চাই বাবা।'

'তোমার মনে যে এতটা চাপা ক্ষোভ ছিল তা আমি বুঝি নি।'

'বুদ্ধি কম বলেই বোঝ নি। অন্য যে কোনো বাবা সেটা বুঝতেন।'

'আই অ্যাম সরি। আই অ্যাপোলোজাইজ।'

শুভ্র হেসে ফেলে বলল, 'অ্যাপোলোজি অ্যাকসেপটেড। বাবা যাই।'

'বন ভযাজ মাই ডিযার সান। বন ভযাজ।'

শুভ্র নিচু হযে বাবাকে পা ছুঁযে সালাম কবতে গেল। ইযাজউদ্দিন সাহেব ছেলেকে তা করতে দিলেন না, জড়িয়ে ধরলেন।

শুভ্র বলল, 'আমি যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দিও। আমি তোমাকে অসম্ভব ভালবাসি বাবা। এই ভালবাসাব মধ্যে কোনো রকম খাদ নেই। এক জন মানুষ অন্য এক জনকে তার গুণের জন্যে ভালবাসে। আমি ভালবাসি তোমাব দোষগুলোব জন্যে। তুমিই আমার দেখা একমাত্র মানুষ যার দোষগুলোকে গুণ বলে মনে হয।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ছেলেকে রিকশায তুলে দিযে রিকশাওযালাকে বললেন, 'খুব ধীরে টেনে নিয়ে যাও।' বলেই তাঁর কী মনে হল তিনি বললেন, 'না ঠিক আছে তুমি যে ভাবে যাও সেভাবেই যাবে। ধীরে যেতে হবে না।'

রিকশাওয়ালা উল্কার বেগে ছুটল। কমলাপুর রেলস্টেশনেব কাছাকাছি এসে স্পিড-ব্রেকার ধাক্কা খেয়ে রিকশা উল্টে গেল। লোকজন ছুটে এসে শুভ্রকে টেনে তুলল। শুভ্র বলল, 'আমার কিছুই হয় নি শুধু চশমাটা ভেঙে গেছে।'

শুভ্র কিছুই দেখেতে পাচ্ছে না। আলো এবং ছাযা তাব চোখে ভাসছে। চশমা ছাড়া সে সত্যি সত্যি অন্ধ।

শুভ্র বলল, 'আপনাবা কেউ কি আমাকে দযা কবে কমলাপুব রেলস্টেশনে নিযে যাবেন। আমি চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। প্লিজ আপনাবা কেউ আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

১১

জরী বিছনায় পা তুলে বসে আছে।

মনিরুদ্দিন, তাঁর বাবা এবং বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন চলে এসেছে। বসার ঘবে সবার জাযগা হচ্ছে না। বারান্দায় কিছু বেতের চেয়ার দেযা হযেছে। সবাই নিজেদেব মধ্যে গল্পগুজব করছেন। মনিরুদ্দিন সৌদি আরবে সাদ্দামের বাহিনী ঢুকে পড়েছে এই খবরে খুবই উল্লসিত। তিনি নিচু গলায ভেতবেব কিছু খবরও দিচ্ছেন। যেমন বাংলাদেশ টেলিভিশন যে বাব বার বলছে সৌদি আরবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল সদস্য ভালো আছে এটা খুবই ভুল খবব। এরা আসল খবর দিচ্ছে না। আসল খবর হল স্কার্ড মিজাইলে একাত্তর জন সোলজার শেষ। ঢাকা এযারপোর্টে কার্ফিউ দিয়ে এদের ডেডবডি আনা হয়েছে। এটা খুবই পাকা খবব।

সবাই খুব আগ্রহ নিযে শুনছে। এক দফা চা হয়েছে। দ্বিতীয দফা চাযের অর্ডার দেযা হযেছে। বিযে পড়াতে সামান্য দেবি হবে। মগবাজাবের কাজী সাহেব এখনো এসে পৌঁছান নি। তাঁকে আনতে গাড়ি গেছে।

বরপক্ষ ছেলের এক খালা বড় একটা সুটকেস নিযে এসেছেন। তিনি হাসি হাসি মুখে এ বাড়িব মেযেদেব সুটকেসেব জিনিস দেখাচ্ছেন।

'হুট কবে বিযে হচ্ছে এই জন্যেই ঘবে যা ছিল তাই আনা হযেছে। গযনার এই সেটটা আপনারা একটু দেখেন। কিছুক্ষণ আগে রেডিমেড কেনা হয়েছে। দাম পড়েছে আশি হাজার সাত শ। মোট পাঁচটা বিযেল ডাযমন্ড আছে। বিসিটও সঙ্গে এনেছি, পছন্দ না হলে বদলে আনতে পাববেন।'

মেযেবা চোখ বড় বড় কবে জড়োযা সেটেব দিকে তাকিযে আছে। চোখ বড় বড় কবে তাকিযে থাকাব মতোই জিনিস। ছেলের খালা বললেন,

'বিযে পড়ানো হোক। বিযে পড়ানো হবাব পর মেযেব গলায এটা পবাবেন।'

জবীব বড় চাচী বললেন, 'আগে পরালে অসুবিধা কী?'

ভদ্র মহিলা শুকনো গলায বললেন, 'আগে না। বিযে পড়ানো হোক।'

জরীর বড় চাচী উঠে এলেন। ঢুকলেন জবীব ঘবে। জবী চাচীর দিকে তাকাল। কিছু বলল না। চাচীকে সে পছন্দ করে না। ভদ্র মহিলা খুব ঝগড়াটে। জ[illegible] যে এ বাড়ির আশ্রিত তা তিনি দিনের মধ্যে এক বার জরীদেব মনে করিযে দেন।

বড় চাচী তীক্ষ্ণ গলায বললেন, 'তুই আমাকে ঠিক করে বল তো জবী, তুই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলি কেন?'

'বলতে ইচ্ছা কবছে না চাচী।'

'ছেলেটাকে তোব খুব অপছন্দ হযেছে?'

'জ্বি।'

'আমারও অপছন্দ হযেছে। এবা ছোটলোকের ঝাড়। তুই বউ সেজে বসে আছিস কেন? পালিযে যা না।'

জরী অবাক হয়ে তাকাল। —

বড় চাচী বললেন, 'পেছনের দরজা দিযে বের হ। কোনো বান্ধবীর বাসায চলে যা। তারপর দেখা যাবে।'

'আমার সাহসে কুলাচ্ছে না চাচী।'

'তুই আয় তো আমার সাথে। পরের বাড়িতে থেকে থেকে তোদের সব গেছে। সাহস গেছে, মর্যাদাবোধ গেছে, তোদের সাথে আমার কথা বলতে ঘেন্না লাগে। আয়, আমার সাথে আয়। টুকুনকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে নিয়ে কোনো এক বান্ধবীর বাড়িতে লুকিয়ে থাক।'

'সত্যি বলছেন?'

'সত্যি বলছি না তো কি — তোর সঙ্গে রস করছি? আমার রস করার বয়স?'

বড় চাচী নিজেই পেছনের দরজা দিয়ে জরীকে বের করলেন। তাঁর সেজো ছেলে টুকুনকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

তারা একটা বেবিট্যাক্সি নিল।

টুকুন বলল, 'তুমি যাবে কোথায় জরী আপা?'

'দারুচিনি দ্বীপে যাব।'

'সেটা কোথায়?'

'অনেক দূর। তুই আমাকে কমলাপুর রেলস্টেশনে নামিয়ে এই বেবিট্যাক্সি নিয়েই বাসায় ফিরে যাবি। পারবি না?'

'খুব পারব। ঢাকা শহরে আমার মতো কেউ চিনে না।'

টুকুনের বয়স দশ, এত বড় দায়িত্ব পেয়ে সে খুবই আনন্দিত।

১২

অয়ন একটা সুটকেস এবং হ্যান্ডব্যাগ হাতে সন্ধ্যা থেকেই তার ছাত্রের বাসায় বসে আছে। ছাত্রের খোঁজ নেই। শুধু ছাত্র না, বাড়িতেই কেউ নেই, সবাই দলবেঁধে বিয়ে খেতে গেছে।

কাজের ছেলেটি বলল, 'বসেন মাস্টার সাব। চা খান।' বাড়িতে লোকজন না থাকলে কাজের লোকরা খুব সামাজিক হয়ে ওঠে। আগ্রহ করে চা-টা দেয়। অয়ন জিজ্ঞেস করল, 'কখন ফিরবে?'

'তার কি কোনো ঠিক আছে। বিয়া বাড়ি বইল্যা কথা। বাইত নয়টার আগে না।'

রাত নটা হলে অপেক্ষা করা যায়। নটা, দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে। একটা বেবিট্যাক্সি নিলে দশ মিনিটে স্টেশনে চলে আসবে। জিনিসপত্র তো সব সঙ্গেই আছে। অসুবিধা কিছু নেই।

অয়নের মনে হল নটার আগেই তার ছাত্র চলে আসবে। স্যারের কথা নিশ্চয়ই তার মনে আছে। গতকালই তো সে বলেছে, 'চিন্তা করবেন না স্যার আমি ব্যবস্থা করে রাখব।' নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে রেখেছে।

অয়ন বলল, 'বিয়ে কোথায় জান নাকি করিম?'

'জ্বে না। কিছুই জানি না। চা দিমু?'

'আচ্ছা দাও। চা দাও।'

রাত দশটার ভেতর সে সর্বমোট ছ কাপ চা খেল। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল তার ছাত্রের কালো গাড়ি যদি দেখা যায়।

রাত দশটা পাঁচে কাজের ছেলে এসে বলল, 'তারা আইজ আর আসব না। চইলা গেছে মীর্জাপুর।'

'তুমি বুঝলে কী করে?'
'আম্মা টেলিফোন করছিল।'
'আমি যে বসে আছি এটা বলেছ?'
'জ্বে না। ইয়াদ ছেল না।'
অয়নের মনে আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। এমন তো হতে পাবে তাব ছাত্র ড্রাইভারকে দিযে স্টেশনে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কারণ সে জানে তাব স্যাব বাত সাড়ে দশটাব ট্রেনে যাচ্ছে। বিয়ের তাড়াহুড়ায় মনে ছিল না। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে মনে হয়েছে। সে কি চলে যাবে স্টেশনে?
'করিম!'
'জ্বে মাস্টার সাব।'
'তাবা কোত্থেকে টেলিফোন করেছে?'
'তা তো জানি না।'
'এই বাসায কি কেউ নেই? সব চলে গেছে?'
'জ্বে। বড় সাবেব এক ভাই আছেন।'
'তুমি উনাকে একটু জিজ্ঞেস কবে আসবে আমার কথা বাবু কিছু বলে গেছে কিনা। আমাকে কিছু টাকা দেযাব কথা ছিল। বাবু উনাব কাছে দিয়ে গেল কিনা।'
করিম খোঁজ নিয়ে এল। বাবু কিছুই বলে নি।
অয়ন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হল বাবু ড্রাইভাবকে দিয়ে স্টেশনেই টাকা পাঠিয়েছে। এতক্ষণ এইখানে নষ্ট না কবে তাব উচিত ছিল স্টেশনে চলে যাওয়া। বিবাট ভুল হয়েছে।
অয়ন ঘব থেকে বেব হয়েই বেবিট্যাক্সি নিল। হাতে সময একেবারেই নেই।

১৩

কমলাপুব বেলস্টেশনে শুভ্র দাঁড়িয়ে আছে।
এত লোকজন চাবপাশে, সে কাউকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে ছাযামূর্তি, এক জাযগায দাঁড়িয়ে থেকেও সে তিন জনেব সঙ্গে ধাক্কা খেল। ভেবেছিল এ বকম সমস্যা হবে। দলের অন্যদেবই বা সে কী করে খুঁজে বের করবে। একমাত্র উপায যদি ওদেব কেউ তাকে দেখতে পায। এখনো কেউ দেখতে পায নি। ওবা কি আসে নি? সাড়ে নটা বাজে। এর মধ্যে তো এসে পড়া উচিত। এত দেরি করছে কেন?
'আপনি, আপনি এখানে?'
শুভ্র তাকাল। তাব সামনে একটি তরুণী মূর্তি তা সে বুঝতে পারছে। কিন্তু চিনতে পাবছে না। গলাব স্বরও অচেনা। নিশ্চয ক্লাসের কোনো মেযে। ক্লাসের মেযেবা ছেলেদের তুমি তুমি করে বলে, শুধু শুভ্রের বেলায আপনি। দোষটা অবশ্যি শুভ্রর। সে ক্লাসেব কোনো মেযেকে তুমি বলতে পাবে না।
'আপনি বোধ হয আমাকে চিনতে পারছেন না। আমার নাম জরী। সাবসিডিযারিতে আমরা এক সঙ্গে ক্লাস করি।'
'ও আচ্ছা।'
'এখনো আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি? আপনার সঙ্গে বেশ কযেকবার আমার কথা হযেছে।'

শুভ্র অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'আমি চিনতে পেরেছি।'

'তাহলে বলুন আমার নাম কি?'

শুভ্র বিব্রত গলায় বলল, 'আমি চোখে কিছুই দেখতে পারছি না। এই জন্যে কিছু চিনতেও পারছি না। আমার চশমা ভেঙে গেছে। চশমা ছাড়া আমি কিছুই দেখি না।'

জরী বলল, 'আমরা সবাই এই খবর খুব ভালো জানি। আপনার নাম হচ্ছে কানা-বাবা। আমরা মেয়েরা অবশ্যি কানা-বাবা বলি না।

'আপনারা কী বলেন?'

আমরা বলি – The learned blind father.'

Learned?'

'লারনেড না ডেকে উপায় আছে? যে ছেলে জীবনে কোনো দিন কোনো পরীক্ষায় ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয় নি তাকে ইচ্ছে না থাকলেও লারনেড ডাকতে হয়।'

শুভ্র অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে।

বিব্রত বোধ করার প্রধান কারণ সে এখনো মেয়েটিকে চিনতে পাবে নি। জরী বলল, 'আপনি কি দারুচিনি দ্বীপে যাচ্ছেন?'

'জ্বি।'

'আমাকে এত সম্মান কবে 'জ্বি' বলতে হবে না। আমিও আপনাদেব সঙ্গে যাচ্ছি। আপনি এখানে দাঁড়িযে আছেন কেন? এই প্লাটফবম থেকে মযমনসিংহ লাইনেব গাড়ি যায়। আপনার গাড়ি ছাড়বে চার নম্বর প্লাটফরম থেকে।'

শুভ্র হাসি মুখে বলল, 'আমি তো এ সবের কিছুই জানি না। এক জন লোক হাত ধরে এখানে দাঁড় করিযে দিযে গেছে। তাবপব থেকে দাঁড়িযেই আছি।'

জরী বলল, 'চলুন হাত ধবে ধরে আপনাকে চাব নম্বর প্লাটফবমে নিযে যাই। ধরুন হাত ধরুন। সংকোচ করার কিছু নেই। আপনি হচ্ছেন কানা-বাবা।'

জরী ভেবে পেল না সে হঠাৎ এত কথা বলছে কেন? সে তো চুপচাপ ধবনেব মেয়ে। এত কথা তো সে কখনো বলে না। আজ তার হযেছেটা কী?

শুভ্র হাত ধরল। খানিকটা ইতস্তত কবে বলল, 'আপনিই বা কেন এদিকে এলেন? আপনারও তো চার নম্বর প্লাটফরমে থাকাব কথা।'

'কেউ এখনো আসে নি তাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আচ্ছা, আপনাব চোখ এত খাবাপ আপনার তো উচিত বাড়তি চশামা রাখা।'

শুভ্র বলল, 'এক্সট্রা চশমা বাড়িতে আছে।'

জরী বলল, 'আপনাব ব্যাগ কে গুছিযে দিযেছে বলুন তো?'

'আমার মা।'

'তাহলে ব্যাগ খুললেই বাড়তি চশমা পাওযা যাবে। দেখি আপনাব ব্যাগটা খুলি। চাবি দিন তো।'

শুভ্র বলল, 'আমার মনে হয না মা বাড়তি চশমা দিযেছেন।'

'অবশ্যই দিয়েছেন। কোনো মা এত বড় ভুল কববে না। দিন চাবি দিন।'

ব্যাগ খুলতেই খাপে মোড়া দুটা চশমা পাওযা গেল।

চোখে চশমা দিয়ে শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি এত সেজেছেন কেন?'

'আজ রাতে আমার বিযে হবার কথা ছিল। এটা হচ্ছে বিয়ের সাজ। বিযে হয নি বলেই যেতে পারছি।'

শুভ্র বলল, 'ভাগ্যিস হয় নি। বিয়ে হলে আপনার সঙ্গে দেখা হত না। আমারও দারুচিনি দ্বীপে যাওয়া হত না। বোকার মতো একা একা ভুল প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কেউ আমাকে খুঁজে পেত না। আর পেলেও কেউ বুদ্ধি করে বলতে পারত না যে আমার ব্যাগে এক্সট্রা চশমা আছে। আমাকে যেতে হত অন্ধের মতো।'

জরী হাসল।

এখন তার সব কিছুই ভালো লাগছে। পৃথিবীটা অনেক বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। স্টেশনের হৈচৈ আলো সব মিলিয়ে কেমন যেন নেশা ধরে যাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে, পৃথিবী এত সুন্দর কেন? একটু কম সুন্দর হলে তো ক্ষতি ছিল না। দুজন হাঁটছে ছোট-ছোট পা ফেলে। শুভ্র হঠাৎ কি মনে করে বলে ফেলল, 'চশমাটা পাওয়া না গেলেই ভালো হত।'

'কেন?'

'আপনি আমাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যেতেন। আপনি যখন আমার হাত ধরে হাঁটছিলেন আমার অসম্ভব ভালো লাগছিল। কিছু মনে করবেন না — কথাটা বলে ফেললাম। বেশির ভাগ সময় আমরা মনের কথা বলতে পারি না বলে কষ্ট পাই। আমি ঠিক করেছি আমি এই ভুল কখনো করব না। যা বলতে ইচ্ছা করে — তা বলব। আপনি কি রাগ করলেন?'

জরী সহজ গলায় বলল, 'না রাগ করি নি। আপনি বরং এক কাজ করুন চশমাটা খুলে পকেটে রেখে দিন। আমি আপনাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাই। নয়তো ওরা দেখলে হাসাহাসি করবে।'

শুভ্র চশমা খুলে পকেটে রাখল।

জরী তাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দলটির সঙ্গে দেখা হল। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল— 'কানা-বাবা! কানা-বাবা।'

আনুশকা ছুটে এসে বলল, 'জরী, তোর তো যাওয়ার কথা ছিল না।'

জরী বলল, 'চলে এলাম।'

'খুব ভালো করেছিস। খুব ভালো। তুই কানা-বাবাকে কোথায় পেলি?'

'পেয়ে গেলাম। বেচারা চশমা ভেঙে ফেলেছে। হাত ধরে আনা ছাড়া উপায় কী?'

দলের সবাই আবার চেঁচিয়ে উঠল— 'কানা-বাবা। কানা-বাবা।'

সঞ্জুর বাবাও এসেছেন।

সঙ্গে মুনাকে নিয়ে এসেছেন। সঞ্জু খুব অস্বস্তি বোধ করছে। সে বুঝতে পারছে তাকে নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে গা টেপাটেপি হচ্ছে। মোতালেব ফিসফিস করে বলল, 'দেখ, সবাই দেখ, খোকাবাবুর বাবা ফিডিং বোতল হাতে চলে এসেছে। লোকটার কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই?'

সবাই ট্রেনে উঠছে। প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরায় নয়। থার্ড ক্লাসে। তাতে কারোর আনন্দে ভাটা পড়ছে না। হাসাহাসি, আনন্দ উল্লাসের সীমা নেই। আনুশকা পাশের অচেনা এক ভদ্রলোককে বলল, 'ব্রাদার আপনি কী সেন্ট মেখেছেন গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে।' সেই লোক হতভম্ব।

জরী শুভ্রকে বলল, 'আপনি চশমা পরছেন না কেন?'

শুভ্র হাসিমুখে বলল, 'আমি চশমা পরব না বলে ঠিক করেছি।'

'বেশ তাহলে হাত ধরুন। আপনাকে ট্রেনে নিয়ে তুলি।'

মোতালেব চেঁচিয়ে বলল, 'ভাইসব রাস্তা করে দিন, কানা-বাবা আসছে কানা-বাবা। দি লারনেড ব্লাইন্ড ফাদার।'

নীরা চেঁচিয়ে বলল, 'অবিকল এই রকম একটা দৃশ্য আমার কল্পনায় ছিল। সুনীল অন্ধ হয়ে গেছে। আমি তার হাত ধরে ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুনীল এই পৃথিবীকে দেখছে আমাব চোখ দিয়ে। বানিয়ে বলছি না। বিশ্বাস কর। এই দ্যাখ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

আনুশকা বলল, 'লারনেড ব্লাইন্ড ফাদারকে সারাক্ষণ হাত ধরে ধরে কে টানবে? চিটাগাং নেমেই ওর জন্য চশমার ব্যবস্থা করতে হবে। শুনুন লারনেড ব্লাইন্ড ফাদার, সব সময় আমরা আপনাকে আপনি বলেছি, এখন আর বলব না। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।'

শুভ্র হাসল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি খুব খুশি হব যদি তা করেন।'

'আরেকটা কথা, এমন ফরমাল ভঙ্গিতে কথা বলবেন না, বললে চিমটি খাবেন।'

'জ্বি আচ্ছা। আর বলব না।'

রানা বলল, 'একটা গান ধরলে কেমন হয়?'

নীরা বলল, 'খুব খারাপ হয়। আচ্ছা আমি বসব কোথায়? আমার তো বসাব জায়গা নেই।'

রানা বলল, 'তুমি এবং সুনীল তোমরা দুজন দাঁড়িয়ে যাও। হাত ধরাধরি কবে দাঁড়িয়ে থাক।'

'আমার দাঁড়িয়ে যেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সুনীলকে বসতে দাও। জানালাব পাশে বসতে দাও। বেচাবা কবি মানুষ।'

সত্যি সত্যি জানালার পাশে খানিকটা জায়গা খালি কবা হল। সেখানে কেউ বসল না।

মুনা লক্ষ করল সবাই আছে শুধু অয়ন নেই।

সে কি যাচ্ছে না? কাউকে জিজ্ঞেস করতে তাব খুব লজ্জা লাগছে, তবু লজ্জা ভেঙে মোতালেবকে জিজ্ঞেস কবল।

মোতালেব বিরক্ত মুখে বলল, 'যাওয়ার তো কথা, গাধাটা এখনো কেন আসছে না কে জানে। ট্রেন মিস কববে। গাধারা সব সময় এ বকম করে। আগে একবাব পিকনিকে গেলাম। সে গেল না। পরে শুনি চাঁদার টাকা জোগাড় হয নি। আরে এক জন চাঁদা না দিলে কী হয। সবাই তো দিচ্ছি।'

মুনা ক্ষীণস্বরে বলল, 'উনার কি ট্যাকার জোগাড় হয নি?'

মোতালেব বলল, কী কবে বলব। আমাকে তো কিছু বলে নি।'

মুনা অসম্ভব রকম মন খারাপ কবে বাবার কাছে চলে এল। আর তখনি সে অয়নকে দেখল। অয়ন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায সে চাচ্ছে না কেউ তাকে দেখে ফেলুক। মুনা চেঁচিযে ডাকল, 'অযন ভাই। অযন ভাই।'

অয়ন প্লাটফরমে গাদা করে রাখা প্যাকিং বাক্সগুলোর আড়ালে সবে গেল। মুনা এগিযে গেল। পিছনে পিছনে এলেন সোবাহান সাহেব।

মুনা বলল, 'অযন ভাই আপনি যাচ্ছেন না। ট্রেন তো ছেড়ে দিচ্ছে।'

অয়ন কী বলবে ভেবে পেল না। সোবাহান সাহেব উত্তেজিত গলায বললেন, 'দৌড়ে গিয়ে উঠ। সিগন্যাল দিযে দিয়েছে।'

অয়ন নিচু গলায় বলল, 'চাচা আমি যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছ না কেন?

'টাকা জোগাড় কবতে পারি নি। এক জনের দেয়ার কথা ছিল সে শেষ পর্যন্ত ....'

গার্ড বাঁশি বাজিযে দিযেছে। ট্রেন নড়তে শুরু করেছে। অযন ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল। মুনার চোখে পানি এসে গেছে। সে জলভেজা চোখে তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

সোবাহান সাহেব পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে শান্তগলায বললেন, 'বাবা এই নাও, এখানে ছয়শ টাকা আছে। তুমি যাও দৌড়াও।'

অয়ন ধরা গলায় বলল, 'বাদ দিন চাচা। আমি যাব না।'

তার খুব কষ্ট হচ্ছে, সে কখনোই কোথাও যেতে পারে না। তার জন্যে খুব কষ্ট তো তার হয় না। আজ কেন হচ্ছে?

সোবাহান সাহেব বললেন, 'এক থাপ্পড় দেব। বেযাদপ ছেলে। দৌড় দাও। দৌড় দাও।'

মুনা বলল, 'যান অয়ন ভাই যান । প্লিজ।'

অযন টাকা নিল।

সে দৌড়াতে শুরু কবেছে। তাব পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে মুনা। সে কেন ছুটছে তা সে নিজেও জানে না।

দলেব সবাই জানালা দিযে মুখ বেব কবে তাকাচ্ছে। মোতালেব এবং সঞ্জু হাত বেব করে রেখেছে — কাছাকাছি এলেই টেনে তুলে ফেলবে। এইত আর একটু। আব একটু .... ।

সোবাহান সাহেব চোখ বন্ধ কবে প্রার্থনা কবছেন — "হে মঙ্গলময ঈশ্বর। এই ছেলেটিকে দারুচিনি দ্বীপে যাবাব ব্যবস্থা তুমি কবে দাও।'

ট্রেনের গতি বাড়ছে।

গতি বাড়ছে অযনেব। আব ঠিক তাব পাশাপাশি ছুটছে মুনা। সে কিছুতেই অযনকে ট্রেন মিস কবতে দেবে না। কিছুতেই না।

দুই দুয়ারী

১

মতিন সাহেব গাড়ির একসিলেটব আরো খানিকটা নামিযে দিলেন। স্পিডোমিটারের কাঁটা সত্তব থেকে আশিতে চলে এল। ময়মনসিংহ–ঢাকা হাইওযে। ফাঁকা বাস্তা, ঘণ্টায আশি কিলোমিটার কিছুই না। মতিন সাহেবের ছোট মেযে মিতু পেছনের সিটে বসে আছে। তার হাতে সত্যজিৎ রাযের সোনার কেল্লা। রওনা হবাব সময সে পড়তে শুরু কবেছে — এখন আর অল্প কিছু পাতা বাকি। মনে হচ্ছে, ঢাকায পৌঁছবার আগেই সে বইটা শেষ করতে পারবে। গাড়ি শালবনের ভেতর ঢুকল। মতিন সাহেব গাড়ির স্পিড আরো খানিকটা বাড়িযে দিলেন। স্পিড বাড়াতে শুরু করলে নেশাব মতো হযে যায। শুধু বাড়াতেই ইচ্ছা করে। মিতু বই বন্ধ করে মিষ্টি গলায ডাকল, 'বাবা।'

মতিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'কি মা?'

'ঢাকায় পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'পঁয়তাল্লিশ মিনিট, গিভ এন্ড টেক টেন মিনিটস।'

'গিভ এন্ড টেক টেন মিনিটস মানে কি বাবা?'

তিনি প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। আচমকা আতংকে জমে গেলেন। রাস্তার মাঝামাঝি একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সরে দাঁড়ানোর কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না! যে গাড়ি ঘণ্টায় নব্বই কিলোমিটার যাচ্ছে তাকে মুহূর্তের মধ্যে থামানো সম্ভব নয়। লোকটির পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার মতো জাযগা কি আছে? মতিন সাহেব একই সঙ্গে হর্ন এবং ব্রেক চাপলেন। চাপা গলায বললেন, 'ও মাই গড! ও মাই গড!'

ধক করে শব্দ হল।

লোকটি গাড়ির মাডগার্ডে ধাক্কা খেযে ছিটকে পড়ল বাস্তার একপাশে। গাড়ি তাকে ছাড়িযে ত্রিশ গজের মতো এগিয়ে পুরোপুরি থামল। মতিন সাহেব ইগনিশন সুইচ বন্ধ কবে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন মেয়ের দিকে।

মিতুর মুখ আতংকে সাদা হযে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পাতলা ঠোঁট কালচে দেখাচ্ছে। মিতু ফিসফিস করে বলল, 'বাবা লোকটা কি মারা গেছে?' মতিন সাহেব পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছতে মুছতে বললেন, 'আমার তাই ধারণা।'

'এখন আমরা কী করব বাবা?'

'কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকব।'

তিনি গাড়ির গ্লোব কম্পার্টমেন্টে সিগারেটের জন্যে হাত বাড়ালেন। তাঁর মনে পড়ল দুমাস আগে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন। গ্লোব কম্পার্টমেন্টে একটা টর্চলাইট ছাড়া কিছুই নেই। তিনি চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। এ রকম একটা ঘটনা ঢাকা শহরে ঘটলে কী হত দ্রুত ভাবার চেষ্টা করছেন। এতক্ষণে হাজারখানিক লোক জমে যেত। গাড়ির কাচ ভাঙত। তাকে এবং মিতুকে গাড়ি থেকে টেনে নামাত। কিছু লোক একত্র হলে এক ধরনের হিংস্রতা আপনা–আপনি জেগে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে ভয়ংকর সব কাণ্ড ঘটে।

মতিন সাহেব গাড়ির দরজা খুললেন। মিতু ভীত গলায় বলল, 'কোথায় যাচ্ছ বাবা?'

'লোকটাকে দেখে আসি।'

'আমার ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কিছু নেই।'

তিনি লক্ষ করলেন, তাঁর নিজেরই ভয় লাগছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মুখে থুতু জমা হচ্ছে। প্রচণ্ড ভয় পেলে শরীরের হরমোনাল ব্যালান্স নষ্ট হয়। বমি ভাব হয়, মুখে থুতু জমতে থাকে।

মিতু ক্ষীণ গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি এস বাবা। আমার কেমন জানি লাগছে।' তিনি এগিয়ে গেলেন। লোকটি মরে গিয়ে থাকলে কী করবেন — বুঝতে পারছেন না। এখানে ফেলে রেখে যাবেন? নাকি তাঁর বাচ্চা মেয়ের পাশে রক্তমাখা একটা ডেডবডি নিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হবেন? মিতুর জন্যে তা হবে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁর মেয়ে এখনো তৈরী নয়। শুধু তাঁর মেয়ে নয়, তিনি নিজেও তৈরী নন মতিন সাহেব এক দলা থুতু ফেললেন।

মতিন সাহেব লোকটির পাশে দাঁড়াতেই সে উঠে বসল। মাথা উঁচু করে তাকাল। লোকটির চোখ পিটপিট করছে। সূর্যের আলো পড়েছে তার চোখে। সে ভালোমতো তাকাতে পারছে না। মতিন সাহেব পুরো হকচকিয়ে গেলেন।

'লোকটি বেঁচে আছে' — তা এখনো মতিন সাহেবের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য হিসেবে ধরা পড়ছে না। তবে বেঁচে আছে তাতো দেখাই যাচ্ছে। এই তো লোকটার গায়ের নীল হাফশার্টে রক্তের ছোপ। কালো রঙের প্যান্টের হাঁটুর কাছটা ছেঁড়া। মতিন সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন, 'আপনি বেঁচে আছেন?'

সে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, যেন বেঁচে থাকার অপরাধে সে অপরাধী মরে গেলেই যেন ব্যাপারটা শোভন এবং সুন্দর হত।

'আপনি কি উঠে দাঁড়াতে পারবেন?'

'জ্বি।'

লোকটি উঠে দাঁড়াল। তার হাঁটুর কাছেও অনেকখানি কেটেছে — চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে।

'থ্যাংক গড যে, আপনি বেঁচে আছেন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি গাড়ি ব্যাক করে আনছি। আপনাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

'লাগবে না।'

'ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখুক। আপনার তো বেঁচে থাকারই কথা না!'

সে হাসল। মতিন সাহেব লোকটির দিকে ভালো করে তাকালেন। অসম্ভব রোগা লম্বা একজন মানুষ। অতিরিক্ত রকমের ফর্সা। হাতের নীল শিরা চামড়া ভেদ করে ফুটে রয়েছে। সরল ধরনের লম্বাটে মুখ। চোখে এক ধরনের শান্ত ভাব আছে, যা শুধুমাত্র পশুদের চোখেই দেখা যায়।

গাড়িতে উঠেই লোকটি ঘুমিয়ে পড়ল। এটা ভালো লক্ষণ না। প্রচণ্ড আঘাতে মস্তিষ্কে রক্তপাত হলে ঘুম পায়। সেই ঘুম সচরাচর ভাঙে না। ঘুমুতে ঘুমুতে কমায় চলে যায়। কমা থেকে মৃত্যু।

মিতু ফিসফিস করে বলল, 'বাবা উনি কি ঘুমুচ্ছেন?'

'হ্যাঁ মা।'

'উনার কিন্তু খালি পা।'

তিনি তাকিয়ে দেখলেন সত্যি সত্যি খালি পা। পায়ে নিশ্চয়ই স্যান্ডেল ছিল — ছিটকে পড়েছে। লোকটিকে গাড়িতে ওঠানোর সময় খেয়াল হয় নি। এখন স্যান্ডেলের জন্যে আবার ফিরে যাবার কোনো অর্থ হয় না।

মিতুর মুখ থেকে ফ্যাকাসে ভাব এখনো দূর হয় নি। তার বয়স দশ। এ বছর ক্লাস ফাইভে উঠেছে। তার ক্ষুদ্র জীবনে এমন ভয়ংকর ঘটনা আর ঘটে নি। সে সোনার কেল্লা বইটা তার চোখের সামনে ধরে রেখেছে কিন্তু বইয়ে মন দিতে পারছে না।

'বাবা!'

'কি মা।'

'আমার কেমন জানি ভয় ভয় লাগছে।'

'কীসের ভয়?'

'মনে হচ্ছে উনি মরে গেছেন।'

'আরে দূর। তুমি চুপচাপ বই পড়তে থাক। আমি বরং গান দিয়ে দি। দেব?'

'দাও।'

ভল্যুম অনেকখানি বাড়িয়ে মতিন সাহেব ক্যাসেট চালু করলেন। তিনি ভেবেছিলেন গানের শব্দে লোকটি জেগে উঠবে। তা হল না। লোকটি সিটে হেলান দিয়ে পাথরের মতো পড়ে আছে। মতিন সাহেবের মনে হল মিতুর কথাই হয়তো সত্যি — লোকটি মরে গেছে। ক্যাসেটে গান হচ্ছে। মতিন সাহেব মন দিয়ে গানের কথা শুনতে লাগলেন। কোনো কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

> 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা
> কহো কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।
> ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে সদাই ভাবনা
> যা কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা ।।'

মিতু ফিসফিস করে বলল, 'বাবা!'

'কি মা?'

'লোকটা মরে গেলে আমরা কী করব?'

'আমরা তার আত্মীয়স্বজনকে খবর দেব।'

'তোমাকে পুলিশে ধরবে না?'

'না। এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।'

'আমার মনে হচ্ছে পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ভয় লাগছে বাবা।'

'ভয়ের কিছু নেই। লোকটা মরে নি।'

মতিন সাহেব আড়চোখে তাকালেন। লোকটি নড়ছে না। নিশ্বাস ফেলছে বলেও মনে হচ্ছে না। সম্ভবত মারা গেছে। প্রথমেই তাকে এক জন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। তিনি গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন। স্পিডোমিটারের কাঁটা আবার নব্বই-এর কাছাকাছি চলে এল।

না, লোকটি মরে নি।

ডাকামাত্র উঠে বসল। হেঁটে হেঁটে ঢুকল ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তার জাকির হোসেন মতিন সাহেবের বন্ধু। তিনি দেখেটেখে বললেন, 'তেমন কিছু না। দু-এক জায়গা ছিঁড়ে গেছে। ওয়াশ করে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিচ্ছি। হাঁটুতে স্টিচ লাগবে। দ্যাটস ইট।'

মতিন সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, 'মাথায় চোট পেয়েছে কিনা দেখবেন? সারা রাস্তা ঝিমুতে ঝিমুতে এসেছে।'

ডাক্তার সাহেব সহজ গলায় বললেন, 'মাথায় চোট পেয়েছে বলে মনে হয় না। চোখের মণি ডাইলেটেড হয় নি। রিফ্লেক্স অ্যাকশন ভালো। লম্বা ঘুম দিলে ঠিক হয়ে যাবে। একটা পেইন রিলিভার দিয়ে দিচ্ছি — ব্যথা বেশি হলে খেতে হবে।' প্রেসক্রিপশন লিখতে গিয়ে ডাক্তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বিব্রত চোখে তাকাল। যেন খুব অস্বস্তিবোধ করছে।

'বলুন, নাম বলুন।'

'আমার কোনো নাম নেই।'

'নাম নেই মানে?'

লোকটি মাথা নিচু করে ফেলল। আড়চোখে তাকাল মতিন সাহেবের দিকে। তার চোখে চাপা সংশয়। মতিন সাহেব খানিকটা হকচকিয়ে গেছেন। তাকাচ্ছেন মিতুর দিকে। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনি কি নাম মনে করতে পারছেন না?'

'না।'

'আপনার পরিচিত কারোর নাম মনে আছে?'

লোকটি মিতুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই মেয়েটার নাম মিতু।'

'এই মেয়ে ছাড়া অন্য কারোর নাম মনে পড়ছে না?'

'না।'

'আপনি কী করেন বলুন তো?'

'কিছু করি না।'

'কিছু নিশ্চয়ই করেন — এখন মনে করতে পারছেন না, তাই না?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা, অ্যাকসিডেন্টের পরের ঘটনা মনে আছে?'

'আছে।'

'দু একটা বলুন তো শুনি।'

'মিতু তার বাবার সঙ্গে কথা বলছিল। গান হচ্ছিল।'

'কী গান?'

লোকটি মতিন সাহেবকে পুরোপুরি চমকে দিয়ে গানের প্রতিটি লাইন বলে গেল। মতিন সাহেব যেমন চমকালেন ডাক্তার তেমন চমকালেন না। সহজ গলায় বললেন, 'সাময়িক অ্যামনেশিয়া। শকটা কেটে গেলে ঠিক হয়ে যাবে। ভালোমতো রেস্ট হলেই স্মৃতি ফিরে আসবে। ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। দশ মিলিগ্রামের একটা করে ফ্রিজিয়াম ঘুমুতে যাবার এক ঘণ্টা আগে খেতে হবে।'

ডাক্তার লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি বমি ভাব হচ্ছে?'

'জ্বি না।'

'মাথা ঘুরছে?'

'ঘুরছে না, তবে কেমন যেন লাগছে।'

'আচ্ছা বসুন এখানে, আমি আপনার ব্লাড প্রেসার মাপি।'

মতিন সাহেব ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে চলে এলেন। তাঁকে একটা সিগারেট খেতেই হবে। মিতু তার পেছনে পেছনে এল। রাস্তার পাশের সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনলেন। মুখে এখনো থুতু জমা হচ্ছে। একটা মিষ্টি পান কিনলেন। মিতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পান খাবিরে মিতু?'

'খাব। মিষ্টি পান।'

মিতু পান মুখে দিয়ে বড়দের মতো পিক ফেলে বলল, 'লোকটাকে এখন আমরা কী করব?'

'বুঝতে পারছি না। ভাবছি একটা শার্ট এবং প্যান্ট কিনে দেব। শ দুএক টাকা দিয়ে দেব। ও বাড়ি চলে যাবে।'

'বাড়ি তো চেনে না। যাবে কীভাবে?'

'তুই কী করতে বলছিস?'

'কয়েকদিন আমাদের বাসায় থাকুক। তুমি খোঁজ করে তার আত্মীয়স্বজন বের কর।'

'এটাও করা যেতে পারে।'

মতিন সাহেব চেম্বারে ঢুকলেন। লোকটি খুশি-খুশি গলায় বলল, 'আমার ব্লাডপ্রেসার স্বাভাবিক। হার্ট বিটও স্বাভাবিক।'

মতিন সাহেব বললেন, 'সব কিছু স্বাভাবিক হলেই ভালো।'

তিনি লোকটিকে বাসায় নিয়ে এলেন।

২

মতিন সাহেবের বাসা বনানীতে।

নিজের বাড়ি নয় — ভাড়া করা। পুরানো ধরনের বাড়ি। অনেকগুলো ঘর। সামনে ফাঁকা জায়গায় দেশি ফুলের গাছ। চাঁপা, কেয়া, হাসনাহেনা। জংলা-জংলা ভাব আছে। বাড়ির দক্ষিণে দুটা ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছ। একটা কাঁঠাল গাছের তলা বাঁধানো। ছুটির দিনের দুপুরে মিতু এইখানে বসে একা একা সাপলুডু খেলে। কাঁঠালতলার আরেকটা নাম আছে — কান্নাতলা। মন খারাপ হলে মিতু এখানে বসে কাঁদে।

এত বড় বাড়িতে মানুষের সংখ্যা অল্প।

মতিন সাহেবের স্ত্রী — সুরমা। তিনি মতিঝিল জনতা ব্যাংকের মহিলা শাখার ম্যানেজার। সারাদিন অফিসেই থাকেন। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে প্রথমেই সবাইকে খানিকক্ষণ বকাঝকা করেন, তারপর উঠে যান দোতলায়। রোজ সন্ধ্যায় তাঁর মাথা ধরে। দোতলায় তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘণ্টা দুএক চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। তারপর একতলায় নেমে এসে আবার সবাইকে খানিকক্ষণ বকাঝকা করেন। ঝড়ঝাপ্টা বেশির ভাগ যায় তাঁর বড় ছেলে সাব্বেরের উপর দিয়ে। সাব্বের এই পরিবারে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করেছে। সবাইকে অশান্তিতে ফেলেছে।

সাব্বের দোতলায় থাকে। একেবারে কোনার দুটি ঘর তার। একটি স্টাডি রুম, অন্যটি শোবার ঘর। সাব্বের তিন বছর আগে ডাক্তারি পাস করেছে। পাস করবার পরপরই ঘোষণা

করেছে ডাক্তারি কিছুই সে শিখতে পারে নি। সে চিকিৎসার ক খ-ও জানে না। কাজেই ডাক্তারি কববে না। মতিন সাহেব সাবেরকে ডেকে বলেছিলেন, 'শুনলাম তুমি চাকরি-বাকরি নিতে চাও না — সত্যি?'

সাবেব শান্ত গলায় বলেছে, 'সত্যি। প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতে চাই না।'

'কেন চাও না?'

'আমি ডাক্তাবি কিছুই শিখতে পাবি নি।'

'পরীক্ষায় তো খুব ভালো রেজাল্ট করেছ।'

'তা করেছি, কিন্তু আমাব কিছুই মনে নেই।'

'কিছুই মনে নেই বলতে কী মিন করছ?'

'যেমন ধর ডিপথেবিয়া। কিছুক্ষণ আগে ডিপথেরিযা নিয়ে চিন্তা কবছিলাম। ডিপথেরিযাতে এন্টিটক্সিন দিতে হয এবং এন্টিবায়োটিক দিতে হয। কিন্তু এন্টিটক্সিনের ডোজ তো আমাব কিছুই মনে নেই। ডিপথেবিযাতে কার্ডিযাক ফেইলিউব হয — কেন হয তাও মনে নেই।'

'সব কিছু মনে থাকতে হবে?'

'অফ কোর্স মনে থাকতে হবে। মানুষেব জীবন নিয়ে কথা।'

'তুমি তাহলে কী করবে?'

'আমি নিজে নিজে পড়ব। যেদিন বুঝব যা-কিছু জানাব সব জেনেছি, সেদিন চিকিৎসা শুরু কবব।'

মতিন সাহেব বললেন, 'তুমি যা করছ তা যে এক ধবনেব পাগলামি তা কি বুঝতে পাবছ?'

'না বুঝতে পাবছি না।'

'আমি কিছুই বলব না। এইসব পাগলামি তুমি তোমাব মার কাছ থেকে পেযেছ। তোমার মাকে আমি যেমন কিছু বলি না — তোমাকেও বলব না। তবে আশা করব যে, দ্রুত পাগলামি কাটিযে উঠবে।'

সাবের মাথা নিচু কবে বাখল। কিছু বলল না। মতিন সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারছ কি বলছি?'

'পারছি।'

'পাগলামি কাটিযে ওঠার চেষ্টা কববে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

পাগলামি কাটিযে ওঠাব কোনোরকম লক্ষণ সাবেরেব মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তার স্টাডি রুমে চিকিৎসাশাস্ত্রের রাজ্যের বই। সাবাদিন সে বই পড়ে। যে সমযটা বই পড়ে না — বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে। এমাথা থেকে ওমাথায় যায় — ওমাথা থেকে এমাথায আসে। যা পড়েছে তা মনে করার চেষ্টা করে।

দোতলায় মার ঘরের পাশেব ঘরে থাকে মিতু এবং এষা। মেজো মেয়ে এষা ইংরেজি সাহিত্যে সেকেন্ড ইযার অনার্স পড়ছে। রূপবতী না হলেও স্নিগ্ধ চেহারা, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। ছেলেটির নাম জুবায়ের। লেদার টেকনোলজিতে জার্মানি থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। নিজেই ছোটখাটো ইন্ডাস্ট্রির মতো শুরু করেছে। শুরুটা করেছে চমৎকার। জুবায়ের প্রাযই এ বাড়িতে আসে। বাড়ির প্রতিটি সদস্য এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করে।

মতিন সাহেবের বড় মেয়ের নাম নিশা। মাত্র কিছুদিন হল তার বিয়ে হয়েছে। এই মেয়েটি অসম্ভব রূপবতী। রূপবতীদের সাধারণ ত্রুটি — অহংকার তার মধ্যে পুরোপুরি আছে। নিশার স্বামী ফজলুর রহমান গোবেচারা ধরনের মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ম্যাথমেটিক্সের এসোসিয়েট প্রফেসর। নিশা এই বিয়েতে সুখী হয় নি বলে মনে হয়। বাবার বাড়িতে সে যখন আসে — স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির বদনাম করতে আসে। মাঝে মাঝে কান্নাকাটিও করে।

মতিন সাহেব থাকেন একতলায়। বলা চলে একা-একাই থাকেন। এমনও দিন যায় — স্ত্রীর সঙ্গে তার কথাই হয় না। এই নিয়ে তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ আছে বলে মনে হয না। মতিন সাহেবের পাশের ঘরে থাকে মিতুর ছোট মামা মন্টু। জগন্নাথ কলেজ থেকে দুবার বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে সে তৃতীয়বারেব প্রস্তুতি নিচ্ছে। মন্টুর ঘরের দরজায বড় বড় করে লেখা...

মনোয়ার আহমেদ মন্টু

তার নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা — বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। মন্টুর ঘর দিন-রাতই খোলা। যার ইচ্ছা সে ঘরে ঢুকছে এবং বেরুচ্ছে। মতিন সাহেবের পরিবারের এই হচ্ছে মোটামুটি পরিচয। এরা ছাড়াও দুজন কাজেব লোক, এক জন বাবুর্চি, এক জন মালী, এক জন দারোযান, এক জন ড্রাইভাব এ বাড়িতেই থাকে। এদেব থাকাব জাযগা বাড়িব পেছনের টিনশেডে। এইসব মানুষেব সঙ্গে তিন দিন আগে আরেকজন মানুষ যুক্ত হযেছে— যার কোনো নাম নেই এবং যে পুবানো কোনো কথা মনে কবতে পাবছে না।

একতলায একটা ঘব তাকে দেযা হযেছে। নির্বিকার ভঙ্গিতেই সে সেই ঘবে আছে। খাওযাদাওযা করছে, ঘুমুচ্ছে। যেন এটা তাব নিজেবই ঘরবাড়ি। মাঝে মাঝে গুনগুন কবে গান গাইতেও শোনা যাচ্ছে। একটিই গান —

'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা
কহো কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।'

মতিন সাহেব লোকটির খোঁজ বের কবাব ভালোই চেষ্টা কবেছেন। থানায ডাযেরি করিয়েছেন। দুটি দৈনিক পত্রিকায় 'সন্ধান চাই' বিজ্ঞাপন ছবিসহ ছাপা হয়েছে। অ্যাকসিডেন্ট যেখানে হযেছিল সেখানেও লোক পাঠিয়েছিলেন। কেউ কোনোরকম সন্ধান দিতে পারে নি। মতিন সাহেব বুঝতে পারছেন না, এখন তাব করণীয কী। তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন আরো তিন-চার দিন দেখে লোকটাকে যেখান থেকে তুলেছেন সেখানে রেখে আসবেন। কাজটা অমানবিক হলেও কিছু করার নেই। সঙ্গে কিছু টাকাপয়সা দিলেই হবে। লোকটি স্মৃতিশক্তি তার কারণেই হাবিযেছে, তাতো নাও হতে পারে। হয়তো আগে থেকেই স্মৃতিশক্তি ছিল না।

বুধবার সন্ধ্যা।

মতিন সাহেব বারান্দায় ইজিচেযারে বসে আছেন। এষা ট্রে-তে কবে চা, এক পিস কেক এবং কলা এনে সামনে রাখল। মতিন সাহেব বললেন, 'কেমন আছ মা?'

এষা হাসিমুখে বলল, 'ভালো আছি। তুমি কেমন আছ বাবা?'

'আমি মন্দ আছি।'

পিতা এবং কন্যা দুজনই এক সঙ্গে হেসে উঠল। এষা কথা-বলা শেখার পর থেকে এই জাতীয় বাক্যালাপ দুজনের মধ্যে চলছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধরনটা একটু পাল্টাচ্ছে। এষার পাঁচ বছর বয়সে কথাবার্তা হত এ রকম :

মতিন সাহেব উঁচু গলায় বলতেন, 'কেমন আছ মা-মণি?'

এষা প্রায় চিৎকার করে বলত, 'তুমি কেমন আছ বাবা-মণি?'

'আমি মন্দ আছি।'

'আমিও মন্দ আছি। হি-হি-হি।'

আজ দুজনেরই বয়স বেড়েছে কিন্তু এই একটা জায়গায় যেন বয়স আটকে আছে। এষা বাবার সামনে চা রাখল। কোমল গলায় বলল, 'কলার খোসা ছাড়িয়ে দেব বাবা?' মতিন সাহেব বললেন, 'তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে কলার খোসা ছাড়ানো দারুণ কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটা করে তুই আমাকে সাহায্য করতে চাস। কিচ্ছু করতে হবে না — তুই আমার সামনে বোস।' বসতে বলার দরকার ছিল না — এষা নিজ থেকেই বসত। সন্ধ্যাবেলা বেশ কিছুটা সময় সে বাবার সঙ্গে বসে। মতিন সাহেব মেয়ের কাছ থেকে বাড়ির সারাদিনের খবরাখবর নেন। এষাকে এ বাড়ির গেজেট বলা চলে। কিছুই তার চোখ এড়ায় না। বলেও খুব গুছিয়ে।

মতিন সাহেব চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'আজ তোর মা আছে কেমন?'

'জানি না। ইউনিভার্সিটিতে যাবার আগে উঁকি দিয়েছিলাম। মা খ্যাঁক করে উঠেছেন — কেন ডিসটার্ব করছ?'

'বেচারি খেটেখুটে বাসায় আসে, ডিসটার্ব না করলেই হয়।'

'ডিসটার্ব আবার কি? আমি মার সঙ্গে কথাও বলব না?'

'যখন মন-টন ভালো থাকবে তখন কথা বলবি।'

'তাঁর মন কখনোই ভালো থাকে না।'

'তাও ঠিক।'

'আরেকটা খবর আছে বাবা।'

'বলে ফেল।'

'হরিপ্রসন্ন স্যার এসেছেন।'

মতিন সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, 'কেন?'

'কিছু বলেন নি। দেখে মনে হল খুব অসুস্থ। তুমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলবে? ডাকব?'

'না — এখন কথা বলব না। মনটা ভালো না।'

'মন ভালো না কেন?'

তিনি উত্তর দিলেন না। সিগারেট ধরালেন। তিনি এখন পুরোদমে সিগারেট খাচ্ছেন। দিনে এক প্যাকেটের বেশি লাগে।

এষা একটু চিন্তিতবোধ করল। বাবার সিগারেট শুরু করা মানে তাঁর ওষুধের কারখানায় বড় ধরনের কোনো সমস্যা; যে সমস্যা নিয়ে তিনি কখনো কারো সঙ্গে কথা বলেন না।

'সাব্বেরের খবর কী রে?'

'দাদা ভালোই আছে। একটা নরকংকাল কিনে এনেছে। অস্থিবিদ্যা যা শিখেছিল সব ভুলে গেছে। আবার নতুন করে নাকি শিখতে হবে।'

মতিন সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এষা বলল, 'মার সঙ্গে দাদাকেও নিয়ে যাও। তাকেও কোনো একজন বড় সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার। আরেক কাপ চা দেব বাবা?'

'না।'

'তুমি আবার সিগারেট ধরিয়েছ। তোমার কারখানায় কি কোনো সমস্যা হচ্ছে?' মতিন সাহেব এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। মনে হল তিনি শুনতে পান নি। এষা বলল, 'তুমি তো ঐ লোকটা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে না!'

'কোন লোকটা?'

'ঐ যে যাকে নিয়ে এসেছ। অ্যামনেশিয়া হয়েছে।'

'ওর কোনো খবর আছে নাকি?'

'না। দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে। মনে হচ্ছে এ বাড়িতে সে সুখে আছে।'

'কারো সঙ্গে কথা-টথা বলে না?'

'নিজ থেকে বলে না। কেউ কিছু বললে খুশি হযে জবাব দেয। আজ দুপুবে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে দেখি সে কাঁঠাল গাছের নিচে বসে মিতুর সঙ্গে লুডু খেলছে।'

'তুই কি কথা বলেছিস?'

'না। কথা বলতাম। কিন্তু লোকটাকে আমার কেন জানি পাগল মনে হয। চোখেব দৃষ্টি যেন কেমন।'

'আরে দূর — চোখের দৃষ্টি ঠিকই আছে। লোকটা কিছু মনে করতে পারছে না এই জন্যে তুই ভয পাচ্ছিস! তোর কাছে মনে হচ্ছে লোকটা পাগল। তুই বরং লোকটার সঙ্গে কথা বল।'

'কেন?'

'কথা বললে বুঝতে পারবি তার ব্যাকগ্রাউন্ড কী? কী ধবনের ফ্যামিলি থেকে এসেছে। পড়াশোনা কী। এতে লোকটাকে ট্রেস করতে সুবিধা হবে।'

'তুমি তো অনেক কথা বলেছ — তোমার কী মনে হয?'

মতিন সাহেব খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না। আমি খানিকটা কনফিউজড।'

'সে কী?'

মতিন সাহেব আরো একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরাতে ধবাতে লক্ষ করলেন, লোকটা হেঁটে হেঁটে কাঁঠাল গাছগুলোর দিকে যাচ্ছে। মতিন সাহেব বললেন, 'লোকটার একটা নাম দরকার। এমনিতে ডাকার জন্য একটা নাম। যতদিন আসল নাম পাওযা না গেছে ততদিন এই নামে ডাকব।'

'নাম তো বাবা দেয়া হয়েছে।'

'কী নাম?'

'নাম হচ্ছে জুলাই।'

'জুলাই!'

'হ্যাঁ, জুলাই। মিতু নাম রেখেছে। এখন জুলাই মাস, কাজেই তার নাম জুলাই। যখন আগস্ট মাস আসবে তখন তার নাম হযে যাবে আগস্ট। মিতুর খুব ইচ্ছা লোকটা যেন সারাজীবন এই বাড়িতে থাকে, যাতে সে প্রতিমাসে একবার কবে নাম বদলাতে পারে।'

এষা খিলখিল করে হেসে উঠল। মতিন সাহেব বললেন, 'আরেক কাপ চা আন তো মা।'

'আরেক কাপ চা এনে দিচ্ছি, কিন্তু বাবা তুমি তোমার সিগারেটের প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে দাও। এরপর তোমার সিগারেট খেতে ইচ্ছা করলে আমার কাছে চাইবে।'

মতিন সাহেব সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে দিলেন।

এষা চা বানিয়ে দেখে, তার বাবা ঘুমুচ্ছেন। তন্দ্রা নয়, বেশ ভালো ঘুম। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত এক জন মানুষের ঘুম। এষার তাকে জাগাতে ইচ্ছা করল না। সে চায়ের কাপ নিয়ে বাগানে নেমে গেল। জুলাই নামের লোকটাকে দিয়ে আসা যাক। তার সঙ্গে কথাও হয় নি। কিছুক্ষণ কথা বলা যেতে পারে। তবে নিজের হাতে চা নিয়ে যাওয়াটা বোধহয় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। লোকটা লাই পেয়ে যেতে পারে; বরং সে নিজেই নিয়ে এসে চা খাবে। চা খেতে খেতে দু একটা কথা বলবে।

বাগানের এই দিকটা অন্ধকার। চল্লিশ পাওয়ারেব একটা বাল্ব ফিউজ হয়েছে, নতুন বাল্ব লাগানো হয় নি। তবে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো খানিকটা এসেছে এদিকে। সেই আলোয় অস্পষ্ট করে হলেও সবকিছু চোখে পড়ে। লোকটিকে কাঁঠাল গাছের নিচে পা তুলে বসে থাকতে দেখা গেল।

বসে থাকার ভঙ্গিটি মজার। পা তুলে পদ্মাসনেব ভঙ্গিতে বসা। শিরদাঁড়া সোজা করা। ধ্যান-ট্যান করছে নাকি? লোকটা বসেছে উল্টো দিকে। এষা এগুচ্ছে পেছন দিক থেকে। লোকটার মুখ দেখতে পারছে না। পেছন দিক থেকে একটা মানুষের কাছে যেতে ভালো লাগে না।

'কেমন আছেন?'

লোকটা চমকে উঠল। উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। এষা বলল, 'আমি মিতুব বড় বোন।' লোকটা নিচু গলায় বলল — 'জ্বি, আমি জানি। মিতু বলেছে।'

'আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

লোকটি বলল, 'আপনিও বসুন।'

কথাগুলো এত সহজ এবং এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলা হল যেন দীর্ঘদিনের পরিচিত এক জন মানুষ কথা বলছে। এষা বসল। বসতে বসতে বলল, 'বাবা আপনার খোঁজ বের কবাব খুব চেষ্টা করছেন। আপনাব ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেযা হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'থানায় খবর দেয়া হয়েছে। যেখান থেকে আপনাকে তুলে এনেছেন সেখানেও লোক পাঠানো হয়েছে।'

'আমি জানি। আপনাব বাবা আমাকে বলেছেন।'

'আপনি কি কিছুই মনে কবতে পাবেন না?'

'জ্বি না।'

'এর জন্যে আপনার মন খারাপ লাগছে না?'

'না।'

'আশ্চর্য! আপনাব আত্মীযস্বজন কাবা, তাঁবা কোথায আছেন — এই ভেবে মন খারাপ হচ্ছে না?'

লোকটি চুপ করে রইল।

এষা বলল, 'আপনার আত্মীযস্বজনরা নিশ্চযই খুব দুশ্চিন্তায আছেন। ছোটাছুটি করছেন।'

লোকটি চুপ করেই রইল। যেন এই প্রসঙ্গে সে কোনো কথা বলতে আগ্রহী নয়। এষা বলল, 'আপনার পড়াশোনা কতদূর?'

'জানি না।'

'আচ্ছা আমি একটা ইংরেজি কবিতা বলি, আপনি এর বাংলা কি, বলুন তো —

'Remember me when I am gone away.
Gone far away into the silent land.'

'আমি অর্থ বলতে পারছি না।'

'আপনি কি ইংরেজি জানেন না?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হয় জানি না।'

'ও আচ্ছা। আমার মনে হচ্ছিল, আপনি ইংরেজি জানেন।'

'আমি জানি না।'

এষা উঠে দাঁড়াল। লোকটি বলল, 'চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আপনিও ঘরে চলে যান। বৃষ্টি নামবে। দেখুন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।'

লোকটি জবাব দিল না।

রাত নটার দিকে বৃষ্টি নামল। এষা নিজের ঘরে পড়ছিল। মালী এসে বলল, 'আপা লোকটা কাঁঠাল গাছের নিচে বইয়া বৃষ্টিতে ভিজতাছে।'

'কেন?'

'জানি না। ঘরে যাইতে বললাম, যায় না।'

'না গেলে না যাবে। ভিজুক।'

'পাগল–ছাগল মানুষ বাড়িতে রাখা ঠিক না আপা।'

'তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ কর।'

মালী চলে গেল। এষা জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। লোকটা বসে আছে। বৃষ্টিতে ভিজছে। তার মধ্যে কোনোরকম বিকার নেই। যেন একটা পাথরের মূর্তি। লোকটা কি পাগল? কথাবার্তায় অবশ্যি মনে হয় নি। ইংরেজি জানে না — তার মানে মূর্খ ধরনের মানুষ।

কাজের মেয়েটি এসে বলল, 'আপা আপনার টেলিফোন।'

'কার টেলিফোন?'

কাজের মেয়েটি মুখ টিপে হাসল। যার মানে এই টেলিফোন জুবায়ের করেছে। জুবায়ের টেলিফোন করলেই এ বাড়িতে এক ধরনের চাপা হাসাহাসি হয়। এর কোনো মানে আছে?

এষা টেলিফোন ধরল।

'কে এষা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের এদিকে কি বৃষ্টি হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। হচ্ছে।'

'অল্পস্বল্প না ক্যাট্স এন্ড ডগস?'

'ভালোই হচ্ছে।'

'বৃষ্টিতে ভিজবে এষা?'

'না।'

'না কেন?'

'আগে এক বার তোমার সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজেছি, তারপর তুমি যে কাণ্ড করেছ তারপর আমার আর সাহসে কুলায় না।'

'আজ আমি সন্ন্যাসীর মতো আচরণ করব। তোমার কাছ থেকে সবসময় চার হাত দূরে থাকব। ওয়ার্ড অব অনার। চলে আসব?'

'আস।'

'ভালো কথা, ঐ লোকটার কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে? মিঃ জুলাই?'

'না।'

'লোকটার সম্পর্কে আমার কি ধারণা শুনতে চাও? আমার ধারণা, ব্যাটা একটা ফ্রড। বিরাট ফ্রড। স্মৃতিশক্তি হারানোর ভান করে তোমাদের এখানে মজায় আছে।'

'আমাদের এখানে মজার কী আছে?'

'ফুড এন্ড শেলটার আছে। এই শহরে কটা লোকের ফুড এন্ড শেলটার আছে জান? এবাউট ফর্টি পারসেন্ট লোকের নেই। তোমরা এক কাজ কর। ঘাড় ধরে ঐ লোকটাকে বের করে দাও।'

'লোকটার উপর তোমার এত রাগ কেন?'

'ফ্রড লোকজন আমি সহ্য করতে পারি না। লোকটার গালে পঞ্চাশ কেজি ওজনের দুটো চড় দিলেই দেখবে হারানো স্মৃতি ফিরে এসেছে। ফড়ফড় করে কথা বলছে।'

'কে দেবে চড়?'

'কেউ দিতে রাজি না থাকে আমি দেব।'

'আচ্ছা চলে এস। এসে চড় দিয়ে যাও।'

এষা টেলিফোন রেখে জানালার পাশে চলে গেল — লোকটা এখনো বৃষ্টিতে ভিজছে। এই কাণ্ড সে কি ইচ্ছা করে করছে? দেখাতে চাচ্ছে — তার মাথা ঠিক নেই?

সাবের বারান্দায় হাঁটছিল।

হাঁটতে হাঁটতে সারা দুপুর যা পড়েছে তা মনে করার চেষ্টা চলছে। বেশির ভাগই মনে পড়ছে না। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তার ধারণা, ব্রেইন পুরোপুরি গেছে। আধঘণ্টা আগের পড়া জিনিসও কিছুই মনে নেই!

কিছুক্ষণ আগে সে ডায়েট সম্পর্কে পড়ছিল। এক জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের কী কী মিনারেল লাগে, কতটুকু লাগে। সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। মনে করার চেষ্টা করেও লাভ হচ্ছে না।

ক্যালসিয়াম : দৈনিক ১ গ্রাম। WHO বলছে তারচে' কম হলেও চলে ০.৪ থেকে ০.৭।

আয়রন : ১৫ মিলিগ্রাম।

আয়োডিন : ০.১ মিলিগ্রাম।

ফসফরাস : ১ গ্রাম।

আসল জিনিসটাই মনে আসছে না — 'সোডিয়াম কতটুকু দরকার'। অনেকখানি খাবার লবণ দৈনিক শরীরে যাচ্ছে — দরকার কতটুকু? এই লবণের সঙ্গে আবার ব্লাডপ্রেসার জড়িত। ফ্লোরিনও তো দরকার। কতটুকু? একটু আগে পড়া অথচ কিছুই মনে পড়ছে না। সাবেরের প্রায় কান্না পাচ্ছে।

মিতু একতলা থেকে দোতলায় উঠে এল। বারান্দায় সাবেরকে হাঁটাহাঁটি করার দৃশ্য সে খানিকক্ষণ দেখে সহজ স্বরে বলল, 'ভাইয়া তুমি বৃষ্টিতে ভিজছ!'

সাবের তার দিকে তাকাল। কিছু বলল না। তার চোখে-মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তি। সোডিয়াম ইনটেকের পরিমাণ মনে করতে হবে। যেভাবেই হোক মনে করতে হবে। মিতু আবার বলল, 'ভাইয়া, তুমি বৃষ্টিতে ভিজে ন্যাতা-ন্যাতা হয়ে গেছো!'

'বিরক্ত করিস না তো।'

'তোমাকে কী রকম যেন পাগলের মতো লাগছে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ।'

সাবের এই প্রথম লক্ষ করল বৃষ্টির ছাঁটে সে সত্যি সত্যি অনেকখানি ভিজেছে। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। ঠাণ্ডা লাগলে অনেক রকম কমপ্লিকেশন। শরীরের ডিফেন্স সিসটেম দুর্বল হয়ে যাবে। ভাইরাস জেঁকে ধরবে। ইনফ্লুয়েনজা, ... আচ্ছা ইনফ্লুযেনজা ভাইরাসের নাম কী যেন!

'মিতু।'

'কি?'

'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ। অল্প একটু বাকি। পুরোপুরি পাগল হলে তুমি কী করবে?'

'জানি না।'

'মিস্টার জুলাই–র মতো বৃষ্টিতে বসে বসে ভিজবে?'

'মিস্টার জুলাইটা কে?'

'ঐ দেখ কাঁঠাল গাছের নিচে বসে ভিজছে।'

'লোকটা কে?'

'কেউ জানে না কে। আমরা যখন মযমনসিংহ থেকে আসছিলাম তখন গাড়িতে ধাক্কা দিযে লোকটাকে ফেলে দেই। প্রথম ভাবলাম মবে গেছে। কিন্তু মরে নাই। বাসায নিযে এসেছি। এই লোকটাও তোমার মতো কিছু মনে বাখতে পারে না।'

'কতদিন হল আছে?'

'চার দিন হযে গেল।'

'আমাকে তো কেউ কিছু বলে নি।'

'তোমাকে বলে কী হবে?'

সাবের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'তাও ঠিক। আমি নিজের যন্ত্রণাতেই অস্থিব। অন্যের যন্ত্রণা নিযে চিন্তার সময আমার কোথায!' সাবের তাবপব আবাব বলল, 'মিতু তুই আমাকে চা খাওয়াতে পারবি?'

'না।'

'কাজের মেয়েটাকে বলে আসতে পারবি তো? নাকি তাও পারবি না?'

'তাও পারব না। আমি দোতলা থেকে মিস্টার জুলাইকে দেখব।'

'একটা মানুষ বৃষ্টিতে ভিজছে তাব মধ্যে দেখার কী আছে?'

'লোকটা পাথরের মতো বসে আছে। একটুও নড়ছে না। কখন নড়ে সেটা দেখব। বারান্দার লাইটটা জ্বালিয়ে দাও তো ভাইয়া, লোকটার গাযে আলো পড়ুক।'

সাবের বাতি জ্বালিয়ে দিতেই লোকটার উপর আলো পড়ল। সাবের বিরক্ত হযে বলল, 'তুই না বললি লোকটা পাথরের মতো বসে আছে, নড়ছে না। ঐ তো নড়ছে।' সত্যিই তাই। লোকটা মাথার পানি ডান হাতে মুছছে। একবার ঘাড় ঘুরিযে সাবেবের দিকে তাকাল।

'মিতু, ভদ্রলোকের নাম কী বললি?'

'মিস্টার জুলাই। আর তিন দিন পর উনার নাম হবে মিস্টার আগস্ট।'

'আমি বোধহয় পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছি, তোর কথাবার্তা কিছুই বুঝছি না। আর তিন দিন পর তার নাম মিস্টার আগস্ট হবে কেন?'

'ভাইয়া, তোমার সঙ্গে আমি এত কথা বলতে পারব না। তুমি কোনো কিছু বুঝিযে বললেও বোঝ না।'

মিতু বারান্দার এক কোনায চলে গেল। এখান থেকে লোকটাকে ভালো দেখা যায়। সাবের নিচে গেল। সে নিচে নামল কাজেব মেযেটিকে চায়ের কথা বলার উদ্দেশ্যে। নিচে নেমে তা মনে রইল না। বাগানে নেমে গেল। মিস্টার জুলাই-এর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছা কবছে। তিন দিন পর তার নাম মিস্টার আগস্ট কেন হচ্ছে তা জানা দরকাব। জেনে ফেলার একটা বিপদও আছে — মস্তিষ্কের মেমোরি সেলে ইনফরমেশনটা থেকে যাবে। অপ্রয়োজনীয় ইনফরমেশন। প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন রাখার জাযগা টান পড়ে যাবে।

বৃষ্টি এখন আর আগের মতো পড়ছে না। গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে। লোকটা বসেই আছে। সাবের তার কাছাকাছি এগিযে গেল। বিস্ময়মাখা গলায় বলল, 'ভাই আপনি কে?'

লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে পরিচিত ভঙ্গিতে তাকাল। যেন এই হাসির মধ্যেই তাব পবিচয লুকানো। সাবের বলল, 'আপনার নাম কি মিস্টাব জুলাই।'

'জ্বি।'

'আপনাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম — এখন মনে কবতে পারছি না।'

লোকটি হাসিমুখে বলল, 'আপনি জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন তিন দিন পব আমার নাম মিস্টাব আগস্ট কেন হবে।'

'হ্যাঁ তাই, তাই! আপনি বুঝলেন কী করে? আপনি কি থট বিডিং জানেন?'

'না। আপনি দোতলাব বাবান্দায মিতুব সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি শুনতে পেলাম। উপব থেকে কথা বললে অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায।'

'আপনি বৃষ্টিতে ভিজছেন কী জন্যে?'

'ভিজতে ভালো লাগছে, এই জন্যে ভিজছি।'

'ঠাণ্ডা লাগবে তো। একবার ঠাণ্ডা লেগে গেলে বিবাট সমস্যায পড়বেন। কোল্ড ভাইবাস আক্রমণ করবে। ইনফ্লুয়েনজা। সেখান থেকে বেসপিবেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেক্‌শন। আমি একজন ডাক্তার।'

'জানি, মিতু বলেছে।'

'অবশ্যি আমি ডাক্তাবি প্র্যাকটিস করছি না। কিছুই মনে বাখতে পাবি না। ভুলে যাই। এক জন প্রাপ্তবযস্ক মানুষেব সোডিযাম ইনটেক কতটুকু প্রযোজন — অনেকক্ষণ ধবে মনে কবাব চেষ্টা করছি, পারছি না।'

'মনে রাখার চেষ্টা খুব বেশি করছেন বলে এই সমস্যা হচ্ছে। আপনি এক কাজ করুন, ভুলে যাবাব চেষ্টা করুন। এতে ফল হতে পারে।'

সাবেব বিস্মিত হযে বলল, 'ভুলে যাবার চেষ্টা কীভাবে কবব?'

'মনে রাখাব চেষ্টা যেভাবে করেন, তাব উল্টোভাবে কববেন।'

'মনে বাখাব চেষ্টা আমি কীভাবে করি?'

লোকটি এব উত্তবে হেসে ফেলল। এবং প্রায সঙ্গে সঙ্গে সাবেবেব মনে পড়ল একজন প্রাপ্তবযস্ক মানুষেব জন্যে দৈনিক ১ থেকে ২ গ্রাম খাবার লবণই যথেষ্ট; অথচ সে বোজ ১০ থেকে ১২ গ্রাম খাবার লবণ খায।

সাবের বিস্মিত হযে বলল, 'মনে পড়েছে।'

লোকটি বলল, 'জানতাম মনে পড়বে।'

সাবের বলল, 'আপনাকে ইন্টারেস্টিং মানুষ বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনাকেও ইন্টারেস্টিং মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি আমাকে একটা ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন? ইংরেজি কবিতার দুটা লাইনের সুন্দর বাংলা করে দেবেন —

"Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land."

সাবের তৎক্ষণাৎ বলল,

"মনে রেখ যখন চলিয়া যাব দূরে
নৈঃশব্দের দূর নগরীতে।"

লোকটি বলল, 'বাহ্ সুন্দর তো!' সাবের খানিকটা হকচকিয়ে গেল। চট করে তার মাথায় এমন সুন্দর দু'টা লাইন কী করে এল, সে বুঝতে পারছে না। লাইন দুটা মাথা থেকে চলে যাচ্ছে না — ঘুরপাক খাচ্ছে। আপনা-আপনি অন্যবকম কবে সাজানো হচ্ছে—

"যখন চলিয়া যাব দূরে
বহু দূরে। নৈঃশব্দের দূর নগরীতে — "

তিন বাব দূর শব্দটা ব্যবহার কবায় মনে হচ্ছে অনেক অনেক দূবের কোনো জায়গার কথা বলা হচ্ছে। মানুষের চিন্তা এবং কল্পনার বাইবের কোনো নগবী, যে নগরী অস্পষ্ট এবং রহস্যময়।

সাবের বলল, 'আপনার পাশে বসি খানিকক্ষণ?'

'বসুন। বৃষ্টিতে ভিজে আবার অসুখ কববে না তো? ভাইরাস যদি ধবে! ইনফ্লুয়েনজা, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেক্শন!'

'ধরুক। কদিন আর বাঁচব। মবতে তো হবেই, তাই না? যেতে হবে অনেক দূবের দেশে। দূরে, বহু দূরে, নৈঃশব্দের দূব নগরীতে।'

সাবের বসল তার পাশে। দুজনই বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। মিতু জানালা থেকে পুবো ব্যাপারটা দেখছে। সে মনে মনে বলল, পাগলে পাগলে বেশ মিল হয়েছে। মিতুর খুব হাসি পাচ্ছে। সে হেসে ফেলল। খিলখিল হাসি। মিস্টার জুলাই হাসিব শব্দ শুনে তাকাল মিতুব দিকে। মিতুর আরো বেশি বেশি হাসি আসছে।

জুবায়ের আসতে আসতে রাত দশটা বাজিয়ে ফেলল।

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। দু একটা তাবাও উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে।

জুবায়ের এষার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'সবি। সময়মতোই রওনা হচ্ছিলাম। গাড়িতে উঠতে যাব — এক গেস্ট এসে উপস্থিত। এমন গেস্ট যে বলা যায় না— ভাই, এখন যান — জরুরি কাজে যাচ্ছি।'

এষা বলল, 'এত সাফাই গাচ্ছ কেন? জরুরি কাজ তো কিছু না।'

জুবায়ের বিস্মিতের ভঙ্গি করে বলল, 'দুজন এক সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজব এটা জরুরি না? কী বলছ তুমি? স্নান করব নীপবনে, ছায়াবীথি তলে — এটা যদি জরুরি না হয তাহলে....'

'তুমি কি খেযে এসেছ?'

'না।'

'ভালো করেছ। এক সঙ্গে খাব। তুমি কি এখনি খাবে? খাবার গরম করতে বলব?'

'বল। এই ফাঁকে আমি চট করে তোমার মাতৃদেবীর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

‘প্লিজ এখন মাকে বিরক্ত করো না। মার মাথা ধরেছে। মা দবজা বন্ধ করে শুয়ে আছেন। এখন গেলেই মা রাগ করবেন।’

‘পৃথিবীর কেউ আমার উপর রাগ করতে পারে না।’

‘মা পারে। এখন তুমি মার ঘরে ঢুকলে মা তোমাকে ধমক দিয়ে বের করে দেবে — এটা ভালো হবে? তারচে’ চল খাওযাদাওয়া করা যাক।’

রাতের খাবার শেষ করে জুবায়ের সিগারেট ধবাতে ধরাতে বলল, ‘চল ছাদে যাই। ছাদে হাঁটাহাঁটি করে আসি। আফটার ডিনার ওযাক–এ মাইল।’

এষা বলল, ‘পাগল, এখন ছাদে যাব কি—? বৃষ্টিতে ছাদ পিছল হযে আছে।’

জুবাযেব খানিকটা গম্ভীর হযে গেল।

এষা বলল, ‘পান খাবে? পান এনে দেব?’

‘না।’

‘কী ব্যাপাব, তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীব হযে গেলে কেন?’

জুবাযের বলল, ‘তোমার ব্যাপাবে আমার একটা অবজাবভেশন আছে। তুমি কোনো নির্জন জাযগায আমাব সঙ্গে থাকতে চাও না — এক ধরনের অস্বস্তিবোধ কব। এব কাবণ কী বল তো? এক জন মৌলানাব সামনে তিন বাব কবুল বলি নি — এই কি কারণ?’

এষা বলল, ‘কী বলছ এসব? হযেছে কী তোমাব? ছাদে যেতে চাচ্ছি না, কাবণ ছাদ পিছল হযে আছে। তাবপরেও তুমি যদি যেতে চাও খুব ভালো কথা। চল যাই — পা পিছলে কোমব ভাঙলে কিন্তু আমাকে দোষ দেবে না।’

জুবাযের বলল, ‘যেদিন ছাদ শুকনো থাকে সেদিনও কিন্তু যেতে চাও না। গত সপ্তাহেব কথা কি তোমাব মনে আছে? তোমাকে বললাম, চল ছাদে যাই। তুমি বললে, তুমি যাও, আমি আসছি। আমি অপেক্ষা কবছি। তুমি এলে ঠিকই, মিতুকে সঙ্গে নিযে এলে।’

এষা বিবক্ত গলায বলল, ‘মিতু আমাব সঙ্গে আসতে চাচ্ছিল। আমি কী কবব? মিতুকে কি বলব— না তুমি যেতে পারবে না? আমাকে একা একা যেতে হবে, যাতে অন্ধকাবে ঐ লোকটা আমাকে জড়িযে ধবতে পাবে? লোকটাকে এই সুযোগ দিতে হবে, কাবণ দুদিন পর সে আমাকে বিযে করছে?’

‘তুমি বেগে যাচ্ছ এষা।’

‘সবি।’

‘আশ্চর্য! তুমি এত চট কবে রেগে যাও। দেখি একটা পান দাও তো খাই।’

এষা পান এনে দিল।

জুবাযেব দ্বিতীয সিগাবেট ধবাতে ধবাতে বলল, ‘আচ্ছা ঐ লোকেব খবর কি? তার বাড়িঘবের কোনো খোঁজ পাওযা গেছে?’

‘না।’

‘সারাদিন সে কবে কী?’

‘কিছুই করে না। আজ সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টিতে ভিজেছে পুরো চাব ঘণ্টা।’

‘খুবই সন্দেহজনক।’

‘সন্দেহজনক কেন?’

‘সে যে একটা অদ্ভুত কিছু এইটা প্রমাণ কবার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে বিরাট ফ্রড। তোমাদের সাবধান থাকা উচিত।’

‘আমার মনে হয না সে ফ্রড। বরং আমার মনে হয একটা ইন্টাবেস্টিং ক্যারেকটাব।’

‘ইযং লেডি, ফর ইওব ইনফবমেশন — পৃথিবীতে ফ্রড মাত্রই ইন্টাবেস্টিং ক্যারেকটার

হয়। বিরক্তিকর কোনো মানুষ ফ্রড হতে পারে না। আমি লোকটার সঙ্গে আলাপ করে আসি। আশা করি জেগে আছে। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?' এষা না-সূচক মাথা নাড়ল। জুবায়ের একাই রওনা হল।

মিস্টার জুলাই জেগে ছিল। বিছানায় বসে গভীর মনোযোগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পত্রিকার পাতার দিকে তাকিয়ে আছে।

জুবায়ের ঘরে ঢুকেই বলল, 'কেমন আছেন?'

'জ্বি ভালো।'

'আমার নাম মোহাম্মদ জুবায়ের। আপনার নাম কি জানতে পারি?'

'আমার নাম জুলাই। তিন দিন পর নাম বদল হবার সম্ভাবনা আছে। বসুন।'

'বসব না — দুএকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'জিজ্ঞেস করুন। তবে আমার মনে হয় আপনার বেশির ভাগ প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারব না।'

'জবাব দিতে পারবেন না এমন কোনো প্রশ্ন আমি আপনাকে করব না। তবে ইচ্ছা করে জবাব না দিলে তো কিছুই করার নেই।'

'আমি যা জানি আপনাকে বলব। অবশ্যই বলব।'

'পাগল সাজার চেষ্টা করছেন কেন?'

'কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'শুনলাম চার ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজেছেন। আপনার এই কাজের পেছনে পাগল সাজার সূক্ষ্ম চেষ্টা লক্ষ করছি। কারণটা জানতে চাচ্ছি।'

মিস্টার জুলাই শান্ত গলায় বলল, 'আপনি বোধহয় একটা জিনিস জানেন না — পাগলরা কখনো বৃষ্টিতে ভিজে না। পানি আর আগুন — এই দুটা জিনিসকে পাগলরা ভয় পায। এই দুটা জিনিস থেকে এরা অনেক দূরে থাকে। কখনো শুনবেন না — কোনো পাগল পানিতে ডুবে মারা গেছে বা আগুনে ঝাঁপিযে পড়েছে।' জুবাযের প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের কবতে করতে বলল, 'আপনি কি সিগারেট খান?'

'না।'

'একটা খান আমাব সঙ্গে। খেযে দেখুন কেমন লাগে।'

লোকটা সিগারেট নিল। আগুন ধবিয়ে টানতে লাগল। জুবায়ের বলল, 'আপনার কয়েকটা জিনিস আমি মিলাতে পারছি না। দুযে-দুযে চার হচ্ছে না। আপনি বলছেন আপনার আগের কথা কিছুই মনে নেই। স্মৃতি-বিলুপ্তি ঘটেছে। অথচ পাগল পানি এবং আগুন ভয় পায এটা মনে আছে। একটা মনে থাকবে, একটা থাকবে না — তা কেমন করে হয়!'

লোকটা জবাব দিল না। নিজের মনে সিগাবেট টানতে লাগল।

জুবায়ের চলে যাবার আগে এষাকে বলে গেল — 'সাবধান থাকবে। খুব সাবধান। খুবই সন্দেহজনক ক্যারেকটার। তোমার বাবাকে বলবে — অতি দ্রুত তিনি যেন লোকটাকে ডিসপোজ করার ব্যবস্থা করবেন। লোকটার কোনো একটা বদ মতলব আছে।'

এষা হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার কী ধারণা — কী করবে সে? গভীর রাতে আমাদের খুন করে পালিয়ে যাবে?'

'বিচিত্র কিছু না। করতেও তো পারে।'

'লোকটাকে দেখে খুনী-খুনী মনে হয না।'

'ফর ইওর ইনফরমেশন ইয়াংলেডি — খুনীদের আলাদা কোনো চেহারা হয় না।'

'ফর ইওর ইনফরমেশন ইয়াংম্যান — রাত পৌনে বাবটা বাজে — তোমার এখন চলে যাওয়া উচিত।'

'আমি যাচ্ছি, কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি — বি কেযারফুল, নেভাব ট্রাস্ট এ স্ট্রেঞ্জার।'

সুরমা খেতে বসেছেন। খাবার ঘরে শুধু তিনি এবং মতিন সাহেব। সুরমা খাবার সময় কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। কেউ কথা বললে এমনভাবে তাকান যেন বিরক্ত হচ্ছেন। মতিন সাহেব বললেন, 'মাথাব্যথা কমেছে?'

সুরমা তাঁর দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'না।'

'রোজ রোজ মাথা ধরে — এটা তো ভালো কথা না। এক জন ডাক্তার দেখাও। সাধারণত চোখের কোনো প্রবলেম হলে মাথা ধরে। তোমার কি চোখের কোনো সমস্যা আছে।'

'জানি না। থাকতে পারে।'

'কাল আমার সঙ্গে চল — আমাব চেনা এক জন চোখের ডাক্তার আছেন।'

'কাল আসুক তখন দেখা যাবে।'

সুরমা উঠে পড়লেন। প্লেটে খাবার পড়ে আছে। অল্প কিছু মুখে দিয়েছেন। তাঁব বমি-বমি আসছে। বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বললেন, 'তোমার ঐ লোকের কোনো গতি করতে পারলে?'

'না।'

'সে কি স্থায়ীভাবে এই বাড়িতেই থাকবে?'

'না — তা কেন। কযেকটা দিন দেখে বিদেয কবে দেব।'

'মিতু ওর সঙ্গে মাখামাখি করে, আমার এটা পছন্দ না।'

'মিতুকে নিষেধ কবে দিও।'

'তোমাব ছেলেমেযেবা কেউ আমার কথা শোনে না, ওদের কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। হরিপ্রসন্ন বাবু এসেছেন, জান?'

'এষা বলেছে।'

'কী জন্যে এসেছেন তা জান?'

'না।'

সুরমা কঠিন মুখে বললেন, 'কোথাও থাকাব জাযগা নেই বলে এসেছেন। তাঁব ধাবণা তিনি অল্প কিছুদিন বাঁচবেন। সেই অল্প কিছুদিন এই বাড়িতে থাকতে চান।'

'তুমি না করে দিয়েছ তো?'

'আমি না করব কেন? অপ্রিয় কাজগুলো তুমি সব সময় আমাকে দিয়ে কবাতে চাও। এটা ঠিক না। তোমার যদি কিছু বলার থাকে তুমি বলবে।'

৩

হরিপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে মতিন সাহেবেব যোগাযোগের একমাত্র সূত্র হচ্ছে মতিন সাহেবের বড় মেযে নিশা। হরিবাবু নিশাকে কিছুদিন অঙ্ক শিখিয়েছেন। নিশার কোনো শিক্ষকই বেশিদিন পছন্দ হয় না। তাঁকেও পছন্দ হয় নি। সে দুমাস অঙ্ক করেই বলল, 'বাবা উনাকে বদলে দাও।'

মতিন সাহেব বলেছিলেন, 'কেন মা? এত ভালো টিচার....'

নিশা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'উনি কেমন করে জানি তাকান, আমার ভালো লাগে না।' মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেমন করে তাকান?'

'আমি তোমাকে বলতে পারব না।'

মতিন সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি হরিবাবুকে ছাড়িয়ে দিলেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে হরিবাবু কখনো কোনো বিশেষভাবে নিশার দিকে তাকান নি। তাঁর মুখে মা-জননী ছাড়া অন্য কোনো ডাকও ছিল না। ষাট বছর বয়সী এক জন বৃদ্ধের ক্লাস টেনের একটা বাচ্চা মেয়ের দিকে বিশেষ ভঙ্গিতে তাকানোর প্রশ্নও ওঠে না। সেই সময় নিশার ধারণা হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর সব পুরুষই তার দিকে বিশেষভাবে তাকায়। তার সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করে।

হরিবাবু চলে গেলেও তিনি এই বাড়িতে আসা-যাওয়া বন্ধ করেন না। প্রায়ই দেখা যায় বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। নিশাকে খবর পাঠাতেন। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলত — 'আমি যেতে পারব না। কেন আসে শুধু শুধু।' ভদ্রলোককে অনেকক্ষণ একা বসে থাকতে হত। শেষ পর্যন্ত নিশা অবশ্যি আসত। শুধু আসত না — হাসিমুখে অনেকক্ষণ গল্প করত।

হরিবাবুর নিকট বা দূর কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। স্ত্রী মারা গেছেন যৌবনে, বিয়ের এক বছরের মাথায়। দুই ভাই পার হয়ে গেছেন ইন্ডিয়ায়। তিনি বাসাবো এলাকায় টিনের দু কামরার একটা ঘরে কুড়ি বছর একাই কাটিয়ে দিয়েছেন। ফরিদা বিদ্যায়তনের শিক্ষক ছিলেন। চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর ভয়াবহ সমস্যায় পড়ে গেলেন। প্রাইভেট স্কুল। পেনশনের ব্যবস্থা নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও পুরোটা পেলেন না। যা পেলেন তাও দ্রুত শেষ হয়ে গেল। গৃহশিক্ষকতা করার ক্ষমতা নেই। ছাত্রছাত্রী কেউ আসেও না। বয়সের নানান আদি ব্যাধিতে পুরোপুরি কাবু হয়ে গেলেন। একমাত্র কাজ দাঁড়াল পুরানো ছাত্রছাত্রী খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে কিছুদিন করে থাকার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করা। বাসাবোর বাড়িটি ছমাস আগে ছেড়ে দিয়েছেন। বাসা ধরে রাখার কোনো অর্থও নেই। তাঁর হাত শূন্য। অর্থ এবং বিত্তের মধ্যে আছে তাঁর স্ত্রীর কানের একজোড়া দুল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দুলজোড়া তিনি নিজের হাতে স্ত্রীর কান থেকে খুলে রেখেছিলেন।

মতিন সাহেবের বাড়িতে তিনি খুব ভয়ে ভয়ে উঠেছেন। এখনো মতিন সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। কয়েকটা দিন এই বাড়িতে থাকতে চান। এই প্রসঙ্গে মতিন সাহেবের সঙ্গে কীভাবে আলাপ করবেন তা অনেকবার মনে মনে ভেবে রেখেছেন। সমস্যা হচ্ছে বয়সের কারণেই বোধহয় ভেবে-রাখা কথা তিনি কখনো ঠিকমতো বলতে পারেন না। তাছাড়া মতিন সাহেব লোকটিকেও তিনি ভয় পান। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে অর্থ ও বিত্তবান সব মানুষকেই তিনি ভয় করতে শুরু করেছেন।

হরিবাবু বারান্দায় বসে ছিলেন।

এষা তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। বসার ঘরে মতিন সাহেব তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। হরিবাবু মনে মনে গীতার শ্লোক বলতে লাগলেন —

"তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

'হে ঈশ্বর, আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও। মৃত্যু থেকে অ-মৃত্যুতে।'

মতিন সাহেব বললেন, 'বসুন।'

হরিবাবু বসলেন।

'শুনলাম, কিছুদিন এখানে থাকতে চান?'

'জ্বি।'

'ব্যাপারটা কী?'

হরিবাবু ভেবে-রাখা কথা দ্রুত মনে কবার চেষ্টা করলেন। কোনো কিছুই মনে পড়ল না। নিজের অভাবের কথা বলতে পাবলেন না। মাথাব ভেতর গীতাব শ্লোক ঘুবতে লাগল—

"তমসো মা জ্যোতির্গময
মৃত্যের্মামৃতং গময।"

'কতদিন থাকতে চান?'

'এই অল্প কটা দিন। আমাব আয়ু শেষ। যাওযাব জাযগা নাই।'

'আত্মীযস্বজন কেউ নেই?'

'খুড়তুতো এক ভাই থাকে পাটনায — তার ঠিকানা জানি না।'

'আমি বরং আপনাকে কিছু অর্থ সাহায্য কবি। এক জন মানুষকে বাখাব অনেক সমস্যা। বুঝতেই পারছেন।'

হবিবাবু বিড়বিড় কবে গীতাব শ্লোক বললেন। মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন — 'এসব কী বলছেন?'

'গীতাব একটা শ্লোক। বযস হযে গেছে — এখন ঠিকমতো কিছু ভাবতেও পাবি না, বলতেও পারি না। আপনাকে আমি বেশিদিন যন্ত্রণা দেব না, কযেকটা দিন। আমাব প্রতি দযা করুন। আমি বোজ সকালে উঠে ঈশ্ববেব কাছে মৃত্যু প্রার্থনা কবি — ঈশ্বব আমাব প্রার্থনা শুনেছেন। আমার সময আগতপ্রায।'

'ঈশ্বব প্রার্থনা শুনেছেন তা কী কবে বুঝলেন?'

'এটা বোঝা যায।'

মতিন সাহেব সিগাবেট ধরাতে ধরাতে বললেন — 'আচ্ছা থাকুন।'

'আপনি কি আমাকে থাকতে বললেন?'

'হ্যাঁ বললাম।'

মতিন সাহেব এষাকে বলে দিলেন — 'ঐ লোকটাব ঘর হরিবাবুকে দিযে দে।'

এষা বলল, 'মিস্টাব জুলাই-এর ঘর? সে তো এখনো যায নি।'

'ঐ ঘরে আরেকটা খাট দিযে দে, তা হলেই তো হল। প্রত্যেকেব আলাদা ঘব লাগবে নাকি?'

হরিবাবু বললেন, 'আপনি আমাকে কিছু বললেন?'

'না। আপনাকে কিছু বলি নি।'

হরিবাবুব জাযগা হল মিস্টার জুলাই-এর সঙ্গে। প্রথম রাত আনন্দে তিনি ঘুমুতে পারলেন না।

৪

মিতু বলল, 'আজ থেকে তোমার নাম মিস্টার আগস্ট।'

লোকটি হাসল। মিতু বলল, 'তোমার খুশি লাগছে না? নতুন নাম পেয়ে গেছ!''

'হ্যাঁ খুশি লাগছে। খুব খুশি। বৎসরে বারটা নাম ঘুরে ঘুরে আসবে। তার চেয়েও ভালো হত যদি এক, দুই, তিন, চার এইভাবে নাম রাখা হত। যেমন — যেদিন একটা শিশুর জন্ম হল সেদিন তার নাম এক, পরের দিন নাম দুই, তার পরের দিন তিন। এইভাবেই চলতে থাকবে। প্রতিদিন নতুন নাম। এতে অনেক সুবিধা।'

'কী সুবিধা?'

'কেউ যখন তার নাম বলবে সঙ্গে সঙ্গে তুমি বুঝবে এই পৃথিবীতে সে কতদিন বাঁচল। এটা জানা থাকা খুব দরকার।'

'দরকার কেন?'

'দরকার এই জন্যে যে নাম শোনামাত্র তুমি বুঝবে এই পৃথিবীতে সর্বমোট কতগুলো সূর্যাস্ত সে দেখেছে।'

মিতু খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ব্যাপাবটা তার ভালো লাগছে। সে নিজের নামটা বদলে ফেলবে কিনা ভাবছে। বদলে ফেললে হয। কেউ আবার রাগ করবে না তো?

মিস্টার আগস্ট মিটিমিটি হাসছে। মিতু বলল, 'আপনি হাসছেন কেন?'

'তুমি তোমার নাম বদলে ফেলতে চাচ্ছ এই জন্যে হাসছি।'

'কে বলল আপনাকে নাম বদলাতে চাচ্ছি?'

'কে কী ভাবছে তা আমি অনুমান করতে পাবি। তুমি তোমার জন্ম তারিখ বল, আমি ঠিক করে দেব তোমার নাম কী হবে।'

'আমার জন্ম ১১ মার্চ।'

'কোন সালে জন্ম সেটা বল।'

মিতু বলল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'তোমার নাম হল তিন হাজার ছযশ চুযান্ন।'

'আগামীকাল আমার নাম হবে তিন হাজার ছয়শ পঞ্চান্ন।'

'হ্যাঁ।'

মিতু নতুন নামের আনন্দ চোখে-মুখে নিয়ে ঘর থেকে বেরুল। সবাইকে ব্যাপাবটা জানানো দরকার। সবাইকে তো জানাবেই, স্কুলের বন্ধুদেরও জানাতে হবে। আজ ছুটির দিন হয়ে মুশকিল হযে গেছে। ছুটির দিন না হলে সব বন্ধুদের একসঙ্গে বলা যেত। এখন বলতে হবে টেলিফোনে। ভাগ্যিস তার একটা টেলিফোন বই আছে। সেই বইযে সে সবার টেলিফোন নাম্বার লিখে রেখেছে। অবশ্যি যাদের সঙ্গে ঝগড়া হয তাদের নাম এবং টেলিফোন নাম্বার কেটে দেয়। ঝগড়া মিটমাট হলে আবার লেখে।

মিতু তার টেলিফোনের বই নিযে বেশ কিছু টেলিফোন করল — 'হ্যালো শমি — 'আমি মিতু। কেমন আছিস ভাই?'

'ভালো।'

'আজ থেকে আমি আমার নাম বদলে ফেলেছি — এখন আমার নাম তিন হাজার ছযশ চুয়ান্ন।'

'ধ্যাৎ।'

'ধ্যাৎ না। সত্যি। আগামীকাল আমার বয়স হবে তিন হাজার ছয়শ পঞ্চান্ন দিন। আমার যত দিন বয়স — সেটাই আমার নাম। এতে সুবিধা কি জানিস? এতে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে — এ জীবনে আমি কটা সূর্যাস্ত দেখেছি।'

'মিতু তুই পাগলের মতো কথা বলছিস কেন? তোর কি জ্বর হয়েছে?'

'মিতু বলে তুই আমাকে আর ডাকবি না ভাই। আমার যা নাম তাই ডাকবি — তিন হাজার ছয়শ চুয়ান্ন। আচ্ছা ভাই রাখলাম।'

মিতু সব মিলিয়ে চারটা টেলিফোন করল। পঞ্চমটা করতে যাচ্ছে, তখন মতিন সাহেব তাকে কাছে ডাকলেন। হাসিমুখে বললেন, 'হচ্ছে কী মিতু?' মিতু লজ্জিত গলায় বলল, 'কিছু না বাবা।'

'টেলিফোনে কী বলছিস? আমি খবরের কাগজ পড়তে পড়তে শুনলাম। যদিও অন্যের টেলিফোন কনভারসেশন শোনা খুবই অনুচিত। মনের ভুলে শুনে ফেলেছি। তুমি কী বলছ বন্ধুদের?'

'এখন থেকে আমার নতুন নাম বাবা। একেকটা দিন আসবে, আমাব নাম বদলে যাবে।'

'এই বুদ্ধি কার?'

'মিস্টার আগস্ট আমাকে বলেছেন।'

মতিন সাহেবের মুখ একটু যেন গম্ভীর হল। মুখের গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে বললেন — 'আচ্ছা ঠিক আছে। এষাকে বল আমাকে চা বানিযে দিতে।' মিতু চাযের কথা বলতে গেল। মতিন সাহেব খবরেব কাগজ হাতে লোকটার খোঁজে গেলেন। সে ঘরে নেই। কাঁঠাল গাছেব নিচে বসে আছে। মতিন সাহেব মন্টুর ঘরে উঁকি দিলেন। সকাল এগাবটা বাজে। মন্টুর ঘুম ভেঙেছে। সে বিছানায শুয়ে শুয়ে দাঁত ব্রাশ করছে। কেউ বিছানায শুযে ব্রাশ কবতে পারে; তা তার ধাবণাব বাইরে ছিল। মন্টু দুলাভাইকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

'দুলাভাই কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। তুমি বিছানায শুযে শুযে দাঁত মাজ, এটা জানতাম না।'

'এটা নতুন শুরু করেছি দুলাভাই। বাতে শোবার আগে টুথপেস্ট লাগিযে মাথার কাছে রেখে দেই। দাঁত-টাত মেজে একেবারে ফ্রেশ হয়ে বিছানা থেকে নামি।'

'ভালো।'

'কী বলতে এসেছেন দুলাভাই?'

'তুমি ঐ লোকটাকে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসতে পারবে? কোনো খোঁজ তো পাওয়া যাচ্ছে না — আর কতদিন রাখব। সে যে নিজ থেকে চলে যাবে তারও লক্ষণ দেখছি না।'

'আমি বরং এক কাজ করি। লোকটাকে কড়া করে বলি, গেট আউট। মামদোবাজি শুরু করেছ? পরের বাড়িতে খাচ্ছ-দাচ্ছ-ঘুমুচ্ছ। স্টপ ইট, বিদায় হও।'

'এসব বলার কোনো দরকার নেই। লোকটাকে যেখান থেকে তুলে এনেছিলাম সেখানে রেখে এস। গাড়ি নিযে যাও। আরেকটা কথা — লোকটাকে না জানানো ভালো যে, তুমি তাকে রেখে আসতে যাচ্ছ।'

'জানলে অসুবিধা কী?'

'লোকটার আজ যে এই অবস্থা তার জন্যে আমি নিজেকে দায়ী মনে করছি। আমার মধ্যে অপরাধবোধ আছে।'

'আপনি যা বলবেন তাই করব দুলাভাই। বিড়ালের বাচ্চা যেমন ছেড়ে দিযে আসে, ঠিক তেমনি ছেড়ে দিযে আসব। ব্যাটা আবার গন্ধ শুঁকে চলে না আসে।'

মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'যা করবে চুপচাপ করবে। বাসার কাউকে কিছ জানানোর দরকার নেই। বিশেষ করে মিতু যেন কিছু না জানে।'

'কেউ কিছু জানবে না দুলাভাই। আমার উপর বিশ্বাস রাখেন। রাতের অন্ধকারে মাল পাচার করে দেব।'

এষা দোতলার বারান্দা থেকে দেখল লোকটা কাঁঠাল গাছের নিচে মোটা একটা বই নিয়ে বসে আছে। কী বই এত মন দিয়ে পড়ছে? একবার ভাবল নিচে নেমে জিজ্ঞেস করবে, পরমুহূর্তেই মনে হল — কী দরকার। এষা সাবেরের ঘরে ঢুকল। তিন দিন ধরে সে জ্বরে ভুগছে। লোকটার সঙ্গে সে ঘণ্টাখানেক বৃষ্টিতে ভিজেছিল। লোকটার কিছু হয নি। তার ঠাণ্ডা লেগে গেল। সেখান থেকে হল টনসিলাইটিস। এখন বুকে ব্যথা করছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এষা বলল, 'শরীর কেমন দাদা?' সাবের বিরস মুখে বলল, 'সুবিধার মনে হচ্ছে না। গাযে টেম্পারেচার আছে। ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে নিউমোনিযায টার্ন নেবে।'

'ডাক্তার ডাকাও। ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করাও।'

'ডাক্তার কী ডাকব। আমি নিজেই ডাক্তাব না!'

'বেশ তুমি নিজেই প্রেসক্রিপশন লিখে ওষুধ আনাও। ওষুধ এনে খাও।'

'খাব। একটু টাইম নিচ্ছি। দেখছি।'

'কী দেখছ?'

'অসুখটা কোন দিকে টার্ন নিচ্ছে তাই দেখছি। মিস্টার আগস্ট আমাকে বলেছেন, কোনো অসুখ সম্পর্কে পুরোপুরি জানার একটাই উপায় — অসুখটা নিজের হওযা। এখন চট করে ওষুধ খেয়ে রোগ সারিয়ে ফেললে আমি জানব কী?'

'মিস্টার আগস্ট এখন তোমাকে ডাক্তারি শেখাচ্ছেন?'

'তা না, শিখতে সাহায্য করছেন। সাহায্যটা আমার খুব কাজে আসছে।'

'সাহায্য করার এই তো নমুনা — সবগুলো অসুখ নিজেব হতে হবে।'

'তা ঠিক।'

'ক্যান্সার সম্পর্কে জানার জন্যে তাহলে তো ক্যান্সার হওযা দবকার।'

'অবশ্যই দরকার।'

'তোমার শিক্ষ'গুরু মিস্টার আগস্ট কি বিনা পযসায তোমাকে শিখাচ্ছেন, না যৎকিঞ্চিৎ ফী নিচ্ছেন?'

'ফী–টি কিছু না। ইন–রিটার্ন আমি উনাকে ইংরেজি শেখাচ্ছি। তাঁর স্মৃতিশক্তি খুব ভালো। দ্রুত শিখে ফেলেছেন। এখন উনাকে বলেছি শব্দভাণ্ডার বাড়াতে। ডিকশনারি মুখস্থ করতে বলেছি।'

'ডিকশনারি মুখস্থ করতে বলেছ?'

'হ্যাঁ। আমার যেমন স্মৃতিশক্তি বলে কিছু নেই উনার আবার উল্টো ব্যাপার। অসম্ভব ভালো স্মৃতিশক্তি। এর কারণও খুঁজে বের করেছি।'

'কী কারণ?'

'কারণ হল উনার আগের কোনো স্মৃতি নেই। ব্রেইনের মেমোরি সেল সব খালি। সেই খালি জায়গাগুলোতে উনি ইনফরমেশন ঢুকিয়ে রেখে দিচ্ছেন।'

এষা উঠে দাঁড়াল। সাবের বলল,'তুই একটা কাজ করবি এষা, উনাকে এখানে পাঠাবি?'

এষা অবাক হয়ে বলল, 'এখানে? বাইরের এক জন মানুষকে তুমি দোতলার শোবার ঘরে নিয়ে আসবে?'

'উনি তো আসেন প্রায়ই।'

এষা বিস্মিত হয়ে বলল, 'প্রায়ই আসেন মানে?'

'গভীর রাতে আসেন। তোরা সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকিস তখন আসেন। গল্প-গুজব করি। কাল রাতে তিনটার দিকে এসেছিলেন।'

'দাদা শোন, আর কখনো তুমি তাঁকে এখানে আসতে বলবে না। কখনো না।'

'তুই রাগ করছি কেন? চমৎকার এক জন মানুষ....'

'চমৎকার মানুষ হোক আর না হোক। তুমি তাকে আসতে বলবে না।'

'আমি আসতে বলি না তো। উনি নিজে-নিজেই চলে আসেন।'

'নিজে-নিজেই চলে আসেন? কী বলছ তুমি এসব?'

'আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুই নিজেই উনাকে জিজ্ঞেস করে আয়।'

এষা নিচে নেমে গেল। মনে মনে ঠিক কবে রাখল কঠিন কিছু কথা বলবে। বাড়ি থেকে চলে যেতেও বলবে। মনে হচ্ছে এই লোকটা সমস্যা সৃষ্টি করবে। হয়তো ইতোমধ্যে করেও ফেলেছে। মিতু বলেছে তার নাম তিন হাজার ছয়শ চুয়ান্ন। এই নামে না ডাকলে সে কথা বলছে না। এসবের কোনো মানে হয় ?

এষাকে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াল। তার হাতে সত্যি সত্যি একটা ডিকশনারি— সংসদ, ইংলিশ টু বেঙ্গলি অভিধান। লোকটা বলল, 'কেমন আছেন?'

এষা কঠিন মুখে বলল, 'ভালো।'

'আপনি মনে হচ্ছে আমাব উপব রাগ করেছেন।'

'বাগেব ব্যাপার না। আপনাব সঙ্গে আমি কযেকটা কথা বলতে চাই।'

'রাগ নিয়ে কথা বললে কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারবেন না। রাগ দূর করে কথাগুলো বলুন। কথা বলা শেষ হবার পর আবার রাগ করুন।'

'তা কি সম্ভব?'

'অবশ্যই সম্ভব। আচ্ছা আম বরং আপনাব বাগ কমানোব ব্যাপাবে সাহায্য কবি। আমি এমন কিছু বলি যাতে আপনাব বাগ কমে যায।'

'বলুন।'

'আমি এই ডিকশনাবিটা মুখস্থ কবে ফেলেছি।'

এষা বিবক্ত গলায বলল, 'আপনি ডিকশনাবি মুখস্থ কবেছেন খুবই ভালো কথা। এতে আমার রাগ কমবে কেন?'

'ডিকশনাবি মুখস্থ কবেছি আপনাব জন্য।'

'আমার জন্য মানে?'

'আমি ইংরেজি জানি না শুনে আপনাব মন খাবাপ হযেছিল। তখনি আমি ঠিক করলাম — ইংরেজি শিখব। আপনাকে খুশি করব। আমি আপনাব মুখ দেখেই বুঝতে পারছি আপনি খুশি হযেছেন। এখন বলুন, কী বলতে চান। এখানে বসুন, তাবপর বলুন।'

'আপনি মিতুর নাম বদলে দিযেছেন?'

'আমি বদলাই নি। সে নিজেব আগ্রহেই বদলেছে।'

'আপনাব ধারণা — সংখ্যা দিযে নামেব এই আইডিযা একটা ব্রিলিযান্ট আইডিযা?'

'হ্যাঁ।'

'সমস্যাগুলো ভেবে দেখেছেন? সবার হবে এক রকম নাম!'

'এটাই কি ভালো না? সব মানুষ তো আসলে এক। আমরা নানানভাবে এক জন মানুষকে অন্যের থেকে আলাদা করি। তার ভিন্ন ভিন্ন নাম দেই। সংখ্যাবাচক নাম হলে আমরা বুঝব মানুষ আসলে একই রকম। শুধু সংখ্যাব বেশ-কম।'

এষা খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ কোনো যুক্তি তার মনে এল না। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'নাম মনে রাখাও একটা সমস্যা হবে। ধরুন, মিতুর সঙ্গে দশদিন আপনার দেখা হল না। তার নাম এই দশদিনে পাল্টে গিয়ে হল তিন হাজার ছয়শ চৌষট্টি। এটা কি আপনার মনে থাকবে?'

'থাকা উচিত। যে মনে রাখতে পারবে না — বুঝতে হবে তার মনে রাখার প্রয়োজন নেই।'

'আপনি খুবই অদ্ভুত কথা বলছেন। এইসব কথাবার্তার একটিই উদ্দেশ্য। আপনি আমাদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছেন। ঠিক করে বলুন তো আপনি কে?'

'আমি মিস্টার আগস্ট।'

'প্লিজ দয়া করে বলুন আপনি কে।'

লোকটা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

এষা শান্ত গলায় বলল, 'গভীর রাতে আপনি দাদার ঘরে যান। কেন যান?'

'ও আমাকে ডাকে, তাই যাই।'

'যে আপনাকে ডাকবে আপনি তার কাছেই যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কে বলুন তো? সত্যি করে বলুন তো আপনি কে?'

'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন আমি জানি না।'

'আপনি নিশ্চয়ই দাবি করেন না যে, আপনি এক জন দেবদূত — আকাশ থেকে পড়েছেন?'

'কী যে বলেন। দেবদূত হতে যাব কেন!'

এষা গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'সায়েন্স ফিকশানেব কোনো ক্যারেক্টার না তো?'

'আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না।'

'সায়েন্স ফিকশানে এ রকম প্রাযই পাওয়া যায — ভবিষ্যতের এক জন মানুষ টাইম মেশিনে করে অতীতে চলে এসেছেন — আপনি তেমন কেউ না তো? ম্যান ফ্রম দ্য ফিউচার?'

'না — তা না। তবে —'

'তবে কী —?'

'হলে মন্দ হত না।'

লোকটি মুখ টিপে হাসল। সে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। তার চোখ কালো। তবু কালো চোখেও কোথায় যেন নীলচে ভাব আছে।

এষার কেন জানি ভয় ভয় করতে লাগল। যদিও সে জানে ভয়ের কোনোই কাবণ নেই। কাঁঠাল গাছের নিচে বসে থাকা লোকটি আধা-পাগল ধরনের মানুষ। এই ধবনের মানুষ নিজস্ব ভঙ্গিতে কিছু কথাবার্তা বলে। যেসব কথাবার্তা সাধারণ মানুষেব কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়।

'এষা।'

'জ্বি।'

'তুমি কি একটু পরীক্ষা করে দেখবে আমি ডিকশনারিটা পুরোপুবি মুখস্থ করতে পেরেছি কিনা।'

'আপনি আমাকে তুমি করে বলছেন কেন?'

'আচ্ছা আর বলব না। আপনি কি দয়া করে দু একটা কঠিন ইংরেজি শব্দ জিজ্ঞেস করবেন — আমি দেখতে চাই ডিকশনারি মুখস্থ করতে পাবলাম কিনা।'

এষা কিছু না বলে উঠে চলে গেল। লোকটা আবাব ডিকশনাবি খুলে বসল। তাব গায়ে চৈত্র মাসের কড়া বোদ এসে পড়েছে। সেদিকে তাব ভ্রূক্ষেপও নেই। ঘণ্টাখানিক এইভাবেই পার হল। তখন মন্টুকে শিস্ দিয়ে আসতে দেখা গেল। সে উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'ব্রাদার কী করছেন?'

'কিছু করছি না।'

'রোদে তো ভাজা ভাজা হয়ে গেলেন। চলুন ঘুরে আসি।'

'কোথায়?'

'আরে ব্রাদার চলুন না। গাড়ি করে যাব। গাড়ি করে ফিরে আসব। গায়ে হাওয়া লাগবে।'

'চলুন।'

'আপনার সঙ্গে আমার এখনো পরিচয় হয় নি। আমার সমস্যা কি জানেন? আমি আগ বাড়িয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে — খুবই ভালো কথা, কথা বলব। সেধে চা খাওয়াব। সিগারেট অফার করব। কেউ নিজে থেকে আমার কাছে না এলে আমি ভুলেও কিছু বলব না।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে মিস্টার আগস্ট বলল, 'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

মন্টু দরাজ গলায় বলল, 'চলুন না ভাই — শালবন দেখে আসি। চৈত্র মাসে শালবনের একটা আলাদা বিউটি আছে।'

রাস্তা ফাঁকা, গাড়ি চলছে ঝড়ের গতিতে। লোকটি পেছনের সিটে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। মন্টু খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছে। একটা বিড়ালকে দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসা এক কথা আব একটা জলজ্যান্ত মানুষ ছেড়ে দিয়ে আসা ভিন্ন কথা। মন্টুব মনের মধ্যে কেমন যেন খুঁতখুঁত কবছে। সে উঁচু গলায বলল, 'ব্রাদারেব কি ধূমপানের অভ্যাস আছে?'

'জ্বি না।'

'বেঁচে গেছেন। অসম্ভব পাজি নেশা। টাকা নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট। আমাব দেড় প্যাকেটের মতো লাগে। আগে দু প্যাকেট লাগত। কমিয়ে দেড় করেছি।'

লোকটি জবাব দিল না। সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। মন্টু একেব পব এক সিগাবেট টেনে যেতে লাগল। সে বুঝতে পারে নি তার এতটা অস্বস্তি লাগবে।

গাড়ি এসে মৌচাকে শালবনের কাছে থামল। মন্টু ক্ষীণস্বরে বলল, 'ব্রাদাব নামুন।'

লোকটা নামল। হাসিমুখেই নামল।

'ব্রাদার, আপনার হাতে এটা কী বই?'

'ডিকশনাবি।'

'ডিকশনারি নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন — ব্যাপার কী?'

'ডিকশনারিটা মুখস্থ কবে ফেলেছি। চর্চাব ব্যাপার তো, চর্চা না থাকলে ভুলে যাব। এই জন্যে সঙ্গে সঙ্গে রাখি। সময় পেলেই পাতা উল্টাই।'

'সত্যি মুখস্থ করে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বলেন কী ব্রাদার, আপনি তো মহা-কাবিল লোক! দেখি ডিকশনারিটা দিন তো আমার হাতে!'

লোকটা ডিকশনারি মন্টুর হাতে তুলে দিল। মন্টু পাতা উল্টে বলল, 'বলুন তো Meed মানে কি?'

'মিড শব্দটার মানে হল পারিশ্রমিক।'

'গুড, হয়েছে। এখন বলুন ম্যালানিন মানে কি?'

'ম্যালানিন হচ্ছে কৃষ্ণকায় জাতির চুলের ও ত্বকের কৃষ্ণবর্ণ।'

'ভেরি গুড। এবার বলুন শেরাটন মানে কি?'

'শেরাটন হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর আসবাবপত্রের অনাড়ম্বর নির্মাণশৈলী।'

'হয়েছে। আমি তো জানতাম শেরাটন হোটেলের নাম। ব্রাদার, আপনি তো কাবিল আদমী!'

'কাবিল আদমী ব্যাপারটা কী?'

'কাবিল আদমী হল গ্রেটম্যান। আপনার বয়স অল্প। আরেকটু বেশি বয়স হলে আপনার পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলতাম। অনেস্ট। আপনি তো ব্রাদার সুপারম্যান। আসুন এই গাছটার নিচে বসি। ব্রাদারলি কিছু কথাবার্তা বলি।'

দুজনে গাছের নিচে বসল। মন্টু বলল, 'সঙ্গে চা থাকলে ভালো হত। গাছের নিচে বসে চা খেতাম। গ্রেট মিসটেক হয়ে গেছে।'

লোকটা বলল, 'আপনি কি আমাকে এখানে রেখে যেতে এসেছেন?'

'আরে না! কী যে বলেন। আপনাকে খামাখা এখানে রেখে যাব কেন? আপনি বিড়াল হলেও একটা কথা ছিল। আমি আবার বিড়াল ফেলে দিয়ে আসার ব্যাপাবে এক্সপার্ট। বিড়াল কীভাবে ফেলে দিয়ে আসতে হয় জানেন?'

'না।'

'প্রথমে একটা বস্তায় ভরতে হয়। বস্তার ভেতর নিতে হয় কর্পূর। যাতে কর্পূরেব গন্ধে অন্য সব গন্ধ ঢাকা পড়ে যায়। অনেক দূরে নিয়ে বস্তার মুখ খুলতে হয়। বস্তার মুখ খুলবার আগে বস্তাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে ঘুরাতে হয়, যাতে বিড়ালের দিকভ্রম হয়।'

'অনেক কাযদা-কানুন দেখি।'

'হ্যাঁ অনেক। তারপরেও বিড়াল গন্ধ শুঁকে শুঁকে বাসায় চলে আসে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মিউ মিউ করে ডাকে। মনটা খুব খারাপ হয ভাইসাব। আহা! বেচারা কতদূব থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসেছে। মন খারাপ হলেও কিছু করার নেই। আবার বস্তায় ভরে ফেলে দিয়ে আসতে হয আরো দূরে। আবারো চলে আসে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিউ মিউ করে।'

লোকটি নিচু গলায বলল, 'বিড়াল মিউ মিউ করে যে কথাগুলো বলে তা যদি মানুষ বুঝত তাহলে তাকে কোনোদিন ফেলে দিযে আসত না।'

'বিড়াল কী বলে?'

'বিড়াল কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি আমাকে অনেক দূরে ফেলে দিযে এসেছিলে। আশ্রয় এবং খাদ্যের সন্ধানে আমি অন্য কোথাও যেতে পারতাম। তা যাই নি। তোমার কাছেই ফিরে এসেছি। অনেক কষ্টে ফিরেছি। কেন জান? তোমার প্রতি ভালবাসার জন্যে। এই ভালবাসা পশুর ভালবাসা হলেও ভালবাসা। এর অমর্যাদা করো না। তুমি আমাকে গ্রহণ কর।'

'আপনাকে এসব কে বলেছে?'

'কেউ বলে নি। আমি অনুমান করেছি।'

'ভাই এই দেখেন আমার চোখে পানি এসে গেছে। আমি আবার হাইলি ইমোশনাল লোক। অল্পতেই আমার চোখে পানি এসে যায। টিভির বাংলা সিনেমা যতবার দেখি, ততবার কাঁদি। সবাই হাসাহাসি করে। সিনেমা দেখা ছেড়ে দিলাম এই কারণে।'

'মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক যন্ত্রণা।'

'কারেক্ট কথা বলেছেন ভাই। এর চেয়ে গাছ হয়ে জন্মানো ভালো ছিল। মাঝে মাঝে গাছ হয়ে যেতে ইচ্ছা করে। হাসবেন না ভাই, সত্যি বলছি।'

'গাছ হওয়া তো খুব সহজ।'

'খুব সহজ! কী বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ খুব সহজ। গভীর বনের মাঝামাঝি একটা ফাঁকা জায়গায় দুহাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। গায়ে কোনো কাপড় থাকবে না। মাথায় রোদ পড়বে, বৃষ্টি পড়বে, রাতে চাঁদের আলো পড়বে। আস্তে আস্তে শরীরটা গাছের মতো হয়ে যেতে থাকবে। প্রথমদিকে ক্ষুধাতৃষ্ণা হবে। আস্তে আস্তে কমে যাবে। বোদে পুড়ে গাযেব চামড়া শক্ত হতে থাকবে। পায়ের তলা দিয়ে শিকড় বেরুবে।'

'সত্যি বলছেন নাকি ভাই?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'কতদিন লাগে?'

'কারো জন্যে খুব অল্পদিন লাগে। আবার কারো জন্যে দীর্ঘ সময়।'

'আমার কতদিন লাগবে বলে মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না। ব্যাপাবটা আপনাব ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভব করছে।'

'ট্রাই কবে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।'

'দেখুন না।'

'পুবোপুরি নগ্ন না হয়ে যদি একটা আন্ডাব ওয্যার থাকে তাতে অসুবিধা হবে?'

'না। তবে পুরোপুরি নগ্ন হতেই অসুবিধা কি? কেউ তো দেখছে না।'

'সেটাও সত্যি। আচ্ছা ভাই আপনি অনেস্টলি বলুন তো — আমি কি দেখব চেষ্টা কবে?'

'দেখুন। অন্তত একদিন এবং একরাত দেখুন। যদি দেখেন পারছেন না, বাসায় চলে আসবেন।'

মন্টুর ঘনঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। সে নিজেব ভেতব অন্য এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব কবছে। সে গাঢ় স্বরে বলল, 'ব্রাদার একটা কথা।'

'বলুন।'

'আপনি এক কাজ করুন। গাড়ি নিযে চলে যান। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবেন আমি থেকে গেছি। কী জন্যে সেটা বলবেন না। ওরা হাসাহাসি করতে পারে।'

'জ্বি আচ্ছা, বলব না।'

লোকটা বাসায় ফিরল বিকেল পাঁচটায়।

সে সরাসরি বাসায় আসে নি। গাড়ি নিযে সাবা শহর ঘুরেছে। ড্রাইভার বিরক্ত হলেও কিছু বলে নি।

মতিন সাহেব বাবান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন — তিনি লোকটাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বিস্মিত হলেন। লোকটি বলল, 'ফিরতে খানিকটা দেরি করলাম। গাড়ি নিযে খুব ঘুরেছি। আশা করি কিছু মনে করবেন না।'

'মন্টু, মন্টু কোথায়?'

'উনি মৌচাকে থেকে গেলেন। আমাকে পাঠিযে দিলেন।'

মতিন সাহেব কী বলবেন ভেবে পেলেন না। লোকটি গুনগুন করতে করতে নিজের ঘরের দিকে এগুচ্ছে —

সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে শোন শোন পিতা
কহ কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।

সুরমাকে নিয়ে আজ চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা। মতিন সাহেব কোনো উৎসাহবোধ করছেন না। তাঁর ভেতর এক ধরনের অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। তাঁর মন বলছে — লোকটিকে তাড়িয়ে দিতে হবে। অতি দ্রুত তাড়িয়ে দিতে হবে।

৫

দুটি খাট পাশাপাশি। হরিপ্রসন্ন বাবু এক খাটে — অন্য খাটে মিস্টার আগস্ট। রাত প্রায় দশটা বাজে। কাজের মেয়ে ঘরেই রাতের খাবার দিয়ে গিয়েছিল। খাওয়া শেষ হয়েছে। হরিবাবু কিছুই প্রায় খেতে পারেন নি। সন্ধ্যা থেকেই তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এখন বেশ বেড়েছে। তাঁর মনে হচ্ছে নিশ্বাস ঠিকই নিতে পারছেন — ফেলতে পারছেন না। ফুসফুসে বাতাস ক্রমেই জমা হচ্ছে।

মিস্টার আগস্ট বলল, 'ভাই আপনার শরীরটা কি খারাপ?'

হরিবাবু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

'নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?'

'হুঁ।'

'লুডু খেলবেন? মিতুর লুডু সেটটা আমার কাছে আছে।'

হরিবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'লুডু।'

'হ্যাঁ লুডু। সাপ-লুডু। এই খেলায় এক ধরনের উত্তেজনা আছে। উত্তেজনার কারণে শারীরিক কষ্ট অনেকটা কমে যাবে। খেলবেন?'

'না।'

'খেলে দেখুন না। ভালো না লাগলে বন্ধ করে দেবেন।'

হরিবাবু অবাক হয়ে দেখলেন লোকটা লুডু বোর্ড মেলে ধরেছে। পাগল নাকি লোকটা? তিনি শুনেছেন লোকটা গাড়ির ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল। স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। মাথাও যে খারাপ হয়ে গেছে সে কথা তাকে কেউ বলে নি।

'ভাই খেলবেন? নিন আপনি প্রথম দান দিন। সাপ-লুডুর নিয়ম জানেন তো — এক না উঠলে ঘুঁটি ঘর থেকে বেরুবে না।'

'আমি খেলব না।'

'আপনার দানগুলো আমি চেলে দেব। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

'না — আমার শরীর ভালো না।'

'তাহলে তো আমাকে একা-একাই খেলতে হয়।'

হরিবাবু শুয়ে পড়লেন। কাজের মেয়েটা মশারি খাটিয়ে দিয়ে গেছে। ঘরে বাতি জ্বলছে। সেই বাতির আলো চোখে লাগছে। পাশের খাটে বসে লোকটা খটখট শব্দে লুডুর দান ফেলছে। হরিবাবু বললেন, 'বাতিটা নেভাবেন? চোখে আলো লাগছে।'

'ও আচ্ছা, আচ্ছা। নিভিয়ে দিচ্ছি, আপনি ঘুমানোর চেষ্টা করুন।'

লোকটা বাতি নিভিয়ে বাইরে বেরুতেই ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি পড়তে লাগল। হরিবাবুর তন্দ্রার মতো এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাও কেটে গেল। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন।

কারণ অনেক-অনেকদিন আগের একটা ঘটনা তাঁর মনে পড়ে গেছে। সেই ঘটনাব সঙ্গে আজকের রাতের ঘটনার এত অদ্ভুত মিল! হরিবাবুর গাযে কাঁটা দিযে উঠল।

বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি গিয়েছেন। চৈত্র মাস — অসহ্য গবম। আরতী অনেক রাতে ঘুমুতে এসে বলল, 'এই গরমে তুমি ঘুমুতে পারবে না — এক কাজ করলে কেমন হয়; এস আমরা লুডু খেলি। সাপ-লুডু।'

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'পাগল নাকি!'

আরতী লুডু বোর্ড মেলে দিয়ে বলল, 'সাপ-লুডু খেলার নিয়ম জান তো? এক না পড়লে ঘুঁটি বের হবে না।'

'আমি খেলব না। কী সব ছেলেমানুষি করছ!'

'তোমার দানগুলো আমি চেলে দেব। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি প্রথম দান দেই কেমন — ?'

তিনি চুপ কবে রইলেন। আরতী একা-একাই খেলে যাচ্ছে। চাল দিচ্ছে। উত্তেজনায তাঁব মুখ ঈষৎ লালচে। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'অন্য কোথাও গিযে খেল তো। কানেব কাছে খট খট করবে না। ঘরের বাতি নিভিযে দিযে যাও।'

আবতী মুখ কালো করে ঘরেব বাতি নিভিয়ে বাইবে চলে গেল। আর তখনি ঝমঝম কবে বৃষ্টি নামল।

এতদিন পব একই ঘটনা আবাব কী কবে ঘটল? বহস্যটা কী? হবিবাবু ঘব থেকে বেব হযে এলেন। লোকটাকে দেখতে পেলেন না।

মিস্টার আগস্ট দোতলায উঠে এসেছে।

সাবেরের ঘবে হালকা টোকা দিযেছে। সাবেব সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিযে বলল, 'ভাই আসুন।'

'এখনো জেগে আছেন?'

'আপনাব জন্য অপেক্ষা কবছি। জানতাম বাত তিনটার দিকে আপনি আসবেন। বসুন, ঐ চেযাবে বসুন। আমার কাছে আসবেন না।'

'কেন?'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপাব হযেছে। আমাকে ডাবল অসুখে ধবেছে।'

'ডাবল নিউমোনিযা।'

'জ্বি না। নিউমোনিযা শুধু বাঁ লাংসটা ধবেছে। ডানটা ঠিক আছে।'

'ডাবল অসুখ বললেন যে ?'

'চিকেন পক্স হযে গেছে বে ভাই। সাবা শবীবে ফুটে বেব হযেছে। দারুণ ইন্টারেস্টিং। একসঙ্গে কযেকটি অসুখ সম্পর্কে জানতে পাবছি।'

'চিকিৎসা করাচ্ছেন?'

'না। রোগেব গতি-প্রকৃতি দেখছি, চিকিৎসা কবাটা ঠিক হবে না।'

'আবার যদি মবে-টবে যান।'

'সেই সম্ভাবনা তো আছেই। নো রিস্ক নো গেইন।'

'আমার মনে হয না আপনি মরবেন। মানুষেব মনেব জোব যখন পুবোপুবি চলে যায মৃত্যু তখনি আসে। আপনার মন শক্তই আছে।'

'সত্যি কথা বলেছেন। আমার মনের জোর একশ গুণ বেড়ে গেছে। আমাব যে এত বড় অসুখ বাসার কেউ জানেই না। হাসিমুখে সবাব সঙ্গে গল্প কবি। সবার ধাবণা, সামান্য ঠাণ্ডা। এদিকে চিকেন পক্সে গা পচে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ, ঘা হয়ে গেছে। ইনফেকশন। এন্টিবায়োটিক শুরু করা উচিত।'

'শুরু করবেন না?'

'না। দেখি। আরো কিছুদিন দেখি।'

'জ্বর আছে?'

'জ্বর তো আছেই। জ্বর থাকবে না?'

সাবের উঠে বসল। গলার স্বর নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আসল ব্যাপার আমি এখনো আপনাকে বলি নি। আমার স্মৃতিশক্তি এখন স্বাভাবিক পর্যায়ে আছে। যা পড়ি মনে থাকে।'

'অসুখের মধ্যেও পড়ছেন?'

'পড়ব না? কী বলেন আপনি? ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছি।'

'কবিতা! কবিতাও পড়ছেন নাকি?'

সাবের লজ্জিত মুখে বলল, 'জ্বি তাও মাঝেমধ্যে পড়ছি। জানি কাজটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু কেন জানি তাই ভালো লাগে।'

লোকটা চেয়ারে পা উঠিযে বসল। সহজ গলায বলল, 'সর্বশেষ যে কবিতাটি পড়লেন সেটা শোনান তো।'

'সত্যি শুনতে চান?'

'হ্যাঁ চাই।'

সাবের বালিশের নিচ থেকে রুলটানা খাতা বেব করল। লাজুক গলায আবৃত্তি শুরু করল —

"নারে মেযে, নারে বোকা মেযে,
আমি ঘুমাবো না। আমি নির্জন পথেব দিকে চেযে
এমন জেগেছি কত বাত,
এমন অনেক ব্যথা আকাঙ্ক্ষার দাঁত
ছিঁড়েছে আমাকে। তুই ঘুমো দেখি, শান্ত হযে ঘুমো।
শিশিরে লাগে নি তার চুমো,
বাতাসে উঠে নি তাব গান।
ওরে বোকা,
এখনো রযেছে রাতি, দরজায পড়ে নি তাব টোকা"

কবিতা পড়তে পড়তে সাবেরের চোখে পানি এসে গেল। সে লজ্জিত চোখে তাকিযে অপ্রস্তুতের হাসি হাসল।

লোকটা বলল, 'সাবের সাহেব আমাব একটা কথা রাখবেন?'

'অবশ্যই রাখব। কী কথা বলুন তো?'

'আপনি ডাক্তারি পড়াশোনাটা ছেড়ে দিন। কবিতা লিখতে শুরু করুন। আপনি পারবেন। সবাই সব কিছু পারে না। একেক জনকে একেক ধরনের দায়িত্ব দিযে পাঠানো হয়।'

'কে পাঠান?'

লোকটি এই প্রশ্নের জবাব না দিযে উঠে দাঁড়াল।

সাবের দুঃখিত গলায় বলল, 'চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন বলুন তো?'
'দেখছেন না — ঝুম ব নেমেছে। ভাবছি বৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ভিজব।'
'বৃষ্টিতে ভিজবেন? আপ খুবই স্ট্রেঞ্জ মানুষ।'
'সব মানুষই স্ট্রেঞ্জ।'
'হ্যাঁ তাও ঠিক। আমারও বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে।'
'খুব বেশি করছে?'
'হ্যাঁ খুব বেশি। মনে হচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজতে না পাবলে মবে যাব।'
'তাহলে চলে আসুন।'
'চলে আসব? বাসার কেউ দেখে ফেললে দারুণ হৈচৈ কববে।'
'কেউ দেখবে না। ঠাণ্ডা হাওযায সবাই আরাম করে ঘুমুচ্ছে।'
'তাহলে চলে আসি কি বলেন?'
'আসুন।'
'উঠতে পারছি না — হাতটা ধবে টেনে তুলুন।'
তারা দুজন কাঁঠাল গাছেব নিচে গিযে বসল। সাবের মুগ্ধ গলায বলল, 'অপূর্ব! অপূর্ব!'

৬

ভোববেলা মন্টু এসে উপস্থিত। তাব চোখ লাল। জামা-কাপড় কাদা-পানিতে মাখামাখি। খালি পা, চোখে-মুখে কেমন দিশেহাবা ভঙ্গি। প্রথমেই দেখা হল এষাব সঙ্গে। এষা বলল, 'ব্যাপাব কী মামা?'

মন্টু থমথমে গলায বলল, 'ঐ ব্যাটা আছে, না গেছে?'

'মিস্টাব আগস্টেব কথা বলছ?'

'হুঁ। আমার কাছ থেকে একটা কথা শুনে বাখ্। তাব ত্রিসীমানায যাবি না। ভুলেও না। ব্যাটাব কথা শুনে আমার জীবন সংশয হযে গেল। আবেকটু হলে গাছ হযে যেতাম।'

'গাছ হযে যেতে মানে?'

'ইন ডিটেইল্স কিছু বলতে পাবব না। মাথা ঘুবছে। বেস্ট নিতে হবে জুতা জোড়াও গেছে। নতুন জুতা, পাঁচশ' টাকায কেনা। এষা।'

'জ্বি মামা?'

'আমি যে ফিরে এসেছি ঐ লোককে বলবি না। খববদাব না। ঐ লোক ডেনজাবাস লোক। ভেরি ডেনজাবাস লোক। ভুজুং-ভাজুং দিযে আমাকে প্রায গাছ বানিযে ফেলেছিল।'

'তুমি এসব কী বলছ মামা!'

মন্টু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এষা বলল, 'মামা তুমি এক্ষুনি বাবাব সঙ্গে দেখা কব। বাবা তোমার জন্য অস্থিব হযে আছেন। বাবার ধারণা তোমাব বড় রকমেব কোনো বিপদ হযেছে।'

'বিপদ হতে যাচ্ছিল। অল্পেব জন্য বেঁচেছি।'

মতিন সাহেব মন্টুর বক্তব্য মন দিযে শুনলেন। মন্টুর গল্প তিনি বিশ্বাস করছেন এমন মনে হল না। আবার অবিশ্বাস কবছেন তাও মনে হল না। মতিন সাহেবের একপাশে এষা,

অন্যপাশে মিতু। দুজনই গভীর আগ্রহে গল্প শুনছে। এষা গল্পের মাঝখানে দুবার হেসে ফেলল। মন্টু বলল, 'আরেকবার হাসলে চড় খাবি। একটা সিরিয়াস এক্সপেরিয়েন্স বলছি আর তুই হাসছিস!

'তারপর দুলাভাই শুনুন কী হল। ঐ ব্যাটা ফট করে আমার মাথায় গাছ হওয়ার আইডিয়া ঢুকিয়ে দিল। মনে হয় ম্যাসমেরিজম জানে। যা-ই হোক, গাছ হবার জন্যে আমি একটা ফাঁকা জায়গায় দু হাত উপরে তুলে দাঁড়ালাম। একটু ভয় ভয় করতে লাগল। কী গাছ হব তা জানি না। ব্যাটা কিছু বলে যায় নি। একটু দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। আমার ইচ্ছা বটগাছ হওয়া। যা-ই হোক, দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বৃষ্টি। ঝুম বৃষ্টি। দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে আছি। কেমন অন্য রকম লাগছে। তারপর হঠাৎ লক্ষ করলাম পায়ের পাতায় চুলবুল করছে। শিকড় গজিয়ে যাচ্ছে বোধহয়। আমি দিলাম এক লাফ...'

এষা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

মন্টু বলল, 'এষা তুই এখান থেকে চলে যা। তুই না গেলে গল্প শেষ করব না। কী রকম ইডিয়টের মতো হাসছে!'

এষা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উঠে গেল। মতিন সাহেব একবারও হাসলেন না। শীতল গলায় বললেন, 'মন্টু তুমি গল্পটা গোড়া থেকে বল। কোনো কিছু বাদ না দিয়ে।'

'ডিকশনারি মুখস্থ থেকে শুরু কবব?'

'ডিকশনারি মুখস্থ মানে?'

'ব্যাটা তো ডিকশনারি মুখস্থ করে বসে আছে — আপনি জানেন না?'

'না তো!'

'এতক্ষণ ধরে আপনাকে আমি কী বলছি দুলাভাই? ডেঞ্জারাস লোক। ওকে এক্ষুনি বাড়ি থেকে বের করে দেযা দরকার। তবে খুব ট্যাক্টফুলি কাজটা কবতে হবে। ও যেন বুঝতে না পারে।'

'তুমি গল্পটা বল। আগে আমি গল্পটা মন দিয়ে শুনি। কিছুই বাদ না দিয়ে বলবে।'

মন্টু গল্প শুরু করল।

মতিন সাহেব গভীর আগ্রহে গল্প শুনছেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না।

এষা জুবায়েরকে টেলিফোন করেছে। এষা হাসির যন্ত্রণায় ঠিকমতো কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। জুবায়ের বলল, 'ব্যাপার কী এত হাসছ কেন? হিস্টিবিযা হয়ে গেছে নাকি?'

'হিস্টিরিযা হবার মতোই ব্যাপার। আমার ছোট মামা — মানে মন্টু মামা — উনি গাছ হয়ে গেছেন। কী গাছ বোঝা যাচ্ছে না। উনার ইচ্ছা ছিল বটগাছ হওযার। হি-হি-হি...'

'কী বলছ ভালোমতো বল তো — গাছ হাওযা মানে?

'এখনো পুরোপুরি হয় নি। পাতা বের হয় নি তবে শিকড় সম্ভবত গজিযেছে। হি-হি-হি'

'শোন এষা, তোমার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তুমি চলে এস। মামার কাছ থেকে গল্পটা শুনে যাও।'

'আমার একটা সমস্যা হযেছে — অফিসে আটকা পড়েছি। এই মুহূর্তে আসতে পারব না। তুমি বরং এক কাজ কর, আমার এখানে চলে এস। গাড়ি পাঠিযে দিচ্ছি। তারপব একসঙ্গে তোমাদের বাসায যাব। দুপুবে তোমাদের ওখানে খাব এবং তোমার মামাব গল্প শুনব। রাখলাম, কথা বলতে পারছি না।'

মতিঝিলের একটি হাইরাইজ বিল্ডিঙে জুবায়েরের অফিস। এগারতলা ফ্লোরের এক-চতুর্থাংশ। বিদেশি কায়দায় সুন্দর করে সব গোছানো। জুবায়েরের অফিসঘরের বাইরে ছোট্ট কিউবিক্যালে অল্পবয়স্কা এক জন তরুণী। বসার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে, হয় স্টেনো কিংবা রিসিপশনিস্ট। এষাকে দেখেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। মিষ্টি করে বলল, 'স্যার ভেতরে আছেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' এষা এর আগেও দুবার এই অফিসে এসেছে। কোনো মহিলা স্টেনো দেখে নি। মেয়েটিকে নতুন নেয়া হয়েছে।

এষা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

জুবায়েরের ঘর ঠাণ্ডা। এয়ারকুলার চলছে। জানালার সানশেড নামানো। জুবায়েরের টেবিলে একটি টি পট। দুটা খালি কাপ। জুবায়ের বলল, 'তোমার জন্যে চা বানিয়ে বসে আছি।'

'থ্যাংক ইউ। একটা মেয়ে দেখলাম। তোমার স্টেনো না রিসিপশনিস্ট?'

'দুটোই — অফিসের শোভা বলতে পার।'

'কবে স্টেনো নিয়েছ?'

'এই মাসেই। আজ এই মেয়ের দ্বিতীয় দিন।'

জুবায়ের উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

এষা বলল, 'দরজা বন্ধ করলে কেন?'

'নিরিবিলি চা খাচ্ছি, এই জন্যে দরজা বন্ধ করলাম। এই দরজার টেকনিক কি জান? ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলেই বাইরে লাল বাতি জ্বলে ওঠে। অর্থাৎ রেড সিগন্যাল, প্রবেশ নিষেধ।'

এষা শুকনো গলায় বলল, 'চা খাবার জন্যে রেড সিগন্যাল লাগবে কেন? প্লিজ দরজা খোল।'

জুবায়ের বলল, 'তুমি এমন করছ কেন? আমি লক্ষ করেছি আমার সঙ্গে একা হলেই তুমি অস্বস্তি বোধ কর। দুদিন পর আমরা বিয়ে করছি। করছি না?'

'প্লিজ দরজা খোল। আমার সত্যি অস্বস্তি লাগছে।'

'অস্বস্তি লাগছে?'

'হ্যাঁ অস্বস্তি লাগছে। শুধু অস্বস্তি না — ঘেন্নাও লাগছে। বাইরে একটি মেয়ে বসে আছে আর তুমি দরজা বন্ধ করে লাল বাতি জ্বালিয়ে দিলে? ছিঃ!'

জুবায়ের উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। শীতল গলায় বলল, 'চা খাও। নাকি চাও খাবে না?'

এষা চায়ের কাপে চা ঢালল। একটা কাপ এগিয়ে দিল জুবায়েরের দিকে। জুবায়ের চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এষা একটা ব্যাপার আমার ভালোমতো জানা দরকার। তুমি কি আমাকে পছন্দ কর?'

'হ্যাঁ করি।'

'আমাকে বিয়ে করার মানসিক প্রস্তুতি কি তোমার আছে?'

'আছে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তুমি সব সময় আমার কাছ থেকে এক ধরনের দূরত্ব বজায় রাখতে চাও। এটা আমি লক্ষ করছি। এটা আমার অবজারভেশন।'

'তোমার অবজারভেশন ঠিক না।'

'আমাকে তুমি যদি পছন্দ কর, যদি আমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি তোমার থাকে তাহলে আমার প্রসঙ্গে তোমার কোনো রকম দ্বিধা থাকা উচিত না। তোমার ভেতর দ্বিধা আছে। বড় রকমের দ্বিধা আছে।'

'তুমি এসব কী বলছ?'

'তোমার ভেতর যে কোনো দ্বিধা নেই তা তুমি খুব সহজেই প্রমাণ করতে পার।'

'কীভাবে?'

'তুমি নিজে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করবে। লাল বাতি জ্বালিয়ে দেবে। তারপর...।'

'তারপর কী?'

'তারপরেরটা তারপর। আপাতত প্রথম দুটি কাজ কর।'

এষা উঠে দাঁড়াল। শুরুতে তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সে দরজা খুলে চলে যাবে। তা সে করল না। দরজা বন্ধ করে শুকনো গলায় বলল, 'এখন কী?' জুবায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লম্বা লম্বা টান দিচ্ছে সিগারেটে। ঘর সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে।

সুরমা ছেলের বিছানার কাছে বসে আছেন। সাবেরের আকাশ-পাতাল জ্বর। দুজন ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়েছে। দুজনের কেউই এখনো এসে পৌছান নি। সুরমা থমথমে গলায় বললেন, 'তোর এমন অসুখ আমি তো কিছুই জানি না!'

'তুমি ব্যস্ত থাক — তোমাকে বলি নি।'

'এমন কী ব্যস্ত থাকি যে অসুখের খবরটাও বলা যাবে না?'

সাবের ক্ষীণ স্বরে বলল, 'বৃষ্টিতে ভেজাটা ঠিক হয় নি। লোভ সামলাতে পারলাম না।

'কবে বৃষ্টিতে ভিজেছিস?'

'কাল রাত তিনটার দিকে। মিঃ আগস্ট বললেন — তিনি বৃষ্টিতে ভিজবেন... শুনে আমার খুব লোভ লাগল...'

সুরমা সাবেরকে কথা শেষ করতে দিলেন না। কঠিন মুখে একতলায় নেমে এলেন। মিস্টার আগস্টকে পাওয়া গেল না। সে নাকি ঘুরতে বের হয়েছে। আরেকটি দৃশ্য দেখে সুরমা খানিকটা চমকালেন — হরিবাবু বিছানায় উবু হয়ে বসে একা একা লুডু খেলছেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে খেলছেন। সুরমা যে ঘরে ঢুকেছেন এই দৃশ্যটিও তাঁর চোখে পড়ে নি।

৭

মিতু বলল, 'বাবা তোমার টেলিফোন।' মতিন সাহেব বললেন, 'বলে দে আমি বাসায় নেই।' তিনি দোতলার বারান্দায় রাখা ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে শুয়ে আছেন। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। দুঘণ্টায় নটি সিগারেট খাওয়া হয়েছে। কোনো কিছুতেই তাঁর মন বসছে না। সাবেরের অসুখের এতটা যে বাড়াবাড়ি তা তিনি বুঝতেই পারেন নি। ছেলের সঙ্গে ইদানীং তাঁর যোগাযোগ নেই বললেই হয়। সাবের তাঁর ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে। এটা জানেন বলেই তিনি নিজেকে দূরে দূরে রাখেন। তার মানে এটা না যে, সাবের অসুস্থ হলেও তিনি জানবেন না। ডাক্তারের কথা শুনে তিনি বেশ বিচলিত বোধ করছেন। দুজন ডাক্তারই বললেন, 'ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন।'

তিনি বললেন, 'কেন?'

'বেটার কেয়ার হবে।'

'এইখানে কি বেটার কেয়ার হবে না বলতে চাচ্ছেন?'

'তা না। হবে নিশ্চয়ই, তবে হাসপাতালে সব সময় হাতের কাছে ডাক্তার থাকবে।'

'প্রয়োজন হলে এখানেও হাতের কাছে ডাক্তার রাখব। তাছাড়া আমাব ছেলে নিজেও এক জন ডাক্তার। রেকর্ড নম্বর পেয়ে এমবিবিএস পাস করেছে।'

'কোনো ইমার্জেন্সি হলে হাতেব কাছে সবকিছু থাকবে। এই জন্যেই হাসপাতালেব কথা বলা; অন্য কোনো কারণ না।'

'ইমার্জেন্সি হবে এ রকম আশংকা করছেন?'

'হ্যাঁ করছি। অবস্থা ভালো না।'

মতিন সাহেব ছেলেকে হাসপাতালে পাঠান নি। সার্বক্ষণিক সেবার জন্যে এক জন নার্স এনেছেন। এক জন ডাক্তারও বাখতে চেয়েছিলেন, সাবেব বাজি হয নি। আগ্রহ এবং আনন্দের সঙ্গে বলেছে — 'ডাক্তাব লাগবে কেন বাবা? আমি নিজেই তো ডাক্তাব। আগে সব ভুলে গিয়েছিলাম — এখন সব মনে পড়ছে। ফার্মাকোলজিব বইটা হাতে নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন কব — আমি বলে দেব।'

সাবেরের কথাবার্তা ঠিক সুস্থ মানুষের কথাবার্তা নয। যে ছেলে বাবাব ভয়ে অস্থির থাকত আজ সে বাবাব সঙ্গে বন্ধুব মতো গলায কথা বলছে। স্বাভাবিক অবস্থায এভাবে কথা বলা সম্ভব নয।

'বাবা, আমার সমস্যাটা কি ডাক্তারবা তোমাকে বলেছে ?'

'না।'

'আমাকেও বলে নি — তবে তাঁবা সন্দেহ কবছেন — চিকেন পক্স দূষিত হয়ে গ্যাংগ্রিনের মতো হয়ে গেছে। তুমি কি আমাব গা থেকে পচা গন্ধ পাচ্ছ?'

'না।'

'পচা গন্ধ পেলে বুঝতে হবে গ্যাংগ্রিন। গ্যাংগ্রিনেব Causative Agents কি, বলব?'

'বলতে ইচ্ছে হলে বল।'

'Clostrodium welchii, gram positive, anaerobic bacilli.... বাবা আমি কিন্তু সব মুখস্থ বলে যাচ্ছি।'

'তাই তো দেখছি!'

'এক জন ভালো ডাক্তারেব যে জিনিসটা সবচে' বেশি দবকাব তা হচ্ছে তীক্ষ্ণ স্মবণশক্তি।'

'কথা না বলে চুপচাপ শুযে থেকে রেস্ট নেযাটা বোধহয ভালো।'

মতিন সাহেব ছেলের কাছ থেকে সরে এসে বারান্দায বসেছেন। সাবেবেব পাশে তাব মা এবং নার্স মেয়েটি আছে। সুরমা অসম্ভব ভয পেযেছেন। নার্স মেয়েটিও ভয পেযেছে।

মিতু আবার এসে বলল, 'বাবা তোমার টেলিফোন।'

মতিন সাহেব বললেন, 'বল বাসায নেই।'

'এক মিথ্যা দুবার বলা যায না বাবা। মিস্টার আগস্ট বলেছেন।'

'তোমাকে যা বলতে বলেছি বল।'

'বড় আপা টেলিফোন করেছে — নিশা আপু।'

মতিন সাহেব যন্ত্রের মতো উঠে গিয়ে টেলিফোন ধবলেন।

'বাবা, কেমন আছ?'

'ভালো।'

'বাসার সবাই ভালো?'

'হ্যাঁ।'

'মিথ্যা কথা বলছ কেন বাবা? সাবেরের তো খুব অসুখ।'

'হ্যাঁ ওর শরীরটা ভালো নেই।'

'এই খবর তোমরা আমাকে জানাও নি।'

'ভুল হয়ে গেছে।'

'এ রকম ভুল ইদানীং তোমাদের খুব ঘনঘন হচ্ছে। তুমি একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছিলে। একটা লোককে প্রায় মেরেই ফেলেছিলে — তাকে তুলে এনেছ। এখন সে আমাদের বাসাতেই আছে — এই খবরও দাও নি।'

'এটা তেমন কোনো খবর না।'

'অবশ্যই বড় খবর। লোকটা অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে...'

'কোনোই অদ্ভুত কাণ্ড করছে না।'

'মিতু বলল করছে, মন্টু মামাকে নাকি বটগাছ বানিয়ে দিয়েছে...'

'মিতু কি বলছে তাই বিশ্বাস করে বসে আছিস?'

'মিতু তো বাবা কখনো মিথ্যা কথা বলে না।'

'বেশ, বাসায় এসে তাহলে তোর বটগাছ মন্টু মামাকে দেখে যা। বটগাছের নিচে বসে খানিকক্ষণ হাওয়া খেয়ে যা।'

'তুমি এমন রেগে রেগে কথা বলছ কেন বাবা?'

'রাগ হচ্ছে বলেই রেগে রেগে কথা বলছি।'

'তুমি কি গাড়িটা পাঠাতে পারবে?'

'না। গাড়ি নিয়ে এষা সকালে বের হয়েছে, এখনো ফেরে নি।'

মতিন সাহেব টেলিফোন রেখে আগের জায়গায় এসে বসলেন। বুঝতে পারছেন নিশার সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবহাব তিনি তাঁব মেয়েদেব সঙ্গে কখনো করেন না। সকাল থেকেই মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। বেলা যতই বাড়ছে মেজাজ ততই খারাপ হচ্ছে। এখন দুপুর।

মিতু ঢুকল, 'বাবা আবার টেলিফোন। নিশা আপা ফোন কবেছে। তুমি নাকি তাকে বকা দিয়েছ? সে কাঁদছে।'

'কাঁদুক।'

মিতু ফিরে গেল। নিশাকে বলল, 'বাবাকে বলেছিলাম তুমি কাঁদছ। বাবা বললেন — কাঁদুক।'

সুরমা অফিসে হাজিরা দিতে গেছেন।

ব্যাংকের চাকরিতে হুট করে অ্যাবসেন্ট করা যায না। এজিএমকে জানাতে হবে। আজকের দিন ছাড়াও আরো দুদিন ছুটি নেবেন। তাঁর মাথায যন্ত্রণা অন্যদিন সন্ধ্যার পর হয়, আজ শুরু হয়েছে দুপুর থেকে। সাবের তার ঘরে একা। নার্স মেয়েটি ঘরের বাইরে বারান্দায় চেয়ারে উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে। মেয়েটি অসম্ভব রোগা—শ্যামলা চেহারা। সরল মুখ। চোখ দেখে মনে হয কোনো কারণে ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স, রোগা বলেই বোধহয় আরো কম দেখা যায়। নার্সিং পেশায় মেয়েটি দুবছব কাটিয়েছে — এর মধ্যেই রোগ এবং রোগী সম্পর্কে নির্বিকার ভাব চলে আসা উচিত ছিল, তা আসে নি।

মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রোগীকে এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর সময় হয়ে গেছে। রোগী এখন ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙিযে হলেও ওষুধ খাওয়াতে হবে। এক মিনিট এদিক-

ওদিক হতে দেয়া যাবে না।

সাবেরের গায়ে হাত দেয়ামাত্র সে চোখ মেলল।

'স্যার, আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।'

সাবের বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি আমাকে স্যার বলছেন কেন? আগেও বলব ভাবছিলাম। মনে থাকে না — আপনি নাম ধরে ডাকবেন। ভালো কথা, আপনার নাম কি?'

'হৈমন্তী।'

'বাহ্, চমৎকার। হেমন্ত ঋতুতে জন্ম বলেই কি হৈমন্তী?'

'জ্বি।'

'আমাদেব এখানে এক জন আছেন তাঁর নাম মিঃ আগস্ট। তাঁব সঙ্গে কি কথা বলেছেন?'

'জ্বি না।'

'কথা বলে দেখবেন। চমৎকার মানুষ।'

'জ্বি — আচ্ছা, কথা বলব। নিন, ওষুধটা খান।'

'আমি ওষুধ খাব না বলে ঠিক করেছি।'

'কখন ঠিক করলেন?'

'কিছুক্ষণ আগে। চোখ বন্ধ করে এই ব্যাপাবটাই ভাবছিলাম। আমি ভেবে দেখলাম কি জানেন? আমি চিন্তা করে দেখলাম, এই মুহূর্তে আমাব শবীবে আছে লক্ষ কোটি জীবাণু। ওষুধ খাওয়া মানে এদেব ধ্বংস কবা। সেটা ঠিক হবে না। আমাদের যেমন জীবন আছে ওদেবও জীবন আছে; সুখ-দুঃখ আছে। একটি জীবনেব জন্যে লক্ষ কোটি জীবন নষ্ট কবা। কোনো কাবণ দেখি না।'

'ছেলেমানুষি কববেন না, ওষুধ খান।'

'না। ওষুধ থাক, আপনি ববং একটা কবিতা শুনুন।'

'আগে ওষুধ খান — তারপব শুনব। তাব আগে না।'

'বললাম তো ওষুধ খাব না।'

হৈমন্তী মতিন সাহেবকে ডেকে নিয়ে এল। তিনি গম্ভীব গলায় বললেন, 'তুমি নাকি ওষুধ খেতে চাচ্ছ না?'

'না। ওষুধ খাওয়া মানে লক্ষ কোটি জীবাণুর মৃত্যুব কাবণ হওয়া।'

'ওষুধ না খেলে তুমি নিজে মারা যাবে। তোমাব শবীবেও লক্ষ কোটি জীবন্ত কোষ আছে। ওদেবও মৃত্যু হবে।'

'তোমাব কথা খুবই ঠিক বাবা। তবে যুক্তিতে ভুল আছে। আমাদের শবীরে লক্ষ কোটি জীবকোষ থাকলেও আমাদেব একটিমাত্র চেতনা। কিন্তু জীবণুগুলোর স্বাধীন সত্তা আছে। এরা প্রত্যেকেই আলাদা।'

'তোমাকে কে বলেছে? জীবাণুগুলোর সঙ্গে তোমার কি কথা হয়েছে?'

'জ্বি হয়েছে।'

'কখন কথা হল?'

'পরশু বাতে প্রথম কথা হয়েছে। তারপরেও কয়েকবাব কথা হয়েছে, দীর্ঘ সময়। ওদেব সঙ্গে কথা বলা একটা সমস্যা — সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চায়, আব কথা বলে খুব দ্রুত....।'

'তুমি বোধহয় বুঝতে পাবছ না যে, তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না বাবা।'

'জীবাণুদের সঙ্গে কথা বলার এই কায়দা তোমাকে কে শিখিয়েছেন? মিস্টার আগস্ট? কথা বলছ না কেন? মিস্টার আগস্ট শিখিয়েছেন?'

'কেউ শেখায় নি। আমি নিজে-নিজেই শিখেছি।'

মতিন সাহেব কিছু না বলে বারান্দায় নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল — সিগারেট আনতে পাঠালেন। দারোয়ানকে বলে দিলেন, মিস্টার আগস্ট আসামাত্র যেন তাঁকে খবর দেয়া হয়।

মিতু এসে বলল, 'এষা আপু এসেছে।'

মতিন সাহেব বললেন, 'আমার কাছে আসতে বল।'

'ও আসবে না। দরজা বন্ধ করে কাঁদছে।'

'কাঁদছে বুঝলে কী করে?'

'শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে যাও।'

'কোথায় যাব?'

'কোথায় যাবে আমি জানি না। আপাতত আমার সামনে থেকে যাও।'

'তুমি আমার উপর রাগ করছ কেন? আমি কী করলাম?'

'যাও আমার সামনে থেকে। যাও বলছি।'

মিতুর চোখে পানি এসে গেল। সে চোখ মুছতে মুছতে বাবার সামনে থেকে চলে গেল এবং পরমুহূর্তেই ফিরে এসে বলল, 'বাবা, নিশা আপু এসেছে।'

মিস্টার আগস্ট এলেন সন্ধ্যার পর।

বাসায় তখন তুমুল উত্তেজনা। এম্বুলেন্স এসেছে — সাবেবকে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। সুরমা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। নিশা এবং এষা কাঁদছে না, তবে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। মিস্টাব আগস্টের বাড়িতে ঢোকা কেউ লক্ষ করল না — সে চলে গেল কাঁঠাল গাছের দিকে। সেখানে আগে থেকেই কে যেন বসে আছে। মোটাসোটা এক জন মানুষ।

আগস্ট বলল, 'কে?'

লোকটি দারুণ চমকে গেল। একজন বয়স্ক মানুষ এতটা চমকায় না।

আগস্ট আবার বলল, 'ভাই, আপনি কে?'

'আমি সিরাজুল ইসলাম।'

'ও আচ্ছা চিনেছি — আপনি মিতুর সবচেয়ে বড় বোনের হাসব্যান্ড?'

'জ্বি।'

'এখানে বসে আছেন কেন?'

'বাসায় কান্নাকাটি হচ্ছে — আমি ভাবলাম একটু দূরেই থাকি। জামাইরা কখনো বাড়ির মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে মিশতে পারে না। তাছাড়া বাড়ির কেউ চায়ও না, জামাইরা তাদের সঙ্গে মিশে যাক। ভালো কথা, আপনি কে?'

'আমার নাম আগস্ট।'

'ও আচ্ছা, আপনি আগস্ট!'

'জ্বি।'

'মাই গড! আমি ভেবেছিলাম অদ্ভুত একজন কাউকে দেখব। ঋষিদের মতো চুল, দাড়ি— লম্বা, ফর্সা। আপনাকে তো খুবই নরম্যাল এক জন মানুষ বলে মনে হচ্ছে।'

'খুব নরম্যাল না। আমি পুরানো কথা কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'অ্যামনেশিয়া?'

'ডাক্তার তাই বলেছে।'

'আপনার সম্পর্কে এত সব অদ্ভুত কথা কেন রটছে বলুন তো? মন্টুকে নাকি গাছ বানিয়ে দিয়েছেন?'

আগস্ট বসতে-বসতে বলল, 'ঠিক বানাই নি, বানানোর কৌশল ব্যাখ্যা করলাম।'

সিরাজুল ইসলাম বিস্মিত হয়ে বললেন, 'গাছ বানানোর কৌশল আবাব কী?'

আগস্ট কোনো জবাব দিল না। সিরাজুল ইসলাম সাহেব একটু সরে বসলেন।

লোকটা উন্মাদও হতে পারে। কিছু কিছু উন্মাদ সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চলাফেরা করে। তাদের পাগলামি হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে। এও মনে হচ্ছে সে রকম কেউ। দীর্ঘদিন একে এ বাড়িতে পোষা হচ্ছে কেন সেও এক রহস্য।

সিরাজুল ইসলাম উঠে দাঁড়ালেন।

আগস্ট বলল, 'চলে যাচ্ছেন?'

সিরাজুল ইসলাম জবাব দিলেন না। পাগল মানুষের প্রতিটি কথার জবাব দেযার কোনোই প্রয়োজন নেই। আগস্ট বলল, 'আপনার কাছে সিগারেট থাকলে দযা করে একটা দিয়ে যান।'

সিরাজুল ইসলাম আবার ভাবলেন, বলবেন, আমি সিগাবেট খাই না। মিথ্যা কথাটা চট করে মুখে এল না। তিনি সিগাবেটেব প্যাকেট বেব করলেন — দুটা মাত্র সিগারেট। তিনি প্যাকেটটাই কাঁঠাল গাছের দিকে ছুড়ে দিলেন।

আগস্ট বলল, 'দিযাশলাই? দিযাশলাই না দিযেই চলে যাচ্ছেন।' তিনি দিযাশলাইও ছুড়ে ফেললেন।

সাবেরকে হাসপাতালে নেযার সব চেষ্টা ব্যর্থ হযেছে। একমাত্র উপায় ছিল জোর করে এম্বুলেন্সে তোলা — মতিন সাহেব নিষেধ করলেন। অবোধ শিশুদের উপর জোর খাটানো যায। সাবেব শিশু নয, অবোধও নয। তাছাড়া যে চিকিৎসা এখানে করা সম্ভব হচ্ছে না সে চিকিৎসা হাসপাতালে কীভাবে করা হবে? মতিন সাহেব কঠিন গলায বললেন, 'সাবের, তুমি যে মারা যাচ্ছ, তা কি বুঝতে পারছ?'

'পারছি — জীবাণুরা আমাকে বলেছে।'

'ওদের সঙ্গে কথাবার্তা তাহলে এখনো হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'তুমি যে নিতান্তই পাগলেব মতো কথা বলছ তা কি বুঝতে পাবছ?'

'পাবছি — কিন্তু আমি যা বলছি তা সত্য। জীবাণুরা যে কোনো ভাবেই হোক আমাব সঙ্গে কম্যুনিকেট করতে পাবছে। তোমাদের ব্যাপাবটা আমি বোঝাতে পারছি না, কাবণ কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপাব গ্রহণ করাব মতো মানসিক প্রস্তুতি তোমাদের নেই।'

'তুমি তো আমাদেবই একজন। তোমার ভেতর সেই মানসিক প্রস্তুতি কী কবে হযে গেল?'

'মিস্টার আগস্ট আমাকে সাহায্য করেছেন।'

মতিন সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'সে তোমাকে জীবাণুর সঙ্গে কথা বলা শিখিয়েছে?'

'তা না, ব্যাপারটা কী হয়েছে আমি তোমাকে বলি — মানুষের অসুখ কী করে হয় ঐ ব্যাপারটা মিস্টার আগস্ট জানতেন না। আমি একদিন তাঁকে বুঝিযে বললাম, পুরো

ব্যাপারটা হয় জীবাণুঘটিত, নয় ভাইরাসঘটিত। তখন তিনি খুব আগ্রহ করে জানতে চাইলেন — আচ্ছা ঐ জীবাণুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না? ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলে খুব সুবিধা হত। তারপর থেকে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি ...।'

'তুমি তাহলে প্রথম ব্যক্তি যে জীবাণুদের সঙ্গে কথা বলল?'

'এর আগেও হয়তো কেউ কেউ বলেছে — এটা তেমন কঠিন কিছু না।'

'এর আগে কেউ যদি বলে থাকে তাহলে এতদিনে আমরা কি তা জানতে পারতাম না?'

'না। যাদের এই সৌভাগ্য হয়েছে তারা ভেবেছে এটা এক ধরনের স্বপ্ন। এক ধরনের ভ্রান্তি। তারা নিজেরাও ঠিক বিশ্বাস করে নি, কাজেই কাউকে বলে নি।'

'তোমার ধারণা এটা স্বপ্ন বা ভ্রান্তি নয়?'

'আমার তাই ধারণা।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে সাবের। তোমার ব্রেইন এখন নন-ফাংশানিং।'

সাবের চোখ বন্ধ করে ফেলল। দীর্ঘ সময় কথা বলার কারণে সে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। তার শ্বাসকষ্ট শুরু হল। মতিন সাহেব সুরমার দিকে তাকালেন। সুরমা তাঁর ছেলের মাথার কাছে মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁর পেছনে খাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে নিশা। সে পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেছে। মতিন সাহেব মিস্টার আগস্টের খোঁজে বের হলেন। আগস্ট ফিরে এসেছে এবং কাঁঠাল গাছের নিচে বসে আছে এই খবর তিনি পেয়েছেন।

মতিন সাহেবকে দেখে আগস্ট উঠে দাঁড়াল।

মতিন সাহেব তীব্র গলায় বললেন, 'আপনি কে ঠিক করে বলুন তো?'

আগস্ট শান্ত গলায় বলল, 'আমি কে তা আমি জানি না। জানলে অবশ্যই বলতাম।'

'আপনি জানেন না আপনি কে?'

'জ্বি না। এবং মজার ব্যাপার কি জানেন — আপনি নিজেও জানেন না আপনি কে। এই পৃথিবীর কোনো মানুষ জানে না সে কে। সে কোথা থেকে এসেছে — সে কোথায় যাবে!'

'আপনি যে আমার পরিবারে ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছেন তা কি আপনি জানেন?'

'পুরোপুরি না জানলেও আঁচ করতে পারছি।'

'কাল সকালে সূর্য ওঠার পর এই বাড়িতে আমি আপনাকে দেখতে চাই না। আমি কী বলছি বুঝতে পারছেন?'

'পারছি। আপনি চাইলে আমি এখনই চলে যেতে পারি!'

'এত রাতে কোথায় যাবেন?'

'হাঁটতে শুরু করব, তারপর আপনার মতো একজন কেউ আমাকে পাবে... তাঁর বাসায় কিছুদিন থাকব। তারপর...'

'আপনার জীবন কি এইভাবেই কাটছে?'

'আমি জানি না। সত্যি জানি না — জানলে আপনাকে জানাতাম। কাঁঠাল গাছের নিচে বসে আমি প্রায়ই ভাবি — আমি কে? পুরানো স্মৃতি বলে আমার কিছু নেই। আমি বাস করি বর্তমানে।'

মতিন সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'আপনি আমাকে কনফিউজ করার চেষ্টা করবেন না, আমি মন্টু না যে আপনার কথা শুনে গাছ হবার জন্য মাঠে দাঁড়িয়ে থাকব বা জীবাণুদের সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করব...'

'আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন।'

মতিন সাহেব শান্ত গলায় বললেন, 'আপনি কি দয়া করে আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন? ওকে বুঝাবেন যে জীবাণুদের সঙ্গে বাক্যালাপ করা যায় না? সে যা করছে তা নেহায়েত পাগলামি...'

'পাগলামি তো না-ও হতে পারে।'

'তার মানে?'

'হয়তো সে সত্যি ওদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে।'

মতিন সাহেব রাগে কাঁপছেন। তীব্র রাগে তিনি কয়েক মুহূর্ত চোখে অন্ধকার দেখলেন — একবার ইচ্ছে হল পাগলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজেকে সামলালেন। বাগান থেকে ঘরের দিকে রওনা হলেন। ক্লান্তিতে পা ভেঙে আসছে।

মিতু এসে আগস্টকে বলল, 'আপনাকে খেতে ডাকছে।'

আগস্ট উঠে দাঁড়াল। মিতু বলল, 'ডাইনিং ঘরে খাবার দিয়েছে।'

আগস্ট কিছু বলল না। কাজের মেয়ে তার খাবার ঘরে দিয়ে যায়। আজ প্রথম ডাইনিং ঘরে ডাক পড়ল। শেষ খাবার বলেই বোধহয়। আগস্ট ভেবেছিল ডাইনিং হলে অনেকেই থাকবে। দেখা গেল শুধু সে আর মিতু। এষা খাবার এগিয়ে দিচ্ছে। এষার চোখ-মুখ কঠিন হয়ে আছে। সে খাবারদাবার টেবিলে রাখছে যন্ত্রের মতো।

আগস্ট বলল, 'আমি কাল ভোরে চলে যাচ্ছি। আপনাদের অনেক বিরক্ত করলাম — কিছু মনে করবেন না।'

এষা উত্তর দিল না। মিতু বলল, 'আর আসবেন না?' আগস্ট ভাত মাখতে মাখতে বলল, 'ভবিষ্যতের কথা তো আমি বলতে পারি না। আসতেও পারি। হয়ত কুড়ি, পঁচিশ বা ত্রিশ বছর পর আবার দেখা হবে।'

মিতু বলল, 'তখন কি আপনি আমাকে চিনতে পারবেন?'

'চিনতে না পারারই কথা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পাল্টে যায়। তবে তুমি তোমার নাম যদি বল — আমি চিনতে পারব। মানুষের চেহারা পাল্টালেও নাম পাল্টায় না।'

খাওয়া এগুচ্ছে নিঃশব্দে। মিতু টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এষা আগস্টের মুখোমুখি বসল। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। চুপ করে গেল। শুধু তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে।

আগস্ট বলল, 'আপনি কি কিছু বলতে চাচ্ছেন? বলতে চাইলে বলে ফেলুন। আর সুযোগ পাবেন না।'

এষা নিচু গলায় বলল, 'আপনি কে আমি জানি না। জানতেও চাই না — হয়তো আপনি কেউ না, সাধারণ একজন মানুষ কিংবা হয়তো বিশেষ ধরনের একজন মানুষ... আপনি যেই হোন, আমি হাতজোড় করে আপনার কাছে একটা অনুরোধ করব।'

'করুন।'

'ভাইয়ার মাথায় যে পাগলামিটা ঢুকেছে তা আপনি দূর করে দিন।'

'যাবার আগে আমি অবশ্যই তার সঙ্গে কথা বলব। তবে তাতে লাভ হবে কিনা জানি না। সে যা করেছে তা যদি পাগলামি না হয় তাহলে তা দূর করা তো অসম্ভব।'

এষা শান্ত গলায় বলল, 'আমার একটি ব্যক্তিগত সমস্যাও আপনাকে বলতে চাই। বলতে ইচ্ছা করছে বলেই বলছি। আমার কোনো লাভ হবে বলে বলছি—'

'বলুন। আমি খুব মন দিয়ে শুনছি।'

এষা নরম গলায় বলল, 'একটা ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আমার ধারণা ছিল ছেলেটাকে আমি পাগলের মতো ভালবাসি। এখন একবার মনে হচ্ছে বাসি না আবার মনে হচ্ছে বাসি। .... আপনি তো অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলেন — আপনি কি এমন কিছু জানেন, যা আমার মনের দ্বিধা দূর করতে পারবে?'

আগস্ট শব্দ করে হাসল।

এষা আহত গলায় বলল, 'হাসছেন কেন?'

'হাসছি — কারণ একটি মেয়ে প্রেমে পড়েছে কি পড়ে নি তা জানা খুব সহজ। কোনো মেয়ে যদি প্রেমে পড়ে তাহলে তার মধ্যে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা চলে আসে। সেই মেয়ে যদি কোনো কাচের পাত্রে হাত রাখে সেই পাত্র গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে। আপনি একটি কাচের পাত্রে হাত দিয়ে দেখুন পাত্রটি নীল হচ্ছে কিনা।'

এষা চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বলল, 'শুধু শুধুই আপনার সঙ্গে কথা বললাম আপনি উন্মাদ। এর বেশি কিছু না। আমার মনে হয় আপনাকে কোনো একটা ঘরে দীর্ঘদিন আটকে রাখা হয়েছিল। আপনি কোনো কায়দায় দরজা খুলে চলে এসেছেন।'

'হতে পারে। বিচিত্র কিছু না।'

৮

সাবের ঝিম মেরে পড়ে ছিল।

রাত প্রায় তিনটা। সুরমা ছেলের পাশে শুয়ে আছেন। এতক্ষণ তিনি জেগেই ছিলেন, কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন। নার্স মেযেটি বারান্দাব চেযারে জেগে বসে আছে। মিস্টার আগস্টকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। রোগীর ঘরে ঢুকতে নিষেধ করতে যাচ্ছিল — কী ভেবে যেন করল না।

মিস্টার আগস্ট ঘরে ঢুকল। সাবেরের কপালে হাত রাখতেই সে চোখ মেলে বলল, 'আমি জেগে ছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। জীবাণুদের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'কী কথা?'

'ওদের একটা কবিতা শুনালাম — আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন, ওরা কবিতা পছন্দ করে! তবে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে হয। যেমন দরজা — দরজা ব্যাপারটা কি ওরা জানে না — মজার কথা না!'

'মজার কথা তো বটেই।'

'আপনাকেও কবিতাটা শোনাই।'

'আমাকে শুনাবে কেন? আমি তো আর জীবাণু না।'

সাবের হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই কবিতা শুরু করল —

দুহাতে দরজা খুলতেই দেখি তুমি
যে ব্যথা বুকের মাঝে গোপনে পুষেছি
এতকাল ধরে, সারাক্ষণ সাথী ছিল

[তোমার বিকল্পরূপে — শুধু এই ব্যথা]
কী করে নামাই বলো, তোমাকে দেখেই।
চার চোখ অপলক শুধু মেলে রাখা
কারো কোনো কথা নেই, অথচ কখন
অবাক চোখের ভাষা অতিদ্রুত গতি
কেড়ে নিল দুজনের প্রিয়–সম্ভাষণ
কেন যে এমন হল, কেন যে এমন।

মিস্টার আগস্ট বলল, 'জীবাণুরা আপনার এই কবিতা পছন্দ করেছে?'

'জ্বি — ঐ যে বললাম, কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। যেমন — চার চোখে চেয়ে থাকা মানে কি, দরজা মানে কি, দুহাত ব্যাপারটা কি? ওদের জগৎ আর আমাদের জগৎ তো ভিন্ন।'

'তাতো বটেই। ওরাও কি কবিতা লেখে?'

'জিজ্ঞেস করি নি।'

'একবার জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা — আপনার মৃত্যু মানে তো ওদেরও মৃত্যু। তা নিয়ে ওরা কি দুঃখিত না?'

'না। ওদের জীবনটা ক্ষণস্থায়ী। স্ফুলিঙ্গের মতো। উড়ে যাবে, নিভে যাবে। ওরা এই ব্যাপারটায় অভ্যস্ত।'

'আপনার সঙ্গে তো ওদের এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়েছে — আপনার মৃত্যুতে তারা কি কষ্ট পাবে না?'

'জিজ্ঞেস করি নি।'

'দেখুন না — জিজ্ঞেস করে।'

সাবের খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। এক সময় চোখ মেলে বলল, 'ওরা বলছে ওরা অসম্ভব কষ্ট পাবে।'

'তাহলে ওদের আপনি বলুন না — আপনাকে মুক্তি দিতে। ওদের তো ক্ষণস্থায়ী জীবন। সেই জীবন তো ওরা ভোগ করল — আর কত!'

'বলব?'

'হ্যাঁ বলুন।'

'এটা বলতে লজ্জা করছে।'

'লজ্জার কিছু নেই, আপনি বলুন।'

সাবের চোখ বন্ধ করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে বলল, 'ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে। ওরা চায় না আমার মৃত্যু হোক।'

'এখন তাহলে ওষুধ খাবেন?'

'ওষুধ খেতে হবে না। ওরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করবে। ওদের সে ক্ষমতা আছে। আচ্ছা আমি যেসব কথাবার্তা বলছি তা কি আপনি বিশ্বাস করছেন?'

'করছি। অবশ্যই করছি। ভাই, আমি তাহলে যাই।'

'কোথায় যাবেন?'

'জানি না।'

'আমার মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।'

'হতেও পারে, কিছুই বলা যায় না। এই জগৎ বড়ই রহস্যময় — ভাই, আমি যাই। সূর্য ওঠার আগে আমাকে বিদেয় হতে হবে।'

মিস্টার আগস্ট ঘর থেকে বের হওয়ামাত্র সাবের তার মাকে ডেকে তুলল। সহজ-স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এককাপ চা খাওয়াতে পার, মা।'

সুরমা ছেলের গায়ে হাত রাখলেন। জ্বর নেমে গেছে। সাবেরের মুখ হাসি-হাসি।

'মা, কড়া করে চা বানাবে। নোন্‌তা বিস্‌কিট থাকলে চায়ের সঙ্গে নোন্‌তা বিসকিট দিও — প্রচণ্ড ক্ষিদে লেগেছে।'

হরিপ্রসন্ন বাবু ঘুমিয়ে ছিলেন।

মিস্টার আগস্ট তাকে ডেকে তুলে বলল, 'আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি — আমি কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হব। বেশ কয়েকদিন আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কাটালাম। কথাবার্তা তেমন হয় নি। হলে ভালো লাগত।'

হরিপ্রসন্ন বাবু বললেন, 'রাতের বেলা কোথায় যাচ্ছেন?'

'আসতে হয় দিনে — যাবার জন্যে তো রাতই ভালো।'

'আপনার কথা বুঝলাম না।'

'কথার কথা বলেছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। সরি, ঘুম থেকে ডেকে তুললাম।'

'না, না, অসুবিধা নাই।'

'আচ্ছা ভালো কথা — আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে?'

হরিপ্রসন্ন বাবু চমকে উঠে বললেন, 'আমি! আমি কোথায় যাব? না, না, কী বলছেন আপনি?'

'আপনি রাজি থাকলে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম।'

'আরে না।'

'আচ্ছা, ভাই, তাহলে ঘুমান। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। চাদরটা গায়ে দিযে নিন।'

মিস্টার আগস্ট দরজা ভেজিযে বারান্দায এল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টিতে·সে নেমে গেল নিঃশব্দে। একবাবও পেছনে ফিবে তাকাল না। পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পেত — দোতলাব বারান্দা থেকে মতিন সাহেব তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

কুড়ি বছর পরের কথা।

আমেরিকার মন্টানা স্টেট ইউনিভার্সিটি।

ইউনিভার্সিটি কফি শপে একজন বাংলাদেশী ছাত্রীকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তার হাতে কফির মগ। টেবিলে স্থানীয় পত্রিকা বিছানো। মেয়েটি অলস ভঙ্গিতে পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলো দেখছে। মেয়েটির নাম মিতু। সে এই বিশ্ববিদ্যালযে ফাইভার অপটিকস-এ পোস্ট ডক করছে। একা একা থাকে। বেশির ভাগ সময়ই তাকে খুব বিষণ্ন দেখা যায। জীবন তার প্রতি খুব সুবিচার করে নি। আমেরিকায় পড়তে আসা তাব এক ধরনের স্বেচ্ছানির্বাসন।

মিতু বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে হঠাৎ চমকে উঠল। এতটা চমকাল যে, হাতের কফির মগ থেকে গরম কফি ছিটকে পড়ল গায়ে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একজন হাসিখুশি যুবকের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে লেখা — এই যুবকটি নিম্ন ঠিকানায় আছে। যুবকটি এক ধরনের অ্যামনেশিযায় ভুগছে। পুরানো স্মৃতি মনে নেই। তার কোনো খোঁজখবর বের করা যাচ্ছে না। যদি কেউ এই যুবকটি সম্পর্কে কিছু জানেন তাহলে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন দিয়েছে স্টেট পুলিশ।

যুবকটির ছবির দিকে মিতু অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

মিতু তাকে চেনে — তার নাম মিস্টার আগস্ট। এ ব্যাপাবে মিতুর কোনো সন্দেহ নেই। মিতু পত্রিকা হাতে উঠে দাঁড়াল।

চৌদ্দ নম্বর পুলিশ প্রিসিংক্ট-এ যুবকটি আছে। উনিশ ডাউন স্ট্রিট — নর্থ। এই হল ঠিকানা। কতক্ষণ লাগবে সেখানে যেতে? বড়জোর কুড়ি মিনিট। মিতুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

যুবকটিব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিতু খানিকটা বিভ্রান্ত হযে গেল। নীল চোখ এবং সোনালি চুলের এক জন আমেরিকান যুবক তার সামনে বসে আছে। যুবকটির চোখে-মুখে চাপা হাসি। মিতু নিশ্চিত যে, সুদূব শৈশবে দেখা মিস্টার আগস্টের সঙ্গে এই যুবকের চেহাবার অসম্ভব মিল — তবু এই আমেবিকান যুবক মিস্টাব আগস্ট হতে পাবে না। পুলিশেব জনৈক কর্মকর্তা বললেন, 'মিস্, আপনি কি এই যুবককে চেনেন?'

মিতু বলল, 'না।'

সে ফিবেই আসছিল। হঠাৎ কি মনে করে যুবকেব দিকে তাকিযে ইংবেজিতে বলল, 'এক সময আমাব নাম ছিল পাঁচ হাজাব ছয শত চুযান্ন। আজ আমার নাম বাবো হাজাব তিন শ' একুশ। তুমি কি আমাকে চিনতে পাবছ?'

যুবকটি মিতুর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'কেমন আছ মিতু?'

মিতুর চোখে পানি এসে গেল।

পুলিশ অফিসার অত্যন্ত আগ্রহেব সঙ্গে জিজ্ঞেস কবলেন, 'মিস্ আপনি কি যুবকটিকে চিনতে পারছেন? তাকে কি আপনাব পরিচিত মনে হচ্ছে?'

মিতু তাকিয়ে আছে যুবকের দিকে। যুবক মাথা নিচু কবে বসে আছে। পা নাচাচ্ছে। তার মুখ হাসি-হাসি।

মিতু বলল, 'আমি চিনি না। 'আমি এই যুবককে চিনি না।'

একজন মায়াবতী

দরজাব কড়া নড়ছে।

মনজুর লেপের ভেতব থেকে মাথা বের করে শব্দ শুনল — আবাব লেপেব ভেতর ঢুকে পড়ল। এর মধ্যেই মাথার পাশে বাখা ঘড়ি দেখে নিয়েছে ---সাতটা দশ। মনজুব নিজেকে একজন বুদ্ধিমান লোক মনে কবে। কোনো বুদ্ধিমান লোক পৌষ মাসে ভোব সাতটা দশে লেপের ভেতব থেকে বেরুতে পাবে না।

যে কড়া নাড়ছে সে যদি বুদ্ধিমান হয তাহলে আরো কযেকবার কড়া নেড়ে চলে যাবে। পাঁঠা শ্রেণীর হলে যাবে না। বিপুল উৎসাহে কড়া নাড়তেই থাকবে। নাড়ুক, ইচ্ছে হলে দরজা ভেঙে ফেলুক। হু কেয়ারস? এখন লেপের ভেতর থেকে বের হওয়া যাবে না।

মনজুর গত রাতে তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিল। ঘুমাতে গেছে তিনটা কুড়িতে। ঘুম ভালো হয নি কারণ ঘুমাতে গেছে ক্ষিধে নিযে। বাত জাগলে ক্ষিধে পায। শরীবেব জন্যে বাড়তি কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন হয। সেই ব্যবস্থা ঘবে থাকে — দু তিন বকমের জেলী এবং পাউরুটি। কাল রাতে জেলী ছিল — পাউরুটি ছিল না। বিস্কিটের টিনে কিছু বিস্কিটেব গুঁড়া পাওয়া গেল। এক চামচ মুখে দিযে মনে হল সাবানের গুঁড়া খাচ্ছে। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। কত দিনকাব বাসি কে জানে। পানি এবং চিনিব কৌটাব শেষ দু চামচ চিনি খেয়ে পেট ভরিযে ঘুমাতে গেছে, চোখ প্রায ধরে এসেছে এমন সময বাথরুম পেযে গেল। ভরপেট পানি খেয়ে ঘুমাতে যাবার এই হল সমস্যা। বাথরুম পাচ্ছে তবে সেই তাগিদ জোরালো নয, উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। শীতেব বাতে লেপেব ভেতব একবাব ঢুকে পড়লে বেরুতে ইচ্ছা করে না।

এখনো খট্‌খট্‌ শব্দ হচ্ছে।

গাধা নাকি? গাধা তো বটেই — অতি নিম্নমানের গাধা। গাধা সমাজেরও কলংক। মনজুর লেপের ভেতর থেকে মুখ বেব করে উঁচু গলায বলল, 'ইউ স্টুপিড অ্যাস। ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।' এটি মনজুরের অতি প্রিয় গালি। সে শিখেছে বিন্দুবাসিনী স্কুলেব হেড স্যারের কাছে। ক্লাস চলাকালীন সময়ে মনজুর কী কারণে জানি হেড স্যারের ঘরে ঢুকেছিল। তাকে দেখে স্যার হুংকার দিলেন, 'ইউ স্টুপিড অ্যাস, ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।' ইংরেজি গালি বাচ্চা ছেলে বুঝতে পাববে কিনা তাঁর হয়তো সন্দেহ হল। তিনি

তৎক্ষণাৎ বাংলা তরজমাও করে দিলেন, "ওহে বোকা গাধা, এখানে তোমার কোনো কর্ম নাই।"

মনজুর হেড স্যারের ইংরেজি গালি সাধারণত মনে মনে দেয। তবে এখন উঁচু গলায দেযা যেতে পারে। শোবার ঘর থেকে যাই বলা হোক, বাইরে থেকে কিছু শোনা যায না। সে হযতো তার স্যাবের মতো গালির বাংলা তরজমাও করত। কিন্তু সে বুঝতে পারছে তাকে বিছানা ছাড়তেই হবে, তলপেটে চাপ পড়ছে, বাথরুমে না গেলেই নয। কাল বাতে বাথরুম পেয়েছিল, সে বাথরুমে না গিযেই ঘুমিযে পড়েছিল। যে দু গ্লাস পানি ঘুমাবাব আগে খেয়েছিল তার পুরোটাই এখন একটি কিডনিতে জমা হযেছে। সাধারণ নিযমে দুটি কিডনিতে জমা হবার কথা — সে সাধাবণ নিযমের বাইবে — তাঁর একটিমাত্র কিডনি। ডান দিকের কিডনি সাত বছর আগে কেটে বাদ দেযা হযেছে। বাঁ দিকেরটাও সম্ভবত যাই-যাই করছে। মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা হয। চোখে অন্ধকাব দেখার মতো ব্যথা। মিলিটারি ডাক্তাব ব্রিগেডিযার এস. মালেক গত মাসে হাসি হাসি মুখে বললেন, Outlook not so good. মিলিটাবি ডাক্তাবরা বোধহয সাধারণ ডাক্তাদের চেযে বোকা হয। বোকা না হলে এই জাতীয কথা হাসিমুখে বলে কী করে?

একজন হাসিমুখে কিছু বললে অন্যজনকেও হাসিমুখে জবাব দিতে হয। মনজুর হাসিমুখে বলল, Outlook not so good বলতে কী মিন করছেন?

ডাক্তাব সাহেবেব হাসি আরো বিস্তৃত হল। তিনি বললেন, 'কিডনি যেটা আছে মনে হচ্ছে সেটাও ফেলে দিতে হবে। সিমটমস ভালো না।'

মনজুবেব বুক শুকিযে সঙ্গে সঙ্গে পানিব তৃষ্ণা পেযে গেল। তবু মুখে হাসি ধবে বাখল। হাসাহাসি দিযে যে বাক্যবিন্যাস শুরু হযেছে তাকে বন্ধ কবাব কোনো মানে হয না।

'যেটা আছে সেটাও ফেলে দিতে হবে? বলেন কী? হা-হা-হা।'

মিলিটাবি ডাক্তাব এই পর্যাযে হকচকিযে গেলেন। সরু গলায বললেন, 'হাসছেন কেন? আপনাব শবীব থেকে একটা প্রত্যঙ্গ ফেলে দিতে হচ্ছে এব মধ্যে হাসির কী পেলেন? What is so funny about it?'

মনজুবেব গা জ্বলে গেল। ব্যাটা বলে কী? আমি হাসছি তোব সঙ্গে তাল দিযে আব তুই বলছিস What is so funny about it?

এখনো কড়া নড়ছে।

খুব কম হলেও ঝাড়া কুড়ি মিনিট ধবে ধাক্কাধাক্কি চলছে। দুটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে — এক. ভিখিরি, যে ঠিক কবেছে ভিক্ষাব বউনি এই বাড়ি থেকে শুরু করবে। কিছু না নিযে যাবেই না। দুই. তাঁর শ্বশুরবাড়ির কেউ। মীরা হযতো তার কোনো খালাতো, চাচাতো কিংবা মামাতো ভাইকে পাঠিযেছে। বলে দিযেছে — 'দেখা না কবে আসবি না।' কাজ হচ্ছে সেইভাবেই। গাধাটা খুঁটি গেড়ে বসে গেছে। মনজুর বিছানা থেকে নামতে নামতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল — এটা কেমন করে সম্ভব যে আমার শ্বশুরবাড়ির প্রতিটি লোক গাধা ধবনেব? শুধু যে স্বভাবে গাধা তাই না, চেহারাতেও গাধা। জহির নামে মীরার এক খালাতো ভাই আছে যার কান দুটি অস্বাভাবিক লম্বা। মুখও লম্বাটে। ঐ ব্যাটাই এসেছে নাকি?

'কে?'

'জ্বি আমি।'

'আমিটা কে?'

'স্যার আমি কুদ্দুস।'

কুদ্দুস মনজুরের অফিসের পিওন। সাত সকালে সে এখানে কেন ? মনজুর কি তাকে আসতে বলেছিল? মনে পড়ল না। আজকাল কিছুই মনে থাকে না। কিডনির সঙ্গে কি স্মৃতিশক্তির কোনো সম্পর্ক আছে? মনজুর দরজা খুলল।

'ব্যাপার কী কুদ্দুস?'

'স্যার আমার ছোট বোনটা গত রাত্রে মারা গেছে।'

মনজুর তাকিয়ে রইল।

ভোরবেলা কেউ মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এলে তাকে কী বলতে হয়? সান্ত্বনার কথাগুলো কী? বলার নিয়মটাই বা কী? মনজুর খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'কুদ্দুস ভিতরে আস। ভেরি স্যাড নিউজ। ইযে কি যেন বলে...কটাব সময মারা গেছে?'

'রাত আড়াইটার সময় স্যার।'

মনজুরের নিজের উপরই রাগ লাগছে। কটার সময মারা গেছে এই খবরে তাব দরকার কী? আড়াইটার সময় সে কী করছিল? বিস্‌কিটেব গুঁড়া খাচ্ছিল বলে মনে হয।

কুদ্দুস মাথা নিচু করে বলল, 'কিছু টাকা দবকার ছিল স্যার। হাত একেবারে খালি।'

মনজুর স্বস্তি বোধ করল। সান্ত্বনা দেযার চেয়ে টাকা দেয়া অনেক সহজ। সান্ত্বনা দেয়ার অসংখ্য পথ আছে, টাকা দেযার একটাই পথ। মানিব্যাগ বের করে হাতে দিযে দেয়া।

'কত টাকা দরকার?'

'স্যার আমি তো জানি না। লাশের খবচপাতি আছে। দেশে নিযা গোব দেযাব ইচ্ছা ছিল; সেটা পারব না। সবই স্যার কপাল।'

'হাজার খানিক দিলে হয়?'

'দেন স্যার।'

'আস ভিতরে এসে বস। নাম কি ছিল তোমাব বোনের?'

'সাবিহা।'

'ও আচ্ছা, সাবিহা।'

মনজুর আবার নিজের উপর বিবক্ত হল। 'নাম কি' প্রশ্নটা সে শুধু শুধু কেন কবল? নাম দিযে তার দরকার কী? মূল কথা হচ্ছে বেচাবি মারা গেছে। তার নাম সাবিহা হলেও যা, ময়ূরাক্ষী হলেও তা। অবিশ্যি ময়ূরাক্ষী নাম হলে এক পলকেব জন্য হলেও মনে হত — "আহা, এত সুন্দর নামের একটা মেয়ে মারা গেল!"

'তুমি এই চেয়ারটায় বস কুদ্দুস। জীবন-মৃত্যু হচ্ছে তোমার কি যেন বলে...উইল অব গড মানে ইয়ে ...দেখি টাকাটা নিযে আসি।'

মানিব্যাগে আছে মাত্র একশ আশি টাকা। টেবিলের ডান দিকেব ড্রযাবে আছে নব্বুই টাকা — এতো দেখি বিরাট বেকাযদা হযে গেল। বাড়িওযালাব কাছে চাইলে কি পাওযা যাবে? সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাকে এই মাসের ভাড়াই দেওযা হয নি। মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে ভাড়া দেওযার কথা, আজ বার তারিখ।

'কুদ্দুস।'

'জ্বি স্যার।'

'মানে একটা সমস্যা হযে গেল। ঘবে এত টাকা নেই। এখানে অল্প কিছু আছে। সরি, আমি ভেবেছিলাম...কুদ্দুস তুমি চা-টা কিছু খেযেছ?

'জ্বি না স্যার।'

'বস চা খেয়ে যাও। শুধু চা — একা থাকি। ঘরে নাশতাব কোনো ব্যবস্থা নেই। বেস্টুরেন্টে নাশতা খাই। বরং তুমি এক কাজ কর — চল আমার সঙ্গে চা-নাশতা খাও।'

'লাগবে না স্যার। আমি যাই।'

'মনটাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা কর। জীবন-মৃত্যুর উপর আমাদের কোনো ইয়ে নেই। মানে গডস উইল।'

'আমি স্যার যাই। দেরি হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা যাও।'

কুদ্দুস চলে যাবার পর মনজুর চায়ের পানি চড়াল। পানি না চড়ালেও হত। চিনি শেষ হয়ে গেছে, চিনির কৌটায় যা অবশিষ্ট ছিল তা কাল রাতে সে খেয়ে নিয়েছে। আর কোনো কৌটায় চিনি আছে কি? সেদিন খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা কৌটা বের হল, যার গায়ে লেখা 'ইমার্জেন্সি চা পাতা' — মীরার কাণ্ড। সে চাযেব কৌটার বাইরেও একটা ইমার্জেন্সি কৌটা রেখেছে। এই কৌটায় সে নিশ্চয় কখনো হাত দেয় না। সে রকম ইমার্জেন্সি চিনি লেখা কোনো কৌটা কি আছে? চিনিব কৌটা পাওয়া গেল না তবে একটা কৌটা পাওয়া গেল যার গায়ে লেখা —'সমুদ্র'। কৌটার গায়ে সমুদ্র লেখাব মানে কী?

মনজুর রাতে ক্ষিধে নিয়ে ঘুমিয়েছিল। সেই ক্ষিধে জানান দিচ্ছে। আরেক চামচ বিস্‌কিটেব গুঁড়া কি খেয়ে নেবে? কুদ্দুসকে টাকা দিতে না পাবাব অস্বস্তি কিছুতেই যাচ্ছে না। কিছু সান্ত্বনার কথা তো তাকে অবশ্যই বলা উচিত ছিল। এইসব পবিস্থিতিতে কী বলতে হয বা বলতে হয না তাব উপব বই-টই থাকা উচিত ছিল। বিদেশে নিশ্চযই আছে। —

"মৃত্যুশোকে কাতব মানুষকে সান্ত্বনা দেবাব
একশ একটি উপায"

আধুনিক মানুষদেব জন্যে এ জাতীয বই খুবই প্রযোজন। অপ্রযোজনীয় বই-এ বাজার ভর্তি, প্রযোজনীয বই খুঁজলে পাওযা যায না। কথা বলাব আর্টের উপবও একটা বই থাকা দবকাব। কেউ কেউ এত সুন্দব কবে কথা বলে, কেউ কথাই বলতে পাবে না। যখন মজাব কোনো গল্প বলে তখন ইচ্ছা করে একটা চড় বসিযে দিতে।

বর্তমানে সময়টা হল কথা-নির্ভব। অথচ সেই কথাই লোকজন গুছিযে বলতে পাবছে না। কথা বলাব উপব বিশ্ববিদ্যালয পর্যাযে একটা কোর্স থাকলে ভালো হত। ইনস্ট্রাকটাবদেব কোনো ডিগ্রি থাকতে হবে না তবে কথা বলাব ব্যাপারে তাদেব হতে হবে এক এক জন এক্সপার্ট। যেমন মীবা। মনজুরেব ধাবণা, মীবার মতো গুছিয়ে এবং সুন্দর কবে কোনো মেয়ে কথা বলতে পারে না। প্রথম দিনে খানিকক্ষণ কথা বলাব পর মীরা বলল, 'আপনাব নামেব প্রথম অক্ষব এবং শেষ অক্ষব দিযে আমাব নাম এটা কি আপনি লক্ষ কবেছেন?' মনজুব বিস্মিত হযে বলল, 'এখন লক্ষ করলাম। আগে করি নি।'

মীবা হাসতে হাসতে বলল, 'নামেব এই মিল কি প্রকাশ কবে বলতে পারেন?'

'জ্বি না।'

'চিন্তা করে দেখুন তো বেব করতে পাবেন কিনা। যদি বেব কবতে পাবেন তাহলে টেলিফোন কবে জানাবেন। যদি বেব কবতে না পাবেন তা হলে টেলিফোন কববেন না।'

মনজুব তৃতীয দিনে টেলিফোন কবল। সে কে, তাব কি নাম কিছুই বলতে হল না। হ্যালো বলতেই মীরা বলল, 'ও আপনি? রহস্য উদ্ধার করে ফেলেছেন? জানতাম আপনি পাববেন।'

মনজুর কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'জ্বি না পারি নি।'

'পারেন নি তাহলে টেলিফোন করলেন যে?'

'আপনার কাছে থেকে জানার জন্যে।'

'আচ্ছা আপনাকে আরো সাতদিন সময় দিচ্ছি। সাতদিন পরেও যদি না পারেন তাহলে বলে দেব। রাখি, কেমন?'

মনজুর অনেক কিছু ভাবল — নামের মিল কী বুঝাচ্ছে? চার অক্ষরের দুটি মিলে যাচ্ছে। প্রথমটি এবং শেষটি। তাতে কী হয়? আদৌ কি কিছু হয়?

সাত দিন পর মীরার সঙ্গে আবার কথা হল। সে হাসতে হাসতে বলল, 'এখনো পারেন নি? এত সহজ আর আপনি পারছেন না।'

'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নিম্ন পর্যাযের। আমার মেজ মামার ধারণা আমি গাধা-মানব।'

'তাই তো দেখছি।'

'মিলটা কী দয়া করে যদি বলেন...'

মীরা হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিক করে বলুন তো আপনার আগ্রহ কি মিল জানার জন্যে, না আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে?'

মনজুর গুছিয়ে কথা বলতে পারলেও তৎক্ষণাৎ তার মাথায় হঠাৎ করে কোনো জবাব এল না। মীরা বলল, 'হ্যালো, কথা বলছেন না কেন? আপনি অ্যামবারাসড্ বোধ করছেন?'

'জ্বি না।'

'মনে হচ্ছে আপনি অ্যামবারাসড্। সরি, আমি কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না। রাখি, কেমন? পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

মনজুর দুধ চিনিবিহীন চা নিযে বিছানায বসল। আশ্চর্য, টেলিফোনে কুঁ-কুঁ-পিঁড়িং জাতীয় শব্দ হচ্ছে! ব্যাপারটা কী? মনজুর অবাক হয়ে তাকাল। গত দুমাস ধরে টেলিফোন ডেড। বিলের টাকা জমা না দেয়ায় লাইন সম্ভবত কেটে দিয়েছে। টেলিফোন অফিসে একবার যাওয়া দরকার। যেতে ইচ্ছা করছে না। টেলিফোন ছাড়া তাব খুব যে অসুবিধা হচ্ছে তাও না। বরং এক রকম আরামই অঁনুভব করছে।

টেলিফোনে আবার কুঁ-কুঁ শব্দ। আপনা আপনি ঠিক হযে গেল নাকি! এ দেশে সবই সম্ভব। যে নিয়মিত বিল দিয়ে যায় তার লাইন কাটা যায আব তার মতো ডিফল্টাবদেব কাটা লাইন আপনাআপনি মেরামত হযে যায়।

মনজুর রিসিভার তুলে কোমল গলায বলল, 'হ্যালো। হ্যালো।'

ওপাশ থেকে আট ন বছর বযসী বালকের গলা শোনা গেল।

'হ্যালো বড় চাচু?'

'আমি বড় চাচু না খোকা — তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভালো, আপনি কে?'

'আমার নাম মনজুর।'

'মনজুর চাচু?'

'তাও বলতে পার। তুমি স্কুলে যাও নি?'

'উহুঁ।'

'কেন বল তো?'

'আমার জ্বর।'

'বল কি, একটু আগে তো বললে — তুমি ভালো!

ছেলেটা হকচকিয়ে গেল। ভুল ধরিয়ে দিলে ছোটরা অসম্ভব লজ্জা পায়।

'নাম কী তোমার খোকা?'

'ইমরুল।'

'ইমরুল? সর্বনাশ, তুমি যখন একটু বড় হবে সবাই তোমাকে কি বলে ক্ষ্যাপাবে জান? সবাই বলবে — ভিমরুল।'

'ভিমরুল কী?'

'ভিমরুল কী বলার আগেই টেলিফোন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একেবারেই ঠাণ্ডা। শোঁ-শোঁ-পি-পি কোনো আওয়াজই নেই। টেলিফোনটা ঠিক থাকলে মীরাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা যেত — কৌটার গায়ে সমুদ্র লেখা কেন? উত্তরে মীরা তার স্বভাব মতো বলতো — 'তুমি আন্দাজ কর তো কেন?'

'আমি পারছি না।'

'তবু চেষ্টা কর। তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম।'

আধুনিক জগতের সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে আছে — রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন...অষ্টম আশ্চর্য (মনজুরের মতে) তার সঙ্গে মীরার বিয়ে। যাকে বলে হুলস্থূল বিবাহ। মীরার বাবা, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার মনসুর উদ্দিন এক হাজার লোককে দাওয়াত করেছিলেন। দাওয়াতী লোকজনদের মধ্যে তিন জন ছিলেন মন্ত্রী। ফ্ল্যাগ দেয়া গাড়ি করে এসেছিলেন। তাঁরা কিছুই খেলেন না। তাঁদের মধ্যে মাত্র এক জন মনজুরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'হ্যালো ইয়াং ম্যান। বেস্ট অব ইওর লাক।'

বাসর হল মীরার বড় ভাইয়ের বাসায়। বিছানার উপর বেলি ফুলের যে চাদর বিছানো তার দামই নাকি দুহাজার টাকা।

মীরা বাসর রাতে প্রথম যে কথাটি বলল, তা হচ্ছে—'এই বিছানার বিশেষত্ব কি বল তো?'

মনজুর কিছু বলতে পারল না।

'কি — বলতে পারলে না? এটা হচ্ছে ওয়াটার বেড। বাংলায় জল-তোশক বলতে পার। এখানে ঘুমালে মনে হবে পানির মধ্যে ঘুমিয়ে আছ।'

'বল কী!'

'ভাইয়া আমেরিকা থেকে আনিয়েছে। সে খুবই শৌখিন। বেচারা নিজে অবশ্যি এই বিছানায় ঘুমাতে পারে না। ওর পিঠে ব্যথা। ডাক্তার নরম বিছানায় শোয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বেচারা ঘুমায় মেঝেতে পাটি পেতে। বাধ্য হয়ে ভাবীকেও তাই করতে হয়। একে বলে পোয়েটিক জাসটিস। আচ্ছা, তুমি এমন মুখ ভোঁতা করে বসে আছ কেন? কথা বল।'

'কী কথা বলব?'

'কী কথা বলবে সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে? ইন্টারেস্টিং কোনো কথা বল। বাসর রাতের কথা বাকি জীবনে অসংখ্যবার মনে করা হবে — কাজেই কথাগুলি খুব সুন্দর হওয়া উচিত।'

মনজুর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমাদের বাথরুমটা কোন দিকে?'

মীরা হেসে ফেলে বলল, 'তোমার প্রথম কথা আমার কাছে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কথাটা কী?'

'ফুলের গন্ধে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ফুলগুলোকে অন্য কোথাও রাখা যায় না?'

'না। আর কিছু বলবে?'

'ইন্টারেস্টিং আর কিছু তো মনে আসছে না। তুমি বল, আমি শুনি।' বলতে বলতে মনজুর হাই তুলল।

মীরা বলল, 'তোমার ঘুম পাচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ। গত দুই রাত এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। আমার ছোট্ট বাসা আত্মীয়স্বজনে গিজগিজ করছে — শোব কি, দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই।'

'খুব বেশি ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়। বাসর রাতে যে বকবক করতেই হবে এমন কথা নেই।'

'মশারি ফেলবে না?'

'দরজা-জানালায় নেট লাগানো — মশা আসবে না, তাছাড়া ঘরে ফুল থাকলে মশা আসে না। ফুলের গন্ধ মশারা সহ্য করতে পারে না।'

'তাই নাকি? জানতাম না তো!'

'ঘুম পেলে শুয়ে পড়।'

মনজুর শুয়ে পড়ল। এক ঘুমে রাত কাবার। মনজুরের ধারণা, সবচে' আরামের ঘুম সে ঘুমিয়েছে বাসর রাতে।

কাফে লবঙ্গে চা খেতে খেতে মনজুর আজ সারাদিনে কি কি করবে ঠিক করে ফেলল। তার ভিজিটিং কার্ডের উল্টো পিঠে এক দুই করে লিখল,

(১) অফিস, সকাল দশটা।

(২) বড়মামার সঙ্গে কথাবার্তা এবং তার অফিসে দুপুরের খাওয়া।

(৩) খালাকে চিঠি লেখা এবং নিজ হাতে পোস্ট করা।

(৪) ইদরিসের সঙ্গে ঝগড়া। [সন্ধ্যায়, তাকে তার বাসায় ধরতে হবে।]

(৫) মীরার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা [রাত দশটার পর।]

এই জাতীয় একটা লিস্ট মনজুর প্রতিদিন ভোরেই করে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে — লিস্ট অনুযায়ী কোনো কাজই শেষ পর্যন্ত করা হয় না। তবু লিস্টটা করলে মনে এক ধরনের শান্তি পাওয়া যায়।

লিস্টের পাঁচ নম্বরে মীরার সঙ্গে কথা বলা। রাত দশটার পরে, তাকে সব সময় পাওয়া যায় না। এগারটার পর হলে মোটামুটি নিশ্চিত যে পাওয়া যাবে। শীতের রাতে এগারটার পর টেলিফোন জোগাড় করাই এক সমস্যা। সব দোকানপাট বন্ধ। বাড়িওয়ালার বাসা থেকে করা যায় তবে তার জন্যে বাড়ির ভাড়া ক্লিয়ার করা দরকার। আজ রাতে বাড়িভাড়া নিয়ে যদি যাওয়া যায় তাহলে উঠে আসার সময় হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলা যেতে পারে, ভাই সাহেব! টেলিফোনটা ঠিক আছে?

উনার টেলিফোন অবশ্যি বেশিরভাগ সময়ই খারাপ থাকে। নিজেই খারাপ করে রাখে কিনা কে জানে!

তারচে' এখন চলে গেলে কেমন হয়? মীরাকে ভোরবেলার দিকে সব সময় পাওয়া যায়। মনজুর ভিজিটিং কার্ড বের করে পাঁচ নম্বর আইটেমে টিক চিহ্ন দিল।

মীরা সহজ স্বরে বলল, 'তুমি এত ভোরে!'

মনজুর বলল, 'ভোর কোথায়। আটটা চল্লিশ বাজে।'

'কোনো কাজে এসেছ?'

'ভাবলাম সেপারেশনের টার্মস এন্ড কন্ডিশনস্‌গুলো নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করি।'

মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'টার্মস এন্ড কন্ডিশনস্‌ মানে? ঠাট্টা করছ নাকি? তোমার কাছে আমি কি কিছু চাচ্ছি? তোমার এমন কোনো রাজত্ব নেই অর্ধেক আমাকে দিয়ে দিবে।'

'তা ঠিক তবু আইনের কিছু ব্যাপারস্যাপার আছে।'

'তার জন্যে তো গত মাসের সাতাশ তারিখে ভাইযা সুপ্রিম কোর্টেব লইযার এম. জামানকে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলেন। তোমার আসার কথা ছিল তুমি আস নি।'

'সেটা আমি এক্সপ্লেইন করেছি। হঠাৎ জরুবি কাজ পড়ে গেল।'

'কী তোমার অফিস আর কী তাব জরুবি কাজ! একটা কথা পরিষ্কার কবে বল তো — সেপারেশনে তোমার কি ইচ্ছা নেই?'

'আরে কী বলে! ইচ্ছা থাকবে না কেন? দু জন মিলেই তো ঠিক করলাম। চা খাওযাতে পাব?'

মীবা চা আনতে উঠে গেল। তাকে আজ অপূর্ব দেখাচ্ছে। বিয়ের সময এতটা সুন্দব ছিল না। আলাদা হবাব পব থেকে সুন্দর হতে শুরু কবেছে। খানিকটা বোগাও হযেছে। রোগার জন্যেই লম্বা লম্বা লাগছে নাকি? চেহারায চাপা আনন্দের আভা। পরিষ্কাব বোঝা যাচ্ছে মীরা এখন সুখে আছে। সমস্ত চেহাবায মাযাবতী মাযাবতী ভাব। নীল শাড়িব জন্যেও হতে পারে। ধবধবে সাদা ব্লাউজের সঙ্গে নীল শাড়ি পরলে মেযেদেব মধ্যে একটা আকাশ আকাশ ভাব চলে আসে। শাড়িটা আকাশ, ব্লাউজ হল পূর্ণিমাব চাঁদ। উপমা নিখুঁত হল না। বাতের আকাশ নীল হয না। হয ঘন কৃষ্ণবর্ণ।

'নাও চা নাও। চাযেব সঙ্গে আব কিছু দেব?'

'না।'

'নাশতা খেযে এসেছ?'

'হুঁ।'

'কোথায় খেলে? তোমার সেই কাফে লবঙ্গ?'

'হুঁ।'

'এক অক্ষরে জবাব দিচ্ছ কেন? আমবা আলাদা থাকছি বলে কথা বলা যাবে না তা তো না। কী কথা ছিল? সেপারেশনেব পরে আমাদের যদি পথেঘাটে দেখা হয় তাহলে আমরা সিভিলাইজড্‌ মানুষের মতো বিহেভ করব।'

'তা অবশ্যই করব।'

'এক ধরনের সাধারণ বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে থাকবে। তুমি চা খাচ্ছ না কেন? চিনি বেশি হয়েছে?'

'না। চিনি ঠিক আছে।'

'তোমাকে অসুস্থ অসুস্থ লাগছে। তোমার শরীরে অসুখ অসুখ গন্ধ।'

মনজুর কিছু না বলে পকেট থেকে সিগারেট বের করল। সিগারেটের কড়া ধোঁযায অসুখ অসুখ গন্ধটা যদি তাড়ানো যায়। মীরার ঘ্রাণশক্তি কুকুরের চেয়েও প্রবল। যখন অসুখ অসুখ গন্ধ বলছে তখন বুঝতে হবে ঠিকই বলছে।

'কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? অসুখ নাকি?'

'আরে না। অসুখ। বিনা পেস্টে দাঁত মেজেছি — গন্ধ যা পাচ্ছ আমার মনে হয় মুখ থেকে পাচ্ছ।'

'মুখের গন্ধ আমি চিনি। তোমার গা থেকে জ্বর জ্বর গন্ধ আসছে। সিগারেটও মনে হয় প্রচুর খাচ্ছ।'

'হেভি টেনশানে থাকি। সিগারেটের ধোঁয়ার উপর দিয়ে টেনশানটা পার করার চেষ্টা করি।'

'কীসের এত টেনশান?'

'আছে অনেক। আচ্ছা তোমাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করি, ধর একজন লোকের খুব নিকট কোনো আত্মীয় মারা গেছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। কী বলে সান্ত্বনা দিবে?'

'কে মারা গেছে?'

'কে মারা গেছে সেটা জরুরি না। কী কথা বললে সে সান্ত্বনা পাবে সেটা বল।'

'কোনো কথাতেই সে সান্ত্বনা পাবে না। তুমি যদি তার গায়ে হাত দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাক তাহলে খানিকটা সান্ত্বনা পেতে পারে।'

মনজুর উঠে দাঁড়াল। মীরা সঙ্গে সঙ্গে উঠল না। বসে বইল। মনজুব বলল, 'আজ উঠি।'

মীরা বলল, 'তুমি না টার্মস এন্ড কন্ডিশনস্ নিযে আলাপ কবতে এসেছিলে? এখন চলে যাচ্ছ যে?'

'আরেকদিন আলাপ করব। অফিসের সময় হয়ে গেল।'

'এ মাসের কুড়ি তারিখে কি তুমি আসতে পারবে? কুড়ি তারিখ বুধবাব। সন্ধ্যা সাতটার পর। পারবে আসতে?'

'পারব।'

'তাহলে ঐ দিন জামান সাহেবকে আসতে বলব।'

'জামান সাহেবটা কে?'

'এর মধ্যে ভুলে গেলে? লইযার।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, অবশ্যই আসব। অফিসে গিযেই ডাযেরিতে লিখে রাখব। এবার আর ভুল হবে না। তবে সেইফ গাইড থাকার জন্য তুমি বুধবার সকালেই একটা টেলিফোন করে দিও। পারবে না? টেলিফোন নাম্বার আছে না?'

'আছে।'

মনজুর বসার ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজার চৌকাঠে একটা ধাক্কা খেল। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার — এ বাড়ির বসার ঘর থেকে বেরুবার সময় প্রতিবার চৌকাঠে ধাক্কা খায়। এর কারণটা কি কে জানে? এই ঘর তাকে পছন্দ করে না — নাকি দবজা তাকে পছন্দ করে না?

এই জগতে জড় বস্তুর কি পছন্দ-অপছন্দ আছে?

রাস্তায় নেমে মনজুরের মনে হল, আসল জিনিসটাই মীরাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। কৌটার গায়ে 'সমুদ্র' লেখা কেন? আবার কি ফিরে যাবে? না — থাক।

দিলকুশা এলাকায় মনজুরের অফিস। এগার তলার ছটি কামরা। ফ্লোর স্পেস আট হাজার স্কয়ার ফিট। অফিসের নাম থ্রি-পি কনস্ট্রাকশনস্। কোম্পানির মালিক নুরুল আফসার মনজুরের স্কুলজীবনের বন্ধু। স্কুলে নুরুল আফসারের নাম ছিল — মিডা

কাচামরিচ। ছেলেবেলাতেই লক্ষ করা গেছে নুরুল আফসার চট করে রেগে যায় তবে রেগে গেলেও অতি মিষ্টি ব্যবহার করে। মিডা কাচামরিচ নামকরণের এই হল রহস্য।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর মনজুর ভর্তি হল জগন্নাথ কলেজে। নুরুল আফসার চলে গেল আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ক্রিয়েটিভ লিটারেচর পড়তে। সায়েন্স পড়তে তার নাকি আর ভালো লাগছে না। ক্রিয়েটিভ লিটারেচরের ক্লাসগুলি তার খুবই পছন্দ হল। প্রথম সেমিস্টারে খুব খেটেখুটে সে একটা অ্যাসাইনমেন্টও জমা দিল। অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে তিন হাজার শব্দে সেইন্ট জোসেফ সেমিটিযারির একটি বর্ণনা দিতে হবে।

অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেযার দিনপাঁচেক পর কোর্স কো-অর্ডিনেটর প্রফেসব ক্লার্ক ব্লেইস তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন — 'তোমার রচনা খুব আগ্রহ নিযে পড়লাম। It is interesting'.

'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'ইন এ ওযে হযেছে। তুমি নিখুঁত বর্ণনা দিযেছ। মোট কটি কবব আছে লিখেছ। কে কবে মারা গেছে তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস করেছ। কববখানা দৈর্ঘ্যে--প্রস্থে কত তা দিযেছ যাকে বলা যায পারফেক্ট ফটোগ্রাফিক ডেসক্রিপশন।'

'থ্যাংক ইউ।'

'কিন্তু সমস্যা কি জান — এই বচনা প্রমাণ কবেছে তোমাব কোনো ক্রিযেটিভিটি নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দেব অন্য কিছু পড়তে। যেমন ধর ইনজিনিয়াবিং।'

'তোমাব ধারণা ইনজিনিয়াবদের ক্রিযেটিভিটি প্রযোজন নেই?'

'অবশ্যই আছে। তাদেব যতটুকু ক্রিযেটিভিটি প্রযোজন তোমার তা আছে।'

নুরুল আফসাব ছ বছর আমেরিকায কাটিযে সিভিল ইনজিনিযারিং-এ ডিগ্রি, আমেরিকান স্ত্রী পলিন এবং দুই যমজ কন্যা পেত্রিসিয়া ও পেরিনিযাকে নিযে দেশে ফিবল। চাকবির চেষ্টা কবল বেশ কিছুদিন — লাভ হল না। শেষ চেষ্টা হিসেবে খুলল কনসট্রাকশন কোম্পানি। স্ত্রী এবং দুই কন্যাব আদ্যক্ষব নিযে কোম্পানিব নাম হল Three P.

মনজুর জন্মলগ্ন থেকেই এই কোম্পানিব সঙ্গে আছে। নুরুল আফসার শুরুতে বলেছিল, 'বেতন দিতে পারব না — পেটেভাতে থাকবি, বাজি থাকলে আয়। যদি কোম্পানি দাঁড়িযে যায তুই তোব শেযাব পাবি। আমি তোকে ঠকাব না বিশ্বাস কর ঠকাব না।'

কোম্পানি বড় হযেছে। ফুলে-ফেঁপে একাকাব। গত বছব দু কোটি টাকাব ব্যবসা করেছে — এ বছর আরো করবে। অফিস শুরু হযেছিল তিন জনকে নিযে, আজ সেখানে একশ এগারজন কর্মচাবী। মনজুরের হাতে নির্দিষ্ট কোনো দাযিত্ব নেই। চিঠিপত্রের যোগাযোগের ব্যাপারটা সে দেখে। পি. আর. ও. বলা যেতে পাবে। প্রতি মাসে তাব একাউন্টে আট হাজার টাকা জমা হয। তার চাকরিব শর্ত কি, দায়িত্ব কি এই নিযে নুরুল আফসারের সঙ্গে তার কখনো কথা হয না।

অফিসঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে মনজুরের ঘর। কামরাটা ছোট তবে মেঝেতে কার্পেট বিছানো। দেযালে পালতোলা নৌকার একটি পেইন্টিং আছে। ঘরের এক প্রান্তে ডিভানের মতো আছে। ডিভানের পাশেই বুক শেলফে বেশ কিছু বাংলা বই যাব বেশিরভাগই কবিতা। তার কোনো কাব্যপ্রীতি নেই। কবিতার বইগুলো মীরা কিনে দিয়েছে। ডিভানে শুয়ে আজকাল সে মাঝে মাঝে বইগুলোর পাতা উল্টায় এবং ভ্রূ কুঁচকে ভাবে — লোকজন কি সত্যি আগ্রহ করে কবিতা পড়ে? যদি পড়ে তাহলে কেন পড়ে?

মনজুরের ঘরে গত পনের দিন ধরে বসছে জাহানারা। জাহানারা টাইপিস্ট হিসেবে তিন মাস আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে। বসার কোনো জায়গা নেই। একেক সময় একেক জায়গায় বসছে। বড় সাহেব নুরুল আফসারের পাশেই হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দিয়ে নতুন ঘর তার জন্য তৈরি হবার কথা। যতদিন হচ্ছে না, ততদিন জাহানারা মনজুরের ঘরে বসবে এই ঠিক হয়েছে। ব্যবস্থাটা মনজুরের পছন্দ হয় নি। একটি অল্পবয়স্কা কুমারী মেয়ে ঘরে থাকলে এক ধরনের অস্বস্তি লেগেই থাকে। সহজ হওয়া যায় না। ডিভানে গা এলিয়ে কবিতার বইয়ের পাতা উল্টানোও সম্ভব না। তারচেয়েও বড় কথা মেয়েটা সিগারেটের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। মুখে কিছুই বলে না তবে মনজুর লক্ষ করেছে সিগারেট ধরালেই জাহানারা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

মনজুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'কী খবর জাহানারা?'

'জ্বি স্যার খবর ভালো।'

'মুখ এত গম্ভীর কেন?'

জাহানারা হাসল। সে এখনো দাঁড়িয়ে। বসতে না বলা পর্যন্ত সে বসবে না।

'বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার ঘর আজ তৈরি হয়ে যাবার কথা না?'

'ঘর তৈরি হয়েছে স্যার।'

'তাহলে আর এখানে কেন, নতুন ঘরে যাও। গৃহপ্রবেশ হয়ে যাক।'

'আপনাকে বলে তারপর যাব, এই জন্যে বসে আছি।'

'ভেরি গুড। বড় সাহেব কি এসেছেন নাকি?'

'জ্বি না স্যার। উনি আজ আসবেন না। চিটাগাং যাবেন।'

জাহানারা হ্যান্ডব্যাগ খুলে মুখবন্ধ খাম বের করল। নিচু গলায় বলল, 'স্যাব আপনাব টাকাটা।' বলতে বলতে জাহানারার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। মনজুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল — মেয়েটা অতিরিক্ত রকমের লাজুক। এই ধরনের মেয়েদের কপালে দুঃখ আছে। এবা নিজেরা সমস্যা তৈরি করে এবং অন্যের তৈরী সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে।

টাকা ফেরত দেয়ার ব্যাপারটি এত দ্রুত করার দরকার ছিল না। নিশ্চযই নানান ঝামেলা করে তাকে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। মনজুর বলল, 'তোমাব এত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই, তুমি আরো পরে দিও। আর পুরো টাকাটা একসঙ্গে দেবারও দরকার নেই। তুমি মাসে মাসে কিছু কিছু কবে দিও।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'আর শোন, মাঝে মাঝে আমাদের সবাইকেই টাকাপয়সা ধার করতে হয়। এত লজ্জা পাওয়ার তো এর মধ্যে কিছু নেই। আমাদের যে বড় সাহেব, তিনিও ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ধার নিয়েছেন।'

জাহানারা হেসে ফেলল।

মনজুর বলল, 'তুমি একটা কাজ করতে পারবে?'

'অবশ্যই পারব। কী কাজ স্যার?'

'আমি এই মাসের বেতন তুলি নি। একটা চেক দিচ্ছি, ক্যাশিয়ার সাহেবকে বল ভাঙিয়ে দিতে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'আর বরুণ বাবুকে বল, আমাদের অফিসের একজন পিওন আছে — আব্দুল কুদ্দুস নাম, জেনারেল ফাইল দেখে তার ঠিকানাটা বের করতে। ও আজ সকালে কিছু টাকার জন্যে এসেছিল। দিতে পারি নি। ওর একটা বোন মারা গেছে।'

জাহানারা চলে গেল।

মনজুরের টেবিলে কোনো ফাইল নেই। অর্থাৎ করার কিছুই নেই। মনজুর দুমাস ধরেই লক্ষ করছে তার টেবিলে কোনো ফাইল আসছে না। বড় সাহেব কি তার টেবিলে ফাইল না পাঠানোর কোনো নির্দেশ দিয়েছেন? এমন না যে অফিসে কোনো কাজকর্ম নেই। বরং উল্টো। কাজকর্মের চাপ অনেক বেশি। শুধু তার টেবিলেই কিছু নেই। এটা নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার, কিন্তু নিজ থেকে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। শরীরে এক ধরনের আলস্য এসে গেছে। আগ বাড়িয়ে কিছু করতে ইচ্ছা করে না। যা হবার হবে এরকম একটা ভাব চলে এসেছে এবং তা এসেছে খুব সম্ভব মীরার কারণে। মীরা চলে না গেলে হয়তো বা এ ধরনের আলস্য আসত না। মনজুর মানিব্যাগ থেকে ভিজিটিং কার্ডটা বের করল। আজ দিনে করণীয় কাজের পাঁচটির মধ্যে দুটি করা হয়ে গেছে। অবশ্যি এর মধ্যে আরেকটি যুক্ত হয়েছে — কুদ্দুসকে টাকা দেয়া। কাউকে দিয়ে টাকাটা পাঠাতে হবে; নাকি নিজেই চলে যাবে ?

কুদ্দুসের গায়ে হাত রেখে কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসবে? সন্ধ্যার পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আপাতত তিন নম্বর আইটেমটির ব্যবস্থা করা যাক। তিন নম্বর আইটেম হচ্ছে — খালাকে চিঠি লেখা এবং নিজ হাতে পোস্ট করা (যেহেতু আগের দুটি চিঠি পান নি।)। মনজুর কাগজ–কলম নিয়ে বসল। একটা দীর্ঘ চিঠি লেখার পরিকল্পনা নিয়ে বসা। হবে অবশ্য উল্টোটা — ছোট্ট চিঠি লেখা হবে। কয়েক লাইন লেখার পরই মনে হবে — আর কিছু লেখার নেই।

শ্রদ্ধেয়া খালা,

আমার সালাম জান(আমি নিয়মিত আপনার চিঠি পাচ্ছি। মনে হয় আপনি আমার পাচ্ছেন না।

আমি ভালোই আছি বলা চলে। তবে যে কিডনিটি এখনো অবশিষ্ট আছে তাতে বোধহয় কিছু সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার মনগড়াও হতে পারে। যেহেতু একটিমাত্র কিডনি অবশিষ্ট সেহেতু কিছু হলেই মনে হয় কিডনি বুঝি গেল। আপনি শুধু শুধু চিন্তা করবেন না। আপনার আবার অকারণ চিন্তা করার অভ্যাস। খালুজানকে আমার সালাম দিবেন।

ইতি আপনার মনজু।

চিঠি ছোট হবে আগেই বোঝা গিয়েছিল, এতটা ছোট হবে তা বোঝা যায় নি। পুরো পাতাটা খালি খালি লাগছে। পুনশ্চ দিয়ে আরো কয়েকটা লাইন না ঢুকালেই না। কী লেখা যায় সেটাই সমস্যা।

পুনশ্চ ঃ ঢাকায় এবার অসম্ভব শীত পড়েছে। আপনাদের এদিকে শীত কেমন? নীতু কেমন আছে? তার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?

নীতুকে একটা আলাদা চিঠি দেয়া উচিত ছিল। বেচারা প্রতি সপ্তাহে একটা চিঠি দেয় — কখনো সেইসব চিঠির জবাব দেয়া হয় না। তাতে নীতুর উৎসাহে কখনো ভাটা পড়ে না। শিশুদের মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে। তারা প্রতিদান আশা করে কিছু করে না। কখনো না। বড়রাই সবসময় প্রতিদান চায়।

মনজুরের ঘরে টেলিফোন বাজছে। এই টেলিফোন সেটে কোনো গণ্ডগোল আছে। তীক্ষ্ণ শব্দ হয়। মাথা ধরে যায়।

'হ্যালো।'

'মনজুর কেমন আছিস তুই?'

মনজুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বড় সাহেবের গলা। একই সঙ্গে তার ছেলেবেলার বন্ধু এবং 'বস'। টেলিফোনে নুরুল আফসারের গলা — ইমরুল নামের ঐ ছেলেটির গলার মতোই লাগছে। কেমন যেন অভিমান মেশা।

'কি রে কথা বলছিস না কেন? কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'তোর বাসার টেলিফোন নষ্ট নাকি? কয়েকবার টেলিফোন করেছিলাম, ভোঁ-ভোঁ শব্দ হয়।'

'টেলিফোনটা ডেড হয়ে আছে।'

'ঠিক করা। চারপাশে মৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে বাস করার কোনো মানে হয়? মানুষ মরে গেলে কিছু করা যায় না — যন্ত্রপাতি মরে গেলে তাদের বাঁচানো যায়।'

'এইকথা বলার জন্যেই টেলিফোন করেছিস — না আরো কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ বলব। মীরা নাকি তোকে ছেড়ে চলে গেছে?'

'হুঁ।'

'ব্যাপারটা ঘটল কবে?'

'এই ধর দিন বিশেক।'

'আমি তো কিছুই জানতাম না। আজ জালাল সাহেব আমাকে বললেন — মীরাব বড় ভাই। চিনতে পারছিস?'

'হ্যাঁ পারছি।'

'তাঁকে খুব খুশি দেখলাম। তাঁর সঙ্গে তোর কোনো গণ্ডগোল ছিল নাকি?'

'না।'

'এত চমৎকার একটা মেয়ে ধরে রাখতে পারলি না? তুই তো বিবাট গাধা।'

'মীরাও আমাকে ধরে রাখতে পারল না তাকেও কি মহিলা গাধা বলা যায় না?'

'তোর সঙ্গে পরে কথা বলব। গাড়ি হর্ন দিচ্ছে।'

নুরুল আফসার লাইন কেটে দিলেন।

মীরার সঙ্গে মনজুরের পবিচয় নুরুল আফসাবের মাধ্যমে। মীবাব বাবা মনসুবউদ্দিন, নুরুল আফসারের আপন ফুপা। সেই মনসুরউদ্দিনের কাছে মনজুর একটা চিঠি নিযে গিয়েছিল।

ক্ষমতাবান মানুষরা সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থীকে সাক্ষাৎ দেন না। তিনি বলে পাঠালেন — অপেক্ষা করতে। সে ঘণ্টাখানিক বারান্দায় রাখা বেতেব চেয়ারে বসে বইল। তারপর বিরক্ত হয়ে বাড়ির সামনের বাগানে হাঁটতে লাগল। মনসুরউদ্দিন সাহেব এই সময বের হয়ে এলেন এবং কঠিন গলায় বললেন — 'এই যে ছেলে, তুমি কী মনে কবে আমাব ফ্লাওয়ার বেডের উপর হাঁটছ? কটা গাছ তুমি নষ্ট করেছ জান? ফ্লাওয়ার বেড কাকে বলে সেটা জান? তুমি কোথাকার মূর্খ?'

মনজুর পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেল। একী সমস্যা!

'কথা বলছ না কেন? তুমি কোথাকার মূর্খ সেটা জানতে চাই। — Speak out loud.

মীরা হৈচৈ শুনে ঘর থেকে বের হয়ে হাসিমুখে মনজুরকে বলল, 'আপনি কাইন্ডলি আমার সঙ্গে আসুন তো। প্লিজ আসুন। প্লিজ।'

মীরা তাকে বারান্দার এক কোনায় নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বাবার ব্যবহারে আমি খুবই দুঃখিত, খুবই লজ্জিত। বাবার মাথা পুরোপুরি ঠিক না। বাবাকে প্রথম দেখছেন বলে

এ রকম মনে হচ্ছে। আপনাকে বাবা যেভাবে ধমক দিলেন ফুলের গাছগুলোকেও তিনি ঠিক সেইভাবে ধমক দেন। মাঝে মাঝে কিছু কিছু গাছকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয। আশা করি বাবার মানসিকতা কিছুটা বুঝতে পারছেন। আপনি এখানে চুপ করে বসুন। আমি চা নিয়ে আসি। বাবা যদি কিছু বলেন — কোনো উত্তর দেবেন না। তবে আমার মনে হয় না তিনি কিছু বলবেন। একবার রেগে যাবার পর ঘণ্টা দু'এক তিনি খুব ভালো থাকেন।'

মীরার কথা দেখা গেল সত্যি। কিছুক্ষণ পরই মনসুরউদ্দিন বারান্দায উঠে এলেন এবং কোমল গলায় মনজুরকে বললেন — 'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না! আপনাব পরিচয়? আপনাকে কি চা-নাশতা কিছু দেয়া হয়েছে?'

কুদ্দুসের বাসা যাত্রাবাড়িতে।

হাফ বিল্ডিং। পাকা মেঝে। উপবে টিন। বাঁশের বেড়া দিযে বাড়ি ঘেরা। বেড়ার আড়াল থেকে কলাগাছেব নধব পাতা উঁকি দিচ্ছে।

মনজুর খানিকটা বিস্ময নিযেই দাঁড়িয়ে আছে। এটা কুদ্দুসের বাড়ি তা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ শ্রীমন্ত চেহারা। বাড়ির ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। সব কেমন ঝিম মেরে আছে। তাই অবশ্যি থাকাব কথা। মৃত্যুর প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে সবাই বেশ দীর্ঘ সমযেব জন্যে চুপ করে যায। আবার কান্নাকাটি শুরু হয দিন দুএক পর।

মনজুব কড়া নাড়তেই বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক বেব হযে এলেন। এই প্রচণ্ড শীতেও তাঁব গাযে পাতলা জামা। তবে গলায মাফলাব আছে। পাযে মোজা। চোখে চশমা। শিক্ষক শিক্ষক চেহারা।

'এটা কুদ্দুসেব বাসা?'

'জ্বি।'

'কুদ্দুস আছে বাসায?'

'না।'

'আমি কুদ্দুসেব জন্যে কিছু টাকা নিযে এসেছিলাম।'

'আমার কাছে দিতে পারেন। আমি তার পিতা। কত টাকা?'

'আটশ' টাকা। কবর দিতে মোট কত খরচ হযেছে?'

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে বললেন, 'কীসের কবর?'

মনজুর হকচকিয়ে গেল।

'সাবিহা নামেব একটা মেযে মারা গেছে না এই বাড়িতে?'

'সাবিহা আমার ছোট মেযেব নাম। সে মারা গেছে দশ বছব আগে। আপনে কে?'

'আমি তেমন কেউ না। নাম বললে চিনবেন না।'

'টাকাটা আমার কাছে দিযে যান। আমি দিয়ে দিব।'

'কুদ্দুসকেই দিতে চাই। আমি অন্য একসময আসব।'

'আমাব কাছে দিতে না চাইলে অপেক্ষা করেন। কুদ্দুস দশটার মধ্যে আসে। চা খান। চায়ের অভ্যাস আছে?'

'আরেক দিন এসে চা খেয়ে যাব।'

মনজুর রাস্তায নেমে এল। তাড়াতাড়ি কোনো একটা রিকশায় উঠে হুড তুলে দিতে হবে। এখন কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে। বুকে ঠাণ্ডা বসে না গেলে হয।

২

ঘুমাবার আগে আয়নায় নিজেকে দেখার যে বাসনা সব তরুণীদের মনেই থাকে সে বাসনা মীরার ভেতরে অনুপস্থিত। ওই কাজটি সে কখনো করে না। চুল বাঁধে হাঁটতে হাঁটতে। সেই সময় সে গুনগুন করে গানও গায়। সে কখনো গান শেখে নি, তবে দু একটা সহজ সুর ভালোই তুলতে পারে।

আজ সে আয়নার সামনে বসে আছে।

বিশাল আয়না। এক ইঞ্চি পুরো বেলজিয়াম গ্লাস। সামনে দাঁড়ালে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায়। মনসুরউদ্দিন, মেয়ের ষোল নম্বর জন্মদিনে এই আয়না তাকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন — 'রোজ এক বার আযনার সামনে দাঁড়াবি এবং নিজের সঙ্গে কথা বলবি।'

মীরা বিস্মিত হয়ে বলেছিল —'কী কথা বলব?'

'নিজেকে প্রশ্ন করবি।'

'নিজেকে প্রশ্ন করার জন্যে আযনা লাগবে কেন?'

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন — 'তোর সঙ্গে কথা বলাই এক যন্ত্রণা। তুই আমাব সামনে থেকে যা।' মীরা হাসতে হাসতে বলল, 'জন্মদিনে তুমি আমাকে ধমক দিযে কথা বলছ। এটা কি বাবা ঠিক হচ্ছে? এখনো সময় আছে। ধমক ফিরিযে নাও।'

'ধমক ফিরিয়ে নেব কীভাবে?'

'মুখে বল ধমক ফিরিযে নিলাম — তাহলেই হল।'

তাকে তাই করতে হল।

মীরা তার জন্মদিনের উপহার এই বিশাল আযনাব সামনে অনেকবার দাঁড়িযেছে কিন্তু কখনো নিজেকে প্রশ্ন করে নি। আযনার ছবিকে প্রশ্ন করার পুরো ব্যাপারটা তাব কাছে সব সময়ই হাস্যকর মনে হয়েছে। আজ অবশ্যি সে একটা প্রশ্ন কবল। নিজের ছবিব দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মীরা দেবী, আপনি কেমন আছেন?'

আয়নার মীরা দেবী সেই প্রশ্নের উত্তরে হেসে ফেলে বলল, 'ভালোই।'

'ভালোর পর ইকার লাগাচ্ছেন কেন? তার মানে কি এই যে আপনি বিশেষ ভালো নেই?'

'আচ্ছা ইকার তুলে দিলাম। আমি ভালো আছি।'

'খুব ভালো?'

'হ্যাঁ খুব ভালো।'

'খুব ভালো থাকলে গান গাচ্ছেন না কেন? আপনার মন খুব ভালো থাকলে আপনি উল্টাপাল্টা সুরে গান গেযে থাকেন। দেখি এখন একটা গান তো?'

মীরা গুনগুন করে গাইল —

> 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিযো না, নিয়ো না
> সরায়ে জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।'

গান দুলাইনের বেশি এগুলো না। কাজের মেয়ে এসে বলল, 'বড় সাব আপনেরে যাইতে বলছে।' মীরা গান বন্ধ করে ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। কযেকদিন থেকেই এই ভয় সে করছিল। না জানি কখন বাবা তাকে ডেকে পাঠান। সে চব্বিশ দিন ধরে এই বাড়িতে আছে। এই চব্বিশ দিনে বাবার সঙ্গে তেমন কোনো কথা হয় নি। মনে হচ্ছে আজ হবে।

বাবার মাথা এখন ঠিক আছে। লজিক পরিষ্কার। তবে শুধু একদিকের লজিক। এক-চক্ষু হরিণের মতো। সমস্যাটা এইখানে।

'বাবা ডেকেছ?'

মনসুরউদ্দিন সাহেবের ঘরের বাতি নেভানো। জিরো পাওয়ারেব নীল একটা বাল্ব জ্বলছে। সে আলোয তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। তিনি মশারির ভিতর কম্বল গাযে দিয়ে বসে আছেন। তিনি খাটের পাশে রাখা চেয়ারেব দিকে ইঙ্গিত কবে বললেন, 'মীবা বোস।'

মীরা বসতে বসতে বলল, 'বাত এগারটা বাজে। তোমাব তো দশটাব মধ্যে ঘুমিযে পড়ার কথা, এখনো জেগে আছ যে। ডাক্তাব শুনলে খুব রাগ কববে।'

'শুযে ছিলাম। ঘুম আসছিল না।'

'ঘুমের ওষুধ খেযেছ?'

'হুঁ।'

'এখন কতটুকু কবে খাও? ফ্রিজিযাম ফাইভ মিলিগ্রাম না দশ মিলিগ্রাম?'

'দশ।'

মীরা আব কী বলবে ভেবে পেল না। সে নিজেব ভেতর চাপা উদ্বেগ অনুভব কবছে। মনসুরউদ্দিন বললেন — 'মীরা, তুই কি আমাকে কিছু বলতে চাস?'

'না।'

'বলতে চাইলে আমি শুনতে বাজি আছি। ভালো না লাগলেও শুনব।'

'আমাব কিছু বলাব নেই বাবা। তুমি ঘুমাও।'

'বাইরের কিছু কথাবার্তা আমাব কানে আসছে — শুনলাম মনজুবকে ছেড়ে তুই চলে এসেছিস। সত্যি না মিথ্যা?

'সত্যি।'

'কাবণ কী?'

'ওকে আমার আর পছন্দ হচ্ছিল না।'

'পছন্দ না হবাবই কথা — গোড়াতেই তা বোঝা উচিত ছিল।'

'তখন বুঝতে পাবি নি।'

'অপছন্দটা হচ্ছে কেন?'

'অনেক কাবণেই হচ্ছে। স্পেসিফিকেলি বলার মতো কিছু না। ছোটখাটো ব্যাপার।'

'ছোটখাটো ব্যাপাবগুলোই আমি শুনতে চাই ....।'

মীবা চুপ করে রইল। সব কথা কি বাবাব কাছে বলা যায? বাবা কেন এই সাধারণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না?

তিনি গম্ভীর স্ববে বললেন, 'কথা বলছিস না কেন? কী করে সে — হাঁ কবে ঘুমায? নাক ডাকায়? শব্দ করে চা খায? সবাব সামনে ফোঁৎ কবে নাক ঝাড়ে?

মীরা হেসে ফেলল।

মনসুরউদ্দিন কড়া গলায় বললেন, 'হাসির কোনো ব্যাপার না। তুই পছন্দ করে, আগ্রহ করে সবার মতামত অগ্রাহ্য করে একটা ছেলেকে বিযে করেছিস, এখন তাকে ছেড়ে চলে এসেছিস — কী কারণে চলে এসেছিস তাও বলতে পারছিস না। অপছন্দ? কেন অপছন্দ?'

'মনের মিল হচ্ছে না বাবা।'

'মনের মিলের সময কি শেষ হযে গেছে? একটা মানুষকে বুঝতে সময লাগে না? সেই সময় তুই দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ দিয়েছি। তিন বছর অনেক সময়। বাবা শোন, সবকিছু তো আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। এইটুকু তোমাকে বলতে পারি যে, আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। তার সঙ্গে থাকতে হলে আমাকে প্রচণ্ড মানসিক কষ্টে থাকতে হবে। আমার পক্ষে তা সম্ভব না। সে ভালবাসতে জানে না। সে খানিকটা রোবটের মতো।'

'আর তুই ভালবাসার সমুদ্র নিয়ে বসে আছিস?'

'এমন করে কথা বলছ কেন বাবা?'

'কী অদ্ভুত কথা; ভালবাসতে জানে না! দিনের মধ্যে সে যদি একশবার বলে, ভালবাসি ভালবাসি তাহলে ভালবাসা হয়ে গেল? আমি তোর মার সঙ্গে বাইশ বছব কাটিয়েছি। এই বাইশ বছরে 'আমি তোমাকে ভালবাসি' জাতীয় ন্যাকামি কথা বলেছি বলে তো মনে হয় না।'

'মুখে না বললেও মনে মনে বলেছ। লক্ষবার বলেছ —মনজুরের মুখে এই কথা নেই, মনেও নেই।'

'তুই মনের কথাও বুঝে ফেললি? তুই এখন তাহলে মনবিশারদ?'

'মনের কথা খুব সহজেই বোঝা যায় বাবা। যে মানুষটা আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসার ক্ষমতাই যার নেই তার সঙ্গে দিনের পর দিন আমি কাটাব কী করে?'

'ভালবাসার ক্ষমতাই তার নেই?'

'না। এই যে আমি তাকে ছেড়ে চলে এসেছি — তাতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না। বা মন খারাপ হচ্ছে না। সে বেশ খাচ্ছেদাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, অফিস করছে। আমি যদি এখন ফিরেও যাই — তার জীবনযাপন পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হবে না। সে খুশিও হবে না, অখুশিও হবে না।'

মনসুরউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুই ফিরে যাবি না — এবকম কোনো মতলব করেছিস নাকি?'

'হ্যাঁ করছি।'

'তুই আমার সামনে থেকে যা। ভোরবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। তোকে দেখলেই আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাবে। সেটা হতে দেযা উচিত হবে না। সবচে' ভালো হয যদি এখন চলে যাস। ড্রাইভার তোকে জালালেব বাসায দিয়ে আসুক। ভাইযেব সঙ্গে থাক — আমার সঙ্গে না। যাদের দেখলে আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায তাদের আমি আমাব আশপাশে দেখতে চাই না।'

'তুমি অকারণে এতটা বাগছ।'

মনসুরউদ্দিন ঘর কাঁপিযে হুংকাব দিলেন, 'গেট আউট! গেট আউট!'

মীরা বের হয়ে এল। রাতে কোথাও গেল না। ভোববেলা জালালউদ্দিনেব বাড়িতে উপস্থিত হল। এই বাড়িতে একটি ঘব সব সময তার জন্যে আছে। ঘরেব নাম মীবা মহল।

মীরা তার ভাই এবং ভাবীর খুব ভক্ত। তাঁদের কোনো ছেলেমেযে নেই। মীবা অনেকটাই তাঁদের সন্তানের মতো।

সুটকেস হাতে গাড়ি থেকে নেমেই ভাবীর সঙ্গে দেখা হল। মীরা বলল, 'কেমন আছ ভাবী? আমি মীরা মহলে কিছুদিন থাকতে এসেছি। মীবা মহলের চাবি তোমার কাছে না ভাইয়ার কাছে?'

৩

খবরের কাগজে লিখেছে 'শৈত্যপ্রবাহ'।

শৈত্যপ্রবাহ মানে যে ঠাণ্ডা কে জানত?

মীরা ফুলহাতা স্যুয়েটার পরেছে। স্যুয়েটারের উপর গবম শাল — তবু শীত যাচ্ছে না। আজ বারান্দায় রোদও আসে নি। আকাশ শ্রাবণ মাসের মেঘলা আকাশের মতো। সবকিছু যেন ঝিম ধরে আছে।

মীরার বড় ভাই জালালউদ্দিন বাবান্দায় মোড়াব উপব বসে আছেন। তাঁব বযস পঁয়তাল্লিশ। এই বযসেই চুলটুল পাকিয়ে বুড়ো হযে গেছেন। বুড়োদের মতো অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে বাতে কষ্ট পান। এইসব দিনে শবীবের বিভিন্ন জাযগায ব্যথা করতে থাকে। আজ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা কোনোটাই না তবু তাঁর পিঠে ব্যথা উঠেছে। ব্যথাব কারণে বাইরে বের হন নি। ডাক্তারকে খবর দেযা হযেছে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়ার কথা। পঁচিশ মিনিট পার হযেছে — ডাক্তাব এখনো আসে নি।

জালালউদ্দিনেব পাযের কাছে কম্বল ভাঁজ কবে বিছানো। তিনি প্রতি পাঁচ মিনিট পবপব কম্বলে এসে চিৎ হযে শুচ্ছেন। ব্যথাব তাতে কোনো হেরফের হচ্ছে না। তাঁব মেজাজ অসম্ভব খাবাপ। যাকেই দেখছেন তাকেই ধমক দিচ্ছেন। মীরা এব মধ্যে দুবার ধমক খেয়েছে। তৃতীযবার ধমক খাওযাব জন্যেও প্রস্তুত হযে আছে। ভাইযাব কাছে বকা খেতে তাব তেমন খাবাপ লাগে না।

'মীবা শোন তো — হট ওযাটাব ব্যাগে পানি ভবে দিতে বলেছি চল্লিশ মিনিট আগে। পানি গবম কবতে চল্লিশ মিনিট লাগে?'

মীরা সহজ গলায বলল, 'পানি গবম হযে গেছে। হট ওযাটাব ব্যাগ খুঁজে পাওযা যাচ্ছে না। ড্রাইভার গেছে আবেকটা কিনে আনতে।'

'এখন একটা কিনতে গেছে? আগেবটা খুঁজে পাওযা যাচ্ছে না? এই বাড়িব সব কটা মানুষ ইডিযট নাকি?'

'শুধু শুধু চিল্লাচিল্লি কবছ কেন?'

'দরকারের সময একটা জিনিস খুঁজে পাওযা যাবে না — তাহলে বাড়িতে এতগুলো মানুষ থাকার প্রযোজন কী?'

'চুপ কবে শুযে থাক তো ভাইযা। আমি বরং পিঠে হাত বুলিযে দিই।'

'খবরদার — পিঠে হাত দিবি না। অসহ্য ব্যথা।'

'কাত হয়ে শুয়ে দেখ তো আবাম হয় কিনা।'

'তোর উপদেশ দেবাব দরকার নেই। তুই ডাক্তাব না।'

মীরাকে এই কথা বললেও তিনি কাত হযে শুলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা কমে গেল।

'ভাইযা ব্যথা কমেছে?'

'একটু কম লাগছে।'

'তাহলে এইভাবে শুযে থাক।'

'কাত হয়ে কতক্ষণ শুযে থাকব। তুই এমন পাগলেব মতো কথা বলিস কেন?'

'ব্যথা তো কমেছে তবু এমন চেঁচামেচি করছ কেন? চা খাবে, চা দিতে বলব?'

'কাত হয়ে চা খাব?'

মীরা হেসে ফেলল। মীরার হাসি দেখে জালালউদ্দিন নিজেও হেসে ফেললেন। যদিও খুব ভালো করে জানেন এখন হাসাটা ঠিক হচ্ছে না। রাগ ভাবটা ধরে বাখা উচিত।

মীরাকে কিছু কঠিন কথা বলা প্রয়োজন। সমস্যা হল পিঠের ব্যথা কমার সঙ্গে সঙ্গে রাগটাও দ্রুত কমে যাচ্ছে।

'মীরা।'

'বলো, কী বলবে।'

'তোর ভাবী বলছিল তুই নাকি আলাদা বাসা ভাড়া করার কথা চিন্তা করছিস?'

'ঠিকই বলেছে। ভাবীর স্মৃতিশক্তি খুবই ভালো। সে পুরো কনভারসেসন, দাঁড়ি-কমাসহ রিপ্রডিউস করতে পারে। তুমি যা শুনেছ ঠিকই শুনেছ।'

'এখানে অসুবিধাটা কী?'

'কোনো অসুবিধা নেই। তোমার এখানে আমি মহা সুখে আছি। এক হাজার করে টাকা হাতখরচও পাচ্ছি।'

'এই এক হাজার টাকা দিয়ে তুই বাসা ভাড়া করে থাকবি?'

'আমার নিজের কাছে কিছু টাকা আছে। চার পাঁচ মাস ঐ টাকায় চালাব, এর মধ্যে চাকরি-বাকরি কিছু একটা জোগাড় করে নেব।'

'চাকরি নিয়ে সবাই তোর জন্য বসে আছে?'

'ভাইয়া শোন, ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি আমার আছে। অনেকেব সঙ্গে চেনা-জানা আছে। আমার পক্ষে একটা চাকরি জোগাড় করা কোনো সমস্যা হবে না। তুমি নিজেও এটা ভালো করে জান। তা ছাড়া একজন রূপবতী ডিভোর্সীকে সাহায্য করার জন্যে সবাই খুব উৎসাহ বোধ করে।'

জালালউদ্দিন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মেয়েটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিজেব বড় ভাইয়ের সঙ্গে এটা কী ধরনের কথাবার্তা? পিঠের ব্যথা চলেই গিয়েছিল — উল্টাপাল্টা কথার কাবণেই বোধহয় ফিবে আসছে।

'তুই নিজেকে বেশি চালাক মনে করিস।'

মীরা সহজ গলায় বলল, 'হ্যাঁ করি। এতে কোনো দোষ নেই। বোকারা নিজেদের চালাক মনে করলে দোষ। বুদ্ধিমানরা মনে করলে দোষ নেই।'

'বুদ্ধির দোকান খুলে বসেছিস মনে হয়।'

'রেগে যাচ্ছ কেন? আবার ব্যথা শুরু হয়েছে? এখন চিৎ হয়ে শুয়ে দেখ। এখন চিৎ হয়ে ঘুমালে হয়তো ব্যথা করবে না।'

জালালউদ্দিন নিজের অজান্তেই চিৎ হয়ে শুলেন। না, ব্যথা লাগছে না। তাঁর গলাব স্বর থেকে রাগ ভাবটা এই কারণেই অনেকখানি কমে গেল। তবু কঠিন গলায় কথা বলার চেষ্টা করলেন, 'তোর কি ধারণা, ফড়ফড় করে কথা বলা বুদ্ধিমানের লক্ষণ?'

'না, এটা বোকার লক্ষণ। বোকারাই ফড়ফড় করে কথা বলে। বুদ্ধিমান লোকদের লক্ষ করলে দেখবে এরা কিছুক্ষণ কথা বলার পর চুপ করে অপেক্ষা করে। আবার কথা বলে, তারপর আবার অপেক্ষা। এই অপেক্ষার সময়টায় তারা চিন্তা করে। অতি দ্রুত চিন্তা করে।'

'আমার সম্পর্কে তোর কী ধারণা? আমি বোকা, না বুদ্ধিমান?'

'তুমি বোকাও না, বুদ্ধিমানও না — মাঝামাঝি।'

'তোর নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি?'

'হুঁ।'

'এই বুদ্ধির জন্যে তোর জীবনটা কোথায় এসে থেমেছে এটা দেখেছিস? হাতের কাছে এতগুলো ছেলে থাকতে বিয়ে করলি একটা অগা-বগাকে।

'তা করেছি। তবে — সে অগা-বগা কিন্তু না। তাকে আমার পছন্দ হয় নি। ভবিষ্যতেও যে হবে না এটা বুঝতে পেরেছি এবং খুব সম্মানজনকভাবে আলাদা হবার ব্যবস্থা করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না।'

'তুই আমার সামনে থেকে যা ... ।'

'যাচ্ছি।'

'যাবার আগে একটা টেলিফোন করে দেখ — ডাক্তারের কী হয়েছে?'

'ভাইযা, আমার মনে হয তুমি যদি একটা হট শাওয়াব নাও তাহলে আবাম হবে।'

'হট শাওযারের চিকিৎসা ডাক্তারের কাছে শুনে তারপর করতে চাই। তোর ডাক্তারি তুই তোর নিজের জন্যে রেখে দে।'

ডাক্তারকে টেলিফোন করার দরকার পড়ল না।

গাড়ির হর্ন শোনা গেল। মীরা মনজুরের অফিসে টেলিফোন করল। আজ মঙ্গলবার। বুধবারের কথা মনে করিযে দেয়া দরকাব।

'হ্যালো' বলতেই মনজুরেব গলা শোনা গেল — মনজুর ভারি গলায বলল 'কে বলছেন?'

'আমি, আমি মীবা।'

'ও আচ্ছা মীরা। কেমন আছ?'

'ভালো আছি। আমি হ্যালো বললাম তারপরেও আমাকে চিনতে পারলে না!'

'চিনব না কেন, চিনেছি।'

'চিনেছ তা হলে বললে কেন — কে বলছেন?'

'অভ্যাস। হ্যালো বলতেই — "কে বলছেন?" বলি তো...'

'থাক এত এক্সপ্লানেশনের দবকাব নেই। তোমাকে খুব জরুরি কাবণে টেলিফোন করেছি।'

মনজুর উদ্বিগ্ন গলায বলল, 'জরুবি কারণটা কী?'

'তুমি আন্দাজ কর তো।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আজ মঙ্গলবার। তোমাকে বুধবারে আসতে বলেছিলাম।'

'ও আচ্ছা — মনে আছে। আমি এপয়েন্টমেন্ট বইযে লিখে বেখেছি।'

'তোমার আবার এপয়েন্ট বুক আছে নাকি?'

'ঠিক এপযেন্টমেন্ট বুক না — ডেস্ক ক্যালেন্ডার। কাল সকালে পাতা উল্টাব। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে।'

'দয়া করে এখনি উল্টাও। ডেস্ক ক্যালেন্ডারের পাতা তুমি কখনো উল্টাও না।'

'আচ্ছা উল্টালাম।'

'কী লেখা পড়ে শোনাও তো। যা লেখা হুবহু তাই তুমি পড়বে।'

'বেশি কিছু না — শুধু মীরা লিখে রেখেছি। নাম দেখলেই মনে পড়বে।'

'আমি টেলিফোন করার আগে কী করছিলে?'

'ডিভানে শুয়ে ছিলাম।'

'শুয়ে ছিলে কেন? শরীর খারাপ নাকি?'

'একটু খারাপ। কিডনি বিষয়ক জটিলতা।'

'পরিষ্কার করে বল। কিডনি বিষয়ক জটিলতা মানে?'

'সবেধন নীলমণি যেটা আছে সেটাও নন-কোঅপারেশন করছে।'

'এটা কি তোমার নিজের ধারণা না ডাক্তারদের ধারণা?'
'ডাক্তারদের।'
'ভালোমতো চিকিৎসা করাও।'
'করাচ্ছি।'
'আচ্ছা তাহলে বুধবারে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'
'আচ্ছা। তুমি ভালো তো?'
'ভালো।'

মীরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। মনজুরের সঙ্গে কথা বলার পর তার কিছুক্ষণের জন্যে খারাপ লাগে। লজ্জা এবং অপরাধবোধের মিশ্র অনুভূতি হয। নিজের উপর তাব খানিকটা রাগও লাগে। শেষের দিকে মনজুরের সঙ্গে সে বেশ খারাপ ব্যবহার করেছে। এতটা খারাপ ব্যবহার মনজুরের প্রাপ্য ছিল না। তার চরিত্রে কিছু ইন্টারেস্টিং দিক অবশ্যই আছে; যেমন — সে ভালোমানুষ। অসাধারণ কিছু না, সাধারণ ভালোমানুষদের এক জন। শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন মানুষ এই পর্যাযের।

আজ বুধবার।

জামান সাহেব এসে পড়েছেন। জালালউদ্দিনের সঙ্গে চা খেতে খেতে মাথা দুলিযে গল্প করছেন। বিলেতের গল্প। বিলেতে খ্রিসমাসের সময়ে এক তরুণীকে বাস্তা পাব করাতে গিয়ে কী যে বিপদে পড়েছিলেন তার গল্প।

'বুঝলেন জালাল সাহেব, পকেট থেকে সিক্সটি পাউন্ড খসে গেল। আজ থেকে পনেব বছর আগের ঘটনা। পনের বছর আগের সিক্সটি পাউন্ড মানে সিক্সটি ইনটু ফিফটিন অর্থাৎ প্রায় নয শ পাউন্ড।'

জালালউদ্দিন হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছেন। মীবার হাসি পাচ্ছে না। হাসি পাওযাব মতো কোনো গল্প না। মাঝে মাঝে লোকজনদেব অকাবণেই হাসতে ইচ্ছা করে; তখন একটা উপলক্ষ ধরে হাসে। এখানেও তাই হচ্ছে।

জামান সাহেব মীরাব দিকে তাকিযে বললেন, 'আমাদেব ক্লায়েন্ট তো এখনো আসছে না!' মীরা বলল, 'এসে পড়বে।'

'আমার অবশ্য কোনো তাড়া নেই। আরেক প্রস্থ চা হোক।'

জালালউদ্দিন বললেন, 'অন্য কোনো পানীয খাবেন? ভালো স্কচ আছে।'

'ঝামেলা চুকে যাক। তাবপর দেখা যাবে। স্কচের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। আটলান্টিক সিটিতে একবার কী হযেছিল শুনুন। একটা নাইট ক্লাবে গিযেছি — এলাদিনস ক্যাসেল। ওখানকার খাবারটা সস্তা এবং ভালো। ভাবলাম খেতে খেতে একটা শো দেখে ফেলি। একটা ড্রিংকস নিয়ে বসেছি — অমনি প্রসটিটিউট ধরনেব এক তরুণী বলল, বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা, তুমি কি আমাকে একটা ড্রিংক অফার করবে? আমি বললাম, অবশ্যই। তুমি ওযেটারকে বল কী খেতে চাও।

মেয়েটা নিচু গলায় ওয়েটারকে কী যেন বলল, সে তৎক্ষণাৎ একটা গ্লাস এবং বোতল এনে টেবিলে রাখল। মেয়েটা অতি দ্রুত বোতল শেষ করে আমাকে থ্যাংকস দিযে চলে গেল। বিল দিতে গিয়ে মাথায আকাশ ভেঙে পড়ল। দুশ চল্লিশ ডলার! মেযেটা নাকি দুশ ডলার দামের ফরাসি শ্যাম্পেন চেযেছিল। তাকে তাই দেয়া হয়েছে। হা-হা-হা।

জালালউদ্দিন ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মীরা ভেবে পেল না, এর মধ্যে হাসির কী আছে। সব মানুষ এত বোকা কেন? পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা এত অল্প!

কলিং বেলের শব্দ হচ্ছে।

মীরা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। চাদব গায়ে মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে কালো একটা ব্যাগ। তার চাদব ভেজা-ভেজা। মীরা বলল, 'বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?'

'হুঁ। এইবারের শীতকালটা অদ্ভুত — দুদিন পরপর বৃষ্টি। আমি কি দেরি করে ফেললাম?'

'হ্যাঁ দেরি কবেছ।'

'জামান সাহেব এসেছেন?'

'দু ঘণ্টা আগে এসেছেন।'

'সরি, ডাক্তারেব কাছে গিয়ে এই যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম। স্লিপে লেখা এগাব। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, আসলে লেখা উনিশ।'

'ডাক্তার কী বলল?'

'বলে নি কিছু। টেস্ট-ফেস্ট করতে দিযেছে।'

'এস আমার সঙ্গে। তাঁরা বারান্দায় বসেছেন। তোমাব ব্যাগে কী?'

'কিছু না। ব্যাগটা এখানে বেখে যাই?'

'সঙ্গে থাক। অসুবিধা কিছু নেই। চাদব খুলে ফেল। ভেজা চাদব গায়ে জড়িয়ে বাখাব মানে কী? দাও আমাব কাছে দাও।'

জামান সাহেব মনজুরের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মনজুব বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'সবি আপনাদের দেরি করিয়ে দিযেছি।'

জামান সাহেব কিছু বললেন না। মনজুবকে তাঁব চেনা চেনা মনে হচ্ছে — কোথায দেখেছেন মনে কবতে পারছেন না। তিনি ইতস্তত কবে বললেন, 'আপনাকে কি আমি আগে দেখেছি? বা আপনি কি আমাকে আগে দেখেছেন?'

মনজুব খানিকক্ষণ তাকিযে থেকে বলল, 'মনে কবতে পাবছি না। আমাব স্মৃতিশক্তি বিশেষ ভালো না।'

'আমাব যথেষ্টই ভালো; কিন্তু আমিও মনে কবতে পাবছি না। যদিও খুব চেনা চেনা লাগছে।'

জালালউদ্দিন চোখ বন্ধ কবে বসে আছেন। তাঁব চোখে-মুখে সুস্পষ্ট বিবক্তি। তিনি বললেন, 'কাজেব কথা শুরু কবলে কেমন হয? এমনিতেই দেরি হযে গেছে।'

জামান সাহেব বললেন, 'কাজেব কথা আব কি? দুজনেব পুবোপুবি সম্মতিতেই ব্যাপাবটা ঘটছে। আমি সব কাগজপত্র তৈবি কবে এনেছি। কযেকটা সই হলেই হবে। মনজুর সাহেব, আপনি বরং ডকুমেন্টগুলো পড়ুন।'

মনজুব নরম গলায বলল, 'পড়তে হবে না। কোথায সই কবব বলুন।'

'দেখুন ক্রসচিহ্ন দেয়া আছে। সই কববার সময পুবো নাম লিখবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'একবার আপনাকে কোর্টেও আসতে হবে। পারবেন না?'

'পারব। কবে?'

'সোমবার ঠিক এগারটায। আপনি আমার চেম্বারে চলে আসুন। সেখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাব। এই কার্ডটা রাখুন। এখানে ঠিকানা দেয়া আছে।'

মনজুর হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল। এবং প্রায সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল। মীবা এল তার পেছনে পেছনে। তবে সে কিছু বলল না। এই প্রথম ঘর থেকে বেরুবার সময সে চৌকাঠে ধাক্কা খেল না।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। চাদরটা ফেলে আসায় মাথা ভিজে যাচ্ছে। জ্বর-জ্বারি না হলে হয়।

৪

'উড কিং' এর মালিক বদরুল আলম, মনজুরের মেজো মামা। উড কিং ছাড়াও ঢাকা শহরে তাঁর আরো দুটি ফার্নিচারের দোকান আছে। মূল কারখানা মালিবাগে। কারখানার সঙ্গেই তাঁর হেড অফিস।

এই মুহূর্তে তিনি মালিবাগের হেড অফিসে বসে আছেন। চায়ের কাপে মুড়ি ভিজিয়ে চামচ দিয়ে তুলে তুলে খাচ্ছেন। তাঁর সামনে কারখানার ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা। ইয়াসিন মোল্লার হাতে গোটা দশেক রসিদ। একটু দূরে কান ধরে 'উড কিং' ফার্নিচারেব সর্বকনিষ্ঠ কর্মচারী নসু মিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স এগার। সে এক টিন তার্পিন তেল পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বদরুল আলম চা-পর্ব শেষ করেই নসুর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। নসুকে আসন্ন শাস্তির আশঙ্কাতে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না।

বদরুল আলমের বয়স একষট্টি। শক্ত-সমর্থ চেহারার বেঁটেখাটো মানুষ। তিনি ধমক না দিয়ে কোনো কথা বলতে পারেন না। কিছুদিন হল আলসার ধরা পড়েছে। আলসারেব চিকিৎসা হিসাবে সারাক্ষণই কিছু না কিছু খাচ্ছেন। চায়ে মুড়ি ভিজিয়ে খাওয়া সেই চিকিৎসারই অঙ্গ।

মনজুর ঘরে ঢুকে মামার দিকে তাকিয়ে হাসল। বদরুল আলম সেই হাসির দিকে কোনোরকম গুরুত্ব দিলেন না। এটাও তাঁর স্বভাবেব অংশ। যে কোনো আগন্তুককে প্রথম কিছুক্ষণ তিনি অগ্রাহ্য করেন। ভাব করেন যেন দেখতে পান নি।

মনজুর পাশের চেয়ারে বসল। মামাব দৃষ্টি আকর্ষণের কোনো চেষ্টা করল না। কাবণ সে জানে চেষ্টা করে লাভ হবে না।

ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা ক্ষীণ গলায় বলল, 'স্যার, নসুর শাস্তির ব্যাপারটা শেষ করে দেন।'

বদরুল আলম কড়া গলায় বললেন, 'শেষ করাকবি আবার কী? তার্পিন তেলেব টিনটা উদ্ধার হয়েছে?'

'জ্বি স্যার।'

'তাহলে ঐ টিন থেকে বড় চামচে দুই চামচ তেল খাইযে দাও। এটাই ওর শাস্তি।'

শাস্তির এই ব্যবস্থায় নসুকে খুব আনন্দিত মনে হল। সে ফিক করে হেসেও ফেলল। ইয়াসিন মোল্লাকে দেখে মনে হচ্ছে শাস্তির এই ধারাটি তার পছন্দ না। সে বিরস গলায বলল, 'স্যার রসিদগুলা একটু দেখবেন? দুই হাজার সিএফটি কাঠ ....'

বদরুল আলম শুকনো গলায় বললেন, 'সব কিছু যদি আমি দেখি তাহলে আপনি আছেন কী জন্যে? এখন যান। নসুকে নিয়ে যান। শাস্তি দেন।'

'তেল সত্যি সত্যি খাওয়াব?'

'অবশ্যই খাওযাবেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যান।'

ঘর খালি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বদরুল আলম বললেন, 'আমার এই ম্যানেজাব বিরাট চোর। থিফ নাম্বার ওয়ান।'

মনজুর বলল, 'থিফ নাম্বার ওয়ান হলে বিদায় করে দেন না কেন? চোর পোষার দরকার কী?'

'দরকার আছে। পোষা চোর কী করে চুরি করে সেই কায়দা-কানুন জানা থাকে। ম্যানেজার ব্যাটা চুরি করামাত্র ধরে ফেলি। নূতন একজনকে নিলে তার চুরিব কায়দা-কানুন ধরতে ধরতে এক বৎসর চলে যাবে। এক বৎসরে সে দোকান ফাঁক করে দেবে, বুঝলি?'

'হ্যাঁ বুঝলাম।'

'কিছুই বুঝিস নাই। ম্যানেজার রসিদগুলো নিয়ে ঘুরঘুর করছে। কেন করছে? কারণ চুরি আছে ওর মধ্যে। বিরাট ঘাপলা। আমি তাকে কী বললাম? বললাম — আমি কিছু দেখতে পারব না — সে নিজে যেন দেখে। এখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে চুরি করবে। আগের মতো সাবধান থাকবে না। ধরা পড়ে যাবে, ক্যাঁক করে ঘাড় চেপে ধরব। বুঝলি?'

'বুঝলাম।'

'কিছুই বুঝিস নাই। আমাব কাছে কী ব্যাপার?'

'তোমাকে দেখতে এলাম।'

'ঠাট্টা করছিস নাকি?'

'ঠাট্টা করব কেন? মাসে এক বার তোমাকে দেখতে আসি না?'

বদরুল আলম চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ চিন্তা কবলেন। মনজুব সত্যি কথাই বলছে। সে মাসে এক বার আসে। প্রতি মাসের শেষের দিকে। ঘণ্টা খানেক থাকে।

'কেন আসিস আমার কাছে?'

'তোমাকে দেখতে আসি।'

'কেন?'

'কী যন্ত্রণা, এত জেবা কবছ কেন?'

বদরুল আলম চোখ থেকে চশমা খুলে খানিকক্ষণ মনজুরেব দিকে তাকিযে বইলেন। চশমা খুলে তিনি প্রায় কিছুই দেখেন না। তবু কাউকে বিশেষভাবে দেখার প্রযোজন হলে চশমা খুলে ফেলেন।

'তোব কি শবীব খাবাপ নাকি?'

'হুঁ।'

'সমস্যা কী?'

'শবীবেব বক্ত ঠিকমতো পরিষ্কাব হচ্ছে না।'

'কালোজাম খা। কালোজামে রক্ত পরিষ্কার হয।'

মনজুব হাসতে হাসতে বলল, 'শীতকালে কালোজাম পাব কোথায? তাছাড়া কালোজামের স্টেজ পাব হয়ে গেছে। কিডনি যেটা ছিল সেটাও যাই-যাই করছে।'

'কী বলছিস তুই!'

'সত্যি। আমি এখন কিডনিব সন্ধানে ঘুবে বেড়াচ্ছি।'

'ইযারকি করছিস নাকি?'

'ইয়ারকি করছি না। দুজন বড় ডাক্তার তাই বললেন।'

'বড় ডাক্তাবরা কিছুই জানে না। ছোট ডাক্তাবদের কাছে যা।'

'ছোট ডাক্তারদেব কাছে যাব?'

'হ্যাঁ। ওরা যত্ন করে দেখবে। এই পাড়ায একজন এল. এম. এফ ডাক্তার আছে। ভূপতি বাবু। খুব ভালো। তার কাছে যাবি? আমি নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে খুব ভালো খাতির। যাবি?'

'না।'

'ছোট বলে অবহেলা করিস না। ছোট কাঁচামরিচের ঝাল বেশি।'

'ঝাল পচা আদারও বেশি। তাই বলে পচা আদা কোনো কাজের জিনিস না।'

বদরুল আলম দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন, পচা আদার কোনো ব্যবহাব মনে পড়ে কিনা। মনে পড়ল না।

'তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি মামা।'
'টাকা-পয়সার কোনো ব্যাপার না হলে বল। টাকা-পয়সা ছাড়া সব পাবি।'
'টাকা-পয়সা কি তোমার নেই?'
'আছে। দেয়া যাবে না। টাকা ব্যবসায় খাটে। ব্যাংকে ফেলে রাখি না।'
'ব্যাংকে কিছু তো আছে?'
'তা আছে।'
'সেখান থেকে এক লাখ দেয়া যাবে?'
'এত লাগবে কেন?'
'কিডনি কিনতে হবে। লাখ খানিক টাকা লাগবে কিনতে। অপারেশন করাতে দেশের বাইরে যেতে হবে। সব মিলিয়ে দরকার তিন থেকে চার লাখ টাকা।'
বদরুল আলম টেবিলে রাখা চশমা চোখে পরলেন। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'তুই কি জনে জনে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিস?'
'হ্যাঁ।'
'কোনো লাভ নাই — অন্য পথ ধর।'
'অন্য কী পথ ধরব?'
'তা আমি কী বলব। ভেবে-চিন্তে বার কর। তুই গরিব মানুষ, তুই বাঁধাবি গরিবের অসুখ — দাস্ত, খোস-পাঁচড়া, ঘাম, জলবসন্ত, তা না...চা খাবি ?'
'না।'
'খা চা খা। ফ্রেশ মুড়ি আছে, খেজুর গুড় দিয়ে খা।'
মনজুর উঠে দাঁড়াল।
বদরুল আলম বললেন, 'তুই কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস নাকি? রাগ নিয়ে যাওয়া ঠিক না। তুই ঝগড়া কর আমার সঙ্গে। চিৎকার, চেঁচামেচি কর। তাহলে তোর মনটা হালকা হবে। তুই রোগী মানুষ, মনটা হালকা থাকা দরকার।'
'আমার মন হালকাই আছে।'
'আরে সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছিস?'
'হ্যাঁ।'
'বোস বোস। চা খেয়ে তারপর যা। সিগারেটখোররা বিনা সিগারেটে চা খেতে পারে না। এই জন্যে মুরুব্বীদের সামনে তারা চা খায় না। যা, তোকে সিগারেটের অনুমতি দিলাম। এখন চা খাবি তো? নাকি এখনো না!'
মনজুর বসল।
বদরুল আলম গলার স্বর নিচু করে বললেন, 'মনটা খুবই খারাপ। তোর অসুখ-বিসুখের জন্যে না। অসুখ-বিসুখ তো মানুষের জীবনে আছেই। এই দেখ না বুড়ো বয়সে আমার হয়ে গেল আলসার।'
'মন খারাপ কী জন্যে?'
'আমার ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে মনটা খারাপ। তারা এখন লায়েক হয়ে গেছে। সমাজে পজিশন হয়েছে। আমি যে একজন কাঠমিস্ত্রি এই জন্যে তারা লজ্জিত। আমাকে লোকজনের সামনে কীভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় জানিস? বলে — ইনি আমার ফাদার। ব্যবসা করেন। টিম্বার মার্চেন্ট। আমি তখন কী করি জানিস? আমি গম্ভীর হয়ে বলি — না রে ভাই। আমি কোনো টিম্বার মার্চেন্ট না। আমি একজন কাঠমিস্ত্রি।'
'তুমি তো সত্যি কাঠমিস্ত্রি না।'
'না তোকে বলল কে? কাঠের কাজ আমি করি না? এখনো করি।'

চা এসে গেছে। মনজুর সিগারেট ধরিয়েছে। বদরুল আলম খেজুর গুড় দিয়ে মুড়ি চিবুচ্ছেন। ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা একটু আগে এসে বলে গেছে — নসু মিয়ার শাস্তি দেয়া হয়েছে। তার্পিন তেল খাওয়ানো হয়েছে। সে এখন বমি করছে। বদরুল আলম বলেছেন — 'করুক। তুমি ফট করে ঘরে ঢুকবে না। কথা বলছি।' এর মধ্যে একবার টেলিফোন এসেছে। বদরুল আলম রিসিভার তুলে রেখেছেন। এখন তাঁর টেলিফোনে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। মনজুরের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলতে ভালো লাগছে। ছেলেটা ভালো। কোনো কথা বললে মন দিয়ে শোনে — দশ জনের কাছে গিয়ে বলে না।

'মনজুর।'

'জ্বি।'

'আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রেব কাণ্ডকারখানা শুনবি?'

'বল।'

'বিয়ে করার পর মনে করছে — আহা কী করলাম। রাজকন্যা পেয়ে গেলাম। চোখে-মুখে সব সময় 'সখী ধর ধর' ভাব। মুখে হাসি লেগেই আছে। কী মধুর হাসি। এখন কথা বলে শান্তিনিকেতনী ভাষায় — এলুম, গেলুম এইসব। ব্যাটা রবিঠাকুর হয়ে গেছে!'

'অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আছে। সবটা না শুনলে বুঝবি না। — গত বৃহস্পতিবার সকালে বারান্দায় এসে দেখি মতিন নেইল কাটাব দিয়ে তার বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে। আমি না দেখাব ভান কবে ঘরে ঢুকে গেলাম। তোর মামীকে বললাম — এই কুলাঙ্গারের মুখ দেখতে চাই না। লাথি দিয়ে একে ঘব থেকে বেব কবে দাও। একে আমি ত্যাজ্যপুত্র কবলাম।'

'নখ কাটা এমন কী অপবাধ?'

'বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দেযা অপবাধ না? তুই কখনো বৌমাব পায়ের নখ কেটে দিযেছিস?'

'না।'

'তাহলে?'

'আমি কি আদর্শ মানব? আমি যা কবব সেটাই ঠিক, অন্যেবটা ঠিক না?'

বদরুল আলম বিবক্ত গলায বললেন, 'তুই আদর্শ মানব হবি কেন? তুই হচ্ছিস গাধা-মানব। এখন কথা হল, গাধা-মানব হয়ে তুই যে কাজটা করছিস না সেই কাজটা আমাব কুলাঙ্গার কবছে — বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে। তাও কোনো রাখঢাক নেই। বারান্দায় বসে কাটছে। হাবামজাদা।'

'মতিনের বৌকে তো তুমি পছন্দ কর। কব না?'

'অবশ্যই করি। ও ভালো মেয়ে। ভেবি গুড গার্ল। আমার কুলাঙ্গাবটা মেযেটার মাথা খাচ্ছে। একদিন কি হবে জানিস? এই মেয়ে নেইল কাটার নিয়ে আমাব কাছে এসে বলবে, বাবা আমার পায়ের নখগুলি একটু কেটে দিন তো।

মনজুর হেসে ফেলল। বদরুল আলম রাগী গলায় বললেন, 'হাসছিস কেন? হাসবি না। হাসি-তামসা এখন আমার সহ্য হয না। হাসি শুনলেই ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়।'

'উঠি মামা?'

'আচ্ছা যা। কোনো চিন্তা করিস না। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখ। গড অলমাইটি ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।'

মনজুর রাস্তায় এসেই রিকশা নিয়ে নিল। আগে হাঁটতে ভালো লাগত। এখন আর লাগে না। কয়েক পা এগোলেই ক্লান্তিতে হাত-পা এলিয়ে আসে। কয়েকবার সে রিকশাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ যে রকম ক্লান্ত লাগছে তাতে মনে হয় — রিকশায় উঠা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

রিকশাওয়ালা বলল, 'কই যাইবেন সাব?'

মনজুর কিছু বলল না। কোথায় যাবে এখনো সে ঠিক করে নি। অফিসে যাওয়া যেত কিন্তু আজ অফিস বন্ধ। তাদের অফিস হচ্ছে একমাত্র অফিস যা সপ্তাহে দুদিন বন্ধ থাকে — শুক্রবার এবং রবিবার। আফসার সাহেব তাঁর সব কর্মচারীকে বলে দিয়েছেন — 'দুদিন বন্ধ দিচ্ছি এই কারণে যাতে বাকি পাঁচদিন আপনারা দশটা-পাঁচটা অফিস করেন এবং মন দিয়ে করেন।'

আজ রোববার।

সব জায়গায় কাজকর্ম হচ্ছে। তাদের অফিস বন্ধ। নিজের ঘরে দবজা বন্ধ করে শুয়ে থাকা যেত। শরীরের ক্লান্তি তাতে হয়তো খানিকটা কাটত। মজার ব্যাপার হচ্ছে অফিস যেদিন থাকে সেদিনই শুধু ঘরে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। অফিস বন্ধের দিন ইচ্ছে করে বাইরে বেরিয়ে পড়তে। আজ যেমন করছে। অবশ্যি যাবার মতো জাযগা পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রেনে করে গ্রামের দিকে গেলে কেমন হয়? পছন্দ হয় এমন কোনো স্টেশনে নেমে পড়া। বিকেলের দিকে ফিরে আসা।

'সাব যাইবেন কই?'

'সামনে।'

রিকশাওয়ালা রির্কশা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। বাব বাব পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে।

'স্যারের শইল কি খারাপ?'

'হুঁ।'

'কী হইছে?'

'কিডনি নষ্ট — বেশিদিন বাঁচব না।'

'না বাঁচাই ভালো। বাঁইচ্যা লাভ কী কন? চাউলের কেজি হইল তের টেকা। গরিবের খানা যে আটা হেইডাও এগার টেকা কেজি।'

'খুবই সত্যি কথা — দেখি তুমি কমলাপুরের দিকে যাও তো।'

'রেল ইস্টিশন?'

'হুঁ।'

ঘুম আসছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনজুর শক্ত করে রিকশার হুড চেপে ধরল। ঘুম হচ্ছে অনেকটা মৃত্যুর মতো। মৃত মানুষের শরীর যেমন শক্ত হয়ে যায় — ঘুমন্ত মানুষদের বেলায়ও তাই হয়। শরীর খানিকটা হলেও শক্ত হয়। ঘুমিয়ে পড়লেও হুড ধরা থাকবে। ঝাঁকুনি খেয়ে রিকশা থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা কমে যাবে। অক্ষত অবস্থায় কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌছানো যেতেও পারে।

অবশ্যি পৌছলেও যে শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া যাবে তা মনে হয় না। ইচ্ছা মবে যাবে। মানুষের কোনো ইচ্ছাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

কিছুদিন ধরে মনজুরের ইচ্ছা করছে অচেনা একজনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় গল্প করা; যে তাকে চেনে না কিন্তু না চিনলেও যে গল্প শুনবে আগ্রহ নিয়ে। প্রযোজনে আগ্রহ নিয়ে গল্প শোনার জন্যে কিছু টাকা-পয়সাও দেয়া যেতে পারে। সমস্যা হল, কেউ গল্প শুনতে চায় না। সবাই বলতে চায়। সবার পেটে অসংখ্য গল্প।

মেজো মামার সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ থাকলে তিনি মতিনের নতুন কিছু গল্প শুনাতেন। গল্প বলতে পারার আনন্দের জন্যে মেজো মামার মতোন মানুষও তাকে সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

'স্যার নামেন। কমলাপুর আসছে।'

মনজুরের নামতে ইচ্ছা করল না। কেমন যেন মাথাটা ঘুরাচ্ছে। বমি-বমি লাগছে। ঝকঝকে রোদ। সেই রোদ এমন কড়া যে চোখে লাগছে। খুবই তীক্ষ্ণ কোনো সুচ দিয়ে রোদের ছবি কেউ যেন চোখের ভেতর আঁকছে।

'সাব নামেন।'

'ভাই শোন, এখানে নামব না। তুমি আমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাও। ভাড়া নিয়ে চিন্তা কববে না। যা ভাড়া হয় তার সঙ্গে পাঁচ টাকা ধরে দেব বখ্‌শিশ।'

'বাসা কোনহানে?'

'বলছি — তুমি চালাতে শুরু কর, তারপর বলছি।'

'টাইট হইয়া বহেন।'

'বসেছি। টাইট হয়ে বসেছি। তুমি আস্তে চালাও।'

রিকশাওয়ালা খুবই ধীরগতিতে বিকশা চালাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে রিকশাব প্যাসেঞ্জাব ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিযে পড়লে ভালো কথা — অজ্ঞান না হয়ে পড়লেই হয। বিকশাওযালা পথের পাশে গজিযে-উঠা একটা চাযের স্টলেব কাছে এনে রিকশা থামাল। প্যাসেঞ্জার খানিকক্ষণ ঘুমাক। এই ফাঁকে সে টোস্ট দিযে এক কাপ চা খেযে নিবে। ভাড়া হিসাবে বাড়তি কিছু টাকা পাওযা যাবে। একটা টাকা চা-টোস্টের জন্যে খরচ করা যায। সে চায়ের কাপ নিযে উবু হযে বসেছে, এমন সময হৈহৈ শব্দ উঠল। ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জাব গড়িযে রিকশা থেকে পড়ে গেছে। পড়ে গিযেও তাব ঘুম ভাঙছে না। তাব মানে ঘুম না —লোকটা হয অজ্ঞান হযে গেছে, নয মারা গেছে।

লোকজন লোকটাকে ধরাধরি করে তুলছে। তুলতে থাকুক, এই ফাঁকে সে দ্রুত চা-টা শেষ করতে চায। চা-টা মজা হযেছে। দ্রুত চা খেতে গিযে রিকশাওযালা মুখ পুড়িযে ফেলল।

৫

'স্যার আপনি কেমন আছেন?'

মনজুর জবাব দিল না। জবাব না দেযার দুটি কারণের একটি হচ্ছে প্রশ্নকর্তাব গলাব স্বর সে চিনতে পারছে না। অচেনা একজনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার তেমন প্রযোজন নেই। দ্বিতীয কারণ — কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত শরীর জুড়ে আরামদাযক আলস্য। তন্দ্রা ভাব। প্রচণ্ড ঘুম আসার আগের অবস্থা। একটা কোলবালিশ জড়িযে পাশে ফিবে ঘুমাতে পারলে হত। শীত শীত লাগছে। গাযের উপর কম্বল দেযা আছে কি? সম্ভবত আছে। তবে সেই কম্বল খুব ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে রাবারের কম্বল।

'স্যার আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি জাহানারা। এখন আপনার শরীর কেমন?'

চোখ না মেলেই বলল, 'শরীর ভালো।'

'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

মনজুর বিরক্ত হচ্ছে। এটা কী ধরনের প্রশ্ন? তাকে চিনতে পারা না পারায় কী যায় আসে? কিছুই যায় আসে না। তবে সে চিনতে পারছে। মনজুর তাকাল। না তাকানোই ভালো ছিল। তীব্র আলো ধক করে চোখে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা শুরু হল। ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। হাতে কি স্যালাইন দেয়া হচ্ছে? এটা হাসপাতাল, না ক্লিনিক? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। হাসপাতাল না হওয়ারই কথা।

'স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

'কেমন আছ জাহানারা?'

'জ্বি স্যার ভালো।'

'এটা কি কোনো ক্লিনিক?'

'জ্বি না — মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি যে হাসপাতালে সেটা জানতাম না। বারটার সময় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করল অফিসে। আপনার মানিব্যাগে ভিজিটিং কার্ড ছিল। আপনি স্যার পুরো একুশ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন।'

'ও আচ্ছা।'

'টেলিফোন ধরেছিলেন চিত্ত বাবু। তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। আমাকে বললেন, 'জাহানারা, হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এসেছে। কী বলছে কিছুই বুঝতেছি না। তুমি ম্যাসেজটা রেখে দাও তো, আমি তখন . . .'

জাহানারা হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে।

মনজুর স্বপ্নেও ভাবে নি, এই মেয়ে এত কথা বলতে পারে। এতদিন পর্যন্ত তার ধারণা ছিল, এই মেয়ে শুধু প্রশ্ন করলেই জবাব দেয়। নিজ থেকে কথা বলে না। এখন মনে হচ্ছে মেইল ট্রেন। দাঁড়ি–কমা ছাড়া কথা বলে যাচ্ছে। মেয়েটা বোধহয় ভয় পেয়েছে। যেসব মানুষ এমনিতে কম কথা বলে তারা ভয় পেলে প্রচুর কথা বলে।

'স্যার, আপনার এখন কেমন লাগছে?'

'ঘুম পাচ্ছে।'

'ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। ডায়ালাইসিস করা হবে। রক্তে টক্সিক মেটেরিয়াল বেশি হয়ে গেছে। এগুলো ডায়ালাইসিস করে সরাবে। তখন ভালো লাগবে।'

'আচ্ছা, তুমি তাহলে এখন যাও। আমি খানিকক্ষণ ঘুমাব।'

'আমার স্যার এখন যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। আপনার আত্মীয়স্বজন কাকে কাকে খবর দিতে হবে বলুন, আমি খবর দিয়ে দিব।'

'কাউকে খবর দিতে হবে না।'

'ভাবী? ভাবীকে খবর দিব না?'

'দাও — টেলিফোন নাম্বার হল . . .''

'উনার টেলিফোন নাম্বার আমি জানি। গত মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবার আপনার খোঁজে টেলিফোন করেছিলেন — তখন উনি তাঁর নাম্বার বললেন। আমি আমার নোট বইয়ে উনার নাম্বার লিখে রেখেছি....'

মনজুর অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছে।

এত কথা বলছে কেন এই মেয়ে? কে তাকে এখানে আসতে বলেছে? মনজুর মনে মনে বলল, "মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি, ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।" কেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বকবক করছ? কে তোমার বকবকানি শুনতে চাচ্ছে? তুমি দয়া করে বিদেয় হও। আমাকে ঘুমাতে দাও। ঘুম পাচ্ছে।"

আরাম করে একটা ঘুম দিতে পারলে — শরীর ঝরঝরে হয়ে যেত। এই মেয়ে তা হতে দেবে না। মানুষ ভিন্ন পরিবেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করে। অফিসে এই মেয়ে একটা কথাও বলে না। হাসপাতালে দাঁড়ি-কমা ছাড়া কথা বলে। বাসায় সে কী করে?

'স্যার, ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

মনজুর জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। যাতে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে মেয়েটা তাকে মুক্তি দেয়।

'স্যার, এখন ঘুমাবেন না। ডাক্তার সাহেব আসছেন। উনার সঙ্গে কথা বলে তারপর ঘুমান। আপনাকে কি আরেকটা বালিশ দিতে বলব? এদের বালিশগুলো খুব পাতলা।'

ডাক্তার সাহেব বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনজুরের টেম্পারেচার চার্ট দেখছেন। ডাক্তার ভদ্রলোক খুব রোগা। তাঁকে সরলরেখার মতো লাগছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সটি বেশ গোলগাল। মনজুরের মনে হল — নার্সটিকে '০'র মতো দেখাচ্ছে। ডাক্তাব যদি ইংরেজি এক হয তাহলে এই দুজনে মিলে হল দশ। .... এইসব কী সে ভাবছে? তার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? ডাক্তাব নিচু হয়ে মনজুরের কপালে হাত রাখলেন। অন্তবঙ্গ গলায় বললেন, 'কেমন আছেন?'

'ভালো'

'শরীব কি খুব দুর্বল লাগছে? বমি ভাব আছে?'

'আছে।'

'মাথা ঘুবছে?'

'না — তবে মাথার ভেতবটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।'

'এ ছাড়া আর কোনো অসুবিধা আছে?'

'আছে। আপনাকে গোপনে বলতে চাই। অন্যদেব যেতে বলুন।'

ডাক্তাবকে কিছু বলতে হল না। সবাই দূবে সরে গেল। মনজুর গলার স্বব নিচু কবে বলল, 'ঐ যে প্রিন্টেব শাড়ি-পবা মেয়েটাকে দেখছেন — তাকে যেতে বলুন। সে আমাকে বড় বিরক্ত করছে। ঘুমাতে দিচ্ছে না।'

'তাকে সবিযে দেবার ব্যবস্থা করছি। এটাই কি আপনার গোপন কথা না আরো কিছু বলবেন?'

'না, আর কিছু বলব না। আমার অবস্থাটা কী জানতে পারি?'

'টেস্ট প্রায় সবই করা হয়েছে। আপনার কিড়নি ভালো কাজ করছে না। তবে এই মুহূর্তে চিন্তার কিছু নেই। ডায়ালাইসিস করলেই আরাম বোধ করবেন। ইতিমধ্যে কিড়নি ট্রান্সপ্লেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি চেষ্টা করে দেখুন কোনো ডোনার পাওয়া যায় কিনা। আপন ভাইবোন হলে ভালো হয়। না পাওয়া গেলে রক্ত সম্পর্ক আছে এমন কেউ। সন্ধ্যাবেলা ডক্টর ইমতিয়াজ আসবেন। উনি সব বুঝিয়ে বলবেন। আপনি এখন রেস্ট নিন। চুপচাপ শুয়ে থাকুন। ঘুমাবার চেষ্টা করুন। যে কোনো অসুখেই বিশ্রাম চমৎকার মেডিসিন।'

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই মনজুর ঘুমিয়ে পড়ল। এমন ঘুম যা মানুষকে আরো ক্লান্ত করে দেয়। কাবণ সে ঘুমাচ্ছে অথচ আশপাশের সমস্ত শব্দ শুনছে। পাশের

বেডের রোগী কাশছে। এই শব্দও ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে। নার্স এসে কাকে যেন ধমকাচ্ছে — সেই ধমকের প্রতিটি শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষের ঘ্রাণশক্তি কাজ করে না — তার কাজ করছে। ঘর মুছে যখন ফিনাইল দেয়া হল — সে ঘুমের মধ্যেই ফিনাইলের কড়া গন্ধ পেল।

মনজুরের ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে আগে। বিছানার কাছে দুটি ডাব হাতে কুদ্দুস মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপরাধী–অপরাধী ভাব। কুদ্দুস অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'স্যারের শরীরটা এখন কেমন?'

'শরীর ভালো।'

'দুইটা ডাব আনলাম স্যার। আমার নিজের গাছের ডাব।'

'বেডের নিচে রেখে দাও।'

'কেটে দেই স্যার? এখন একটা খান?'

'এখন খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'না খেলে তো স্যার শরীরে বল হবে না।'

'বল না হলেও কিছু করার নাই। তুমি এখন আমার সামনে থেকে যাও। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'ঐ দিনের ঘটনার জন্যে আমি মাফ চাই স্যার।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'আপনি মাফ না দিলে ...'

'মাফ না দিলে কী?'

কুদ্দুস মাথা চুলকাচ্ছে — কথা পাচ্ছে না। আগে ভালোমতো বিহার্সেল দিয়ে আসে নি। কুদ্দুসের উচিত ছিল কী কথাবার্তা বলবে সব ঠিক করে আসা। তা করে নি। অবশ্যি অনেক সময় ঠিক করে এলেও বলার সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা তাব বেলায় অসংখ্যবার ঘটেছে। ভেবেচিন্তে ঠিক করে রাখা কথা একটাও সে কোনোদিন বলতে পারে নি।

'কুদ্দুস তুমি এখন যাও। কথা বলা আমার নিষেধ আছে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'অফিসেও সবাইকে বলবে — তারা যেন না আসে।'

'আচ্ছা স্যার বলব।'

'থ্যাংকস। তোমার ডাব আমি এক সময় খাব।'

কুদ্দুস মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'স্যার শুনলাম আপনার একটা কিড্‌নি দরকার?'

'ঠিকই শুনেছ। তুমি কি দিতে চাও?'

কুদ্দুস হ্যাঁ–না কিছুই বলল না।

মনজুর সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, 'দিতে চাইলে পরে এ নিয়ে কথা বলব। এখন যাও।'

'ডাব দুইটা মনে করে খাবেন স্যার।'

'বললাম তো খাব।'

'নিজের গাছের ডাব। বাবা নিজ হাতে গাছ পুঁতেছিলেন।'

মনজুর মৃদু গলায় বলল, 'যাত্রবাড়ির ঐ বাড়ি কি তোমার নিজের?'

'জ্বি না — ভাড়া বাড়ি।'

'কবে এসেছ ঐ বাড়িতে?'

'দুই বছর আগে। শ্রাবণ মাসে।'

'দুই বছর আগে পোঁতা গাছে ডাব হয়ে গেল?'

কুদ্দুস ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মনজুর বড়ই বিরক্ত বোধ করছে। এ ভালোমতো মিথ্যা বলাও শিখে নি। জেরায় টিকতে পারে না। সামান্য বুদ্ধি থাকলে বলত — দেশের বাড়ির ডাব। বাবা দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন। তা না বলে কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মনজুর চোখ বন্ধ করে পাশ ফিবল। কুদ্দুস ক্ষীণ গলায় বলল, 'স্যাব আমি যাই?'

'আচ্ছা যাও।'

কুদ্দুস 'যাই' বলেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

মনজুর চোখ বন্ধ করেও তা বুঝতে পাবছে। অসুখেব সময মানুষের ইন্দ্রিয তীক্ষ্ণ হয। মনজুর চোখ মেলল কুদ্দুস চলে যাবার পর। প্রথমেই চোখে পড়ল বিছানার পাশে — একগাদা ম্যাগাজিন। কয়েকটা কবিতাব বই। কবিতার বইগুলোতে মীরার নাম লেখা। নিশ্চযই জাহানারার কাণ্ড। অফিসে তার ঘরেব শেল্‌ফ থেকে নিযে এসেছে। জাহানারার হযতো ধাবণা, মনজুর কবিতার পোকা। মনে কবাই স্বাভাবিক। সে অনেকবার মনজুরেব হাতে কবিতার বই দেখেছে। সে জানেও না মনজুর এইসব বই মুখের সামনে ধবে পাতা ওল্টানো ছাড়া কিছুই কবে না। দুএকবাব যে পড়ার চেষ্টা কবে নি তা না। চেষ্টা করেছে — ভালো লাগে নি।

ডান হাতে এখনো স্যালাইনের সুচ বিঁধে আছে। মনজুব বাঁ হাতে একটা কবিতাব বই টেনে নিল।

> সমুদ্রেব জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম
> কেউ দেখে নি, কেউ টের পায নি
> প্রবল ঢেউযের মাথায় ফেনাব মধ্যে
> মিশে গিযেছিল আমাব থুতু
> তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পব আমি শুনতে পাই
> সমুদ্রেব অভিশাপ।

মনজুব খানিকটা হকচকিযে গেল। তাব নিজের সঙ্গে কবিতাব মিল খুঁজে পাওযা যাচ্ছে। মীরাকে নিযে সে কক্সবাজাব গিয়েছিল। সমুদ্রেব মতো এত সুন্দব জিনিস অথচ সে কিনা থুতু ফেলল সমুদ্রে। মীবা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আশ্চর্য! তুমি সমুদ্রে থুতু ফেললে — ছিঃ।' সে নিজেও হকচকিযে গেল! মীবা বলল — 'এত বিশাল একটা জিনিসেব গাযে তুমি থুতু ফেলতে পারলে?'

মনজুর হালকা গলায বলল, 'সমুদ্র তো আমাদেব দেবতা না মীরা। ওব গাযে থুতু ফেললে কিছু যায় আসে না।'

'অবশ্যই সমুদ্রের কিছু যায আসে না। সমুদ্রেব কথা আমি ভাবছি না। আমি তোমাব কথা ভাবছি। তুমি কোন মানসিকতায এটা পারলে?'

'মুখে থুতু এসেছিল — ফেলে দিযেছি। এর বেশি কিছু না।'

মীরা পুরো বিকেলটা কাটাল চুপচাপ। যেন বড় ধরনের আঘাত পেযেছে।

তলপেটে ব্যথা হচ্ছে।

তীব্র ব্যথা না — এক ধরনের আরামদায়ক ব্যথা। যে ব্যথায় শরীরে ঝিমঝিম ভাব হয়। কড়া ঘুমের ওষুধ খাবার পর শরীরে যেমন আবেশের সৃষ্টি হয় — ব্যথাটা ঠিক সে রকম আবেশ তৈরি করছে। কবিতার বইয়ের পাতা ওল্টাতে ভালো লাগছে না। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে — বমি বমি ভাবটা যাচ্ছে না।

রাতের খাবার নিয়ে এল সন্ধ্যা মিলানোর আগেই। ভাত, মাছ, সবজি। তবে কিছু কিছু রোগীর জন্যে অন্য ধরনের খাবারও আছে। যেমন তার জন্যে এসেছে দু স্লাইস রুটি, এক বাটি দুধ এবং একটা কলা।

মনজুর আধখান কলা খেল। তার পাশের বেডের রোগী বলল, 'ভাইজান কলাডা ফালাইয়েন না। রাইখ্যা দেন। বাইতে ক্ষিধা চাপলে খাইবেন। এরা রাইতে কোনো খাওন দেয় না। ক্ষিধায় কষ্ট হয়।'

মনজুর বলল, 'আপনার নাম কি?'

রোগী এই প্রশ্নের জবাব দিল না। পাশ ফিরে কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। যেন একটা জরুরি খবর দেয়ার প্রয়োজন ছিল, সে দিয়েছে। তার আব কিছু বলার নেই।

'স্যার আপনার জন্য খাবার এনেছি।'

ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ার হাতে জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারাব পাশে রোগা পনের-ষোল বছরের একটা ছেলে। সে দেখতে অবিকল জাহানাবাব মতো; তবে মনে হচ্ছে খুব লাজুক। একবারও মুখ তুলে তাকায় নি।

'স্যার ও আমার ছোট ভাই — ফরিদ। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। ওকে নিয়ে এসেছি। ও আপনার সঙ্গে থাকবে।'

'আমার সঙ্গে থাকবে কেন?'

'যদি কখনো কিছু দরকাব হয।'

'কোনো কিছু দরকার হবে না। আর দরকার হলে কত লোকজন আছে।'

'স্যার, ও বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করবে। মাঝে মাঝে আপনাকে দেখে যাবে।'

মনজুর বিবক্ত গলায় বলল, 'জাহানারা তুমি যন্ত্রণা কবছ কেন? ওকে নিয়ে তুমি যাও তো। আর শোন, রাতের খাবার আমি খেয়ে নিয়েছি। খাবারও নিয়ে যাও। এক্ষুনি।'

জাহানারার মুখ ফ্যাকাসে হযে গেছে। তার ভাই ভীত চোখে তাকাচ্ছে বোনেব দিকে। জাহানারার চোখ তখন জলে ভিজে উঠল। সে প্রায অস্পষ্ট স্ববে বলল, 'ফরিদ আয়।'

দুই ভাইবোন ক্লান্ত পায়ে এগোচ্ছে — বারান্দার দিকে।

ফরিদ ফিসফিস করে বলল, 'আপা এত লোকজনের সামনে কাঁদছ? সবাই তাকিয়ে আছে তোমার দিকে!' জাহানাবা বলল, 'থাকুক।'

ফরিদ বলল, 'আপা চল বাসায চলে যাই।'

জাহানারা বলল, 'না।'

'আমরা তাহলে কী করব?'

'এখানে থাকব। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করব।'

ফরিদ তার বোনের দিকে তাকাল, কিছু বলল না। বড় বোনকে সে খুব ভয পায।

হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কিন্তু জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘর থেকে যেতে পারছে না। এই মানুষটা তার জন্যে যা করেছে তার কিছুই সে ফেরত দিতে পারছে না। কিন্তু সে ফেরত দিতে চাচ্ছে। সেই ইচ্ছাটাও এই মানুষটা জানতে পারছে না।

এই মানুষটা তাকে এবং তার পরিবারকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সে সময় কী ভয়াবহ অবস্থা। খবরের কাগজে যেখানে যা দেখছে সে অ্যাপ্লিকেশন করে দিচ্ছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং–এর কর্মী, সেলসম্যান, টেলিফোন অপারেটর, ফুলের দোকানের কর্মচারী, বিউটি পার্লারের বিউটিশিয়ান। যোগ্যতা আছে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। অ্যাপ্লিকেশন করা এবং সন্ধ্যায় মন খারাপ করে মার সঙ্গে বসে থাকা এই ছিল কাজ। মা কাঁদতেন নিঃশব্দে এবং এক সময় বলতেন, 'এখন কী হবে রে?'

জাহানারা বলত, 'জানি না মা।'

'দেশের বাড়িতে যাবি? তোর এক চাচা আছেন। উনি কি আব ফেলে দেবেন? যাবি দেশের বাড়িতে?'

'জানি না মা।'

'তুই বল — এখন কী করব?'

'আল্লাহ্ আল্লাহ্ কব। এ ছাড়া কী আর করবে।'

এই বকম অবস্থায সে ইন্টারভ্যু দিতে এল থ্রী পিতে। থ্রী পিব মালিক নিজেই আছেন ইন্টারভ্যু বোর্ডে। তাঁর সঙ্গে আবো তিন জন। সেই তিন জনেব এক জন মনজুব সাহেব।

বড় সাহেব বললেন, 'আপনাব টাইপিং স্পিড কত?'

জাহানারা ক্ষীণ স্ববে বলল, 'টাইপ জানি না স্যাব।'

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত গলায বললেন, 'চাওযা হয়েছে টাইপিস্ট আব আপনি টাইপ না জেনেই দবখাস্ত কবেছেন?'

'স্যার আমি শিখে নেব।'

'ডিযাব ইযাং লেডি, এটা তো টাইপ শেখাব স্কুল নয। আচ্ছা আপনি যান। নেক্সট।

তেতাল্লিশ জন ইন্টারভ্যু দিচ্ছে। তাদেব সবারই নিশ্চযই চাকবি প্রযোজন কিন্তু তাব মতো কি প্রযোজন? না, তার মতো প্রযোজন কাবোবই নেই। জাহানারা বাড়ি চলে গেল না। সারাদিন বসে রইল। ইন্টারভ্যু শেষ হবাব পব আবেকবার সে যাবে। দবকাব হলে চিৎকাব করে কাঁদবে।

তাব প্রয়োজন হল না। মনজুব বেব হযে এসে তাকে দেখে বলল, 'আপনাব তো ইন্টারভ্যু হযে গেছে, দাঁড়িযে আছেন কেন?' জাহানারা প্রায অস্পষ্ট স্ববে বলল, 'স্যাব আপনাব সঙ্গে কি আমি একটু কথা বলতে পারি?'

'বলুন।'

'স্যার আমি এক রাতেব মধ্যে টাইপ শিখব।'

'আপনার কি চাকবিটা খুব বেশি দরকাব?'

'জ্বি।'

'বসুন এখানে। দুপুরে কিছু খেযেছেন?'

জাহানারা জবাব দিল না।

মনজুর খানিকক্ষণ তাকিযে থেকে কনফাবেনস্ রুমে ঢুকে গেল। বেরিযে এল আধঘণ্টা পর। হাতে অ্যাপযেন্টমেন্ট লেটাব। বাড়ি ভাড়া, মেডিক্যাল অ্যালাউন্স সব মিলিয়ে তিন হাজার দু শ টাকা। অকল্পনীয ব্যাপাব।

মনজুর বলল, 'তোমার বযস খুবই কম। আমি তুমি করে বললে আশা করি বাগ কববে না। এই নাও অ্যাপযেন্টমেন্ট লেটার। এস আমার সঙ্গে চা খাও।'

জাহানারা কোনো কথা না বলে পেছনে পেছনে এল। তার খুব ইচ্ছা কবছে চিৎকার কবে বলে থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। সে বলতে পারল না। তার গলা ভার ভার হযে আসছে; চোখ জ্বালা করছে।

'বস জাহানারা।'

জাহানারা বসল। মনজুর বলল, 'আমি ধার হিসেবে তোমাকে এখন কিছু টাকা দেব যা তুমি মাসে মাসে আমাকে শোধ করবে। দেব?'

জাহানারা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

জাহানারার মা মানত করেছিলেন — মেয়ের চাকবি হলে একশ রাকাত নামাজ পড়বেন। সেই একশ রাকাত নামাজ শেষ হতে বাত চারটা বেজে গেল। জাহানারা তখনো জেগে। বারান্দায় অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে।

মা বারান্দায় এসে বললেন, 'পৃথিবীতে মানুষ এখনো আছে। এই বকম মানুষ বেশি থাকার দরকার নেই। কিছু থাকলেই হয়। একবার কি তুই উনাকে এই বাসায নিয়ে আসবি? শুধু দেখব। উনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

জাহানারা কিছু বলল না।

তার তখনো পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে স্বপ্ন। পুরোটাই স্বপ্ন। এসব জিনিস বাস্তবে কখনো ঘটে না। স্বপ্নেই ঘটে।

৬

জার্মান কালচারাল সেন্টারে ছবির এক্সিবিশন।

সুভেনিয়ারে লেখা — "Sunrise 71". পঞ্চাশটি নানান মাপের ছবি। মীরা সুভেনিযাব হাতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে। মীরার দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই — মইন তার সঙ্গে আছে। লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে মইনের দিকে। তাকে পুরোপুরি বিদেশি বলে মনে হচ্ছে। মইন প্রায় ছ ফুটেব মতো লম্বা। মাথার বেশিরভাগ চুল সাদা হওযায — চুলে লালচে কালো রং দিয়েছে। লাল চুলের ধবধবে ফর্সা একজন মানুষ। গায়ে পাযজামা-পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির উপব কাজ করা গাঢ় লাল রঙের চাদর। এমন চাদর পবতে যথেষ্ট সাহস লাগে। মইনের সাহসের কোনো অভাব নেই। তার বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে। চোখের কোল ঈষৎ ফোলা, এ ছাড়া চেহারায বযসেব কোনো ছাপ নেই। মীরার সঙ্গে মইনের দেখা এগার বছর পর। এগার বছর আগে এক মেঘলা দুপুরে মীরার মনে হযেছিল এই মানুষটিকে ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। এই মানুষটি আছে বলেই পৃথিবী আছে, চন্দ্র-সূর্য আছে। এই মানুষটি পৃথিবীতে আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দব।

মইন বেশ উঁচু গলায বলল, 'ইন্টারেস্টিং।'

তার আশপাশে যারা ছিল সবাই তাকাল। মইন মীরার চোখে চোখ রেখে বলল, 'একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে ছবি অথচ সব ছবির ক্যাপশন ইংবেজিতে। মজার ব্যাপার না মীরা?'

মীরা কিছু বলল না।

মইন আগের মতোই উঁচু গলায় বলল, 'আমি এই এক মাসে তিনটা ছবির এক্সিবিশন দেখলাম। তিনটাতেই দেখি ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে। সম্ভবত আর্টিস্টরা তাদের ছবির জন্যে বাংলা ভাষাকে যোগ্য মনে করে না।'

মীরা বলল, 'চুপ করুন তো। আপনাকে নিয়ে কোথাও যাওয়াই মুশকিল। আর্টিস্টদের নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে।'

'সেই যুক্তিটা শুনতে চাচ্ছি। তুমি কি জান?'

'না — আমি জানি না। চলুন যাই বেরিয়ে পড়ি। আর ভাল্লাগছে না।'

'আমার তো ভালোই লাগছে। একটা ছবি কিনব বলে ভাবছি। ছবি কেনার কায়দা-কানুন তুমি জানো? কার সঙ্গে কথা বলব?'

'আমি জানি না কার সঙ্গে কথা বলবেন — ঐ যে ডেস্কের কাছে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন — উনাকে জিজ্ঞেস করুন। উনিই আর্টিস্ট।'

'বুঝলে কী করে?'

'সুভেনিয়ারে উনার ছবি আছে।'

মইন লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। ইংরেজিতে নিখুঁত ব্রিটিশ উচ্চারণে যা বলল তার বঙ্গানুবাদ হল, 'স্বাধীনতা বিষয়ক আপনার ছবিগুলো দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছে। এ দেশের শিল্পীরা যে 'স্বাধীনতা' বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে তা বোঝা যায়। আপনার আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে একটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছে — ছবির নাম দ্যা বাযোনেট। আমি ছবিটি কিনতে চাই। ইউএস ডলারে আমাকে কত দিতে হবে?'

আর্টিস্ট ভদ্রলোক খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। কী বলবেন তা ইংরেজিতে ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারলেন না। শুধু বললেন — 'জাস্ট এ মিনিট।' তিনি ব্যাকুল হযে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। সম্ভবত ইংরেজি জানা পরিচিত কাউকে খুঁজছেন যিনি বাঙালি পোশাক-পরা এই বিদেশির সঙ্গে ছবির দরদাম নিয়ে কথা চালাতে পারবেন।

মইন আবার আগের মতোই ব্রিটিশ উচ্চারণে বলল — 'Is there any problem sir?'

আর্টিস্ট অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন — 'জাস্ট এ মিনিট। My English very bad.'

মইন আবার বাংলায় বলল, 'আপনার ইংরেজির জ্ঞান অল্প তাহলে ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে দিয়েছেন কেন? আপনি রাগ করবেন না। কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করছি। অনেকদিন দেশের বাইরে ছিলাম, দেশের নিয়ম-কানুন জানার চেষ্টা করছি।'

মইন ভেবেছিল আর্টিস্ট রেগে যাবে। রেগে গেলেই লজিকবিহীন উল্টাপাল্টা কথা শুরু করবে। তখন মোটামুটি একটা ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশান হতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, আর্টিস্ট একেবারেই রাগ করল না ববং হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আপনাকে দেখে আমেরিকান ভেবেছিলাম। আজকাল আমেরিকানরা খুব পাযজামা-পাঞ্জাবি পরে। শাল গায়ে দিয়ে ভাবে — এ দেশের সংস্কৃতি শিখে ফেলছে। আমি ভাই আপনার ইংরেজি শুনে ভড়কে গিয়েছিলাম। আমি সরাসরি ইংরেজি বলতে পারি না। প্রথমে বাংলায় চিন্তা করি তারপর মনে মনে ট্রানস্লেশন করি। মেট্রিকে ইংরেজিতে কত পেযেছিলাম জানেন? চৌত্রিশ। একেবারে জানের পাশ দিয়ে গুলি গেছে।'

'আপনি কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি।'

'দিচ্ছিরে ভাই দিচ্ছি। আমার সাথে বারান্দায় আসেন। বারান্দায় চা খেতে খেতে আপনাকে বুঝিয়ে দেই।'

মইন বারান্দায় চলে এল। আর্টিস্ট হাসিমুখে বললেন, 'আর্ট কলেজ থেকে বের হয়েছি চার বছর আগে। কোনো চাকরি-বাকরি নেই। ছবির এক্সিবিশন করি, কিছু ছবি বিক্রি হয়, তা দিয়ে দিন চলে। ঐসব ছবি কারা কিনে — বিদেশিরা। আমাদের মানুষরা ভাত খেতে পারে না — ছবি কিনবে কি? ঐ বিদেশিদের জন্যেই ক্যাপশনগুলো ইংরেজিতে লেখা।'

'আপনার যুক্তি গ্রহণ করা যায়।'

'তাহলে আরেকটা কথা শুনে যান — সুভেনিয়ারে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাযও ছবির নাম দেয়া আছে। আমাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে আপনি এতই উল্লসিত ছিলেন যে ব্যাপারটা লক্ষ করেন নি।'

'সরি।'

'আপনাদের মতো লোকজন যারা সারাজীবন বাইরে থাকে — মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্যে দেশে আসে এবং দেশের প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি মমতায় অসম্ভব কাতর হয়ে পড়ে তাদেরকে আমি কি মনে করি জানতে চান?'

'না জানতে চাই না। এই জানাটা আমার জন্যে খুব আনন্দজনক হবে না তা বুঝতে পারছি।'

'জানতে না চাইলে বলব না। ছবি কি সত্যি সত্যি কিনবেন না চাল দেখালেন?'

'কিনব। সত্যি সত্যি কিনব।'

'ছবির দাম দশ হাজার টাকা। ইউ.এস. ডলারে আপনি দু শ ডলার দিলেই হবে। বন্ধু হিসেবে এটা হল আমার কমিশন।'

মইন দুটি একশ ডলারের নোট বের করল।

আর্টিস্ট নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'এক্সিবিশন আরো তিন দিন চলবে। থার্ড ডে-তে বিকেলে যদি আসেন ছবি নিয়ে যেতে পারবেন। কিংবা আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলে ছবি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।'

'আমি নিজেই আসব। চা খাবার কথা বলে বাবান্দায এনেছিলেন। চা কোথায?'

'চা আসছে। একটু অপেক্ষা করুন।'

'কাউকে চায়ের কথা বলেছেন — এমন শুনি নি কিন্তু।'

'কাউকে বলি নি তবে ব্যবস্থা করা আছে। রাস্তার ওপাশে ঐ যে চাযেব দোকান দেখছেন ওদের বলা আছে যখনই আমাকে বারান্দায় দেখবে — চা নিয়ে আসবে।'

মইন লক্ষ করল, একটা বাচ্চা ছেলে দুকাপ চা নিয়ে সত্যি সত্যি আসছে।

•

মইন জার্মান কালচারাল সেন্টারে গাড়ি নিযে এসেছিল।

মীরাকে বলল, 'গাড়ি ছেড়ে দিযে রিকশা নিয়ে নিলে কেমন হয? বিকশা নিযে খানিকক্ষণ ঘুরি, কেমন। ক্ষিধেটা ভালোমতো জমুক, তারপর কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাবে। এখন বাজে মাত্র বারটা দশ। একটা-দেড়টার দিকে খাওয়া-দাওয়া করব, কেমন?'

'আজ বাদ দিলে কেমন হয়। কেন জানি ভালো লাগছে না, খুব ক্লান্ত লাগছে —।'

'ভালো না লাগলে অবশ্যি প্রোগ্রাম বাতিল করে দিতে হবে। তবে দ্বিতীযবাব আব এই প্রোগ্রাম করা সম্ভব হবে বলে মনে হয না। নয় তাবিখ আমি চলে যাচ্ছি।'

'টিকিট পেয়ে গেছেন?'

'ইয়েস মাই ফেয়ার লেডি।'

'বেশ, তাহলে চলুন রিকশা করে খানিকক্ষণ ঘুরি।'

রিকশায় উঠতে উঠতে মইন বলল, 'তুমি খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে যাচ্ছ -- কোনো অসুবিধা নেই। অনিচ্ছা দূর হয়ে যাবে। আমি এক জন ভালো কোম্পেনিয়ন, আশা করি তা স্বীকার কর।'

'জ্বি স্বীকার করি।'

'এক সময় আমার জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে এটাও বোধহয় ভুল না।'

'না ভুল না। অপেক্ষা করতাম। যখন ক্লাস টেনে পড়তাম তখন আপনাকে দেবতার মতো মনে হত।'

'এখন মনে হয় না?'

'না।'

'এখন কী মনে হয়?'

'এখন সাধারণ এক জন মানুষ বলে মনে হয়।'

'সাধারণ?'

'হ্যাঁ সাধারণ এবং একটু বোকা।'

মইন বিস্মিত হয়ে বলল, 'বোকা? এই প্রথম কেউ আমাকে বোকা বলল!'

মীরা সহজভাবে বলল, 'আমিই বুঝি প্রথম বললাম? আমার ধারণা ছিল আমার আগেও আরো কেউ বলেছে।'

'না বলে নি। তুমি কী কারণে আমাকে বোকা বলেছ একটু ব্যাখ্যা কর তো।'

'আপনার মধ্যে একটা লোক-দেখানো ব্যাপার আছে। প্রবলভাবেই আছে। আপনার মেধার একটি বড় অংশ আপনি ব্যয় করেন কীভাবে লোকদের ইমপ্রেস করবেন তার কায়দা-কানুন বের করার জন্যে। এই যে আর্ট গ্যালারিতে নাটকটা করার চেষ্টা করলেন তার পেছনে একই জিনিস কাজ করেছে। এই যে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিলেন তার পেছনেও আমাকে ইমপ্রেস করার ব্যাপার আছে। আছে না? আপনি নিশ্চয় ভাবছেন — এই কাণ্ডটা করার ফলে আমি ভাবব — মানুষটা সাধারণ আর দশটা মানুষের মতো না।

মইন বলল, 'আমি কি সিগারেট ধরাতে পারি?'

'পারেন।'

'আশা করি ধোঁয়ায় তোমার অসুবিধা হবে না।'

'না — হবে না।'

মইন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'তুমি অসম্ভব স্মার্ট হয়েছ। ভেরি ভেরি স্মার্ট।'

'আপনি কি ভেবেছিলেন এখনো আমি ক্লাস টেনের ছাত্রী?'

'তা ভাবি নি। তবে ....'

'তবে কী?'

'এ রকম স্মার্টনেসও আশা করি নি। স্মার্টনেসের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কাঠিন্যও চরিত্রে চলে এসেছে — আই লাইক ইট। হাসছ কেন মীরা?'

'আই লাইক ইট শুনে হাসলাম। মনে আছে আপনি প্রায়ই আই লাইক ইট বলতেন?'

'বলতাম নাকি? আমার মনে নেই। রিকশায় ঘুরতে ভালো লাগছে না, চল কোথাও গিয়ে বসি। রিকশায় কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না। মুখ দেখা যায় না। তাকিয়ে থাকতে হয় রিকশাওয়ালার পিঠের দিকে।'

মীরা বলল, 'আমার কিন্তু রিকশায় ঘুরতে ভালোই লাগছে। মাথা ধরেছিল। মাথাধরাটা এখন গেছে।'

'তাহলে চল খানিকক্ষণ ঘুরি। এক কাজ করি — রিকশা করেই গুলশানে যাই। গুলশানে সি ফুডের ভালো রেস্টুরেন্ট আছে। লবস্টার খাওয়া যাবে।'

মীরা কিছু বলল না।

মইন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মীরার হাঁটুতে হাত রেখেছে। তার মনে কোনো দ্বিধা, কোনো সংকোচ নেই। মীরাও কোনোরকম অস্বস্তি বোধ করছে না।

'মীরা।'

'জ্বি।'

'আমার রিকশা নেবার পেছনে যে যুক্তি তুমি দিয়েছ তা পুরোপুরি ঠিক না। রিকশার সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে — ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার সুযোগ পাওয়া যায়। এই যে আমি আমার বাঁ হাত তোমার হাঁটুতে রাখলাম — এটাও খুব অস্বাভাবিক লাগছে না তোমার কাছে। কারণ, আমার এই হাত রাখার জায়গা নেই — হা-হা-হা।'

মীরা বলল, 'আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার কোনো বাসনা কি কখনো আপনার মধ্যে ছিল?'

মইন বলল, 'ছিল না। যখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তখন তুমি ছিলে নিতান্তই বালিকা। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তাভাবনায় তোমার মাথাটা ছিল ঠাসা। তাছাড়া আমার প্রতি তোমার আগ্রহ ছিল এতই প্রবল, এতই তীব্র যে আমার আগ্রহ অপ্রয়োজনীয় ছিল।'

'এতদিন পর আপনারইবা হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার ইচ্ছা হল কেন?'

'জানি না। বয়স হয়েছে বলেই হযতো। অবশ্যি তুমি অনেক সুন্দব হযেছ। বালিকা বয়সে তোমার চেহারায় দিশাহারা দিশাহারা ব্যাপার ছিল — তাতে তোমাকে খানিকটা হলেও পাগলের মতো দেখাত।'

'এখন দেখাচ্ছে না?'

'না।'

মীরা হালকা গলায বলল, 'বালিকা বযসে আমি দিশাহারা ছিলাম না। আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করার জন্যে আপনি ছিলেন। এখন আমি দিশাহারা।'

'দিশাহারা হলেও চেহারায কিন্তু তাব ছাপ নেই। এখন তোমার কথা বল। আমি সিগারেট ধরিয়ে সিগারেট টানব। তুমি কথা বলতে থাকবে, আমি শুনব। এক সময আমি কথা বলতাম — তুমি হাঁ করে শুনতে; এখন তুমি বলবে — আমি শুনব।'

'রিকশাওয়ালাও শুনবে।'

'শুনুক, ক্ষতি কী? তার সঙ্গে দ্বিতীযবার দেখা হবাব সম্ভাবনা খুবই কম। হলেও কিছু যায় আসে না। অবশ্যি তুমি ইংরেজিতেও বলতে পার।'

'আমার বলার মতো কিছু নেই।'

'বিয়ে করছ সেই খবর পেয়েছিলাম।'

'পাওয়ারই তো কথা। আমি আপনাকে চিঠি দিয়ে জানিযেছিলাম।'

'তোমার একটি বাচ্চা মারা গেছে এই খবর কিন্তু জানাও নি। দেশে এসে শুনলাম। মাই ডিপেস্ট সিমপ্যাথি।'

মীরা কিছু বলল না। মুখের উপর সরাসরি রোদ এসে পড়েছে। কপাল বিড়বিড় করছে।

'মীরা।'

'জ্বি।'

'তোমার ম্যারেজ ব্রেকডাউন করল কেন বল তো? আমি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ স্পেসিফিক্যালি কিছু বলতে পারে না। তোমার বড় ভাই জালাল সাহেবকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনিও কিছু বলতে পারেন নি। শুধু বলেছেন — লোকটা গাধা টাইপের। তাকে মানুষ বলা যায় না। সে হচ্ছে ফার্নিচারের মতো। সত্যি?'

'খানিকটা সত্যি।'

'তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে জেনেশুনে একটা ফার্নিচার বিয়ে কববে!'

'আমি বুদ্ধিমতী না। বুদ্ধিমতী হলে — আপনার জন্যে এমন পাগল হতাম না।'

'এক সময় আমার জন্যে পাগল হয়েছিলে তার জন্যে এখন কি তুমি রিপেনটেড?'

'না রিপেনটেড না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল ঐটা। আর আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি এখন চুপ করে থাকব।'

মীরা সত্যি সত্যি চুপ করে গেল। রেস্টুরেন্টেও তেমন কিছু বলল না। মইন হড়বড় করে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। মীরার কেন জানি মনে হয়েছিল মইনের গল্প এখন আর তাকে আকর্ষণ করবে না। দেখা গেল; তা নয়। এগার বছর পরেও মইনের গল্প শুনতে তার ভালো লাগছে। শুধু ভালো না, অসম্ভব ভালো লাগছে। তার কারণ কী? বালিকা বয়সের তীব্র আবেগের স্মৃতির কারণে? এই আবেগের একটি অংশ কি এখনো রয়ে গেছে?'

'বুঝলে মীরা, যদিও তুমি আমাকে আধঘণ্টা আগে বোকা বলেছ — আমি বোকা নই। কারণ আমি যুক্তি দিয়ে চারপাশের জগৎ বুঝতে চেষ্টা করি। একজন বোকা তা পারে না। আমি যদি আবেগ দিয়ে সবকিছু বিচার করতাম তাহলে হয়তো এগার বছর আগে তোমাকে বিয়ে করতাম। তাব ফল খুব শুভ হত না। আমরা কমপেটেবল না। তেল এবং জলের মতো ঝাঁকিয়ে মেশানো যায়। কিছুক্ষণ রাখলেই আলাদা হয়ে যায়।

আমি অনেক ভেবেচিন্তে এক আমেরিকান তরুণীকে বিয়ে করেছি। আমেরিকান তরুণীরা এশিযান পুরুষদের প্রতি এক ধবনের আকর্ষণ অনুভব করে। কারণ তারা জানে এশিযানরা বিবাহবিচ্ছেদ জিনিসটা খারাপ চোখে দেখে। সহজে বিবাহবিচ্ছেদে যেতে চায না। আমেরিকান তরুণীবা সঙ্গত কারণেই স্থাযী সম্পর্কে যেতে চায।

আমাব স্ত্রী মিশেলেব হোমটাউন হচ্ছে — নিউ অবলিন্স। বাবা কোটিপতি। ফার্মিং করে মিলিওনিযাব হযেছে। তাব বিপুল অর্থেব একটা অংশ আমাব স্ত্রী পাবে। বিয়ের সময় এটিও আমার হিসেবে ছিল।

ধনী স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অনেকাংশে ক্ষমা কবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, দোষত্রুটি তাব কিছুই নেই। চমৎকার একটি মেয়ে। A loving and caring wife. এখন আমার তিনটি বাচ্চা। মিশেল তার বাচ্চাগুলোকে পাগলেব মতো ভালবাসে। আমাকে দেবতা মনে না করলেও দেবতার কাছাকাছি মনে করে এবং আমাকে খুশি কবাব জন্যে যা করে তাকেও পাগলামির পর্যাযে ফেলা চলে। একটা উদাহবণ তোমাকে দেই। তোমার বোরিং লাগছে না তো মীরা?'

'না। বোরিং লাগছে না। ঝগড়াঝাঁটির গল্প হলে বোবিং লাগত।'

'একবার মিশেল বলল, তোমাব আসছে জন্মদিনে তোমাকে আমি চমৎকাব একটা উপহার দেব। এত চমৎকার যে তুমি মুগ্ধ হযে যাবে। আমি বললাম, খুব এক্সপেনসিভ গিফট? সে বলল, মোটেই এক্সপেনসিভ নয — তবে অসাধাবণ। আমি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা কবছি। জন্মদিন এসে গেল। মিশেল বলল, তোমাব জন্মদিনেব উপহাব হল, আমি এখন বাংলায় কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারি। তোমাকে খুশি করার জন্যে আমি একটি বাঙালি পরিবাবেব কাছে গত আট মাস ধরে বাংলা শিখছি। তুমি এখন বাংলায আমার সঙ্গে কথা বলতে পাব। এই বলেই সে পরিষ্কার বাংলায বলল — "মইন, আমি ভালবাসি, তোমাকে। অল্প নয। বেশি পবিমাণে ভালবাসি।"

মীবা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি ভাগ্যবান পুরুষ মইন ভাই। আপনাব স্ত্রীর ছবি কি আপনার কাছে আছে? একটু দেখান না।'

'মিশেলের ছবি আমাব কাছে নেই। থাকলে দেখাতাম। She is quite pretty. তুমি তো কিছুই খাও নি মীরা।'

'কেন জানি খেতে ভালো লাগছে না।'
'তুমি খুব ডিসটার্বড?'
'না।'
'তোমার বড়ভাই বলছিলেন তুমি নাকি খুব ব্যস্ত হয়ে চাকরি খুঁজছ?'
'হ্যাঁ খুঁজছি।'
'আমি যদি তোমার জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করে দেই তাহলে কেমন হয়?'
'ভালোই হয়।'
'সব মিলিয়ে সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার পাবে।'
'অনেক টাকা।'
'বড় একটা কোম্পানির পিআরও — জনসংযোগ। এইসব কাজ মেয়েরা খুব ভালো পারে।'
'আমিও ভালোই পারব। চলুন আজ তাহলে উঠি?'
'আরেকটু বস। আইসক্রিম খাও। আইসক্রিম খাবে?'
'না।'
'আমি তোমাকে ছোটখাটো একটা সারপ্রাইজ দেবার ব্যবস্থা করেছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তুমি টার্মস এন্ড কন্ডিশনস্‌গুলো দেখো।'
মীরা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই চিঠিটা নিল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল। রেখে দিল তার হ্যান্ডব্যাগে। হালকা গলায় বলল, 'থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'
মইন নিচু গলায় বলল, 'তোমার বিষয়ে আমার মনে বড় ধরনের অপরাধবোধ আছে। তোমার জন্যে সামান্য কিছু করতে চাচ্ছি অপরাধবোধ খানিকটা হলেও কমানোর জন্যে।'
মীরা শীতল গলায় বলল, 'অপরাধবোধ কেন?'
মইন চুপ করে রইল।
মীরা আবার বলল, 'অপরাধবোধ কী জন্যে পরিষ্কার করে বলুন।'
'থাক বাদ দাও। চল ওঠা যাক।'
মীরা উঠল না। চেয়ারে বসেই রইল। তার চোখ ছোট হয়ে এসেছে। ভুরুর কাছে ঈষৎ ঘাম। হাতের পাতলা আঙুলগুলো অল্প অল্প কাঁপছে। এগার বছর আগের এক দুপুরে এই পৃথিবী হঠাৎ তার কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল সে মারা যাচ্ছে। এক ধরনের অদ্ভুত কষ্ট, অদ্ভুত আনন্দ। সে চুপি চুপি তাদের কলাবাগানের ফ্ল্যাটের তিনতলায় উঠে গেল। সেই ফ্ল্যাটের দরজা সব সময়ই খোলা থাকে। মীরা ঘরে ঢুকে দেখল ঠাণ্ডা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে মইন ভাইয়ের মা শুয়ে আছেন। মীরাকে ঢুকতে দেখে বললেন, ' আয় মা আয়। কী গরম পড়েছে দেখেছিস। শরীরের সব চর্বি ঘাম হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।'
মীরা কোনোমতে বলল, 'মইন ভাই কোথায় খালা?'
তিনি ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, 'আছে বোধহয় তার ঘরে। ঠাণ্ডা পানি চাচ্ছিল। মা, ফ্রিজ থেকে একটা পানির বোতল দিয়ে আয় তো।'
মীরা পানির বোতল ছাড়াই ঘরে ঢুকেছিল।
সেই নির্জন ঘুমকাতর দুপুর। বারান্দায় রেলিঙে কা-কা করে একঘেয়ে স্বরে কাক ডাকছে। মাথার উপর কর্কশ শব্দে ঘুরছে ফ্যান। মইন ভাই উবু হয়ে কী যেন লিখছেন।
মইন ভাই পায়ের শব্দে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'হোয়াট এ সারপ্রাইজ। কী ব্যাপার মীরা?'

মীরা কোনোমতে চাপা গলায় বলল, 'আপনাকে দেখতে এসেছি।'

এগার বছর আগে ঐ ঘরে যা ঘটেছিল তার জন্যে মীরার মনে কোনো অপরাধবোধ নেই। সে অনেকবার ভেবেছে। নানাভাবে ভেবেছে। প্রতিবারই মনে হয়েছে — তাকে যদি আবার এই জীবন নূতন করে শুরু করার সুযোগ দেয়া হয় সে এই ভুল আবারো করবে। আগ্রহ ও আনন্দ নিয়েই করবে।

মীরা বাসায় ফিরল সন্ধ্যায়।

মীরার ভাবী বললেন, 'জাহানারা নামে একটা মেয়ে টেলিফোন করেছিল। বলল মনজুর খুব অসুস্থ। হাসপাতালে আছে।'

মীরা বলল, 'ও আচ্ছা।'

'দেখতে যেতে চাও?'

'আজ আর যাব না। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

'জাহানারা মেয়েটা কে? তিন বার টেলিফোন কবেছে।'

'ওব অফিসে কাজ কবে — টাইপিস্ট।'

'বলেছে রাত আটটার পর আবার টেলিফোন কববে।'

'আমাকে চাইলে বলবে আমি বাসায নেই।'

মীরা তার ঘরে ঢুকে সুইচে হাত দিযে শক খেল।

সুইচ ঠিক করা হয নি। গত দুদিন ধবে তাব ঘবের সুইচ নষ্ট। বাতি জ্বলছে না। দিনেব বেলা সমস্যা হয না। বাতে অন্ধকার ঘরে ঢুকতে হয। মশারি ফেলতে হয় অন্ধকারে। দরজা-জানালা বন্ধ কবে বিছানায ওঠাব পব চাবপাশেব অন্ধকাব ভযাবহ লাগে। এক বিন্দু আলোব জন্যে প্রাণ ছটফট কবতে থাকে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে চোখ বন্ধ কবে কল্পনায আলো-ঝলমল দিন দেখা। ভাগ্যিস কল্পনা কবাব এমন অসাধাবণ ক্ষমতা দিযে মানুষকে পাঠানো হযেছিল।

'মীরা!'

মীরা চমকে পেছনে তাকাল। অন্ধকারে মানুষ খুব সহজেই চমকায়। তা ছাড়া কাপড়েব অদ্ভুত এক জোড়া স্যান্ডেল পবে জালালউদ্দিন আজকাল নিঃশব্দে হাঁটা শুরু করেছেন। আচমকা উপস্থিত হন, চিকন গলায 'মীরা' বলে এমনভাবে ডাকেন যে কেঁপে উঠতে হয।

'তোব ঘবের সুইচ আজো ঠিক কবা হয নি। দোষ আমার। আমি ইলেকট্রিশিযানকে খবর দিতে ভুলে গেছি।'

মীরা বলল, 'নো প্রবলেম।'

'একটা টেবিল ল্যাম্প লাগিয়ে দিয়ে গেছি। দেখ তো জ্বলে কিনা।'

টেবিল ল্যাম্প জ্বলে কিনা তা দেখার জন্যে এত বাতে ভাইয়া তার ঘবে আসবে এটা মীরা আশা করে না। নিশ্চযই কিছু বলার আছে। এমন কোনো বিষয যা সহজভাবে বলা যায না। যার জন্যে অজুহাত তৈরি করে ঘরে আসতে হয়।

'মীরা ল্যাম্পটা কি জ্বলছে? এটার সুইচটাও খারাপ, খুব জোরে চাপ দে। জ্বলছে?'

'হুঁ। ভাইয়া এস ঘরে এস।'

জালালউদ্দিন বললেন, 'রাত সাড়ে দশটা বাজে — এখন তোর ঘরে ঢুকে কী কবব। তুই ঘুমাতে যা। আমিও ঘুমাব।'

'তোমার যদি কিছু বলার থাকে বল।'

জালালউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমার আবার কী বলার থাকবে? তুই কি কিছু বলতে চাস?'

'না।'

'তাহলে ঘুমিয়ে পড়। ও আরেকটা কথা, চাকরির জন্যে তোর ছোটাছুটি করার কোনো দরকার নেই। মাসে মাসে তোকে যে হাতখরচ দেই সেটা সামনের মাস থেকে ডাবল করে দেব।'

'কোনো দরকার নেই ভাইয়া। চাকরি একটা পেয়েছি।'

'সে কী!'

'তোমাকে বলেছিলাম না, একজন স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট তরুণীর চাকরি পাওয়া খুবই সহজ।'

'বেতন কত?'

'বেতন কত, কী চাকরি সবই বলব, আগে জয়েন করে নেই। তোমার পিঠের ব্যথার অবস্থা কী?'

'ব্যথা এখন নেই। স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার কি জানিস, ব্যথাটা দিনে থাকে — রাতে থাকে না। তুই তো সব কিছুতেই একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে ফেলিস, এই ব্যাপারে তোর যুক্তি কী?'

'কোনো যুক্তি নেই। তুমি ঘুমাতে যাও। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। তবে তোমার যদি বিশেষ কিছু বলার থাকে তাহলে ভেতরে আস। আমার ধারণা তুমি কিছু বলতে চাও। আমার ঘরের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলে কিনা সেই খোঁজে তুমি আসবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

জালালউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, 'তোর সবচে' বড় সমস্যা কি জানিস? সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে তোর ধারণা তুই সবকিছু বুঝে ফেলিস। যেখানে বোঝার কিছু নেই সেখানেও তুই A থেকে Z পর্যন্ত বুঝে ফেলছিস।'

'রাগ করছ কেন?'

'রাগ করছি না। সত্যি সত্যি টেবিল ল্যাম্প জ্বলে কিনা দেখতে এসেছিলাম, তুই তারও একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করিয়ে ফেললি!'

'তুমি যে প্রচণ্ড রাগ করছ তার থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আমার ব্যাখ্যা ঠিক আছে। ব্যাখ্যা ভুল হলে মোটেই রাগ করতে না।'

'তুই তোর ব্যাখ্যা নিয়ে থাক। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।'

যে কাপড়ের স্যান্ডেলে তিনি নিঃশব্দে হাঁটেন সেই স্যান্ডেলেই তিনি শব্দ করে হেঁটে নিজের শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। রাগে তাঁর গা জ্বলে যাচ্ছে কারণ মীরার কথা সত্যি। তিনি আসলেই মীরার সঙ্গে জরুরি কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলেন।

তিনি বলতে এসেছিলেন মীরা যেন মনজুরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে হাসপাতালে না যায়। অসুখ অবস্থায় মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। মনজুরেরও মাথার ঠিক নেই। সে আবোল-তাবোল অনেক কিছু বলে ফেলতে পারে। এই সব শুনে মীরার যদি মনে হয় — ডিভোর্স নেয়া ঠিক হয় নি তাহলেই সর্বনাশ। সম্পর্ক ছেদের পরের এক মাস খুবই সর্বনেশে মাস। এই এক মাস কেটে যাওয়া সম্পর্কের জন্যে মন হা-হা করতে থাকে। তিনি নিজের চোখে বন্ধু ফজলুকে দেখেছেন। স্বামী-স্ত্রীতে দিনরাত ঝগড়া, কিছুতেই বনিবনা হয় না। ফজলু উত্তরে গেলে তার স্ত্রী যায় দক্ষিণে। ফজলু যদি কোনো ব্যাপারে হ্যাঁ বলে তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে পরপর তিন বার বলবে 'না'। এক সময় ফজলু বলল,

'তোমার সঙ্গে বাস করা সম্ভব হচ্ছে না।' এই এক বারই দেখা গেল তার স্ত্রীরও একই অভিমত। ডিভোর্স হয়ে গেল। ফজলু হাসতে হাসতে জালালউদ্দিনকে বলল, 'ভাই বাঁচলাম। জীবন প্রায় যেতে বসেছিল। এখন নিজেকে মনে হচ্ছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো।'

সেই মুক্ত বিহঙ্গকে দেখা গেল ডিভোর্সের দশ দিন পর তার স্ত্রীর বাবার বাড়ির সামনের রাস্তায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করে। মাথার চুল এলোমেলো, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। হাতে সিগারেটের প্যাকেট। একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে, কয়েকটা টান দিয়েই ফেলে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় দিনেও একই অবস্থা। তার স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং কঠিন গলায় বলল, 'কী চাও তুমি?' ফজলু কাঁদো–কাঁদো গলায় বলল, 'বাসায় চল।'

'বাসায় যাব মানে? 'কী বলছ তুমি?'

ফজলু আবারো বলল, 'বাসায় চল।'

'তোমার মাথা আগেই খারাপ ছিল, এখন তো মনে হয় আরো খারাপ হযেছে। বাসায কী করে যাব? পাগলের মতো কথা বলছ কেন?'

ফজলু একটা রিকশা দাঁড়া করাল এবং তৃতীযবার বলল, 'বাসায় চল।'

তার স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'শাড়িটা বদলে আসি। এই শাড়ি পরে যাব নাকি?'

এখনো তারা এক সঙ্গেই আছে। দুটি বাচ্চা হযেছে। মনের মিলের ছিটেফোঁটাও নেই। ঝগড়াঝাঁটি দশগুণ বেড়েছে। তা নিয়ে ফজলুর মাথাব্যথা নেই। জালালউদ্দিনেব ধারণা, মীরার ব্যাপারেও তাই হবে। যদিও মীবা আর দশটা মেযের মতো না। বেশ খানিকটা অন্য রকম, তবু শেষ পর্যন্ত তাই হবে। বিছানায শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মনজুব কিছু একটা বলতেই মীবার চোখে পানি এসে যাবে। সে আর হাসপাতাল থেকে নড়বে না। সেটা একটা ভযাবহ ব্যাপাব হবে।

তিনি একেবারে গোড়া থেকেই এই ছেলেটিকে বিযে না করাব জন্যে মীরাকে বলছিলেন। মীরা তাঁর কথা শোনে নি। কোনোরকম যুক্তিতে কান দেয় নি। আজ তার ফল মীরা কি হাতে হাতে দেখছে না? বেশি বুঝলে তার ফল এই হয়।

জালালউদ্দিনের মতিঝিলের অফিসে একদিন মীরা এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, 'ব্যাপার কী রে?'

মীরা বলল, 'তুমি কি খুব ব্যস্ত?'

'ব্যস্ত তো বটেই। তুই চাস কী?'

'পনের মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'জরুরি কিছু?'

'অবশ্যই জরুরি। বিযে কবব বলে ঠিক কবেছি।'

জালাল উদ্দিন অসম্ভব খুশি হলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল? চিরকুমারী থাকব, নিজের মতো থাকব ঐ পোকাগুলো মাথা থেকে নেমেছে?'

'হ্যাঁ নেমেছে।'

'ছেলেটা কে? আমি চিনি?'

'না তুমি চেন না — আমি নিজেও চিনি না।'

'আমি নিজেও চিনি না মানে? তোর সঙ্গে পরিচয় নেই?'

'পরিচয় আছে। পরিচয় থাকলেও তো সবাইকে চেনা যায় না। ও এই রকম।'

'ছেলেটা সম্পর্কে বল তো শুনি।'

'নাম হচ্ছে মনজুর।'

'নাম যাই হোক — ছেলেটা কী। কী করে? পড়াশোনা কী?'

'মোটামুটি ধরনের একটা চাকরি করে — প্রাইভেট ফার্মে। পড়াশোনা কী জিজ্ঞেস করি নি। বি.এ. পাস নিশ্চয়ই।'

'পরিচয় কত দিনের?'

'খুব বেশি হলে দুমাস।'

'ফ্যামিলির অবস্থা কী?'

'ফ্যামিলিই নেই — আর ফ্যামিলির অবস্থা।'

'ফ্যামিলি নেই মানে?'

'বাবা-মা ভাই-বোন কিছুই নেই। মা মারা গেছেন দুবছর বয়সে, বাবা ১৬ বছর বয়সে।'

'সে-কী!'

মীরা খুব শান্ত গলায় বলল, 'এই ব্যাপারটাই আমাকে খুব আকর্ষণ করেছে। ভালবাসাহীন পৃথিবীতে সে মানুষ হয়েছে। অতি প্রিয়জন সে কাউকে কখনো পায় নি। এই প্রথম পাবে। প্রবল আবেগ ও ভালবাসায় সে বাকি জীবনটা আচ্ছন্ন থাকবে।'

জালালউদ্দিন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'উল্টোটাও তো হতে পারে — ভালবাসা কী এই ছেলে জানেই না। ভালবাসবে কী?'

'না জানলে তো ভাইয়া আরো ভালো। আমি তাকে ভালবাসা শেখাব।'

জালালউদ্দিন চিন্তিত মুখে বললেন, 'তোর ব্যাপার কোনোটাই আমাব কখনো পছন্দ হয় নি; এটিও হচ্ছে না। আরো ভালোমতো আলোচনা করব। তুই চা খাবি?'

'খাব। চা খেতে খেতে তুমি কি ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে? ওকে নিয়ে এসেছি।'

'নিয়ে এসেছিস!'

'হুঁ। বারান্দায় দাঁড়া করিয়ে রেখেছি। ঠিক করে রেখেছি চা খাবার সময় তাকে ডাকব। চা খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র বিদায় করে দেব। তোমার সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কথা বলব। তুমি ছেলেটিকে দেখার পর কী মনে করছ তা শুনব।'

'দেখার আগেই বলছি আমার পছন্দ না।'

মীরা মানিব্যাগ থেকে মুখ-বন্ধ একটা খাম বের করে ভাইয়ের হাতে দিয়ে হালকা গলায় বলল, 'ছেলেটিকে দেখার পর, তার সঙ্গে কথা বলার পর তুমি যা বলবে তা আমি লিখে এনেছি। তুমি দেখবে কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায। খামটা এখন খুলবে না ভাইয়া।'

জালালউদ্দিন খাম হাতে বসে রইলেন। মীরা বারান্দা থেকে মনজুরকে নিয়ে এল। তিনি ছেলেটির মধ্যে এমন কিছুই পেলেন না যা দেখে খুব উৎসাহিত বোধ কবা যায়। গায়ে চকলেট রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট, ধবধবে সাদা প্যান্টের উপর ভালোই দেখাচ্ছে। চুল আঁচড়ানো, চেহারা মোটামুটি। চোখ-মুখে এক ধরনের অনাগ্রহ যা এই বয়সী ছেলেদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না।

জালালউদ্দিন লক্ষ করলেন, ছেলেটি তাকে ঠিক পাত্তা দিচ্ছে না। ইচ্ছাকৃতভাবে সে যে তা করছে তা হয়তো না। তার স্বভাবই হয়তো এরকম। তিনি বসতে বলার আগেই সে চেয়ার টেনে বসল।

তিনি যখন বললেন, 'চা, না কফি?'

সে বলল, 'কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।'

জালালউদ্দিন যখন সিগারেট বের করে বললেন, 'চলবে?'

সে কোনো কথা না বলে সিগারেট নিল। যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার ভাইয়ের কাছ থেকে এরকম সহজভাবে সিগারেট নেয়া যায় না। সামাজিক কিছু ব্যাপার আছে।

মীরা বলল, 'ভাইয়া এর নাম মনজুর।'

তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'শুধু মনজুর? আগে-পেছনে কিছু নেই? আহম্মদ বা মোহাম্মদ?'

মনজুর বলল, 'জ্বি না।'

'সে কী!'

মনজুর বলল, 'বাবা ডাকনাম বাখার সুযোগ পেয়েছিলেন, ভালো নাম রাখাব সুযোগ পান নি। আমার ডাকনাম মঞ্জু। স্কুলের খাতাতে আমার নাম ছিল মঞ্জু। এসএসসি পবীক্ষার রেজিস্ট্রেশনেব সময হেড স্যার বললেন, মঞ্জু নাম তো দেযা যায না; এটাকে মনজুর করে দেই। মনজুর হোসেন। হোসেন আমাব খুবই অপছন্দ কিন্তু তা বলতে পারলাম না কাবণ হেড স্যারকে খুব ভয় পেতাম।'

'তাহলে তো আপনার নাম মনজুব হোসেন। মনজুর বলছেন কেন?'

'এডমিট কার্ড যখন আসল তখন দেখা গেল হেড স্যার আমার নামের শেষে হোসেন দিতে ভুলে গেছেন। আমাব আগে যে ছিল জহিব আহাম্মদ তার নামের শেষে হোসেন লাগিযে দিযেছেন। সেই বেচারার নাম এখন জহির আহাম্মদ হোসেন।'

জালালউদ্দিন ভুরু কুঁচকে তাকিযে বইলেন। গল্পটা তাঁর খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না।

একদল মানুষ আছে যাদের ভাণ্ডাবে এবকম গোটা পাঁচেক গল্প থাকে। গল্পগুলো বলে তাবা প্রথম আলাপে লোকজনদের মুগ্ধ কবে। সবাই ভাবে, বাহ্ বেশ, এই লোকটা বসিক তো। কিন্তু রস যে এই পাঁচটিতেই সীমাবদ্ধ তা তারা জানতে পারে না।

তাঁব মনে হল — ছেলেটা কথাও বেশি বলে। নাম জিজ্ঞেস করলে যে লম্বা গল্প ফেঁদে বসে, সে তো সারাক্ষণই বকবক করবে। শেষ পর্যন্ত মীরা এমন এক জনকে পছন্দ করল! আশ্চর্য! জালালউদ্দিনের ইচ্ছা ছিল আরো দুএকটা কথা জিজ্ঞেস করাব — যেমন, বাড়ি কোথায, পড়াশোনা কী পবিমাণ কবেছেন; কিন্তু এখন আর আগ্রহ বোধ কবছেন না।

মীরা বলল, 'আচ্ছা তুমি এখন যাও। ভাইযার সঙ্গে আমাব কিছু কথা আছে। আগামীকাল এগারটার দিকে তোমাব অফিসে যাব।'

মনজুর চলে গেল। যাবার আগে সাধারণ ভদ্রতায 'স্লামালিকুম' বলার কথাও তাব মনে হল না। জালালউদ্দিনের মনটাই কালো হযে গেল। তিনি দুঃখিত হযে ভাবলেন — এই ছেলে? শেষ পর্যন্ত এই ছেলে?

মীরা বলল, 'ভাইযা এখন তোমার মতামত বল। তোমার মতামত আমাব কাগজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।'

জালালউদ্দিন বললেন, 'তোর পছন্দ হয়েছে তুই বিয়ে কর, অসুবিধা কী? এটা তোব ব্যাপার। আমার তো কিছু না।'

মীরা হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি এটা বলছ যাতে কাগজের লেখার সাথে তোমার কথা না মেলে। তুমি ইচ্ছা করেই উল্টো কথা বলছ। তাই না?'

জালালউদ্দিন বিরক্ত হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন — মীরার কথা সত্যি।

মীরা বলল, 'উঠি ভাইয়া। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।'

সে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর জালালউদ্দিন খাম খুললেন। মীরা গোটা গোটা করে লিখেছে —

> "ভাইয়া, তুমি মত দেবে। তুমি বলবে — হ্যাঁ।
> তুমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলবে। দেখলে
> আমার কেমন বুদ্ধি? এরকম এক জন বুদ্ধিমতী
> মেয়ে কখনো ভুল করবে না। আমি যা করছি
> ঠিকই করছি। তুমি ভয় পেয়ো না। ছেলেটা ভালো।"

বুদ্ধিমতী মেয়ে ভুল করে না তার নমুনা এখন দেখা যাচ্ছে। তিন বছরের মাথায় তাকে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হতে হয়েছে।

৭

বদরুল আলম ভাগ্নেকে দেখতে এসেছেন।

শুধু হাতে আসেন নি। দু ডজন কমলা, এক ডজন কলা এবং চারটা ডাব এনেছেন। একটা হরলিক্সের কৌটাও সঙ্গে আছে। তিনি বিছানার পাশে বসতে বসতে বললেন, 'তুই আছিস কেমন?'

মনজুর বলল, 'ভালো।'

'ভালো সেটা বুঝতেই পারছি। ভালো না হলে এইভাবে বিছানায় বসে কেউ চা খায়? তোকে চা খেতে দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ দিচ্ছে। শুধু তাই না — ডাক্তার বলেছে ইচ্ছা করলে আমি বাসায় চলে যেতে পারি।'

'বলিস কী!'

'গতকাল ডায়ালিসিস হল। তারপর থেকে শরীর ইমপ্রুভ করছে। এখন বেশ ভালো। যে কিড্‌নিটা কাজ করছিল না সেটাও কাজ করা শুরু করেছে বলে আমার ধারণা।'

'তোর কিড্‌নি প্রব্‌লেম তাহলে সলভড্‌। বাঁচলাম। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম প্রয়োজনে একটা তোকে দেব।'

মনজুর দরাজ গলায় বলল, 'সেই সুযোগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব না মামা। সুযোগ এখনো আছে। একশ ভাগ আছে। কিড্‌নি বদলাতে হবে।'

বদরুল আলম চুপ করে গেলেন।

মনজুর বলল, 'শুনে মনে হচ্ছে চুপসে গেলে!'

বদরুল আলম বললেন, 'চুপসে যাব না তো কী? এই বয়সে কিড্‌নি দিলে কি আর বাঁচব? অপারেশনের ধকলই সইবে না। তুই ঠিকই বেঁচে থাকবি, মাঝখান থেকে আমি শেষ।'

'তোমার আর বাঁচার দরকার কী? অনেক দিন তো বাঁচলে।'

'এই বাঁচা কি কোনো বাঁচা? পরিশ্রম করতে করতে জীবন গেল। সুখের মুখ দেখলাম না — এখন একটু দেখতে শুরু করেছি, এখন যদি মরে যাই তাহলে লাভটা কী?'

'তাও ঠিক।'

বদরুল আলম বললেন, 'নে কলা খা।'

'কলা খাব না মামা, তুমি খাও।'

'কলা হল ফ্রুটসের রাজা। একটা কলায় কতটুকু আয়রন থাকে জানিস?'

'কতটুক থাকে?'

'অনেক — বলতে গেলে পুরোটাই আয়রন।'

'তুমি বসে বসে আয়রন খাও। আমার ইচ্ছা করছে না। আর কিড্‌নি নিয়েও তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এমনি বললাম।'

'কিড্‌নি লাগবে না?'

'লাগবে হয়তো। লাগলেও তোমারটা না।'

বদরুল আলম বেশ নিশ্চিন্ত বোধ কবলেন। দুটা কলা এবং একটা কমলা খেলেন। হৃষ্ট গলায় বললেন, 'তোর এখানে কোনো লোকটোক নেই? একটা দা পেলে ডাব কেটে খাওয়া যেত।'

'এখানে কোনো লোক নেই মামা। ডাব সঙ্গে কবে নিয়ে যাও। তোমার অফিসেব লোকজন কেটে দেবে।'

'ডাবেব শাঁসেও কিন্তু আযবন আছে।'

মনজুব বিবক্ত গলায় বলল, 'তুমি আযবনেব এত খোঁজ কোথায় পেলে বল তো মামা?'

'কাঠেব মিস্ত্রি বলে তুই আমাব কথা বিশ্বাস কবছিস না?'

'বিশ্বাস কবছি। বিশ্বাস কবছি।'

বদরুল আলম বললেন, 'এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হত না।'

মনজুর বলল, 'এখানেব চা মুখে দিতে পাববে না মামা। ভযাবহ চা। প্রচুব চিনি, প্রচুর দুধ এবং প্রচুব জীবাণু।'

'প্রচুব জীবাণু মানে?'

'হাসপাতাল হচ্ছে অসুখেব গুদাম। এখানকাব চাযে জীবাণু থাকবে না তো কোথায় থাকবে? কিলবিল কবছে জীবাণু। তুমি বরং চলে যাও।'

'তুই আমাকে বিদায় কবে দিতে চাচ্ছিস কেন?'

'বিদায কবতে চাচ্ছি কাবণ তোমাব সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। তোমাব গা থেকে তার্পিন তেলের গন্ধ আসছে — গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে।'

বদরুল আলম দুঃখিত গলায় বললেন, 'তুই কি কোনো কাবণে আমাব উপর বেগে আছিস? রেগে থাকলে সেটা খোলাখুলি বল। খামাখা তার্পিন তেলের কথা আনলি কেন? আমি কি গাযে তার্পিন তেল মাখি, নাকি আমি একটা ফার্নিচাব যে আমাব গাযে দুবেলা তার্পিন তেল দিয়ে বার্নিশ করা হয়? তোব রাগটা কী জন্যে, শুনি?'

'আমার কোনো বাগ নেই।'

'অবশ্যই আছে। এবং কারণটাও জানি। কাঠমিস্ত্রি হযেছি বলেই কি আমাব বুদ্ধিশুদ্ধি থাকবে না?'

'ঠিক আছে, কী কারণ তুমি বল।'

'আমি তোকে বলেছিলাম তোর বিযেতে একটা খাট বানিযে দেব। এমন খাট যে যেই দেখবে ট্যারা হযে যাবে। সেই খাট দেয়া হয় নি — তোর রাগটা এই কারণে। কাঠ এখন কেনা হয়েছে। বার্মা টিক খুঁজেছিলাম, পাই নি। চিটাগাং টিক কিনেছি। সিজন কবা কাঠ। খুব ভালো জিনিস। ছমাসেব মধ্যে তোর খাট আমি দেব — যা কথা দিলাম।'

'ছমাস আমি টিকব না মামা।'

'পাগলের মতো কথা বলিস না।'

'সত্যি বলছি ছমাস টিকব না।'

'ডাক্তার বলেছে এই কথা?'

'ডাক্তাররা কি আর সরাসরি এই কথা বলে?'

'তাহলে কি স্বপ্ন দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কী স্বপ্ন?'

মনজুর হাসল, কিছু বলল না। বদরুল আলম উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'স্বপ্নটা কখন দেখেছিস? মাঝরাতে, না শেষরাতে? মাঝরাতের স্বপ্নের কোনো গুরুত্ব নেই; শেষরাতের স্বপ্ন হলে চিন্তার কথা।'

'শেষরাতেই দেখেছি। ঘুম ভেঙে দেখি সকাল।'

বদরুল আলম আরো উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'পেট ঠিক ছিল তো? বদহজম অবস্থায় স্বপ্ন দেখলে — ভুলে যা।

'বদহজম-টজম কিছু না। পেট ঠিকই ছিল।

'স্বপ্নে কী দেখলি?'

'দেখলাম আমি এই বিছানায় শুয়ে আছি। একটা ধবধবে সাদা চাদরে আমার সাবা শরীর ঢাকা। আমি বুঝতে পারছি আমি মাবা গেছি। একজন ডাক্তার এসে বললেন, ডেডবডি এখনো সরানো হয নি? কোনো মানে হয? খামখা একটা বেড দখল করে আছে। সবাই তখন ধরাধরি করে আমাকে নিচে নামিযে দিল। আমার বিছানায নতুন একজন রোগী চলে এল। তার কিছুক্ষণ পর জাহানারা হাসপাতালে ঢুকল। সে অবাক হযে সবাইকে জিজ্ঞেস করছে, 'স্যাব কোথায?' কেউ বলতে পারছে না। অথচ আমি মেঝেতেই পড়ে আছি।'

'জাহানারাটা কে?'

'আমাদের অফিসে কাজ করে।'

'স্বপ্নটা এখানেই শেষ, না আরো আছে?'

'আর নেই। তার পরপরই আমার ঘুম ভেঙে যায।'

'এই স্বপ্ন দেখে তোর ধারণা হল তুই আর ছমাস বাঁচবি?'

'হুঁ।'

'তুই তো দেখছি বিরাট গাধা। তোকে আমি খাবনামা বই দিয়ে যাব। পড়ে দেখিস — পরিষ্কার লেখা আছে — স্বপ্নে নিজের মৃত্যু দেখলে দীর্ঘায়ু হয। তুই বাঁচবি অনেক দিন।'

'বাঁচলে তো ভালোই। তুমি কি এখন যাবে; না বসবে আরো খানিকক্ষণ?'

'বসি কিছুক্ষণ। আমার তো আর অফিস না যে ঘড়ির কাঁটা ধরে যেতে হবে। আমার হল স্বাধীন ব্যবসা। ইচ্ছা হলে যাব, ইচ্ছা না হলে যাব না। সারাদিন তোর সঙ্গে বসে থাকতে পারি। কোনো সমস্যা না।'

মনজুর আঁতকে উঠে বলল, 'তুমি কি সারাদিন থাকার প্ল্যান করছ?'

বদরুল আলম বললেন, 'কোন প্ল্যান-ট্যান নেই। এককাপ চা খেতে পারলে হত।'

'তোমার চায়ের ব্যবস্থা করছি। দয়া কবে চা খাও। চা খেয়ে বিদেয হও।'

মনজুর বিছানা থেকে নামল। শরীর বেশ ভালো লাগছে। মাথা ঘুরছে না বা দুর্বল-দুর্বল লাগছে না। বাসায় চলে গেলে কেমন হয়? গরম পানিতে ভালো করে গোসল করে একটা লম্বা ঘুম দিলে শরীর অনেকখানি ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

মনজুর গেল চায়ের খোঁজে।

আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল জাহানারা। অবিকল স্বপ্নদৃশ্যের মতো একটা ব্যাপার হল। সে চোখ বড় বড় করে বলল, 'স্যার কোথায় স্যার?'

বদরুল আলম মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটা সুন্দর। শুধু সুন্দর না, বেশ সুন্দর। সবচে' সুন্দর তার গলার স্বর। কানে এসে গানের মতো বাজে।

জাহানারা আবার বলল, 'স্যার কোথায়? স্যার?'

বদরুল আলম বললেন, 'তোমার নাম কি জাহানারা?'

জাহানারা সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় পাশের বেডের রোগীকে বলল, 'স্যার কোথায়?'

জাহানারা আজ অফিসে যায় নি। বাসা থেকে সরাসরি চলে এসেছে। ঘর থেকে বের হবার সময় ধাক্কা লেগে পানির একটা গ্লাস ভেঙেছে। তখনই তার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ আছে।

যে বাসে আসছিল মাঝপথে সেই বাসের চাকা বসে গেল। খারাপ সংবাদ, খারাপ সংবাদ, নিশ্চয়ই কোনো খারাপ সংবাদ। কখনো বাসের চাকা বসে না — আজ বসল কেন?

বদরুল আলম আবার বললেন, 'মা, তোমার নাম কি জাহানারা?'

জাহানারা বলল, 'এই বিছানায় যে রোগী ছিলেন উনি কোথায়?'

'মনজুর আমার জন্যে চা আনতে গেছে। তুমি বস এখানে। আমি মনজুরের মামা হই। জাহানারা তোমার নাম, তাই না?'

'জ্বি।'

'কী করে বললাম বল তো?'

জাহানারা তাকিয়ে রইল। সে সত্যি বুঝতে পারছে না।

'কলা খাবে? খেয়ে দেখ। মনজুর খাবে বলে মনে হয় না। নাও একটা খাও। প্রচুর আয়রন আছে।'

ফরিদও জাহানারার সঙ্গে এসেছে। সে দরজার ওপাশ থেকে ভীত চোখে তাকিয়ে আছে। তার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার।

মনজুর চা নিয়ে ফিরে এল। তার হাতে ছোট্ট একটা ফ্লাস্ক, সঙ্গে দশ-বার বছরের একটি ছেলে যার এক হাতে দুটা খালি কাপ, অন্য হাতে কয়েকটা নোনতা বিসকিট। সে বিসকিটগুলো বদরুল আলমের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

তিনি বললেন, 'মারব এক থাপ্পড়, হাতে করে বিসকিট নিয়ে আসছে!'

ছেলেটি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'ইচ্ছা হইলে খাইবেন, ইচ্ছা না হইলে নাই। থাপ্পড় মারামারি ক্যান?'

মনজুর বলল, 'খেয়ে ফেলেন মামা। হাত যেমন নোংরা প্লেটও সেরকম নোংরা। বরং হাতে দেয়ার মধ্যে এক ধরনের আন্তরিকতা আছে।'

জাহানারা হাসছে।

তার খুব ভালো লাগছে। যে মানুষটা মর-মর হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল তাকে এমন

সুস্থ স্বাভাবিক দেখবে সে ভাবেই নি। চোখের নিচের কালিও অনেক কম। গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো কেটে ফেললেই কেউ বুঝবে না এই মানুষটা বড় ধরনের অসুখে ভুগছে।

'জাহানারা কখন এসেছ?'

'কিছুক্ষণ আগে।'

'চা-বিসকিট কিছু খাবে?'

'জ্বি না।'

'কলা খেতে পার। প্রচুর আয়রন আছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে মামাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।'

বদরুল আলম চা খাচ্ছেন। নোনতা বিস্কিটও খাচ্ছেন। দোকানের ছেলেটি কাপ ফেরত নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার হাতে এখনো দুটা বিস্কিট ধরা আছে।

জাহানারা বলল, 'আপনার শরীর তো সেরে গেছে বলে মনে হয়।'

মনজুর বলল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। দশটার দিকে ডাক্তার এসে দেখবে। তাকে বলব, আমাকে রিলিজ করে দিতে। আবার যখন শরীর খারাপ হবে, ভর্তি হব। ইতিমধ্যে কিডনি জোগাড়ের চেষ্টা চালাব। পাওয়া গেলে তো ভালোই। না পাওয়া গেলে নাই।'

জাহানারা বলল, 'স্যার আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার কিছুই লাগবে না।'

'না লাগলে তো ভালোই।'

বদরুল আলম বললেন, 'আমি তোকে একজন পীর সাহেবের কাছে নিযে যাব। অত্যন্ত পাওয়ারফুল পীর। ক্ষমতা অসাধারণ। পান-বিড়ির একটা দোকান চালায। বাইবে থেকে বোঝার কোনো উপায়ই নাই। গভীর রাতে, মিনিস্টার, সেক্রেটারি, এরা আসে।'

মনজুর বলল, 'দিনে আসে না কেন?'

'দিনে আসলে তো লাভ নাই। দিনের বেলা পীর সাহেব হচ্ছেন দোকানদার। বাতে পীর।'

'পীর সাহেবকে গিয়ে আমার অসুখের কথা বলবে?'

'হুঁ। এরা ইচ্ছা করলে কী না করতে পারে? আজ যাবি?'

'না।'

'তোকে যদি রিলিজ করে দেয় তাহলে চল না আমার সাথে। ক্ষতি তো কিছু নাই।'

জাহানারা বলল, 'স্যার যান না। পীর ফকির সাধু সন্ন্যাসী এদেব অনেক রকম ক্ষমতা থাকে।'

মনজুর বলল, 'এদের একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে লোকজনদের ধোঁকা দেযা। এব বাইরে এদের কোনো ক্ষমতা নেই।'

'ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা না বলেই তুই বুঝে ফেললি? আগে কথা বল — তাবপব ডিসিশান নে। পীর সাহেবের তাবিজ যে গলায় বাঁধতেই হবে, এমন তো কথা নেই।'

'উনি কি তাবিজও দেন নাকি?'

'না। মাঝে মাঝে গলায হাত বুলিয়ে দেন।'

'গলায় কেন?'

'আমি কী করে বলব কেন! তুই যাবি কিনা বল! আমি ফল পেয়েছি। হাতে হাতে ফল পেয়েছি।'

'আচ্ছা যাও যাব। তোমাকে খুশি করবার জন্য যাব। যদি হাসপাতাল থেকে ছাড়ে তাহলে সরাসরি চলে যাব তোমার ওখানে। এখন দয়া করে তুমি বিদায় হও। জাহানারা তুমিও যাও। আমি এখন খানিকক্ষণ ঘুমাব। ঘুম পাচ্ছে।'

জাহানারা বলল, 'স্যার আপনি ঘুমান। আমি এই চেয়ারে বসে থাকি। আমি স্যাব তিন দিনের ছুটি নিয়েছি।'

'তিন দিনের ছুটি নেয়ার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই কাল অফিসে জয়েন করছি।'

'স্যার এই শরীরে আপনি অফিসে জয়েন করবেন?'

'হুঁ।'

যে দুটি বিস্কিট নিয়ে ছেলেটি বসে ছিল, বদরুল আলম সেই দুটিও নিয়ে নিলেন এবং নিচু গলায় বললেন, 'বাবা চট করে আরেক কাপ চা আনতে পারবি?'

গলির ভেতর গলি, তার ভেতর আরেক গলি।

মনজুর বলল, 'তোমার পীর সাহেব তো মামা ভালো আস্তানা বের কবেছেন!'

বদরুল আলম বললেন, 'পীর-ফকির মানুষ; এবা কি ধানমণ্ডি-গুলশান এলাকায় থাকবে? এরা থাকবে চিপা গলিতে, বস্তিতে।'

'তুমি একে খুঁজে বের করলে কীভাবে ?'

'সে বিস্তর ইতিহাস। তোকে একদিন বলব। হাঁটতে পারছিস?'

'হুঁ।'

'শরীরটা ঠিক আছে তো?'

'এখনো আছে। চোখে এখন কিছুই দেখছি না, নর্দমায-টর্দমায পড়ব না তো?'

'তুই আমাব হাত ধরে ধবে আয।'

'তুমি কি এখানে প্রায়ই আস?'

'সপ্তাহে এক দিন আসি। উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'যেরকম নির্জন রাস্তা, আমাব তো মনে হচ্ছে ফেরাব পথে হাইজ্যাক হযে যাব। তোমার কাছে টাকা-পযসা বিশেষ নাই তো?'

'কিছু আছে, অসুবিধা নাই — বাবাব কাছে যারা আসে তারা কখনো হাইজ্যাকড্ হয় না।'

'উনাকে বাবা ডাক নাকি?'

বদরুল আলম কিছু বললেন না। মনজুর বলল, 'তুমি বাবা ডাকলে তো আমাকে দাদাজান বলতে হয।'

বদরুল আলম বিরক্ত গলায বললেন, 'উনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করিস না। এবা ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করে না।'

বাবা দোকানের ঝাঁপ ফেলে ঘুমিযে পড়েছিলেন।

ধাক্কাধাক্কির পর উঠে বসলেন। মধ্য বযেসী একজন ভদ্রলোক — যাকে বাবা ডাকা বেশ কঠিন। স্বাস্থ্যবান মানুষ। গাযে হলুদ রঙের গলাবন্ধ, নোংরা স্যুযেটার। মাথার চুল লম্বা, চোখ লাল। ঘুমাবার আগে বাবা হয়তো মুখ ভর্তি করে পান খেযেছিলেন। পানের রসে কালো ঠোঁট লালচে হয়ে আছে। ঘুম ভাঙানোয বাবাকে বেশ বিরক্ত মনে হল। কঠিন গলায় বললেন, 'কী চাই।'

'আমাকে চিনেছেন? আমি উড কিং-এর মালিক। বদরুল আলম। আর এ আমাব ভাগ্নে। এর নাম মনজুর।'

'চাই কী?'

‘কিছু চাই না। একে একটু দোয়া করে দেন — এর শরীরটা ভালো না।’

‘নিজের দোয়া নিজের করা লাগে। অন্যে কী দোয়া করব। এখন যান বাড়িতে গিয়া ঘুমান।’

‘একটু গলায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেন।’

‘বললাম তো বাড়িতে গিয়া ঘুমান। ঘুমের মধ্যেও দোয়া আছে। ঘুমেব সময শইল আরাম পায়। শইল দোয়া করে। হেই দোয়া কামে লাগে।’

মনজুর হাই তুলে বলল, ‘মামা চলুন যাই। আমার সত্যি সত্যি ঘুম পাচ্ছে।’

বদরুল আলম যেতে চাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে দোয়া না করিয়ে তিনি যাবেন না।

‘আমার ভাগ্নের শরীরটা খুবই খারাপ। একটু যদি দোয়া করেন।’

বাবার মন মনে হয গলল, বাঁ হাত উঠিয়ে আচমকা মনজুরের কণ্ঠার উপর রাখলেন। মনজুরের মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে উঠার ঠিক আগে আগে হাত সরিয়ে নেয়া হল। তখনো মনজুরের নিশ্বাস স্বাভাবিক হয নি।

‘শইল তো খারাপ, খুবই খারাপ।’

বদরুল আলম বললেন, ‘আপনি কি দোয়া করেছেন?’

‘না। দোয়ায় কিছু হওনের নাই। আইচ্ছা শুনেন, আফনের কি কোনো সন্তান মারা গেছে?’

কয়েক মুহূর্ত হকচকিত থেকে মনজুর বলল, ‘জ্বি।’

‘কন্যা সন্তান?’

‘জ্বি। কীভাবে বললেন?’

‘অনুমানে বলছি। অনুমান। আইচ্ছা অখন যান। পরে একদিন আইস্যেন। দেখি কিছু করা গেলে করমু।’

বাবা দোকানের ভিতর ঢুকে ঝাঁপ ফেলে দিলেন। উৎকট বিড়ির গন্ধ পাওযা গেল। বাবা সম্ভবত ঘুমাবার আগে বিড়ি খান।

বদরুল আলম বললেন, ‘উনার পাওয়ার দেখলি? কীভাবে বলে দিল!’

মনজুর হাই তুলতে তুলতে বলল, ‘তুমি এসে আগে বলে গেছ। খুব অন্যায কাজ করেছ মামা।’

বদরুল আলম হতভম্ব গলায বললেন, ‘আমি আগে এসে বলে গেছি?’

‘হুঁ।’

‘আমার স্বার্থ কী?’

‘আমাকে চমকে দিবে। আমি হতভম্ব হয়ে ভাবব — পীরবাবার কী ক্ষমতা! ভাগ্যিস মামা আমাকে ইনার কাছে এনেছেন। তোমার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ হব। তুমি তা দেখে খুশি হবে — এইটাই তোমার স্বার্থ। চল যাই।’

দুজনে হাঁটছে।

মনজুর খুবই ক্লান্ত বোধ করছে। মামার সঙ্গে তার আসাই ঠিক হয নি। উচিত ছিল হাসপাতালের বিছানায শুয়ে থাকা। ডাক্তাররা তাকে ছাড়তে রাজি হয নি। মনজুর যখন বলল, ‘আমি তো এখানে শুয়েই থাকি, বাসায় গিয়েও শুয়েই থাকব। নিজের পরিষ্কার বিছানায় আরাম করে ঘুমাব। আর আপনাদেরও তো খালি বেড দরকার। দরকাব না?’

এতেই ডাক্তাররা রাজি হলেন। ডাক্তারদের একজন বললেন, ‘প্রিয় মানুষদেব সঙ্গে থাকলে মন ভালো থাকবে। মন ভালো থাকলে তার প্রভাব পড়বে শবীরে — ঠিক আছে যান।’

মনজুর চলে এসেছে — এবং তার এক জন প্রিয় মানুষ মেজো মামাব সঙ্গে ঘুরছে। উচিত হয় নি; একেবারেই উচিত হয নি।

'মনজুর!'

'জ্বি।'

'তুই কি আমার উপর রাগ করলি নাকি?'

'রাগ করব কেন?'

'পীর সাহেবকে তোর বাচ্চা মারা যাবার খবরটা আগে দেয়া ঠিক হয নি।'

'তুমি তাহলে আগে-ভাগে খবর দিয়ে রেখেছ?'

বদরুল আলম কিছু বললেন না। মাফলার দিযে কান ঢেকে দিলেন। ভাবটা এরকম যেন কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। কাজে ব্যস্ত।

'বমি-বমি লাগছে মামা।'

বলিস কী, শরীব কি আবাব খারাপ কবেছে?'

'মনে হচ্ছে সে রকম।'

মনজুর বাস্তাব পাশে বসে হড়হড় কবে বমি কবতে লাগল। বদরুল আলম দোযা কুনুত পড়ে মনজুরেব মাথায ফুঁ দিতে লাগলেন।

'এত বমি করছিস — ব্যাপাবটা কী? তুই দেখি নাড়িভুঁড়ি সব বেব করে ফেলবি।'

মনজুব এক সময উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগেই তাব চোখ স্বাভাবিক ছিল। এখন টকটকে লাল। যদিও অন্ধকারে তা দেখা যাচ্ছে না।

'মামা, হাত ধরে ধবে তুমি আমাকে একটা বিকশায নিযে তোল তো।'

'মনজুর তুই কি আমাব উপব খুব বেশি বাগ কবেছিস?'

'হুঁ কবেছি — আমাব বাচ্চাব মৃত্যুব খবব আমি কাউকে বলি না। তুমি সেটা তৃতীয শ্রেণীব এক ভণ্ডকে বলেছ। উচিত হয নি।'

'তৃতীয শ্রেণীব বলছিস কেন? উনি খুব কামেল মানুষ। মানুষের চেহাবা-ছবি দিযে তো সব কিছু বিচার করা ঠিক না।'

'আমি চেহাবা--ছবি দিযে কাউকেই বিচার করি না। ঐ লোকটা ভণ্ড। তুমি প্রতি সপ্তাহে এক বাব তাব কাছে আস। তোমাকে সে খুব ভালো কবেই চেনে। অথচ আজ না চেনাব ভান কবল। না চেনার ভান কবলে তাব জন্যে সুবিধা।'

'সুবিধা কী?'

'সে যখন আমাব অতীত বলল, তখন আমি আব সন্দেহ কবলাম না যে তুমি আগেই সব বলে বসে আছ। আব কি কি বলেছ? ডিভোর্সেব কথাটা বল নি ?'

বদরুল আলম কিছু বলার আগেই মনজুর আবাব বসে পড়ল। হড়হড় কবে দ্বিতীয দফায বমি কবল।

৮

ছদিন পর মনজুর অফিসে এসেছে।

তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে অসুস্থ। বরং চকলেট বঙের শার্টে তাকে অন্যদিনেব চেযে হাসিখুশি লাগছে। অনেকদিন পর ক্লিন শেভ করলে গালে এক ধরনের আভা দেখা যায়, তাও দেখা যাচ্ছে।

কুদ্দুস বিস্মিত হয়ে বলল, 'স্যার আপনে অফিসে আইলেন?'

মনজুর বলল, 'আসা কি নিষেধ নাকি?'

কুদ্দুস দাঁত বের করে হাসল। অফিসের অন্য কেউ হাসল না। কনসট্রাকশন সাইডের ম্যানেজার পরিমল বাবু বললেন, 'শুনেছিলাম আপনি গুরুতর অসুস্থ, তা বোধহয় মিথ্যা।'

মনজুর হ্যাঁ–না কিছু বলল না। পরিমল বাবু মানুষটিকে সে পছন্দ করে না। কেন করে না তাও জানে না। এমনিতে পরিমল বাবু নিতান্তই ভদ্রলোক, পরোপকারী। অফিসের কাজেও অত্যন্ত দক্ষ। তিনি খুব অল্পসংখ্যক কর্মচারীদের এক জন যিনি দশটা–পাঁচটা অফিস করেন এবং চেয়ারের পেছনে কোট ঝুলিয়ে বাড়ি চলে যান না।

পরিমল বাবু বললেন, 'মনজুর সাহেব অফিসে আপনার সমস্যাটা কী বলুন তো?'

মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি তো কোনো সমস্যার কথা জানি না।'

'না, মানে পে–স্লিপ দেখছিলাম, লক্ষ করলাম পে–স্লিপে আপনার নাম নেই। এ মাসে বেতন হয় নি।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখুন তো ব্যাপারটা কী? আমি নিজেই জিজ্ঞেস করতাম, তারপর ভাবলাম, আমি বাইরের লোক, আই মিন আমি ইনভলভড় নই। যাঁর সমস্যা তাঁকেই প্রথমে খোঁজ নিতে হবে। আপনি ক্যাশিযারকে জিজ্ঞেস করুন।'

মনজুর বলল, 'মনে হয চাকরি চলে গেছে।'

'চাকরি চলে গেছে মানে? এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনি জন্মলগ্ন থেকে আছেন। বলতে গেলে এই প্রতিষ্ঠান আপনার নিজের হাতে তৈবী। সেখানে বিনা নোটিশে চাকবি চলে যাবে? আপনি এক্ষুনি ক্যাশিযার সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন।'

'আচ্ছা বলব।'

'স্যারও অফিসে আছেন। উনার সঙ্গে কথা বলে দেখুন কী ব্যাপার। আপনার মতো মানুষের হুট করে চাকরি চলে যাওয়া তো ভযাবহ কথা। আপনারই যদি এই ব্যাপাব হয তাহলে আমাদের কী হবে?'

মনজুর ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেল না। ক্যাশিয়ার সাহেব নিজেই এলেন। বেশ খানিকক্ষণ শরীরের খোঁজখবর নিযে বললেন, 'আপনি কি খবব কিছু শুনেছেন?'

'কোন্ খবরের কথা বলছেন?'

'আপনার পে–স্লিপের ব্যাপার।'

'শুনলাম।'

'আমি যথারীতি সব পে–স্লিপ বড় সাহেবের কাছে পাঠিয়েছি। বড় সাহেব সব পে–স্লিপেই সই করলেন, আপনারটায় করলেন না।'

মনজুর উদাস গলায় বলল, 'না করলে কী আর করা।'

'আপনি স্যারের সঙ্গে দেখা করুন। আমরা সবাই এই ব্যাপারে আপসেট। আমার তো মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। আপনি অসুস্থ মানুষ। এখন টাকা দরকার। আমি বড় সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম। উনি বললেন ....।'

ক্যাশিয়ার সাহেব কথা শেষ করলেন না। অস্বস্তি নিয়ে চুপ করে গেলেন। মনজুরও কিছু জিজ্ঞেস করল না। বেশি জানা ভালো না। জানলে মন খারাপ হবে।

মনজুরকে বড় সাহেবের ঘরে নিজ থেকে যেতে হল না। বড় সাহেবই তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মনজুর ঘরে ঢোকামাত্র নুরুল আফসার বললেন, 'তোব শরীর কেমন?'

মনজুর বলল, 'ভালো না। মারা যাচ্ছি বলে মনে হয।'
'কবে নাগাদ মারা যাচ্ছিস?'
'সম্ভবত মাস ছযেক টিকব।'
'কিডনি বদলে ফেল।'
'চেষ্টা করছি।'
'পাচ্ছিস না?'
'না।'
'এই দরিদ্র দেশে কিডনি পাবি না একটা কথা হল? পাঁচশ টাকা দিযে এই দেশে মানুষ খুন করা যায়। তুই কিডনি চেযে বিজ্ঞাপন দে, লিখে দে কুড়ি হাজার টাকা নগদ দেয়া হবে; দেখবি পাঁচশ এপ্লিকেশন পড়ে গেছে। নে সিগারেট নে।'
মনজুর সিগারেট ধরাল।
'চা খাবি মনজুর?'
'না।'
'খা এক কাপ আমাব সঙ্গে। মুখ অন্ধকাব কবে বসে আছিস কেন? ইজ এনিথিং রং?'
'না।'
'ভালো করে চিন্তাভাবনা কর; তাবপর বল — ইজ এনিথিং বং?'
'না।'
'ভেরি গুড। তোব বেতন এ মাসে হয নি সেটা দেখেছিস?'
'শুনলাম।'
'কিছু বলতে চাস?'
'না।'
'এক অক্ষরে সব কথাব উত্তব দিচ্ছিস — ব্যাপার কী? তুই কি কোনো কারণে আমার উপর রেগে আছিস?'
'না। বেগে নেই।'
'তাহলে এমন মুখ গোমড়া কবে আছিস কেন? একটা বসিকতা শুনবি — শোন, রিডার্স ডাইজেস্টে পড়লাম। এক ভদ্রলোক মৃত্যুর সময় বললেন, সবাই বলে পরকালে টাকাপযসা কোনো কাজে লাগে না। কথাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। আমি মৃত্যুর পর সঙ্গে করে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিযে যেতে চাই। ভদ্রলোক নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার তাঁর স্ত্রীকে দিযে বললেন, আমাব কফিনে এই টাকাটা দিযে দিও। ভুল হয় না যেন। তাঁব স্ত্রী কবলেন কি — নগদ ডলার রেখে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটা চেক দিযে দিলেন। হা-হা-হা।'
নুরুল আফসাব সমস্ত শবীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। অনেক কষ্টে হাসি থামিযে বললেন, 'তুই হাসলি না, ব্যাপার কী? যাকে বলছি সেই হাসছে। হা-হা-হা। শুধু পলিন হাসে নি। সে চোখ গোল গোল করে বলেছে — What is so funny about it ? ভালো কথা, পলিন তার তিন কন্যা নিযে আমেরিকা চলে যাবে বলে কথা হচ্ছে। যাকে বলে পুরোপুরি চলে যাওয়া।'
'তুই? তুই একা থাকবি?'
'না। আমিও চলে যাব।'
মনজুর তীক্ষ্ণ চাখে তাকিয়ে বইল। বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা বসিকতা কিনা। বসিকতা বলে মনে হচ্ছে না। নুরুল আফসার বললেন, 'পলিন কিছুতেই নিজেকে এডজাস্ট

করতে পারছে না। বাচ্চাগুলোও পারছে না। গত চার মাস ধরে এই নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। ঝগড়া চলছে, মনকষাকষি চলছে। এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।'

'ফার্মের কী হবে ?'

'একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে। নে আরেকটা সিগারেট নে। সিগারেটের সঙ্গে এক ঢোঁক হুইস্কি খাবি? আছে এখানে। সমানে হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছি। বাসায় খাই। অফিসে এসেও খাই।'

নুরুল আফসার ড্রয়ার খুলে হুইস্কির বোতল বের করলেন, গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বললেন, 'খাবি?'

'না।'

'আমি পুরোপুরি এলকোহলিক হয়ে গেছি। আমার আগে এলকোহলিক হয়েছে পলিন। আমেরিকায় পৌঁছেই এর চিকিৎসা করাতে হবে। পলিন এলকোহল ছাড়া কোনো তরল পদার্থই খাচ্ছে না। গত দুমাসে সে এক চামচ বিশুদ্ধ পানি খেয়েছে কিনা আমি জানি না।'

'আগে তো কিছু বলিস নি?'

'কেন বলব? মীরা যে তোকে লাথি মেরে চলে গেল তুই কি আমাকে বলেছিস্?'

'লাথি মেরে চলে যায় নি।'

'ঐ একই হল।'

নুরুল আফসার গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢাললেন। পানি মেশালেন না। ঢেলে দিলেন গলায়। তাঁর মুখ বিকৃত হল না। তবে মুহূর্তের মধ্যেই চোখ টকটকে লাল হয়ে গেল। তিনি শীতল গলায় বললেন, 'মনজুর তোকে একটা কথা বলব, মন দিয়ে শোন।'

'শুনছি।'

'এই ফার্ম ছেড়ে যাওয়া আমার জন্যে কী রকম কষ্টের তা নিশ্চয়ই তুই জানিস। জানিস না?'

'জানি।'

'পলিনকে ছেড়ে দেয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ওকে পাগলের মতো ভালবাসি। তাছাড়া ও গেলে আমার বাচ্চাগুলোও যাবে। যাবে না?'

'হ্যাঁ যাবে।'

'কাজেই ওকে খুন করার একটা সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আমার আছে। ওর হুইস্কির সঙ্গে খানিকটা আর্সেনিক মিশিয়ে দিলেই হল। আর্সেনিক জোগাড় করেছি। একটা শুভদিন দেখে জিনিসটা মেশানো হবে। বারই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে খুব শুভদিন — ওর জন্মদিন।'

'তোর নেশা হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা।'

'নেশা হয় নি। যা বলছি সুস্থ মাথায় বলছি। আজই তো বার তারিখ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তুই কি সত্যি খাবি না? খা একটু আমার সঙ্গে। মদ হচ্ছে এমন এক তরল পদার্থ যা কখনো একা খাওয়া যায় না। তাছাড়া জিনিসটা কিডনির জন্য ভালো। সত্যি ভালো।'

মনজুর চুপ করে রইল।

নুরুল আফসার বললেন, 'না খেলে চুপচাপ বসে থাকবি না। চলে যা। আর পলিনকে খুন করা সম্পর্কে যা বললাম সবই রসিকতা। নেশা হলেই বলি। নেশা হয়েছে — তোকে বলেছি। নেশা কেটে গেলে সব ভুলে যাব। তবে মনটা খারাপ। খুবই খারাপ। এত কষ্ট করে ফার্মটা তৈরি করেছি — সব জলে ভেসে যাবে। কাঁদতে ইচ্ছা হয়। নেশা খুব বেশি হলে কাঁদি। মুশকিল হচ্ছে নেশা আগের মতো হয় না। আমি পুরো বোতল শেষ করে ফেলব কিন্তু তেমন নেশা হবে না। যা তুই যা। Leave me alone.'

মনজুর বেরিয়ে এল।

জাহানারা হাতে টাইপ করা একটা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ অসম্ভব মলিন। মনে হচ্ছে টাইপ করতে করতে সে খানিকটা কেঁদেছে। তার চোখের কাজল লেপ্টে গেছে। আজকালকার মেয়েরা চোখে কাজল দেয় বলে মনজুরের ধারণা ছিল না। এই মেয়েটা দেয়। মীরাও দিত। মীরার সঙ্গে কি এই মেয়েটির কোনো মিল আছে? না কোনো মিল নেই। দুজন সম্পূর্ণ দুরকম।

জাহানারা বলল, 'স্যার আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

মনজুর বলল, 'টাইপ হয়ে গেছে?'

'জ্বি।'

'ইত্তেফাকে পাঠিয়ে দাও। বল পরপর তিন দিন ছাপাতে।'

'আপনি কি দেখে দেবেন না?'

'না।'

'স্যার একটু দেখে দেন।'

মনজুব দ্রুত চোখ বুলাল —

কিডনি প্রয়োজন

একটি কিডনি কিনতে চাই। কেউ আগ্রহী হলে
অতি সত্বব যোগাযোগ কবতে অনুবোধ কবা হচ্ছে।

ঠিকানা দেযা আছে উড কিং–এব। কেযাব অফ বদরুল আলম। মনজুবের মনে পড়ল — মামাকে এ ব্যাপাবে কিছুই জানানে হয় নি। বিজ্ঞাপনটা ছাপা হবাব আগেই জানানো উচিত।

জাহানাবা বলল, 'স্যাব আপনি কি কিছুক্ষণ অফিসে থাকবেন না চলে যাবেন?'

'আছি কিছুক্ষণ।'

'আপনার শবীব কেমন?'

'ভালো। বেশ ভালো।'

জাহানাবা খানিকক্ষণ ইতস্তত কবে বলল, 'স্যাব আপনি কি একদিন আমাদের বাসায আসবেন?'

'আসব। অবশ্যই আসব।'

জাহানাবা মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এব আগেও এই মানুষটিকে সে কয়েকবাব তাদেব বাসায যেতে বলেছে। প্রতিবাবেই মনজুবের উত্তব ছিল — 'যাব। অবশ্যই যাব। কেন যাব না?' অথচ কোনো বাবই জিজ্ঞেস কবে নি — ঠিকানা কী। এবারো জিজ্ঞেস করলেন না। আসলে উনি যাবেন না। কোনোদিনও না।

জাহানাবা ক্ষীণ স্ববে বলল, 'স্যার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কবব?'

'জিজ্ঞেস কর।'

'অফিসে সবাই বলাবলি করছে আপনার চাকরি নেই। কথাটা কি সত্যি?'

'জানি না। সত্যি হতেও পাবে।'

'আপনি বড় সাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?'

'না। তবে সত্যি হওয়া সম্ভব — অনেকদিন ধবেই দেখছি আমার টেবিলে কোনো ফাইল নেই। অফিসে আমি অপ্রযোজনীয হযে পড়েছি। আমাকে ছাড়াই সব কাজ চলছে

এবং খুব ভালোভাবে চলছে। আমাদের বড় সাহেবকে আমি খুব ভালো করে চিনি। সে কখনো অপ্রয়োজনীয় মানুষজন রাখবে না। তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও না। ফার্মকে বড় করতে হলে কিছু কঠিন নিয়মকানুনের দরকার হয়।'

মনজুর নিজের অফিসে ঢুকে গেল।

খুব ক্লান্ত লাগছে। ঘুম পাচ্ছে। টেবিলে কোনো ফাইলপত্র নেই। ইজিচেয়ারে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা যায়। মনজুর ইজিচেয়ারে কাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

জাহানারা পেছনে পেছনে আসছিল। ঘুমন্ত মনজুরকে দেখে তার মনটা অসম্ভব খারাপ হল। কী অসুস্থ একটা মানুষ। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথা কাত হয়ে আছে। কেমন অসহায় অসহায় ভঙ্গি। একটা বালিশ থাকলে মাথার নিচে দিয়ে দেয়া যেত।

৯

জাহানারা মাছ কুটছিল।

ঘরে ছাই নেই। ছোট ছোট মাছ, কুটতে এমন অসুবিধা হচ্ছে, পিছলে পিছলে যাচ্ছে। একটা ঠিকা-ঝি আছে; সে মাসের গোড়ায় পলিথিনের ব্যাগে এক ব্যাগ ছাই দিয়ে যায়। এক ব্যাগ ছাইয়ের দাম দুটাকা। এই মাসে তার ছাই রাখা হয় নি। এক ব্যাগ ছাইযেব জন্যে সে চাইল পাঁচ টাকা। জাহানারা বলল, 'এক ধাক্কায় আড়াইগুণ দাম বেড়ে গেল, ব্যাপারটা কী?'

ঠিকা-ঝি গম্ভীর গলায বলল — 'সব জিনিসের দাম বাড়তাছে আফা। আব এই ছাই হইল আসল। আমার কাছে নকলের কারবার নাই।'

জাহানারা বিরক্ত গলায বলল, 'ছাইয়ের আবাব আসল-নকল কী? যাও নিয়ে যাও — ছাই লাগবে না।'

'না লাগলে নাই — ধমক দেন ক্যান?'.

'ধমক দিলাম কোথায়? খামাখা তর্ক না করে কাজ শেষ কর।'

'হিসাব মিটাইয়া দেন আফা — আফনাগো বাড়ি কাম করুম না। আফনেরা মানুষ বালা না।'

ঝি চলে গেলে মহা সমস্যা জেনেও জাহানারা হিসাব মিটিযে দিল। বুড়ি ছাইযেব ব্যাগ হাতে মুখ অন্ধকার করে চলে গেল। এখন মনে হচ্ছে পাঁচ টাকা দিযে এক ব্যাগ আসল ছাই কেনাই ভালো ছিল। ছাই থাকত, কাজের লোকও থাকত।

দরজার কড়া নড়ছে। জাহানারাকেই উঠতে হবে। ঘরে আর কেউ নেই। মার দাঁতে যন্ত্রণা, ফরিদ মাকে নিয়ে গেছে মেডিক্যাল কলেজে। দুপুরের আগে ফিরতে পারবে না। এর মধ্যেই রান্না শেষ করে রাখতে হবে। তারা ফিরে এলে তবেই জাহানারা অফিসে যাবে। সমস্যা হবে না সে বলে এসেছে। তবু খারাপ লাগে।

জাহানারা দরজা খুলে হকচকিয়ে গেল। মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারার ইচ্ছা করল আনন্দে চিৎকার করে উঠতে। এরকম অদ্ভুত ইচ্ছার জন্যে পরমুহূর্তেই লজ্জায প্রায নীল হয়ে গেল।

মনজুর বলল, 'তোমাদের বাসা খুঁজতে খুব যন্ত্রণা হযেছে। এখানে বাসাব নাম্বাবেব কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কেমন আছ জাহানারা?'

'জ্বি স্যার ভালো।'

'আসতে বলেছিলে — আসলাম। তোমার মা ভালো আছেন?'

'জ্বি স্যার আসুন, — ভেতরে আসুন।'

জাহানারা লক্ষ করল সে ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। তার শরীর কাঁপছে। কেন এরকম হচ্ছে? এরকম হচ্ছে কেন?

'কোনো সাড়াশব্দ নেই, তুমি কি বাসায় একা?'

'জ্বি স্যার। আমার মা গেছেন দাঁত তুলতে। ফরিদ মাকে নিয়ে গেছে। আপনি বসুন।'

'তোমার মার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই এসেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি অফিসে থাকবে, আমি তোমার মার সঙ্গে দেখা কবে চলে যাব।'

'মা এসে পড়বেন। আপনি বসুন।'

মনজুর বসল। জাহানারার কান্না পাচ্ছে। বসার ঘরটা ফবিদ কী করে বেখেছে। এলোমেলো হযে আছে বিছানার চাদব। বসার ঘবে ফরিদের খাট না রাখাই উচিত ছিল। বসাব ঘরটা থাকবে সুন্দব, গোছানো।

জাহানারা বিছানাব চাদর ঠিক করতে গিযে হাতের মযলায মাখামাখি করে ফেলল। মাছ কুটতে কুটতে সে উঠে এসেছে তাব মনেই নেই, হাত ধোযা হয় নি।

'জাহানারা!'

'জ্বি।'

'আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দিতে পারবে?'

'স্যাব, এক্ষুনি আনছি।'

ঘবেব গ্লাসগুলো এত বাজে। কী ক্ষতি ছিল একটা সুন্দর গ্লাস যদি ঘবে থাকত? বমিজদের বাসা থেকে একটা গ্লাস নিযে আসবে? তাব সঙ্গে ফ্রিজেব এক বোতল ঠাণ্ডা পানি? ওরা আবাব কিছু মনে করবে না তো? করুক মনে। কিছু যায আসে না। ভালো চাযেব কাপও একটা আনতে হবে। জাহানাবা ঠিক করে ফেলল, এবাবেব বেতন পেযে সে আব কিছু করুক বা না করুক, চমৎকাব একটা গ্লাস কিনবে, একটা চাযেব কাপ কিনবে। আচ্ছা স্যারকে কি সে দুপুবে খেতে বলবে? বললেই কি উনি খাবেন? যদি খেতে বাজি হন — কী দিযে সে খাওযাবে?

জাহানাবা বাবান্দায এসে দেখল বিড়াল মহানন্দে মাছ খাচ্ছে। খাক, যা ইচ্ছে করুক। তাব ভালো লাগছে না। জ্বব-জ্বর লাগছে। জাহানাবা পাশেব বাসা থেকে পানির বোতল এবং গ্লাস আনতে গেল।

ঘবে কিচ্ছু নেই। শুধু এক গ্লাস পানি কি কাউকে দেযা যায? পানিব গ্লাস টেবিলে বাখতে রাখতে জাহানাবা নিজেব অজান্তেই বলে ফেলল, 'স্যাব আমাদেব সঙ্গে চাবটা ভাত খাবেন?'

মনজুর বিস্মিত হযে বলল, 'ভাত?'

'খেলে খুব খুশি হব স্যার। আর এর মধ্যে মা এসে যাবেন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। ভাত খাব। কী রান্না?'

জাহানারার মুখ শুকিযে গেল। কিছুই তো রান্না নেই! সে কী খাওযাবে? কেন সে ভাত খাওযার কথা বলতে গেল? কেন সে এতবড় বোকামি কবল? ফবিদ এলে তাকে রিকশা করে কাঁচাবাজারে পাঠালে সে কি মাছ-মাংস কিছু আনতে পারবে না? নাহয আজ একটু দেরি করেই খাওয়া হবে।

'কী রান্না তা তো বললে না?'

'এখনো কিছু রান্না হয় নি স্যার।'

'তাহলে বরং এক কাজ করি। অন্য একদিন এসে খেয়ে যাব। আজ থাক। শরীরটাও ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে জ্বর আসছে।'

জাহানারার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, স্যার আপনি যেতে পাববেন না। আপনাকে থাকতে হবে। আমি নিজের হাতে রান্না করে আপনাকে খাওয়াব। শুধু এক দিন, শুধু এক বার। মানুষ হবার অনেক যন্ত্রণার একটি হচ্ছে — যা বলতে প্রাণ কাঁদে তা কখনো বলা হয় না।

মনজুর বলল, 'উঠি কেমন? আরেকদিন এসে তোমার মার সঙ্গে দেখা করব।'

১০

টেলিফোনের শব্দে মনজুরের ঘুম ভেঙে গেল।

সব কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। সে কোথায়? অফিসে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা মনে আছে। এখনো কি অফিসেই ঘুমাচ্ছে? তাকে রেখে অফিস বন্ধ করে সবাই চলে গেছে? না, তা কেমন করে হয়? চারদিক অন্ধকার। অফিস এত অন্ধকার হবে না। আরে এতো তাব নিজের বিছানা! সে বাসায় কখন ফিরল? টেলিফোন বেজেই চলছে। টেলিফোন ঠিক হযে গেল নাকি? নিশ্চয়ই ভৌতিক কোনো ব্যাপার। ঐ ছেলেটিই বোধহয টেলিফোন কবছে — 'ভিমরুল'। একমাত্র ঐ ছেলেটিই টেলিফোন করে তাকে পায। আব কেউ পায না।

মনজুর আধো ঘুম আধো জাগরণে বিসিভার কানে লাগিযে বলল, 'হ্যালো ভিমরুল?'

ওপাশ থেকে অভিমানী গলা শোনা গেল — 'আপনি আমাকে ভিমরুল বলছেন কেন?'

'ঠাট্টা করছি। তোমাকে খ্যাপাচ্ছি।'

'আমার কিন্তু খুব রাগ লাগছে।'

'খুব বেশি রাগ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'খুব বেশি রাগ হলে তুমি কী কর?'

'কিছু করি না।'

'কাঁদো না?'

'না। আমি তো ছেলে। ছেলেদের কাঁদতে নেই।'

'তা তো বটেই — আমি যখন তোমার মতো ছিলাম তখন ছেলে হযেও খুব কাঁদতাম। তারপর হঠাৎ একদিন কান্না বন্ধ করে দিলাম।'

'কেন?'

'সেটা একটা মজার গল্প। তখন আমার মা মারা গেছেন। বাবা, আমি আর একটা কাজের ছেলে এই তিন জন থাকি। বাবা খুব কঠিন মানুষ। কথায় কথায় শাস্তি দেন। একবার কী অন্যায় যেন কবেছি বাবা আমাকে শাস্তি দিলেন — বাথরুমে ঢুকিয়ে বাইবে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর কি হল জান? তিনি আমার কথা ভুলে গেলেন। চলে গেলেন বাইরে। সেই বাতে আর ফিরলেন না। আমি সারারাত অন্ধকার বাথরুমে আটকা পড়ে রইলাম।'

'কাজের ছেলে আপনার খোঁজ করল না?'

'না। সে ভেবেছিল আমি বাবার সঙ্গে গিয়েছি।'

'আপনি কান্নাকাটি করলেন না? চিৎকার করলেন না।'

'প্রথম কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদলাম তারপর কান্না বন্ধ করে দিলাম। পরদিন ভোরে বাবা এসে বাথরুমের দরজা খুলে আমাকে বের করলেন।'

'উনি তখন কী করলেন?'

'সেটা আমি তোমাকে বলব না — একী ভিমরুল তুমি কাঁদছ নাকি?'

'না।'

'আমি যেন ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ শুনলাম।'

'কাঁদলে কী?'

'কিছুই না — নাথিং.....'

ওপাশের কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

টেলিফোন পুরোপুরি ডেড। মনজুর উঠে বাতি জ্বালাল। ঘড়ি দেখল — রাত দুটো। রাত দুটার সময় ইমরুল নিশ্চয়ই তাকে টেলিফোন করে নি। পুরো ব্যাপারটিই কি তার কল্পনা? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

মনজুর বাথরুমের দিকে রওনা হল।

বাথরুম সেরে গরম এক কাপ চা খাবে। চিনি, দুধ সবই কেনা আছে। চিনি সে রেখেছে 'সমুদ্র' নামের কৌটায়। এটা ঠিক হয় নি। সমুদ্র নামের কৌটায় রাখা উচিত ছিল লবণ --- চিনি নয়। আমরা সব সময় যাকে যেখানে রাখার কথা সেখানে না রেখে ভুল জায়গায় রাখি।

'আপনার কিছু লাগবে ?'

মনজুর চমকে তাকাল। পনের-ষোল বছরের লাজুক ছেলেটিকে সে চিনতে পারল না। সে কে? এখানে এলইবা কোত্থেকে?

'তুমি কে?'

'স্যার আমার নাম ফরিদ।'

'ফরিদ নামের কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না!'

'আমি জাহানারা আপার ছোট ভাই।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা। জাহানারা তোমাকে এখানে পোস্টিং দিয়ে গেছে?'

'জ্বি।'

'মেয়েটা তো বড় যন্ত্রণা করছে।'

ফরিদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে মনজুর বলল, 'আমার এই কথায় তুমি কি মন খারাপ করলে?'

'জ্বি না স্যার।'

'স্যার বলছ কেন? আমি তো তোমার স্যার না। তুমি কী পড়?'

'এইবার এসএসসি দেব।'

'সায়েন্স না আর্টস?'

'কমার্স। আমি পড়াশোনায় খুব খারাপ।'

'তুমি কি চা বানাতে পার?'

'জ্বি না।'

'শুধু পড়াশোনায় না, তুমি তো মনে হচ্ছে কাজকর্মেও খারাপ। পানি গরম করতে পার?'

'জ্বি পারি।'

'ভেরি গুড। পানি গরম কর। আমি বাথরুম থেকে এসেই চা বানাব এবং তোমাকে চা বানানো শিখিয়ে দেব।'

ফরিদ হেসে ফেলল।

রাত আড়াইটা।

দুজন নিঃশব্দে চা খাচ্ছে। মনজুর সিগারেট ধরিয়ে সহজ গলায় বলল, 'ফরিদ সিগারেট খাবে নাকি?'

ফরিদ চমকে উঠল।

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, 'অল্পবয়স্কদের সিগারেট সাধা হচ্ছে আমার সস্তা ধবনেব রসিকতার একটি। এই রসিকতা করে একবার কী বিপদে পড়েছিলাম শোন। ক্লাস টুতে পড়ে একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম — খোকা সিগারেট খাবে ? সে গম্ভীব গলায বলল, 'জ্বি খাব। দিন একটা।'

মনজুর খুব হাসতে লাগল।

হাসছে ফরিদও। প্রথম দিন এই মানুষটাকে খুব খাবাপ লেগেছিল। আজ লাগছে না। আজ ভালো লাগছে।

'ফরিদ।'

'জ্বি।'

'আমি একটা ছেলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলাম। তুমি কি কিছু শুনতে পেয়েছ?'

'জ্বি না।'

'তুমি কি জেগে ছিলে?'

'জ্বি জেগে ছিলাম। নতুন জাযগায় আমাব ঘুম হয় না।'

'তুমি যদি জেগে থেকে কিছু না শুনে থাক তাহলে ধবে নিতে হবে আমাব মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি একটা কাজ কর — আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস কব। দেখি বলতে পারি কিনা। পাগলেরা ধাঁধার উত্তর পাবে না।'

ফরিদ বলল, 'আপনি শুয়ে থাকুন। আপনার বিশ্রাম দরকার।'

'এখন আমার শরীরটা খুব ভালো লাগছে। বিশ্রামের কোনোই দরকাব নেই। এস দুজন বারান্দায় বসে থাকি।'

'আপনার ঠাণ্ডা লাগবে।'

'তা লাগবে। লাগুক না। চল — ভোর হওয়া দেখি।'

'ভোর হতে এখনো অনেক দেরি।'

'মোটেই দেরি নয় ফরিদ সাহেব। সময় অত্যন্ত দ্রুত যায়। আমরা জীবন শুরু কবি, তারপর হঠাৎ একদিন দেখি — সময় শেষ — দুয়ারে পাল্কি এসে দাঁড়িয়েছে।'

১১

আজ মীরার নতুন চাকরিতে যোগ দেবার কথা।

জালালউদ্দিন গাড়ি রেখে গেছেন। প্রথম দিন সে গাড়ি করে যাক। মীরা বলেছে গাড়ি লাগবে না তবু খুশিই হয়েছে। গাড়ি সে ছেড়ে দেবে না। শুরুর দিনটিতে তারা নিশ্চয়ই তাকে সারাদিনের জন্যে রেখে দেবে না। কাজটাজ খানিকটা বুঝিয়ে দিয়ে বলবে — বাসায় চলে যান। প্রথম দিনেই এত কাজের দরকার নেই। সে তখন গাড়ি নিয়ে খুব ঘুরবে। বিশেষ কোথাও যাবে না। এমনি ঘুরবে। গুলশান মার্কেট যেতে পারে। সুন্দর সুন্দর কিছু বিছানার চাদর কেনা যেতে পারে। বিছানার চাদর কেনা মীরার হবি বিশেষ। কত ধরনের চাদর যে তার আছে — তারপরেও কেনা চাই।

কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকে বলল, 'আফা আপনার কাছে আইছে।'

'কে এসেছে?'

কাজের মেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল। যার মানে যে এসেছে তার পরিচয় দিতে লজ্জা লাগছে এবং কিঞ্চিৎ হাসি পাচ্ছে। নিশ্চয়ই মনজুর। মীরা কঠিন গলায় বলল, 'হাসছ কেন?'

হাসি থেমে গেল। কাজের মেয়েটি এখন ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। মীরা এমন কঠিন করে কথা বলবে তা হয়তো সে ভাবে নি। মীরা শীতল গলায় বলল, 'উনি যদি আসেন কখনো এমন করে হাসবে না, যাও দুকাপ চা দিতে বল।'

আটটা চল্লিশ বাজে। এখনো অনেক সময় আছে। দশটা বাজার পনের মিনিট আগে রওনা হলেই হবে। মীরা আয়নার দিকে তাকাল। চুল বাঁধা হয় নি। এই ভাবেই কি যাবে, না চুল বাঁধবে? শাড়িটাও গুছিয়ে পরা নেই। একটু কি গুছিয়ে পরা উচিত না ? সে চিরুনি হাতে নিয়ে দ্রুত চুলের উপর টানতে লাগল।

আশ্চর্য মীরাকে ঢুকতে দেখে মনজুর উঠে দাঁড়াল। বাইরের একজন মহিলাকে সে যেন সম্মান দেখাচ্ছে। কোনো মানে হয়? মীরা বলল, 'কেমন আছ?'

'ভালো।'

'কী রকম ভালো সেটা শুনি।'

'মোটামুটি ভালো। চলাফেরা করতে পারছি। কতদিন পারব জানি না।'

'তোমার হাসপাতালে ভর্তি হবার খবর শুনেছি। সরি, দেখতে যেতে পারি নি। হাসপাতাল আমার ভালো লাগে না। বাবা একবার অসুখ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। দশ দিন ছিলেন। আমি দেখতে যাই নি। হাসপাতালের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।'

মনজুর হেসে বলল, "কৈফিয়ত দিচ্ছ কেন? আমি কি কৈফিয়ত তলব করতে এসেছি?'

'কী জন্যে এসেছ?'

'তোমার অনেক জিনিসপত্র আমার কাছে রয়ে গেছে — ঐসব কী করবে তাই জানতে এসেছি।'

'থাকুক তোমার ওখানে। এক সময় নিয়ে আসব।'

'আমি এখন কিছুদিন মেজো মামার সঙ্গে থাকব। তোমার জিনিসপত্র আবার নষ্ট না হয়।'

'নষ্ট হলে হবে, কি-বা আছে!'

মনজুর উঠে দাঁড়াল। মীরা বলল, 'বস চা আসছে। তুমি যাবে কোথায় অফিসে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি নামিয়ে দেব। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। সাড়ে নটার সময় আমি বেব হব। চলবে তো?'

'চলবে।'

কাজের মেয়েটি চা নিয়ে ঢুকেছে। শুধুই দুকাপ চা, সঙ্গে কিছুই নেই। সামান্য ভদ্রতাটুকুও কি এরা এই মানুষটাকে দেখাবে না?

'নাও চা খাও। চিনি হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'আমি এর মধ্যে তোমার খোঁজ নেয়ার জন্যে তোমাদের অফিসে টেলিফোন করেছিলাম। তুমি ছিলে না। অফিসের এক ভদ্রলোক বললেন, তুমি আজকাল অফিসে খুব কম আস। তোমার শরীর কি বেশি খারাপ?'

'শরীর খুব বেশি খারাপ না। অফিসে যাই না কাবণ মনে হচ্ছে আমাব চাকবিটা নেই।'

'কী বলছ তুমি!'

'এখনো নিশ্চিতভাবে জানি না তবে এদেব ভাবভঙ্গিতে তাই মনে হচ্ছে।'

'তুমি ভালোমতো জানতেও চাও নি?'

'না।'

'কেন না — সেটা আমাকে গুছিয়ে বল।'

'আমার ইচ্ছা করছিল না। যা হবাব হবে।'

'তুমি গা এলিয়ে পড়ে থাকবে?'

'সব সময় তো তাই করেছি।'

'এটা কি কোনো বাহাদুবি?'

মনজুর কিছু বলল না। মনে হয একটু হাসল। মীবা বাগী গলায বলল, 'তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন গা এলিযে পড়ে থাকা খুব অহংকারেব ব্যাপাব। যেন তুমি মস্ত কাজ করে ফেলছ!'

'রেগে যাচ্ছ কেন মীবা?'

'রাগের কাণ্ড করছ তাই রেগে যাচ্ছি। এই ফার্ম দাঁড়া কবাবাব পেছনে তোমাব কনট্রিবিউশন আমি কি জানি না? তুমি কখনো বল নি, তোমার বস বলেছে। আব সে তোমাকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলবে — তুমি কোনো কথা বলবে না?'

মনজুর সিগারেট ধরিযে বলল, 'একেকজন মানুষ একেক রকম হয। আমি ছোটবেলা থেকেই এরকম। কত বড় বড় ঘটনা ঘটে, প্রথমে খুব হকচকিযে যাই, তারপর মনে হয– আচ্ছা ঠিক আছে। কি আর করা।'

'তুমি তাহলে এক জন সাধুপুরুষ? মহামানব?'

'আরে কী যে বল। তুমি এতদিন পর আজ হঠাৎ এত রাগ কবছ কেন?'

'জানি না। তোমাকে দেখে কেন জানি খুব রাগ লাগছে। যাও আব বাগ করব না। তুমি খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আরেক কাপ চা খাও। আমি কাপড় বদলে আসি।'

'আচ্ছা।'

'তোমাকে বলা হয় নি আজ আমি একটা চাকরিতে জয়েন কবছি।'

'বাহ্ ভালো তো।'

'সামনের মাসেই নতুন বাসা নেব।'

'ভেরি গুড। তোমার নতুন বাসার জন্যে কোনো ফার্নিচার দরকার হলে আমাকে বলবে। আমি মামাকে বলে ভালো ফার্নিচারের ব্যবস্থা করে দেব।'

'থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে এখন কাপড় বদলাতে যাই। আমার বেশিক্ষণ লাগবে না — চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

মীরার এত সময়ও লাগল না। ত্রিশ মিনিটের মাথায় ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখল মনজুর সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। দুবার ডাকতেই ধড়মড় করে উঠে পড়ল। লজ্জিত গলায় বলল, 'আমার এখন প্রধান সমস্যাই হচ্ছে ক্লান্তি। হেঁটে হেঁটে তোমার এখানে এসেছি তো, ক্লান্ত হয়েছি — ঘুম এসে গেছে। সরি এবাউট ইট।'

'হেঁটে হেঁটে এলে কেন?'

'রিকশায় ওঠা আমার জন্যে বিরাট সমস্যা, দুলুনিতে ঘুম পেয়ে যায়। রিকশায় ঘুমিয়ে পড়া বিরাট রিস্কি ব্যাপার।'

'তোমার শরীর তো খুবই খারাপ।'

মনজুর সহজ গলায় বলল, 'কিডনি ট্রান্সফার করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিডনি সত্যি সত্যি ট্রান্সফার করতে হচ্ছে?'

'হুঁ।'

'কে দিচ্ছে কিডনি?'

'এখনো ঠিক হয় নি। ডোনার চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি।'

'কবে দিয়েছ?'

'তিন দিন হল। এখনো কেউ আসে নি।'

'কত টাকা দিচ্ছ ডোনারকে?'

'এক লাখ।'

'এত টাকা!'

'একজন তার শরীরের মূল্যবান একটা অংশ দিয়ে দেবে আর তাকে এক লাখ টাকাও দেব না?'

'আছে তোমার কাছে এত টাকা?'

'না। আমার খালা কিছু দিয়েছেন — আর মামাও দিচ্ছেন।'

'ট্রান্সপ্লেন্টটা হবে কোথায় ?'

'মাদ্রাজে। ভ্যালোর। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।'

'যোগাযোগটা করছে কে? তুমি নিশ্চয়ই না।'

'মামাই সব দেখাশোনা করছেন।'

'তোমার তো অনেক টাকা লাগবে।'

'তা লাগবে।'

'আমার কাছ থেকে টাকা নিতে তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমি কিছু দিতে পারি। পরে ফেরত দিয়ে দিও।'

মনজুর কথা বলল না।

গাড়িতে সে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে গেল। মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'ওখানে বসছ কেন? পেছনে আস।' মনজুর বিনা বাক্যব্যয়ে পেছনে মীরার সঙ্গে বসল।

মীরা বলল, 'আমার সঙ্গে বসতে অস্বস্তি বোধ করছ নাকি?'

'না — অস্বস্তি বোধ করার কী আছে?'

'কিছুই নেই কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে অনেক কিছুই আছে। আরাম করে বস। আবার যেন ঘুমিয়ে যেও না।'

'না এখন আর ঘুমাব না — তোমাদের বাসায় সোফায় ভালো ঘুম হয়েছে।'

'তুমি এখন তাহলে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছ?'

'হুঁ। অসুখটা মনে হয় আমাকে কাবু করে ফেলছে।'

'অসুখ ছাড়াও তো তুমি ভালোই ঘুমাতে। বাসর রাতে কি ঘুমটাই ঘুমিয়েছিলে মনে আছে?'

'মনে আছে। এক ঘুমে রাত কাবার।'

'দ্বিতীয়বার যদি বিয়ে কর — তাহলে এই ভুল করবে না।'

'না — তা করব না।'

মীরা মনজুরকে তার অফিসের সামনে নামিয়ে দিল।

মনজুর কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেলেদুলে এগোচ্ছে। মানুষটা এত অসুস্থ!

মনজুর লিফটে করে উঠার সময় একটা ব্যাপার লক্ষ করল।

অফিসের দুজন কর্মচারীও তার সঙ্গে উঠছে। তারা সালাম দিল না। এমন কোনো বড় ব্যাপার না কিন্তু চোখে লাগে। মনজুর তাদেব দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'কি ভালো?' ওরা দুজনেই লজ্জা পেল বলে মনে হল। এক জন বলল, 'জ্বি ভালো।' তবে সে স্যার বলল না। মনে হচ্ছে এখন কেউ আর তাকে স্যার বলায় আগ্রহী নয়। নিচের অফিসাবদের কেউই উঠে দাঁড়ায় না। তাকে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন সম্ভবত ফুরিয়েছে।

চিফ অ্যাকাউটেন্ট সেদিন হঠাৎ কি মনে করে তার ঘরে এসেছিলেন। প্রথমদিকে মনজুর তার উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে পারল না। মনে হল গল্প-গুজব করতেই এসেছেন। চা খেলেন, সিগারেট খেলেন। শরীরের খোঁজখবর কবলেন। এক সময বললেন, 'মনজুর সাহেব, আপনার এই ঘবের সাইজ কত?' তখন ব্যাপাবটা পবিষ্কাব হল। ভদ্রলোক মনজুরের ছেড়ে যাওয়া কামরায় এসে উঠতে চান। ঘরের মাপে কার্পেট কিনতে হবে। মনজুর বলল, 'ঘরেব মাপ তো জানি না। একটা গজ-ফিতা দিযে মেপে ফেললে হয। মাপব?'

'না থাক।'

'জানতে চাচ্ছেন কেন?'

'এমনি প্রশ্নটা মনে আসল। আমার ঘর আবার সাইজে খুবই ছোট। আপনাব ঘবে ক্রস ভেন্টিলেশনের সুবিধা আছে।'

'এই ঘরে আসতে চান?'

সরাসরি প্রশ্নে চীফ অ্যাকাউটেন্ট নার্ভাস হয়ে গেলেন। থতমত খাওযা গলায় বললেন, 'আরে না। আপনার ঘরে আপনি আছেন। আমি আসব কী করে?'

'আমি তো নাও থাকতে পারি।'

'যখন থাকবেন না তখন দেখা যাবে। আচ্ছা যাই মনজুর সাহেব। শবীরের দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং মনে সাহস রাখবেন। সব ওষুধের সেরা ওষুধ হল মনের জোব।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পরপরই কুদ্দুসকে ডাকিয়ে মনজুর কামরা মাপাল। কাগজে সেই মাপ লিখে পাঠিয়ে দিল চিফ অ্যাকাউটেন্টকে। ভদ্রলোককে খানিকটা লজ্জায় ফেলা হল। মাঝে মাঝে মানুষকে লজ্জা দিতে খারাপ লাগে না। অবশ্যি একদল মানুষ আছেন যারা কখনো লজ্জা পান না। চিফ অ্যাকাউটেন্ট সেই রকম একজন মানুষ।

মনজুর নিজের ঘরে ঢুকল।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম কবতে হবে। আজকাল অতি অল্পতেই শরীর ভেঙে আসে। মনে হচ্ছে আবেকবার ডায়ালাইসিস করিয়ে রক্তের ভেতর থেকে দূষিত জিনিসগুলি বের করে দিতে হবে। হাঁটাহাঁটি, ঘোরাফেরা বন্ধ করে হাসপাতালের বিছানায় ফিরে যেতে হবে।

মনজুর ডিভানে বসল। ডিভানের এক মাথায ছোট্ট একটা বালিশ। নিশ্চযই জাহানারার কাণ্ড। মেয়েটা তার সেবাযত্নের নানান চেষ্টা করছে। কোনো কিছুতেই তার মন ভরছে না। গতকাল তাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'স্যার কযেকটা দিন আমাদের বাসায এসে থাকবেন?' বলেই সে এমন লজ্জা পেল যে মনজুব এই প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। মনে হল প্রসঙ্গ পাল্টানোয় জাহানাবা স্বস্তি পেযেছে।

আবার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ঘুমিযে পড়াব আগ মুহূর্তে কুদ্দুস মাথা ঢুকিযে বলল, 'বড় সাব আফনেরে ডাকে। বিশেষ দরকার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। মনজুরেব ইচ্ছে করছে বলতে — বড় সাহেবকে এইখানে আসতে বল। আমাব নড়াচড়াব শক্তি নেই। তা বলা সম্ভব নয।

নুরুল আফসার এই ভোবেই মদ্যপান কবেছেন।

ঘবময এলকোহল এবং সিগারেটের কটু গন্ধ। এয়ারকুলাব চলছে। এযারকুলার থেকে পাতলা ধাতব আওযাজ আসছে যা সূক্ষ্মভাবে মাথার উপর চাপ ফেলে। এক সময মাথায যন্ত্রণা হতে শুরু করে।

নুরুল আফসাব টেবিলে পা তুলে আধশোযা হয়ে আছেন। মনজুবেব দিকে তাকিযে হাসিমুখে বললেন, 'তুই আছিস কেমন?'

'ভালো।'

'তোকে একটা কমপ্লিমেন্ট দেয়ার জন্যে ডাকিযেছি।'

'কী কমপ্লিমেন্ট?'

'পৃথিবীতে নির্লোভ মানুষ আছে বলে আমাব ধাবণা ছিল না। তুই প্রমাণ কবেছিস যে আছে। তুই কি ছোটবেলা থেকেই এমন, না বড় হযে হযেছিস?'

'ছোটবেলায আমি বিবাট চোব ছিলাম।'

নুরুল আফসাব আগ্রহ নিযে তাকালেন। মনজুবেব কথায তিনি বেশ মজা পাচ্ছেন।

'তুই ছোটবেলায চোব ছিলি?'

'হুঁ।'

'কী চুবি করতি?'

'খালাব বিছানার নিচ থেকে ভাংতি পযসা সবাতাম।'

'রেগুলাব সরাতি?'

'হুঁ। পবে জানতে পাবলাম আমি যাতে পযসা চুবি কবতে পাবি সে জন্যেই খালা সব সময তোশকের নিচে ভাংতি পযসা বাখতেন কারণ এমনিতে আমি কখনো টাকাপযসা নিতাম না। হাজার সাধাসাধিতেও না।'

'তোর খালাও মনে হচ্ছে তোর মতোই ইন্টারেস্টিং ক্যাবেকটার।'

'খালা একজন চমৎকার মানুষ। তোব কথা কি শেষ হযেছে? আমি এখন ডিভানে শুযে খানিকক্ষণ ঘুমাব। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।'

'কথা শেষ হয নি। আসল কথা, এবং সবচে' ইম্পর্টেন্ট কথাটাই বাকি।'

'যদি সম্ভব হয তাড়াতাড়ি বলে ফেল।'

নুরুল আফসার টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'এই ফার্মটা শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। তুই আমার পাশে দাঁড়িয়ে গাধার মতো খেটেছিস। মনে আছে?'

'আছে।'

'তোকে অনেকবার বলেছিলাম, আমাকে তুই দাঁড়া করিয়ে দে; তোকে আমি ঠকাব না। কি, মনে আছে?'

'আছে।'

'তুই তোর কথা রেখেছিস — আমাকে দাঁড়া করিয়ে দিয়েছিস। আমি আমার কথা রাখতে চাই। তুই কি লক্ষ করেছিস পে-স্লিপে তোর নাম নেই?'

'লক্ষ করেছি।'

'কেন নেই এ নিয়ে তোর মনে প্রশ্ন ওঠে নি?'

'উঠলেও খুব মাথা ঘামাই নি।'

'আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ফিরে আসতে পারি আবার নাও আসতে পারি। এই ফার্মের মালিকানার একান্ন ভাগ তোকে দিয়ে যাচ্ছি। বাকি উনপঞ্চাশ ভাগ থাকবে আমার। পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা থাকবে তোর হাতে। তেব হাজাব মাইল দূব থেকে আমি সুতা নাড়ব না। অনেস্ট।'

মনজুর হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

সে খুশি হল না অখুশি হল তাও বোঝা গেল না। বড় বড় ঘটনা তার উপব কোনোই প্রভাব ফেলে না। তার চোখ ছোট ছোট। তাকে দেখে মনে হচ্ছে জেগে থাকার জন্য তাকে কষ্ট করতে হচ্ছে।

নুরুল আফসার বললেন, 'মনজুব, কোম্পানির এসেটস যেমন আছে — লায়াবিলিটিসও আছে। আমাদের ব্যাংক-লোন আছে দু কোটি টাকার উপব। সব কিছু মাথায় রাখতে হবে। কিছু ডিসঅনেস্ট কর্মচাবী আমাদেব আছে। ডিসঅনেস্ট হলেও তারা খুব এফিসিয়েন্ট। এদের কখনো হাতছাড়া করবি না আবার কখনো এদেব উপব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবি না। তুই কি ঘুমিয়ে পড়ছিস নাকি?'

'না।'

'তুই তোর ঘরে গিয়ে বস। কাগজপত্র পাঠাচ্ছি। অনেক কাগজে সিগনেচাব কবতে হবে।'

মনজুর তার ঘরে ঢুকল। তাব মনে হচ্ছে খববটা ছড়িয়ে গেছে, অফিসেব সবাই এখন জানে। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই কেমন অন্যরকম করে তাকাচ্ছে। মনজুরেব ঘবে যাবাব পথ মূল অফিস ঘরেব ভেতব দিয়ে। মূল অফিসে পা দেয়ামাত্র সবাব কাজকর্ম থেমে গেল। তাদেরকে কেমন যেন নার্ভাস লাগছে।

মনজুর তার ঘরে ঢুকে ডিভানে গা এলিয়ে দিল। খুব তৃষ্ণা লাগছে। অথচ উঠে পানির বোতলের কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা একগাদা কাগজ হাতে ঢুকেছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, 'বড় সাহেব পাঠিয়েছেন — সই করতে হবে স্যার।'

'কলম আছে তোমার কাছে?'

'জ্বি আছে।'

দস্তখত করতে করতে মনজুর বলল, 'তুমি কাঁদছ কেন জাহানারা?'

জাহানারা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। খবরটা শোনার পর থেকে একটু পরপর তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে কিছুতেই চোখের পানি আটকাতে পারছে না। কী যে আনন্দ হচ্ছে! কেন এত আনন্দ? কেন?

জাহানারা আজ বাড়ি ফেরার পথে কযেকটা জিনিস কিনল। একটা গ্লাস, সুন্দব একটা চাযের কাপ, ভালো একটা চিনামাটির প্লেট। জাহানারাব মা অবাক হযে বললেন, 'সব জিনিস একটা একটা কবে কেন রে মা?'

জাহানারা বিব্রত গলায বলল, 'আমার কি টাকা আছে? ধীবে ধীরে কিনব। জিনিসগুলো সুন্দর হযেছে না মা?'

'হ্যাঁ সুন্দর। পরে কি তুই সেট মিলিয়ে কিনতে পারবি?'

'পারব।'

জাহানাবা মুখে বলল — পারবে, কিন্তু সে ঠিক কবে রেখেছে সেট মিলিযে সে কিনবে না। এই জিনিসগুলো তার কাছে একটা করেই থাকবে।

১২

দবজাব কড়া নড়ছে।

মনজুব বড় বিবক্ত হল। এত ভোবে কে এল? ইদানীং সবাই মিলে তাকে খুব বিবক্ত কবছে। অফিসেব লোকজন আসছে — কখনো একা, কখনো দল বেঁধে। একবাব এলে আব যেতে চাচ্ছে না। সেদিন কবিম সাহেব এলেন, সঙ্গে নীল বঙেব একটা বোতল। এই বোতলে হালুযাঘাটেব এক পীব সাহেবেব পানি-পড়া আছে। এই বস্তু জোগাড় কবতে তাঁকে যে কী পবিমাণ কষ্ট কবতে হযেছে সে গল্প এক ঘণ্টা ধবে কবলেন। গল্প শুনে মনে হওযা স্বাভাবিক যে এই পানি-পড়া জোগাড় কবাব চেযে সুন্দববনে গিযে বাঘিনীব কোল থেকে বাচ্চা নিযে আসা অনেক সহজ।

গতকাল এসেছিলেন বাসাবত সাহেব, একা আসেন নি — নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামে একজন আযুর্বেদ শাস্ত্রী নিযে এসেছিলেন। ছোটখাটো মানুষ হলেও নিত্যানন্দবাবু এক'ধাবে কাব্যতীর্থ, আযুর্বেদাচার্য, আযুর্বেদশাস্ত্রী, জ্ঞানশ্রী এবং বিদ্যাশ্রী। ভদ্রলোক মনজুবেব নাড়ি ধবে ঝাড়া পঁযতাল্লিশ মিনিট চোখ বন্ধ কবে বসে বইলেন। পঁযতাল্লিশ মিনিট পব মনজুব বলল, 'ঘুমিযে পড়লেন নাকি ভাই?'

আযুর্বেদশাস্ত্রী হাতেব ইশাবায তাকে চুপ কবে থাকতে বললেন এবং আবো দশ মিনিট এইভাবেই কেটে গেল। মনজুব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল, একী যন্ত্রণা!

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী চোখ মেলে বললেন, 'আপনাকে একটা ওষুধ তৈবি কবে দেব। ওষুধটার নাম "নলাদি ক্বাথ।" নল, কুশ, কাশ এবং ইক্ষু এই চাব উপাদানে নির্মিত। ওষুধটা এক মাস ব্যবহাব করুন। তাবপব এই যুগের বড় বড় ডাক্তাবদেব কাছে যান। তাবা বলবে — কিডনি ঠিক আছে। যদি তা না বলে আমি আমার সংগ্রহে আযুর্বেদ শাস্ত্রেব যে শতাধিক পুস্তক আছে সব পুড়িযে ছাই বানাব। সেই ছাই মুখে লেপন কবে আপনাকে দেখিযে যাব।'

মনজুব বলল, 'কত লাগবে ওষুধ তৈবি করতে?'

বাসাবত সাহেব চেঁচিযে উঠলেন, 'এটা নিযে আপনি চিন্তা কববেন না। কী লাগবে না-লাগবে তা আমি দেখব।'

'বেশ দেখুন।'

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী তখন তাঁর চিকিৎসার গল্প শুরু করলেন। এক এমআরসিপি ডাক্তার কীভাবে তাঁর কাছে ছুটে এসে করজোড়ে বলেছিলেন — নিত্যবাবু আপনার মতো চিকিৎসক আমার জীবনে দেখি নি। আপনি বয়োকনিষ্ঠ, নয়তো আপনার পায়ের ধুলা নিতাম।

মনজুর তাদেরকে জোর করেই ঘর থেকে বের করে দিল। নিত্যবাবু এবং বাসারত দুজনের কেউই যাবার নামটি মুখে আনছিল না।

আজ সেই নিত্যবাবুই এসেছেন মনে হচ্ছে। চার দিন পর তাঁর ওষুধ দিয়ে যাবাব কথা — "নলাদি ক্বাথ।" চার দিন পার হয়েছে। আজ পঞ্চম দিন।

মনজুর উঠে দরজা খুলল।

এই ভোরবেলায় জাহানারা চলে এসেছে। তার শরীর হলুদ রঙেব চাদরে ঢাকা। চাদরে পুরোপুরি শীত মানছে বলে মনে হচ্ছে না। অল্প অল্প কাঁপছে। জাহানারার হাতে টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটি।

'স্লামালিকুম স্যার।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। সূর্য ওঠার আগে চলে এসেছ, ব্যাপাব কী?'

'আপনি কেমন আছেন?'

'ভালোই আছি। কিছুক্ষণের মধ্যে — নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামের এক লোক আমাকে "নলাদি ক্বাথ" দিয়ে যাবে। ঐ বস্তু খাওযার পর শরীর আরো ভালো হযে যাবে। কিডনি যেটা নষ্ট সেটা তো ঠিক হবেই — অন্য যেটা কেটে বাদ দেযা হয়েছে সেটাও সম্ভবত গজাবে। এস ভেতরে এস। টিফিন বক্সে কী?'

'ভাপা পিঠা। মা করে দিযেছেন স্যার।'

'ভেরি গুড। চল ভাপা পিঠা খাওয়া যাক। আমি হাতমুখ ধুযে আসি — তুমি ততক্ষণে চায়ের পানি বসিযে দাও। চা খেযেই বেরিযে পড়তে হবে। নয়তো নিত্যবাবুব জালে আটকা পড়ে যেতে হবে।'

জাহানারা রান্নাঘরে চলে গেল।

তার মুখ মলিন। রাতে সে এক ফোঁটা ঘুমাতে পারে নি। পুরো রাত ছটফট করেছে। শেষরাতের দিকে বারান্দায় এসে বসেছে। বারান্দার কোনায় জাহানারার মাও বসে ছিলেন। তিনি সেখান থেকেই ডাকলেন, 'এদিকে আয় মা।' জাহানাবা মার কাছে গেল না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

তিনি বললেন, 'তোর কী হয়েছে তুই আমাকে বল তো মা।' জাহানারা বলল, 'কিছু হয় নি।'

'অনেক দিন থেকেই দেখছি — তুই ছটফট করছিস। আমাকে বল তো মা, তোর কী হয়েছে?'

জাহানারা তীব্র গলায় বলল, 'বললাম তো কিছু হয নি।' সে আবার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। জাহানারার মা তার পেছনে পেছনে ঢুকলেন এবং অবাক হযে লক্ষ করলেন তাঁর মেয়ে বিছানায শুয়ে ছোট্ট বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিযে কাঁদছে। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না। বাকি বাতটা বিছানার পাশে চুপচাপ বসে কাটালেন। মেয়ের গায়ে-মাথায হাত বুলিযে আদব করার সাহসও তাঁব হল না।

'স্যার দেখুন তো চায়ে চিনি ঠিক আছে কিনা?'

মনজুর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'সব ঠিক আছে। তুমি চা খাচ্ছ না?'

'জ্বি না। আমি খালিপেটে চা খেতে পারি না।'

'খালিপেটে খেতে হবে কেন? পিঠা তো আছে। পিঠা নাও।'

'এখন কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।'

জাহানারা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে মৃদু গলায় বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলার জন্যে আমি এত ভোরে এসেছি। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।'

'বল।'

'স্যার আপনি কিডনি চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমি আপনাকে একটা কিডনি দিতে চাই।'

মনজুর বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটি একেক সময় একেকভাবে কথা বলে। আজ সম্পূর্ণ অন্য রকমভাবে কথা বলছে।

'তুমি কিডনি দিতে চাও?'

'জ্বি।'

'কেন বল তো?'

জাহানারা জবাব দিল না। তার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। মেয়েটা যে আজ কথা অন্যভাবে বলছে তাই না — তাকে দেখাচ্ছেও অন্য রকম। মনজুব বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস।'

জাহানারা বসল না। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনজুব বলল, 'তুমি কিডনি দিতে চাইলেই তো হবে না। ক্রস ম্যাচিঙের ব্যাপার আছে।'

'ক্রস ম্যাচিঙের অসুবিধা হবে না। আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম, আপনাব ডাক্তাবকে দিয়ে পবীক্ষা করিয়েছি। তিনি বলেছেন — ঠিক আছে।'

মনজুব অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'আমি একবার তোমাকে কিছু সাহায্য করেছিলাম। তুমি কি তার প্রতিদান দিতে চাচ্ছ?'

'না। সেসব কিছু না।'

'তাহলে কী?'

জাহানাবা জবাব দিল না তবে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

মনজুব বলল, 'দেখ জাহানারা, আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি। নগদ টাকা দিয়ে আমি কিডনি কিনব।'

'আপনাকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে না স্যার।'

'আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। যাও তুমি বাসায় যাও।'

জাহানারা একটি কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সে একটা রিকশা নিয়েছে। চাদরে মুখ ঢেকে সারাপথ ফুঁপাতে ফুঁপাতে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারছে না। রিকশাওয়ালা এক সময় বলল, 'আম্মা কাইন্দেন না। মনডা শান্ত করেন।'

১৩

বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে পাঁচটি।

বদরুল আলম সাহেব পাঁচ জনের ভেতর থেকে চার জনকে ইন্টারভ্যুতে ডেকেছেন। পঞ্চম জন বাদ পড়েছে। বাদ পড়ার কারণ তার নাম ডেরেন কুইয়া। ডেরেন কুইয়া নামের কাউকে ইন্টারভ্যু নেয়ার পেছনে তিনি কোনো যুক্তি খুঁজে পান নি। নিশ্চয়ই খ্রিস্টান। মুসলমান বডিতে অন্য ধর্মের মানুষের শরীরের অংশ ফিট করবে না বলেই তাঁর ধারণা। ইন্টারভ্যুতে এক জন বাদ পড়ল। কারণ তাকে খুনীর মতো দেখাচ্ছিল। যে তিন জন টিকে গেল তাদের ভেতর থেকে ডাক্তাররা এক জনকে বেছে নিলেন। ক্রস ম্যাচিঙে তারটাই নাকি সবচে' ভালো মেলে। ছেলেটির নাম আমানুল্লাহ্ খান। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। রোগা-শ্যামলা এবং বেশ লম্বা। শেষ পর্যন্ত টিকে গেছে শুনে সে মনে হল খানিকটা ঘাবড়ে গেল। হাসপাতালেই বদরুল আলম সাহেবকে বলল, 'স্যার ভয়-ভয় লাগছে।'

বদরুল আলম ধমকে উঠলেন, 'ভয়ের কী?'

'অপারেশনে মরে-টরে যদি যাই!'

'এইসব অপারেশনে কেউ মরে না। কিডনি কেটে বাদ দেয়া হল ডাল-ভাত অপারেশন। ডাক্তার লাগে না, এক্সপেরিয়েনস্ড নার্সও করে ফেলতে পারে। তোমারটা তো নার্স করবে না। ভ্যালোরের বড় বড় ডাক্তাররা করবেন।'

'তবু ভয় লাগছে।'

বদরুল আলম গম্ভীর মুখে বললেন, 'তার মানে কী দাঁড়ায়? তুমি রাজি না? রাজি না থাকলে বল, আমাদের হাতে অন্য ক্যানডিডেট আছে। ওরা এক পায়ে খাড়া।'

তাঁর হাতে অন্য কেউই নেই। এইসব বলার কারণ আমানুল্লাহকে জানিয়ে দেয়া যে সে সবেধন নীলমণি নয়। এতে টাকাপয়সা নিয়ে দরদাম করারও সুযোগ থাকে। নয়তো আকাশছোঁয়া টাকা হেঁকে বসবে।

বদরুল আলম বললেন, 'কথা পাকাপাকি হওয়ার আগে টাকাপয়সার ব্যাপারটা সেটল হওয়া উচিত। কত চাও তুমি?'

আমানুল্লাহ্ মাথা নিচু করে বসে রইল।

বদরুল আলম বললেন, 'তোমার ডিমান্ড কী আগে শুনি তারপর আমাদের কথা আমরা বলব। পছন্দ হলে ভালো কথা। পছন্দ না হলে কিছু করার নাই। আসসালামু আলায়কুম বলে বিদায় করে দিতে হবে। বল কী তোমার দাবি?'

আমানুল্লাহ বলল, 'আপনারটাই আগে শুনি। আপনি কত দিতে চান?'

আমার নিজের হলে বিশ হাজারের বেশি একটা পয়সা দিতাম না। দশ হাজারে আস্ত মানুষ পাওয়া যায় — সেখানে কুড়ি। ডাবল দেয়া। তবে আমার ভাগ্নে বলে দিয়েছে এক লাখ। এক লাখই দেয়া হবে। এক পয়সা কমও না। এক পয়সা বেশিও না।'

'টাকাটা দেবেন কীভাবে?'

'কীভাবে মানে? ক্যাশ পেমেন্ট হবে, তবে একটা কিন্তু আছে।'

'কিন্তুটা কী?'

'পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে আগে দেয়া হবে। এটাকে তুমি বুকিং মানি বলতে পার। বাকি পঁচানব্বুই দেয়া হবে কার্য সমাধা হবার পর।'

'পুরো টাকাটা আগে দেবেন না?'

'না।'

'না কেন? যদি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাই?'

'হ্যাঁ। অসম্ভব কিছু না। এতগুলো টাকা।'

আমানুল্লাহ্‌ বলল, 'উল্টাও তো হতে পারে। আমি কিডনি দিয়ে দিলাম তারপর আপনারা আর টাকা দিলেন না।'

'কী যে তুমি বল। স্ট্যাম্পের উপর দলিল করা থাকবে।'

'টাকা না দিলে কে আর কোর্ট-কাছারি করবে বলুন। তাছাড়া অপারেশন টেবিলে মরেও তো যেতে পারি। তখন টাকাটা দেবেন কাকে?'

'খোদা না খাস্তা সে রকম কিছু হলে তোমার আত্মীয়স্বজন পাবে।'

'আত্মীয়স্বজনদের জন্যে তো আমার টাকাটা দরকার নেই। আত্মীয়স্বজনদের আমি কিছু জানাতে চাই না। তারা কিছু জানবেও না।'

'কাউকে জানাতে চাও না?'

'জ্বি না। শুধু একটা জিনিসই আমি চাই — পুরো টাকাটা এডভান্স চাই। আপনাদের ভয়ের কিছু নেই। আমি ভদ্রলোকের ছেলে। টাকা নিয়ে পালিয়ে যাব না।'

আমানুল্লাহ যে ভদ্রলোকের ছেলে সেই খোঁজও বদরুল আলম নিলেন। তার বাবা একটা স্কুলের হেডমাস্টার। চার ছেলেমেয়ের মধ্যে আমানুল্লাহ্‌ সর্বকনিষ্ঠ। বড় এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। মেজো ভাই টাঙ্গাইল কৃষি ব্যাংকের সেকেন্ড অফিসার। আমানুল্লাহ নিজে এ বছর বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে।

বদরুল আলম বললেন, 'টাকাটা তুমি কাকে দেবে?'

আমানুল্লাহ্‌ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তা দিয়ে আপনার দরকার কী? আপনার যে জিনিসটা দরকার তা হল আমার একটা কিডনি। আর কিছু না। আপনি যদি নগদ টাকা দেন — কিডনি আপনি পাবেন।'

বদরুল আলম চিন্তায় পড়ে গেলেন। ছেলেটাকে যতটা সরল সাদাসিধা মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে ততটা সে না, ত্যাঁদড় আছে।

আমানুল্লাহ বলল, 'আপনি যদি মনস্থির করতে পারেন তাহলে আমাকে খবর দেবেন। তবে আমার বাড়িতে কিছু বলবেন না। আরেকটা কথা, ভ্যালোর যেতে হলে আমাকে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্ট-টাসপোর্ট কীভাবে করতে হয় তাও আমি জানি না। ঐ ব্যাপারেও আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

বদরুল আলম বললেন, 'পাসপোর্ট কোনো ব্যাপারই না। এক ঘণ্টায় পাসপোর্ট পাওয়া যায়। আসল সমস্যা টাকাটা। আমি আমার ভাগ্নের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারি। সে রাজি হবে বলে মনে হয় না।'

'আপনি উনার ঠিকানাটা আমাকে দিন। আমি নিজেই কথা বলব।'

'তোমার কথা বলার কোনো দরকার নেই। আমরা মনজুরকে এর বাইরে রাখতে চাই। সে রোগী মানুষ।'

'উনার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। তাকে আমি আমার শরীরের একটা অংশ দেব আর তাঁর সঙ্গে আগে কথা বলব না তা তো হয় না। আগে তাঁকে আমার পছন্দ হতে হবে.।'

'পছন্দ না হলে কিডনি দেবে না?'

'দেব। পছন্দ না হলেও দেব। টাকাটা আমার খুবই দরকার।'

বদরুল আলম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনজুরের ঠিকানা লেখা একটা কাগজ তার হাতে দিলেন। দিয়েই বুঝলেন বিরাট ভুল করা হয়েছে। মনজুর এক কথায় টাকা দিবে। একটা

হাতে লেখা রসিদও রাখবে না। মনজুর হচ্ছে তার ভাষায় বুদ্ধিমান গাধা-মানব। যথেষ্ট বুদ্ধি, যথেষ্ট চিন্তাশক্তি; কিন্তু কাজকর্ম গাধার মতো। ছেলেটিকে ঠিকানা দেয়া উচিত হয় নি। না দিয়েই বা কী করা?

১৪

থ্রি পি কনসট্রাকশনের মালিকানা বদলে তেমন কোনো পরিবর্তন হল না। তবে সবাইকে খানিকটা উদ্বিগ্ন মনে হল। প্রধান ব্যক্তির প্রতি আস্থার অভাব থাকলে সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সেই ধরনের নিরাপত্তাহীনতা। উড়া-উড়া খবর পাওয়া গেল অনেকের চাকরি চলে যাবে। নতুন স্টাফ আসবে। কোম্পানির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা করছেন। কিছু গুজব নিয়ে কানাঘুষা হচ্ছে। তার মধ্যে সবচে' আতংকজনক গুজব হচ্ছে — বেতন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বড় সাহেব তিন কোটি টাকা নিয়ে আমেরিকা চলে গেছেন। কোম্পানির লিকুইড প্রপার্টি বলতে কিছুই নেই। ঈদ বোনাস তো দূরের কথা, বেতনই হবে না। এই গুজব বিশ্বাসযোগ্যভাবে ছড়িয়েছে। উপরের মহলের অফিসারও বিশ্বাস করেছেন।

আজ সেই গুজব মিথ্যা প্রমাণিত হল। সবার বেতন হল যাদের ইয়ারলি ইনক্রিমেন্ট ডিউ হয়েছিল, তারা তা পেল। ঈদের বোনাস পাওয়া না গেলেও বলা হল ঈদের ছুটির আগের দিন দেয়া হবে। যে চাপা উদ্বেগ ও অস্বস্তি সবার মধ্যেই ছিল তা অনেকাংশেই কেটে গেল। দুপুরের দিকে মনজুর ডেকে পাঠাল চিফ অ্যাকাউটেন্ট করিম সাহেবকে।

করিম সাহেব ঘরে ঢুকলেন চিন্তিত মুখে। তাঁকে ছাঁটাই করা হচ্ছে এ রকম একটি গুজবও খুব ছড়িয়েছে। গুজব অবশ্যি শুরু করেছেন তিনি নিজেই।

মনজুর হাসিমুখে বলল, 'কেমন আছেন করিম সাহেব?'

'জ্বি স্যার ভালো।'

'বসুন। আমার সঙ্গে চা খান।'

করিম সাহেব বসলেন। মনজুর নিজেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল। করিম সাহেব চায়ে চুমুক দিলেন, সিগারেট নিলেন না।

'কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা তো আপনার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। সবার বেতন হবে, ঈদ বোনাস হবে — এগুলো আপনি জানেন — তারপরেও কী করে গুজব ছড়াল যে বেতন বন্ধ?'

'গুজবের কি স্যার কোনো মা-বাবা আছে?'

'অবশ্যই আছে। গুজবের মা থাকে, বাবা থাকে এবং গুজবের পেছনে একটা উদ্দেশ্যও থাকে। গুজবটা আপনার অফিস থেকে ছড়িয়েছে এটাই দুঃখজনক।'

'আমার অফিস থেকে ছড়িয়েছে এটা কে বলল?'

'আমি অনুমান করছি। করিম সাহেব, আমার অনুমান খুব ভালো।'

করিম সাহেব আর কিছুই বললেন না। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। ঠাণ্ডা ঘর, তবু তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তাঁর সামনে বসা মানুষটিকে আজ এত অন্যরকম মনে হচ্ছে কেন? কেমন কঠিন চেহারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ক্ষমতা মানুষকে বদলে দেয় তা ঠিক কিন্তু এত দ্রুত বদলাতে পারে? এই লোকটির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বদলে গেছে।

'করিম সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'আমি যে ঘরে বসতাম ঐ ঘরটা আপনার বেশ পছন্দ — আপনি ঐ ঘরে বসুন। নিজের মতো করে ঘরটা সাজিয়ে নিন।'

করিম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর হঠাৎ পানির পিপাসা পেয়ে গেল। আগের বড় সাহেবের বেলায় এ রকম কখনো হয় নি। আজ কেন হচ্ছে? ব্যাপারটা কী? তিনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

'করিম সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'আমাদের বেশ বড় একটা সরকারি বিল দীর্ঘদিন আটকে ছিল। নুরুল আফসার সাহেব দেশ ছাড়ার আগে ঐ বিল ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন — কোন বিলটির কথা বলছি বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'আমি ঐ বিলের টাকাব অর্ধেক একটা বিশেষ কাজে ব্যবহাব করতে চাই।'

'বলুন স্যার কী কাজ।'

'আমাদেব এত বড় কনস্ট্রাকশন ফার্ম — বাড়িঘর সমানে তৈরি কবে যাচ্ছি। যাচ্ছি না?'

'যাচ্ছি।'

'অথচ আমাদেব কর্মচাবীদের কোনো কোয়ার্টাব নেই। ভাড়া বাসায তারা থাকে। তাদের বেতনেব একটা বড় অংশ চলে যায বাড়িভাড়ায। আমি চাই থ্রি পি কনস্ট্রাকশনেব প্রতিটি কর্মচারীব জন্যে ফ্ল্যাট হবে। কাউকেই ভাড়া করা বাড়িতে থাকতে হবে না।'

'অনেকগুলো টাকা ব্লক্‌ড হয়ে যাবে স্যাব।'

'হোক। কত দ্রুত কাজটা কবা যাবে বলুন তো? মালিবাগে আমাদের কিছু রিয়েল এস্টেট আছে না?'

'আছে।'

'ঐখানেই ফ্ল্যাট উঠুক। তিন ধবনেব ফ্ল্যাট হবে। প্রথম শ্রেণীব অফিসারদেব জন্যে এক ধবনের, দ্বিতীয় শ্রেণীব জন্য এক ধবনেব, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীব কর্মচারীদের জন্য এক ধরনেব। আমি চাই কাজটা যেন দ্রুত শেষ হয। দ্রুত। আমাব হাতে সময বেশি নেই।'

'সময বেশি নেই বলছেন কেন?'

'আমি অসুস্থ এটা আপনাব চোখে পড়ছে না?'

'চিকিৎসা তো স্যার হচ্ছে। কিডনি ট্রান্সপ্লেন্ট হবে, তখন আর সমস্যা থাকাব কথা না।'

'তা ঠিক। আচ্ছা আপনি এখন উঠুন। বিকেলের দিকে একটা মিটিং ডাকুন। সেখানে ঠিক করব কীভাবে কী করা যায়।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

করিম সাহেব চলে যাবার পরপরই কুদ্দুস ঢুকল হাসিমুখে। তাব হাতে কাঁঠাল আকৃতির দুটি পাকা পেঁপে। সে স্যারেব জন্যে নিয়ে এসেছে। কুদ্দুস মাথা চুলকে বলল, 'গাছের পেঁপে স্যার।'

'তাই নাকি?'

'বাবার নিজের হাতে পোঁতা গাছ।'

'ভালো খুবই ভালো — দাম পড়ল কত?'

'চল্লিশ টাকা। পঞ্চাশ টাকা জোড়া চায় — চল্লিশে দিল।'

মনজুর হেসে ফেলল। কুদ্দুসের মুখ অসম্ভব বিষণ্ন হয়ে গেল। জেরার মুখে সে এক সেকেন্ডও টিকতে পারে না। তাছাড়া এই মানুষটাকে সে আগে থেকেই ভয় পায়। এখন যেন সেই ভয় সাতগুণ বেড়েছে। ছায়া দেখলেই ভয় লাগে। মূল মানুষটাকে দেখতে হয় না।

'কুদ্দুস।'

'জ্বি স্যার।'

'ওয়েটিং রুমে আমানুল্লাহ নামে একটা ছেলে বসে আছে। তাকে নিয়ে আস।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

কুদ্দুস ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। মনে মনে ঠিক করল, আগামী এক মাস এই মানুষটার ত্রিসীমানায় সে থাকবে না। নগদ টাকা সাধলেও না।

আমানুল্লাহর সঙ্গে মনজুরের আগে একবার দেখা হয়েছে। এটা দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। আজ সে আমানুল্লাহকে আসতে বলেছে। আজ তাকে টাকা দেয়ার কথা। মনজুর বাজি আছে আমানুল্লাহর শর্তে। নগদ এক লক্ষ টাকা আগেই দেয়া হবে।

আমানুল্লাহ আজ সুন্দর একটা শার্ট পরেছে।

চুল আঁচড়ানো। ইস্ত্রি করা প্যান্ট। সকালবেলাতেই গোসল করেছে বলে বোধহয় তাকে সুন্দর লাগছে। চোখে-মুখে স্নিগ্ধ ভাব।

'কেমন আছ আমানুল্লাহ?'

'জ্বি স্যার ভালো।'

মনজুর ব্রাউন রঙের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, 'তোমাব টাকা এখানেই আছে। পাঁচশ টাকার নোট দিয়েছি। তুমি গুনে নাও।'

আমানুল্লাহ টাকা গুনছে।

মনজুর বলল, 'তুমি কিছু খাবে?'

'জ্বি না।'

'চা-টাও খাবে না?'

'না।'

টাকা গোনা শেষ হয়েছে। প্যাকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে আমানুল্লাহ বলল, 'আমি একজনকে টাকাটা দেয়ার জন্যে তিন চার দিনের জন্যে বাইরে যাব। আপনাবা হয়তো ভাবতে পারেন আমি পালিয়ে গেছি এই জন্যে বললাম।'

মনজুর বলল, 'আমি এ রকম কিছুই ভাবব না।'

'আমার পাসপোর্ট হয়ে গেছে। যেদিন যেতে বলবেন আমি যাব। শুধু....'

'শুধু কী?'

'না কিছু না।'

তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'ভয় ? হ্যাঁ একটু পাচ্ছি।'

'কেন ?'

'মনে হচ্ছে অপারেশনে আমি মারা যাব।'

'তাই যদি মনে হয় তাহলে রাজি হলে কেন?'

'টাকাটা আমার খুবই দরকার।'

'মরে যাবে জেনেও টাকার জন্যে তুমি রাজি হচ্ছ?'

'জ্বি। অবশ্যি তাতে কোনো অসুবিধা নেই। মানুষ তো আর সারাজীবন বেঁচে থাকে না। এক সময় না এক সময় মরতে হয়। আগে আর পরে — এই আর কি। আচ্ছা আমি যাই।'

'তোমার সঙ্গে একটা গাড়ি দিয়ে দি। গাড়ি নিযে যাও — এতগুলো টাকা সঙ্গে করে নেবে।'

'অসুবিধা নেই। কেউ বুঝবে না আমার কাছে এত টাকা — স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

মনজুর চুপচাপ বসে আছে। তার খুব খারাপ লাগছে। মন খারাপ শুধু না, শরীরও খারাপ। বমি ভাব হচ্ছে। মাথায় যন্ত্রণা। কুদ্দুস দরজার ফাঁক দিযে মাথা ঢোকাল। মনজুর বলল, 'কিছু বলবে কুদ্দুস?'

'স্যার পেঁপে কেটে দিব?'

'না। তোমার দেশের বাড়ির পেঁপে পরে খাব।'

'আপনাব কি স্যার শরীর খাবাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

'বাসায চলে যাবেন?'

'তাই ভাবছি।'

'গাড়ি বের করতে বলব স্যাব?'

মনজুরের মনে পড়ল এখন তাব দখলে বড় একটা গাড়ি আছে যে গাড়িতে চড়ে সে এখন সারা শহব ঘুরতে পারে।

১৫

অফিসের কাজ মীরার মনে ধরেছে।

তেমন কিছু করার নেই। সেজেগুজে বসে থাকাই মনে হচ্ছে কাজের প্রধান অংশ। দ্বিতীয অংশ হচ্ছে অফিস পলিটিক্স। দুটি প্রধান দল আছে অফিসে। জি.এম. সাহেবের দল, এন্টি জি.এম. দল। দুদলেই চেষ্টা করছে মীরার মন ফেরাতে। এন্টি জি.এম. দলের প্রধান — মোসাদ্দেক সাহেব একদিন মীরাকে অফিস কেন্টিনে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন এবং নানান কথার ফাঁকে এক সময় নিচু গলায বললেন, 'আপনার বয়স অল্প, আপনাকে একটা কথা বলছি শুনে রাখুন, জি.এম. সাহেব যদি গাড়িতে লিফ্‌ট দিতে চান — এভযেড করবেন। কী জন্যে এভযেড করতে বলছি জিজ্ঞেস করবেন না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব না।'

মীরা হেসে বলল, 'ঠিক আছে জিজ্ঞেস করব না।'

মোসাদ্দেক সাহেব খানিকটা বিমর্ষ হযে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন মীরা শোনার জন্য অনুরোধ করবে তখন রসিয়ে গল্পটা বলা যাবে।

'মিস মীরা, আপনি আছেন যখন সবই শুনবেন। এইসব হচ্ছে ঘরের কথা। কাউকে বলাও যায় না— সহ্য করাও যায় না।'

জি.এম. সাহেবকে মীরার বেশ পছন্দ হল। ভদ্রলোক হাসিখুশি। মহিলা কর্মচারী আশপাশে থাকলে তাঁর হাসিখুশির পরিমাণটা বেড়ে যায়। এছাড়া অন্য কোনো দোষ মীরার চোখে পড়ল না।

জি.এম. সাহেব মীরাকে বললেন, 'আপনি কি রিকশায় যাওয়া-আসা করেন?'

'জ্বি স্যার তবে মাঝেমধ্যে ভাইয়ের গাড়িতে আসি।'

'ভবিষ্যতে আর রিকশায় যাওয়া-আসা করবেন না। অফিসারদের আনা-নেয়ার জন্যে গাড়ি আছে। ঐ গাড়িতে যাবেন-আসবেন। মাঝেমধ্যে আমার গাড়িতেও যেতে পারেন। কোনো অসুবিধা নেই। বললেই হবে। আমি ঐদিক দিয়েই যাই।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।'

'কাজকর্ম কেমন লাগছে?'

'ভালো। অবশ্যি কাজকর্ম তেমন কিছু তো নেই।'

'হবে। ধীরে ধীরে হবে। আপনার পোস্টটা নতুন ক্রিয়েট করা হয়েছে। এই পোস্ট আগে ছিল না। মইন সাহেবের জন্যেই ক্রিয়েট করা। ইনি আপনার কে হন?'

'দূর সম্পর্কের আত্মীয়।'

'খুব চমৎকার মানুষ। তাই না মিস মীরা?'

'জ্বি চমৎকার মানুষ।'

'শুনলাম তিনি বিদেশে ফিরে যাচ্ছেন না। দেশে সেটেল করবেন। শুনে ভালো লাগল। তাঁর মতো একটিভ, ইনোভেটিভ মানুষ হচ্ছে দেশের সম্পদ। দেশ গড়ার কাজে এদের মতো লোক দরকার — তাই না?'

মীরা কিছু বলল না।

মইন ফিরে যাচ্ছে না। দেশেই থাকছে। এই খবর তাব জানা ছিল না। মীরাব সঙ্গে শেষ দেখা জার্মান কালচারাল সেন্টারে। মীরার ধারণা ছিল উনি চলে গেছেন। মীরা অবশ্যি খোঁজ নেয় নি। একবার খোঁজ নেয়া উচিত ছিল। কেন জানি খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে নি।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে কিছু সময় আসে যখন কোনোকিছুই ভালো লাগে না। মীরার এখন এই সময় যাচ্ছে। ভালো লাগার একটা ভঙ্গি করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু তার কিছু ভালো লাগছে না। কখনো কখনো তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়— আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কিচ্ছু না। সে অনেক চিন্তা করেছে, এরকম হচ্ছে কেন? মনজুরের অভাব কি সে বোধ করছে? তা তো না। তার জীবনের শূন্য অংশ মনজুর ভরাট করতে পারে নি। কাজেই তার অভাবে কাতর হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অন্য কোনো ব্যাপার। কী ব্যাপার তা সে ধরতে পারছে না। নিজেকে সে যতটা বুদ্ধিমান ভাবত এখন মনে হচ্ছে সে ততটা নয়। তার সমস্যাটা কেউ ধরে দিতে পারলে চমৎকার হত। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে কেমন হয়। আছে এমন কেউ? তাকে গিযে সে কী বলবে? ছোট বাচ্চাদের মতো বলবে— "আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না" রোগ হযেছে। আপনি সারিয়ে দিন।

মীরার অফিস ছুটি হয় চারটায়।

ছুটির পরপর তার বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করে না — বাসায় ফিরে সে কী করবে? নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকবে ?

বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে না। তার বন্ধুবান্ধব নেই। যারা আছে তাদের সঙ্গে গল্প বেশিদূর চালানো যায় না। মেয়েলি গল্পের বাইরে তারা যায় না কিংবা যেতে পারে না।

আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে সে সব সময় দূরে দূরে থেকেছে। এখন আরো বেশি দূরে থাকতে ইচ্ছা করে। তাঁদের কারো সঙ্গে দেখা হলেই অস্বস্তি, চট করে বিয়ে ভাঙা সমস্যায় চলে আসেন। সমস্ত চোখে–মুখে বিষাদের ভঙ্গি এনে বলেন — 'বুঝলি মীবা, সবই কপাল। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে জীবন শুরু কর। কী আর করবি? বেঁচে তো থাকতে হবে।'

নতুন সংসার যাতে শুরু করতে পারে সেই দুশ্চিন্তাতেও তার আত্মীয়স্বজন অস্থির। প্রায়ই খোঁজ আনছেন, ছেলের ছবি নিয়ে আসছেন। যে ছেলে আগে বিয়ে হয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী।

মীরার ছোট ফুপু এক ছেলেব খোঁজ আনলেন — খুব নাকি চমৎকার ছেলে। ভালো বংশ, ভালো টাকাপযসা, ভালো চেহারা। ছেলেব আগে বিয়ে হয নি, এখন বিযে করতে চায। তবে কুমাবী মেযে নয, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা।

মীরা বলল, 'এই ছেলে তো পাগল। আপনি শেষ পর্যন্ত একটা পাগল ছেলেব খোঁজ আমাব জন্যে নিযে এলেন?'

ফুপু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'পাগল বলছিস কী? স্মার্ট ইযাং ছেলে সুন্দব চেহাবা।'

'স্মার্ট ইযাং ছেলে বিধবা ছাড়া বিয়ে করতে চায় না — এব মানে কী? ছেলে কি বিদ্যাসাগবেব চ্যালা?'

'এখনই এত রেগে যাচ্ছিস কেন? আগে ছেলেব সঙ্গে কথা বল। তাবপব রাগারাগি করবি।'

'আমি ঐ ছেলের সঙ্গে কথা বল্‌ব না। তোমাব সঙ্গেও না। তুমি আব এ বাড়িতে এস না।'

'তোর নিজেরই মাথাটা খারাপ হযেছে মীরা।'

'তা ঠিক। মাথা আমাব নিজেরই খারাপ।'

এই সন্দেহ আজকাল মীরাব হচ্ছে। তাব কি মাথা খাবাপ? এমন কিছু কি তার মধ্যে আছে যাব জন্যে তার লজিক মাঝে মাঝে এলোমেলো হযে যায? আছে। নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্কের সেই অংশটা কি ঠিক কবা যায না?

জি.এম. সাহেব বললেন, 'মিস মীবা আজ আমি সাড়ে তিনটাব দিকে অফিস থেকে বেরুব। একটা বিযেব পার্টি আছে। গিফ্‌ট কিনতে হবে। ভালো গিফ্‌ট কোথায পাওযা যায় বলুন তো?'

মীরা বলল, 'ভালো বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?'

'ভালো মানে, যা দেখে তাবা এপ্রিসিযেট করবে। আমাব রুচিব প্রশংসা কববে।'

মীবা বলল, 'আজকাল রুচিটুচি কেউ দেখে না। উপহাবটাব দাম কত তাই দেখে। আপনি দামি একটা কিছু কিনে দিন তাহলেই হবে।'

'কী দেব বলুন তো?'

'আপনার বাজেট কত স্যার?'

'হাজার খানিক। এরচে' কম হলেই ভালো।'

'শাড়ি দিয়ে দিন।'

'আপনি কি আমাকে পছন্দ করে দিতে পারেন? অবশ্যি আপনাব যদি সময থাকে। আমার আবার রুচি বলে কিছু নেই। একবার আমার স্ত্রীর জন্যে একটা শাড়ি কিনেছিলাম।

শাড়ি দেখে সে বলল — এটা লুঙ্গির কাপড়। আমি নাকি থান থেকে সাড়ে তিন গজ লুঙ্গির কাপড় কিনে এনেছি।'

মীরা হসল।

পুরানো রসিকতা। সব স্বামীরাই স্ত্রীর জন্যে শাড়ি কেনা নিয়ে এই একটি রসিকতাই করে। এবং মনে করে খুব উচ্চ শ্রেণীর রসিকতা করা হল।

'মিস মীরা।'

'জ্বি স্যার।'

'আমার স্ত্রী, অন্য দশ জন মানুষের স্ত্রীর মতো না। অন্য দশজন শাড়িটাকে লুঙ্গির কাপড় বলে খানিকক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করবে, তারপর অনুতপ্ত হয়ে সেই শাড়ি পরে বলবে — পরার পর তো ভালোই দেখাচ্ছে! তোমার রুচি খুব খারাপ না।'

'আপনার স্ত্রী কী করলেন?'

'সে ঐ শাড়ি কেটে আমার জন্যে তিনটা লুঙ্গি বানিয়ে দিল। সে লুঙ্গি আমাকেই পরতে হল।'

মীরা কিছু বলল না। সাধারণ রসিকতার গল্প এখন সেনসেটিভ পর্যায়ে চলে গেছে। এখন কিছু না বলাই ভালো।

'আপনার কি সময় হবে মিস মীরা?'

'জ্বি স্যার হবে।'

'তাহলে চলুন যাই। শাড়ি কোথায় পাওয়া যায় তাও তো জানি না — শাড়িটাড়ি অবশ্যি আমার স্ত্রী কেনে। খুব আগ্রহ নিয়ে কেনে। তবে আজকেরটা কিনবে না। কারণ কি জানেন?'

'জ্বি না।'

অনুমান করতে পারেন?'

'না — তাও পারছি না।'

'যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে সে আমার দিকের আত্মীয়। আমার দিকের আত্মীয়ের কোনো কর্মকাণ্ডে সে থাকবে না। বিয়েতেও সে যাবে না — সাজগোজ সে করবে ঠিকই। গাড়িতে উঠার আগ মুহূর্তে বলবে — মাথা ধরেছে, বমি বমি লাগছে। বলেই ছুটে বাথরুমে ঢুকে গলায় আঙুল দিয়ে হড়হড় করে বমি করবে। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হবে — থাক যেতে হবে না। এই হচ্ছে আমার জীবন। অনেক কথা আপনাকে বলে ফেললাম, চলুন যাওয়া যাক।'

শাড়ি কেনা হয়ে গেল পনের মিনিটে। দোকানদার কয়েকটা শাড়ি মেলে ধরল। মীরা সাদা জামদানীর উপর নীল লতাপাতা আঁকা একটা শাড়ি তুলে নিয়ে বলল — 'এইটা নিন স্যার। চমৎকার।'

জি.এম. সাহেব বললেন, 'আরেকটু ঘুরেফিরে দেখলে হয় না?'

'শুধু শুধু হাঁটাহাঁটি করে কোনো লাভ নেই — এটা ভালো শাড়ি। আপনি আমার রুচির উপর ভরসা করেছেন — এটাই নিন। আমি এখান থেকে বিদায় নেব। বইয়ের দোকানে খানিকক্ষণ ঘুরব।'

'আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি — তারপর আপনাকে নামিয়ে দেব।'

'স্যার কোনো দরকার নেই।'

মীরা বইয়ের দোকানগুলোতে বেশ কিছু সময় কাটাল। তিনটা বই কিনল — তিনটিই কবিতার। বই তিনটিই তার আছে তবু কিনল কেন কে জানে? মানুষের কিছু কাজকর্ম আছে চট করে যার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না। অবচেতন মনে কোনো ব্যাখ্যা হয়তো আছে যা এই মুহূর্তে মীরা নিজেও জানে না।

মীরা ঘড়ি দেখল। মোটে চারটা বাজে। কী করা যায়? মনজুরের খোঁজে কি একবার যাবে? অফিস ছুটি হয়ে গেছে। তাকে এখন অফিসে পাওয়া যাবে না। আগের বাসায় গেলেও তাকে পাওয়া যাবে না। বাসা বদলে সে তার মেজো মামার কাছে গিয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই। সেখানে যাওয়া যেতে পারে তবে ঐ লোকটিকে তাব নিতান্তই অপছন্দ। অশিক্ষিত, অশালীন গ্রাম্য ধরনের মানুষ। মনজুরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে মীরা যখন তাব বাবার বাড়িতে চলে এসেছে তখনকাব ঘটনা। বদরুল আলম এক সন্ধ্যাবেলায় দুই কেজি মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত। অতি নম্র গলায় বললেন, 'মার কাছে ছেলের একটা আবদাব। আবদাব রক্ষা না করলে ছেলে এই বাড়ি থেকে যাবে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। হাতি দিয়ে টেনেও ছেলেকে নড়াতে পারবে না মা।'

মীরা শুকনো গলায় বলেছে — 'বলুন কী আবদার।'

'মনজুরেব কাছে শুনলাম — তুমি ওকে ছেড়ে এই বাড়িতে চলে এসেছ। এখন মা জননী তুমি আমাব সঙ্গে চল। বাইরে একটা বেবীট্যাক্সি আছে। দাঁড়া করিয়ে বেখেছি।'

'বাইবে বেবীট্যাক্সি আছে?'

'হ্যাঁ মা।'

'দেখুন মামা, আমি বাগের মাথায় হুট কবে চলে আসি নি। আমি পুবো এক বছব এটা নিয়ে চিন্তা কবেছি। ভেবেছি। রাতের পব বাত নির্ঘুম কাটিয়ে তাবপব সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনজুবেব সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনজুব কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে?'

'না — আমি নিজেই এসেছি। মনজুব যদি শোনে সে বাগ কববে। তাকে তুমি এই বিষয়ে কিছু বোলো না।'

'আমি কিছুই বলব না। আপনি চা খান। চা খেয়ে চলে যান।'

বদরুল আলম সাহেবেব নিশ্চযই অনেক কিছু বলাব ছিল। সব গুছিয়ে রেখেছিলেন। মীরাব শীতল চোখেব সামনে সব এলোমেলো হয়ে গেল। চা না খেয়েই চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন আবাব এলেন সঙ্গে দু কেজি মিষ্টি। তৃতীয় দিন আবাব সঙ্গে সেই মিষ্টি।

মীবা বাধ্য হয়ে মনজুবকে বলল সে যেন তাব মামাকে সামলায। নির্বোধ ধবনেব মানুষকে সামলানো বড়ই কঠিন কাজ।

সেই মামার কাছে মনজুবেব খোঁজে যাওযাব কোনো অর্থই হয না। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করবেন। ভেবে বসবেন — সমস্যাব সমাধান হয়ে গেছে ; আবারো হয়তো লোক পাঠিয়ে দু কেজি মিষ্টি আনাবেন। কোনো দবকার নেই। তাবচে' মইনের কাছে যাওয়া যেতে পাবে। তাকে পাওযাব সম্ভাবনাও খুব কম। তবু চেষ্টা করে দেখা.যেতে পাবে। এই চাকবিটি তাঁব কারণেই হয়েছে। সেই হিসেবে ধন্যবাদ তো তাঁব প্রাপ্য।

নিউ মার্কেট থেকে বের হয়ে মীবা বিকশা নিল। রিকশায় উঠতে উঠতে মনে হল — ভালো লাগছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। বেঁচে থাকা, খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো — সব অর্থহীন মনে হচ্ছে — কী যেন সেই কবিতাটা?

রিকশাওয়ালা বলল, 'কই যাইবেন আম্মা?'

মীরা চমকে উঠল। এত মিষ্টি গলায় অনেকদিন তাকে কেউ আম্মা ডাকে নি। অজানা অচেনা অপুষ্টিতে জড়োজড়ো বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা এত মিষ্টি করে তাকে আম্মা ডাকল? এত মমতা ছিল তার গলায়?

মীরা বলল, 'আপনি সোজা যেতে থাকুন। আমি আপনাকে বলব।'

'জ্বি আচ্ছা আম্মা।'

মীরার মন ভালো হতে শুরু করেছে। কেন?

মীরা জানে না। মইনের বাসায় যাবার আগে একবার কি মনজুরের অফিস দেখে যাবে? এত বড় কোম্পানির মালিক সে, নিশ্চয়ই পাঁচটা বাজতেই বাসায় চলে যায় না। তাকে নিশ্চযই অনেক কাগজপত্র সই কবতে হয।

'আসব?'

মনজুর হাসিমুখে বলল, 'এস।'

'তোমার বসগিরি দেখতে এলাম।'

'খুব ভালো করেছ।'

'শরীর কেমন?'

'ভালো। মাঝখানে খারাপ হযে গিযেছিল। ডাযালিসিস করার পর ঠিক আছে। সেই সঙ্গে চলছে আযুর্বেদী চিকিৎসা — নলাদি ক্বাথ খাচ্ছি।'

'নলাদি ক্বাথটা কী জিনিস?'

'গোবর পানিতে গুললে যে বস্তু হয তাব নাম নলাদি ক্বাথ, কিডনির মহৌষধ বলতে পার।'

'এখন তাহলে আযুর্বেদী চিকিৎসাও চলছে?'

'যে যা বলছে তাই করছি। একজন হালুয়াঘাট থেকে পীর সাহেবেব পানি পড়া এনে দিলেন — তাও খেলাম।'

'কেন করছ এসব?'

'আগ্রহ কবে তারা নানান চিকিৎসার কথা বলে। তাদের খুশি কবার জন্যে কোনোকিছুতেই না করি না। মানুষকে খুশি করতে আমাব ভালো লাগে। তুমি কিছু খাবে মীরা?'

'না।'

'পেঁপে খেতে পার। কুদ্দুস নামে আমার এখানে একজন কর্মচারী আছে — সে বোজ নিউমার্কেট থেকে পেঁপে কিনে এনে বলছে, নিজের গাছের পেঁপে স্যাব। বাবার হাতে পোঁতা গাছ। কুদ্দুস খুব পিতৃভক্ত। তাব সব গাছই থাকে বাবার হাতে পোঁতা।'

মীরা তার ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'রসিকতা করাব চেষ্টা করছ বলে মনে হয়।'

'রসিকতা পছন্দ হচ্ছে না?'

'না। আজ তাহলে উঠি।'

মীরা উঠে দাঁড়াল। মনজুর দুঃখিত গলায় বলল, 'সত্যি সত্যি উঠছ? বস না একটু। আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাও।'

'এক জায়গায় যাব। দেরি হয়ে যাবে, সন্ধ্যার পর রিকশায় যেতে ভয ভয লাগে।'

'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে — যেখানে যেতে চাও নিযে যাবে।'

'ও আচ্ছা, তোমার তো এখন গাড়ি আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম। তাহলে খানিকক্ষণ বসা যায়। বল চা আনতে বল। ভালো কথা, ডোনার পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। নাম আমানুল্লাহ।'

মীবা অতি দ্রুত চা শেষ করে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল। মনজুর বলল, 'চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। তুমি যাবে কোথায — মইন সাহেবেব কাছে?'

মীরা খানিকটা হকচকিয়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। তুমি উনাকে চেন?'

'উনি একদিন আমার কাছে এসেছিলেন।'

'কী জন্যে?'

'এমনি বোধহয এসেছিলেন। কথাবার্তা বলার জন্যে।'

মীবা নরম গলায় বলল, 'তাঁব প্রতি এক সময আমার ভয়ংকর রকম টান ছিল তা কি উনি বলেছেন?'

মনজুর হেসে ফেলে বলল, 'সবই বলেছেন। কিছুই বাদ দেন নি। আমার কি মনে হয জান? আমার মনে হয ভদ্রলোক তোমাকে নিযে নতুন কবে জীবন শুরু করতে চান। তোমাকে কী করে বলবেন বুঝতে পারছেন না।'

'তুমি তোমার উর্বব মাথা থেকে এটা বেব করলে?'

'হ্যাঁ। আমার কিডনি ফেল করতে পাবে, ব্রেইন ফেল করে নি।'

'কবেছে। কাবণ তুমি জান যে মইন ভাই তাঁব স্ত্রী এবং বাচ্চাদেব নিযে খুব সুখে আছেন।'

মনজুর সহজ গলায বলল, 'আমি যতদূর জানি তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে লুসিযানায চলে যাবার পরই তিনি দেশে এসেছেন। ফিবে যাবেন না বলেই এসেছেন।'

'উনি নিজে তোমাকে বললেন?'

'হ্যাঁ। এবং আমার কি মনে হয জান মীবা, আমার মনে হয তোমাব উচিত তাঁকে বিযে কবা। এই ভদ্রলোকের প্রতি তোমার যে প্রচণ্ড মোহ ছিল তার সবটাই এখনো আছে। আছে বলেই আমার সঙ্গে থাকতে পাবলে না। আমাব মধ্যে তুমি মইন সাহেবেব ছাযা দেখতে চেযেছিলে। তা কি সম্ভব? আমি হচ্ছি আমি।'

মীরা কিছু বলল না।

গাড়িতে উঠেও চুপ করে রইল। মনজুব বলল, 'মনে হচ্ছে তোমাব মন খাবাপ করিয়ে দিযেছি। সরি।'

মীরা বলল, 'সরি হবার কিছু নেই।'

মনজুর বলল, 'তোমার মোহ প্রসঙ্গে যা বললাম তা কি ভুল?'

'না ভুল না।'

'ভুল না হলে তুমি এত লজ্জিত বোধ কবছ কেন?'

'লজ্জিত বোধ করছি না তো!'

'করছ। খুব মন খারাপ কবেছ। প্লিজ মন খাবাপ কববে না। আমাব সঙ্গে তিনটি বছর তোমার খুব খাবাপ কেটেছে। খারাপের পর ভালো আসে। সামনেব দিনগুলো তোমার ভালো যাবে। আমি একশ ভাগ নিশ্চিত।'

মনজুর মীরাকে নামিযে দিযে চলে গেল।

১৬

মইন বারান্দায় কাগজ, কেঁচি এবং গাম নিয়ে এসেছে। তৈরি করছে কাগজের এরোপ্লেন মডেল। তার সামনে একটা বই খোলা। বইয়ে লেখা মাপমতো প্রতিটি মডেল তৈরি হচ্ছে এবং তা সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়িয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাকে ঘিরে নানান বয়সী কিছু বাচ্চাকাচ্চা বসে আছে। তাদের বিস্ময় এবং মুগ্ধতা সীমাহীন।

মইন মীরাকে দেখে সহজ গলায় বলল, 'এস মীরা, এস। প্লেন বানাচ্ছি।' মইনের গলায় কোনো বিস্ময় নেই। মনে হতে পারে সে এই মুহূর্তে মীরার জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিস্মিত না হবার অভিনয় দুরূহ অভিনয়। এই মানুষটি সেই অভিনয় এত চমৎকার করেছে কী করে? নাকি সে আসলেই বিস্মিত হয় নি। ধরেই নিয়েছিল মীরা যে কোনোদিন আসবে। মইন কাগজ কাটতে কাটতে বলল, 'এই মোড়াটায় আরাম করে বস। আমার চারপাশে যারা বসে আছে তারা আমার নেফিউ এবং নিস। এদেবকে আমি এই মুহূর্তে এরোডায়নামিক্স শিখাচ্ছি। সামান্য কাগজের তৈরী প্লেন বাতাসে ভর কবে কুড়ি থেকে পঁচিশ গজ যেতে পারে যদি ঠিক ডিজাইনে তাদেব তৈরী কবা হয। এই দেখ এটাকে দেখ — ফড়িঙের মতো স্লিম বডি, আকাশে ভেসে থাকাব ক্ষমতা দেখলে তুমি হকচকিযে যাবে।

মইন কাগজের প্লেন আকাশে ছুড়ে মাবল। সেই প্লেন সত্যি সত্যি উড়তে উড়তে বাড়ির কম্পাউন্ড ছাড়িয়ে রাস্তার দিকে রওনা হল। পেছনে পেছনে ছুটে গেল শিশুর দল। মইন মীরার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'কেমন আছ?'

'ভালো।'

'কোনো উদ্দেশ্য নিযে এসেছ না এমনি এসেছ?'

'এমনি এসেছি। আপনার না চলে যাবার কথা ছিল?'

'যাওযা হয নি। আরো মাসখানিক থাকব।'

'আমাদের জি.এম. বলছিলেন, পুবোপুরি থেকে যাওযার সম্ভাবনাও নাকি আছে।'

'না। কথার কথা বলছিলাম। সেটাকেই ভদ্রলোক বিশ্বাস করে বসে আছেন। বর্তমান বাংলাদেশের সমস্যা কি জান? সিরিযাসলি যেসব কথা তুমি বলবে সেসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু রসিকতা কবে তুমি যদি কিছু কথা বল, যদি 'casual remarks' কিছু কর সবাই তা বিশ্বাস করবে। চল ভেতরে বসে কথা বলি।'

'প্লেন বানানো শেষ?'

'আজকের মতো শেষ। তুমি কি অফিস থেকে আসছ?'

'না। নিউ মার্কেট থেকে। আমাদের জি.এম. সাহেবের সঙ্গে নিউমার্কেটে গিয়েছিলাম। আত্মীয়ের বিযে উপলক্ষে তিনি শাড়ি কিনলেন। আমাকে পছন্দ করে দিতে হল।'

মইন হাসিমুখে বলল, 'উনি নিশ্চয এর মধ্যে তোমাকে বলেছেন যে তাঁর পারিবাবিক জীবন কী রকম বিষময়। বলেন নি?'

'বলেছেন।'

ঐ গল্পটি কি করেছেন — যেখানে তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্যে শখ করে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা সেই শাড়ি কেটে তিনটি লুঙ্গি বানিয়ে তাঁকে প্রেজেন্ট করলেন। এই গল্প কি শোনা হয়েছে, না শোনা হয নি?'

মীরা বলল, 'শোনা হযেছে।'

মইন বলল, 'এইসব গল্প এক বর্ণও বিশ্বাস করবে না। সুন্দরী মহিলাদের সহানুভূতি আদায়ের জন্যে এই গল্প তিনি করেন। ভদ্রলোক হার্মলেস। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তাঁর সঙ্গে ঘুরতে পার। কোনোদিন ভুলেও সে তোমার হাত ধরবে না। সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে গল্প করার আনন্দই তাঁর একমাত্র আনন্দ। তাঁর পারিবারিক জীবনও খুব ভালো। ভদ্রলোকের স্ত্রী একজন রূপবতী মহিলা এবং অত্যন্ত ভালো মহিলা। মীরা তুমি মনে হয় আমার কথা শুনে হকচকিয়ে গেছ।'

'কিছুটা হকচকিয়ে গেছি তা ঠিক।'

'বুঝলে মীবা, পৃথিবীটা আসলে মোটামুটি ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা। এখন বল তোমার পরিকল্পনা কী?'

'আমার কোনো পবিকল্পনা নেই। আপনার কল্যাণে চাকবি হয়েছে আমি তাব জন্যে আপনাকে থ্যাংকস্ দিতে এসেছি। এর বেশি কিছু না।'

'তুমি এমনভাবে না বললে, যাতে মনে হচ্ছে এর বেশি কিছু হলে তোমার আপত্তি আছে। বস, আমার সঙ্গে চা খাও। চা খেয়ে চল ঘুরতে বেব হই। বাতে ডিনারেব পব তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসব। ভয়ের কিছু নেই। আমিও তোমাদের জি.এম. সাহেবেব মতো হার্মলেস। ভালো কথা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে মনটা খুব খাবাপ। কী হয়েছে বল তো?'

মীরা বলল, 'কিছু হয় নি, আমি বেশিক্ষণ থাকব না। চা খাব তাবপর বাসায় চলে যাব। কাজ আছে।'

'কাজ পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কাজেই আব কোনো কথা নয়। আমার পরিকল্পনা কি ছিল জান? পবিকল্পনা ছিল সন্ধ্যাব পর তোমাকে নিয়ে বাইবে কোথাও খেতে যাব। তোমাদেব বাসায় আই ’মিন তোমাব ভাইয়ের বাসায় খবর দিয়ে বেখেছিলাম। তুমি যখন এলে তখন ভাবলাম খবব পেয়ে নিজেই এসেছ। তুমি হয়তো লক্ষ কব নি যে তোমাকে দেখে আমি মোটেও অবাক হই নি। পবে অবশ্যি বুঝলাম যে নিজ থেকেই এসেছ। খবব পাও নি। এব পবেও যদি যেতে না চাও তাহলে আমাব হাতে আরেকটি কঠিন অস্ত্র আছে।'

'কী অস্ত্র?'

'আজ আমার জন্মদিন। তুমি এই দিনটাও ভুলে গেলে এটা খুবই দুঃখেব কথা। আমার ধারণা ছিল আমার জন্যে অনেকখানি আবেগ তুমি সব সময় ধবে বাখবে। ধাবণা দেখা যাচ্ছে ঠিক না। তুমি সব ভুলেটুলে বসে আছ।'

'তাই কি ভালো না?'

'জানি না, হয়তো ভালো। এখন বল তুমি কি যাবে, না যাবে না?'

'চলুন যাই।'

'তুমি খুব অনাগ্রহ নিয়ে আমার সঙ্গে রওনা হচ্ছ। আমি হাজাব টাকা বাজি বাখতে পারি এই অনাগ্রহ তোমার থাকবে না।'

'বাজিতে আপনি হারবেন। আজকাল কোনো কিছুতেই আগ্রহ বোধ কবি না।'

'কেন কর না তাও জানতে চাই।'

'জানতে চান কেন?'

'আজকের অনাগ্রহের পেছনে — অনেকদিন আগে আমার ঘবে যা ঘটেছিল তার কোনো যোগ আছে কিনা জানতে চাই। আমি নিজে অত্যন্ত সুখী মানুষ। আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই।'

দুজন হাঁটতে হাঁটতে রওনা হল। মইনের ইচ্ছা অনেকক্ষণ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যাবার পর তারা রিকশা নেবে। রিকশায় করে ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন কোনো চাইনিজ রেস্তোরাঁর আধো আলো আধো আঁধারে রাতের খাবার শেষ করবে।

মীরা লক্ষ করল মইনকে অসম্ভব খুশি খুশি লাগছে। মনে হচ্ছে সে তার আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। মীরাকে সে কোনো কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না। অনবরত কথা বলে যাচ্ছে —

'মীরা, জার্মান কালচারাল ইন্সটিটিউটে একটা ছবি কিনেছিলাম তোমার মনে আছে? নগদ দাম দিয়ে কিনেছিলাম। এক্সিবিশন শেষে ছবি নিয়ে আসার কথা ছিল। আমি আর ছবি আনতে যাই নি। ইচ্ছা করেই যাই নি। ঐ আর্টিস্ট যেহেতু আমার ঠিকানা জানে না — ছবি দিয়ে যেতেও পারছে না। হা-হা-হা।'

'এতে খুশি হচ্ছেন, কারণটা কী?'

'খুশি হচ্ছি কারণ আর্টিস্ট সাহেবকে এক ধরনের মানসিক কষ্ট দিতে পারছি। সে ঐদিন আমাকে সূক্ষ্মভাবে অপমান করেছিল। কঠিন অপমান। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম শোধ নেব। এখন নিচ্ছি। বেচাবা এখন ছবিটা নিয়ে পড়েছে বিপদে। নিজের কাছে ছবিটা রাখতে হচ্ছে। যতবার তাকাচ্ছে ছবিটার দিকে ততবার আমার কথাটা মনে হচ্ছে। মনটা খারাপ হচ্ছে — টাকা দিল অথচ ছবি নিল না। কঠিন মানসিক চাপ। হা-হা-হা।'

'আপনি মানুষটা বেশ অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত না- ক্রুয়েল। নিষ্ঠুর। শুধু সদ্‌গুণ নিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয না — এইসবও কিছু কিছু লাগে। যাদের ভেতর শুধুই সদ্‌গুণ, মানুষ হিসেবে অনেক নিচের দিকে তাদের অবস্থান।'

'কী পাগলের মতো কথা বলছেন?'

'পাগলের মতো কথা বলছি না। ভেবেচিন্তে বলছি। তোমাকে এই কথাগুলো বলার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্যও আছে। কী বলছি মন দিয়ে শোন। খুব মন দিয়ে। একজন মানুষ যার ভেতরে মহৎ গুণাবলি ছাড়া আর কিছুই নেই, রাগ নেই, হিংসা নেই, ঘৃণা নেই সে কী করে জান? সে আশপাশের মানুষদের অসম্ভব কষ্ট দেয। আমরা তাকে এড়িযে চলি। ক্ষেত্রবিশেষে পরিত্যাগ করি। কারণ আমবা তাকে সহ্য করতে পারি না।'

মীরা থমথমে গলায় বলল, 'আমাকে এসব কেন বলছেন?'

মইন হাঁটা বন্ধ করে সিগারেট ধরাল। ধোঁযা ছাড়তে ছাড়তে বেশ কিছু সময় তাকিযে রইল মীরার দিকে। সন্ধ্যার শেষ আলোয় মীরার মুখ কেমন জানি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত।

মইন হালকা গলায় বলল, 'বুঝলে মীরা, আমি কয়েকদিন আগে মনজুর নামেব ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এক ধরনের কৌতূহল থেকেই গিয়েছিলাম। তোমার মতো একটা মেয়ে সবার মতের বিরুদ্ধে এমন সাদামাঠা একজন মানুষকে কেন বিয়ে করল আবার ছাড়াছাড়িই বা কেন হল খুব জানার ইচ্ছা ছিল। আমাব সঙ্গে এই লোকটি প্রতিযোগিতা করেছে এবং এক অর্থে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে, কাজেই তার সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক, তাই না, কাজেই দেখা করলাম।'

'কেমন দেখলেন?'

'অন্য দশজন যা বলেছে তাই — নিতান্তই সাধারণ এক জন মানুষ।'

মীরা চাপা গলায় বলল, 'আপনার ধারণা ঠিক না। ও নিতান্ত সাধারণ মানুষ না।'

মইন হেসে ফেলে বলল, 'প্রথম দর্শনে আমার যা মনে হল তা বললাম — সাধারণ মানুষ, খুবই সাধারণ। তারপর অবাক হয়ে দেখি হিসেবে কী যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। কী একটা জিনিস যেন মিলছে না। লোকটি পরিপূর্ণ মানুষ না। তার মধ্যে মানুষের ত্রুটিগুলো অনুপস্থিত। আমার ধারণা এই যে তার সঙ্গে তোমার বনল না তার কারণ এই।'

'আপনি তো অদ্ভুত কথা বলছেন মইন ভাই। একজন মানুষের ভেতর ত্রুটি নেই বলেই তাকে আমার পছন্দ হবে না?'

'হ্যাঁ তুমিই তার ত্রুটিগুলো বল। তার সবচে' বড় ত্রুটি কী যা তোমাকে সবচে' বেশি আহত করেছে?'

'ভালবাসা বলে কিছু তার মধ্যে ছিল না। তার মধ্যে যা ছিল তা হল আশপাশেব সবাব সম্পর্কে অনাগ্রহ।'

'ভালবাসার বাস হচ্ছে হৃদযে। তাকে চোখে দেখা যায় না। আমবা করি কি, নানান কাণ্ডকারখানা করে তা দেখাতে চাই যেমন ফুল কিনে আনি, উপহার দেই। এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে এক ধরনের ভান আছে — ভানটা হচ্ছে আমাদের ত্রুটি। যে মানুষেব মধ্যে এই ত্রুটি নেই সে ভালবাসা দেখানোর চেষ্টা করবে না।'

'ভালবাসা যদি থাকে তা দেখানোয দোষ কী?'

'কোনোই দোষ নেই। দেখানোই উচিত। কিন্তু খুব ক্ষুদ্র একদল মানুষ আছে যাদেব কাছে এই অংশটি অপ্রযোজনীয মনে হবে। এদেরকে আমরা যখন বিচার কবব তখন মানুষ হিসেবে এদের স্থান হবে অনেক পেছনে। কারণ এবা দুর্বোধ্য।'

মীবা শীতল গলায বলল, 'ওব সঙ্গে সামান্য কিছুক্ষণ কথা বলে ওকে আপনি মহাপুরুষদেব দলে ফেলে দিযেছেন?'

'সামান্য কিছুক্ষণ কথা হযেছে তা ঠিক না। প্রচুব কথা হযেছে। আমি তাঁকে খোলাখুলি অনেক কথাই বলেছি। কেন জানি তাঁব সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করল। মাঝে মাঝে কিছু মানুষ পাওযা যায যাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। কবে না?'

'হ্যাঁ কবে।'

'মীবা আমি তোমাকে কিছু মিথ্যা কথাও বলেছি। আমি কনফেশন কবতে চাই এবং.......'

মইন থেমে গেল। মীরা বলল, 'থামলেন কেন, কথা শেষ করুন।'

মইন খুবই নিচু গলায় বলল, 'অনেক আগে তুমি প্রচণ্ড ঘোর এবং প্রচণ্ড মোহ নিযে আমাব কাছে ছুটে এসেছিলে। আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেই নি। আজ যদি আমি ঠিক সেই বকম মোহ নিযে তোমার কাছে ছুটে আসি, তুমি কি আমাকে ফিরিযে দেবে?'

মীবা জবাব দিল না। তার সমস্ত হৃদয হাহাকারে পূর্ণ হযে গেল। তার ইচ্ছে কবল চিৎকাব করে ওঠে — আমাব ভালো লাগছে না। আমাব কিছুই ভালো লাগছে না।

১৬.

ডাক্তার সাহেবের নাম শাহেদ মজুমদার।

ডাক্তাররা কখনো পুরো নামে পরিচিত হন না।

শাহেদ মজুমদার সেই কাবণেই এস মজুমদার নামে পরিচিত। বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। এই বযসেই প্রচুর খ্যাতি এবং অখ্যাতি কুড়িয়েছেন। ডাক্তার সাহেবকে মনজুরের

পছন্দ। মানুষটি রসিক। রস ব্যাপারটা ডাক্তারদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায় না। প্রথম দিন মনজুর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ভাই আমি কি মারা যাচ্ছি নাকি?'

ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বলেছেন, 'হ্যাঁ যাচ্ছেন।'

মনজুর যখন পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে তখন তিনি বলেছেন, 'ভয় পাবেন না। আমরা সবাই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রায় ষাট বছর পার করে মারা যাচ্ছি — এই অর্থে বলেছি। নির্দিষ্ট সময়টুকু আপনি যাতে পান সে চেষ্টা আমি করব এই আশ্বাস দিচ্ছি।'

আজ মনজুরকে তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। দেখা শেষ করে বললেন, 'আপনাকে কমপ্লিট রেস্টে চলে যেতে হবে। আগেও তো বলেছি। আপনি কথা শোনেন নি।'

মনজুর বলল, 'কিছু ঝামেলা ছিল, শেষ করেছি। এখন লম্বা হয়ে বিছানায শুযে পড়ব।'

'কবে শোবেন? আজ থেকেই শুরু করুন।'

'আপনি বললে আজই শুযে পড়ব। ভালো কথা ডাক্তার সাহেব, আমার এই সমস্যায কি মাথায গণ্ডগোল হয়?'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না — মাথায় গণ্ডগোল মানে?'

মনজুর লাজুক গলায় বলল, 'আমার ঘরে একটা টেলিফোন আছে। হঠাৎ হঠাৎ সেই টেলিফোন বেজে ওঠে। বেজে উঠার কথা না। টেলিফোনটা অনেকদিন ধরেই ডেড। একটা ছেলের নাম ইমরুল, সে রাত দুটা আড়াইটার দিকে টেলিফোন করে। মজার মজাব কথা বলে। আমি জানি এটা অসম্ভব না। আমাব এক ধরনেব হেলুসিনেশন হচ্ছে। আমি কি ঠিক বলছি ডাক্তার সাহেব?'

• 'ঠিকই বলছেন। রক্তে টক্সিক মেটেরিয়াল বেড়ে গেলে — হেলুসিনেশন হতে পাবে। এরকম ঘটনার নজির আছে। ছেলেটার সঙ্গে কী কথা হয?'

'ছেলেমানুষি ধরনেব কথা, গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।'

'হযতো পুরো ব্যাপারটা আপনি স্বপ্নে দেখেছেন।'

'তাও হতে পারে।'

'শেষ কবে টেলিফোন পেলেন?'

'গত কাল রাত তিনটাব দিকে। সে বলল, যে ছেলেটি আপনাকে কিডনি দিচ্ছে তাব একমাত্র কিডনিটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন সে কী কববে?'

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেলে বললেন, 'আপনার কথা শুনে তো মনে হয না ঐ ছেলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে না। সে তো বেশ সিরিয়াস ধরনেব কথা বলেছে। এই কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনার মনেও আছে। আছে না?'

'জ্বি আছে।'

'এসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবেন না। আপনার সাব-কনশাস মাইন্ড আপনাকে নিয়ে খেলছে। এটাকে গুরুত্ব দেযা ঠিক হবে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন।'

'তা দিচ্ছি। গুরুত্ব দেযার কারণও আছে। আমি কি কারণটা আপনাকে বলব?'

'বলুন।'

'কারণটা কোনো একজনকে বলা দরকার। আমি বলার মতো কাউকে পাচ্ছি না। সবাই কথা বলতে চায়। কেউ শুনতে চায় না।'

ডাক্তার সাহেব নরম গলায় বললেন, 'আমি আপনার কথা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছি। আপনি ধীরেসুস্থে বলুন।'

'আমি আমানুল্লাহ ছেলেটির সঙ্গে নিজের খুব মিল দেখতে পাচ্ছি। সে একটি কিডনি বিক্রি করেছে। আমিও তাই করেছিলাম। আপনাকে এই তথ্য আগেই দিয়েছি। বাবার চিকিৎসার জন্যে এটা করতে হয়েছিল। তাঁর থ্রোট ক্যানসার হয়েছিল। ক্যানসার হয়েছে জানার পর থেকে তিনি বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা হল বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করলেই তিনি সেরে উঠবেন। টাকা টাকা করে তিনি একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন। সারাক্ষণ বলতেন, এক লাখ টাকা হলেই বিদেশে গিয়ে জীবনটা রক্ষা করতাম। এই সময়ই আমি বাবাকে এক লাখ টাকা দেই। টাকা হাতে নেযার দু দিনের মাথায তাঁর মৃত্যু হয়।'

'তখনো আপনার কিডনি কেটে বাদ দেয়া হয় নি?'

'জ্বি না। আমি ইচ্ছা করলে টাকাটা ফেরত দিতে পাবতাম, বলতে পাবতাম আমি কিডনি বিক্রি করতে চাই না। তা করি নি। যথাসময়ে কিডনি ট্রান্সপ্লেন্ট হয। যাক ঐ প্রসঙ্গ। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আমানুল্লাহ্ নামের ছেলেটিরও একই ব্যাপার ঘটছে। সে একটি কিডনি নিযে বেঁচে থাকবে এবং একসময দেখা যাবে আমাব মতো সমস্যা হযেছে।'

'তেমন সম্ভাবনা খুবই কম।'

'কম হলেও তো আছে। আছে না?'

ডাক্তার জবাব দিলেন না।

মনজুর বলল, 'আপনাব এখানে কি একটা সিগাবেট খেতে পাবি। প্রচণ্ড তৃষ্ণা হচ্ছে। যদি অনুমতি দেন।'

'অনুমতি দিলাম।'

মনজুব সিগাবেট ধবিযে প্রায অস্পষ্ট স্ববে বলল, 'আমি একটা সিদ্ধান্ত নিযেছি ডাক্তাব সাহেব — আমি ঐ ছেলেটিব কিডনি নেব না। যে ক দিন বাঁচব নিজের যা আছে তা নিযেই বাঁচব।'

'এই সিদ্ধান্ত কি এখন নিলেন?'

'না। যেদিন আমানুল্লাহ্‌কে নগদ এক লাখ টাকা গুনে গুনে দিলাম সেদিনই নিযেছি। ডাক্তাব সাহেব, আমাব শবীরটা এখন বেশ খাবাপ লাগছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিন আমি আজ রাতেই হাসপাতালেব বিছানায শুযে পড়তে চাই — অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। জ্বর আসছে বলেও মনে হচ্ছে। প্লিজ একটু দেখবেন আমার গাযে টেম্পারেচার আছে কিনা?'

মনজুব ডাক্তাবেব দিকে তাব হাত বাড়িযে দিল। ডাক্তাব সাহেব সেই হাত ধবলেন না। তিনি তাকিয়ে বইলেন মনজুবের চোখের দিকে। সেই চোখ কোমল ও শান্ত। অস্থিরতার কোনো ছাপ চোখেব মণিতে নেই।

১৮

মনজুর অপারেশন করতে রাজি নয।

এই খবর জাহানারা পেয়েছে গতকাল রাতে। ফরিদ এসে খবর দিযেছে। জাহানারা তৎক্ষণাৎ ফরিদকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছে। কাঁদো কাঁদো গলায বলেছে — 'ফরিদ এসব কী বলছে স্যার?'

মনজুর বলল, 'ও যা বলছে ঠিকই বলেছে। আমি অনেক ভেবেচিন্তে ডিসিশান নিয়েছি। এর নড়চড় হবে না। তুমি আমাকে অনুরোধ কোরো না বা কান্নাকাটিও কোরো না।'

জাহানারা হতভম্ব হয়ে গেল। এ রকম হতে পারে সে কল্পনাও করে নি। জাহানারা থাকতে থাকতেই বদরুল সাহেব এলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি রাগী গলায় বললেন, 'তুই কি পাগল হয়ে গেলি?'

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ঐ এক লাখ টাকার কী হবে? ঐ টাকা তো আর উদ্ধার হবে না।'

'তা হবে না। মামা, টাকাটা আমি দান করেছি।'

'তুই পাগল, ষোল আনা পাগল।'

মনজুর ক্লান্ত গলায় বলল, 'মামা আমার শরীরটা খুবই খারাপ। তোমার চিৎকারে আরো খারাপ হচ্ছে। দয়া করে বিদেয় হও।'

বদরুল আলম নড়লেন না। জাহানারা বেব হয়ে এল। ফরিদকে হাসপাতালে রেখে একা চলে এল মীরার কাছে।

জাহানারা মীরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে অসম্ভব ভয় পেয়েছে। তার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। সারা পথই সে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে। তার চোখ ফোলা। মুখ অসম্ভব বিষণ্ন।

মীরা বলল, 'আমি বললেই কি মনজুর আমার কথা শুনবে?'

জাহানারা ধরা গলায় বলল, 'হ্যাঁ আপনি বললে শুনবে।'

'আপনি কী করে জানেন?'

'আমি জানি। আপনি স্যারের হাত ধরে যদি এক বার বলেন, স্যাব বাজি হবেন। কিডনি আমি দেব। সেটা কোনো সমস্যাই না। আপনি শুধু স্যাবকে বাজি করাবেন। বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।'

'সেটা আপনি জানেন, আমিও জানি। কিন্তু ও জানে না। ওব কিছু নিজস্ব বিচিত্র লজিক আছে। সে ঐ লজিকে চলে। অন্য কারো কথাই শোনে না। আমার কথাও শুনবে না।'

'আপনার কথা শুনবেন। আপনার কথা না শুনে স্যারের উপায় নেই।'

'এত নিশ্চিত হয়ে কী করে বলছেন?'

'স্যারের রাইটিং প্যাডের একটা পাতা আমি আপনার জন্যে নিযে এসেছি। ঐটা দেখলেই আপনি বুঝবেন তিনি আপনার কথা ফেলবেন না।'

জাহানারা রাইটিং প্যাডের একটা পাতা মীরার দিকে বাড়িয়ে ধরল। সেখানে গুটি-গুটি করে অসংখ্যবার লেখা — মীরা, মীরা, মীরা।

জাহানারা বলল, 'মোট তিনশ ছ বার লেখা আছে।'

'আপনি বসে বসে গুনেছেন?'

'জ্বি।'

মীরা জাহানারার দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল। মীরার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। এই হাসি সে তৎক্ষণাৎ মুছে ফেলে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আপনাব স্যারকে আপনার খুব পছন্দ তাই না?'

জাহানারা সহজ গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

'কেন পছন্দ সেটা কি জানেন?'

'জানি।'

'আমাকে বলবেন?'

জাহানারা স্পষ্ট স্বরে বলল, 'না।'

মীরা বলল, 'আচ্ছা থাক বলতে হবে না। সবকিছু বলতে নেই। চলুন আপনার স্যারের কাছে যাই। দেখি তাকে রাজি করানো যায় কিনা। ওর সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয় তখন আমার পরনে আসমানি রঙের একটা শাড়ি ছিল। ঐ শাড়িটা পরে গেলে কেমন হয়?'

'খুব ভালো হয়।'

'আপনি তাহলে অপেক্ষা করুন, আমি শাড়ি বদলে আসছি। আর শুনুন, এত কাঁদবেন না। আপনাব কান্না দেখে আমারই কান্না পেয়ে যাচ্ছে। দেখি, কাছে আসুন তো আপনাকে একটু আদব কবে দেই।'

আশাবরী

১

জানেন, আমাদের বাসায গত তিন মাস ধরে কোনো আযনা নেই। ঠাট্টা করছি না। সত্যি নেই। একমাত্র আয়নাটা ছিল বাবার ঘরে। ড্রেসিং টেবিল নামেব এক বস্তুর সঙ্গে লাগানো। একদিন সন্ধ্যায় বিনা নোটিশে সেই আয়না ঝুব ঝুব করে ভেঙে পড়ে গেল। অভ্যাসের বশে আমরা এখনো ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়াই। যেখানে আযনা ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে চেষ্টা করি। ভুল ধরা পড়ামাত্র খানিকটা লজ্জা পাই। শুধু ভাইয়া এমন ভাব কবে যেন সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে, আযনা থাকলে আমবা যে ভাবে মাথা এদিক-ওদিক করে চুল আঁচড়াই সেও তাই করে।

মজার ব্যাপার কি জানেন, ঘরে যে আযনা নেই এ নিযে কাবো কোনো মাথাব্যথাও নেই। আপা সব কিছু নিয়ে কঠিন গলায কথা বলে, এ ব্যাপারে একটি কথাও বলছে না। ভাইয়াও চুপ। অথচ সংসারের দাযদায়িত্ব এখন অনেকখানি তাঁর। পুরুষ মানুষ বলতে সে একা। বাবার কোনো খোঁজ নেই। কোথায আছেন আমবা জানি না। তাঁকে নিযে আমবা তেমন চিন্তিতও নই। মাঝে মাঝে ডুব দেযা পুরানো অভ্যাস। বাবার ব্যবসা যখন খাবাপ চলে, সংসারে টাকা-পয়সা দিতে পাবেন না তখন উধাও হযে যান। মাসখানিক পব একটা পোস্টকার্ড এসে উপস্থিত হয়। পোস্টকার্ডের এক পিঠে সম্বোধনহীন চিঠি। যে চিঠিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হয — "পর সমাচাব এই যে, ব্যবসাব কাবণে আমাকে সুনামগঞ্জে আসিতে হইয়াছে। এক ঠগবাজের পাল্লায পড়িয়া সামান্য অর্থনৈতিক ঝামেলায পড়িয়াছি। তোমরা কোনোমতে চালাইয়া নাও। যথাশীঘ্র চলিযা আসিব। চিন্তাব কোনো কারণ নাই।"

যদিও লেখা থাকে সুনামগঞ্জ থেকে লিখছি কিংবা চাঁদপুব থেকে লিখছি, তবু আমাদেব সবার ধারণা তিনি লেখেন ঢাকায় বসেই কারণ পোস্টকার্ডে সুনামগঞ্জ কিংবা চাঁদপুবেব কোনো সিল থাকে না। একবার চিঠিতে লিখলেন যশোহর থেকে লিখছি। ওমা সেই চিঠি পরের দিন এসে উপস্থিত। ভাইযা শার্লক হোমসেব মতো চিঠিব ঠিকানা থেকে এই তথ্য বের করল এবং মাকে ক্ষেপাবার জন্য বলতে লাগল '— সন্দেহজনক। খুবই সন্দেহজনক।'

বাবা উধাও হলে টাকা-পযসার বড় বকমের সমস্যা হয়। তখন সংসার কীভাবে চলে আমি জানি না। তবে আমাকে কলেজে যাবাব সময ঠিকই দশ টাকা হাতখরচ দেযা হয।

টাকাটা নিতে লজ্জা লাগে তবু আমি আমার অভ্যাসমতো বলি — 'আরো দশটা টাকা দাও না মা, প্লিজ।' মা বিস্ময় এবং ব্যথিত চোখে তাকিয়ে থাকেন। হয়তো মনে মনে ভাবেন তাঁর এই মেয়েটা এত বোকা? কিছুই বোঝে না? আমি ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকি — 'দাও না মা, প্লিজ। প্লিজ। দশ টাকা তো রিক্‌শা ভাড়াতেই চলে যাবে। দুপুরে না খেয়ে থাকব?'

এ রকম ঘ্যান ঘ্যান করা, সবকিছু বুঝেও না বোঝা আমার অভ্যাস। মানুষের অভ্যাস কি চট করে যায় — আপনি বলুন? আযনা নেই জেনেও তো আমরা আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছি। দাঁড়াচ্ছি না? সবই অভ্যাস। যেমন ভাইযার অভ্যাস হচ্ছে রসিকতা করা এবং দার্শনিক ধবনের কথাবার্তা বলা। তার যদি কোনো কাবণে ফাঁসি হয, আমাব ধারণা, সে ফাঁসির দড়ির কাছে গিয়ে চিন্তিত গলায় বলবে — 'দড়ি তো খুব পল্‌কা মনে হচ্ছে — ছিঁড়ে পড়ে যাবে না তো ভাই? আমার ওজন কিন্তু অনেক বেশি — একশ পঞ্চাশ পাউন্ড। রোগা পটকা চেহারা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না।'

ভাইয়া তাব রসিকতার অভ্যাস কিছুতেই বদলাতে পারবে না। আমার ধারণা, তার মৃত্যুব সময়ও সে কোনো না কোনো রসিকতা করে আমাদের তো হাসাবেই, যে আজবাইল তাব জীবন নিতে আসবে তাকেও হাসাবে। একবার কী হল শুনুন, ভাইযাব প্রচণ্ড জ্বর। ঘরে থার্মোমিটার নেই কাজেই কত জ্বব তা বুঝতে পারছি না। আমি গ্রিন ফার্মেসির ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনলাম। তিনি জ্বর মেপে আঁতকে উঠলেন — 'একশ পাঁচ। এক্ষুনি শাওযাবেব নিচে বসিযে দিতে হবে, ক্রমাগত পানি ঢালতে হবে।'

ভাইয়া আমাকে বলল, 'ও রেনু যাতো এক কেতলি পানি এনে আমার মাথার উপব বসিযে দে। পানি ফুটলে সেই পানিতে চা বানিযে আমাকে খাওযা — মাছের তেলে মাছ ভাজা কাকে বলে দেখিযে দিচ্ছি। নিজেব টেম্পাবেচাবে নিজেব ফুড প্রিপারেশন।'

ভাইযাব বসিকতায আমবা সবাই হাসি। সবচে' বেশি হাসেন আমার বাবা। হাসতে হাসতে বলেন — "ফানি ম্যান। ভেরি ফানি ম্যান।"

শুধু আপা হাসে না। মুখ কঠিন কবে বলে, 'গোপাল ভাঁড়।' আপাব ব্যাপার আমি ঠিক বুঝি না — যেখানে খুশি হওযা উচিত সেখানে সে বেজার হয। রাগ কবাব কোনোই কাবণ নেই এমন সব জাযগায সে রাগ করে।

আপা অসম্ভব রূপবতী। নিজেব বোন না হযে অন্যেব বোন হলে ৮ ৭ হিংসায জ্বলেপুড়ে মবে যেতাম। তাঁব চোখ সুন্দব, গাযের বং সুন্দর, নাক মুখ সবই সুন্দর। না, আমি মোটেই বাড়িয়ে বলছি না — একটা উদাহবণ দিলেই বুঝবেন। আপা যখন ইডেন কলেজে সেকেন্ড ইযাবে পড়ে তখনকাব ঘটনা। সন্ধ্যা হয়েছে। আমরা সবাই বসে চা-মুড়ি খাচ্ছি, বিবাট একটা গাড়ি এসে বাসার সামনে থামল। দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক এলেন। তাঁবা বাবার সঙ্গে কথা বলতে চান। শুনলাম তাঁরা সিনেমার লোক। নতুন ছবি বানাচ্ছেন — ছবির নাম "বোনের সংসাব"। ছবিতে এক জন টিনএজ নায়িকা থাকবে। দর্শকদেব নতুন মুখ উপহাব দেযা হবে। মীবা আপা হচ্ছে সেই নতুন মুখ। এখন বাবা বাজি হলেই হয। তাঁরা দশ হাজাব টাকা সাইনিং মানি নিযে এসেছে।

বাবা বললেন, 'সাইনিং মানি ব্যাপারটা কী?'

'ছবি কবতে রাজি হলে চুক্তিপত্রে সই হবে, তখন টাকাটা দেয়া হবে। তারপর ছবি যত এগোবে তত ভাগে ভাগে টাকা দেয়া হবে। ফিল্ম লাইনে পুরোটা এক সঙ্গে দেযার নিয়ম নেই।'

বাবা খুব আগ্রহ নিযে বললেন, 'সব মিলিযে কত হবে?'

'নতুনরা খুব বেশি পায় না তবে আমরা ভালোই দিব, পঞ্চাশ তো বটেই।'

'পঞ্চাশ কী?'

'পঞ্চাশ হাজার।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা হাজার। হাজার তো হবেই পঞ্চাশ টাকা তো দিতে পারেন না। হা-হা-হা। চা খাবেন স্যার?'

'জ্বি না, চা খাব না। আপনার মেয়েকে ডাকুন তার সঙ্গেও কথা হোক। আমাদের কী কথাবার্তা হচ্ছে তার শোনা দরকার।'

বাবা বললেন, 'ও আছে। এইখানে কী কথাবার্তা হয সব বারান্দা থেকে শোনা যায়। একটা কথা জিজ্ঞেস করি — স্যার আপনারা আমার মেয়ের খোঁজ পেলেন কোথায়?'

'তাঁর এক বান্ধবীর জন্মদিনে সে গিয়েছিল আমিও সেখানে ছিলাম। মনে ধবল, বেশ সুইট চেহারা। অবশ্যি হাইট কম। সেটা আমরা ক্যামেরায় ম্যানেজ করব।'

'অভিনয় তো জানে না।'

'শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। সিনেমা হচ্ছে ডাইরেক্টরস মিডিয়া। ডাইরেক্টর ইচ্ছা কবলে একটা কাঠের চেয়ারকেও নায়িকাব রোল দিযে পার করে নিয়ে আসতে পারে।'

'তাই নাকি?'

'না মানে কথার কথা বলছি আর কি। রূপক অর্থে বলা। ডাকুন আপনার মেয়েকে।'

বাবা দুঃখিত গলায় বললেন, 'ওকে ডাকাডাকি করে লাভ নেই, ও করবে না। বরং আমার ছোট মেযেটাকে দেখতে পারেন — রেনু। চটপটে আছে। ডাকবাক্স না পোস্টবক্স নামে রবি ঠাকুরের একটা নাটক আছে না? ঐটাতে অভিনয করেছিল। ভালো হযেছিল। আমি অবশ্যি দেখি নি — শুনেছি। নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি, সময পাই না। টুকটাক বিজনেস করি। ছোট বিজনেসম্যান হল ফকিরের মতো। শুধু হাঁটাহাঁটি। স্যার ছোট মেয়েটাকে ডাকব?'

'না আপনি বড় জনের সঙ্গেই কথা বলুন। সিনেমার কথা শুনলে রাজি হতেও পাবে। টিনএজারদের এই দিকে খুব ঝোঁক।'

বাবা উঠে এলেন। আপা বাবাকে দেখেই পাথরের মতো মুখ করে বলল, 'না।'

বাবা ইতস্তত করে বললেন, 'ভদ্রলোক মানুষ, কষ্ট কবে এসেছেন। টাকা-পযসাও নিয়ে এসেছেন। সেকেন্ড থট দিবি নাকি?'

'না।'

'সরাসরি না বলার কী দরকাব? তুই গিযে বল আমি ভেবে দেখব। ভদ্রলোক কষ্ট করে এসেছেন।'

আপা আগের চেয়েও কঠিন স্বরে বলল, 'না।'

বাবা নিচু গলায় বললেন, 'সিনেমা লাইনটা খাবাপ না। ভালো ভালো মেযেবা এখন যাচ্ছে। তা ছাড়া নিজে ভালো থাকলে জগৎ ভালো। নিজে মন্দ হলে জগৎ মন্দ। ভালো-মন্দ নিজের কাছে। কি, ওদের চলে যেতে বলব?'

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোকরা চলে গেলেন ঠিকই তারপরেও দুবার এলেন। শেষবার এলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে। সব একশ টাকার নোট। বসার ঘরের বেতের টেবিলটা টাকায প্রায ভরে গেল। আমি আমার আঠার বছরেব জীবনে এত টাকা এক সঙ্গে দেখি নি। ভাইযা বলল, 'একশ টাকার নোটে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওজন কত জানিস? মাত্র এক পোযা।'

আমি বললাম, 'কেমন করে জানলে, তুমি ওজন করেছ?'

'করেছি। একশটা একশ টাকার নোট ওজন করে সেখান থেকে বের করেছি। সহজ ঐকিক নিয়ম।'

ভাইয়ার এইসব কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে মিথ্যা কথা সত্যের মতো করে বলে। সত্য কথাগুলো মিথ্যার মতো বলে। আমরা সবাই তাতে খুব মজা পাই। বাবা হাসিমুখে বলেন, 'ফানি ম্যান, ভেবি ফানি ম্যান।' শুধু আপা রাগ কবে।

ভাইয়ার উপব আপার রাগ আবো বাড়ল যখন ভাইযা তাকে ম্যাডাম ডাকা শুরু করল। সিনেমাতে নায়িকাদের নাকি ম্যাডাম ডাকার নিযম। ভাইযা ম্যাডাম ডাকছে আব আপা রাগছে। রাগলে আপার ফর্সা মুখ লাল টকটকে হযে যায। নাক ঘামতে থাকে। চোখের মণি হয়ে যায় স্থির। তখন আমি আপার দিকে তাকিযে ভাবি — ইস আমি কেন এত সুন্দর হলাম না। যদিও অভিনয কবার জন্যে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হত না। বিনা টাকাতেই আমি অভিনয কবে দিযে আসতাম। ইস আরেকটু যদি সুন্দর হতাম। দরিদ্র পরিবাবে সুন্দরী হযে জন্মানো খুব সুখেব নয়। আমি খুব ভালো করে জানি।

যেই দেখছে সেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। পিওন এক গাদা চিঠি বোজ দিযে যাচ্ছে। যার বেশির ভাগই বেজিস্ট্রি। সেই সব চিঠিব সবই প্রেমপত্র। খুব কাঁচা হাতে লেখা। ভুল বানান। লাইনে লাইনে কবিতা। কিছু কিছু চিঠির কথাবার্তা অসম্ভব নোংবা। সেসব চিঠি হাত দিয়ে ছুলেও হাত সাবান দিযে ধুয়ে ফেলতে হয।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আপা কোনোদিনও একটি চিঠি পড়ে দেখে নি। মানুষেব সাধারণ কৌতূহলও তো থাকে --- কী লিখছে, জানার আগ্রহ। আপাব নেই। সেইসব চিঠি পড়তাম আমবা দুজন। আমি এবং ভাইযা। চিঠিতে নাম্বাব দেওযা হত। কোনোটা পাচ্ছে একশতে দশ, কোনোটা একশতে পাঁচ। এব মধ্যে একটা চিঠি এল ইংবেজিতে। সম্বোধন হচ্ছে —

'My dearest Moonshine'.

ভাইযা পনেব টাকা খরচ করে সেই চিঠি বাঁধিযে এনে আপাব জন্মদিনে আপাকে প্রেজেন্ট কবল। আপা খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা চোখে ভাইযাব দিকে তাকিযে বলল, 'ভাইযা তুমি যদি আব কোনোদিন আমাব সঙ্গে এ বকম বসিকতা কব তাহলে আমি কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

'কোথায যাবি?'

'আমাব যাবার জাযগাব অভাব নেই -- তুমি এটা ভালোই জান। ঐ সিনেমা ওযালাদেব কাছেও যেতে পাবি। ওবা কার্ড দিযে গেছে।'

'সবি, আব করব না।'

আপা খাবাব টেবিল থেকে উঠে নিজেব ঘবে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল। জন্মদিন–টন্মদিন তো আমাদের পবিবাবে হয না। হবাব কথাও না। সেদিন মজা কববার জন্যেই ভাইযা একটা কেক কিনে এনেছিল। কেকেব উপব লেখা —

'My dearest Moonshine'.

কোনোই মজা হল না। শুধু বাবা ভাইযার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ফানি ম্যান। ভেরি ফানি ম্যান।' মনে হল বাবাই খুব মজা পাচ্ছেন। কেকটাও বাবাব খুব ভালো লাগল। পাঁচ পিস কেক খেযে ফেললেন। বার বার বিস্মিত গলায় বললেন — 'মারাত্মক টেস্ট হয়েছে তো!' ভাইয়া বলল, 'মাবাত্মক টেস্ট হবাব কারণ জান তো বাবা? মারাত্মক পচা ডিম ব্যবহার করা হয়েছে। কেকের স্বাদ নির্ভর করে কী ধরনেব পচা ডিম ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর।'

আচ্ছা, আমার কথাবার্তা শুনে আপনার কি মনে হচ্ছে আমি আমাদের এই 'ফানি ম্যান'কে খুব পছন্দ করি? ঠিকই ধরেছেন। হ্যাঁ, আমি খুব পছন্দ করি। যদিও আমি কাউকেই খুব পছন্দ করতে পারি না, আবার কাউকে খুব অপছন্দও করতে পারি না। তবে ... না থাক পরে বলব। এখন ভাইয়ার কথা বলি। ভাইয়াকে সবাই পছন্দ করে। এমন কি আমাদের বাড়িওয়ালাও। পৃথিবীর কোনো বাড়িওয়ালাই ভাড়াটেদের পছন্দ করে না। যে ভাড়াটে নিয়মিত ভাড়া দেয় তাকেও না। কারণ বাড়িওয়ালার নিজের অতি আপন একটি জিনিস ভাড়াটে ব্যবহার করে। তাকে পছন্দ করার কোনোই কারণ নেই। অথচ আমাদেব বাড়িওয়ালা সুলায়মান সাহেব — ভাইয়াকে পছন্দ করেন। দুমাস, তিন মাস বাড়ি ভাড়া বাকি থাকে — সুলায়মান সাহেব কিছুই বলেন না — অবশ্যি এক সময় ডেকে পাঠান। ভাইয়া বিস্ময়ের ভঙ্গি করে যায় এবং অবাক হওয়া গলায় বলে, 'কী জন্যে ডেকেছেন চাচা?'

ভাইয়ার এই বিস্ময় দেখে সুলায়মান সাহেব হকচকিয়ে যান। আমতা আমতা কবে বলেন, 'আছ কেমন?'

'জ্বি ভালো। আপনি কেমন চাচা?'

'আছি কোনোমতে।'

'আপনার ডায়াবেটিস কি কিছু কমের দিকে?'

'ইনসুলিন নিচ্ছি না। ডায়েটের উপর আছি। কবলা খাচ্ছি, মেথি খাচ্ছি, হাঁটাহাঁটি করছি।'

'আপনাকে কিন্তু আগের চেয়ে অনেক ভালো দেখাচ্ছে।'

'না ভালো আর কোথায় —শরীরে জোব পাই না।'

'শরীরের জোরটা আসল না চাচা, মনের জোরটাই আসল। মনে জোর বাখবেন — মনটাকে শক্ত রাখবেন। এই দেখুন না, টাকা-পয়সার কী সমস্যা আমাদের যাচ্ছে। টিকে আছি মনের জোরে। আপনাকে তিন মাস ধরে বাড়ি ভাড়া দেয়া হচ্ছে না — লজ্জায় মবে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে যাতে দেখা না হয় এই জন্যে খুব সাবধানে থাকি। ঐদিন দেখি আপনি বাজার করে ফিরছেন। আমি সিগাবেট কিনছিলাম, ধাঁই করে গলিতে ঢুকে পড়লাম। এই যে আপনি ডেকে পাঠালেন, আমি ভয়ে অস্থির যদি বাড়িভাড়া চান কী বলব?'

সুলায়মান সাহেব বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন — 'আরে না ঐ জন্যে তোমাকে ডাকি নি। এমনি খবর দিয়েছি। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। করছ কী আজকাল?'

'চারটা প্রাইভেট টিউশ্যানি কবছি। পত্রিকায় একটা কাজ জোগাড় কবেছি — বিভিন্ন প্রতিবেদন-টেদন লিখি। ছাপা হলে শ'খানিক দেয়।'

'কী পত্রিকা?'

'ফালতু পত্রিকা। নাম হচ্ছে শতদল — এই পত্রিকার একমাত্র আকর্ষণ হল ধর্ষণেব খবর। যে সপ্তাহে কোনো মেয়ে রেপড হয় না সেই সপ্তাহে আমাদের পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদকের খুব মন খারাপ থাকে।'

'কী বলছ এসব?

'আমি দুএকটা সংখ্যা দিয়ে যাব, পড়লেই বুঝবেন। ধর্ষণের এত সুন্দব বর্ণনা আপনি কোনো পত্রিকায় পাবেন না। আমরা কোনো ডিটেইল বাদ দেই না।'

'বল কী? হচ্ছে কী দেশটার? খুবই চিন্তার কথা।'

'চাচা আজ তাহলে উঠি। আমার আবার একটা ইন্টারভ্যু নিতে হবে। রেপড হয়েছে এমন একটা মেয়ে।'

শুনলে সবার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে — আমরা পাঁচ বছর এ বাড়িতে আছি — বাড়ির ভাড়া বাড়ে নি। কেন বাড়ে নি জানেন? ভাইযার জন্য। একবার চারশ টাকা ভাড়া বাড়ল। সুলায়মান সাহেব নিজে এসে বাবাকে এই খবর দিয়ে গেলেন। হাত-টাত কচলে বললেন, 'কী করব ভাই বলুন — প্রপার্টি ট্যাক্স ডাবল করে দিযেছে। প্রপার্টি বলতে তো এই বাড়ি। ভাড়ার উপব বেঁচে আছি। মেযেগুলোকে বিয়ে দিযেছি — একা মানুষ বলে কোনো রকমে চলে যায়। এমন সমস্যা কী আব বলব আপনাকে — জামাইরা প্রতি মাসে টাকার জন্য আসে। ফকিরেরও অধম। ভাড়া না বাড়িযে তো পারছি না। চারশ টাকা করে বেশি দিতে হবে সামনের মাস থেকে। তিন ঘর ভাড়াটেব সবাব ভাড়াই চারশ কবে বাড়িয়েছি।'

বাবা বললেন — 'আচ্ছা ঠিক আছে।'

সব কিছুতেই রাজি হয়ে যাওযা বাবার স্বভাব। তিনি এমন ভাব করলেন যে চারশ টাকা কিছুই না। মাথায আকাশ ভেঙে পড়ল আমাদেব। চারশ টাকা বাড়তি দেযা একেবারেই অসম্ভব। ভাইযা বলল, 'কোনো চিন্তা নেই, আমি ঠিক করে দেব।'

সন্ধ্যাবেলা সে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'চাচা, আপনি নাকি আমাদেব বেব কবে দিচ্ছেন?'

সুলাযমান সাহেব হতভম্ব হযে বললেন — 'সেকী। তোমাদেব বেব কবব কেন? ছিঃ ছিঃ — কার কাছে শুনেছ এসব কথা?'

'বাড়িভাড়া চারশ বাড়িযেছেন — আমাদের বেব হযে না যাওযা ছাড়া উপায কী? কোত্থেকে দেব বাড়তি চাবশ টাকা? যা ভাড়া তাই দিতে পারি না। দুদিন পবে পবে বাকি পড়ে।'

সুলাযমান সাহেব বিব্রত গলায বললেন — 'আচ্ছা আচ্ছা থাক। বাদ দাও। যা আছে তাই। অন্য ভাড়াটেদেব কিছু জানিও না।'

ভাইয়া দবাজ গলায বলল, 'আমাব একটা চাকবি-বাকবি হোক। তারপর দেখবেন, আপনাকে বলতে হবে না। পাঁচশ টাকা বাড়তি আপনাব হাতে গুনে দিযে যাব।'

সুলাযমান সাহেব বললেন — 'আচ্ছা আচ্ছা — ঠিক আছে। একবার তো বললাম ঠিক আছে।'

'আপনার ব্যবহারে মনে খুব কষ্ট পেযেছি চাচা।'

'আহা বাদ দাও না। চা খাও। কই নসু — বাবা, আমাদের দুজনকে চা দাও তো।'

সুলাযমান সাহেব ভাইযাকে কেন এত পছন্দ কবেন আমি জানি না। এত বাড়াবাড়ি ধবনের পছন্দ দেখা যায না বলে ব্যাপারটাকে অনেকদিন আমবা সন্দেহের চোখে দেখতাম। আমাদেব ধারণা ছিল — সুলাযমান সাহেবের কোনো আত্মীযার সঙ্গে তিনি ভাইযার বিযে দিতে চান। সেই আত্মীযার এমনিতে বিযে হবার সম্ভাবনা নেই। হযতো এসিডে পুড়ে মুখ ঝলসে গেছে কিংবা পঙ্গু। আমাদের সব ধাবণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে সুলাযমান সাহেবেব ভালো লাগার পেছনে তেমন কোনো স্বার্থ নেই। এটাও খুব অস্বস্তিকর। স্বার্থ ছাড়া ভালবাসে এমন মানুষ আমরা দেখি না। হঠাৎ কাউকে দেখলে খানিকটা অস্বস্তি লেগেই থাকে।

একটা লোক যে তাকে এত পছন্দ কবে তা নিয়ে ভাইযার কোনো মাথাব্যথা নেই। যেন সে ধরেই নিয়েছে সবাই তাকে পছন্দ করবে।

মজার ব্যাপার — করছেও তাই। আমাদের পেছনেই থাকেন ব্যারিস্টার মুশফিকুর রহমান। তিনি তাঁর দোতলা বাড়ি এত বড় করে বানিয়েছেন যে, আমরা শীতের সময

ভোরের রোদ পাই না। অসম্ভব ব্যস্ত এই মুশফিকুর রহমান সাহেবের সঙ্গেও ভাইয়ার খাতির আছে। এই খাতির কীভাবে হল আমরা জানি না। ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করলে সে হাসে। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাত নটার দিকে মুশফিকুর রহমান সাহেব লোক পাঠিয়ে দেন — ভাইয়াকে তাঁর প্রয়োজন। একহাত দাবা খেলবেন। ভাইয়া দাবা খেলতে যায় — রাত এগারটা-বারটার দিকে ফিরে। তার মুখে হাসি।

'কি ভাইয়া হারলে না জিতলে?'

'প্রথম দিকে উইন করছিলাম। একটা পণ এবং দুটা পিস আপ ছিল। শেষটায় গুবলেট করে দিয়েছি।'

'প্রতিবারই তো শুনি একই ব্যাপার।

'ব্যারিস্টার সাহেব শুরুতে খুব খারাপ খেললেও শেষের দিকে সামলে খেলেন। একেকটা দুর্দান্ত চাল দিয়ে — ছেড়াবেড়া করে দেন।'

ব্যারিস্টার সাহেবের সবচে' ছোট মেয়ে দুলু আপাও যে আমাদের মতো গরিব মানুষদের বাসায় আসা যাওয়া করে আমাব ধারণা তার একমাত্র কারণ ভাইযা।

দুলু আপা তাদের দোতলার বাবান্দায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে গল্প কবেন। তখনি করেন যখন ভাইয়া উঠানে থাকে। আমি মনে মনে হাসি। প্রকাশ্যেই হাসতাম — তা হাসি না কারণ দুলু আপাকে আমি খুব পছন্দ করি।

চমৎকার মেযে। হিস্ট্রিতে অনার্স ফাইনাল দেবেন। খুব ভালো ছাত্রী। দিনরাত হাতে বই। চাপা ধরনের মেযে। একটু পাগলাটে ভাব আছে। হযতো ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে, আমি কলেজে না গিযে বাসায় বসে আছি। দুলু আপাদেব বাসাব কাজেব লোক আমার জন্যে চিঠি নিয়ে এল। চিঠিতে লেখা — 'রেনু, খুব বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজবে? যদি বাজি থাক — চলে আস। আমরা গাড়ি করে গ্রামের দিকে চলে যাব। তারপব রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে বৃষ্টিতে ভিজব।'

এক দিন কথামতো গেলাম। গাড়ি জয়দেবপুর ছাড়িযে চলে গেল। মোটামুটি নির্জন একটা জায়গা বের করে দুলু আপা বললেন, 'ড্রাইভার সাহেব থামেন তো।' ড্রাইভাব গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে বসে রইল — আমরা বৃষ্টিতে ভিজে এলাম। দুলু আপা কযেকবাব বলল, 'ইন্টারেস্টিং লাগছে না রেনু?'

আমার মোটেই ইন্টারেস্টিং লাগছিল না — তবু বললাম, 'দারুণ লাগছে।'

দুলু আপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'পুরোপুরি নগ্ন হযে বৃষ্টিতে ভিজতে পাবলে আরো চমৎকার হত — তাতো আর সম্ভব না।'

যে মেয়ে এ জাতীয় কথা বলে তার মাথায় ছিট আছে তাতো বলাই বাহুল্য।

দুলু আপার মতো ভাবুক, অসম্ভব রোমান্টিক, আবেগতাড়িত একটি মেয়ে ভাইযাব মতো মানুষের জন্য দুর্বলতা পোষণ কবা স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে এতটা কি উচিত? তাও যদি ভাইয়ার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হত। চোখেব দেখাতে প্রেম গল্প-উপন্যাসে হয। বাস্তবে প্রেমে পড়ার জন্য এক জনকে অন্যজনেব কাছাকাছি যেতে হয। ভাইযা এবং দুলু আপা, দুজন দু প্রান্তের মানুষ।

ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হলে ভাইযা তার স্বভাবমতো রসিকতা অবশ্য করে। কিন্তু দুল আপাকে দেখে বোঝার কোনো উপায়ই নেই — তিনি এই রসিকতাগুলো পছন্দ করছেন কি করছেন না। হয়তো দুলু আপা ভোরবেলায আমাদের বাসায এসেছেন। ভাইয়া মেঝেতে বসে দাড়ি কামাচ্ছে। যেহেতু আয়না নেই দাড়ি কাটতে হচ্ছে সম্পূর্ণ অনুমানেব উপর। দুলু আপাকে দেখে ভাইযা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল —

'তারপর দুলু, খবর ভালো?'

'জ্বি ভালো।'

'হিস্ট্রি পড়ছ কেমন? ভাজা ভাজা করে ফেলছ নাকি?'

'ভালোই পড়ছি।'

'আচ্ছা বল তো দেখি সম্রাট শাহজাহানেব খালা শাশুড়ির নাম কী? দশ টাকা বাজি। তুমি বলতে পারবে না।'

দুলু আপা তার উত্তরে কিছু বলবে না — পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকবে। তাকে দেখে তখন মনে হওয়া অস্বাভাবিক না যে দাড়ি কামানোব দৃশ্যই হচ্ছে পৃথিবীর সবচে' সুন্দর দৃশ্য।

ভাইযা নিরাসক্ত ধরনের মানুষ। কোনো কিছুতেই তাব আসক্তি নেই। যখন পয়সা হচ্ছে — ধুমসে সিগারেট টানছে। টাকা-পয়সা শেষ — নির্বিকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখে মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় — সে চোখবন্ধ এক জন মানুষ। তাকিয়ে আছে কিন্তু তেমন কিছু দেখছে না। যদি দেখত তাহলে অবশ্যই বুঝতে পাবত দুলু আপা গভীর আগ্রহে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। যে আগ্রহে তিল পরিমাণ খাদ নেই।

ভাইযা যখন ব্যারিস্টার সাহেবেব সঙ্গে দাবা খেলেন, দুলু আপা তখন বসার ঘবে পর্দার ওপাশে দাঁড়িযে থাকেন। সেই দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। মুখ ফ্যাকাসে হযে থাকে। থর থর করে কাঁপতে থাকেন। আমি এক দিন দৃশ্যটা দেখে ফেললাম। অবাক হয়ে বললাম, 'কী হযেছে আপা?'

দুলু আপা বিব্রত গলায বললেন, 'কিছু হয নি তো।'

'এখানে দাঁড়িযে আছ কেন?'

দুলু আপা ফিসফিস করে বলল, 'এমনি। এমনি দাঁড়িযে আছি।' বলতে বলতে তার চোখ ভিজে উঠল। গলা ধরে গেল।

ভাইয়াব যে বাব একশ পাঁচ জ্বর হল তখন কী পবিমাণ অস্থিবতা যে দুলু আপাব দেখেছিলাম তা কখনো গুছিযে বলতে পাবব না। মানুষ খুব অস্থিব হলে নানা ভাবে সেই অস্থিবতা প্রকাশ কবে। কাঁদে, হৈচৈ কবে। দুলু আপা অস্থিবতা প্রকাশ করতে পারেন না। নিজের মধ্যে চেপে বাখেন। তাব কষ্টও সীমাহীন। জ্বর নামানোর জন্যে যখন আমরা ধরাধরি কবে ভাইযাকে বাথরুমে নিযে যাচ্ছি — শাওযাব ছেড়ে দিযে জ্বর নামাব। তখন দুলু আপা আমাদেব ঘবে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হল, ভাইযাকে ধরে নিয়ে যাবার কাজটিব বিনিমযে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন এক কথায় দিযে দিতে পারেন। ভাইয়া দুল আপার দিকে তাকিযে বললেন, 'কী খবব দুলু? ভালো? অসমযে কী মনে কবে?'

দুলু আপা হকচকিযে গিযে বললেন, 'আজকের খববের কাগজটা নিতে এসেছি।'

ভাইযা বলল, 'ভুল জাযগায এসেছ — আমরা খবরের কাগজ রাখি না। একটা কাগজেব দাম তিন টাকা। ত্রিশ গুণন তিন, মাসে নব্বুই টাকা — ফব নাথিং চলে যায়। নব্বুই টাকায ছসের চাল হয।'

দুলু আপাব সঙ্গে কখনো ভাইযা এই ভঙ্গিতে কথা বলে না। সেবার বলল তার কারণ জ্বর তার মাথায উঠে গেছে। সে কী বলছে নিজেও জানে না।

আমরা ভাইযাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে কল ছেড়ে দিলাম। দুলু আপা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন। পুরোপুবি গেলেন না, তাদেব দোতলার বাবান্দার এক কোনায দাঁড়িযে বইলেন, যেখান থেকে আমাদেব ঘবেব অনেকটা দেখা যায।

ভাইয়াব জ্বব নামতে নামতে দুটা বেজে গেল। তখনো দুলু আপা দাঁড়িযে। আমি উঠোনে গিযে বললাম, 'আপা ভাইযাব জ্বব নেমে গেছে।'

দুলু আপা যেন আমার কথা শুনতে পান নি এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'রেনু, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোছনা দেখছিলাম। কী সুন্দর জোছনা হয়েছে দেখেছিস?' দুলু আপার ভাবটা এমন যেন সারাক্ষণ তিনি জোছনা দেখার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাইয়ার জ্বর কমল কি না কমল সে ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই।

কী কথা থেকে কী কথায় চলে এসেছি — শুরুতে কী বলছিলাম যেন? ও আচ্ছা — আয়না। হ্যাঁ আমাদের বাসায় কোনো আয়না নেই। বেশ কিছুদিন ধরেই নেই। এবং এই নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথাও নেই। ভাইযা বরং একটু খুশি। আমাকে বলল, 'আয়না না থাকার একটা বড় সুবিধা কি জানিস? রোজ নিজেকে দেখতে হয় না। মানুষ নিজেকে যেমন ভালবাসে নিজেকে তেমন ঘৃণাও করে। ঘৃণার মানুষটাকে বোজ দেখতে হচ্ছে না, এটা আনন্দের ব্যাপার না?'

আয়না না থাকার কষ্ট মীরা আপার সবচে' বেশি হওয়ার কথা। সুন্দরীরা বার বাব নিজেকে দেখতে চায়। রূপকথার রাজকন্যাদের মতো আয়নার দিকে তাকিযে মনে মনে বলে — 'বল তো সুন্দরী কে আমার চেযে?' কিন্তু আপাকেও নির্বিকার মনে হচ্ছে। একদিন সে শুধু নিচু গলায় বলল, 'আমার নিজের চেহারাটা কেমন আমি ভুলে গেছি। সত্যি ভুলে গেছি। মজার ব্যাপার কি জানিস, ভুলে গিযে ভালোই লাগছে।'

ঠিক দুমাস এগার দিন পর, আমাদের বাসায নতুন আযনা এল। বাবা কাঠের ফ্রেমেব বেশ বড়সড় একটা আযনা নিযে অনেকদিন পর উদয হলেন এবং হাসিমুখে বললেন — 'খবর সব ভালো?'

সেই আয়না বারান্দায় টানানো হল। আমি আযনার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখি দুটা মুখ দেখা যাচ্ছে।

বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এরকম হচ্ছে কেন? আমি তো দেখে শুনেই কিনলাম। বদলানোর তো কোনো উপায নেই, বদলাতে হলে চিটাগাং যেতে হয। চিটাগাং থেকে কেনা।'

ভাইয়া বলল, 'বদলানোর দরকার কী? একটাব জাযগায় দুটা মুখ দেখা যাচ্ছে। ভালোই তো। একের ভেতর দুই। ইন্টারেস্টিং ব্যাপাব হল — একটা মুখকে হাসিখুশি দেখায় অন্যটা গম্ভীর। জ্যাকেল এন্ড হাইড।'

বাবা হো-হো করে হাসতে হাসতে বললেন, 'ফানি ম্যান। ভেবি ফানি ম্যান।'

২

বাবা এবার খুব হাসিখুশি হয়ে ফিরেছেন। সব বার এরকম হয না। যতবার বাইরে থেকে আসেন তাঁকে ক্লান্ত লাগে, মনে হয় খানিকটা বয়স যেন বেড়েছে। মাথায কয়েকটা চুল বেশি পাকা। চোখের নিচটা যেন আগের চেয়েও সামান্য বেশি ঝুলেছে। এবার ব্যতিক্রম হল। বাবার মাথার সব চুল কুচকুচে কালো। পান খাওয়ার কারণে দাঁতে যে লাল ছোপ ছিল তাও নেই। ঝকঝকে সাদা দাঁত। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন হিসেবে চালিয়ে দেবার মতো দাঁত।

ভাইয়া বলল, 'চুলে কলপ দিয়েছ নাকি?'

বাবা খানিকটা লজ্জা পেলেন। লজ্জা ঢাকার তেমন চেষ্টা করলেন না। লাজুক গলাতে বললেন, 'চুল কাটাতে গিয়েছি। কাটা শেষ হলে নাপিত বলল, ওয়াশ করে দেব নাকি স্যার? আমি বললাম, দাও। খানিকক্ষণ পরে দেখি এই অবস্থা। ওয়াশ মানে যে কলপ তাতো জানতাম না।'

ভাইয়া বলল, 'দাঁতের এই অবস্থা করলে কী কবে? দাঁতও ওয়াশ কবেছ?'

'আরে না। ডেনটিস্টের কাছে গিয়েছিলাম দাঁত তুলতে। সে ক্লিন কবে দিল।'

ভাইযা বলল, 'তুমি তোমার বযস দশ বছর কমিযে নিয়ে এসেছ? একটা বঙচঙা হাফশার্ট পরলে তোমাব বয়স পনেব বছর কম মনে হবে। দেব একটা শার্ট?'

কী কাণ্ড, গোসল করে বাবা সত্যি সত্যি বঙিন শার্ট পরলেন। তার নিজেব না, ভাইযাব। লাল নীল ফুল আঁকা বাহারি শার্ট। মাপে খানিকটা বড় হল। কাবণ ভাইযা হচ্ছে প্রায ছয় ফুটের কাছাকাছি। তাতে অসুবিধা হল না। বাবাকে শার্টে খুব মানিযে গেল। তাঁকে যুবক ছেলের মতোই দেখাতে লাগল। তিনি বাবান্দায মোড়ায বসে পা নাচাতে নাচাতে সিগারেট টানতে লাগলেন। যেন তিনি পৃথিবীব সবচে' সুখী মানুষ। গাঢ় গলায বললেন, 'কই চা দাও তো, আরাম করে এককাপ চা খাই।'

মা চা নিযে বেব হলেন। আমরা দ্বিতীযবাব চমকালাম। মার পরনে নতুন শাড়ি। এই শাড়ি বাবা নিযে এসেছেন। বাবা সম্ভবত কালার ব্লাইন্ড। কালাব ব্লাইন্ড না হলে এমন ভযাবহ বঙেব শাড়ি কেনা সম্ভব না। মালটি কালার শাড়িতে মাকেও খুকি খুকি লাগছে। খুকি খুকি লাগার প্রধান কাবণ মা কানে দুল পবেছেন। চুল টান টান কবে বেণি কবেছেন। এমন সাজগোজ করে মা লজ্জায মরে যাচ্ছেন। কোনোমতে বাবাব সামনে চাযেব কাপ রেখে রান্নাঘরে পালিযে বাঁচলেন। মাব সঙ্গে আমরা ঠাট্টা তামাশা বিশেষ কবি না। কারণ তিনি রসিকতা বুঝতে পাবেন না। কেঁদে ফেলেন। ভাইযা যদি ঠাট্টা কবে বলত, 'ব্যাপাব কী মা? আজ কি তোমাব বিয়ে?' তাহলে মা নিশ্চযই চাযেব কাপ ছুড়ে ফেলে চিৎকাব কবে কেঁদে একটা কাণ্ড ঘটাতেন।

বাবা কিছুদিন বাইবে থেকে ফিবলে মা খানিকটা সাজসজ্জা কবেন। কিছুটা নিজেব ইচ্ছায তবে বেশিরভাগই বাবার অনুবোধে। শাড়ি না পাল্টানো পর্যন্ত বাবা ঘ্যান ঘ্যান কবতে থাকবেন --

'এতদিন পব আসলাম, তুমি ফকিবনী সেজে আছ ব্যাপারটা কী? শাড়িটা পাল্টাও তো। চুল-টুল বাঁধো। একদিন রান্না না করলে কিছু যায আসে না। না হয হোটেল থেকে কিছু এনে খেযে নিলেই হবে। খাওযাটা জরুবি না।'

মাকে বাধ্য হয়ে সাজ করতে হয।

তেমন কিছু না — চুল বাঁধেন। চোখে কাজল দেন এবং তাঁর একমাত্র গযনা কানের দুল জোড়া পবে ছেলেমেযেদেব সামনে লজ্জা সংকোচে এতটুকু হযে যান। আমবা এমন ভাব করি যে ব্যাপাবটা কেউ লক্ষই করছি না। কোনো একটা ঠাট্টা করাব জন্য ভাইযার জিব চুলকাতে থাকে। আমি চোখে চোখে ইশারা করি — যেন ঠাট্টা না কবে।

বাবা অনেক দিন পর আসায আমাদের দিনটা সুন্দরভাবে শুরু হল। আপা বলল, সে ইউনিভার্সিটিতে যাবে না। আপা যেখানে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না, আমার সেখানে কলেজে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ভাইযা যে ভাবে বাবার সামনে পা ছড়িয়ে বসেছে তাতে মনে হয় সেও কোথাও যাবে না।

বাবা চায়ের কাপে চমুক দিতে দিতে বললেন, 'তোর মাকে আজ তো দারুণ লাগছে। লক্ষ করেছিস? মনে হয় ষোল সতের বছরের খুকি! ঠিক না?'

ভাইয়া বলল, 'খুব ঠিক।'

বাবা বললেন, 'একটা ছবি তুলে রাখলে ভালো হত। আজ আবার আমাদের একটা বিশেষ দিন। বিশেষ দিন কেন সেটা আবার জানতে চাস না যেন। সব কিছু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ডিসকাস করা যায় না। আমি মানুষটা ওল্ড ফ্যাশান্ড।

ভাইয়া বলল, 'আমাকে হিন্টস দাও। বাকিটা আমরা আন্দাজে বুঝে নেব। আজ যে তোমাদের বিয়ের দিন না তা জানি — তোমাদের বিয়ে হয়েছে আগস্ট মাসে, এটা হল জুন। এই দিনে তোমরা কী করেছিলে?'

বাবা চোখ বন্ধ করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। ভাবটা এমন যেন প্রশ্নটা শুনতে পান নি।

বাবা এবং মার অনেকগুলো বিশেষ দিন আছে। এই সব দিনগুলো তাঁরা মনে রাখেন। একটাও ভুলেন না। এবং তাঁদের মতো করে দিনগুলো পালনও করা হয়। কয়েকটা বিশেষ দিন আমরা জানি যেমন মে মাসের দু তারিখ — তাঁদের প্রথম দেখা। আগস্ট মাসের আট তারিখ বাবার সঙ্গে পালিয়ে ঢাকায় চলে আসা। নানান ধরনের নাটকীয় কাণ্ড এই দুজন করেছেন। বাবার পক্ষে সবই সম্ভব কিন্তু মার মতো শান্ত, সরল এবং খানিকটা বোকা-বোকা ধরনের মহিলার পক্ষে কী করে সম্ভব তা কখনো ভেবে পাই না। মা যে কাণ্ড করেছেন, আমি বা আপা কখনো এসব করতে পারব বলে মনে হয় না।

একটা ছেলে যার সঙ্গে কোনো কথা হয নি শুধু দূর থেকে চোখে চোখে দেখা — সে এক সন্ধ্যায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুমি আমাব সঙ্গে চল। যদি না যাও রেললাইনে শুয়ে পড়ব।' ওমনি মা, যার বয়স মাত্র পনের, তিনি বাড়ির কাউকে একটা কথা না বলে বের হযে গেলেন। এটা কী করে সম্ভব হল, কে বলবে? আমি মাকে একবার খুব শক্ত কবে ধরলাম — 'একটা ছেলেকে তুমি চেন না জান না, তোমাদের মধ্যে কোনো কথাও হয নি, সে এসে বলল, আর তুমি ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলে। কেন এটা করলে বল তো?'

মা বিরক্ত হযে বললেন, 'বাদ দে তো — । দু দিন পব পর এক কথা। বাদ দে।'

'না বাদ দেব না। বলতে হবে।'

মা ভেজা ভেজা গলায় বলল, 'ঐ সন্ধ্যায তোব বাবার সঙ্গে না বের হলে তো সে রেললাইনে শুযে পড়ত। সেটা ভালো হত?'

'সে রেললাইনে শুয়ে পড়ত তা কী করে বুঝলে?'

'বোঝা যায়। আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বলল।'

'ছেলেরা বানিয়ে বানিযে এ জাতীয় কথা অনেক বলে।'

'তোদের সময বলে। আমাদের সময বলত না।'

'না বলত না — তোমাদের সময তো ছেলেরা মহাপুরুষ ছিল? সদা সত্য কথা কহিত।'

'চুপ কর তো।'

'তুমি খুব বোকা ছিলে মা। খুবই বোকা। বাবা না হয়ে অন্য কোনো ছেলে হলে তোমার কী যে হত কে জানে।'

'যথেষ্ট হয়েছে, চুপ কর।'

বাবাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, খুব সিরিয়াস গলায় বলেছিলাম, 'আচ্ছা বাবা, মা যদি ঐ দিন তোমার সঙ্গে না যেত তুমি কি সত্যি সত্যি রেললাইনে শুয়ে পড়তে?'

বাবা গলা নিচু করে বলেছিলেন, 'পাগল হয়েছিস? ঐদিন কথার কথা হিসেবে বলেছিলাম। তোর মা যে বের হয়ে চলে আসবে কে জানত। যখন সত্যি সত্যি বের হযে

এল — মাথায় সপ্ত আকাশ ভেঙে পড়ল। এমন ভরা বয়সের মেয়েকে নিয়ে যাই কোথায়? পকেটে নাই পয়সা। স্টেশনে গিয়ে বসে আছি — তোর মা ক্রমাগত কাঁদছে। একবার ভয়ে ভয়ে বললাম — বাড়িতে ফিরে যাবে? তোর মা কাঁদতে কাঁদতে বলল — না। আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ্ পাক, তুমি আমাকে একী বিপদে ফেললে। ইউনুস নবী মাছেব পেটে বসে যে দোযা পড়েছিলেন — ক্রমাগত সেই দোয়া পড়ছি — লাইলা-হা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জুয়ালেমিন।'

'দোযায় কাজ হল?'

'খানিকটা হল। ট্রেনে ওঠাব পর তোব মাব কান্না থেমে গেল।'

'হাসি শুরু করলেন?'

'না। গল্প শুরু করল। দুনিয়ার গল্প। এত গল্প যে তার পেটে ছিল কে জানত? আমার কান ঝালাপালা করে দিল। মাঝে মাঝে ঘুমিযে পড়ি তখন সে আমাকে ধাক্কা দিযে জাগায়। বিরাট যন্ত্রণা। তার উপর আখাউড়া স্টেশনে টিকিট চেকার এসে টিকিট চাইল। সাড়ে সর্বনাশ। টিকিট কাটি নি।'

'কাট নি কেন?'

'পযসা কোথায টিকিট কাটব?'

'তখন কী কবলে?'

'এই সব শুনে লাভ নেই। বাদ দে।'

'বাদ দেব কেন বল না শুনি।'

'তোব মা টাকা দিল। ফাইন দিযে টিকিট কাটলাম। আজকাল যেমন বিনা ভাড়ায চলে যাওযা যায কেউ কিছু বলে না। আমাদেব সময খুব কড়াকড়ি ছিল।'

'মা কীভাবে টাকা দিল? তাব কাছে টাকা ছিল?'

'হুঁ ছিল। মেযেবা খুব হুঁশিযার। কোনো মেযে ঝোঁকের মাথায কিছু করে না, তোর মা তাব বাবাব ব্যাগ থেকে নগদ তিনশ টাকা নিযে এসেছিল। তখনকাব তিনশ মানে মেলা টাকা। আমরা দুই মাস এই টাকার উপর বেঁচে ছিলাম।'

'বাবা, তোমাদেব জীবনেব শুরুটা খুব সুন্দব ছিল। ছিল না?'

প্রশ্নটা কবেই মনে হল ভুল কবেছি। এই প্রশ্ন কবা উচিত হয নি। বাবাব হাসিহাসি মুখ করুণ হয়ে গেছে। তিনি তাকিয়ে আছেন অন্য দিকে। কারণ তাঁদেব জীবনের শুরুটা খুব সুন্দব ছিল না। তাঁবা কঠিন দুঃসময পার করেছেন। আমার নানাজান বাবার বিরুদ্ধে কেস কবে দিযেছিলেন। ফুসলিযে নাবালিকা অপহবণেব মামলা। পুলিশ চার মাস পব বাবাকে ধরে হাজতে পাঠিযে দেয। মাকে পাঠানো হয নানাজানের কাছে। মা তখন অন্তঃসত্ত্বা। সব জানাব পব নানাজান কেস তুলে নিলেন তবে বাবাকে গ্রহণ করলেন না। মা পুরোপুরি বন্দি হয়ে গেলেন। তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম হল — আমাদেব সবচে' বড় বোন — নাম 'অরু'। বাবা তাঁব প্রথম সন্তানেব মুখ কোনোদিন দেখতে পেলেন না। জন্মেব পর পবই আমাদের বড় আপাব মৃত্যু হয। তাঁব মৃত্যুতে কোনো বহস্য কি ছিল? হয়তো ছিল। আমরা জানি না জানতেও চাই না।

বৎসরের একটা দিনে মা দরজা বন্ধ কবে সারাদিন কাঁদেন। বাবা শুকনো মুখে দরজার বাইরে মোড়ায বসে থাকেন। আমরা জানি এই দিনটি হচ্ছে — বড় আপার মৃত্যু দিন। যে বড় আপার বযস মাত্র এক দিন — কিন্তু এক দিন বযস হলেও সে আমাদের সবার বড়। সে বেঁচে থাকলে আজ আমবা চার ভাইবোন বাবাকে ঘিরে বসে থাকতাম। সে থাকত বাবার সবচে' কাছাকাছি। বড় মেয়েরা তো সব সময়ই বাবার কাছের জন হয়। তা ছাড়া সে আমাদেব বাবা-মাব ভালবাসাবাসিব প্রথম ফুল।

বাবা চা শেষ করে খুশি খুশি স্বরে বললেন, 'এক কাপ চায়ে তো তেমন জুত হল না। সেকেন্ড কাপ অব টি হবে নাকি? তোরা কেউ গিয়ে আরেক কাপ আন। তোর মা রান্নাঘরে বসে আছে কেন? আজ একটা বিশেষ দিন।'

আপা বলল, 'বিশেষ দিনটা কী বলে ফেল না।'

বাবা বললেন, 'অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো না। বিশেষ করে বাবা-মার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কোনো রকম কৌতূহল থাকা উচিত না। যা হোক এইবার শুধু বলছি — আর কিছু জানতে চাইবি না। চাইলেও লাভ হবে না। বলব না। আজকের দিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ .... বাবা কথা শেষ করতে পারলেন না। মা রাগী মুখে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে বললেন — 'চুপ করবে?'

'আহা শখ করে শুনতে চাচ্ছে।'

'তুমি যদি মুখ খোল আমি কিন্তু গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেব।'

'থাক তাহলে। বাদ দিলাম।'

আপা বলল, 'তোমরা দুজন কোনোখান থেকে ঘুরে আস না কেন? বাইরে কোনো রেস্টুরেন্টে খাও। এখানের রান্নাবান্না আমি করব।'

বাবা বললেন, 'আইডিয়া খারাপ না। মিনু যাবে?'

মা বললেন, 'মরে গেলেও না।'

মার কথা এবং কাজ এক হল না। কিছুক্ষণের ভেতর মাকে দেখা গেল লজ্জা লজ্জা মুখে বের হচ্ছেন। বাবার গায়ে ভাইযার রঙিন শার্ট। শার্টটাকে এখন আবো বড় লাগছে। বাবাকে খুবই হাস্যকর দেখাচ্ছে। লম্বা শার্ট পরলে বেঁটে মানুষকে যে আরো বেঁটে লাগে তা আমার জানা ছিল না।

বাবা বেশ কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছেন। এও এক রহস্য। তাঁব ব্যবসা এমনই যে কখনো হাতে কিছু থাকে না। বাড়িভাড়া দেয়া হয তো দোকানে বাকি থাকে। যেবাব দোকান ক্লিয়ার করা হয় সেবার বাইরের কারোর কাছে ধাব হয়।

এবার সব ধার মিটিয়ে দেয়া হল। তিন মাসের বাড়িভাড়া নিয়ে আমি দোতলায উঠে গেলাম। সুলায়মান চাচা বসার ঘরে টিভির সামনে বসে ছিলেন। আমাকে দেখে শুকনো গলায় বললেন, 'কী খবর?'

আমি বললাম, 'বাড়িভাড়া দিতে এসেছি চাচা।'

'ক মাসের?'

'তিন মাসের।'

'টেবিলের উপর রেখে দাও।'

কেমন শুকনো গলা। যেন আমাকে চেনেন না। কিংবা চেনেন কিন্তু পছন্দ করেন না। এরকম হবার কথা নয়। সুলায়মান চাচা ভাইয়ার মতো আমাকেও পছন্দ করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু আমাকেও পছন্দ করে। আমি যাদের ভয়াবহ রকমের অপছন্দ করি তারাও আমাকে পছন্দ করে। সুলায়মান চাচা আজ এমন করছেন কেন বুঝতে পারলাম না। এমন না যে টিভিতে খুব মজার কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে। বেগুন চাষের সমস্যা নিয়ে টেকোমাথা এক লোক বকবক করছে। লোকটার হাতে বিরাট একটা বেগুন। সুলাযমান চাচা এক দৃষ্টিতে বেগুনটার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন পৃথিবীর যাবতীয় রূপ-রস-গন্ধ ঐ বেগুনটা ধারণ করে আছে। বাড়িভাড়ার টাকাটাও গুনে দেখছেন না। যে কাজটা তিনি সব সময় করেন। গোনা শেষ করে এমনভাবে তাকান যেন শখানেক টাকা কম হয়েছে। এই সময় আমাব বুক টিপ টিপ করতে থাকে।

'রেনু!'

'জ্বি।'

'রসিদ আমি পরে পাঠিয়ে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'জ্বি আচ্ছা' বলার পরেও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তাকিয়ে আছি টিভিব দিকে যেন আমিও ঐ বেগুনটাকে দেখে খুব মজা পাচ্ছি।

'রেনু।'

'জ্বি।'

'বসবি নাকি?'

'আপনি বললে বসব।'

সুলায়মান চাচা কিছু বললেন না। আমি নিজের থেকেই বসলাম। সুলাযমান চাচার ঠিক পাশে। যেন ইচ্ছা করলেই তিনি আমার পিঠে হাত রাখতে পারেন। মাঝে মাঝে কথা বলার সময় তিনি পিঠে হাত রাখেন। যেন আমি তাঁর সবচে' আদরের ছোট একটা মেয়ে। সুলাযমান চাচার আদর করে কথা বলার এই ভঙ্গিটা আমার খুব ভালো লাগে।

'রেনু!'

'জ্বি।'

'মনটা খুব খারাপ বে রেনু।'

'কেন?'

'জামাই তিনটা বড় বিরক্ত কবছে।'

'সে তো সব সময়ই করে।'

'এবার বেশি করছে। এদেব নিজেদেব মধ্যে কোনো মিল নেই। এক জন আরেক জনকে দেখতে পারে না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মিলেব অন্ত নেই। তিন জন মিলে আমাকে ভাজা ভাজা করে ফেলছে।'

'তাঁরা চান কী?'

'তারা চায় বাড়িটা যেন আমি ওদেব লিখে দি। ওবা বাড়ি ভেঙে মাল্টিস্টোবিড এপার্টমেন্ট হাউস করবে।'

'আপিন কী বললেন?'

'এখনো কিছু বলি নি — রঞ্জুর কাছে পবামর্শ চেযেছি। সেও কিছু বলছে না।'

'ভাইয়াব কাছে পরামর্শ চেযে লাভ নেই চাচা — ও এমন পরামর্শ দেবে যে রাগে আপনার গা জ্বলে যাবে।'

'আরে না — কী যে তুই বলিস। ওর পরামর্শ প্রথমে খুব হাস্যকব মনে হলেও শেষে দেখা যায় ঠিক আছে।'

'আপনার মেযেবা কী বলে চাচা?'

'ওরা হচ্ছে হিজ মাস্টারস ভযেস — জামাইরা যা বলে ওরা তাই বলে। আমাকে বুঝাতে চায় — শিখিয়ে দেয়া কথা নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করে — ভাঙা বাড়ি দিয়ে তুমি কী করবে বাবা? বিশাল মাল্টিস্টোরিড কমপ্লেক্স হবে। সবচে' উপরের ফ্ল্যাটে থাকবে তুমি। হাত পা ছড়িয়ে বাস করবে। আমরা তিন বোন থাকব তোমার কাছাকাছি। এই বয়সে তোমার তো সেবা দরকার বাবা।'

সুলায়মান চাচা চুপ করে গেলেন। তাকিযে আছেন টিভির দিকে। টিভিতে ক্লোজ আপে বেগুনের পোকা দেখা যাচ্ছে। ভয়ংকর লাগছে পোকাগুলোকে। আমি বললাম, 'চাচা যাই?'

তিনি কোনো জবাব দিলেন না। পোকা দেখতে লাগলেন যেন পোকাদের ভেতর পৃথিবীর সব সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। সেই সৌন্দর্য আমাকে তেমন আকর্ষণ করল না। আমি ঠিক করলাম দুলু আপার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করব। যদিও আজ দুলু আপাদের বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ। শুক্রবার সন্ধ্যার পর তাদের বাড়িতে যাওয়া যায় না। দুলু আপার নিষেধ আছে। ঐ দিন দুলু আপার বাবা মদ্যপান করেন। অল্পতেই তাঁর নেশা হয়। তিনি হৈচৈ করে নানা কাণ্ড করেন। দুলু আপা চান না সেই দৃশ্য আমি দেখি। ঐ দৃশ্য দেখার জন্যেই আমার শুধু শুক্রবারেই তাঁদের বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে। বেশ কবার গিয়েছি এখনো কিছু দেখি নি।

আমি চলে গেলাম দুলু আপার ঘরে। দোতলার শেষ প্রান্তে দুলু আপার ঘর। ছোট্ট একটা খাট, সঙ্গে লাগোয়া চমৎকার ড্রেসিং টেবিল। আয়নাটা প্রকাণ্ড। আয়নার সামনে দাঁড়ালে এমনিতেই মন ভালো হয়ে যায়। ঘরের এক কোনায় পুরানো ধরনের রেডিওগ্রাম। বেশির ভাগ সময়ই দুলু আপার ঘরে ঢুকলে গান শোনা যায়। রেডিওগ্রামে সাতটা রেকর্ড চাপানো থাকে। শেষ হলেই নতুন রেকর্ড চাপানো হয।

আজ গান হচ্ছে না। দুলু আপার ঘরও অন্ধকার। আমি দরজা ফাঁক করে দেখি ঠাণ্ডা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে দুলু আপা শুয়ে আছেন। এটিও তাঁর এক অদ্ভুত অভ্যাস, সিমেন্টেব মেঝে সব সময় ধুয়ে মুছে রাখেন। বেশিব ভাগ সময় শুয়ে থাকেন মেঝেতে — হাতে বই।

'দুলু আপা আসব?'

'আয।'

'ঘর অন্ধকার কেন?'

'মাথা ধরেছে। আয আমার পাশে বস।'

আমি বসতে বসতে বললাম, 'চাচা কোথায?'

দুলু আপা সহজ গলায় বললেন, 'নিজের ঘরেই আছেন। বাবাও আমার মতো ঘব অন্ধকার করে বসে আছেন। ঐ দিকে খবরদার যাবি না।'

'চাচা কী করছেন?'

'জানি না কী করছে। আমের শরবত খাবি?'

'এখন তুমি আমের শরবত কোথায পাবে?'

'ডিপ ফ্রিজে আম আছে। খেতে চাইলে বানিযে দেই। বেশিক্ষণ লাগবে না। দেব?'

'না।'

'অন্য কিছু খাবি?'

'উহুঁ। গান শুনব দুলু আপা।'

দুলু আপা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আজ থাক। অন্যদিন শুনবি। আজ মনটা ভালো নেই।'

'আমি কি চলে যাব?'

'না। তোকে আমি একটা চিঠি পড়াব। মন দিযে পড়ে বলবি চিঠিটা কেমন হযেছে।'

'তোমার লেখা চিঠি?'

'হ্যাঁ।'

'কাকে লিখেছ?'

'সেটা তোর জানার দরকার নেই। তুই শুধু পড়বি। বানান ভুল থাকলে ঠিক করে দিবি।'

'প্রেমপত্র নাকি?'

'এত কথার দরকার কী?'

'দাও পড়ি।'

দুলু আপা হাসতে হাসতে বললেন, 'দেব। এত ব্যস্ত কেন? চিঠি পড়ে তুই একটা শক খাবি। এখন চুপচাপ বসে থাক। অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকার মধ্যে এক ধরনের মজা আছে। মাঝে মাঝে আমি কি করি জানিস? দরজা জানালা সব বন্ধ করে ঘর নিকষ অন্ধকার করি। তারপর মেঝেতে চুপচাপ বসে থাকি। অল্প কিছুক্ষণ বসে থাকলেই মনে হয় — অনন্তকাল পার হয়েছে। টাইম শ্লো হয়ে যায়।'

'চিঠিটা দাও দুলু আপা, পড়ি।'

দুলু আপা চিঠি দিলেন। রেডিওবন্ড কাগজে গোটা গোটা কবে লেখা দীর্ঘ চিঠি। বিষয়বস্তু হচ্ছে — পূর্ণিমা রাতে রাস্তার সোডিয়াম বাতিগুলো যদি নেভানো থাকে তাহলে নগরবাসীরা পূর্ণিমা উপভোগের সুযোগ পায়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালটি কি এই কাজটি কববে? ভরা পূর্ণিমার সময রাত ১১টা থেকে বাত ৩টা পর্যন্ত রাস্তার সব বাতি নিভিয়ে দেবে? তখন তো চাঁদের আলোই থাকবে। কৃত্রিম বাতিব প্রযোজন কী?

চিঠিটা কেমন?'

'ইন্টাবেস্টিং।'

দুলু আপা হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই মনে হয আরো ইন্টারেস্টিং কোনো চিঠি আশা করেছিলি? কি কবেছিলি না?'

'হুঁ।'

দুলু আপা বাতি নিভিযে দিযে বললেন, 'নিজ থেকে আমি কখনো কোনো ছেলেকে চিঠি লিখব না। কখনো না।'

'লিখলে ক্ষতি কী?'

'ক্ষতি আছে। কেউ যদি আমার সেই চিঠি নিযে হাসাহাসি কবে আমাব খুব কষ্ট হবে।'

'এমন কাউকে লিখবে না যে তোমাব চিঠি নিযে হাসাহাসি কববে।'

'যাকে লিখতে চাই সে তাই করবে। হাসাহাসি কববে। সবাইকে প῾ .শানাবে। চিঠিব ভাষা নিযে ক্যাবিকেচাব কববে।'

'তোমাব মনেব কথা পৌছানো দিযে কথা। সে কী কববে না কববে তা দিযে তোমাব প্রযোজন কী?'

'তুই এসব বুঝবি না। আচ্ছা তুই এখন যা।'

দুলু আপার ঘর থেকে বেরিযেই দেখি সিঁড়ির মাথায দুলু আপাব বাবা। তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিযে আছেন। আমি বললাম, 'স্লামালিকুম চাচা।'

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন — 'কে? হু আব ইউ।'

'চাচা আমি রেনু।'

'রেনুটা কে?'

'আমি ঐ বাড়িতে থাকি?'

'এখানে কী চাও?'

'কিছু চাই না?'

আমাদের কথাবার্তা শুনে দুলু আপা বের হয়ে এলেন। তাঁর বাবার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন — 'তুমি ঘরে যাও বাবা।'

উনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরের দিকে রওনা হলেন। রেলিং ধরে ধরে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে টলতে টলতে যাচ্ছেন। আমি আগে মাতাল দেখি নি — এই প্রথম দেখলাম। বুকের মধ্যে ধক করে উঠল।

দুলু আপা বললেন, 'বাসায় যা রেনু। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, 'যাচ্ছি।'

'তুই কি ভয় পেয়েছিস?'

'হুঁ।'

'কেন? বাবা কিছু বলেছে তোকে?'

'না।'

'তাহলে ভয় পেলি কেন? আয় আমি তোকে এগিয়ে দিচ্ছি।'

'এগিয়ে দিতে হবে না দুলু আপা।'

আমি সিঁড়ি বেয়ে নামছি। হঠাৎ মনে হল আমি নিজেও অবিকল দুলু আপার বাবার মতোই টলতে টলতে নামছি। এক হাতে সিঁড়ির রেলিং ধরে আছি। সিঁড়ির গোড়ায় এসে পেছনে ফিরলাম। দুলু আপা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি খানিকটা মন খারাপ করে বাসায় ফিরলাম। দুলু আপাকে আমি বেশ পছন্দ করি। তাঁকে যতটা পছন্দ করি নিজের আপাকে ততটা করি না। মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় মীরা আপা আমার বোন না হয়ে দুলু আপা বোন হলে বেশ হত।

তার মানে এই না যে আপাকে আমি পছন্দ করি না। করি। তবে কেন জানি খানিকটা ভয় ভয়ও লাগে। একজন মানুষ খুব পরিচিত একজনকে তখনি ভয় করে যখন সে তাকে বুঝতে পারে না। আপাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আগে আমরা দুবোন একটা ঘরে ঘুমাতাম। বড় একটা খাট ছিল ঘরের মাঝখানে যাতে কাউকেই কিনারে শুতে না হয়। ঘুমাতে যাবার আগে আপা আমার চুল বেঁধে দিত। এই সময় হালকা গলায় গল্প গুজব করত। একদিন হঠাৎ বলল, 'রেনু, এখন থেকে তুই কি ভাইয়ার ঘরে শুবি? ওখানে তো এক্সট্রা চৌকি আছে। আমার একা ঘুমাতে ইচ্ছে করে।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

'তুই মন খারাপ করলি না তো?'

'না।'

'মাঝে মাঝে আমার খুব একা থাকতে ইচ্ছা করে। সব সময় না, মাঝে মাঝে।'

'বুঝতে পারছি।'

'না বুঝতে পারছিস না। এটা এত সহজে বোঝার জিনিস না।'

আমি চলে এলাম ভাইয়ার ঘরে। এমনিতেই ঘরটা ছোট — তার উপর দুটা চৌকি। ঘরে ঢুকলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। তার উপর রোজ ভাইয়া রাত করে ফিরে। আমাকে দরজা খুলে দেবার জন্যে জেগে থাকতে হয়। ইদানীং আবার সিগারেট ধরেছে। ঘুমাবার আগে বিছানায় শুয়ে সিগারেট টানে। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কী বিশ্রী অবস্থা। আমি একদিন বললাম, 'সিগারেট বারান্দায় খেলে কেমন হয়?'

ভাইয়া পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'ভালোই হয় কিন্তু সব কিছুর একটা নিয়ম আছে। দিনের শেষ সিগারেট বিছানায় শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে খেতে হয়, এটাই নিয়ম। নিয়ম তো ভঙ্গ করতে পারি না। এই জন্যেই তো পা নাচাচ্ছি।'

'আমার তো ভাইয়া দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'বুঝতে পারছি। বাট আই কান্ট হেল্প। আমার ঘরে বাস করলে এই কষ্ট সহ্য করতেই হবে। উপায় নেই।'

ভাইয়ার সঙ্গে বাস করার কিছু অসুবিধা যেমন আছে — সুবিধাও আছে। প্রায় রাতেই সে অনেকক্ষণ গল্প করে। মজার মজার গল্প। মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। কিছু কিছু গল্প তার নিজের বানানো — যেমন আধুনিক কালের ঈশপের গল্প। পুরানো গল্প — কাক মাংসের টুকরা নিয়ে গাছে বসেছে, শিয়াল এসে বলল কাক ভাই তোমার গলাটা বড় মিষ্টি। একটা গান গাও না। কতদিন তোমার গলার মধুর কা-কা ধ্বনি শুনি নি। ঈশপের গল্পে কাক তখন গান ধরে। কিন্তু ভাইয়ার গল্পে গান ধরে না। কারণ সৌভাগ্যক্রমে ঈশপের গল্পটি তার পড়া। সে এমন সব কাণ্ডকারখানা করে যে শুনে হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে আসে। এত কাণ্ড করেও কাকের শেষ রক্ষা হয় না — মাংসের টুকরা চলে যায় শিয়ালের পেটে। এই গল্পগুলো লিখে ফেললে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যেত কিন্তু সে লিখবে না।

ভাইয়ার ঘরে একটা টেবিল ফ্যান আছে — এটি সে দিয়ে রাখে আমার দিকে। সে নাকি হিট প্রুফ — গরমে তার কিছু হয় না, বরং সুনিদ্রা হয়। এটা অবশ্য মিথ্যা কথা। গরম অসহ্য বোধ হওয়াতেই সে তার কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে এই ফ্যান নিয়ে এসেছিল। আমি তার ঘরে চলে আসায় বেচারাকে বাধ্য হয়ে ফ্যানটা আমাকে দিয়ে দিতে হয়েছে।

আপনি বোধ হয ভাবছেন — মেযেটা কী স্বার্থপর! নিজে ফ্যানের বাতাস খাচ্ছে — বড় ভাই গরমে সিদ্ধ হচ্ছে।

আসলে তা কিন্তু না। আমার ভাইয়ার মতো চট করে ঘুম আসে না। ভাইযা ঘুমাবার পরেও আমি অনেকক্ষণ জেগে থাকি। তারপর ফ্যানের মুখ ঘুরিয়ে দেই ভাইয়ার দিকে। ভাদ্রমাসেব অসহ্য গরমে ছটফট করতে করতে ভাবি, একদিন যখন আমাদের খুব টাকা-পযসা হবে তখন ঘবে ঘবে এযারকুলার থাকবে। সবগুলো ঘব থাকবে হিমশীতল। ভাদ মাসের গরমে লেপ গাযে ঘুমাব।

বাত এখন বাজছে একটা দশ। আমি ভাইযার জন্য অপেক্ষা করছি। বাবা অনেকক্ষণ জেগে ছিলেন, কিছুক্ষণ আগে ঘুমাতে গেলেন। ভাইয়া বাতে ভাত খাবার সময না থাকায তিনি বেশ মন খারাপ করেছেন। কিছু দিন বাইরে কাটিয়ে ফিরলেই বাবা সবাইকে নিয়ে খাওযাব ব্যাপাবটায খুব গুরুত্ব দিতে থাকেন। আজ বিকেলে তিনি নিউ মার্কেট থেকে কাতল মাছের একটা বিশাল মাথা কিনে এনেছেন। সেই মাথার মুড়িঘণ্ট রান্না হল। রান্নার সময বাবা পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন এবং মাকে নানান উপদেশ দিতে লাগলেন — 'একটু ঝোল-ঝোল রাখ, শুকনো হলে খেয়ে আরাম পাওযা যাবে না। কয়েকটা আলু কুচিকুচি করে দিয়ে দাও — আলু গলে ঝোলটা ঘন কববে, খেতে আরাম হবে। পাঁচ ফোড়ন আছে? এক চিমটি পাঁচ ফোড়ন ডোজ দিযে দাও না — সুন্দর গন্ধ হবে। গোটা পাঁচেক আস্ত কাঁচামরিচ দিযে দাও কাঁচামবিচের সুঘ্রাণ তুলনাহীন।'

রান্নার এক ফাঁকে মা এসে আমাকে আর আপাকে চুপি চুপি বলে গেলেন, 'মাছের মাথাটা পচা ছিল — খেতে ভালো হবে না। তোর বাবাকে কিছু বলিস না, মনে কষ্ট পাবে। বেচারা শখ করে কিনেছে।'

আপা বলল, 'পচা মাছ খেয়ে তো অসুখ করবে মা।'

'এত পচা না। কষ্ট করে খেয়ে নিস মা —'

খাবার সময় মোটামুটি করুণ দৃশ্যের অবতারণা হল বলা যেতে পারে — বাবা নিজেই মাছ মুখে দিতে পারলেন না — মুখ কুঁচকে বললেন — 'মাথাটা পচা নাকি?'

মা বললেন, 'না তো। টাটকা মাথা। কানকো লাল টকটকে ছিল।'

'খেতে এমন লাগছে কেন? পচা গন্ধ পাচ্ছি।'

আমি বললাম, 'তুমি উল্টাপাল্টা ডিরেকশন দিয়ে মাছটা নষ্ট করেছ বাবা।'

আপা বলল, 'আমার কাছে খেতে তো ভালোই লাগছে।'

বাবা বললেন, 'খেতে খারাপ হয় নি। গন্ধটা ডিসটার্ব করছে। রঞ্জু থাকলে এই গন্ধ নিয়ে কিছু একটা বলে সবাইকে হাসিয়ে মারত। ও কি রোজ ফিরতে দেরি করে?'

আমি বললাম, 'মাঝে মাঝে করে।'

'এটা ঠিক না। ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে। ঢাকা শহর এখন আগের মতো সেফ না । রাত বিরেতে চলাচল বন্ধ করতে হবে। আমি আজ ওকে বলব। কড়া গলায় বলব — অবশ্যি তাকে কড়া গলায় কিছু বলাও মুশকিল। ফানি ম্যান। এমন কিছু বলবে যে হাসতে হাসতে জীবন যাবে।'

বলেই বাবা হাসতে লাগলেন। সেই হাসি থামতে সময় লাগল। হাসি থামে, দুএক নলা ভাত খান। আবার হাসেন।

ভাইয়া ফিরল রাত দেড়টায। ঘরে ঢুকেই বলল, 'খুকি জেগে আছিস?' আমার দুটা ডাক নাম, একটা খুকি, অন্যটা রেনু। খুকি নামে এখন কেউ ডাকে না, আমি নিষেধ করে দিয়েছি। কেউ যদি ভুল করেও ডাকে আমি রাগারাগি কবি। শুধু ভাইয়া ডাকে। আমাকে রাগাবার জন্যেই ডাকে। রাগ করলে আরো বেশি ডাকবে বলে চুপ করে থাকি। ভাইযা শার্ট খুলতে খুলতে বলল, 'কথা বলছিস না কেন? জেগে আছিস নাকি?'

'না ঘুমিয়ে আছি। আচ্ছা ভাইযা, এত দেরি করলে? বাবা তোমার জন্যে এতক্ষণ জেগে ছিলেন। রাতে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আমরা ভাত খেযেছি এগাবটাব সময!'

'মেনু ছিল কী?'

'মাছের মাথা — মুড়িঘণ্ট। বাবা নিজে মাথা কিনে আনলেন।'

ভাইয়া শুকনো গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই পচা ছিল। আজ পর্যন্ত কোনোদিন বাবা টাটকা মাথা কিনতে পারেন নি। আমি একশ টাকা বাজি বাখতে পাবি, মাথাটা ছিল পচা, তোবা কেউ খেতে পারিস নি।'

'মাথা ভালোই ছিল। ভাইযা তুমি কি খেযে এসেছ না খাবাব গরম কবব?'

'খেয়ে এসেছি — আভা আজ তাদের বাসায নিযে গেল। আভার মা খাইয়ে দিলেন।'

'কোন আভা?'

'এমন ভাবে বললি যেন দশ-বারটা আভাব সঙ্গে আমাব খাতিব। কথাবার্তা চিন্তাভাবনা করে বল। প্রশ্ন করতে হয বলেই যে বলতে হবে — কোন আভা? তাতো ঠিক না।'

'সরি।'

'সরি হলে ভালো — তুই এখন যা, আমাব জন্য ফ্লাস্ক ভর্তি কবে চা বানিযে আন। আজ সারারাত জাগতে হবে। পত্রিকায একটা ভালো অ্যাসাইনমেন্ট পেযেছি। প্রচ্ছদ কাহিনী — বিষয হল, "ঢাকা শহরে ভ্রাম্যমাণ পাগল"। ঠিকঠাক মতো নামাতে পারলে এক হাজার টাকা পাওয়া যাবে। আভা আমাকে সাহায্য করছে। ও নেবে চাবশ — আমি ছশ .... ।'

আভা নামের মেয়েটির কথা ভাইযাব মুখে কযেকবার শুনেছি, এখনো দেখি নি। আমাদের বাসায় এখনো আসে নি। মেয়েটা শতদল পত্রিকায কাজ করে। ভাইযাব ভাষায খুব 'ফাইটিং টাইপ' মেয়ে — বেঁচে থাকার জন্য 'ফাইট' দিয়ে যাচ্ছে। মানি প্ল্যান্ট জাতীয় মেয়ে না — ছোট-ছোট তিনটা ভাইবোন, অসুস্থ মা — সে একা রোজগার করছে। দিনরাত পরিশ্রম করছে।

'কীরে খুকি এখনো দাঁড়িয়ে আছিস, ব্যাপার কী? চা নিয়ে আয়। ফ্লাস্ক ভর্তি করে আনবি?'

'ফ্লাস্ক পাব কোথায়?'

'ঐদিন যে একটা দেখলাম?'

'দুলু আপাদের ফ্লাস্ক।'

'ও আচ্ছা, তাহলে তো তোর কাজ বেড়ে গেল। তোকেও জেগে থাকতে হবে — ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাকে চা খাওয়াতে হবে। ছোট বোন হয়ে জন্মানোব অনেক যন্ত্রণা।'

আমি বললাম, 'আভা মেয়েটা দেখতে কেমন?'

'ভেরি অর্ডিনারি। সাজলে গুজলে হয়তো সুন্দব দেখাবে। সাজার সময কোথায়? সাজতে তো পয়সাও লাগে। পযসা কোথায? একটা মাত্র ঘব সাবলেট নিযে এতগুলো মানুষ থাকে। কীভাবে বাস করে না দেখলে বিশ্বাস করবি না। আমি ওদের বাসায গিয়ে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলাম, বুঝলি খুকি? আমার ধারণা ছিল — আমবাই বোধ হয সবচে' গরিব। ওদেব বাড়িতে রাতে কী বান্না হয়েছে জানিস — শুধু ভাত আর ডাল। স্বাস্থ্যবান ভাত ইযা মোটা মোটা।'

'তুমি ডাল ভাত খেযে এলে?'

'না, আভা গিযে আমার জন্যে ডিম কিনে নিযে এল। সেই ডিম ভাজা হল। আভার একটা ছোট বোন আছে তার নাম শেফা। সে খুব গোপনে ফ্রকের আড়ালে একটা বাটি নিযে গেল পাশেব বাড়ি। সেখান থেকে খানিকটা মাছেব তরকারিও এল।'

ভাইযা হাত মুখ ধুযে কাগজ-কলম নিযে বিছানায লম্বা হযে শুযে পড়ল। আমি চা বানিযে আনলাম। ভাইয়া বলল, 'এক কাজ কব তো খুকি। তোব ফ্যানটা আমাকে ধাব দে। বড্ড বেশি গরম। আব শোন, একটা গামছা ভিজিযে আমাব পিঠেব উপব দিযে দে। তাহলে মশা বিশেষ কাযদা করতে পারবে না। শরীবটাও ঠাণ্ডা থাকবে।'

আমি ভাইযাব পিঠে ভেজা গামছা দিযে বাবান্দায মোড়া পেতে বসলাম। ঘবে আলো থাকলে আমাব ঘুম হয না। এবচে' বাবান্দায বসে থাকা ভালো। বারান্দায খানিকটা বাতাস আছে। বসে থাকতে খুব খাবাপ লাগছে না।

আমি চুপচাপ বসে আছি। দুলু আপা গান বাজানো শুরু কবেছেন। তাঁর মনখারাপ ভাবটা সম্ভবত কেটেছে। একজন মানুষ বেশিক্ষণ যেমন মন ভালো রাখতে পারে না — বেশিক্ষণ মন খাবাপও বাখতে পারে না। তিনি নিশ্চযই খাওয়াদাওযাও কবেছেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায কেউ গান শুনতে পাবে না। সংগীত ক্ষুধার্ত মানুষের বিষয নয।

'ওকে ধরিলে তো ধবা দেবে না —
ওকে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে ...'

দুলু আপাব অসংখ্য বেকর্ড কিন্তু গভীব রাতে তিনি অল্পকিছু গান ঘুবেফিরে বাজান। কোনো কোনো বাতে এমন হয যে একই গান বার বার বাজাচ্ছেন। কে জানে আজ হয়তো এই গানটাই পঞ্চাশবাব বাজাবেন।

বসে থাকতে থাকতে আমার ঝিমুনি ধরে গেল। ভাইয়ার ঘবের দরজা বন্ধ বলেই বাবান্দা অন্ধকার হয়ে আছে। এখন বেশ বাতাস ছেড়েছে। বারান্দায় পাটি পেতে ঘুমাতে পারলে ভালো হত। আকাশে মেঘ করেছে। কযেকবাব বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি নামলে খুব ভালো হয। আরাম করে ঘুমানো যায। এবার গবমটা বেশি পড়েছে। ভাইয়া ভেতর থেকে চেঁচাল।

'ও খুকি চা দে।'

আমি আবার চা বানিয়ে আনলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। দুলু আপা একই গান বারে বারে বাজাচ্ছেন —

'ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না —
ওকে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে ....'

ভাইয়া চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, 'আমাকে যদি বলত ঢাকা শহরের গৃহবন্দি পাগলের উপর প্রচ্ছদ কাহিনী লিখতে — আমি সবার প্রথমে লিখতাম তোর দুল আপার কথা। দেখ একই গান বার বার বাজাচ্ছে। এই ভাবে মানুষকে বিরক্ত করার কোনো মানে হয়? — ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না ... কান ঝালাপালা হয়ে গেল। যাকে ধরিলে ধরা দেবে না তাকে ধরার জন্য এত মাতামাতি কেন? ছেড়ে দাও চরে খাক। ইস্ কী বিরক্ত যে এই মেয়েটা করে!'

'তুমি জেগে আছ তাতো আর উনি জানেন না? তোমার লেখা এগোচ্ছে কেমন?'

'মোটোই এগোচ্ছে না। শুরুটা নিয়েই সমস্যা — একটা ইন্টারেস্টিং ওপেনিং দরকার — সেটা পারছি না। যাকে বলে শুরুতেই পাঠককে একটা চমক দেয়া — দেখ্ তো এই শুরুটা তোর কাছে কেমন লাগে — তুই পড়বি না আমি পড়ে শোনাব?'

'তুমিই পড়ে শোনাও। তোমার হিজিবিজি হাতের লেখা আমি পড়তে পারি না।'

ভাইয়া পড়তে শুরু করল — 'ধরুন, আপনি ঢাকা শহরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন পুরোপুরি নগ্ন এক জন মানুষ আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ট্রাফিক কনট্রোল করছে। ট্রাফিক পুলিশ যে ভাবে বাঁশি বাজায় সেই ভাবেই পিপ পিপ করে মুখে বাঁশি বাজানোর আওয়াজ করছে — তখন আপনি কী করবেন? বিরক্ত হবেন? তার সিগন্যাল উপেক্ষা করে গাড়ি নিয়ে পার হয়ে যাবেন, নাকি সিগন্যাল মানবেন?

নওয়াবপুর রোডের মোড়ে এক পাগল ট্রাফিক কনট্রোল করে — যার সিগন্যাল সবাই মানে। সে যখন হাত উঠিয়ে গাড়ি থামতে বলে তখন সব গাড়ি থামে। চলতে বললে চলে। বদ্ধ উন্মাদ এই ব্যক্তি ট্রাফিক কনট্রোল করে খুব সুন্দর ভাবে। মোড়েব ট্রাফিক পুলিশ তার কাছে দায়িত্ব দিয়ে চা-টা খেতে যায়। খুকি ঘুমিয়ে পড়েছিস?''

'না — শুনছি।'

'কেমন লাগছে?'

'ভালো। সত্যি এমন কেউ আছে নাকি?'

'অবশ্যই আছে। আমি তো গল্প লিখছি না। সত্য অনুসন্ধানী রিপোর্ট। আভা যখন এই লোকটার কথা বলল তখন আমি নিজেও বিশ্বাস করি নি। আভা আমাকে নিয়ে গেল। পাগলটার সঙ্গে কথা-টথা বললাম। ভেবি ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার।'

'সত্যি পাগল?'

'হুঁ — যাই জিজ্ঞেস করি হাসে আর বলে — 'খিস' 'খিস'।'

'ভাইয়া আমি ববান্দায চাদর পেতে শুচ্ছি — তোমার লেখা শেষ হলে আমাকে ডেকে দিও।'

'তোকে মনে হয কষ্টের মধ্যে ফেললাম — কাল ছুটি আছে সারাদিন ঘুমাতে পাববি। আজ একটু কষ্ট কর। শেষ বারের মতো এক কাপ চা নিয়ে আয়।'

চা এনে দেখি লেখা খাতার উপর মাথা বেখে ভাইযা ঘুমাচ্ছে— ।

ভাইয়াকে জাগালাম না। বাতি নিভিযে দিলাম। ঘড়িতে রাত সাড়ে তিনটা বাজে। এখন আর ঘুমাতে যাবার কোনো মানে হয না। ঘুম আসতে আসতে আধঘণ্টা লাগবে। তারপর যেই ঘুমটা আসবে, ভোর হবে। ঘরে রোদ ঢুকে যাবে। জেগে উঠতে হবে। আধঘণ্টা, একঘণ্টা ঘুমানোর চেয়ে না ঘুমানো ভালো।

আমি বরান্দায় চলে এলাম। এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাচ্ছি। চারদিক নীরব। দুলু আপা গান বাজানো বন্ধ করেছেন। যাকে তিনি ধরতে চাচ্ছেন তাঁকে ধরবার আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি সম্ভবত ঘুমাতে গেছেন।

এইখানে আমি আপনাকে একটা কথা বলি — সারারাত জেগে থাকার বিশ্রী অভ্যাস আমার আছে। কোনোই কারণ নেই অথচ আমার ঘুম আসছে না। আমি বাবান্দায় হাঁটাহাঁটি করছি এ রকম প্রাযই হয়। হাঁটাহাঁটি করতে করতে আমি অনেক কিছু চিন্তা করি। আমার খুব ভালো লাগে। কী নিয়ে চিন্তা করি তার সব আপনাকে বলা যাবে না। আপনি হাসবেন। এবং মনে মনে বলবেন — মেযেটা তো ভারি ইযে ....

শুধু একটা চিন্তার কথা বলি — চিন্তা না — কল্পনা। আমি কল্পনা করি যেন রাতের ট্রেনে আমি যাচ্ছি। কামরায় দুটি মাত্র মানুষ। আমি এবং একটি ছেলে। ছেলেটিকে আমি আগে কখনো দেখি নি। অল্প বয়স, সুন্দর চেহারা। বড় বড় চোখ। চোখে চশমা। খুব বৃষ্টি নেমেছে। ছেলেটা ট্রেনের কামরার জানালা বন্ধ করছে। আমার জানালাটা খোলা। সে বিরক্ত হযে বলল, 'জানালা বন্ধ করছেন না কেন?'

আমি বললাম, 'তাতে আপনার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?'

'আপনি তো ভিজে যাচ্ছেন।'

'আমাকে শুকনা বাখার দাযিত্ব তো আপনাকে দেযা হয নি। আমার বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছা হচ্ছে — ভিজছি ..... '

এই কথায় ছেলেটা একটু যেন আহত হল। নিজের দিকের জানালা খুলে সেও আমার মতো জানালা দিযে মাথা বেব কবে ভিজতে লাগল। আমি বললাম, 'আপনি ভিজছেন কেন?'

'ইচ্ছে হচ্ছে ভিজছি।'

'আপনাব অসুখ করতে পারে। বৃষ্টির পানি সবাব সহ্য হয না। আমাব অভ্যাস আছে। আমাব কিছু হয না।'

'আমারও অভ্যাস আছে। আমাবও কিছু হয় না।'

'না আপনাব অভ্যাস নেই। অভ্যাস থাকলে বৃষ্টি নামামাত্র খটাখট জানালা বন্ধ কবতেন না। তাছাড়া আমি পরিষ্কাব দেখতে পাচ্ছি শীতে আপনি কাঁপছেন। নির্ঘাত অসুখ বাধাবেন।'

'অসুখ বাধালে আপনার কী?'

'আচ্ছা আপনি এমন অবুঝেব মতো আচবণ কবছেন কেন? কথা শুনছেন না কেন?'

আমার চিন্তাগুলো হচ্ছে এই রকম কথাব পিঠে কথা তৈবি করা। ছেলেমানুষি খেলা। একা থাকলেই আমার এই খেলাটা খেলতে ইচ্ছা কবে। সব খেলাব শেষেই ক্লান্তি আসে। আমার এই খেলায কখনো ক্লান্তি আসে না। যাই হোক, যা বলছিলাম — আমি বাবান্দায হাঁটছি — এক মাথা থেকে আবেক মাথায যাচ্ছি — তখন হঠাৎ কবেই ফুঁপিযে কান্নার শব্দ শুনলাম। একজন কে কান্না চাপতে চেষ্টা কবছে — পারছে না। আমি পুবোপুবি হকচকিয়ে গেলাম — কাঁদছে আপা। এই কান্না প্রচণ্ড কষ্টেব কান্না।

আপা কেন এরকম করে কাঁদবে? এমন কী কষ্ট আছে তার? আমি অবাক হযে আপার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। যাতে সে একা একা কাঁদতে পারে এই জন্যই কি সে আমাকে ঘব থেকে বেব কবে দিযেছে? এই কারণেই কি তাব মাঝে মাঝে একা একা থাকতে ইচ্ছা করে?

আমি আপার দরজায় ধাক্কা দিযে ডাকলাম, 'আপা, আপা।' কান্না থেমে গেল। আপা কোনো উত্তর দিল না।

কাক ডাকছে। ভোর হতে শুরু করেছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি আপার ঘরের সামনে। যদিও ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে এতটুকুও ভালো লাগছে না। এই বাড়ির সঙ্গে গাছগাছালিতে ভর্তি যদি কোনো বাগান থাকত আমি দাঁড়াতাম বাগানের ঠিক মাঝখানে।

পচা মাছের মাথা খেয়ে আমাদের কিছু হল না, বাবার খুব শরীর খারাপ করল। পেট নেমে গেল, সেই সঙ্গে যুক্ত হল বমির উপসর্গ। ভাইয়া বলল, 'কলেরা বাধিয়ে বসেছ নাকি বাবা? '

বাবা ক্ষীণস্বরে বললেন, 'বাঁচব না রে। বাঁচব না। আমার দিন শেষ।'

বাবার এই ঘোষণায় আমরা বিশেষ বিচলিত হলাম না কারণ সামান্য অসুখ-বিসুখেই তিনি এ জাতীয় ঘোষণা দেন যা মাকে খুব কাবু করে ফেলে। মা এবারো খুব কাবু হয়ে পড়লেন, ভাইয়াকে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'একটা ভালো ডাক্তার আন। মানুষটা মরে যাচ্ছে দেখছিস না?'

ভাইয়া সহজ গলায় বলল, 'যে কোনো ডাক্তারই আসুক বাবাকে স্যালাইন ওয়াটারই দেবে। কাজেই চুপ করে বসে থাক। চিন্তার কিচ্ছু নেই। বাবার শরীর থেকে পচা মাছের সর্বশেষ অংশটা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাস্ত এবং বমি চলতেই থাকবে।'

'কী করে বুঝলি? তুই কি ডাক্তার?'

'এসব বুঝার জন্যে ডাক্তাব হওয়া লাগে না মা। এগুলো হচ্ছে কমনসেন্স। আমাব অন্য কোনো সেন্স না থাকলেও কমনসেন্স খুব ভালো। কাল পবশুব মধ্যে দেখবে বাবা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছে।'

'যদি না বসে?

'তখন ডাক্তার আনব।'

বড় ডাক্তার আনতে হল না। বাবা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বরিশাল যাবার জন্য। বরিশাল থেকে সুপাবি কিনে আনতে হবে। এইটাই নাকি ঠিক সময়।

মা অবাক হয়ে বললেন, 'এই শরীর নিয়ে তুমি বরিশাল যাবে কী করে?'

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি তো আর সাঁতার দিয়ে যাব না। লঞ্চে করে যাব। ডেকে বিছানা করে হাওয়া খেতে খেতে যাব।'

মা বললেন, 'তোমাকে আর ছোটাছুটি করতে হবে না, ঘরে বসে থেকে যা পাব কব। সংসার তুমি যতদিন পেরেছ টেনেছ। এখন রঞ্জু টানবে।'

বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ও টানবে কেন? এটা কি ওর সংসার না আমাব সংসার? আমার ব্যবসার যা ধারা — ঘরে বসে থাকলে চলবে না। জায়গায় জায়গায় যেতেই হবে।'

'ঠিক আছে। শরীর সারুক তারপর যাবে। এখন রঞ্জুকে গুছিয়ে বলে দাও ও সুপারি কিনে আনবে।'

'ও সুপারি কী কিনবে? সবাইকে দিয়ে সবকিছু হয না। ঢাকা শহরে ভ্রাম্যমাণ পাগল কত প্রকার ও কি কি ওকে জিজ্ঞেস কর — ও বলে দেবে। সুপারির দর জিজ্ঞেস কর বলতে পারবে না।'

শরীর পুরোপুরি না সারতেই বাবা বরিশাল যাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। আমরা সবাই প্রবল আপত্তি করলাম। শুধু আপা বলল — 'বাবা বাইরে গেলে ভালোই হবে। অনেকদিন ঘরে থেকে মনটন খারাপ হয়ে আছে। আগের মতো ঘোরাঘুরি শুরু করলে শরীর আরো তাড়াতাড়ি সারবে।'

বাবার সবগুলো প্যান্ট ঢিলা হয়ে গেছে। পিছলে পড়ে যায়। বেল্ট নেই কাজেই পায়জামার দড়ি দিয়ে প্যান্ট পরা হল। তিনি এক হাতে সুটকেস অন্য হাতে দুবাটিব ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়াব নিয়ে বিকেল চারটায় রিকশায় উঠে বসলেন। তাঁব লঞ্চ ছটায়। ট্রাফিক জামে পড়ে যেন লঞ্চ মিস না করেন সে জন্যেই এত সাবধানতা।

'চার দিনেব মাথায় চলে আসব। খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ। চিন্তার কোনো কাবণ নাই — আল্লাহ্ হাফেজ।'

বাবা বাড়ি থেকে বেরুলেই মা মন খাবাপ করেন। এবাব অনেক বেশি মন খাবাপ করলেন কারণ আগেব বাতে তিনি নাকি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। মার দুঃস্বপ্নগুলি সাধারণত খুব জটিল হয়।

এটা তেমন জটিল না।

এক অন্ধ লোক ভিক্ষা চাইতে এসেছে। বাবা ভিক্ষা দিতে যাচ্ছেন, মা আপত্তি কবছেন — ওর কাছে যেও না, ও আসলে ভিক্ষুক না, খুনী। ও তোমাকে খুন কববে। বাবা মাব কথা শুনলেন না। কাছে গেলেন। অন্ধ লোকটা তখন বিকট শব্দে হেসে উঠল। মাব ঘুমও ভেঙে গেল।

বাবার বিকশা বড় বাস্তায় পড়াব আগেই মা আমাদের কাজেব মেয়েটিকে একটা কালো রঙেব মুবগি কিনতে পাঠালেন। আগামীকাল ভোবে এই মুবগি কোনো একজন অন্ধ ভিখারিকে ছদকা দেয়া হবে।

বাত বাবটার দিকে আমরা সবাই যখন ঘুমাতে যাচ্ছি — বাবা এসে উপস্থিত। ভাইযা অবাক হয়ে বলল, 'ব্যাপার কী?' বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'ব্যাপাব কিছু না। হঠাৎ একটা জিনিস মনে পড়ল চলে এলাম।'

'কী মনে পড়ল?'

'না মানে, আগামীকাল দিনটা একটা বিশেষ দিন। ভুলেই গিয়েছিলাম ...... লঞ্চে উঠে মনে পড়ল, চলে এলাম। এক দিন পবেই যাই, এক দিনে কী হবে?'

'বিশেষ দিন মানে? কী হয়েছিল এই দিনে?'

'সে বিরাট ইতিহাস। আবেক দিন বলব।'

'আরেক দিন বললে হবে না। আজই বলতে হবে।'

দেখা গেল — তেমন বিবাট ইতিহাস কিছু না। এই দিনে বাবা মাব সঙ্গে প্রথম কথা বলেছেন। সেই কথাও নিতান্ত গদ্য ধবনেব কথা। বাবা মাব বাড়িতে অনেকক্ষণ দবজা ধাক্কাধাক্কি কবাব পব মা দবজা খুললেন। বাবা বললেন, 'এটা কি জয়নাল সাহেবেব বাড়ি?'

মা বললেন, 'হুঁ।'

'উনাকে একটু ডেকে দাও।'

'উনি বাড়িতে নাই।'

বাবা চলে এলেন এবং আধঘণ্টা পব আবাব গেলেন। আবাবো একই কথাবার্তা হল। বাবা ফিরে এসে আবাব আধঘণ্টা পব গেলেন। এইবার মা হেসে ফেলে বললেন, 'আপনি বার বার চলে যাচ্ছেন কেন? বসেন।' বাবা বসলেন।

ভাইয়া বলল, 'ঐদিনই কি তোমরা দুজন দুজনের প্রেমে পড়লে?'

'আহ্ কী সব প্রশ্ন! তোর মাকি ঘুমাচ্ছে নাকি? ডেকে তোল্। বিশেষ দিনটার কথা তোর মার মনে আছে কিনা কে জানে।'

বিশেষ দিনটার কথা মারও মনে ছিল। তবে দিনটার প্রসঙ্গে মার বর্ণনা এবং বাবার বর্ণনা এক না। মার কথামতো বাবা পর পর তিনবার জয়নাল সাহেবের খোঁজ করলেন এবং প্রতিবারই বললেন, 'এক গ্লাস পানি খাব।' শেষবার মা পানি দেন নি। লেবুর শরবত বানিয়ে দিয়েছিলেন। পানি ভেবে বাবা এক চুমুক দিলেন — তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মুখ তুলে মার দিকে তাকাতেই মা হেসে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

মার দৌড়ে পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা অবশ্যি আমার অনুমান। ঘটনা এমনই ঘটার কথা। আমার ভেবে খুব অবাক লাগে যে বাবা-মার চরিত্রের অসম্ভব রোমান্টিক দিকটি আমাদের তিন ভাইবোন কারোর মধ্যেই নেই। আপার মধ্যে তো ছিটেফোঁটাও নেই। ভাইয়ার মধ্যেও নেই — থাকলে দুলু আপার আবেগ তাঁর চোখে পড়ত। আমার নেই এইটুকু বলতে পারি। ছেলেরা যখন ভাব জমানো কথা বলে আমার কেন জানি গা জ্বলে যায়।

আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক জন বান্ধবী আছে, মেরিন। তার বড় ভাই আর্কিটেকচাবে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। আমাকে দেখলেই গদগদ ভাব করে। এমন বিশ্রী লাগে! সেদিন বলল, 'তোমার রেনু নামটা আমার পছন্দ না। তোমাকে এখন থেকে স্বর্ণরেনু ডাকলে কি তোমার খুব আপত্তি আছে?'

আমি বললাম, 'কোনো আপত্তি নেই, তবে আমিও এখন থেকে আপনাকে কবীর ভাই না ডেকে ডাকব — তাম্র কবীর ভাই। আপনার আপত্তি নেই তো?'

কবীর ভাই খুবই হকচকিযে গেলেন। মেয়েরা কথাব পিঠে কথা বললে ছেলেরা ঠিক তাল রাখতে পারে না। তাদের চিন্তাভাবনা এলোমেলো হযে যায। অকারণে রাগও কবে। কবীর ভাই যে ঐ দিন খুব রাগ করেছিলেন তার প্রমাণ হল পরদিনই মেরিন আমাকে বলল, 'রেনু তুই আমার ভাইয়াকে অপম্যন করেছিস, ব্যাপাব কী?'

আমি বললাম — 'অপমান করি নি তো।'

'তুই ভাই, আমাদের বাসায় আর আসিস না। ভাইযা খুব রাগ কবেছে।'

আমি মেরিনদের বাসায় আর যাই নি তবে কবীব ভাইয়ের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হল। তিনি রিকশায করে কোথায যেন যাচ্ছিলেন — আমি বাস্তাব সবাইকে সচকিত কবে ডাকতে লাগলাম — 'তাম্র ভাই, তাম্র ভাই।'

রাগ, দুঃখ এবং বিস্ময়ে বেচারার মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি রিকশা থামালেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কোন দিকে যাচ্ছেন?'

'কেন?'

'আমার পথের দিকে হলে, আপনাব সঙ্গে খানিকটা যেতাম। দুপুব বোদে হাঁটতে ভালো লাগছে না।'

'তুমি কোনদিকে যাবে?'

'এলিফ্যান্ট রোড।'

'আমি ঐদিকে যাচ্ছি না। আব শোন একটা কথা — তাম্র ভাই, তাম্র ভাই কবছ কেন?'

'তাম্র কবীর ভাই বললে অনেক বড় হযে যায় এই জন্যে শর্ট করে বলছি। আপনি রাগ করলে আর বলব না।'

কবীর ভাই তীব্র দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন — 'বেয়াদবি করবে না। বেয়াদবি করার বয়স তোমার এখনো হয় নি।'

আমি কিন্তু বেয়াদবি করতে চাই নি। মজাই করতে চেয়েছিলাম। মজা করারও বোধ হয় বয়স আছে। সব বয়সে মজা করা যায় না। আমি ঠিক করে রেখেছি এব পরে যদি কখনো কবীর ভাইযের সঙ্গে দেখা হয আমি খুব বিনযী ব্যবহার করব। হেসে হেসে কথা বলব। এখনো তাঁর সঙ্গে দেখা হয নি।

বাবা বরিশাল চলে যাবার পব পরই মা অসুখে পড়লেন। তেমন কিছু না, জ্বর।

ভাইযা বলল, 'এই জ্বরের নাম হচ্ছে বিবহ-জ্বব। বাবার বিবহে কাতর হযে মার জ্বব এসে গেছে। হা-হা-হা।'

মার শবীর খারাপ হওযায় আমার একটা লাভ হয়েছে — আমি এখন রাতে মার ঘরে ঘুমাচ্ছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে বাবা যখন থাকেন না তখনো মা তাব ঘরে একা থাকেন। আমাকে বা আপাকে তাঁব সঙ্গে ঘুমাবাব জন্যে বলেন না। কোন্ ছোটবেলায মাব সঙ্গে ঘুমিয়েছি মনেই নেই। বড় হয়ে ঘুমাতে এসে লক্ষ করলাম, আমাব কেমন জানি লজ্জা লজ্জা লাগছে। একটু সংকোচও লাগছে। যেন আমি অনধিকাব প্রবেশ কবছি। এই ঘবটা মাব একটা জগৎ। এই জগতে আমার বা আমাদের কোনো স্থান নেই। ঘরটা মা এবং বাবার।

মাব সঙ্গে ঘুমানোব প্রাথমিক সংকোচ দ্বিতীয বাতেই কেটে গেল। লক্ষ কবলাম মা এমন ভাবে আমাব সঙ্গে গল্প কবছেন যেন তিনি আমাব একজন বান্ধবী। বাতি নিভিযে গাযে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'মীবা মাঝে মাঝে খুব কান্নাকাটি কবে। কেন কবে তুই জানিস?'

'না।'

'কাঁদে যে সেটা জানিস?'

'জানি।'

'কখনো জিজ্ঞেস কবিস নি?'

'না।'

'জিজ্ঞেস কবা উচিত না?'

'তুমি যদি বল তাহলে জিজ্ঞেস কবব।'

'থাক, জিজ্ঞেস করার দরকাব নেই। বলাব হলে নিজেই বলবে।'

'এই ভেবেই আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নি মা।'

'ভালো করেছিস। আচ্ছা, বঞ্জু কি বিয়ে টিয়ের কথা কিছু ভাবছে?'

'জানি না তো মা।'

'দুলু মেযেটাকে কি ও পছন্দ করে?'

'করে নিশ্চযই, তবে খুব করে বলে মনে হয় না।'

মা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর পছন্দ করলেই বা কী! ওবা তো আব রঞ্জুব সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবে না। ওরা কোথায আব আমরা কোথায। আচ্ছা বেনু, দুলুর বাবা মন্ত্রী হচ্ছে এটা কি সত্যি?'

'জানি না তো। কে বলল তোমাকে?'

'শুনলাম।'

'হতেও পারে। খুব টাকা-পয়সাওযালা মানুষজনই তো মন্ত্রী হয। উনাব তো টাকা-পয়সার অভাব নেই।'

'মন্ত্রী হলে ভালোই হয়।'

'ভালো হবে কেন?'

'উনাকে ধরলে হয়তো তখন রঞ্জুর চাকরির একটা ব্যবস্থা হবে। আমরা প্রতিবেশী, আমাদের একটা কথা কি আর উনি ফেলবেন?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'মন্ত্রীরা কারো কথাই ফেলেন না মা। তাঁদের বিশাল একটা কালো বাক্স আছে — সবার কথাবার্তা তাঁরা ঐ বাক্সে রেখে তালা দিযে দেন। ঐ তালা আর খোলেন না।'

মা হাসতে হাসতে বললেন, 'তুইও দেখি রঞ্জুর মতো হয়ে যাচ্ছিস। মজা করে কথা বলিস। আচ্ছা শোন, রুঞ্জু ঐ দিন আভা নামের কি একটা মেযের কথা বলছিল। ঐ মেয়েটিকে কি তার পছন্দ?'

'জানি না মা। ভাইয়া হচ্ছে এমন এক জাতের ছেলে কাউকেই যাদের খুব অপছন্দও হয় না আবার পছন্দও হয় না। এরা পছন্দ করে শুধু নিজেকে আর কাউকে না।'

মা হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই বুঝলি কী করে?'

আমি বললাম, 'আমি নিজেও অবিকল ভাইয়ার মতো, এই জন্যে বুঝেছি।'

সাত দিনের ভেতব বাবার ফেরার কথা, তিনি ফিরলেন না। তাঁর একটা চিঠি এল। এবাব পোস্টকার্ড না। খামে ভরা চিঠি। বিশেষ কাউকে লেখা না সবার উদ্দেশে লেখা —

"পর সমাচার এই যে সুপারি কিনিতে পাবি নাই। এইবাব সুপারির দব অত্যধিক। ঝড়ে ফলন হয নাই। অধিকাংশ সুপারির গাছ নষ্ট হইযা গিয়াছে। অধিক দামে সুপারি ক্রয করিতে পারি — তাহাতে খুব লাভ হইবে না। কারণ বেনাপোল দিয়া পাটনার সুপারি দেশে আসিতেছে। তা দামেও সস্তা। কাজেই সিদ্ধান্ত নিযাছি খুলনায যাইব, অন্য কোনো ব্যবসার সন্ধান দেখিব। সেখানে মধু সস্তা তবে মধুব তেমন বাজার নাই। প্রচুব বিদেশি মধু দেশে পাওযা যায়। বিশেষ কবিয়া অস্ট্রেলিযার মধু দামেও সস্তা, গুণগত মানও খাবাপ না। যাই হউক, এইসব নিযা তোমরা চিন্তা করিবে না। আমি ভালো আছি। খাওয়াদাওযা খুব সাবধানে করিতেছি। বাহিরের খাদ্য গ্রহণ কবিতেছি না। স্বপাক আহাব কবিতেছি। আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় স্বপাক খাইবার ব্যবস্থা হইযাছে। খুব শীঘ্র তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইতি ....."

মার জ্বর সেরে গেছে। তিনি কাজকর্ম শুরু করেছেন। তবে তাঁকে দেখলে খুব দুর্বল এবং মনমরা মনে হয। তাঁর রাতে ঘুম হয না। যতবার আমি জাগি, দেখি মা একটা হাতপাখা দুলাচ্ছেন। এই ঘরের একটা সিলিং ফ্যান ছিল, সেটা নষ্ট। ঠিক করানো হচ্ছে না কারণ আমরা আবার টাকা-পযসার কষ্টে পড়ে গেছি। ভাইযার শতদল পত্রিকাটা বন্ধ হযে গেছে। এত খাটাখাটনি করে, "ঢাকা শহবের ভ্রাম্যমাণ পাগল" নিয়ে যে লেখাটা সে লিখেছে তা কোথাও ছাপা হয নি। ঘরে পড়ে আছে। ভাইয়া কাজ জুটানোর জন্যে খুব ছোটাছুটি করছে, লাভ হচ্ছে না।

আমি দুলু আপার কাছ থেকে প্রথমে তিনশ পরে দুশ টাকা এনেছি। সেই টাকাও শেষ। চরম দুঃসময়েও আমরা খুব স্বাভাবিক থাকতে পারি, এখন তাই আছি। ভাইয়া আগের মতোই হাসি-তামাশা করছে। সেদিন ভাত খাবার সময় বলল, 'ঢাকা শহরে সবচে' সুখে কারা বাস করে জানিস খুকি? ঢাকা শহবে সবচে' সুখে আছে — ভ্রাম্যমাণ পাগলেব দল।'

'কেন?'

'এদের রোজগার খুব ভালো। যার কাছেই টাকা চায় সেই ভয়ে অস্থির হয়ে টাকা দিয়ে দেয়। পাগল মানুষ, কী করে ঠিক নেই তো। যে কোনো রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ালে রেস্টুরেন্টের মালিক কিছু একটা খাবার হাতে ধরিয়ে দেয় যাতে তাড়াতাড়ি বিদেয় হয়। পুলিশ এদের কিছু বলে না। তাদের আছে পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।'

আপা বলল, 'ভিক্ষা না করে লোকজন পাগল সাজলেই পারে।'

'তা পারে। তবে পাগল সাজা খুব সহজ কাজ না। কঠিন কাজ। বিশ্বাসযোগ্য কবে তোলাব ব্যাপার আছে। পাগল হিসেবে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য কবার প্রথম শর্ত হচ্ছে সব কাপড়চোপড় খুলে ফেলতে হবে যাতে দেখামাত্র লোকজন বুঝতে পারে এ পাগল। ঢাকা শহরের ভ্রাম্যমাণ পাগলদের শতকরা ৭০ ভাগ হল দিগম্বর। বানিযে বলছি না। হিসাব করে বলছি।'

আমি বললাম, 'এর মধ্যে নকল পাগল নেই?'

'আছে। বেশ কয়েকটা নকল পাগল আছে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে পাগলামির অভিনয় করতে করতে অল্পদিনেব মধ্যে এরা পাগল হযে যায। এটা বেশ স্ট্রেঞ্জ একটা ব্যাপার।'

'তুমি দেখি ভাইযা পাগল বিশেষজ্ঞ হযে গেছ।'

'তা হযেছি। বেশ কয়েকটা পাগলের সঙ্গে আমার খাতিবও হয়েছে। শিক্ষা ভবনের সামনে ছালা গায়ে একটা পাগল বসে থাকে, আমাকে দেখলেই দৌড়ে এসে হাত ধবে টানতে টানতে চাযেব দোকানে নিযে যাবে। চা খাওযাবে। সিগারেট খাওযাবে।'

'আসল পাগল না নকল?'

'ওযান হানড্রেড পারসেন্ট খাঁটি পাগল। এব বাবা এডভোকেট, ভাইবোন আছে। এক বোন গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের ম্যানেজার।'

'এইসব জানলে কোথে কে? পাগল তোমাকে বলেছে?'

'আরে না। পাগল কোনো কথা বলে না। খালি হাসে। এর নাম আমি দিয়েছি হাস্যমুখী। এইসব তথ্য আমি জেনেছি যেখানে চা খাই সেই দোকানেব মালিকের কাছ থেকে। পাগলের বাবা ঐ দোকানে খাতা খুলে দিযেছে। ছেলে যত কাপ চা খায হিসাব থাকে। মাসেব শেষে টাকা দিযে যান।'

আমি বললাম, 'ওদেব সঙ্গে এত ঘোবাঘুরি কোবো না তো ভাইযা। শেষে তুমি নিজেও পাগল হযে যাবে।'

'পাগল হই নি তোকে বলল কে? গভীব বাতে তোরা সবাই যখন ঘুমিযে পড়িস তখন হা-হা করে আমি পাগলের মতো হাসি।'

আমি বললাম, 'পাগলবা হা-হা করে হাসে না।'

ভাইযা অবাক হয়ে বলল, 'দ্যাটস কারেক্ট। পাগলবা আসলেই হা-হা করে হাসে না। অথচ আমরা কথায কথায বলি, পাগলের মতো হা-হা করে হাসছে। ওরা চিৎকার করে কাঁদেও না। আমার ধাবণা কি জানিস, যে মানুষ যত সুস্থ সে তত শব্দ কবে হাসে এবং কাঁদে।'

আমি বললাম, 'অন্য কোনো আলাপ কর তো ভাইযা। এই প্রসঙ্গ আমাব ভালো লাগছে না। প্রসঙ্গ পাল্টাও।'

'পাল্টাচ্ছি। তুই কি তোব দুলুনী আপাব কাছে থেকে আমাকে তিনশ টাকা এনে দিতে পারবি?'

'পারব।'

'আমার কথা বলবি না।'

'তোমার কথা বললে অসুবিধা কী?

'অসুবিধা আছে। তুই বলবি তোর নিজের দরকার।'

আমি টাকা আনতে গেলাম। কার দরকার কিছুই বলতে হল না। দুলু আপা ড্রয়ার থেকে টাকা বের করতে করতে বললেন, 'রেনু তোদের কি খুব অসুবিধা যাচ্ছে?'

আমি বললাম, 'হুঁ। তবে সাময়িক। বাবার একটা বড় বিল আটকে আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে।'

'ও আচ্ছা।'

'ভাইয়া যদি একটু সংসারী হত তাহলে কোনো সমস্যাই হত না। সে একবার বিদেশি কোম্পানির চাকবির অফার পেয়েছিল। বেতন শুনে তুমি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।'

'কত বেতন?'

'কুড়ি। টুয়েন্টি থাউজেন্ড।'

'বলিস কী?'

'ভাইযা রাজি হল না। বলে দূর দূর — ।'

'দূর দূর বলল কেন?'

'জাহাজের চাকরি তো। জাহাজে জাহাজে থাকতে হয়। ভাইয়ার পছন্দ না।'

দুলু আপা মৃদুস্বরে বললেন, 'জাহাজের চাকবি তো খুব ইন্টাবেস্টিং হওযার কথা। সব সময় পানির উপর থাকা। চাকবিটা নিলেই পারত।'

'আমরা অনেক বুঝিয়েছি। ভাইয়া রাজি হয নি।'

কথাবার্তা চালিয়ে যেতে আমাব অস্বস্তি লাগছে। যা বলছি সবই মিথ্যা। কে ভাইযাকে কুড়ি হাজার টাকার চাকরি দেবে? টাকা তো এত সস্তা এখনো হয নি।

মিথ্যা কথা বলার আমাব এই বিশ্রী স্বভাবটাব কথা কি আপনাকে বলেছি? বলেছি বোধ হয়। মিথ্যা বলতে আমার খুব যে ভালো লাগে তা না তবু হঠাৎ হঠাৎ বলতে হয। দুলু আপার সঙ্গে যখন মিথ্যা বলি তখন সত্যি খুব খাবাপ লাগে।

এই যেমন এখন লাগছে। ইচ্ছা করছে তাঁব হাত ধবে বলি — আপা যা বলেছি সব কিছু মিথ্যা। কিছু মনে কোরো না।

দুলু আপা বলল, 'বাদামের শরবত খাবি?'

'বাদামের আবার শরবত হয় নাকি?'

'হয়। পেস্তা বাদাম হামান দিস্তায পিষে শরবত বানায়।'

'সেই সব শরবত তো পালোয়ানরা খায বলে জানি।'

'খেয়ে দেখ্, খেতে খুব ভালো।'

'না আপা শরবত খাব না। এখন যাব।'

দুলু আপা অন্যমনস্ক গলায বলল, 'আচ্ছা শোন, তোর ভাইযা মাঝে মাঝে গভীর রাতে এমন হা-হা কবে হাসে কেন?'

'জানি না কেন? মনে হয় পাগল হওয়ার চেষ্টা করছে।'

দুলু আপা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শান্ত স্বরে বললেন, 'পাগল হবাব চেষ্টা করছে মানে?'

'ঠাট্টা করছি আপা।'

'না, তুই ঠাট্টা করছিস না — ব্যাপারটা কী বল তো?'

'ব্যাপার কিছু না। ভাইয়া পাগলদের উপর গবেষণা করছে তো। কাজেই মাঝে মাঝে পাগলের মতো আচরণ করে। হা-হা করে হাসে। তবে আপা হা-হা করে হাসি কিন্তু পাগলের লক্ষণ না। পাগলেরা হা-হা করে হাসতে পারে না।'

'কে বলল?'

'ভাইয়া বলেছে।'

দুলু আপা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন — 'ঐ দিন তোর ভাইযাকে রাস্তায় দেখলাম। সঙ্গে রোগামতো একটি মেয়ে। দুজন খুব হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করছে। ঐ মেযেটা কে?'

'খুব সম্ভব আভা। সেও একজন পাগল বিশেষজ্ঞ। ওরা দুজন মিলে পাগল খুঁজে বেড়ায়।'

'কী যে কথা তুই বলিস না রেনু। তুই কি সব সময এমন বানিযে বানিযে কথা বলিস?'

আমি কিছু বললাম না। ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলাম। এমন হাসি যাব অনেক রকম অর্থ হতে পারে। দুলু আপা বললেন, তোবা তিন ভাইবোন সম্পূর্ণ তিন বকম। কারোব সঙ্গে কাবোব মিল নেই।'

'উঠি আপা?'

'না না বোস। আবেকটু বোস। পা উঠিযে আবাম কবে বোস। তুই এসেই শুধু যাই যাই কবিস কেন?'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আজ আব যাব না। থাকব তোমাব এখানে। বাতে ঘুমাব।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'তাহলে আয ছাদে পাটি পেতে সাবাবাত কাটিযে দি। বৃষ্টির মধ্যে পাটি পেতে শুযে দেখেছিস? দারুণ ইন্টারেস্টিং। শুধু বাতাস যখন বয তখন খুব ঠাণ্ডা লাগে।'

আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'তুমি কিন্তু আপা এক জন গ শ্রেণীর পাগল।'

'গ শ্রেণীব পাগল মানে?'

'তিন ক্যাটাগবিব পাগল আছে। ক, খ ও গ। তুমি গ ক্যাটাগবি।'

'কী সব উদ্ভট তোব কথাবার্তা। অন্য গল্প কব।'

'অন্য কী গল্প?'

'ঐ মেযেটিব কথা বল।'

'কোন মেযেটিব কথা?'

'আভা।'

'আভাব কথা কী বলব?'

'যা জানিস সব বলবি।'

'আমি কিছুই জানি না। ঐ মেযেটিকে কখনো দেখি নি।'

'সে কী?'

'সত্যি দেখি নি। এ বাড়িতে কখনো আসে নি।'

দুলু আপা আগ্রহ নিযে বললেন, 'এলে তুই কি আমাকে খবব দিবি?'

'হু দেব।'

'অনেস্ট!'

'অনেস্ট।'

আভার সঙ্গে দেখা হল পরদিন। দুপুরবেলা দরজা খটখট করছে। আমি দরজা খুলতেই রোগামতো মেয়েটি বলল, 'রেনু ভালো আছ?' শুরুতেই মেয়েটা আমাকে খানিকটা হকচকিয়ে দিল। হয়তো ইচ্ছা করেই দিল। মানুষকে হকচকিয়ে দিতে সবাই পছন্দ করে। আমি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললাম, 'আমি ভালো আছি।'

'তুমি কি আমাকে চেন?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'না।' যদিও আমি তাঁকে খুব ভালো করেই চিনেছি। রোদে ঘুরে মুখ লাল টকটকে হয়ে আছে। মাথার চুল উড়ছে। কপালে বিন্দু বিন্দ ঘাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণার্ত মানুষের ঠোঁট শুকিয়ে থাকে।

'রঞ্জু কি ঘরে আছে?'

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এই মেয়ে ভাইয়ার চেয়ে খুব কম করে হলেও চার-পাঁচ বছরের ছোট। অথচ কত অবলীলায় বলছে, রঞ্জু কি ঘরে আছে?

আমি শুকনো গলায় বললাম, 'না।'

'আমাকে একটা জিনিস দেবার কথা। তোমাকে কিছু বলে যায় নি?'

'না তো।'

'আমি খানিকক্ষণ বসি?'

'বসুন।'

আমি তাঁকে ভাইয়ার ঘরে নিয়ে গেলাম। আভা বিছানায় বসতে বসতে বলল, 'তুমি আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াও। ঠাণ্ডা পানি। তোমাদের বাসায় কি ফ্রিজ আছে?'

'না, ফ্রিজ নেই।'

'দুলুদের বাসায় নিশ্চয়ই আছে। ওদের কাছ থেকে ঠাণ্ডা এক বোতল পানি এনে দেবে? তৃষ্ণায় আমার সমস্ত শরীর শুকিয়ে গেছে। খুব ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছে করছে।'

আমি পানি আনতে গেলাম। এক সঙ্গে দুটি কাজ হবে। দুলু আপাকেও বলা হবে — আভা এসেছে। আভার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কথা বলতে পারবেন।

দুলু আপা বাসায় ছিলেন না। তাঁর নানুর বাড়ি গিয়েছেন। সন্ধ্যায় আগে ফিরবেন না। আমি পানির বোতল নিয়ে ফিরে এসে দেখি ভাইয়ার টেবিল থেকে একটা পেপারওয়েট নিয়ে আভা তার স্যান্ডেলে কী যেন ঠুকঠাক করছে। আমাকে দেখে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল — 'পেরেকে উঁচু হয়ে আছে। পা কেটে রক্তারক্তি। আজকাল কোনো স্যান্ডেলে পেরেক থাকে না। গাম দিয়ে জোড়া লাগানো হয়। আমার ভাগে কী করে যেন পড়ল পেরেক লাগানো স্যান্ডেল।'

'নিন, পানি নিন।'

'টেবিলের উপর রাখ। তোমাদের বাসায় লোকজন নেই? খালি খালি লাগছে।'

'না। আমি একাই আছি।'

'বাকিরা কোথায়?'

'এক বিয়েতে গেছেন?'

'কার বিয়ে?'

আমি নিতান্তই বিরক্তি বোধ করছি। কার বিয়ে তা দিয়ে উনার প্রয়োজনটা কী? আমি বললাম, 'যার বিয়ে তাকে আপনি চিনবেন না।'

'আমি তোমাদের সব আত্মীয়স্বজনকে চিনি। রঞ্জু আমাকে বলেছে।'

'বললাম তো তাকে আপনি চিনবেন না। সে আমাদের কোনো আত্মীয় নয় — আপার বান্ধবী। আপা একা কোথাও যায় না বলেই মাকে নিয়ে গেছে।'

আভা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'মীরার বান্ধবী? ইয়াসমিনের কথা বলছ? যার এক ভাই জাপান এম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি?'

আমি শুকনো গলায় বললাম, 'হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'রঞ্জু আর আমি কিছুদিন দীর্ঘ সময় এক সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছি — তখন কথা হয়েছে। আমি বললাম না — তোমাদের সব কথা জানি। তুমি তো আমার কথা বিশ্বাস কর নি।'

'এখন করছি। আপনি কিন্তু পানি খান নি।'

'খাব। আচ্ছা শোন রেনু, তুমি কি আমাকে বিসকিট বা এই জাতীয় কিছু দিতে পারবে? ঘরে আছে? সারাদিন কিছু খাই নি তো। সেই ভোর সাতটায় দুকাপ চা আর একটা টোস্ট বিসকিট খেয়েছি। এখন বাজে দুটা। সাত ঘণ্টা। খালি পেটে চা খেলে কি হবে জান? হড়হড় করে সব বমি হয়ে যাবে।'

'আপনি কি ভাত খাবেন? আমি এখনো খাই নি, আমার সঙ্গে খেতে পারেন।'

'তোমার কম পড়বে না তো আবার?'

'না কম পড়বে না। তবে খাওয়ার তেমন কিছু নেই।'

আভা হাসতে হাসতে বলল, 'কিচ্ছু লাগবে না। তুমি বোধ হয় জান না আমি শুধু ভাত খেতে পারি। খুব গরম ভাত লবণ ছিটিয়ে খেযে দেখো, ইন্টারেস্টিং লাগে। ভাতেব আসল স্বাদ পাওযা যায়। তবকারি দিযে খেলে ভাতের আসল স্বাদ পাওযা যায না।'

'আপনি কি হাত মুখ ধুবেন?'

'হ্যাঁ ধোব। তুমি যদি র'গ না কর তাহলে আমাকে একটা শাড়ি দাও। গোসল করে ফেলি। ঘামে সাবা শবীর চটচট করছে। গা না ধুযে কিছু খেতে পারব না। আমাব কথাবার্তায তুমি বাগ কবছ না তো?'

'না বাগ করছি না।'

'রাগী-বাগী চোখে তাকিযে আছ কিন্তু।'

'আমাব চোখগুলোই ও বকম।'

'তোমাব চোখ খুব সুন্দব। আমি মন-বাখা কথা বলি না। সত্যি কথা তোমাকে বললাম।'

নিতান্তই অপরিচিত একটা বাসায কোনো মেযে এত সহজ স্বাভাবিক আচবণ কবতে পারে তা আমার ধাবণার বাইরে ছিল। খুব বোকা ধবনেব মেযেরা হযতো করলেও করতে পাবে। কিন্তু আভা বোকা নয। চালাক মেযে।

সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গোসল সারল। চিরুনি দিযে আযনার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল — 'এই বুঝি তোমাদের সেই একের ভেতর দুই আয়না? বা সুন্দর তো!'

খেতে বসতে বসতে আমাদের তিনটা বেজে গেল।

আভা খেতে পারল না। অল্প চারটা ভাত মুখে দিযেই বলল, 'রেনু, আমি খেতে পারছি না। আমার জ্বর আসছে।'

কেউ জ্বর আসছে বললে হাত বাড়িযে তার গাযেব উত্তাপ পবীক্ষা করা ভদ্রতা। আমাব তা করতে ইচ্ছা কবল না। আমি চুপ করে রইলাম। আভা থালা সবিয়ে উঠে পড়ল।

'রেনু, আমি কিছুক্ষণ শুযে থাকি?'

'থাকুন।'

'খাওয়া শেষ হলে তুমি আমার গায়ে একটা চাদর-টাদর কিছু দিয়ে দিও তো। খুব শীত লাগছে।'

'ঘরে প্যারাসিটামল আছে। খাবেন?'

'না। আমি ট্যাবলেট খেতে পারি না। বমি হয়ে যায়।'

আমি খাওয়া শেষ করে থালা বাসন গুছিয়ে ভাইয়ার ঘরে গিয়ে দেখি — আভা তার পুরানো কাপড়গুলো পরে চুপচাপ বসে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, 'বাসায় চলে যাব রেনু। জ্বর খুব বাড়বে। আমার মনে হয় এখনি বেড়েছে। দেখ, গায়ে হাত দিয়ে দেখ।'

এরপর জ্বর না দেখলে খারাপ দেখায়। আমি গায়ে হাত দিয়ে রীতিমতো চমকে উঠলাম। গা পুড়ে যাচ্ছে। এতটা জ্বর নিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কেউ কথা বলছে কী করে কে জানে।

'আপা আপনি শুয়ে থাকুন।'

'পাগল! এখন শুয়ে থাকা যাবে না। শোন রেনু, আমাকে রিকশা ভাড়া দিতে পারবে? এই অবস্থায় হেঁটে যাওয়া সম্ভব না। আমি এসেছিলাম কী জন্যে জান? টাকা ধাব কবতে। রঞ্জুকে বলেছিলাম শ তিনেক টাকা জোগাড় করে রাখতে। যার সঙ্গেই আমাব সামান্য পরিচয় হয় তার কাছেই আমি টাকা ধার চাই। কী বিশ্রী অবস্থা। আমি ভেবেছিলাম বঞ্জুর কাছে কোনোদিন ধার চাইব না। মানুষ যা ভাবে তা করতে পারে না।'

'ভাইয়া সম্ভবত আপনার জন্য টাকার ব্যবস্থা করেছে।'

'বলেছিল করবে। তোমাকে দিয়ে দুলুর কাছ থেকে আনবে। এই দেখ, তোমাদেব সব কথা আমি জানি। রেনু, আমাকে রিকশা ভাড়া দাও। আমি চলে যাই। আর শোন, এই কাগজে আমার বাসার ঠিকানা লিখে দিলাম — রঞ্জুকে দেবে।'

'ভাইযা তো আপনার বাসা চেনে।'

'এই বাসাটা চেনে না। আমরা বেশি দিন এক বাসায় থাকি না। ভাড়া জমে যায়, তারপর বাসা বদলাই।'

আভা হেসে ফেলল যেন খুব মজার কোনো কথা।

আমার কাছে একটা দশ টাকার নোট ছিল। আগামীকাল কলেজে যাবাব ভাড়া। নোটটা এনে দিলাম।

আভা বলল, 'রেনু যাই। রঞ্জুকে কাগজটা দিও।'

দুঃখের ব্যাপার কি জানেন? ভাইয়াকে আমি কাগজটা দিতে পারলাম না। টেবিলেব উপর বই-চাপা দিয়ে রেখেছিলাম — ভাইযা বাসায ফিরলে কাগজটা পেলাম না। পুরো টেবিল দু তিনবার খোঁজা হল। কাগজ পাওয়া গেল না। ভাইযা বলল, 'বাদ দে। আভাই আসবে। আমার সমস্যা আছে। আমি ঠিকানা খুঁজে বেব করতে পাবি না। ঠিকানা থাকা না থাকা আমার কাছে একই।'

'এত জ্বর নিয়ে গেল তুমি তাকে দেখতে যাবে না?'

'ঠিকানা নাই, যাব কী করে? টাকাটা খামে ভরে তোর কাছে দিয়ে দিচ্ছি। এর পর যখন আভা আসবে তাকে দিয়ে দিবি। ও কালই আসবে।'

'উনি কাল আসবেন না। তুমি যদি না যাও উনি আসবেন না।'

'কে বলল তোকে?'

'আমি জানি।'

'তোদের বয়েসী মেয়েদের সবচে' বড় সমস্যা কি জানিস? তোদের বয়েসী মেয়েরা মনে করে তারা পৃথিবীর সব কিছুই জানে। আসলে কিছুই জানে না। আভা কালই আসবে। দশ টাকা বাজি।'

আভা এল না। এক মাস পার হয়ে গেল — তারপরেও না। ভাইয়া পুরানো বাড়িওয়ালার কাছে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। সে রেগে ভূত হয়ে আছে। ভাইয়াকে এই মারে তো সেই মারে অবস্থা।

'এই মেয়ে কি আপনার আত্মীয়? স্ট্রেট জবাব দেন। ভয়ংকর মেয়ে — রাত আটটার সময় আমাকে বলল, চাচা কাল দুপুর বারটার মধ্যে চার মাসের ভাড়া দিয়ে দেব। খুব লজ্জিত, এত দেরি করলাম। বেশ কিছু টাকা পেয়েছি। চেক। ব্যাংকে জমা দিয়েছি। কাল ক্যাশ হবে। প্রথম টাকাটা তুলেই আপনাকে দেব।

আমি বললাম, ভালো কথা। তারপর মেয়েকে চা-টা খাওয়ালাম। সে হাসিমুখে খাওয়াদাওয়া করল। আমার ছেলে ভিডিও ক্লাব থেকে উত্তম-সুচিত্রার পুরানো বাংলা ছবি এনেছে। মেয়ে বলল, ছবিটা এখন দিও না। একটু পরে দাও। আমিও দেখব।

আমার ছেলে বলল, আচ্ছা। তারপর মেয়ে করল কি সবাইকে নিয়ে বেবিট্যাক্সি করে বিদায়। ঘরবাড়ি খা-খা করছে। বিছানা বালিশ সব আগেই সরিয়েছে। একটা একটা করে সরিয়েছে। কিছু টের পাই নাই।

অনেক মেয়ে দেখেছি জীবনে। এমন মেয়ে কিন্তু দেখি নাই। এখন আপনি বলেন — তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী।'

'কোনো সম্পর্ক নেই।'

'সম্পর্ক নেই বললে তো হবে না। আপনি জোয়ান ছেলে আর সেও সুন্দরী মেয়ে। সম্পর্ক আছেই — তবে সাবধান করে দিচ্ছি। চার নম্বর দূরবর্তী বিপদ সংকেত। যত দূরে থাকবেন — তত ভালো থাকবেন। বৃদ্ধ মানুষের এই উপদেশ মনে রাখবেন।'

৪

দেড়মাস পার হল বাবা ফিরলেন না। এর আগে কখনো এতদিন বাইরে থাকেন নি। পনের দিন আগে মানি অর্ডারে তেরশ টাকা পাঠিয়েছেন। কুপনে গুড়ি-গুড়ি অক্ষরে লেখা—

"পর সমাচার, আমি ভালো আছি। দেশের সামগ্রিক অবস্থা খারাপ। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যও খারাপ। কী করিব বুঝিতে পারিতেছি না। জ্বর-জ্বারিতে কিঞ্চিৎ কাবু হইয়াছি। তবে বর্তমানে সুস্থ। খাওয়াদাওয়া নিয়মিত করিতেছি। শিগ্‌গিরই আসিতেছি।'

কুপনের লেখা দেখে আমরা খুব চিন্তিত বোধ করলাম। কারণ কুপনের লেখাটা বাবার হাতের না। অন্য কেউ লিখে দিয়েছে। এরকম কখনো হয় না। মা বললেন, 'কে লিখে দিল রে।'

ভাইয়া বলল — 'অশনি সংকেত।'

মা বললেন, 'অশনি সংকেত কী?'

'মেয়েছেলের হাতের লেখা বলে মনে হচ্ছে।'

ভাইয়ার এই রসিকতা মাঠে মারা গেল। মা খানিকক্ষণ কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে — দ্রুত চলে গেলেন।

ভাইয়া হো–হো করে খানিকক্ষণ হাসল। আমরা কেউ ভাইয়ার হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। আপা বিরক্ত হয়ে ধমক দিল। — 'চুপ কর তো ভাইয়া।'

রাতে মার সঙ্গে ঘুমাচ্ছি। মা বললেন, 'মানি অর্ডারের লেখাটা কি মেয়ের হাতের?'

আমি বললাম, 'মেয়ের হাতের লেখা আবার কী? মেয়েদের কি কোনো আলাদা লেখা হয়? ছেলেরা যেমন লেখে মেয়েরাও তেমনই লেখে।' মা শুকনো ভাবে বললেন, 'ও।'

'তুমি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাব নাকি মা?'

'না ভাবি না।'

'বাবা কয়েক দিনের মধ্যেই চলে আসবেন। তোমার মন থেকে তখন সব দুশ্চিন্তা দূর হবে। বাবাকে আটকে রেখ। তাকে আর বাইরে বেরুতে দিও না।'

'ও বেশি দিন ঘরে থাকতে পারে না।'

'এইবার কঠিন শাসনে বেঁধে রাখবে। দরকাব হলে তালা বন্ধ করে বাখবে। পারবে না?'

মা চুপ করে রইলেন।

আমি মার গায়ে হাত বেখে বললাম, 'আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর বাবা ফিরে আসবে মা। আটচল্লিশ ঘণ্টা।'

মা শুকনো গলায় বললেন, 'ফিরে এলে তো ভালোই।'

বাবা ফিরে এলেন না। আরো পনের দিন কেটে গেল। মার দিকে তাকিযে আমরা এমন ভাব করতে লাগলাম যেন এটা কিছুই না। বাবার দীর্ঘদিন না ফেবাটা যেন খুব স্বাভাবিক।

লেখকরা নাকি অনেক কিছু বুঝতে পারেন?

আপনি কি পারেন? আপনি কি আমাকে দেখে বলতে পারবেন আমি সুখে আছি না কষ্টে আছি? আমার কিন্তু মনে হয় না। এখন যদি আমি আপনাকে আমাদের বাসায নিযে যাই আপনি ভাববেন — বাহ সুখী পরিবার তো! হাসহাসি গল্পগুজব হচ্ছে। কে বলবে আমাদের কোনো সমস্যা আছে? ভাইয়া এক জাপানি শেখার স্কুলে ভর্তি হযেছে। নিযমিত ক্লাস করছে। জাপানি ভাষা যা শিখে আসছে — আমাদেরও শেখাচ্ছে। যেমন : আজ গবম — কিয়োও ওয়া আৎসুই দেসু। গতকালও গরম ছিল : কিনোও মো আৎসুকাওযা দেসু। অনেক দিন পর আপনাকে দেখতে পাচ্ছি : ইয়াআ শিবারাকু।

ভাইয়া যা শিখে আসছে আমিও সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে সব শিখে নিচ্ছি। খাবার টেবিলে দুজন গম্ভীর ভঙ্গিতে জাপানিতে কথা বলি। অথচ আড়াই মাস হযে গেল — বাবার খোঁজ নেই, তিনি কোথায় আছেন কিছুই জানি না। দুপুরবেলা আমরা সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকি — কারণ ঠিক দুপুরে পিওন আসে। পিওন আসে এবং চলে যায। চিঠি আসে না। আমাদের উৎকণ্ঠা কাটে না। হযতো টেলিগ্রাম আসবে। টেলিগ্রাম পিওন তো যে কোনো সময় আসতে পারে।

আমরা সবাই যে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা এবং অনিশ্চয়তায বাস করছি তা এক জন অন্য জনকে বুঝতে দেই না। সংসার একেবারে অচল অবস্থায় এসে ঠেকেছে। ঠিকা–ঝি নেই। ঘরের যাবতীয কাজকর্ম মা এবং আপা করছেন। আপাই বেশি করছে। মার শবীর ভেঙে পড়েছে। তিনি তেমন কিছু করতে পারেন না। বেশিরভাগ সময় বারান্দায় বসে থাকেন।

সংসার এখনো কী করে চলছে আমি জানি না। দুবেলা রান্না হচ্ছে তা দেখছি। দুঃসময়ের জন্য মার নানা রকম গোপন সঞ্চয় আছে। একে একে সেইসব সঞ্চয় ব্যবহৃত হচ্ছে। তাও নিশ্চয়ই শেষের দিকে। গত সপ্তাহে প্রথমবারের মতো কলেজে যাবাব আগে আগে মা বললেন, 'বাদ দে, কলেজে যেতে হবে না।'

আমি বললাম, 'কেন যেতে হবে না মা?'

মা চুপ করে রইলেন।

'রিকশা ভাড়া দিতে পারবে না — তাই না?'

'হুঁ।'

'হেঁটে যাব। তোমাকে রিকশা ভাড়া দিতে হবে না।'

বাসা থেকে বই খাতা নিয়ে আমি বের হই — বেশিরভাগ দিনই কলেজে যাই না। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটি। কেন হাঁটি বলুন তো? হ্যাঁ, ঠিক ধবেছেন আমি বাবাকে খুঁজি। প্রতিদিনই মনে হয আজ হয়তো পাব। হঠাৎ দেখব রাস্তার মোড়ে কোনো চাযেব দোকানে বসে বাবা চা খাচ্ছেন — হাতে খববেব কাগজ। বাবাকে দেখে প্রচণ্ড চিৎকাব দিতে গিযেও আমি দিলাম না। নিজেকে সামলে নিযে চুপিচুপি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। কানেব কাছে মুখ নিযে নিচু গলায গানের মতো সুরে বললাম, 'বাবা!'

তিনি চমকে তাকালেন। অবাক হযে বললেন, 'আরে খুকি, তুই এখানে কোথেকে?'

আমি বললাম, 'আগে বল তুমি এখানে কী কবছ?'

'চা খাচ্ছি।'

'আমবা চিন্তায মরে যাচ্ছি, আব তুমি আবাম করে চা খাচ্ছ?'

'চিন্তায মরে যাচ্ছিস কেন?'

'আনাতা মো ইশশোনি ইকিমাসেন কা!'

'ইকড়ি মিকিড়ি কবছিস কেন?'

'ইকড়ি মিকিড়ি না এটা হচ্ছে জাপানি ভাষা।'

'জাপানি বলছিস কেন?'

'বাসাব সিস্টেম বদলে গেছে বাবা। বাসায কথাবার্তা সব হয জাপানিতে।'

'বলিস কী?'

'তোমাকেও জাপানি শিখতে হবে নযতো কথাবার্তা বলতে পাববে না।'

'এতো আরেক যন্ত্রণা হল দেখি।'

বাবাব সঙ্গে দেখা হলে প্রথম কথা কী বলব তা ভেবে ভেবে পথ হাঁটতে ভালো লাগে। বাসায ফিরি ক্লান্ত হযে কিন্তু এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে। মনে হয বাসায পা দিযেই দেখব -- বাবা এসেছেন। চুলে কলপ দিযে যুবক সাজার হাস্যকর প্রচেষ্টা যথাবীতি কবেছেন। দাঁতও ওযাশ কবা হযেছে। মাব জন্যে অতি বদবঙা শাড়িও আনা হয়েছে। বাবান্দাব মোড়ায বসে পা দোলাতে দোলাতে চা খাচ্ছেন — কাছেই বাজারেব ব্যাগ। চা শেষ করে চলে যাবেন মাছেব মাথা কিনতে। সবচে' পচা মাথাটা কিনে হাসিমুখে ফিববেন। রান্নাব সময মার পাশে বসে ডিরেকশন দেবেন — 'দুটা কাঁচা মরিচ ছেড়ে দাও তো। আর এক চিমটি পাঁচ ফোড়ন।'

তিন মাস পাব হবাব পর আমরা পত্রিকায বিজ্ঞাপন দিলাম। ছবিসহ বিজ্ঞাপন। ভাইযা থানায় গিযে জিডি এন্ট্রি করাল। ওসি সাহেব বললেন, 'উনার কি কোনো শত্রু আছে?'

ভাইযা দুঃখিত গলায বলল, 'শত্রু থাকবে কেন?'

ওসি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'মহাপুরুষদেরও তো শত্রু থাকে ভাই। গান্ধিজীকেও আততায়ীর হাতে মরতে হয়েছিল।'

'মৃত্যুর কথা বলছেন কেন?'

'কথার কথা বলছি। তবু পসিবিলিটি কিছু থাকেই। আপনি বলছেন ব্যবসায়ের কারণে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় — ধরুন কোনো হোটেলে হার্ট এ্যাটাক হল। কেউ জানে না এই লোক কে? তখন এক দিন অপেক্ষা করে সাধারণত মাটি দিয়ে দেয়।'

'বলেন কী?'

'আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ কখনো পকেটে ঠিকানা নিয়ে ঘোরে না। আপনি দিন সাতেক পরে আসুন। এ জাতীয় কেস থানায় রিপোর্টেড হয়। খবর বের করে রাখব। ঘাবড়াবেন না।'

'ঘাবড়াচ্ছি না।'

শুধু ভাইয়া না, আমরা কেউ ঘাবড়াচ্ছি না। অন্তত আমাদের দেখে কেউ বলবে না আমরা ভেঙে পড়েছি। শুধু একটু বেশি হাসাহাসি করছি। আগেব চেয়ে শব্দ করে কথা বলছি। রাত একটা দুটা পর্যন্ত জেগে বসে থাকছি। দরজায় কড়া নাড়াব শব্দ হলে এক সঙ্গে দুতিন জন ছুটে যাচ্ছি।

আমার ধারণা ছিল, পত্রিকায় ছবি বের হবার পর অনেকেই আমাদেব বাসায় আসবে। বাবার বন্ধুরা যাঁরা তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করেন। যাদেব সঙ্গে কর্মসূত্রে তাঁব ঘনিষ্ঠতা হযেছে। আশ্চর্য! কেউ এল না। তাহলে ব্যাপার কি এই দাঁড়াচ্ছে যে তাঁর কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না? মিত্রহীন একজন মানুষ এই শহরে দীর্ঘদিন ঘুবে বেড়িযেছে?

সুলায়মান চাচা একদিন বললেন, 'রেনু তোর বাবার একটি ছবি আমাকে দিস তো?'

'ছবি দিয়ে কী হবে চাচা?'

'চকবাজাবে যাব। ছোট ব্যবসাযীবা সবাই কোনো না কোনোভাবে চকবাজারেব সঙ্গে যুক্ত। ওদের ছবি দেখালে চিনতে পাবে।'

'আমাকে সঙ্গে নেবেন চাচা?'

'আচ্ছা নেব। শরীরটা একটু ঠিক হোক তাবপরই .....'

সুলাযমান চাচার শরীর খুবই খারাপ করেছে। বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে যাওযাও নিষিদ্ধ। সেবার জন্যে তাঁর তিন মেয়েই এসেছিল। তাদের তিনি হাঁকিয়ে দিয়েছেন। ভাইযাকে বলেছেন, 'এরা স্বামীর পরামর্শে আমাকে খুন কববে। মুখে বালিশ চেপে ধরবে। তিন জন এক সঙ্গে বালিশ চেপে ধরলে আর দেখতে হবে না।'

ভাইয়া বলল, 'চাচা আপনার নিজের মেয়ে। এসব কী বলছেন?'

সুলায়মান চাচা বললেন, 'এরা এখন আর মেযে না — এরা স্বামীর হাতেব রোবট। স্বামীরা বোতাম টিপে এদের কন্ট্রোল করছে। হাসতে বললে হাসে, কাঁদতে বললে কাঁদে। এখন ওরা হাঁ করে বসে আছে — কখন মরব। বোজ খোঁজ নিতে আসে অবস্থা কী? আব কত দেরি।'

ভাইয়া বলল, 'উনারা ভালো মনেই আসেন।'

'মোটেই ভালো মনে আসে না। আমি মুখ দেখেই বুঝতে পারি। ওবা যখন দেখে আমার শরীর একটু ভালো তখন মুখ লম্বা করে ফেলে। সে একটা দেখার মতো দৃশ্য। তবে ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে — এমন প্যাঁচ দেব — বুঝবে ঠ্যালা।'

'কী ঠ্যালা?'

'মেজো মেয়েকে সব জমিজমা দানপত্র করে যাব। ঐ মেয়েটাই সবচে' বদ। তখন খেলা জমে যাবে। বাকি দুই জন তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। সম্পত্তি নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু

হবে। তিন জামাই যে 'থ্রি কমরেডস' হয়েছে কমরেডশিপ বের হয়ে যাবে। শুরু হবে সাপে নেউলে — হা-হা-হা।'

'প্ল্যান খারাপ না চাচা।'

'অনেক চিন্তাভাবনা করে প্ল্যান বের করা। প্ল্যান খাবাপ হবে কেন? তোর বাবাব সন্ধান বের করার জন্যেও প্ল্যান করছি। সারাদিন তো বাসায় শুয়েই থাকি। শুয়ে শুয়ে ভাবি।'

'পেয়েছেন কিছু?'

'এখনো কংক্রিট কিছু পাই নি। তবে সব বকম চেষ্টা চালাতে হবে। ভৌতিক, আধিভৌতিক। দরকাব হলে জিনের সাহায্য নিতে হবে। ছোটবেলায় দেখেছি কেউ হাবিয়ে গেলে জিন নামানো হত।'

আমি হেসে ফেললাম। সুলায়মান চাচা বিবক্ত গলায় বললেন, 'এই মেয়ে হাসে কেন? জগতে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার হয়। বুঝলি মেয়ে — সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিতে নাই। জিন, পরী সবই আছে।...'

আমি বললাম, 'একবাব জিন নিয়ে আসুন চাচা। আমাব জিন দেখাব খুব শখ।'

'দেখি পাওয়া যায় কিনা। এই লাইনে ওস্তাদ লোকজন পাওয়াই মুশকিল। চর্চা নাই। দু এক জনকে বলেছি — ওবা চেষ্টা চবিত্র কবছে।'

আমবা উঠে আসাব আগে সুলায়মান চাচা নিচু গলায় বললেন, 'বঞ্জু শোন, টাকা-পয়সা লাগবে?'

ভাইযা বলল, 'না।'

'চালাচ্ছ কীভাবে?'

'চালাচ্ছি না। চাকা আপনা-আপনি ঘুবছে।'

'কবছ কিছু?'

'বাংলা বাজাবে বইয়েব প্রুফ দেখছি। নতুন একটা পত্রিকা বেব হয়েছে তাব সঙ্গেও আছি। দুহাজাব করে দিবে বলছে — দেখি।'

'চাকবি-বাকরির চেষ্টা কিছু করছ না?'

'না।'

'না — কেন?'

'কোনো লাভ নেই — খামাখা পবিশ্রম।'

'ব্যাবিস্টাব সাহেবকে বলে দেখলে হয় না? উনাব সঙ্গে তো তোমার খুব খাতিব। খাতির আছে না এখনো?'

'আছে।'

'তাহলে বল উনাকে।'

'বলব, আগে মন্ত্রী হোক। শোনা যাচ্ছে মন্ত্রী হতে বেশি দেবি নেই। মন্ত্রী হলে ধবব। উনার মন্ত্রী হবার জন্য আমি দিনবাত দোযা করছি। ভাবছি একটা খতম পড়াব। খতমে ইউনুস।'

এক সন্ধ্যায় সুলায়মান চাচা খবর পাঠিয়ে আমাকে এবং ভাইয়াকে নিয়ে গেলেন। তাঁব ঘরে রোগা লম্বা এক লোক বসে আছে। ছোট-ছোট চোখ, গায়ে কটকটা হলুদ রঙেব পাঞ্জাবি। সুলায়মান চাচা গলা খাকাবি দিয়ে বললেন, 'উনাকে খবর দিয়ে এনেছি। উনি হচ্ছেন এক জন গণক। নিখোঁজ লোকেব সন্ধান দিতে পাবেন। খুব নামডাক আছে।'

ডুবন্ত মানুষ খড়কুটা আঁকড়ে ধরে। হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে এই লোককে খড়কুটারও অধম লাগছে। একে আঁকড়ে ধরার কোনো মানে হয় না।

ভাইয়া বলল, 'জনাব আপনার নাম?'

এমন ভঙ্গিতে জনাব বলল যেন সে নাটোরের মহরাজাকে সম্বোধন করছে। ঐ লোকও খানিকটা ঘাবড়ে গেল। নিচু গলায় বলল, 'আমার নাম আবদুর রহমান।'

'আবদুর রহমান সাহেব, নিখোঁজ লোক খুঁজে বের করাই কি আপনার একমাত্র পেশা না অন্য কিছুও করেন?'

'সাইড ব্যবসা আছে।'

'মূল ব্যবসা লোক খোঁজা ? কীভাবে খোঁজেন — মন্ত্র আছে?'

'মন্ত্র না। আল্লাহ্ পাকের পাক কালাম।'

'কত টাকা নেন এর জন্যে?'

'কন্ট্রাক্টে কাজ করি। কাজ সমাধান হইলে টেকা নেই। লোক বুঝে নেই। পঞ্চাশ টাকাও নেই আবার ধরেন, দশ হাজারও নেই।'

'দশ হাজার কেউ দিয়েছে?'

'জ্বি দিয়েছে। এক ব্যবসায়ীর ক্লাস টুতে পড়া ছেলে হারায়ে গিযেছিল — গণে বের করলাম।'

'বলেন কী?'

'কথা বিশ্বাস না করলে সার্টিফিকেট দেখেন।'

'মারহাবা আপনাব সার্টিফিকেটও আছে?'

সুলাযমান চাচা বিবক্ত হযে বললেন, 'খামাখা এত কথা বলছ কেন বজ্লু? ও বলেছে কন্ট্রাক্টে কাজ করবে তাই করুক। যদি সন্ধান দিতে পারে আমবা তাকে পাঁচশ টাকা দেব।'

ভাইয়া উদাস গলায বলল, 'ঠিক আছে দেব।'

ভদ্রলোককে বাবার নাম, দাদার নাম দেয়া হল। বাবার ব্যবহাবী একটা শার্ট দেযা হল। সেই শার্ট মাথায় জড়িয়ে সে চোখ বন্ধ অবস্থায গুনগুন কবে খানিকক্ষণ কী যেন পড়ল। চোখ খুলে খুবই আত্মবিশ্বাসেব সঙ্গে বলল, 'উনি রওনা হযে গেছেন। এখন আছেন মোটরে। চলন্ত অবস্থায তাঁকে দেখলাম। শরীর ভালো আছে। তবে একটু কফ হয়েছে।'

'ঢাকায় পৌছবেন কবে?'

'এক সপ্তাহ্ লাগবে?'

'মোটরে আসতে এক সপ্তাহ্ লাগবে? বলেন কী? উনি আছেন কোথায, দিল্লিতে?'

'তা বলতে পারতেছি না — তবে ঠিক এক সপ্তাহ্ লাগবে আসতে।'

'উনার গায়ে কী কাপড় দেখলেন?'

'পাঞ্জাবি।'

'সাদা রঙের না খদ্দর?'

'সাদা।'

'আচ্ছা ভাই আরেকজনের সন্ধান দিতে পারেন কিনা দেখেন। এর নাম আভা। এ ঢাকা শহরেই আছে। কোথায় আছে জানি না।'

আবদুর রহমান সাহেব গম্ভীর গলায বললেন, 'এক দিনে দুই জনের কাজ করতে পারি না। এখন যাতায়াত খরচ দেন, চলে যাই। সাত দিন পরে এসে পাঁচশ টাকা নিয়ে যাব।'

ভদ্রলোককে কুড়ি টাকা যাতায়াত ভাড়া দেয়া হল। সুলায়মান চাচাই দিলেন।

ভাইয়া বলল, 'এই মক্কেল কোথেকে জোগাড় করেছেন চাচা?'

'তোমার বিশ্বাস হয় নি, না?'

'আপনার হয়েছে?'

'একেবারে যে অবিশ্বাস হচ্ছে তা না। জগতে অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে। দেখা যাক না সাত দিন অপেক্ষা করে। ক্ষতি তো কিছু নেই।'

'লোকটা পুরোপুরি বোগাস চাচা — বাবা কখনো পাঞ্জাবি পরেন না। ব্যাটা তাঁকে দেখেছে পাঞ্জাবি পবে বসে আছেন।'

'হয়তো শখ করে পরেছেন। দেখা যাক না। সাতটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

সাত দিন কাটল। অষ্টম দিনে আমবা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে বইলাম। আমবা কেউ ব্যাপারটা বিশ্বাস করছি না তবু মনে মনে অপেক্ষা করছি। আমাদেব মধ্যে সবচে' যে অবিশ্বাসী — ভাইযা — সে ভোরবেলা বাজার থেকে মাছের মাথা কিনে আনল। দুপুবে আমরা মাথা খেলাম না — অপেক্ষা কবে রইলাম বাতের জন্যে। বাবা যদি রাতে আসেন। বাতেও এলেন না। আমরা যথারীতি খাওযাদাওযা করলাম। ভাইযা আধুনিক ঈশপেব গল্প বলে সবাইকে হাসাল। মাও হাসলেন।

বাত এগারটা থেকে বৃষ্টি নামল। মুষলধারে বৃষ্টি। মা আমাকে ডেকে বললেন — 'রেনু, রঞ্জুকে বল না এক পোয়া চিনি নিয়ে আসতে।'

'এই ঝড়বৃষ্টিব মধ্যে?'

মা মৃদু গলায বললেন, 'লোকটা যদি ভিজতে ভিজতে আসে। এসেই চা খেতে চাইবে। ঘবে একদানা চিনি নেই।'

ভাইযাকে বলতেই সে বৃষ্টি মাথায কবে চিনি আনতে গেল। তার প্রায সঙ্গে সঙ্গেই দুলু আপাদেব বাড়িব কাজেব ছেলেটি এসে আমাকে একটা চিবকুট দিযে গেল। সেখানে লেখা,

'রেনু, খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ছাদে ভিজতে ইচ্ছা করছে। তুমি আসবে? প্লিজ চলে এস। আমার মনটা ভালো না।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। মন খাবাপের কত তুচ্ছ কাবণ থাকে মানুষের। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে এই দেখে একজনেব মন খাবাপ হযে গেছে। সে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মন ভালো করার চেষ্টা করবে।

আমি দুলু আপার বাড়িতে গেলাম না। অনেক রাতে ঘুমাতে গিযে দেখি মা দরজা বন্ধ করে শুযে পড়েছেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায কযেকবার ডাকলাম — মা সাড়া দিলেন না। যদিও জানি তিনি জেগে আছেন। চলে এলাম ভাইয়ার ঘরে। সেও শোবার জোগাড় কবছে।

'তোমার ঘরে শোব ভাইয়া।'

ভাইযা হাই তুলতে তুলতে বলল, 'অনুমতি দেযা হল। কন্ডিশান আছে।'

'কী কন্ডিশান?'

'ভোর পাঁচটায ডেকে দিতে হবে, পারবি?'

'এত ভোরে উঠার তোমাব দরকার কী?'

'এক ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে কথা হযেছে। সে আমাকে বরিশাল নিযে যাবে। ট্রাক ছাড়বে ভোর ছটায।'

'বরিশাল যাবে কেন?'

'একটা কাজ আছে।'

'বাবার কোনো খোঁজ পেয়েছে?'

'হুঁ।'

'সদরঘাটের এক লোক বলল — দিন দশেক আগে সে বাবাকে দেখেছে। বরিশাল যাবার লঞ্চে উঠছেন।'

'দিন দশেক আগে সে বাবাকে ঢাকায় দেখেছে?'

'তাই তো বলল।'

'বাবাকে সে চেনে?'

'ছবি দেখে চিনেছে। নাম জানে না। চেহারায় চেনে।'

'আমাদের তুমি বল নি কেন?'

'লোকটার চেহারা প্রফেশনাল মিথ্যাবাদীর মতো।'

'চেহারা মিথ্যাবাদীদের মতো আবার কী?'

'মিথ্যাবাদী লোকদের চেহারায় মিথ্যার ছাপ পড়ে।'

'ও শুধু শুধু মিথ্যা বলবেই বা কেন?'

'প্রফেশনাল মিথ্যাবাদীরা কারণ ছাড়াই মিথ্যা বলে — তাদের একজনকে তুই যদি জিজ্ঞেস করিস, ভাই বাসাবো যাব কোন রাস্তায়? সে ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলবে — বাসে করে চলে যান। সহজ হবে।'

'প্রফেশনাল মিথ্যাবাদী তখন কী করবে জানিস? ভুল একটা বাসে উঠিয়ে দেবে। এতেই এদের আনন্দ। ভালো কথা, বরিশাল যাবার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলিস না। বাবাকে পাওয়া গেলে মজার একটা সারপ্রাইজ হবে। সারপ্রাইজ নষ্ট করে লাভ নেই।'

ভাইয়া বরিশাল থেকে কোনো খবর ছাড়াই ফিরে এল। অন্তত আমার তাই ধারণা কারণ কাউকে সে কিছু বলল না। আমিও কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। সে যদি নিজ থেকে কিছু বলতে চায় বলবে।

আমি আবার ভাইয়ার ঘরে থাকতে শুরু করেছি। কারণ মা এখন আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারছেন না। অল্পতেই খিটমিট করেন — 'একি গায়ে পা তুলে দিচ্ছিস কেন? ভালোমতো ঘুমা। অকারণে এত নড়াচড়া করিস না তো। বিশ্রী লাগে।'

শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, 'আমি কি ভাইয়ার ঘরে ঘুমাব?'

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যা ইচ্ছা কর্ বিরক্ত করিস না।'

ভাইয়ার স্বভাব কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আগের হাসিখুশি ভাব খানিকটা কমে গেছে। রাতে দুটা টিউশ্যানি করে খুব ক্লান্ত হয়ে ফেরে। ভাত খেয়েই বুকের নিচে বালিশ দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। পত্রিকার লেখা লিখতে হয়। লেখার সময় মেজাজ খুব খারাপ থাকে। কর্কশ গলায় বলে, 'চা দে তো রেনু।'

আমি যদি বলি, 'চিনি ছাড়া দেব ভাইয়া? চিনি শেষ হয়ে গেছে।'

ভাইয়া বিশ্রী ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠবে, 'চিনি নেই সেটা রাত দুপুরে বলছিস কেন? দিনে মনে ছিল না? যেখান থেকে পারিস চিনি দিয়ে চা বানিয়ে আন।'

আমি প্রায় মাঝরাতে চিনি আনতে দুলু আপাদের বাসায় গেলাম। তিনি ফ্লাস্ক ভর্তি চা বানিয়ে দিলেন। শুধু চা না, সঙ্গে এক প্লেট নোনতা বিসকিট। স্লাইস করে কাটা পনির।

ভাইয়া চা খায়, পনির মুখে দেয়। একবারও বলে না — কোত্থেকে জোগাড় হল। তার লেখালেখির সময়টা আমি বারান্দায় বসে থাকি। যে সব রাতে দুলু আপা গান বাজায়

— আমার সময়টা ভালো কাটে। তবে বেশিরভাগ সময় বসে থাকতে হয় চুপচাপ। দুলু আপার স্বভাবেরও বোধ হয় পরিবর্তন হয়েছে। আগের মতো একই গান লক্ষবার বাজান না।

শুনতে পাচ্ছি তাঁর বিয়েব কথা হচ্ছে। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে তাকে একবার দুলু আপাদের বাড়িতে দেখেছি। আমাব পছন্দ হয নি। মানুষটা হযতোবা খুবই ভালো। প্রথম দর্শনে কোনো পুরুষকেই আমার পছন্দ হয় না। পুরুষদের বোধ হয উল্টোটা হয — প্রথম দর্শনে সব মেয়েকেই ভালো লাগে।

৫

আচ্ছা, আপনি কি খুব কাছ থেকে কাউকে মাবা যেতে দেখেছেন?

এক জন মানুষ মাবা যাচ্ছে আব একগাদা লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি সেই একগাদা মানুষেব এক জন — সেই কথা বলছি না। এক জন মানুষ মাবা যাচ্ছে, আপনি তার হাত ধবে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘবে আর কেউ নেই। এমন অবস্থা কি আপনাব জীবনে হযেছে?

আমাব হযেছে।

সুলায়মান চাচাব মৃত্যুব সময আমি তাঁব পাশে। ঘরে আর কেউ নেই। মৃত্যু মুহূর্তে আমি তাঁর হাত ধরে বসে আছি। ব্যাপাবটা ভালো করে গুছিযে বলি। চাচাব শরীর খুব যখন খাবাপ হল তখন তিনি ভাইযাকে বললেন, তাঁকে কোনো একটা ক্লিনিকে ভর্তি কবিযে দিতে। ভর্তিটা কবাতে হবে গোপনে যেন তাঁর তিন মেযে কিছুই জানতে না পারে।

ভাইযা বলল, 'সেটা কি ঠিক হবে চাচা?'

'খুব ঠিক হবে। ওদেব না দেখলে আমি আবো কিছুদিন বেঁচে থাকব। দেখলে আব বাঁচব না। তুমি আমাকে শহব থেকে দূবে কোনো ক্লিনিকে ভর্তি করিযে দাও। এই কাজটা কব।'

ভাইযা তাঁকে শহবেব একটা ক্লিনিকে ভর্তি কবিযে দিযে এল। সুলাযমান চাচা ক্লিনিকে যাবার আগে সবাব কাছ থেকে বিদায় নিযে এলেন। তাঁর বাসাব কাজেব মানুষ দুজনকে বেতন ছাড়াও এক হাজার কবে টাকা দিযে বিদেয দেযা হল। ওদেব বললেন, 'তোরা দুজনই দু হাতে চুরি কবেছিস। সেই অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। আমিও তোদেব বকাঝকা যা কবেছি তা মনে রাখিস না।'

ভাইযাকে বললেন, 'বাড়ি ভাড়া বাবদ তোমার কাছে অনেক টাকা পাওনা। সেগুলো ক্ষমা কবে দিলাম। তাব বদলে তুমি প্রতিদিন একবাব হাসপাতালে আমাকে দেখতে যাবে।'

ভাইযা বলল, 'নিতান্তই অসম্ভব। হাসপাতাল আমি সহ্যই কবতে পাবি না। তাছাড়া প্রতিদিন যে যাব — রিকশা ভাড়া পাব কোথায?'

'রিকশা ভাড়া আমি দেব। যতবার যাবে কুড়ি টাকা কবে রিকশা ভাড়া পাবে।'

'নানান ধান্ধায থাকি চাচা। রোজ যেতে পারব না তবে প্রাযই যাব। রেনু যাবে।'

'আমি যে কোথায় আছি তা যেন ভুলেও প্রকাশ না হয।'

'প্রকাশ হবে না।'

সুলায়মান চাচাকে ঢাকা শহরের মাঝখানে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দেযা হল। উনি গেলেন খুব হাসিমুখে। যেন পিকনিক করতে যাচ্ছেন কিংবা ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন। তাঁর ঘরের দরজায় বিশাল তালা লাগিযে চাবি আমাকে দিয়ে গেলেন।

'কাউকে চাবি দিবি না। কাউকে না। আমার তিন কন্যাকে তো নয়ই। মনে থাকে যেন।'

সুলায়মান চাচা চলে যাবার পরদিনই তাঁর ছোট মেয়ে এসে আমাদের ঘবের কড়া নাড়তে লাগল। আমি দরজা খুলতেই তিনি বললেন, 'বাবা কোথায়?'

আমি ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললাম, 'জানি না তো।'

'কিছুই জান না?'

'জ্বি না।'

'কী আশ্চর্য কথা! একটা অসুস্থ মানুষ সে যাবে কোথায়?'

'হয়তো বেড়াতে গেছেন। এসে যাবেন। আপনি অপেক্ষা করুন।'

'বিছানা থেকে নামতে পারে না একটা মানুষ সে গেছে বেড়াতে? এসব কী বলছ পাগলের মতো!'

ভদ্রমহিলা বিরস মুখে দোতলায উঠে গেলেন। পেছনে পেছনে উঠলেন তাঁব স্বামী। এই ভদ্রলোকের চেহারা ভালোমানুষের মতো। শিশু শিশু মুখে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন। হাতে সিগারেট। তাঁকে দেখে মনে হল খুব মজা পাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরই ধুম-ধুম শব্দ হতে লাগল। বুঝলাম তালা ভাঙা হচ্ছে। সন্ধ্যাব মধ্যে বাকি দুবোনও চলে এলেন। আরো কিছু লোকজন এল। বাড়ি গমগম করতে লাগল। [illegible] নিয়ে বাত দশটাব দিকে আমাদেব ঘবেব কড়া নাড়তে লাগলেন। [illegible] দিল। আমি এবং আপা ববান্দা থেকে তাদের কথাবার্তা শুনছি।

'আমার বাবা কোথায় গেছেন জানেন?'

'জানি না।'

'মিথ্যা কথা বলছেন কেন? আমাদের আরেক ভাড়াটে ইসমাইল সাহেবেব স্ত্রী বললেন — তিনি দেখেছেন আপনি বাবাকে একটা সবুজ রঙের গাড়িতে করে কোথায় যেন নিযে যাচ্ছেন।'

'উনি পুরোপুরি সত্যি বলেন নি। গাড়ির রং ছিল নীল, নেভি ব্লু।'

'তাহলে যে আপনি বললেন — আপনি জানেন না বাবা কোথায?'

'ঠিকই বলেছি। আমি ভোরবেলায় বেরুচ্ছি — দেখি উনি গাড়িতে। আমাকে বললেন, কোথায় যাবে রঞ্জু? আমি বললাম, সদরঘাট। চাচা বললেন, উঠে আস, আমি তোমাকে গুলিস্তানে নামিয়ে দেব। আমি উঠলাম, গুলিস্তানে নেমে গেলাম।'

'বাবা কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করেন নি?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বললেন, ভালো দেখে একটা ক্যামেরা কিনতে চান। স্টেডিয়ামের ইলেকট্রনিক্স দোকানগুলোতে ঘুরবেন।'

'বাবার বিছানা থেকে নামার শক্তি নেই। আর তিনি কিনা স্টেডিযামে ঘুবে ঘুরে ক্যামেরা কিনবেন?'

'আমি যা জানি আপনাকে বললাম। তাছাড়া উনি বিছানা থেকে নামতে পারেন না বলে যা বলছেন তাও সত্যি না। হেঁটে হেঁটেই তো গাড়িতে উঠলেন। ধরেও নামাতে হল না।'

'আমি আপনাব একটি কথাও বিশ্বাস করছি না।'

'আপনার কথা শুনে মনে খুব কষ্ট পেয়েছি বললে ভুল বলা হবে। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না এটাই স্বাভাবিক।'

'বাবার সঙ্গে কী জিনিসপত্র ছিল?'

'আমার কোনো কথাই তো আপনি বিশ্বাস করছেন না। শুধু শুধু প্রশ্ন কবছেন কেন?'

'বলুন উনার সঙ্গে জিনিসপত্র কী ছিল?'

'বলতে চাচ্ছি না।'

এবার শোনা গেল ভদ্রমহিলাব স্বামীর গলা। মেয়েদেব মতো চিকন স্বরে তিনি বললেন, 'আমি অন্য প্রসঙ্গে আপনাকে একটা কথা বলছি। সব ভাড়াটেদেরই বলা হয়েছে, শুধু আপনাকে বলা বাকি। কথাটা হচ্ছে পারিবারিক প্রয়োজনে পুবো বাড়িটা আমাদের দরকার। আপনাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।'

'কবে নাগাদ?'

'এক মাসের মধ্যে ছাড়তে হবে।'

'সেটা তো ভাই সম্ভব হবে না। প্রথমত মুখেব কথায় নোটিশ হয না। আপনাদেব লিখিতভাবে জানাতে হবে। দ্বিতীযত, নোটিশ আপনারা পাঠালে হবে না। যাঁর বাড়ি তাঁকে নোটিশ দিতে হবে। নোটিশের পরেও তিনি মবে গিযে থাকলে ভিন্ন কথা — অবশ্যি তাবপরও সমস্যা আছে — কোর্ট থেকে আপনাদের সাকসেসান সার্টিফিকেট বেব কবতে হবে।'

খানিকক্ষণ আব কোনো কথাবার্তা শোনা গেল না। ভদ্রলোকেব হযতো ভাইযাব কথাগুলো হজম করতে সময লাগছে। সময লাগাটাই স্বাভাবিক। এমন কঠিন কথাব চট কবে জবাব দেযা যায না। জবাবটা কী হয শোনাব জন্য অপেক্ষা করছি, রেগে আগুন হযে একটা কঠিন জবাব দেবার কথা। ভদ্রলোক তা দিলেন না। তিনি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'রঞ্জু সাহেব যেসব আইনকানুনেব কথা বললেন — তা সবই আমি জানি। তাবপরেও বলছি সাত দিনেব মৌখিক নোটিশে আপনাকে উচ্ছেদ করা আমাব পক্ষে কোনো সমস্যাই নয। সাত দিনও খুব বেশি সময। যাই হোক শুরুতে আমার স্ত্রী এক মাসেব কথা বলেছে। কাজেই এক মাসই বহাল বইল। আপনি এক মাস পর বাড়ি ছেড়ে দেবেন।'

'যদি না ছাড়ি?'

'আপনি বুদ্ধিমান লোক। ভুল করবেন বলে মনে হয় না। আচ্ছা ভাই — যাই। এত রাতে বিরক্ত কবাব জন্যে দুঃখিত।'

ভাইযা গম্ভীর মুখে ভাত খেতে এল। মা বললেন, 'কী হযেছে রে রঞ্জু?' ভাইযা শুকনো গলায বলল, 'কিছু হয নি।'

'ঐ ভদ্রলোক তোকে কী বলল?'

'তেমন কিছু বলে নি।'

'তেমন কিছু বলে নি তাহলে তুই এমন গম্ভীব হযে আছিস কেন? তোর বাবা সম্পর্কে কিছু বলেছে?'

ভাইযা বিরক্ত গলায় বলল, 'বাবা সম্পর্কে কিছু বলে নি। তোমাব কি ধারণা পৃথিবীর সবাই বাবা সম্পর্কে আলোচনা কবে? এইটাই কি তাদের কথা বলাব একমাত্র বিষয়?'

'তুই রেগে যাচ্ছিস কেন? আমি কি তোর বাবার কথা তুলে কোনো অন্যায় করেছি?'

'আরে, কোন কথা থেকে কোন কথায আসছ — ন্যায়-অন্যাযের প্রশ্ন আসছে কেন?'

'আমি লক্ষ করেছি — তোর বাবার বিষয়ে কিছু বললেই তুই বেগে যাস।'

'রেগে যাই না মা, বিরক্ত হই। দিনের মধ্যে এক হাজার বার জিজ্ঞেস কর তোর বাবার কোনো খোঁজ পেলি। কী যন্ত্রণা খোঁজ পেলে আমি বলব না?'

'তোর বাবার কথা জিজ্ঞেস করা কি অপরাধ?'

ভাইয়া খাওয়া বন্ধ করে প্লেট ঠেলে উঠে দাঁড়াল। মা শান্ত গলায় বললেন, 'ভাত খা রঞ্জু। আমি আর কোনোদিন তোর বাবার প্রসঙ্গ তুলব না।'

মার কথায় ভাইয়া হকচকিয়ে গেল। আবার চেয়ারে বসল। কিন্তু কিছু খেতে পারল না। অতি অল্প সময়ে খুব বড় ধরনের একটা নাটক আমাদের বাসায় হয়ে গেল। মাকে আমি চিনি — মা আর কোনোদিনই বাবার প্রসঙ্গ তুলবে না।

সে রাতে ভাইয়া সকাল সকাল দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল। মার ঘরে গিয়ে দেখি মাও শুয়ে পড়েছেন। কয়েকবার ডাকলাম — মা সাড়া দিলেন না। গেলাম আপার ঘবে। আপা বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকাল। কিংবা স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই তাকাল কিন্তু আমার কাছে মনে হল খুব বিরক্ত। কারণ ইদানীং সারাক্ষণ সে বিরক্ত ভাব করে ঘরে বসে থাকে।

'আপা তোমার সঙ্গে ঘুমাতে হবে।'

'কেন?'

'ভাইয়া, মা দুজনই দরজা বন্ধ করে শুযে পড়েছে। তুমি কি জাযগা দেবে?'

'এটা কেমন কথা — জাযগা দেব না কেন?'

আমি বিছানায় উঠতে উঠতে বললাম, 'কী বিশ্রী ব্যাপাব হল আপা দেখেছ? ভাইযা এটা কী করল?'

আপা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সবে শুরু। আরো কত খারাপ ব্যাপাব হবে দেখবি।'

'কী রকম খারাপ ব্যাপার?'

'এতদিনে যখন বাবাব খোঁজ পাওয়া যায় নি — আর যাবেও না। ভাইযা অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও চাকরি পাবে না। আমাদের এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। মাব শবীব খুব খাবাপ হবে। নানা রোগ-ব্যাধিতে ভুগবেন কিন্তু মববেন না। বেঁচে থাকবেন। আশায আশায বাঁচবেন। বাবা একদিন ফিরে আসবেন, তাঁব সঙ্গে দেখা হবে এই আশায বেঁচে থাকা। রেনু। আমাদের সামনে ভযংকর সব সমস্যা।'

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, 'তুমি কি এসব নিয়ে খুব চিন্তা কর?'

'না।'

আপা শোবার আযোজন করল। বাতি নিভিযে দিল। আমি বললাম, মশাবি খাটাবে না? খুব মশা তো।'

'মশারির ভেতর আমার ঘুম আসে না। দমবন্ধ লাগে। এই জন্যেই তো একা থাকতে চাই। কাউকে সঙ্গে রাখতে চাই না।'

'তোমাকে মশায় কামড়ায় না?'

'খুব কম কামড়ায়। ফর্সা মানুষদের মশা কামড়ায না। তোকে কামড়াবে। আমাকে না। মশাদের সৌন্দর্যবোধ প্রবল .... ।'

বলতে বলতে আপা হাসল। অনেকদিন পর আমি আপাকে হাসতে শুনলাম। আপা আমার গায়ে হাত রেখে বলল, 'রেনু তোদের রেখে আমি যদি চলে যাই। তোরা রাগ করিস না।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'কোথায় যাবে?'

'দেশের বাইরে। আমাদের একজন টিচার আছেন যাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় আমার প্রতি তাঁর খানিকটা আগ্রহ আছে। তিনি স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন। আমাকে

তাঁর চেম্বারে ডেকে বাইরে যাবার কথা খুব উৎসাহ নিয়ে বললেন। তারপর হঠাৎ আমাদের বাসার ঠিকানা চাইলেন।'

'তুমি কি উনাকে পছন্দ কর?'

'না।'

'একেবারেই না?'

'একেবারেই না। কিছু মানুষ আছে যাদের দেখলে মনের উপর অসম্ভব চাপ পড়ে — ঐ লোকটি হচ্ছে সে রকম। এরা কী করে জানিস? এরা খুব হিসেব করে আগায়। বিয়ের ব্যাপারটাই ধর — এরা চায় সবচে' সুন্দরী মেয়েটাকে বিয়ে করতে। মেয়ে শুধু সুন্দরী হলে হবে না, পড়াশোনায় ভালো হতে হবে, বাবার প্রচুর টাকা থাকতে হবে।'

'উনি তেমন নাও তো হাতে পারেন।'

'সেই সম্ভাবনা খুব কম। ঐ লোক আমাকে ছাড়াও আমার জানামতে আরো তিনটি মেয়ের ঠিকানা নিয়েছে। তিন জনই রূপবতী। সে এদের প্রত্যেকের বাসায় যাবে। হিসাব–নিকাশ করবে। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকব আমি।'

'তুমি টিকে থাকবে কেন?'

'আমার সে রকমই মনে হচ্ছে। আমি কিছু কিছু জিনিস আগে আগে বুঝতে পাবি। আর কথা বলতে ভালো লাগছে না, ঘুমাতে চেষ্টা কর।'

'চেষ্টা করেও লাভ নেই আপা, আমাব সহজে ঘুম আসে না।'

আপা আবার হাসল। আমি বিস্মিত হযে বললাম, 'হাসছ কেন?'

আপা বলল, 'যাদেব মাথায় রাজ্যের চিন্তা তারা বিছানায শোযামাত্র ঘুমিযে পড়ে। প্রকৃতি তাদেব ঘুম পাড়িযে চিন্তামুক্ত করে। যাবা সুখী মানুষ তাবাই সহজে ঘুমাতে পারে না। বিছানায গড়াগড়ি করে।'

'তোমাকে কে বলল?'

'আমার তাই ধারণা। দেখিস না আমি কেমন চট করে ঘুমিযে পড়ি। বাবাও তাই। বাবাব ঘুমের সমস্যাব কথা কখনো শুনেছিস? শোযামাত্র ঘুম। বাবাকে কখনো দেখেছিস ঘুম হচ্ছে না বলে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি কবছে?'

'না।'

'মিলল আমার কথা?'

আমি জবাব দিলাম না। আপা মৃদুগলায বলল — 'দুলুব কথা ধর। এই মেয়ে কি রাতে ঘুমায? আমার তো মনে হয জেগেই কাটায। অথচ ওব মতো সুখী মেযে বাংলাদেশে কটা আছে?'

কথা শেষ করে আপা পাশ ফিবল এবং প্রায সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিযে পড়ল। আমি সম্ভবত সুখী মেযে। জেগে রইলাম। দুলু আপাও জেগে আছে। তাকে আগের রোগে ধরেছে। ক্রমাগত গান বাজিয়ে যাচ্ছে। একই গান — বার বার শুনলে গানটা আর গান থাকে না। মন্ত্রের মতো হযে যায। শেষের দিকে মনে হয কে যেন কানেব কাছে মন্ত্র পাঠ কবছে :

যায দিন, শ্রাবণ দিন যায
আঁধারিল মন মোর আশঙ্কায
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায
যায দিন, শ্রাবণ দিন যায ....

আমি আধোঘুম আধো জাগরণে মন্ত্রপাঠ শুনতে লাগলাম।

সুখী মেযেরা রাস্তায় কীভাবে হাঁটে আপনি জানেন? জানেন না? আমিও জানি না কিন্তু হাঁটতে চেষ্টা করি সুখী মেয়ের মতো। ভাব কবি যেন হাঁটতে খুব ভালো লাগছে, যা

দেখছি তাতেই মুগ্ধ হচ্ছি। কলেজ ছুটি হয়ে গেছে বাসায় বলি নি। ঠিক নটায় তাড়াহুড়া করে বই খাতা সঙ্গে নিয়ে বের হই। বেরুবার আগে মার সামনে যাই। নিচু গলায় বলি — 'টাকা দিতে পারবে? না পারলে অসুবিধা নেই।'

মা পাঁচ টাকার একটা নোট এগিয়ে দেন। কোত্থেকে দেন কে জানে। বেশিরভাগ দিন এই নোটটা খরচ হয় না। হেঁটে বেড়ালে টাকা খরচ হবে কেন? ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কোনো একটা রেকর্ডের দোকানে ঢুকি। খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলি, 'সতীনাথের পুরানো গানের একটা ক্যাসেট অতি দ্রুত করে দিতে পারেন? আমার এখনি দরকার। আমি এক্সট্রা পে করতে রাজি আছি।' দোকানদার হাই তুলতে তুলতে বলে – 'এক সপ্তাহের আগে সম্ভব হবে না। হেভি বুকিং।'

'বাড়তি টাকা দিলেও হবে না?'

'আর্জেন্ট করে দিতে পারি। ডাবল পেমেন্ট। তাও আজ পাবেন না। দুদিন লাগবে।'

আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবার ভঙ্গি করে বলি, তা হলে তো হচ্ছে না। আচ্ছা, সতীনাথের ঐ গানটা একটু বাজান তো শুনি — "এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন।"

দোকানদার নিতান্ত অনিচ্ছায় খানিকটা বাজায়। বাজাতে বাজাতে হাই তোলে। ক্যাসেটের দোকানের লোকজন ক্রমাগত হাই তুলে কেন কে জানে। আমি যে কটা দোকানে গেছি সব জায়গায় এক অবস্থা — এরা হাই না তুলে কথা বলতে পারে না। কথা বলেও কম। রানীক্ষেত রোগ হলে মুরগিরা যেমন ঝিম ধরে থাকে এরাও সে রকম। সারাক্ষণ ঝিম ধরে আছে।

দুপুরের পর হাঁটতে ভালো লাগে না। বাসায় ফিরে আসি। গোসল করে লম্বা একটা ঘুম দেই। সুলায়মান চাচাকে দেখতে যাই না কারণ তাঁর মেয়েরা খোঁজ পেয়ে গেছে। তারা সারাক্ষণ বাবাকে ঘিরে থাকে। যে দুবার গিয়েছিলাম এমন করে তাকিয়েছে যেন আমি রক্তচোষা ড্রাকুলা। তার বাবার রক্ত খাবার জন্যে আসি।

হাসপাতালেই সবচে' ছোট মেয়েটি আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে বলল, 'বাড়ি ছাড়ার জন্যে আপনাদের এক মাস সময় দেয়া হয়েছিল। মাস প্রায় শেষ হতে চলল। আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম। আমার স্মৃতিশক্তি ভালো না।'

আমি বললাম, 'মনে করিয়ে খুব ভালো করেছেন। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'অন্য তিন জন ভাড়াটের মধ্যে দুজন চলে গেছে। আর এক জন যাবে এই শুক্রবারে।'

'ও আচ্ছা।'

'বাড়িটা আমাদের খুব জরুরি ভাবে দরকার।'

'ভাইয়াকে বলব। ঐ তো গার্জিয়ান।'

সুলায়মান চাচাকে দেখতে যেতে ভালো না লাগার আরেকটা কারণ হচ্ছে তিনি এখন কথাবার্তা একেবারেই বলেন না। তাঁর শরীর দ্রুত খারাপ হয়েছে। চোখ গাঢ় হলুদ। নিশ্বাস ফেলার সময় অদ্ভুত শব্দ হয়। আমার দিকে এমনভাবে তাকান যেন চিনতে পারছেন না। তবে চলে আসবার সময় মেয়েদের বলেন—'রেনুর হাতে কুড়িটা টাকা দাও তো। রিকশাভাড়া।'

মেয়েরা তৎক্ষণাৎ বলে, 'দিচ্ছি।'

কিন্তু দেয় না। বরং এমন ভঙ্গি করে যে আমার বলতে ইচ্ছা করে, 'কিছু দিতে হবে না। আমার কাছে একটা পাঁচ টাকার নোট আছে। আপনি দয়া করে রেখে দিন।'

ডাক্তাররা সুলায়মান চাচার ব্যাপারে জবাব দিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়। তাঁর শরীরের কোনো যন্ত্রপাতিই এখন কাজ করছে না। লিভার কাজ করছে না, কিডনি কাজ করছে না, শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। মাথার চুলও উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতালে ঢোকার আগে কিছু চুল ছিল। এখন মাথা প্রায় ফাঁকা। কথাবার্তাও অসংলগ্ন। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে এমন ভাবে যান যে খটকা লাগে।

ঐ দিন শীত নিয়ে কথা হচ্ছে। শেষ রাতে নাকি তার খুব শীত লাগে। আবার গায়ে চাদর দিলে গরম লাগে।

এই প্রসঙ্গে বলতে বলতে হঠাৎ বললেন, 'রেনু তোর বাবা কাজটা ভালোই করেছে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কোন কাজ?'

'এই যে লুকিয়ে আছে। আমার কি ধারণা জানিস? আমার ধারণা উনি কোথাও ঘাপটি মেরে আছেন। বেশি দূরে না, কাছেই। তোদের আশপাশে যাতে তোদের উপর লক্ষ রাখতে পারেন। এক সময় বের হবেন — তোদের চমকে দেবেন।'

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, 'এই প্রসঙ্গ থাক চাচা।'

'আচ্ছা থাক। তবে আমি কিন্তু ভুল বলছি না। যা বললাম আমাব মনের কথা। তোর বাবা যে কাজটা করেছেন — আমার এমন একটা কাজ করার ইচ্ছা সারা জীবন ছিল। করতে পাবি নি। সাহসেব অভাবে পাবি নি। গৃহত্যাগ করা সহজ ব্যাপাব না। মহাপুরুষ ছাড়া কেউ পাবেন না।'

'বাবা গৃহত্যাগ কবেন নি। উনি গৃহত্যাগের মানুষ না। খুব ঘরোয়া মানুষ। ব্যবসাযেব কারণে বাইবে যেতেন। যে কদিন বাইবে থাকতেন ছটফট করতেন।'

'মানুষকে এত চট করে বো্ঝা যায না বে বেনু। মানুষ খুব জটিল বস্তু। গৌতম বুদ্ধও তো সংসাবী মানুষ ছিলেন। তাঁর ছিল পবমাসুন্দরী স্ত্রী যশোধাবা। চাঁদের মতো ছেলে ছিল — বাহুল। ছেলেকে এক মিনিট চোখেব আড়াল কবতেন না। সেই গৌতম বুদ্ধও কি ঘুমন্ত স্ত্রী-পুত্র বেখে পালিযে যান নি?'

'বাবা গৌতম বুদ্ধ না চাচা। এক জন অতি সামান্য ব্যবসাযী। যাকে জীবিকাব জন্যে সামযিকভাবে গৃহত্যাগ কবতে হত।'

'আব একটা ভুল কথা বললি বেনু। সব মানুষেব মধ্যেই গৌতম বুদ্ধের বীজ থাকে। সমযমতো পানি পায না বলে বীজ থেকে গাছ হয না। তুই যখন রাস্তায় হাঁটবি চোখ কান খোলা বেখে হাঁটবি। আমি নিশ্চিত অনেকবাব তোর সঙ্গে তোব বাবাব দেখা হযেছে, তুই খেযাল কবিস নি।'

আমি সব সমযই চোখ কান খোলা বেখে হাঁটতাম। বাবা নিখোঁজ হবাব পব তা আরো বেড়েছে। তাতে কোনো লাভ হয নি। তবে কেন জানি আমার নিজের মধ্যেই একটা ক্ষীণ আশা — একদিন পেছন থেকে বাবা ডেকে উঠবেন 'কে যাচ্ছে, রেনু না?'

আমি থমকে দাঁড়াব। বাবা হতভম্ব গলায় বলবেন — 'শাড়ি পরে যাচ্ছিলি, আমি তো চিনতেই পারি নি। শাড়ি পরছিস কবে থেকে?'

'অল্পদিন থেকে পরছি। ঘরে পরি নি। বাইরে বের হলে পরি।'

'সুন্দর লাগছে। আচ্ছা কিনে দেব। ভালো শাড়ি কিনে দেব। চল এখনি কিনে দি। কিছু টাকা সঙ্গে আছে।'

'শাড়ি কিনতে হবে না বাবা, তুমি আমার সঙ্গে চল তো।'

'কোথায় যাব?'

'বাসায়। আবার কোথায়? তোমার যে ঘরবাড়ি আছে এটা কি তোমাব মনে নেই?'

'হুঁ। ভালো কথা বলেছিস। আসলে ব্যাপারটা কি জানিস . . . '

'আসল ব্যাপারটা কী?'

বাবা বিব্রত ভঙ্গিতে হাসতে থাকেন। আমি তাঁর হাত ধরি। কল্পনা এই পর্যন্ত। মানুষের কল্পনারও সীমা থাকে। আমার তো মনে হয় না কেউ কখনো কল্পনা করে সে উড়তে পারে। আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কল্পনাকেও যুক্তির ভেতর থাকতে হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাশক্তিও কমতে থাকে। একটা সময় আসে যখন মানুষ কল্পনা করে না। আমার মার বোধ হয় সেই সময় যাচ্ছে। তিনি তাকিয়ে থাকেন শূন্য চোখে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কী যেন বলেন। আমি একদিন বললাম, 'মা তুমি কী বলছ?' তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কই কিছুই বলছি না তো।'

আমাদের বড় আপার মৃত্যুদিন গেল গত পরশু। আমরা সবাই খুব আতংকগ্রস্ত ছিলাম মা না জানি কী করেন! তিনি কিছুই করলেন না। নিতান্তই স্বাভাবিক আচরণ করলেন। সব বার শোকের এই তীব্র দিনটিতে বাবা–মা এক সঙ্গে থাকেন। এবার মা একা। এবং তাঁর মধ্যে কোনো বিকার নেই। নামাযে অন্য দিনটিতে যতটা সময় দেন, আজও তাই দিলেন। সন্ধ্যার পর বারান্দায় এসে বসলেন। আপাকে বললেন, 'মীরা আমাকে এক কাপ চা দিবি মা।' তাঁকে চা দেয়া হল। তিনি চা খেলেন। বাতের খাবারও খেলেন নিঃশব্দে। এর আগে কোনোদিন তাঁকে রাতে কিছু খেতে দেখি নি। রাত দশটার দিকে ঘুমাতে গেলেন। আপা আমাকে ডেকে বললেন — 'তুই মার সঙ্গে ঘুমা। কোনো সমস্যা হলে আমাকে ডাকবি। আমি জেগে আছি।'

'মা থাকতে দেবে না। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

'দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখ।'

আমি বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মা তোমাব সঙ্গে ঘুমাব।' মা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বললেন, 'আয়।'

আমি ঘরে ঢুকলাম, মার পাশে শুয়ে পড়লাম। মা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন — 'তোর তো কলেজ বন্ধ, তুই সারাদিন কী করিস?' আমি হকচকিয়ে গেলাম। ক্ষীণস্বরে বললাম, 'কলেজ বন্ধের কথা তোমাকে কে বলল?'

'আমি জানি।'

'কবে জানলে?'

'অনেক দিন আগেই জানি। তুই কি কারো বাসায় যাস?'

'না।'

'রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াস?'

'হুঁ।'

'তোর বাবাকে খুঁজিস?'

আমি জবাব দিলাম না। মা আমার মাথায হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'আব হাঁটাহাঁটির দরকার নেই। তোর বাবা ফিরে আসবেন না। উনি জীবিত নেই।'

'কী বলছ মা?'

'জীবিত থাকলে আজকের দিনে চলে আসত। আজ যখন আসে নি আর কোনোদিনও আসবে না। তুই ঘুমা তো রেনু। রোদে ঘুরে ঘুরে কী কালো হযে গেছিস! আয়নায় নিজেকে দেখিস না? এখনি তো সুন্দর হওয়ার বয়স।'

মা এমন কোনো আবেগের কথা বলছেন না। সহজ স্বাভাবিক কথা। কিন্তু আমার কান্না পেয়ে গেল। আমি নিঃশব্দে কাঁদছি। এমন ভাবে কাঁদছি যেন মা কিছুতেই বুঝতে না পারেন।

'রেনু!'

'জ্বি।'

'তোর বড় আপার জন্য আমি নিজের হাতে একটা জামা বানিযেছিলাম। টকটকে লাল সিল্কের জামা। ঐ জামাটা তোর বাবা তার ব্রিফকেসে কাগজপত্রের নিচে লুকিয়ে রাখে — বছরের মাত্র এক দিন গভীর বাতে জামাটা বের করা হয। আজ সেই রাত। তোর বড় আপাকে লোকটা কোনোদিন দেখে নি — কিন্তু..'

'বাদ দাও মা।'

'কত যে কল্পনা ছিল অরুকে নিযে। দরিদ্র মানুষ — জিনিসপত্র কিনে বাড়ি বোঝাই করে ফেলেছিল। জুতা কিনেছিল তিন জোড়া। চাবটা জামা। বাচ্চাদেব গোসল দেবার জন্য লাল প্লাস্টিকের গামলা। মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর সব বিলিয়ে দেয়।'

'মা, আমি কিছু শুনতে চাচ্ছি না।'

'এই যে তোর বাবা নানা জাযগায ঘুরে বেড়ায়, ঠিক যে ব্যবসাযের কারণে ঘুবে বেড়ায তা কিন্তু না। ঘরে তার মন টেকে না। কিছুদিন ঘরে থাকলেই সে অস্থির হযে ওঠে। অরু বেঁচে থাকলে — এ রকম হত না। মানুষটা ঘরেই থাকত।'

'মা ঘুমাও।'

মা পাশ ফিবলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমিযে ছিলাম।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা–সন্ধ্যায। নিজ থেকে ভাঙল না। আপা এসে ধাক্কা দিযে তুলল। শংকিত গলায় বলল, 'তোকে নিতে এসেছে, তাড়াতাড়ি ওঠ।'

'কে নিতে এসেছে?'

'সুলাযমান চাচার বড় মেযে। চাচার শরীর খুব খারাপ। তোকে আর ভাইয়াকে নিতে এসেছে। তোদের দেখতে চেযেছেন। ভাইযা বাসায নেই। তুই যা।'

আমি বিছানা ছেড়ে নামলাম। হাত মুখ ধুতে বারান্দায় গিযে দেখি সুলাযমান চাচার বড় মেয়ে মোড়ায বসে আছেন। ব্যাকুল হযে কাঁদছেন। আমাকে দেখে ভাঙা গলায বললেন — 'তাড়াতাড়ি কর রেনু।'

সুলাযমান চাচা মাবা গেলেন ঠিক সন্ধ্যায। ঘবে তখন শুধু আমি একা। সুলাযমান চাচা ইশারায় সবাইকে চলে যেতে বলেছিলেন। ঘরে কেউ ছিল না। তিনি আমাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। আমি কাছে গেলাম। তাঁব হাত ধরে পাশে দাঁড়ালাম। তিনি কিছু একটা বলতে চাইলেন। বলতে পাবলেন না। মৃত্যু সম্পর্কে অনেককে বলতে শুনেছি — মানুষ কখন মারা যায বোঝা যায না, এমন কি ডাক্তাবরাও ধরতে পারেন না। পরীক্ষা–টরীক্ষা কবে বলতে হয রোগী মৃত। আমার ধারণা কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। যেই মুহূর্তে সুলায়মান চাচা মারা গেলেন আমি টের পেলাম। তারপবেও অনেকক্ষণ তাব হাত ধরে বসে রইলাম। একটা মানুষ কত ভালো ছিল তা টের পাওযা যায মৃত্যুর পর। আমি তো খুব বেশি মানুষের সঙ্গে মিশি নি। আমার ক্ষুদ্র জীবনে দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি মাবা গেলেন আমাব চোখের সামনে। আমার কাঁদা উচিত। কাঁদতে পারছি না। দুঃখে হৃদয অভিভূত হওয়া উচিত। তাও হচ্ছে না। আমি শান্ত ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হযে এলাম। ক্লিনিকের বারান্দায় সবাই দাঁড়িযে আছে। আমি শান্ত মুখে বললাম, 'যান, আপনারা ভেতরে যান।'

বড় মেযে আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'বাবা কেমন আছেন?'

আমি কিছু না ভেবেই বললাম, 'ভালো।'

ঐ দিন সন্ধ্যা আমার জীবনের একটা বিশেষ সময়।

কাজেই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এখন যা বলব, খুব মন দিয়ে শোনার জন্য। আমি ক্লিনিক থেকে বের হলাম। রিকশা নিতে যাব — মনে হল — আসার সময় টাকা নিয়ে আসি নি। তাতে অসুবিধা নেই। একটা রিকশা নিয়ে বাসায় যেতে পারি। কিন্তু বাসায় পৌঁছে যদি দেখি — মার কাছে টাকা নেই!

পথ খুব বেশি না। এক মাইলেরও কম হবে। অনায়াসেই হেঁটে যাওয়া যায়। রাস্তাভর্তি লোকজন। সোডিয়াম লাইট জ্বলছে। অসুবিধা কী? আমি হাঁটতে শুরু করলাম। মগবাজার চৌরাস্তায় পৌঁছতেই একজন নিতান্ত অপরিচিত লোক আমাকে পেছন থেকে ডাকল — 'রেনু, এই রেনু।'

আমি চমকে পেছনে ফিরে দেখি রিকশায় ৩০/৩৫ বছরের এক ভদ্রলোক বসে আছেন। দুহাতে দুটা বাজারের ব্যাগ। পায়ের কাছে ধবধবে সাদা রঙের একটা হাঁস। ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা দেই — খুব সাধারণ চেহারা। তবে বড় বড় চোখ। চোখের দিকে তাকালে কাজী নজরুল–কাজী নজরুল মনে হয়। কাজী নজরুল মনে হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে তাঁর মাথার চুল লম্বা। ফ্যাশানের লম্বা না। অনেকদিন চুল না কাটলে চুল যেমন ঝাকড়া–ঝাকড়া হয়ে যায় তেমন। তাঁর গায়ে খয়েরি রঙের শার্ট।

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক বিরক্ত গলায় বললেন, 'কী যন্ত্রণায় পড়েছি দেখ তো রেনু। রিকশার চাকা বার্স্ট হয়েছে। বাজারের ব্যাগ একটা ফুটো হয়েছে। টপ টপ করে গোল আলু পড়ছে। হাঁস একটা কিনেছি। ব্যাটা ঠিকমতো বেঁধে দেয় নি। উড়ে যাবার চেষ্টা করছে। হাঁসটাকে পা দিয়ে চেপে ধরে রাখতে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'আপনাকে কিন্তু আমি চিনতে পারছি না।'

ভদ্রলোক অবাক হযে বললেন, 'আমাকে চিনতে পাবছ না মানে? তুমি বেনু না?'

'জ্বি।'

'আমি মবিন। মবিনুব বহমান।'

'আমি এখনো চিনতে পারছি না।'

'বল কী! তুমি কলাবাগানে থাক না?'

'জ্বি না?'

'তুমি আউয়াল সাহেবেব মেযে না?'

'জ্বি না।'

ভদ্রলোক হতভম্ব হযে গেলেন। আমি নিজেও বিস্মিত। তিনি যে মেযেকে চেনেন সে নিশ্চয়ই দেখতে আমার মতো। তাব নামও রেনু। এমন মিলের কোনো মানে হয?

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি অসম্ভব রকম লজ্জিত। তুমি কিছু মনে কোরো না। একবার তুমি বলে ফেলেছি বলেই এখনো বলছি। নয়তো বলতাম না। মাই গড। হোযাট এ মিসটেক!'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আমি কিছু মনে করি নি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি যে মেয়ের কথা বলছি — সে দেখতে অবিকল তোমার মতো। আমি যে ভুল করেছি সেই ভুল ঐ মেয়েকে যারা চেনে তারা সবাই কববে। তুমি বিশ্বাস কর আমার কথা।'

'আপনাকে এত লজ্জায় পড়তে হবে না। আমি কিছু মনে করি নি। আচ্ছা যাই? আপনার হাঁসটা কিন্তু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ভালো করে চেপে ধরুন।'

আমি হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এসে একবার পেছনে ফিরলাম। ভদ্রলোক রিকশা থেকে নেমেছেন। হাতে ব্যাগ বা হাঁস কিছুই নেই। তাঁর পলকহীন দৃষ্টি আমার দিকে। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল তিনি লজ্জায় পাথর হয়ে গেছেন।

সেই রাতে আমার একফোঁটা ঘুম হল না। তাব কারণ সুলাযমান চাচাব মৃত্যু নয। কারণ পাথবের মতো দাঁড়িযে থাকা ঐ ভদ্রলোক। সাবাক্ষণ ঐ ছবি আমার মনে পড়তে লাগল। শেষ রাতে সামান্য তন্দ্রার মতো এল — তখনি ভদ্রলোককে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি দুটি রাজহাঁস নিযে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। দরজার কড়া নাড়লেন। আমি দরজা খুললাম। ভদ্রলোক বললেন, 'রেনু দুটা রাজহাঁস নিয়ে এসেছি। দেখ তো পছন্দ হয কিনা।'

আমি বললাম, 'আপনি কে? আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।'

ভদ্রলোক আহত ও অপমানিত গলায বললেন, 'কী বলছ তুমি?'

'আমি আপনার নামও তো জানি না।'

'আমার নাম মবিন। মবিনুব বহমান।'

'এই নামে আমি কাউকে চিনি না। প্লিজ আপনি যান তো।'

'আচ্ছা যাচ্ছি। হাঁস দুটা রেখে দাও।'

ভদ্রলোক হাঁস দুটা ঘরের ভেতব ছেড়ে দিলেন। তারা প্যাক-প্যাক করে সাবা ঘরময ছুটে বেড়াতে লাগল। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

একজন মধ্যবযস্ক মানুষ। সন্ধ্যাবেলা বাজাব কবে ফিবছে। যাব চেহাবাও আমি সম্ভবত ভালো কবে দেখি নি। সামান্য কিছু কথা হযেছে। আব তাতেই সারাবাত আমাব ঘুম হল না।

ভোরবেলা আমি পুবো ব্যাপাবটা উড়িযে দিতে চেষ্টা কবলাম। একটা আলগা ফুর্তিব ভাব নিযে আসতে চেষ্টা কবলাম। টবে আমাদেব দুটা গোলাপ গাছ আছে — কাঁচি নিযে গাছ ছেঁটে দিতে গেলাম। গাছেব ডাল কাটতে কাটতে সম্ভবত গুনগুন কবে গানও গাইলাম।

আপা বারান্দায় দাঁড়িযে আমাকে দেখছিল। সে কঠিন গলায বলল, 'কী হযেছে বেনু?'

'কিছু হয নি তো।'

'তুই খুশি হবাব ভান কবছিস। কেন?'

আমি রাগী গলায বললাম, 'তুমি বেশি বেশি বোঝ, আমি মোটেই খুশি হবার ভান কবছি না। কাল সন্ধ্যায একজন মানুষকে মাবা যেতে দেখলাম। অপরিচিত কাউকে না, খুব পরিচিত এক জনকে। সারা বাত আমাব ঘুম হয নি। কাজেই আমি এখন কি কবছি না কবছি তা দেখে তুমি আমার চরিত্র বুঝে ফেলবে কীভাবে? তুমি তো অন্তর্যামী নও।'

আপা কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল। আমার মনটা খাবাপ হয়ে গেল।

প্রতিদিন আমি কিছুক্ষণের জন্য হলেও ঘব থেকে বেব হই। সেদিন বেব হলাম না। সাবা সকাল পড়াব চেষ্টা করলাম। দুপুরে ঘুমাতে গেলাম। বাতে ঘুম হয নি। দুপুবে শোযামাত্র ঘুম আসাব কথা। ঘুম এল না।

বিকেল চাবটার দিকে মনে হল — মবিনুর বহমান সাহেব নামেব ভদ্রলোক বাজার করে নিশ্চয় ঐ রাস্তায ফিরবেন। যদিও পব পব দুদিন বাজার করার কথা না। কিন্তু উনি যেমন ভুলো মনেব মানুষ হযতো কিছু একটা ভুলে আনা হয নি। আজ আবার আনতে হবে। কিছু কিছু মানুষ আছে বিকেলে বাজার করতে পছন্দ কবে। অফিস থেকে সবাসরি কাঁচা বাজারে চলে যায . . . । এখন যদি আমি ঘব থেকে বের হই — ভদ্রলোকেব সঙ্গে নিশ্চযই দেখা হবে।

শাড়ি পাল্টাচ্ছি। আপা বলল, 'কোথায যাচ্ছিস?'

'মিতুদেব বাসায়।'

'এখন মিতুদের বাসায যাচ্ছিস? সন্ধ্যা তো হয-হয ফিববি কীভাবে?'

'মিতুর ছোটমামা পৌঁছে দেবেন। যেতেই হবে। মিতুর জন্মদিন। খুব করে বলে দিয়েছে।'

'জন্মদিনে খালি হাতে যাবি?'

'উপায় কী?'

'তুই কি সত্যি মিতুর জন্মদিনে যাচ্ছিস?'

আমি কঠিন গলায় বললাম, 'তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন আপা? কেন তোমাব মনে হল আমি মিথ্যা কথা বলছি?'

'তুই খুব সাজগোজ করেছিস তাই বলছি।'

'বন্ধুর জন্মদিনে সাজগোজ করতে পারব না?'

'অবশ্যই পারবি। কিন্তু আগেও তো আরো অনেক জন্মদিন হয়েছে। তোকে কখনো সাজতে দেখি নি। আজ একেবারে টিপ পরেছিস।'

আমি টিপ খুলে ফেললাম। আপা বলল, 'রাগ করিস না। এমনি বললাম। লাল টিপে তোকে সুন্দর লাগছে। আমাব কাছে পঞ্চাশটা টাকা আছে। নিযে যা। একটা বই-টই কিনে দিস। বন্ধুর জন্মদিন। খালি হাতে কেন যাবি।'

আমি গেলাম ঐ রাস্তায। আধ ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করে ফিরে এলাম। আপা দবজা খুলে আমার দিকে তাকিযে থেকে বলল, 'তুই কি আমাকে কিছু বলবি?'

আমি বললাম, 'বলব।'

'আয় আমার ঘরে আয়।'

আমি সব বললাম কিছুই বাদ দিলাম না। আমাব ধাবণা ছিল আপা কথা শুনে হেসে ফেলবে। সে হাসল না। আমাব হাত ধবে বসে রইল। আমি বললাম, 'আমাব এ বকম হল কেন আপা?'

'তুই ব্যাপারটা যত বড় কবে ভাবছিস আসলে এটা মোটেই তেমন কোনো বড় ব্যাপার না। খুব সামান্য ব্যাপার। ঐ সন্ধ্যায তোব মনটা ছিল অন্যবকম। কাছ থেকে এক জন মানুষের মৃত্যু দেখেছিস। খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছিলি। বাড়ির দিকে বওনা হযেছিস একা একা। যখন তোর মনে হচ্ছে — তুই একা তোর আশপাশে কেউ নেই তখন খুব কোমল গলায এক জন ডাকল — রেনু। রেনু।

ঐ ভদ্রলোকের গলার স্বরে হযতো বাবার গলার স্বরেব খানিকটা মিল ছিল। তুই চমকে উঠলি। তোর সমস্ত শবীর হযতো ঝনঝন করে উঠল। তাবপব খানিকক্ষণ ভদ্রলোকের সঙ্গে তোর কথা হল। ভদ্রলোক অসম্ভব বিব্রত হলেন। বিব্রত মানুষেব উপর এমনিতেই আমাদের মমতা বোধ হয়। তোর চরিত্রে মমতার অংশ প্রবল। তুই অনেকখানি মমতা বোধ করলি — এই হচ্ছে ব্যাপার।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি এত গুছিযে কী কবে বললে?'

আপা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আজ রাতে ভালো করে ঘুমা, ভোরবেলা দেখবি সব ধুয়ে মুছে গেছে। কাল সন্ধ্যায় আর সেজেগুজে ঐ রাস্তায দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে না।'

আপার বেশিরভাগ কথাই ঠিক হয। এই কথা ঠিক হল না। ঘটনাটা মোটেই ধুযে মুছে গেল না। আমি প্রতিদিন ঐ রাস্তায দাঁড়িযে অপেক্ষা করা শুরু করলাম। তবে বিকেলে নয় সকালে। সকালে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অফিসে যাবেন। একদিন না একদিন দেখা হবেই। তিনি চমকে উঠে ডাকবেন — 'রেনু, এই রেনু।' আমি তাঁকে চিনতে পাবছি না এই ভঙ্গি করব না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাব।

৬

দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমাব বলে শুই নি। কেন জানি খুব ক্লান্ত লাগছিল। মা ডাকলেন, 'খেতে আয রেনু।' আমি বললাম, 'আসছি।' বলেই বিছানায় শুয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। মা ডেকে তুললেন না। মা আগের মতো নেই। একবার ডেকেই দায়িত্ব শেষ কবেছেন। সারাদিন না খেলেও দ্বিতীযবাব ডেকে কিছু বলবেন না। তাছাড়া ভাইযার সঙ্গে মার আবার ঝগড়া হযেছে। শীতল ঝগড়া। এই ঝগড়াব পব মা আরো চুপ করে গেছেন। কারো সঙ্গেই কিছু বলছেন না।

ঝগড়ার কাবণ অতি তুচ্ছ। সকালবেলা ভাইযাকে চা দিতে দিতে মা বললেন, 'তুই কি একবার বগুড়া যাবি?'

ভাইযা চাযে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'অবশ্যই যাব। কী ব্যাপার?'

মা অস্বস্তিব সঙ্গে বললেন, 'স্বপ্নে দেখলাম তোব বাবা বগুড়ায।'

ভাইযা গম্ভীর গলায বলল, 'স্বপ্নেব উপব নির্ভব কবে এতদূব যাওযাটা কি ঠিক হবে?'

'আমাব স্বপ্ন ঠিক হয।'

'তুমি যে স্বপ্ন বিশাবদ তাতো মা জানতাম না।'

মা কঠিন গলায বললেন, 'ঠাট্টা করছিস?'

'না ঠাট্টা কবছি না। শুধু জানতে চাচ্ছি তোমাব স্বপ্নেব উপব নির্ভব করে এতদূব যাওযাটা কি ঠিক হবে?'

'ঠিক না হলে যাবি না।'

'বাগেব কথা না মা। যুক্তিব কথা। বগুড়া তো ছোট্ট একটা জাযগা না। অনেক বড় জাযগা। সেখানে বাবাকে কোথায খুঁজব? স্বপ্নে এ্যাড্রেস পেযেছ?'

'তোকে কিছু খুঁজতে হবে না। স্বপ্ন তো স্বপ্নই। স্বপ্নেব আবাব কোনো মানে আছে?'

বলতে বলতে মাব চোখে পানি এসে গেল। মা আঁচলে মুখ ঢেকে তাঁর ঘবে ঢুকে দবজা বন্ধ কবে দিলেন। সেই দবজা বাত দশটার আগে খোলা হল না।

মাকে খুশি কববাব জন্যেই ভাইয়া বগুড়া ঘুবে এল। হোটেলগুলোতে খোঁজ করল। থানাব ওসি সাহেবেব সঙ্গে দেখা কবল। কাজেব কাজ কিছু হল না। ভাইযা ফিবল ঘুসঘুসে জ্বর নিযে।

মাব বাগ পড়ল না।

ভাইযা যখন বলল, 'মা হাসিমুখে দুটা কথা আমাব সঙ্গে বল। বগুড়া দেখে এলাম তো।'

মা কিছুই বললেন না। ভাইযা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এব পবেব বাব যদি এ জাতীয স্বপ্ন দেখ তাহলে অবশ্যই আসল ঠিকানা জেনে নেবে।'

যে কথা বলছিলাম সে কথায় ফিবে আসি। আপনি নিশ্চযই আমার কথা বলার ভঙ্গিতে বিরক্ত হচ্ছেন। আসলে আমি একনাগাড়ে কোনো বিষয নিযে কথা বলতে পাবি না। প্লিজ, কিছু মনে কববেন না।

ক্লান্ত হযে শুযেছি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে গেছে। দিনে ঘুমালে আমি সব সময স্বপ্ন দেখি। সেদিনও স্বপ্ন দেখছি। দুঃস্বপ্ন। যেন একটা লোমশ ভালুকের মতো লোক দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে।

হাতুড়ি দিয়ে দরজায প্রচণ্ড জোরে বাড়ি দিচ্ছে। তার হাতুড়ির শব্দেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে শুনি সত্যি সত্যি দরজায কে যেন টোকা দিচ্ছে। আমি উঠে গিযে

দরজা খুললাম। ভবঘুরে টাইপের একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে চাদর। লম্বা লম্বা চুল। চোখ লাল। আমি বললাম, 'কাকে চান?'

'রঞ্জু সাহেব বাসায় আছেন?'

আমি না জেনেই বললাম, 'উনি বাসায় নেই।' আমার ইচ্ছে করছিল না যে ভাইযা লোকটার সঙ্গে কথা বলে। আমার মনে হচ্ছিল লোকটা ভালো না। হয়তো একটু আগে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি বলে এরকম মনে হচ্ছে।

'কখন ফিরবেন?'

'জানি না কখন ফিরবে। ভাইয়ার সঙ্গে আপনার কী দরকার?'

'উনি আপনার ভাই?'

'হুঁ। আপনার প্রয়োজনটা কী?'

'একটা খবর ছিল।'

'কী খবর?'

'আড়ালে বলতে চাই।'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। আড়ালে বলতে চাই মানে? এমন কী খবব লোকটার কাছে আছে যা সে আড়লে বলতে চায? তাছাড়া এখন আমাদের আশপাশে কেউ নেই। এবচে' আড়াল কী হতে পারে?

'খবরটা আপনার পিতা সম্পর্কে।'

'বলুন।'

'উনি কোথায আছেন আমি জানি।'

'বলুন কোথায় আছেন।'

'নারায়ণগঞ্জে থাকেন। একটা বিবাহ্ কবেছেন। তাঁর একটা কন্যা সন্তান আছে।'

'আপনি কে?'

'আমি কে তা দিয়ে আপনার প্রযোজন কী? আমার খবর সত্য। আমি রঞ্জু সাহেবকে খবর দিয়েছিলাম তিনি বিশ্বাস করেন নাই। গালাগালি কবেছেন। কিন্তু খবব সত্য।'

আমি হতভম্ব হযে তাকিযে রইলাম। এবং এই প্রথম বুঝলাম যে আমি আসলে খুব শক্ত নার্ভের মেয়ে। অন্য কেউ হলে হৈচৈ শুরু কবে দিত। আমি কিছুই করলাম না। চুপচাপ লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে দেযাশলাইযের কাঠি দিযে দাঁত খোঁচাচ্ছে।

'আপনার পিতা যাকে বিবাহ করেছেন তার নাম সরজুবালা। হিন্দু মেযে। বিবাহ হয়েছে চার বছর আগে।'

'এই সব খবর আপনি আমাকে দিচ্ছেন কেন? আপনাব উদ্দেশ্য কী?'

লোকটা বিড়ি ধরাল। উৎকট গন্ধ। ঢাকা শহরে আমি কাউকে বিড়ি খেতে দেখি নি। ঢাকা শহরের রিকশাওয়ালারা পর্যন্ত সিগাবেট খায। এই লোকটা বিড়ি টানছে। আমি কঠিন গলায় বললাম, 'আপনার উদ্দেশ্য কী?'

'আমি সামনের মাসের এক দুই তারিখে আবার আসব। তিন হাজার টাকা জোগাড় করে রাখবেন। আমি আপনাদের ঠিকানা দিব।'

'আপনার নিজের ঠিকানা কী?'

'আমার নিজের কোনো ঠিকানা নাই। আপনারা টাকা জোগাড় কবে রাখবেন। সামনের মাসের এক দুই তারিখে আসব।'

লোকটা চলে যাবার পর আমি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মার ঘরে ঢুকলাম। মা ঘুমাচ্ছেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ছোটখাটো এক জন মহিলা। তাঁর চোখের কোণে পানির দাগ।

কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি মার ঘর থেকে আপাব ঘরে ঢুকলাম। আপা বলল,

'কার সঙ্গে কথা বলছিলি?'

'কারো সঙ্গে না। এক লোক ঠিকানা জানতে চাচ্ছিল।'

'ও আচ্ছা। চা খাওয়াতে পারবি রেনু?'

'পারব।'

আমি চা বানিয়ে নিয়ে এসে দেখি আপা শাড়ি পাল্টাচ্ছে। চুল বেঁধেছে। আপাকে লাগছে ইন্দ্রানীর মতো। আমি বললাম, 'কোথাও যাচ্ছ?'

'হুঁ।'

'কোথায়?'

'আমার এক বান্ধবীর জন্মদিনে।'

আপা চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। আমি তাকিয়ে আছি মুগ্ধ চোখে। এই সামান্য সাজেই কী সুন্দব যে আপাকে লাগছে! আল্লাহ্ কিছু কিছু মানুষকে এত সুন্দব করে কেন বানান?

'রেনু আমি কি ঠিক করেছি জানিস? এখন থেকে সব বান্ধবীর জন্মদিনে যাব। বিযেব অনুষ্ঠানে যাব। তাতে লাভ কি হবে জানিস — কাবোর না কারোর চোখে পড়ে যাব। আমার এখন খুব দ্রুত বিয়ে হওয়া দরকাব। ভাইযাব মাথা খারাপ হবাব বেশি দেবি নেই। পুবোপুবি মাথা খাবাপ হয়ে গেলে আমাব আর বিয়ে হবে না। সুন্দবী মেয়ে বিয়ে না হওয়া মানে ভযাবহ সর্বনাশ!'

'মাঝে মাঝে তুমি খুব স্বার্থপরের মতো কথা বল আপা।'

'স্বার্থপবেব মতো না। আমি বুদ্ধিমতী মেযের মতো কথা বলি। রূপবতীদেব বুদ্ধিমতী হওয়াতে বাধার কিছু নেই। এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হলে আমাদের অবস্থা কী হবে কখনো ভেবেছিস?'

'কিছু একটা হবেই।'

'কিছুই হবে না রেনু। যত দিন যাবে অবস্থা ততই জট পাকিয়ে যাবে। ঐ যে লোকটা তোকে বলল, বাবার খোঁজ পাওয়া গেছে। দেখা যাবে সেটাও সত্যি।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'তুমি কথা শুনেছ?'

'শুনব না কেন? আমি তো বধিব না। আমার কান খুব পবিষ্কাব। ভাইযার সঙ্গে লোকটার যে কথা হয় তাও শুনেছি।'

'কিছু তো বল নি।'

'বলব কেন? আগ বাড়িয়ে আমি কিছু বলি না।'

'তোমাব কি ধাবণা লোকটা সত্যি কথা বলছে?'

'না — মিথ্যা বলছে। বিবাট ফ্রড বলেই টাকা চাচ্ছে। তবে সব মিথ্যাব সঙ্গে খানিকটা সত্যি থাকে। অ্যাবসলিউট ট্রুথ বলে কোনো জিনিস নেই, অ্যাবসলিউট ফলস বলেও কিছু নেই।'

আপা উঠে দাঁড়াল। আমাকে বলল, 'তুই আমার সঙ্গে রাস্তার মোড় পর্যন্ত আয়। চাযেব দোকানেব কযেকটা ছেলে আমাকে খুব বিরক্ত করে। একা একা যেতে ইচ্ছা করে না।'

আমি আপার সঙ্গে যাচ্ছি। আপা বলল, 'আয় আমরা হাত ধরাধবি কবে হাঁটি।' আমি আপাব হাত ধরলাম। আপা গলাব স্বব নিচু কবে বলল, 'বেনু আমি প্রচণ্ড আতংকের মধ্যে বাস কবি।'

'কেন?'

'আমার সারাক্ষণই মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্য হবে আভার মতো। সন্ধ্যাবেলায় সেজেগুজে সংসদ ভবনের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে হবে যাতে কোনো পুরুষ মানুষ দয়া করে এগিয়ে আসে।'

'তুমি এসব কী বলছ আপা?'

'না জেনে বলছি না রেনু। জেনেই বলছি। আভার সঙ্গে আমার এক দিন দেখা হয়েছিল। সব সে খুলে বলল — কিছুই গোপন করল না। অসাধারণ একটা মেয়ে। ওর ঠিকানা আছে আমার কাছে। আমি কি ঠিক করেছি জানিস একদিন একগাদা গোলাপ ফুল নিয়ে আভার বাসায় উপস্থিত হব।'

'কেন?'

'একটা অসাধারণ মেয়ে। ফুল ছাড়া ওর কাছে যাওয়া যায় না। রেনু একটা কথা বলি, তোর কাছে যে লোকটা এসেছিল খবরদার ভাইযাকে এই সম্পর্কে কিছু বলবি না। বেচাবা এমনিতেই নানান সমস্যায় অস্থির হয়ে আছে। ওকে আর জড়ানো ঠিক হবে না।'

ভাইয়াকে আমি কিছুই বললাম না। খুব স্বাভাবিক আচরণ করতে লাগলাম। হৈচৈ গল্প-গুজব আগের চেয়ে আরো বেশি করলাম। ভাইয়া কোথেকে দড়ি কাটার এক ম্যাজিক শিখে এসেছে। ম্যাজিক দেখাতে গিযে ধরা খেযে গেল। আমরা খুব হাসাহাসি কবতে লাগলাম। আমাদের দেখে কে বলবে যে আমাদের কোনো দুঃখ কষ্ট আছে।

আপার কাছ থেকে ঠিকানা নিযে একদিন গেলাম আভাকে দেখতে। আভা ঘবেই ছিল। আমাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল — 'ও আল্লা রেনু, রেনু। মা দেখ দেখ রেনু এসেছে, রেনু।' যেন আমি বিবাট বড় এক স্টাব। আমার এ বাড়িতে আসা যেন ইতিহাসের বইয়ে লিখে রাখার মতো ঘটনা।

'কেমন আছ রেনু?'

'ভালো আছি।'

'তোমার ভাইয়া কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

'ও এখন শুধু পাগলদের সঙ্গে ঘুরঘুর কবে তাই না?'

'হুঁ।'

'আমি দুদিন দেখেছি। দুদিনই পাগলের সাথে। এক দিন দেখি সে এক পাগলের গলা জড়িয়ে ধরে হাঁটছে। প্রায চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলালাম। আমি ওর সামনে পড়তে চাই না।'

'কেন চান না?'

আভা হাসতে হাসতে বলল, 'এক সময আমার অনেক স্বপ্ন ছিল রেনু। এখন স্বপ্ন-টপ্ন নেই। তোমার ভাইয়ের দরকার স্বপ্ন আছে এমন একটি মেয়ে। আমাকে দেখলে সে আবার আটকে যাবে। কাজেই তোমার যে আমার সঙ্গে দেখা হযেছে এই খবর তুমি চেপে যাবে এবং চেষ্টা করবে যেন দুলু নামের মেযেটির সঙ্গে তার বিযে হয। মনে থাকবে?'

আমি জবাব দিলাম না।

আভা ক্লান্ত গলায় বলল, 'পুরুষ মানুষ সম্পর্কে আমার মোহভঙ্গ হযেছে রেনু। আমি আর কোনোদিন কোনো পুরুষকে বিয়ে করে সুখী হতে পারব না। মাকড়সা দেখলে আমাদের যেমন ঘেন্নায় শরীর কেমন করতে থাকে, পুরুষ মানুষ দেখলেও আমার এমন

হয়। যাক এসব কথা, রেনু তোমার চোখ কিন্তু আরো সুন্দর হয়েছে। কোনো কথা না বলে তুমি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাক তো।'

আভা আপার বাসা থেকে ফিববার পথে আমার কেন জানি মনে হল ঐ মানুষটার সঙ্গে আমার দেখা হবে। দেখা হবেই। এবং অল্প কিছু সময তিনি যদি আমাব সঙ্গে কথা বলেন তাহলে আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হযে যাবে। আমার মনে হতে লাগল তিনিও আভা আপার মতো আমার চোখের দিকে তাকিযে বিস্মিত হযে বলবেন, 'আরে তোমার চোখ দুটি তো ভারি সুন্দর!'

আমি ঐ রাস্তায় অপেক্ষা কবতে লাগলাম। সন্ধ্যা মিলিযে অন্ধকার হযে গেল। গুণ্ডা ধরনেব এক ছেলে আমার কাছে এসে বলল, 'এই যে আপামনি অনেকক্ষণ ধরে ঘোবাঘুবি করছেন। কেস কী?'

আমি বাসায় ফিরলাম। বিকশা করে কাঁদতে কাঁদতে ফিবলাম। কেন কাঁদছিলাম নিজেও জানি না। রিকশাওযালা দবদমাখা গলায বলল, 'কী হইছে আপনেব? কী হইছে?'

কী যে আমাব হযেছে তা কি আমি নিজেই জানি?

৭

বাসা ছেড়ে দেযাব জন্যে যে এক মাস সময দেযা হযেছিল সেই এক মাস সাত দিন আগে পাব হযেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে কেউ কিছু বলছে না। সুলাযমান চাচার তিন মেযে এবং তাঁদের স্বামীদেব সঙ্গে আমাদেৎ বেশ কবাব দেখা হযেছে। তাঁবা আমাদের কিছু বলেন নি। সবাই এমন ভাব করেছেন যেন আমাদের দেখতে পান নি। কোনো বিচিত্র কারণে আমরা অদৃশ্য হযে আছি। সামনে থাকলেও আমাদেব দেখা যায না। বহস্যটা কী আমবা বুঝতে পারছি না। তবে সবাই এক ধবনের অনিশ্চযতায ভুগছি। না সবাই না। ভাইযা কোনো কিছুতে ভুগছে না। সে তার জাপানি ভাষা নিযে ব্যস্ত। তাব জাপানি ভাষার ফাইনাল পবীক্ষা। পাস কবলে সার্টিফিকেট পাবে। তার ধারণা এক জন পাস কবলেও সে পাস কববে। সব কিছু ছেড়েছুড়ে এখন সে জাপানি পড়ছে।

খাবাব টেবিলেও জাপানি ভাষা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলছে না।

'বুঝলি খুকি, আমরা যেমন এক দুই কবে জিনিস গুনি জাপানিরা তাই করে। তবে একেক বকম জিনিসের জন্যে একেক ধরনের এক দুই ব্যবহার কবে। জাতি হিসেবে এবা খুব পাগলা।'

'তোমার কথা কিছুই বুঝলাম না।'

'সমতল জিনিস, যেমন — রুমাল, তক্তা এইসব গোনার জন্যে তাদেব এক রকম সংখ্যা। এক হল ইচিমাই, দুই হল নিমাই, তিন হল সানমাই। আবার জন্তু এবং মাছ গোনার জন্য অন্য রকম সংখ্যা। এক হল ইপপিকি, দুই হল নিহিকি, তিন হল সানবিকি। লম্বা জিনিস যেমন — কলম, কলা, ছাতা এগুলো গোনাব জন্য অন্য রকম সংখ্যা। এক হল ইপপোন, দুই হল নিহোন, তিন হল সানবোন।'

'পাগল নাকি?'

'অফকোর্স পাগল। ওরা যখন শোনে আমরা সব কিছু গোনার জন্যে এক দুই ব্যবহার করি তখন ওরাও চোখ কপালে তুলে বলে — পাগল নাকি হা-হা-হা।'

মা এবং আপা কেউই ভাইয়ার এই সব আলাপে অংশগ্রহণ করে না। আপা মাঝে মধ্যে কিছু বললেও মা কখনো বলেন না। ভাইয়ার সঙ্গে তাঁর ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছে। ভাইয়া বেশ কবার মিটমাটের চেষ্টা করেছে, লাভ হয় নি। মা আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। বলা যেতে পারে বাসার পরিস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক।

আপার টিচার তার দুই বন্ধুকে নিয়ে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ গল্প-টল্প করলেন। চা খেলেন। ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য প্রশ্ন করলেন। উত্তর যা পেলেন তার কোনোটিই তাদেব পছন্দ হল না। কিছু কিছু উত্তর শুনে রীতিমতো ভড়কে গেলেন। প্রশ্নের উত্তর বেশিরভাগই দিল ভাইয়া। সে না দিয়ে যদি আমি দিতাম তাহলে হযতো বা কিছুটা সামলে দিতাম। ভাইয়া সে সুযোগ দিল না। প্রশ্ন-উত্তরগুলো এরকম :

স্যার : এই বাড়ি কি আপনাদের নিজের?

ভাইয়া : পাগল হয়েছেন। ভাড়া বাড়ি। তাও অনেকদিন ভাড়া দেয়া হচ্ছে না। যে কোনো মুহূর্তে বের করে দেবে।

স্যার : গ্রামের বাড়িতে নিশ্চযই জমিজমা আছে?

ভাইয়া : কিছুই নেই। সামান্য ছিল, বাবা তা বিক্রি কবে ক্যাশ টাকা করেছিলেন ব্যবসার জন্যে। পাটের ব্যবসায লাগানো হয়েছিল -- লাভ হয নি। আমও গেছে ছালাও গেছে।

স্যার : আপনার বাবা ব্যবসা করেন?

ভাইয়া : বাবা যা করেন তাকে ব্যবসা বলা ঠিক হবে না। তাতে ব্যবসা শব্দটার অমর্যাদা হবে। বাবাকে ভদ্র ফেরিওযালা বলতে পারেন। তিনি এক জায়গার জিনিস অন্য জাযগায আনেন।

স্যার : ইনি কি আছেন বাসায?

ভাইয়া : না, উনি যে কোথায আছেন আমরা জানি না। চার মাস ধবে বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই।

স্যার : (পুরোপুরি ঘাড়বে গিযে) কেন?

ভাইয়া : বুঝতে পারছি না। সম্ভবত আমাদের পছন্দ করেন না।

এ জাতীয বাক্যালাপের পর বিয়ের কথা একশ হাত পানির নিচে চলে যাওযার কথা। গেলও তাই। ভদ্রলোক শুকনো মুখে চলে গেলেন।

আপা বলল, 'আবার আসবে। এক সপ্তাহের মধ্যে আসবে। কোনো জায়গায কিছু ঠিক করতে না পেরে আসবে।'

'ঠিক করতে পারবে না কেন?'

'চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝিস না কেন? ঘোড়ার মতো মুখ। এই চিজকে কে শখ করে বিয়ে করবে? আমার কাছে আবার আসা ছাড়া গতি নেই। আবার আসবে। শেষ মুহূর্তে আসবে।'

'যদি আসে তুমি রাজি হবে?'

'জানি না, হয়তো হব। এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না। পালিয়ে যেতে ইচ্ছা কবছে। ঘোড়া টাইপ একটা ছেলেকে বিয়ে না করলে পালানো যাবে না।'

'তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?'

আপা সরু চোখে তাকাল।

সে আরো সুন্দর হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই সুন্দর হচ্ছে। এটাও আমাদের জন্যে ভয়ের কথা। সুন্দরী মেয়েদের সমস্যার অন্ত নেই। বাসার সামনে আজেবাজে ধরনেব কিছু ছেলে এখন জটলা পাকায়। এর মধ্যে এক জনকে দেখলে ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সে মোটর সাইকেলে চড়ে আসে। মাথাভর্তি বাবরি চুল। চোখ সানগ্লাসে ঢাকা। সে একা আসে না। তার কোমর জড়িয়ে ধরে আরেকজন বসে থাকে। সেই জন রোগা টিঙটিঙে। সম্ভবত চামচা টাইপের কেউ। চোখে সানগ্লাসওয়ালা মোটর সাইকেল থেকে নেমে পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। চামচাটা পান এনে দেয় সিগাবেট এনে দেয়। পাশে দাঁড়িয়ে হ্যা-হ্যা করে হাসে।

আমাদের বাসাটাই যে এদের লক্ষ্য তা অত্যন্ত পরিষ্কার। কারণ এরা তাকিয়ে থাকে আমাদেব বাসাব দিকে। কোনো কোনো দিন দুটা মোটর সাইকেলে করে চাব জন এসে উপস্থিত হয়। এরা কখনো বসে না। পা ফাঁক কবে দাঁড়িয়ে থাকে। সম্ভবত দাঁড়িয়ে থাকাটাই স্টাইল। এক বিকেলে সানগ্লাসওয়ালা আমাদের বাসাব কড়া নাড়ল। আমি দবজা খুললাম। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে বললাম, কী চান?'

সানগ্লাসওয়ালা বলল, 'আগুন দরকার। দেয়াশলাই আছে?'

আমি দেযাশলাই এনে দিলাম। সে সিগারেট ধবাতে ধবাতে বলল, 'মীবা কি বাসায়?'

'হ্যাঁ বাসায, কেন?'

'না এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

সে লম্বা লম্বা পা ফেলে মোটর সাইকেলেব দিকে বওনা হল। আমি বললাম, 'দিযাশলাই দিযে যান।'

'ও সরি, ক্যাচ ধব তো।'

বলে দূব থেকে দেয়াশলাই ছুঁড়ে দিল। তাব সঙ্গীবা হেসে উঠল। আমি কঠিন মুখ কবে অনেকক্ষণ দাঁড়িযে রইলাম। এর বেশি আমাব আব কি বা কবাব আছে! আমাদেব পাশেব বাড়ির ভাড়াটেব স্ত্রী একদিন এসে কথায কথায আমাব মাকে বললেন — 'আপা বড় মেয়েটাকে আপনি তাড়াতাড়ি বিয়ে দিযে দিন।'

মা বললেন, 'কেন?'

'সবাই কি সব বলাবলি করে, শুনে ভয লাগে শেষটায যদি কোনো কেলেংকাবি হয।'

'কী বলাবলি করে?'

'গুণ্ডা টাইপেব ছেলে রোজ আসে। এদেব বিশ্বাস নেই। ধরুন খালি বাসায এবা যদি কোনো দিন এসে মেয়ে উঠিযে নিযে যায। তখন কী কববেন? এরকম তো হচ্ছে আজকাল। খববের কাগজ খুললেই দেখা যায় — অপহরণ, ধর্ষণ। আপা, আপনি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করুন কিংবা দূরে কোথাও পাঠিযে দিন।'

এ জাতীয় কথায আতংকগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। আমবা আতংকগ্রস্ত হই। কিন্তু ভাইযা নির্বিকাব। সে হাসতে হাসতে বলল, 'যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পা ফাঁক করে দাঁড়িযে থাকে তাদেরকে ভযের কিছু নেই। এরা হার্মলেস ভেজিটেবল। কাজকর্ম নেই বলে দাঁড়িয়ে থাকে।'

আমি ভাইয়াকে বললাম, 'তুমি তাদের কিছুই বলবে না?'

'কিছু বললে ওদের গুরুত্ব দেয়া হবে। এরা এটাই চাচ্ছে। কিছু না বলাই ভালো।'

'ওদের কাণ্ডকারখানা আমার কিন্তু ভালো লাগছে না। ওরা কোনো একটা মতলব কবছে।'

'মানুষের বাড়ির সামনে পা মেলে দাঁড়িয়ে কেউ মতলব করে না। তুই খামাখা চিন্তা করিস না তো। চিন্তা করে কখনো কোনো সমস্যার সমাধান হয় না।'

'অতি তুচ্ছ সব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার কোনো মানে হয় না। আমাদের সামনে বিশাল সমস্যা।'

'বিশাল সমস্যাটা কী?'

'যথাসময়ে জানতে পারবি।'

'এখনি বল।'

ভাইয়া হাসতে হাসতে বলল, 'মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাচ্ছি। ছোটখাটো সব লক্ষণ আমার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। রাস্তায় নামলেই পরিচিত লোকজনদের দেখি — যারা আসলে ত্রিসীমানায় নেই। যেমন গতকাল রেসকোর্সের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি — পাবলিক লাইব্রেরির দিকে, কী মনে করে ডান দিকে তাকালাম, দেখি সুলায়মান চাচা। রেসকোর্সের ভেতর একটা গাছের নিচে বসে আছেন।'

'কী বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ তাই। বসে বসে বাদাম খাচ্ছেন। আমাব দিকে তাকিযে মিটমিট করে হাসছেন। প্রচণ্ড একটা শক খেলাম — ছুটে গেলাম, দেখি সুলাযমান চাচা না। অন্য একজন।'

'এটা তো ভাইয়া এমন কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার না।'

'একবার ঘটলে অস্বাভাবিক না। বার বার ঘটলেই অস্বাভাবিক। আমি আভাকে দেখেছি তিন বার। অথচ কোনো বারই আভা ছিল না। ছিল অন্য মহিলা। একবাব দেখলাম আভা রিকশা করে যাচ্ছে — আমাকে দেখে ডাকল — এ্যাই এ্যাই। আমি বাস্তাব ওপাশে ছিলাম, দৌড়ে পাব হলাম — আরেকটু হলে একটা টেম্পোর নিচে পড়তাম। যাই হোক রাস্তা পার হয়ে দেখি অন্য মেয়ে। তারপর বাবার কথা ধর — বাবাকে তো প্রাযই দেখি।'

আমি ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। সে সহজ গলায বলল, 'নানান ঝামেলা এবং যন্ত্রণায ব্রেইন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পাগলের সঙ্গে সব সময ঘোবাঘুবি কবি — সেটাও একটা ব্যাপাব।'

'এখনও পাগলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি কব?'

'হুঁ। করি। মানুষ হিসেবে এরা অসাধারণ। অতি ভদ্র। আমি ওদেব সঙ্গে জাপানি ভাষায় কথা বলি। ওরা এমন ভাব করে যেন কথা বুঝতে পারছে। কিছু কিছু আবাব বুঝতেও পারে।'

'ভাইয়া চুপ কর তো।'

'আচ্ছা যা চুপ করলাম।'

'চা খাবে? চা বানিয়ে আনব?'

'নিয়ে আয়।'

'আজ তুমি বেরুবে না?'

'না। শরীরটা ভালো লাগছে না।'

চা এনে দেখি ভাইয়া চাদর গায়ে ঘুমাচ্ছে। তার গায়ে জ্বর। বেশ ভালো জ্বর।

বিকেলে জ্বর গায়েই সে বেরুল। টিউশ্যানি আছে। ছাত্রের পরীক্ষা। টিউশ্যানি মিস করলে সমস্যা হবে — ছাত্রের মা ভয়ংকর কড়া। এই টিউশ্যানি হাতছাড়া করা যাবে না। এরা টাকা ভালো দেয়। আমি বললাম, 'তুমি আমাকে ঠিকানা দাও ভাইয়া — আমি পড়িয়ে আসি। জ্বর গায়ে তুমি বেরুতে পারবে না।'

ভাইয়া হাসতে হাসতে বলল, 'জ্বরকে পাত্তা দিলে জ্বর মাথায় চড়ে বসে। অসুখ বিসুখ হলে এদের অগ্রাহ্য করতে হয়। অগ্রাহ্য করলে এরা লজ্জায় পালিয়ে যায়। এদের লজ্জা বেশি।'

ভাইয়া রাতে প্রবল জ্বর নিয়ে ফিরল। কয়েকবার বমি করে নেতিয়ে পড়ল। আমি এবং আপা সারারাত জেগে রইলাম। মা দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন — ভেতরে ঢুকলেন না। আশ্চর্য! এখনো তাঁর রাগ পড়ে নি। ঘরে থার্মোমিটার নেই, তাপ কত দেখতে পারছি না। ভাইয়া আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আছে। মাঝে মাঝে চোখ মেলে তাকাচ্ছে। টকটকে লাল চোখ। ঠোঁট শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে কিন্তু মুখ হাসি হাসি।

আপা বলল, 'ভাইয়া কেমন লাগছে?'

ভাইয়া বলল, 'কামিনারি দে দেন্‌তোও গা কিএমাশিতা।'

'এর মানে কী?'

'মানে হচ্ছে – বজ্র পড়ায় বাতি নিভে গেল।'

'ঘুমাতে চেষ্টা কর তো ভাইয়া।'

'চেষ্টা করছি, লাভ হচ্ছে না। পৃথিবী যে নিজের অক্ষের উপর ঘোবে এই ব্যাপারটা আগে বিশ্বাস কবি নি। এখন করছি। আমাব চাবদিক ভনভন কবে ঘুরছে। জয় বিজ্ঞান।'

আমি বললাম, 'চুপচাপ শুয়ে থাক।'

ভাইযা হাসতে হাসতে বলল, 'শুযেই তো আছি দাঁড়িযে আছি নাকি?'

শেষ রাতেব দিকে ভাইযাব জ্বব একটু নামল, সে বিছানায উঠে বসল। আমাদেব দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুব ট্রাবল দিয়েছি এখন ঘুমাতে যা।'

'শরীব ভালো লাগছে?'

'খানিকটা লাগছে। মা কি জেগে আছে?'

'হুঁ। বরান্দায় বসে আছেন।'

'মাকে ডেকে আন তো। মাব বাগ ভাঙাবার ব্যবস্থা করি।'

মা ঘবে এলেন। ভাইযা বলল, 'বসো মা।'

মা বসলেন না। দাঁড়িযে বইলেন। তাঁব স্বাস্থ্য যে এতটা খারাপ হযেছে আগে লক্ষ কবি নি। ছাযাব মতো এক জন মানুষ। ভাইযা হাত বাড়িযে মার হাত ধরল। মাকে টেনে পাশে বসিযে বলল, 'বাবা কোথায আছেন এই সম্পর্কে অনেক চিন্তাভাবনা করে একটা থিওবি বেব করেছি। তোমাকে বলি শোন — বাবার একটা চিঠির কথা তোমার মনে আছে? যেখানে বেনাপোল বর্ডাব দিযে সুপারি আসার কথা লেখা, ঐ চিঠি থেকে আমাব ধাবণা হযেছে — বাবা বেনাপোল গিয়েছিলেন। তারপর লোভে লোভে বর্ডার ক্রস কবেছেন। ব্যবসার জন্যেও যেতে পারেন আবার দেশ দেখার জন্যেও যেতে পারেন। তাঁব তো ঘোরার বাতিক আছে। ঐখানে ইন্ডিযান পুলিশের হাতে ধবা পড়েছেন। তারা বাবাকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। খবরের কাগজে দেখেছি কোলকাতার জেলে সত্তব জনের মতো বাংলাদেশি আছে। বিনা পাসপোর্টে যাবা যায তাদের ছমাসের মতো জেল হয। ছমাস প্রায হতে চলল। আমার ধারণা, বাবার ফিরে আসার সময হযেছে।'

আমরা সবাই হতভম্ভ হয়ে ভাইযার দিকে তাকিয়ে আছি।

ভাইযা বলল, 'আমি কোলকাতায় খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছি। লাভ হয় নি। নিজেই যাব। পাসপোর্ট করেছি। এই দেখ পাসপোর্ট।

ভাইয়া তোশক উল্টে পাসপোর্ট বের করল।

'মা শোন, তুমি যে ভাব, বাবার ব্যাপারে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, এটা ঠিক না। আমাব কোনো বন্ধুবান্ধব নেই মা। বাবা ছিলেন বন্ধুর মতো। তুমি যতটুকু আগ্রহ

নিয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করছ আমি তার চেয়ে কম আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি না। বাবা একদিন ফিরে আসবে এবং হাসতে হাসতে বলবে — "ফ্যানি ম্যান। ভেরি ফানি ম্যান।" এটা শোনার জন্য আমি কতটুকু ব্যস্ত তা তুমি কোনোদিন বুঝবে না। আমি জ্বরে মরে যাচ্ছিলাম, তুমি দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলে। একবার ভেতরেও ঢুকলে না। তোমার এই অপরাধ আমি কোনোদিন ক্ষমা করব না বলে ভেবেছিলাম, মত পাল্টেছি। তোমাকে ক্ষমা করা হল। এখন তুমি ঘুমাতে যাও মা। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

মা ঘর থেকে চলে যাবার পর পর আমি বললাম, 'তুমি যে কথাটা বললে তা কি নিজে বিশ্বাস কর?'

ভাইয়া রাগী গলায় বলল, 'বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস না করলে পাসপোর্ট করিয়েছি শুধু শুধু?'

আমি নিচু গলায় বললাম, 'আমার কাছে একটা লোক এসেছিল সে . . .'

ভাইয়া আমাকে থামিয়া দিয়ে বলল, 'চুপ কর। পাগলের মতো কথা বলবি না।

'সত্যি হতেও তো পারে।'

ভাইয়া চোখ লাল করে বলল, 'যা তুই আমার সামনে থেকে। গেট আউট। গেট আউট।'

মা ভাইয়ার চিৎকার শুনে ছুটে এসে বললেন, 'কী হয়েছে?'

ভাইয়া হাসিমুখে বলল, 'কিছুই না। রেনুকে একটা হিটলারি ধমক দিয়ে দেখলাম — ধমক দিতে পারি কিনা। ভালো কথা মা তোমাদের বলতে ভুলে গেছি আমাব একটা চাকবি হচ্ছে। দুলুর বাবা, মন্ত্রী সাহেব নিজেই আমাকে ডেকে চাকরি দিতে চেয়েছেন। ভালো একটা খবর ভেবেছিলাম চাকরি পাবার পর দেব। আগেভাগেই দিয়ে ফেললাম। এখন দযা করে একটু হাস মা। অনেকদিন তোমাব মুখের হাসি দেখি না।'

দ্বিতীয় দিনে ভাইয়ার জ্বর দুপুরবেলাব দিকে খুব বাড়ল। একবাব বমি কবল। বমির সঙ্গে টাটকা রক্ত। আমি হকচকিযে বললাম, 'রক্ত কেন?'

ভাইয়া বলল, 'টনসিল থেকে রক্ত আসছে। খামাখা মুখ এরকম কবিস না। জ্বব নেমে যাচ্ছে।'

সত্যি সত্যি বিকেলের দিকে জ্বর নেমে গেল।

ভাইয়ার অসুখের কথা কাউকে আমরা বলি নি কিন্তু দুলু আপা কোথেকে যেন খবর পেয়ে চলে এলেন। একবার ভাইযার ঘবে উঁকি দিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

'অনেকদিন তুই আমাদের বাসায় আসিস না। কারণটা কী বল তো?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'মন্ত্রীর বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে না। তবু একদিন গিয়েছিলাম। গেটে পুলিশ ধরল। হেনতেন কত প্রশ্ন। কার কাছে যাবেন? কেন যাবেন? শেষে রাগ করে চলে এসেছি।'

দুলু আপা প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'দুদিন পর পর তোর ভাইযার জ্বর হয কেন বল তো?'

'জানি না।'

'অকারণে রোদে ঘোরাঘুরি করে। জ্বর হবে না তো কী? আমি দুদিন দেখেছি, ঝাঁঝাঁ রোদে হাঁটছে। সঙ্গে পাগল ধরনের এক জন মানুষ।'

'পাগল ধরনের না আপা। সত্যিকারের পাগল। ভাইয়া আজকাল পাগল ছাড়া কারো সঙ্গে মেশে না। তোমার সঙ্গে ভাইযার খুব ভালো মিল হবে। তুমিও পাগল।'

দুলু আপার মুখ টকটকে লাল হয়ে গেল — খানিকটা লজ্জায়, খানিকটা আনন্দে।

পৃথিবীর সবচে' সুন্দর দৃশ্য হচ্ছে একটি মেয়ের লজ্জা ও আনন্দ মেশানো লালচে মুখ। দুলু আপার দিকে তাকিয়ে থাকতে এত ভালো লাগছে।

আমি বললাম, 'আপা তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে এটা কি সত্যি?'

'মোটেই সত্যি না। আরেকটা কথা তোকে বলি — তুই যে আমাকে একবার বলেছিলি চিঠি লিখতে। আমি ঠিক করেছি লিখব।'

'খুব ভালো করেছ। আমার কাছে দিও। পৌঁছে দেব।'

'তোকে পৌঁছাতে হবে না। আমার চিঠি আমিই পৌঁছাব।'

আমি বললাম, 'ভাইযা জেগে আছে। আপা তুমি কি তাঁব সঙ্গে দেখা করবে?'

দুলু আপা দ্বিতীযবার লজ্জায় লাল হয়ে বললেন, 'না। আমি যাই বেনু। তোব ভাইযাব জ্বর বাড়লে আমাকে খবর দিস। মন্ত্রীর মেয়ে বলে অবহেলা কবিস না।'

ভাইযার জ্বরেব তৃতীয দিনের কথা। মা ঘরে নেই — তাঁর এক মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছেন। সম্ভবত টাকা ধাব করতে গেছেন। ঘবে একটি টাকাও নেই। আমিও আমার অভ্যাসমতো ঘুরতে বেব হযেছি। হাঁটাহাঁটি কবছি ঐ রাস্তায যদি মবিনুব রহমান নামেব মানুষটিব দেখা পেয়ে যাই। একদিন না একদিন দেখা তো হবেই। এই দিকেই কোথাও তাঁব বাসা। এই রাস্তাতেই তাঁকে যাওযা-আসা করতে হয। হাল ছেড়ে ঘবে বসে থাকাব কোনো মানে হয না।

বাসায আছে শুধু আপা একা। ভাইযাব বেশ জ্বর। সে এই জ্বব নিয়েই আপার সঙ্গে হাসি তামাশা কবছে। এক সময বলল, 'মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ — গাল চুলকাচ্ছে — মীবা, বেজাবটা এনে দে, দাড়ি কাম:ব। আব শোন্ বাবাব টু-ইন-ওযান আযনাটাও আন্ তো।'

আপা বেজাব এবং সাবান এনে দেখে ভাইযা খাটেব নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তাব মুখ দিযে ফেনা বেরুচ্ছে। আপা দবজা খুলে ছুটে বের হযে এল। কাঁদতে কাঁদতে সানগ্লাস পবা ছেলেটার কাছে গিযে বলল — 'আমার ভাইযা মবে যাচ্ছে। আমাব ভাইযা মবে যাচ্ছে।'

সানগ্লাস পবা ছেলে অসাধ্য সাধন কবল। একা ভাইযাকে কোলে নিয়ে বের হযে এল। বেবিট্যাক্সি করে নিযে গেল হাসপাতালে। হাসপাতালে আপা ক্রমাগত কাঁদছিল। ছেলেটা আপাকে প্রচণ্ড ধমক দিল — 'কান্নাকাটি কবাব এখন সময? বিপদেব সময কান্নাকাটি — একেবাবে অসহ্য। চুপ করেন তো।'

ডাক্তারবা ভাইযার অসুখ ধবতে পাবলেন না। তাঁদেব চেষ্টাব কোনো ত্রুটি অবশ্যি হল না। কারণ দুলু আপাব বাবা (সেচ ও যোগাযোগমন্ত্রী) দুবাব এসে রোগীকে দেখে গেছেন। তাঁর নির্দেশে রোগীকে জেনারেল ওযার্ড থেকে কেবিনে নেযা হযেছে। চিকিৎসার জন্যে একটা মেডিকেল বোর্ড তৈরি হযেছে।

দুলু আপা সারাক্ষণ আছেন ভাইযার পাশে। কোনো রকম সংকোচ নেই। রোগীর গা স্পঞ্জ কবতে হয়। দুলু আপা অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায বলেন, 'দেখি তোযালেটা আমার কাছে দাও তো। আমি গা স্পঞ্জ করে দিচ্ছি। ভাইযা লাল চোখে দুলু আপার দিকে তাকিযে থেকে বলেন — 'কে আভা নাকি? মাই গড, তুমি কোথেকে খবর পেলে? আমি তোমাকে খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করেছি। তুমি কোথায ডুব দিয়েছিলে বল তো?'

দুলু আপা কিছুই বলেন না। চুপ করে থাকেন। তাঁর চোখ মমতা ও বেদনায ছলছল করে।

ভাইয়া মারা গেল উনিশ দিনের দিন। সে কমায় চলে গিয়েছিল, শেষের পাঁচ দিন আশপাশের জগৎ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। মৃত্যুর আগে আগে পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেল। দুলু আপাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল — 'আরে দুলু তুমি! তুমি এখানে কী করছ?'

দুলু আপা সবাইকে অগ্রাহ্য করে কাছে এগিয়ে গেলেন। ভাইয়ার হাত ধরে বিছানার কাছে বসলেন। ভাইয়া অস্বস্তি এবং লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। সে তাকাতে লাগল আমাদের দিকে। একটু চেষ্টাও করল হাত ছাড়িয়ে নিতে। তার কিছুক্ষণ পর ভাইয়ার মৃত্যু হল। আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বারান্দায় সানগ্লাস পরা ছেলেটি একা একা দাঁড়িয়ে। তার চোখে আজ সানগ্লাস নেই। সে কাঁদছে। ময়লা রুমালে ক্রমাগত চোখ মুছছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আমার ভাই — 'ফানি ম্যান' আজ মারা গেছে। সে তো কাঁদবেই। সে একা কেন সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে আজ চিৎকার করে কাঁদতে হবে। শুধু আমি কাঁদব না। আমি কিছুতেই কাঁদব না। আমি বাস্তায় রাস্তায় সুখী মেয়ের মতো ঘুরে বেড়াব।

ভাইয়ার ঘর থেকে বের হয়েই দেখি বারান্দায় রেলিং ধরে আভা দাঁড়িয়ে আছে। আপা তাকে খবর দিয়ে এনেছে। সে ঘরে ঢোকে নি। দাঁড়িয়ে আছে বাবান্দায়। আমাকে দেখে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, 'আমার ভাইয়া ফানি ম্যান রঞ্জু মারা গেছে।'

আভা কিছুই বলল না। ঘরে ঢুকল না বা উঁকি দিয়ে দেখল না — ক্লান্ত পায়ে হাসপাতালের লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। আভার গায়ে আকাশি রঙের শাড়ি। এই শাড়ি সে ইচ্ছা করেই পরে এসেছে। ফানি ম্যান বঞ্জুর নীল শাড়ি খুব পছন্দ। কে জানে কোনো এক উপলক্ষে এই নীল শাড়ি হয়তো সে-ই আভাকে কিনে দিয়েছে।

এই পৃথিবী পরম রহস্যময়। হাসপাতাল থেকে বাস্তায় নামামাত্র আমি যে মানুষটিকে এতদিন ধরে খুঁজছি তাঁর দেখা পেলাম। তিনি প্রথম দিনের মতো রিক্‌শা কবে ফিরছেন। হাতে বাজারের ব্যাগ। আমি ছুটে গিয়ে বললাম, 'কেমন আছেন?'

তিনি বিস্মিত গলায় বললেন, 'চিনতে পারছি না তো, কে?'

'চিনতে পারছেন না?'

'না। কে তুমি?'

"ওগেনকি দেসু কা?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'এর মানে?'

আমি শান্তগলায় বললাম, 'এটা জাপানি ভাষা আপনি বুঝবেন না।'

ভদ্রলোক রিক্‌শা থামিয়েছেন। আমি এগিয়ে যাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তেই অপেক্ষা করছি তিনি পেছন থেকে কোমল গলায় ডেকে উঠবেন — "রেনু। এই রেনু।" আর আমি তাঁকে কাঁদতে কাঁদতে বলব, 'জানেন এই কিছুক্ষণ আগে আমার ভাই মাবা গেছে। ওর নাম রঞ্জু। ফানি ম্যান রঞ্জু।'

আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। অল্প কিছুক্ষণেব মধ্যেই শহরের সমস্ত হলুদ বাতি জ্বলে উঠবে। কুৎসিত নোংরা শহরটাকে মনে হবে সোনালি শহর।

অনিল বাগচীর একদিন

কেউ কি হাঁটছে বারান্দায় ?

পা টিপে টিপে হাঁটছে ?

অনিল বাগচী শুযেছিল, উঠে বসল। তার শবীব ঝিমঝিম করছে, পানির পিপাসা লেগেছে। সামান্য শব্দেই তার এখন এমন হচ্ছে। শরীরের কলকব্জা সম্ভবত সবই নষ্ট হযে গেছে। মাথাব ভেতবটা সাবাক্ষণ ফাঁকা লাগে। তাব নাক পবিষ্কাব, সর্দি নেই, কিছুই নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে সে হাঁ কবে মুখ দিযে নিশ্বাস নিচ্ছে।

আবাব পাযের শব্দ। শব্দটা কি বারান্দায় হচ্ছে, না রাস্তায় হচ্ছে? অনিলের কান এখন খুব তীক্ষ্ণ। অনেক দূবেব শব্দও সে এখন পরিষ্কার শুনতে পায। হযতো রাস্তায় কেউ হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু রাতের বেলা কে হাঁটবে বাস্তায়? এখনকার রাত অন্যবকম বাত। দবজা-জানালা বন্ধ করে বসে থাকাব বাত। বাস্তায় হেঁটে বেড়াবার রাত না।

কা-কা শব্দে কাক ডাকল। অনিল ভযংকর চমকে উঠল। এমন চমকে উঠার কিছুই না। একটা কাক তাব জানালার বাইরে বাসা বেঁধেছে। সে তো ডাকবেই, কিন্তু কা-কা শব্দটা ঠিক যেন তাব মাথার ভেতব হযেছে। কাকটা যেন তার মগজে পা বেখে দাঁড়িযেছিল। কা-কা করে ডেকে ঠোঁট দিযে অনিলের মাথার মগজ খানিকটা ঠুকবে নিল। ব্যথায শবীব পাক খাচ্ছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। পিপাসায বুক শুকিযে কাঠ।

এতটা ভয নিযে বেঁচে থাকা কি সম্ভব? এবচে' মবে যাওয়া কি অনেক সহজ না? বাড়িব ছাদে উঠে রাস্তায় লাফিযে পড়লে কেমন হয? ছাদে উঠার দরজাটা কি খোলা? মেসেব মালিক কামাল মিযা ভাবি ভাবি সব তালা লাগিয়েছেন। সদর দরজায ভেতর থেকে দুটা তালা লাগানো হয। ছাদে যাবার দরজাও নিশ্চযই বন্ধ। সেখানেও তালা।

অনিল হাত বাড়িযে পানিব জগ নিল। তার গ্লাস ভেঙে গেছে, জগে মুখ লাগিয়ে পানি খেতে হয। শোবার সময সে জগ ভর্তি করে পানি এনে রাখে। কিছুক্ষণ পর পব কযেক ঢোক কবে পানি খায। ভোরের মধ্যে পানির জগ শেষ হয়ে যায়।

ভয়। তীব্র ভয। সারাক্ষণ ভযে অনিলের শরীর কাঁপে। সে অবশ্যি জন্ম থেকেই ভীতু ধবনেব। ছোটবেলায় অন্ধকারে কখনো ঘুমাতে পারত না। বাতি জ্বালিযে রাখতে হত। সেই সমযটা আবার ফিরে এসেছে। এখন সে অন্ধকারে ঘুমাতে পাবে না। রাত এগাবটাব

পর বাতি নিভিয়ে দিতে হয়। সে জেগে থাকে। মাঝে মাঝে অন্ধকার অসহ্য বোধ হলে বালিশের নিচে রাখা টর্চ জ্বালায়। তীরের মতো আলোর ফলা দেয়ালের নানান জায়গায ফেলে। ঘরের অন্ধকার তো তাতে কমে না। খুব সামান্য অংশই আলোকিত হয়। বাকি ঘরে আগের মতোই অন্ধকার থাকে। অন্ধকার কমে না। অনিলের ভয়ও কমে না। অনিল বালিশের নিচ থেকে দু' ব্যাটারির টর্চটা বের করল। আলো ফেলল দেয়ালে। আলো তেমন জোরালো না। ব্যাটারি কিনতে হবে। কি কি কিনতে হবে তা দিনে মনে থাকে না। রাতে শুধু মনে হয়। টর্চের ব্যাটারি, একটা পানির গ্লাস, মোমবাতি, কাগজ, লেখার কাগজ। কাল রাতে চিঠি লেখার ইচ্ছা করছিল। কাগজের অভাবে চিঠি লেখা হয় নি।

অনিল টেবিলে রাখা টেবিলঘড়িটিতে আলো ফেলল। রাত বেশি না, কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। সে এবার আলো ফেলল দেয়ালে। আলোটা পড়ল ঠিক ক্যালেন্ডারটার উপর। ওষুধ কোম্পানির চোখে বাংলাদেশ। পালতোলা নৌকা যাচ্ছে। মাঝি হাল ধরে বসে আছে। তার মুখভর্তি হাসি। তার হাসি দেখে মনে হতে পারে, নৌকার হাল ধরে বসে থাকাব মধ্যেই জীবনের পরম শান্তি।

ক্যালেন্ডারের পাশেই স্বামী বিবেকানন্দের বাঁধানো ছবি। অনিলের বাবা এই ছবি ছেলেকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন। ছবিটির নিচে বিবেকানন্দের একটি বাণী লেখা। বাণীটি হচ্ছে — 'যে ঈশ্বর মানুষকে ইহকালে ক্ষুধার অন্ন দিতে পারে না, তিনি পরকালে তাদের পরম সুখে রাখবেন, তা আমি বিশ্বাস করি না।'

ছবির বিবেকানন্দ রাগী চোখে তাকিয়ে আছেন। ঘরের যে দিকে যাওযা যাক মনে হবে, স্বামীজী সে দিকেই তাকিয়ে আছেন। রাগ ছাড়াও তাঁর চোখের ভাষায় এক ধবনেব ভর্ৎসনা আছে। তিনি যেন বলছেন, 'রে মূর্খ, জীবনটা নষ্ট করছিস কেন?'

অনিল টর্চ লাইটের আলো নিভিযে ফেলল। ছবিটা সরানো দরকার। নষ্ট কবে ফেলা দরকার, কিংবা লুকিয়ে ফেলা দরকার। বিবেকানন্দের ছবি ঘবে বাখা এখন ভযাবহ ব্যাপার। ছবিটা সরাতে হবে। এখনই কি সরাবে? আবার কাক ডাকল। অনিল ভযে একটা ঝাঁকুনি খেল। অনিলের বাবা রূপেশ্বর মডেল হাই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক সুবেশ বাগচী, ছেলের চরিত্রে অস্বাভাবিক ভযেব ব্যাপাবটি লক্ষ করেই বোধহয় ছেলের খাতায এক দিন বড় বড় করে লিখে দিলেন —

"Cowards die many times before their death."

গম্ভীর গলায় বললেন, 'রোজ সকালে এই লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকবি। ধ্যান করবি। লেখাটার মানে হল — ভীতুদের মৃত্যুর আগেও অনেকবার মৃত্যুবরণ কবতে হয। যে সে মানুষের লেখা না। শেক্সপীয়রের লেখা। দেখি শেক্সপীযর বানান কব তো?' সুবেশ বাগচীর অভ্যাসই হচ্ছে যে-কোনো কথা বলেই ফট করে বানান জিজ্ঞেস করা। অনিল ক্লাস থ্রিতে যখন পড়ে তার পেটে তীব্র ব্যথা শুরু হল। সুরেশ বাবু ছেলেকে কোলে নিযে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন। পথে নেমেই বললেন, 'ব্যথা বেশি হচ্ছে বাবা?'

অনিল কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হুঁ।'

'খুব বেশি?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা বাবা বল তো ব্যথার ইংরেজি কী?'

অনিল চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'পেইন।'

'এই তো হয়েছে। আচ্ছা বাবা, এখন পেইন বানান কর তো। কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ব্যথা কম লাগবে। বানান কর তো পেইন। আচ্ছা, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। প্রথম অক্ষর হল পি।'

সুরেশ বাগচীর প্রাণপণ চেষ্টাতেও অনিলের ইংরেজি বিদ্যা বেশিদূর অগ্রসর হয় নি। ইংরেজিতে আই. এ. পরীক্ষায় রেফার্ড পেয়ে গেল। সুরেশ বাগচী মনের দুঃখে পুরো দিন না খেয়ে রইলেন। এবং সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ করে ছোট ছেলেমেয়েদের মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। অনিল শুকনো মুখে বারান্দায় বসে রইল। অনিলের বড় বোন অতসী বাবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলতে লাগল, 'দরজা খোল বাবা। দরজা খোল।' সুরেশ বাগচী বললেন, 'ঐ কুলাঙ্গারকে বেরিয়ে যেতে বল অতসী। কুলাঙ্গারের মুখ দেখতে চাই না।' অনিল ঘর থেকে বের হয়ে একা একা রূপেশ্বর নদীর ঘাটে বসে রইল।

অন্ধকার রাত। জনমানবশূন্য নদীর ঘাট। ওপারে শ্মশান, মড়া পোড়ানো হয়। কয়দিন আগেই মড়া পুড়িয়ে গেছে। ভাঙা কলসি, পোড়া কাঠ আবছা করে হলেও নজরে পড়ে। অনিলের গা ছমছম করতে লাগল। মনে হতে লাগল–অশরীরী মানুষজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। নিঃশব্দে চলাফেরা করছে তাকে ঘিরে। এই তো কে যেন হাসল। শিয়াল ডাকছে। শিয়ালের ডাক এমন ভয়ংকর লাগছে কেন? অনিল ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে যে দৌড়ে বাড়ি চলে যাবে সেই সাহসও রইল না।

গভীর রাতে হারিকেন হাতে সুরেশ বাগচী ছেলেকে খুঁজতে এলেন। নদীর পারে এসে কোমল গলায় বললেন, 'অনিল বাবা, আয় বাড়ি যাই।' তিনি হাত ধরে ছেলেকে নিয়ে এগুতে লাগলেন। এক সময় বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এমন কাঁপছিস কেন?'

'ভয় লাগছে বাবা।'

'আরে বোকা, কীসের ভয়? শেক্সপীয়র কি বলেছিলেন, কাউয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ। ভীতুদের মরবার আগেও অনেকবার মরতে হয়। বল তো শেক্সপীয়রের কোন বইয়ে এই লেখাটা আছে। তোকে আগে একবার বলেছি। কি, পারবি না?'

ছেলেবেলার অন্ধ, তীব্র ভয় আবার ফিরে এসেছে। অনিল এখন ঘুমাতে পারে না। রাত জেগে জেগে নানান ধরনের শব্দ শোনে। আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে ওঠে। সবচে' বেশি ভয় পায় যখন কাক ডেকে ওঠে। আচমকা এই কাকটা কা–কা করে আত্মা কাঁপিয়ে দেয়।

পরিষ্কার চটি পায়ে হাঁটার শব্দ। কে হাঁটছে চটি পায়ে? রহিম সাহেব? রহিম সাহেবের মাঝে মাঝে গভীর রাতে হাঁটার অভ্যাস আছে। তাঁর তো আজ সকালে চলে যাবার কথা ছিল। যেতে পারেন নি। অনিল বলল, 'কে? কে হাঁটে?'

কেউ জবাব দিল না। হুস করে একটা ট্রাক চলে গেল। কুকুর ডাকছে। ঢাকা শহরের কুকুরগুলো এখন খুব ডাকছে। মিলিটারি নাকি অনেক কুকুর মেরেছে। রাত দুপুরে কুকুরগুলো আচমকা ডেকে ওঠে — মিলিটারিরা ভয় পেয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। কুকুর এখন মিলিটারি চিনে ফেলেছে। হঠাৎ কোনো রাস্তা কুকুরশূন্য হলে বুঝতে হবে মিলিটারি সেখানে আছে। কিংবা তারা আসছে। বাঘের আগে ফেউ ডাকার মতো, মিলিটারির আগে কুকুর ডাকে।

পায়ের শব্দটা আবার আসছে। ঠিক তার দরজার কাছে এসে শব্দ থেমে গেল। অনিল ক্ষীণ স্বরে বলল, 'কে?' তার নিজের গলার শব্দ সে নিজেই শুনতে পেল না। তাকে ধরবার জন্যে কি মিলিটারি চলে এসেছে? একটু আগে যে ট্রাকের শব্দ শোনা গেল, সেই ট্রাকে করেই কি তাকে অজানা কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে? সে দরজা খুলবে আর তাকে নিয়ে ট্রাকে তুলবে। এরা কি গাড়িতে তোলার সময় চোখ বেঁধে তুলে? কেন তাকে শুধু শুধ তুলবে? সে তো কিছুই করে নি। সে কোনো মিছিলে যায় নি। তার ভয় লাগে। সারাই

মার্চের ভাষণ শোনার জন্য রেসকোর্সের মাঠে যাবার ইচ্ছা ছিল, তবু যায় নি। তার মন বলছিল ঝামেলা হবে। কয়েকটা টিয়ার গ্যাস ফেললেই ঝামেলা লেগে যাবে। লোকজন ছোটাছুটি শুরু করবে। মরতে হবে মানুষের পায়ের নিচে চাপা পড়ে।

জন্মাষ্টমীর রথযাত্রা উপলক্ষে বিরাট মেলা হয় নন্দিগ্রামে। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে সেই মেলা সে দেখতে গেল। কী প্রচণ্ড ভিড়! যাতে হারিয়ে না যায় সে জন্যে সে দুহাতে শক্ত করে বাবার হাত ধরে রাখল। তারপরেও সে হারিয়ে গেল। লোকজনের চাপে ছিটকে কোথায় চলে গেল। মেলার সবগুলো মানুষ যেন হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। যে যে দিকে পারছে ছুটছে। বেদেনীর সাপের ঝুড়ি থেকে দুটা কাল সাপ নাকি বের হয়ে পড়েছে। ছোটাছুটি এই কারণে। অনিল দৌড়াচ্ছিল চোখ বন্ধ করে। হঠাৎ কে যেন তাকে ধরে ফেলল। অনিল তাকাচ্ছে কিন্তু কিছু দেখছে না। তার চোখে সব দৃশ্য এলোমেলো হয়ে গেছে। শুধু সে শুনছে বুড়ো এক ভদ্রলোক বলছেন, 'এই ছেলেটা এমন করছে কেন ? এ কেমন যেন নীল হয়ে যাচ্ছে। এই ছেলেটাকে বাতাস কর। ছেলেটাকে বাতাস কর।'

অনিল সারাজীবন সব রকম ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। আর আশ্চর্য! বেছে বেছে তাকেই একের পর এক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। রূপেশ্বরে এক পাগলি আছে – 'মোক্তার পাগলি'। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তাকে মোক্তার বললেই বাঘিনীর মতো ছুটে যায়। বাচ্চা-কাচ্চারা তাকে দেখলেই ঢিল ছোড়ে। 'মোক্তার' বলে চিৎকার করে খেপায়। পাগলি তাদের তাড়া করে। অনিল কোনোদিন মোক্তার পাগলিকে দেখে হাসে নি। তার গায়ে ঢিল ছোড়ে নি কিংবা মোক্তার বলে চেঁচায় নি। তারপরেও এই পাগলি শুধু তাকেই খুঁজে বেড়াত। দেখা হলেই তাড়া করত। হয়তো সে বই নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে বটগাছের আড়াল থেকে মোক্তার পাগলি বের হয়ে এল। বই-খাতা ফেলে অনিল ছুটছে। পেছনে পেছনে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছে মোক্তার পাগলি। রূপেশ্বরে এটা ছিল সাধারণ ব্যাপার। কেউ অনিলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসত না। দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখত। কেউ কেউ হাততালি দিয়ে চেঁচাত — "লাগ ভেলকি লাগ।"

একদিন অনিল ধরা পড়ে গেল মোক্তার পাগলির হাতে। তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। হাফইয়ার্লি পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরছে। পোস্টাপিসের কাছে আসামাত্র মোক্তার পাগলি ছুটে এসে অনিলকে চেপে ধরল। মেলায় যেমন হয়েছিল অনিলের সে রকম হল। মনে হল, সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। এক্ষুনি বোধহয় হৃৎপিণ্ড ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। নাক দিয়ে সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। চারদিকে লোক জমে গেছে। সবাই মজা দেখছে। বড়ই মজাদার দৃশ্য।

মোক্তার পাগলি এক ঝটকায় অনিলকে কোলে তুলে ফেলল। তার অনাবৃত স্তনে অনিলের মুখ চেপে বলল, 'খা দুধ খা। খা কইলাম।'

দর্শকরা বিপুল আনন্দে হেসে ফেলল। অনিলের নাম হয়ে গেল 'দুদু খাওয়া অনিল।' দুটি অনিল ছিল ক্লাসে। একজন শুধু অনিল, অন্যজন দুদু খাওয়া অনিল।

অনিল ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দিল। স্কুলের সময় দরজা বন্ধ করে বসে থাকত। চেঁচিয়ে কাঁদত। অতসী বাবাকে গিয়ে বলত, 'থাক বাবা, আজ স্কুলে না গেল।' একদিন সুরেশ বাগচী ছেলেকে ডেকে বললেন, 'তোকে দুধ খাইয়েছে তো কী হয়েছে? মাতৃস্নেহে দুগ্ধপান করানোর চেষ্টা দোষের কিছু না। মাতৃভাবে তাকে সম্মান করবে, তাহলেই হবে। আয় তোর ভয় ভাঙিয়ে দিয়ে আসি।'

অনিল বলল, 'না।'

'না বলবি না। না বলা দুর্বল মানুষের লক্ষণ। আয় আমার সাথে। অতসী তোর মার একটা শাড়ি বের করে দে।'

অতসী বলল, 'শাড়ি কী করবে?'

'মোক্তার পাগলিকে দেব। নগ্ন ঘুরে বেড়ায় দেখতে খারাপ লাগে।'

'মার শাড়ি কাউকে দিতে দিব না বাবা।'

'নূতন শাড়ি কেনাব পযসা নাইবে মা। দে, তোর মার একটা শাড়ি দে। মার স্মৃতি তো শাড়িতে থাকে না রে মা। মার স্মৃতি থাকে অন্তবে।'

এক হাতে লাল পাড় শাড়ি নিযে অন্য হাতে শক্ত কবে অনিলের হাত ধরে সুবেশ বাগচী নগ্ন পাগলিকে খুঁজে বেব কবলেন। পাগলি কঠিন চোখে তাকাল। সুবেশ বাগচী বললেন, 'আমাব এই পুত্র আপনাব ভযে অসম্ভব ভীত। আমি শুনেছি আপনি তাকে পুত্রস্নেহে দুগ্ধ পান কবাবাব চেষ্টা কবেছেন। কাজেই সে আপনাব পুত্রস্থানীয়। আপনি আপনাব পুত্রের ভয ভাঙিযে দিন।'

পাগলি এইসব কঠিন কথার কি বুঝল কে জানে, তবে সে হাতে ইশারা করে অনিলকে কাছে ডাকল। অনিল ভযাবহ আতঙ্কে বাবাকে জড়িযে ধরল। সুবেশ বাগচী বললেন, 'ছেলে আপনাব জন্য একটা শাড়ি এনেছে, তার মাযেব ব্যবহারী শাড়ি। আপনি গ্রহণ করলে আমবা খুশি হব।'

পাগলি হাত বাড়িযে শাড়ি নিল।

সুবেশ বাগচী বললেন, 'পুত্রেব কাছে নগ্ন অবস্থায উপস্থিত হওযা শোভন নয। আপনি শাড়িটা পবে আমার ছেলেব গাযে-মাথায হাত বুলিযে আদব করে দিন।' পাগলি বলল, 'দূব হ হাবামজাদা।'

'আমি হাতজোড় কবে মিনতি কবছি। আপনি তাকে আব ভয দেখাবেন না। মা-মবা ছেলে, সে জন্ম থেকেই ভীতু। আপনি তাব মাতৃস্থানীয। আপনাব ভযে সে স্কুলে যাওযা ছেড়ে দিযেছে।'

পাগলি নিজেব গাযে শাড়ি মেলে ধবতে ধরতে হাসিমুখে বলল, 'দূব হ, দূব হ কইলাম।'

আশ্চর্যের ব্যাপার! পাগলি আর কোনোদিনই অনিলকে ভয দেখায নি। লালপেড়ে শাড়ি তাকে কখনো পবতে দেখা যায নি। সে নগ্ন হযেই ঘুবত। অনিলকে দেখলে থমকে দাঁড়িযে লাজুক গলায বলত — 'এই পুলা, মাথার চুল আঁচড়াও না ক্যান? একটা চিরুনি আনবা, চুল আঁচড়াইযা দিমু।' অনিল দৌড়ে পালিযে যেত। তাব ভয কাটে নি। শরীরেব সমস্ত স্নায়ু অবশ কবে দেযা তীব্র ভয।

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

অনিলের হাত-পা ঠাণ্ডা হযে গেল। কেউ একজন দরজার পাশে তাহলে দাঁড়িযে ছিল? কে সে? কে? অনিলের ঘাম হচ্ছে। দম বন্ধ হযে আসছে।

'অনিল ঘুমাচ্ছ?'

গফুর সাহেবের গলা। তবু অনিল বলল, 'কে, কে?'

'আমি। ভয়ের কিছু নাই। আমি। দরজা খোল।'

অনিল বিছানা ছেড়ে উঠেছে। সুইচ বোর্ড খুঁজে পাচ্ছে না। সমস্ত দেযাল হাতড়ে বেড়াচ্ছে সুইচ বোর্ডেব জন্যে। তার বালিশেব নিচে টর্চলাইট। একবাবও টর্চলাইটের কথা

তার মনে আসছে না। তাকে ডাকছেন গফুর সাহেব। সর্ব দক্ষিণের সিঙ্গেল রুমে থাকেন। এজি অফিসের সিনিয়র অ্যাসিসটেন্ট। এই বছরেই রিটায়ার করার কথা। ঢাকায় বাসা করে থাকতেন। স্ত্রী মারা যাবার পর বাসা ছেড়ে মেসে এসে উঠেছেন। একা মানুষ। বাসা ভাড়া করে এতগুলো টাকা নষ্ট করতে ইচ্ছা করে নি। প্রয়োজনও নেই। দুটি মেয়ে। দুজনেরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। একজন থাকে রাজশাহীতে, একজন খুলনায়।

সুইচ বোর্ড খুঁজে পাওয়া গেল। অনিল বাতি জ্বালাল, দরজা খুলল। গফুর সাহেব বললেন, 'ঘুম আসছিল না, এই জন্যেই ডাকলাম। অন্য কিছু না।'

'এতক্ষণ ধরে আপনিই কি হাঁটাহাঁটি করছিলেন ?'

'হুঁ। বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। আকাশে খুব মেঘ। তুমি কি চা খাবে অনিল? রাতে ঘুম ভালো হয় না। একটু পরে পরে চা খাই। খাবে ?'

'না।'

'আস না একটু চা খাও। সময় খারাপ। কথা–টথা বললে ভালো লাগে।'

গফুর সাহেব কথাগুলো বলার সময় একবারও অনিলের দিকে তাকালেন না। অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বললেন। কারণ তিনি অনিলের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছেন না। আজ দুপুরে একটা ছেলে অনিলের একটা চিঠি দিয়ে গেছে তাঁর হাতে। চিঠিটা অনিলকে পৌঁছানোর দায়িত্ব তাঁর। সেই খোলা চিঠি তিনি কয়েকবার পড়েছেন। ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদের এই চিঠি তিনি অনিলকে দেয়ার মতো মনের জোর সংগ্রহ করতে পারেন নি। রূপেশ্বর স্কুলের হেডমাস্টার মনোয়ারউদ্দিন খাঁ লিখেছেন —

বাবা অনিল,

তোমাকে একটি দুঃখের সংবাদ জানাইতেছি। এপ্রিল মাসের নয় তারিখে রূপেশ্বরে পাক মিলিটারি উপস্থিত। তাহাদের আকস্মিক আগমনের জন্যে আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না। তাহারা রূপেশ্বরে অবস্থান নেয়। এপ্রিল মাসের বার তারিখ আরো অনেকের সঙ্গে তাহারা তোমার বাবাকে হত্যা করে। আমরা তাঁহাকে বাঁচানোর সর্বরকম চেষ্টা করিয়াছি। এর বেশি আমি আর কী বলিব! তোমার ভগ্নিকে আমি আমার বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছি। তাহার বিষয়ে তুমি কোনো চিন্তা করিবে না। আল্লাহপাকের নামে শপথ নিয়া বলিতেছি, আমার জীবন থাকিতে আমি অতসী মায়ের কোনো অনিষ্ট হইতে দিব না। তোমার পিতার মৃত্যুতে রূপেশ্বরের প্রতিটি মানুষ চোখের জল ফেলিয়াছে। এই কথা তোমাকে জানাইলাম। জানি না ইহাতে তুমি মনে কোনো শান্তি পাইবে কিনা। আল্লাহপাক তাঁহার আত্মার শান্তি দিন, এই প্রার্থনা করি। তুমি সাবধানে থাকিবে। ভুলেও রূপেশ্বরে আসিবার কথা চিন্তা করিবে না। একদল মুক্তিযোদ্ধা রূপেশ্বর থানা আক্রমণ করার চেষ্টা করায় ভয়াবহ ফল হইয়াছে। রূপেশ্বরে বর্তমানে কোনো যুবক ছেলে নাই।...

গফুর সাহেব ভেবেছিলেন রাতে চিঠিটা দেবেন। এখন অনিলের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে চিঠিটা না দেয়াই ভালো। ছেলেটা ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। এই খবর পেলে কী করবে কে জানে!

'অনিল।'

'জ্বি।'

'আস আমার ঘরে আস, চা খাও।'

অনিল উঠে এল। গফুর সাহেব কেরোসিনের চুলায় কেতলি বসিয়ে দিলেন। দুজন মেঝেতে মুখোমুখি বসে আছে। কারো মুখেই কোনো কথা নেই। অস্বস্তি কাটাবার জন্যে গফুর সাহেব বললেন, 'আজকের পূর্বদেশটা পড়েছ?'

অনিল বলল, 'না। আমি এখন খবরের কাগজ পড়ি না। পড়তে ইচ্ছা করে না।'

'আমারও পড়তে ইচ্ছা করে না। অভ্যাসের বসে পড়ি। তবে আজকের পূর্বদেশটা তোমার পড়া উচিত। নাও, এই জায়গাটা পড়ো। মন দিয়ে পড়ো।'

'অনিল পড়ল।'

"পাকিস্তানের আযাদী দিবস উপলক্ষে গোলাম আযমের আহ্বান। আযাদী দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলে এক বিশাল সভার আয়োজন করে। সেই সভায় জনাব গোলাম আযম পাকিস্তানের দুশমনদের মহল্লায়-মহল্লায় তন্ন-তন্ন করে খুঁজে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের শান্তিকমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।"

'পড়েছ অনিল?'

'জ্বি।'

'তোমার খুব সাবধানে থাকা দরকার। মেসে থাকাটা একেবারেই উচিত না। মিলিটারির তিনটা টার্গেট — আওয়ামী লীগ, হিন্দু, যুবক ছেলে। তারপর আবার শুনলাম, মেসে কারা কারা থাকে তাদের নামধাম পরিচয় জানতে চেয়ে চিঠি এসেছে। কামাল মিয়া বলল।'

'কে চিঠি দিয়েছে?'

'স্থানীয় শান্তি রক্ষা কমিটির এক লোক — এস. এম. সোলায়মান। মজার ব্যাপার কি জান — আগে এই লোক ঘোর আওয়ামী লীগার ছিল। শেখ সাহেবের ভাষণ ক্যাসেট করে নিয়ে এসেছিল। মাইক বাজিয়ে মহল্লায় মহল্লায় শুনিয়েছে। এখন সে বিরাট পাকিস্তানপন্থী। মানুষের চরিত্র বোঝা খুব কঠিন। তবে আমি তাকে ঠিক দোষও দিচ্ছি না। সে হয়তো যা করছে প্রাণ বাঁচার জন্যে করছে। এসব না করলে আওয়ামী লীগার হিসেবে তাকে মেরে ফেলত। ঠিক না?'

অনিল কিছু বলল না। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নিঃশব্দে চুমুক দিতে লাগল। চা-টা খেতে ভালো লাগছে। বেশ ভালো লাগছে।

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে? চানাচুর আছে। দেব চানাচুর? টেনশানের সময় খুব ক্ষিধা পায়।'

অনিল বলল, 'আমি আর কিছু খাব না। চা থাকলে আরেকটু নেব।'

গফুর সাহেব আবার কাপ ভর্তি করে দিলেন। নিচু গলায় বললেন, 'তুমি বরং মেসটা ছেড়ে দাও।'

'মেস ছেড়ে যাব কোথায়? ঢাকা শহরে আমার পরিচিত কেউ নেই। ফতুল্লায় এক মামা থাকতেন। এখন আছেন কিনা তাও জানি না।'

গফুর সাহেব হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাবার শেষ চিঠি কবে পেয়েছ?'

'কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'এমনি জানতে চাচ্ছি। কোনো কারণ নাই।'

'বাবার শেষ চিঠি পেয়েছি চার মাস আগে। এখন কেমন আছেন কিছুই জানি না। আমি বেশ কয়েকটা চিঠি দিয়েছি জবাব পাচ্ছি না।'

গফুর সাহেব বললেন, 'যাও শুয়ে পড়ো। রাত অনেক হয়েছে।' অনিল নিজের ঘরে চলে এল। বাতি নিভিয়ে বিছানায় যাওয়ামাত্র বৃষ্টি শুরু হল। ঝুম বৃষ্টি।

জানালা খুলে একটু বৃষ্টি দেখলে কেমন হয় ? কত দিন যে জানালা খুলে ঘুমানো হয় না। আহা কেমন না জানি লাগে জানালা খোলা রেখে ঘুমাতে। দেশ স্বাধীন যদি সত্যি সত্যি হয়, তাহলে সে কয়েক রাত রাস্তার পাশে পাটি পেতে ঘুমাবে। যে রাতগুলোতে ঘুম আসবে না সে রাতগুলো কাটাবে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে।

ভালো বৃষ্টি হচ্ছে তো। ঝড়বৃষ্টির সময় মিলিটারিরা রাস্তায় থাকে না। এরা বৃষ্টি ভয় করে। হোক বৃষ্টি। দেশ ভাসিয়ে নিয়ে যাক। পদ্মা–মেঘনা–যুমনায় বান ডাকুক। শোঁ–শোঁ শব্দে ছুটে আসুক জলরাশি।

টক টক শব্দে টিকটিকি ডাকছে। এই ঘরে চারটা টিকটিকি আছে। একটার গা ধবল কুষ্ঠের রোগীর মতো সাদা। একটা মাকড়সা আছে। সে সম্ভবত আয়নার পেছনে থাকে। ঠিক রাত আটটায় পেছন থেকে এসে আয়নার উপর বসে থাকে। এমন নিখুঁত সময়ে ব্যাপারটা ঘটে যে, মনে হয় মাকড়সাটার নিজের কাছেও কোনো ঘড়ি আছে। সম্ভবত টিকটিকিগুলো তাকে খেয়ে ফেলেছে। সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট। যে ফিট সে টিকে থাকবে।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নীল আলোয় ঘর ভেসে গিয়ে আবার সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। অল্প বৃষ্টি হলেই মেসের সামনের রাস্তাটায় এক হাঁটু পানি হয়। সারারাত বৃষ্টি হোক, রাস্তায় এক কোমর পানি জমে যাক। পানি ভেঙে মিলিটারি জিপ আসবে না। ওরা শুকনো দেশের মানুষ। পানিতে ওদের খুব ভয়।

ঝড় হচ্ছে না — কী? জানালায় শব্দ হচ্ছে। কাকটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। সাধারণত একটা কাক ডাকলে দশটা কাক এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই কাকটা নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন। এর ডাকে কখনো কাউকে সাড়া দিতে অনিল শোনে নি। সে থাকেও একা একা। তার পুরুষ বন্ধুও তাকে ছেড়ে গেছে। সে কি দরজা খুলে কাকটাকে ভেতরে আসতে বলবে?

ঘুমে অনিলের চোখ জড়িয়ে আসছে। সারাদিন অসহ্য গরম ছিল। এখন পৃথিবী শীতল হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভয় কেটে যাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে — এমন দুর্যোগে মিলিটারি পথে নামবে না। অন্তত আজকের রাতটা মানুষের শান্তিতে কাটবে। অনিল ঘুমিয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার স্বপ্ন দেখল। অনিল যেন খুব ছোট। তারা নৌকায় করে মামার বাড়ি যাচ্ছে। রূপবতী একজন তরুণীর কোলে সে বসে আছে। তার খুব লজ্জা লাগছে। অনিলের বাবা বললেন, 'ছেলে দেখি লজ্জায় মারা যাচ্ছে। আরে বোকা, এটা তোর মা। মার কোলে বসায় এত লজ্জা কী?' রূপবতী তরুণীটি বলছে — 'আহা ও কি আমাকে চিনে? লজ্জা তো পাবেই। এটাই তো স্বাভাবিক।' রূপবতী তরুণীর মুখ তখন খানিকটা মোক্তার পাগলির মতো হয়ে গেল। এবং সে বলতে লাগল — 'চিরুনিটা কই? দেখি অতসী চিরুনিটা দে তো। আমি বাবুর চুল আঁচড়ে দেই।' অতসী খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল, 'ওকে বাবু ডাকছ কেন? ওর নাম অনিল।' তখন কোথেকে যেন কাক ডাকতে লাগল — কা–কা–কা।

২

কা–কা–কা–কা। আসলেই কাক ডাকছে।

কাকের চিৎকারে অনিলের ঘুম ভাঙল। জানালা খোলা। গত রাতের ঝড়ে এক সময় ছিটকিনি খুলে গেছে। বৃষ্টির ছাটে বিছানার এক অংশ ভেজা। অনিলের পা–ও ভিজে আছে। তার ঘুম ভাঙে নি। এখন ঘুম ভাঙল কাকের ডাকে। নিঃসঙ্গ কাকটা জানালায় বসে অনিলের দিকে তাকিয়েই ডাকছে। অনিল বিছানা ছেড়ে নামল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। জানালার পাশে চলে গেল। সামান্য আলো হয়েছে। ভোর হচ্ছে। ভোর, নূতন আরেকটি দিনের শুরু।

রাস্তাঘাট ফাঁকা। এখানে–ওখানে পানি জমে আছে। পানির উপর দিয়ে ছপ–ছপ করতে করতে একটা কুকুর এগিয়ে গেল। শুকনো জায়গাও আছে। কুকুরটা সেদিকে গেল না। পানির উপর দিয়ে হাঁটতেই তার বোধহয় ভালো লাগছে। লাইটপোস্টের ইলেকট্রিক তারে একঝাঁক শালিক বসে আছে। কটা শালিক সে কি গুনে দেখবে? সুরেশ বাগচী এইভাবেই তাকে গুনতে শিখিয়েছেন। ট্রেনে করে যাচ্ছে, জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখা গেল টেলিগ্রাফের তারে কয়েকটা ফিঙে বসে আছে। সুরেশ বাবু বললেন, 'ও বাবু, ও অনিল গুনে ফেল তো বাবা কটা পাখি।'

অনিল বলল, 'না। আমি গুনব না।'

অতসী বলল, 'আমি গুনব বাবা?'

সুরেশ বললেন, 'উহুঁ–উহুঁ, অনিল গুনবে। কটা অনিল? কটা?'

গোনার আগেই ট্রেন পাখি ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল। সুরেশ বাগচীর মুখ দেখে তখন মনে হতে পারে — তাঁর খুব ইচ্ছা চেন টেনে ট্রেনটাকে তিনি থামান। পুত্রকে নিয়ে চলে যান হাঁটতে হাঁটতে যাতে সে ফিঙে গুনে আসতে পারে।

শৈশবের অভ্যাসেই অনিল এখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শালিক পাখি গুনছে। পাখিগুলো স্থির হয়ে বসে আছে। পুরোপুরি ভোর না হওয়া পর্যন্ত এরা বোধহয় নড়বে না। কিংবা কে জানে এরা বোধহয় বুঝতে পারছে অনিল নামের ছাব্বিশ বছরের এক যুবক তাদের গুনছে। নড়াচড়া করলে যুবকের গুনতে অসুবিধা হবে।

রাস্তা এখনো ফাঁকা, রিকশা নেই, গাড়ি নেই, একটা মানুষ নেই। কার্ফ্যু সকাল ছটা পর্যন্ত। কাজেই ছটার আগে কাউকে দেখা যাবে না। এই সময় রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বললে কেমন হয় — 'আমি কার্ফ্যু মানি না।'

একটা জিপ চলে গেল।

মিলিটারি জিপ। ড্রাইভারের পাশে যে অফিসারটি বসে আছে তার চোখে সানগ্লাস। এই ভোরবেলা, যখন দিনের আলো পর্যন্ত স্পষ্ট হয় নি তখন অফিসারটি চোখে সানগ্লাস পরে বের হল কেন? সে কি চারদিকে অন্ধকার করে রাখতে চায়? আশপাশের কিছু দেখতে চায় না? জানালাটা বন্ধ করে দেয়া উচিত। সব বাড়ির জানালা বন্ধ। তারটা খোলা। সহজেই চোখে পড়ে যাবে। কারো মনে হয়ে যেতে পারে — এই বাড়িতে কোনো রহস্য আছে। অনিল জানালা বন্ধ করে ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ভেতরের দিকে মেসঘরের উঠানে বিশাল এক কাঁঠাল গাছ। মেসের মালিক কামাল মিয়া প্রতিবারই বলেন, গাছ কাটিয়ে ফেলবেন — কোনোবারই কাটা হয় না।

সব গাছেরই কিছু নিজস্ব রহস্য আছে। এই গাছেরও আছে। এই গাছে কখনো পাখি বসে না, পাখি বাসা বাঁধে না। অনিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে।

গাছের মাথায় রোদ এসে পড়েছে। কাল রাতের বৃষ্টিতে পাতাগুলো ভেজা। সেই ভেজা পাতা রোদে চিকমিক করছে। মনে হচ্ছে, গাছটা মাথায় সোনার টোপর পরেছে। কী আশ্চর্য সুন্দর! অদ্ভুত সুন্দর! বাবা তার সঙ্গে থাকলে মুগ্ধ হয়ে দেখতেন। বিস্মিত হয়ে বলতেন — 'আহা রে, আহা রে, কী সুন্দর! কী সুন্দর! এই জিনিসের ছবি আঁকা যাবে না। বুঝলি অনিল, এই জিনিসের ছবি আঁকা খুব সমস্যা।'

যে-কোনো সুন্দর জিনিস দেখলেই সুরেশ বাগচীর প্রথম চিন্তা এটার ছবি আঁকা যাবে কিনা। ভাবটা এরকম যেন ছবি আঁকা গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ রং তুলি দিয়ে ছবি এঁকে ফেলতেন।

'দিঘির জলে আকাশের ছায়া' দেখাবার জন্যে সুরেশ বাবু একবার অনিলকে নিয়ে গেলেন। সেটা নাকি একটা দেখার মতো ব্যাপার। যার ছবি আঁকা অসম্ভব। অনিলের বয়স তখন ছয় কি সাত। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা। সুরেশ বাগচী বললেন, 'কষ্ট হচ্ছে নাকি রে বাবু ?'

অনিল বলল, 'বাবু বলবে না।'

'আচ্ছা যা বলব না। কষ্ট হচ্ছে নাকি রে অনিল ?'

অনিল বলল, 'হুঁ।'

'যে-কোনো ভালো জিনিস দেখার জন্যে কষ্ট করতে হয়। আয় কাঁধে উঠে পড়।'

পাঁচ মাইল দূরে বিরামপুর দিঘি। মহারাজ কৃষ্ণকান্তর কাটা দিঘি। বাঁধানো ঘাট। সুরেশ বাবু তাঁর ছেলেকে নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হলেন। লোকজন কাপড় কাচছে, গোসল করছে। তিনি বললেন, 'আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ঘণ্টাখানেকেব জন্য দিঘির জল কেউ নাড়াবেন না। নিস্তরঙ্গ জলে আকাশের ছায়া দেখাবার জন্যে আমি আমার পুত্রকে নিয়ে এসেছি। অনেক দূর থেকে এসেছি।'

আধবুড়ো এক লোক বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনে কেডা ?'

'আমার নাম সুরেশ বাগচী। আমি একজন শিক্ষক। দিঘির জল ঘণ্টাখানেকের জন্যে না নাড়ালে বড় ভালো হয়।'

'কাজকামের সময় চুপচাপ কে বসে থাকবে বলেন ? বিকালে আসবেন।'

'আচ্ছা, আমরা বরং অপেক্ষা করি। অপেক্ষারও আনন্দ আছে। খিদে পেযেছে নাকি রে অনিল ?'

'না।'

'অতসীকে নিয়ে আসলে ভালো হত। বেচারির এত শখ ছিল দেখার। ভাবলাম, মেয়েমানুষ এত দূর হাঁটবে। মেয়ে হলে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয। তোব ঘুম পাচ্ছে নাকি? ঝিমাচ্ছিস কেন ?'

দিঘির ঘাট আর জনশূন্য হয় না। লোকজন আসছেই। দুঘণ্টা বসে থাকার পর বৃষ্টি শুরু হযে গেল। ঝুম বৃষ্টি। সুরেশ বাগচী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর হবে না, চল ফিরে যাই।'

ছাতা নেই। ভিজতে ভিজতে ফেরা। রাস্তা হয়েছে পিছল। সুরেশ বাগচীকে ছেলে কাঁধে নিয়ে এগোতে হচ্ছে। তিনি বিড়বিড় করে বলছেন, 'এ তো বড়ই যন্ত্রণা হয়ে গেল। নির্ঘাৎ জ্বর-জ্বারি হবে।'

তারা বাড়ি পৌছল সন্ধ্যা মিলিয়ে যাবার পর। সুরেশ বাগচী বাড়ি পৌছে শুনলেন তাঁব মেয়ে সারাদিন কিছু খায নি। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছে। সুরেশ বাগচী উদাস গলায় বললেন, 'ভুল হয়ে গেছে রে মা। তোকে সঙ্গে নেয়া উচিত ছিল। আমরাও কিছু দেখতে পারি নি। আবার যেতে হবে। তখন নিয়ে যাব। গায়ে হাত দিয়ে বলছি রে মা।'

অতসী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'ভেজা হাত সরাও তো বাবা। নিজেরা সব ভালো ভালো জিনিস দেখবে।'

'ভুল হয়ে গেছে রে মা। বিরাট ভুল হযে গেছে। তবে আমরা ভালো জিনিস কিছু দেখতেও পাই নি। বিশ্বাস কর। এবার থেকে ভালো জিনিস যা দেখব, তোকে নিয়ে দেখব।'

অনিল কাঁঠাল গাছের মাথার মুকুটেব দিকে তাকিয়ে মন ঠিক করে ফেলল। দেশটা ঠিকঠাক হলে এই দেশে যা কিছু সন্দুর জিনিস আছে সে তার বাবাকে আর অতসীদিকে নিযে ঘুবে ঘুরে দেখবে। প্রথম ছ মাস শুধু ঘুরে বেড়াবে। কোনো একটা সুন্দব জিনিসেব সামনে বাবাকে দাঁড় করিয়ে দিযে সে বলবে — 'বাবা দেখো তো, এর ছবি আঁকা যাবে কিনা।' বাবা মাথা নাড়তে নাড়তে বলবেন, 'অসম্ভব।' অতসীদি খিলখিল করে হাসবে। বাবা বিরক্ত হয়ে বলবেন, 'হাসছিস কেন মা? সৌন্দর্যের একটা অংশ থাকে, কখনো যাব ছবি আঁকা যায় না। এই জিনিসটা বুঝতে হবে...'

গফুর সাহেবের ঘর থেকে কোরান তেলাওযাতের সুব ভেসে আসছে। তিনি ওঠেন অন্ধকার থাকতে থাকতে। নামায পড়েন। নামাযের পর অনেকক্ষণ কোরান তেলাওয়াত কবেন। তাঁর গলাব স্বর মিষ্টি। পড়েনও খুব সুন্দব করে। প্রাযই ভোরে অনিল বারান্দায় দাঁড়িযে শোনে। তার ভালো লাগে। শুধু ভালো লাগে বললে কম হয়, বেশ ভালো লাগে।

গফুর সাহেব দবজা খুলে অনিলকে দেখলেন। ক্লান্ত গলায বললেন, 'রাতে ঘুম হযেছিল অনিল ?'

'জ্বি।'

'আমাব এক ফোঁটা ঘুম হয নি। সাবারাত জেগে কাটালাম। খুব খারাপ লাগছে। গত বাতেও ঘুমাতে পারি নি। এইভাবে দিন কাটালে তো বাঁচব না। কিছু একটা করা উচিত।'

'কী করবেন ?'

'তাই তো জানি না। করব কী ?'

গফুব সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় বললেন, 'তোমার একটা খবর আছে অনিল। কাল বিকেলে একটা ছেলে তোমার খোঁজে এসেছিল। অনেকক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আমাকে চিঠিটা দিযে গেছে। খুবই দুঃসংবাদ। তোমাকে দুঃসংবাদটা কীভাবে দেব বুঝতে পারছিলাম না। রাতে এই জন্যেই ঘুম হয় নি। সারারাত চিন্তা করেছি। এখন মনে হচ্ছে দুঃসংবাদটা দেওয়া উচিত। সব মানুষেরই দুঃসংবাদ জানার অধিকার আছে। মন শক্ত কর অনিল।'

অনিল তাকিযে আছে। গফুর সাহেব তার কাঁধে হাত বেখে প্রায অস্পষ্ট গলায বললেন, 'তোমাব বাবা মারা গেছেন অনিল। এটা সহজভাবে নেয়ার চেষ্টা কর। আরো অসংখ্য মৃত্যু ঘটবে। এইগুলো নিযে আমরা এখন কোনো কান্নাকাটি করব না। দেশ স্বাধীন হোক। দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা চিৎকার করে কাঁদব। নাও চিঠিটা পড়ো।'

অনিল চিঠি পড়ল। তার চোখ শুকনো। মুখ ভাবলেশহীন। অনিলের মুখের দিকে তাকিযে থাকতে থাকতে গফুর সাহেবের চোখে পানি এসে গেছে। তিনি পাঞ্জাবির প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছছেন। অনিল ছেলেটিকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। ভদ্র, লাজুক এবং অতি বিনযী ছেলে। কোরান পাঠেব পর বারান্দায এলে রোজই এই ছেলেকে দেখেন। একদিন সে লাজুক গলায় বলল, 'আমি চিঠি পেযেছি আমাব বাবা খুব অসুস্থ। নূতন চাকরি, এবা ছুটি দিচ্ছে না। যেতে পারছি না। আপনি কি আমাব বাবার জন্যে একটু প্রার্থনা করবেন?'

গফুর সাহেব বললেন, 'অবশ্যই করব, অবশ্যই। আমি খাস দিলে উনার জন্য দোয়া করব। আলাদা নফল নামায পড়ব। তুমি মোটেও চিন্তা করবে না। দেখি আস, আস আমার ঘরে, চা খাও।' অনিল তার ঘরে এসে কেঁদে ফেলল।

সেই ছেলে বাবার মৃত্যু সংবাদের চিঠি হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চিঠিটা সে দ্বিতীয়বার পড়ে নি। তার চোখ শুকনো। সে তাকিয়ে আছে কাঁঠাল গাছটার দিকে। কে জানে ছেলেটার মনের ভেতর এখন কি হচ্ছে।

গফুর সাহেব নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। আজকের মতো কোরান পাঠ তিনি শেষ করেছিলেন। এখন আরো খানিকটা পড়তে ইচ্ছা করছে।

"আলিফ লাম মীম। জা লিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহা, হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন।"

ইহা সেই গ্রন্থ, যাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। যাহা বিশ্বাসীদের পথপ্রদর্শক।

অনিল ঘরে ঢুকল। জানালা খুলে দিল। অন্ধকার ঘর ক্রমে আলো হয়ে উঠছে। আকাশ পরিষ্কার। ঝকঝকে নীল। বাতাস মধুর। শ্রাবণ মাসের অপূর্ব সুন্দর একটা সকাল।

অনিল কাপড় পরছে। সে রূপেশ্বর রওনা হবে। তার এখন কেন জানি মোটেই ভয় লাগছে না। চুল আঁচড়াবার জন্য চিরুনি খুঁজতে ড্রয়ারে টান দিতেই একগাদা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। দু একটা পড়েছে মেঝেতে। অনিলের কাছে লেখা তার বাবা এবং অতসীদির চিঠি। তার কাছে লেখা তার বাবার শেষ চিঠিটাই সে শুধু সঙ্গে নিয়ে যাবে। বাকিগুলো থাকুক যেমন আছে। শেষ চিঠিতে সুবেশ বাগচী লিখেছেন —

'বাবা অনিল,

অত্যন্ত বিষণ্ন মনে তোমাকে পত্র দিতেছি। চারিদিকের আবহাওয়া আমার ভালো বোধ হইতেছে না। শংকিত বোধ করিতেছি। মন বলিতেছে এই দেশ বড় ধরনের কোনো বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া যাইবে। নিজের জন্যে এবং অতসীর জন্যে আমার কোনো চিন্তা নাই। তোমাকে নিয়াই যত ভয়। রাজধানীতে আছ। বিপর্যয়ের প্রথম ধাক্কাটা তোমাদের উপর দিয়াই যাইবে। তুমি ভীতু ধরনের ছেলে, কী করিতে কী করিবে তাহাই আমার চিন্তা। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখিও এবং ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিও। ভুলিও না — মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহার বিরাট জগতের প্রতিটি জীবের কথা ভাবেন। আমাদেরও উচিত তাঁহার কথা ভাবা।

অতসী ভালো আছে। তাহাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করা আমার বড় দায়িত্বের একটি। তেমন সন্ধান পাইতেছি না। তাহার বড় মামা কলিকাতা হইতে পত্র দিয়াছেন যেন আমি অতসীকে কলিকাতা নিয়া যাই। সেইখানে পাত্রের সন্ধান করিয়া বিবাহ দিবেন। আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। অতসী এই দেশের মেয়ে। এই দেশে তাহার বিবাহ হইবে। এই বিষয়ে তোমার ভিন্ন মত থাকিলে আমাকে জানাইবে।

মোক্তার পাগলি মাঝেমধ্যে তোমার সন্ধানে আসে। কিছুদিন পূর্বে কয়েকটা পাকা কামরাঙ্গা নিয়া আসিয়াছিল। তোমাকে দিতে চায়। একজন পাগল মানুষের ভালবাসার এই প্রকাশ দেখিয়া আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। আমি অতসীকে বলিলাম যত্ন করিয়া সে যেন মোক্তার পাগলিকে চারটা ভাত খাওয়াইয়া দেয়। তাহাকে বারান্দায় পাটি বিছাইয়া খাইতে দেওয়া হইল। সে অনেকক্ষণ ভাত মাখাইয়া কিছু মুখে না দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

এই পাগল মানুষটি তোমার প্রতি যে ভালবাসা দেখাইল তাহা তুমি স্মরণ রাখিও। আরেকজন মানুষের কথা স্মরণ রাখিও — যিনি তোমার প্রতি কোনো ভালবাসা দেখাইবার

সুযোগ পান নাই। তিনি তোমার মা। তোমার জন্মমুহূর্তেই তাঁহার মৃত্যু হইযাছে। মাযেরা সন্তানের জন্যে অসীম ভালবাসা নিযা আসেন। এই মা সেই অসীম ভালবাসার কিছুই ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া মনে করিও না সেই ভালবাসা নষ্ট হইযাছে। এই পৃথিবীতে সবই নশ্বর, কিছুই টিকিয়া থাকে না, কেবল ভালাবসা টিকিয়া থাকে।

যদি কখনো বড় বিপদে পড়ো ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। সেই সঙ্গে তোমার মাকেও স্মরণ করিবে। ইহাই আমার উপদেশ। পরম করুণাময় তোমার মঙ্গল করুন।"

৩

রেস্টুবেন্টেব নাম কিছুদিন আগেও ছিল 'বাংলা রেস্টুরেন্ট।'

এখন নতুন নাম। কাযদে আযম বেস্টুবেন্ট। সাইনবোর্ড ইংরেজি, উর্দু এবং বাংলায লেখা। সবচে' ছোট হবফ বাংলায। বাঙালিবা এসব দেখছে। কিছুই বলছে না। চুপ করে আছে। ছাব্বিশে মার্চেব পর সবাই অতিরিক্ত বকমেব চুপ। বেস্টুরেন্টে ফ্রেমে বাঁধাই কবা আছে বড় বড় অক্ষরে লেখা "রাজনৈতিক আলোচনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।" তার প্রযোজন ছিল না। বাজনৈতিক আলোচনা কেউ কবছে না। মনে হচ্ছে এ বিষযে এখন কাবো কোনো আগ্রহ নেই।

অনিল কাযদে আযম বেস্টুবেন্টে নাশতা খেতে এসেছে। ভালোমতো খেযে নেবে, তাবপব বওনা হবে টাঙ্গাইলেব দিকে। বাস আছে নিশ্চযই। পত্রিকায বাব বাব লেখা হচ্ছে— 'দেশেব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হযেছে।' দুষ্কৃতকারীব খববও কিছু আছে, তা ভেতবেব পাতায। নিতান্ত অবহেলায এক কোণে ছাপা। তবু, কী কবে জানি এই খবরের দিকেই চোখ চলে যায। অনিল চা খেতে খেতে কাগজ পড়ছে।

প্রথম পাতার খবর হল হাজিব হওযাব নির্দেশ। চোখে কালো চশমা, বগলে ব্যান্টনসহ টিক্কা খানের হাসি হাসি মুখেব এক ছবির নিচে লেখা — খ অঞ্চলেব সামবিক আইন প্রশাসক কর্নেল ওসমানীকে হাজিব হওযাব নির্দেশ প্রদান কবেন। সবকাবি নির্দেশে বলা হয—

"৪০ নম্বর সামবিক আইন বিধি অনুযাযী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আমি 'খ' অঞ্চলেব সামবিক আইন প্রশাসক লে. জে. টিক্কা খান এম. পি. কে, পি এসসি — আপনি কর্নেল এম. এ. জি ওসমানীকে (অবসরপ্রাপ্ত) আপনাব বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধিব ১২১, ১২৩, ১৩১ ও ১৩২ নম্বব ধারা এবং ১০ ও ১৪ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযাযী আনীত অভিযোগেব জবাব দেযার জন্যে ১৯১১ সালেব ২০শে আগস্ট সকাল আটটার সময ঢাকাব দ্বিতীয বাজধানীস্থ ১ নম্বব সেক্টরেব উপসামরিক আইন প্রশাসকেব সামনে হাজির হতে আদেশ দিচ্ছি। যদি আপনি হাজিরে ব্যর্থ হন তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতে ৪০ নম্বব সামবিক আইন বিধি অনুযাযী আপনাব বিচার হবে।"

বাণিজ্য, শিল্প ও আইনমন্ত্রী আখতাবউদ্দিন আহমেদ সাহেবেরও একটি ছবি ছাপা হয়েছে টিক্কা খানের ছবির নিচে। মন্ত্রী জনসভায বলেছেন —

"আল্লাহ না করুক, পাকিস্তান যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানবা তাদেব আলাদা বৈশিষ্ট্য হাবিযে ফেলবে এবং হিন্দুদেব দাসত্বেব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হযে পড়বে।"

বক্স করে ছাপা হয়েছে — "সাবধান, গুজব ছড়াবেন না। আপনার গুজব শত্রুকেই সাহায্য করে।"

দু পৃষ্ঠার খবরের কাগজ এই টুকুতেই শেষ। শেষের পাতায় সামরিক নির্দেশাবলী যা কিছুদিন পরপর ছাপা হচ্ছে। ভেতরের দু পাতার সবটাই বিজ্ঞাপন। এক কোনায় ছোট করে একটা সংবাদ — শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার : কয়েকজন গ্রেপ্তার।

"গত রোববার রাতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযানগুলো চালানো হয়।"

গ্রেপ্তার করা দুটি ছেলের ছবি ছাপা হয়েছে। ছেলে দুটির বয়স কিছুতেই আঠার-উনিশের বেশি হবে না। দুজনেরই হাত পেছন দিকে বাঁধা। কিন্তু এদের মুখ হাসিহাসি। ছবি তোলার সময় এরা কি সত্যি হাসছিল না অনিল কল্পনা করছে, এরা হাসছে? এদের নাম দেয় নি, নাম দেয়া উচিত ছিল।

'ভাইজান, খবরের কাগজটা দেখি।'

অনিল তার সামনে বসা মানুষটির দিকে কাগজ এগিয়ে দিল। সেও সব খবর ফেলে এই খবরটিই পড়ছে। একটা খবর পড়তে এতক্ষণ লাগে না। নিশ্চয়ই বার বার পড়ছে। মানুষটার চোখে মুখে আনন্দের আভা। পত্রিকা বন্ধ করার পরেও সে আরেকবার খুলল, তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। অনিল বলল, 'কাগজটা আপনি রেখে দেন।'

'জ্বি না, দরকার নেই।'

'রেখে দেন। অন্যকে দেখাবেন।'

লোকটা হেসে ফেলে চাপা গলায় বলল, 'দুই বাঘের বাচ্চা, কি বলেন ভাইজান?'

অনিল বলল, 'বাঘের বাচ্চা তো নিশ্চয়ই।'

'খাঁটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। দেখেন চোখ দেখেন। চোখ দেখলেই বোঝা যায়।'

অনিল আরেক বার তাকাল। ছেলে দুটির চোখ দেখা যাচ্ছে না। মারের জন্যেই মুখ ফুলে চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে। তবু এর মধ্যেই তেজী চোখ এই মানুষটা দেখতে পাচ্ছে। তাই তো স্বাভাবিক। চায়ের দাম দিয়ে অনিল উঠে পড়ল। সে অফিসে যাবে। বড় সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে রওনা হবে দেশের দিকে। পৌছতে পারবে কিনা সে তা জানে না। চেষ্টা করবে।

কী সুন্দর দিন! কী চমৎকার রোদ! শ্রাবণ মাসের মেঘশূন্য আকাশের মতো সুন্দর কিছু কি আছে? এই রোদের নাম মেঘভাঙা রোদ। রিকশা নিতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ইচ্ছা করছে। রাস্তা এখনো ফাঁকা। তারচেয়েও বড় কথা, রাস্তায় কোনো শিশু নেই। এখনকার এই নগরী শিশুশূন্য। বাবা-মারা তাদের সন্তানদের ঘরের ভেতরে আগলে রাখছেন। শহর এখন দানবের হাতে। শিশুদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

বড় রাস্তার মোড়ে মেশিনগান বসানো একটি ট্রাক। পাশেই জিপ গাড়ি। বিশাল ট্রাকের পাশে জিপটাকে খেলনার মতো লাগছে। একজন অফিসার কথা বলছেন একজন বিদেশির সঙ্গে। বিদেশির কাঁধে কয়েক ধরনের ক্যামেরা। দুজনের মুখই খুব হাসিহাসি। এই বিদেশি কি একজন সাংবাদিক? কয়েকদিন আগে অনিল পত্রিকায় পড়েছিল, বিদেশি সাংবাদিকদের আহ্বান করা হয়েছে তারা যেন নিজেদের চোখে দেখে যায় কী সুন্দর পরিবেশ পূর্ব পাকিস্তানে।

এই লোকটি তাই দেখতে আসছে? সুন্দর পরিবেশ দেখে মোহিত হচ্ছে? কিছুটা মোহিত হতেও পারে। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। বস্তি নেই। পঁচিশে মার্চেই বস্তি উজাড় হয়েছে। ভিখিরিও নেই। ভিখিরিরা ভিক্ষা চাইতে কেন বেরুচ্ছে না কে জানে? এরা সম্ভবত ভিখিরিদেরও গুলি করে মারছে।

বিদেশি ভদ্রলোক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অনিলের দিকে। হাত ইশারা করে তিনি অনিলকে ডাকলেন। শুধু অনিল না, আরো কয়েকজনকে তিনি ডেকেছেন। তারা ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে। অনিল এগিয়ে গেল।

সেনাবাহিনীর অফিসারটি ইংরেজি–বাংলা–উর্দু মিশিয়ে যে কথা বলল, তা হচ্ছে ইনি ইউনাইটেড প্রেসের একজন সাংবাদিক। খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন। তোমাদের যা বলার ইনাকে বল। ভয়ের কিছু নাই। Whaterver you want to say, say it. কোই ফিকির নেই। সাংবাদিক ভদ্রলোক একজন দোভাষী নিয়ে এসেছেন। বিহারী মুসলমান। সে কথা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছে। নীল হাওয়াই শার্ট পরে একজন মানুষকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হল —। প্রশ্নোত্তরের পুরো সময় মুখের সামনেই মাইক্রোফোন ধরা থাকল।

'আপনার নাম?'

'আমার নাম মোহাম্মদ জলিল মিযা।'

'কী করেন?'

'আমি একজন ব্যবসায়ী, আমার বাসাবোয ফার্নিচারের দোকান আছে।'

'দেশের অবস্থা কী?'

'জনাব অবস্থা খুবই ভালো।'

'মুক্তিবাহিনী শহরে গেরিলা অপারেশন চালাচ্ছে, এটা কি সত্য?'

'মোটেই সত্য না।'

'একটা পেট্রল পাম্প তো উড়িয়ে দিয়েছে।'

'এগুলো হল আপনার দুষ্কৃতকারী।'

'আপনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর সন্তুষ্ট?'

'জ্বি জনাব। এরা দেশ রক্ষা করেছে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

' শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?'

'তিনি আমাদের ভুল পথে পরিচালনা করেছেন। ইহা উচিত হয় নাই।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আপনাকে ধন্যবাদ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

মাইক্রোফোন এবার অনিলের কাছে এগিয়ে আনা হল।

'আপনার নাম?'

'আমার নাম অনিল। অনিল বাগচী।'

'আপনি কী করেন?'

'আমি একটা ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কাজ করি। আলফা ইন্সুরেন্স।'

'দেশের অবস্থা কী?'

'দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।'

'কেন বলছেন দেশের অবস্থা খারাপ?'

'স্যার, আপনি নিজে বুঝতে পারছেন না? আপনি কি রাস্তায় কোনো শিশু দেখেছেন? আপনার চোখে পড়েছে হাসতে হাসতে, গল্প করতে করতে কেউ যাচ্ছে? শহরে কিছু সুন্দর সুন্দর পার্ক আছে। গিয়ে দেখেছেন পার্কগুলোতে কেউ আছে কিনা? বিকাল চারটার পর

রাস্তায় কোনো মানুষ থাকে না। কেন থাকে না? স্যার, আমার বাবা মারা গেছেন মিলিটারির হাতে।'

'কী করতেন আপনার বাবা?'

'তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।'

'আপনি কি আওয়ামী লীগের কর্মী?'

'না, আমি আওয়ামী লীগের কর্মী না।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

সবাই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে অনিলের দিকে। সবচে' বেশি অবাক হয়েছে ফার্নিচাব দোকানের মালিক। অনিল একবারও মিলিটারি অফিসারের দিকে তাকাল না। তাকে চলে যেতে বলা হয়েছে। সে চলে যাচ্ছে। ভুলেও পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে এই বুঝি একঝাঁক গুলি এসে পিঠে বিঁধল।

ফার্নিচার দোকানের মালিক অনিলের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সে ফিসফিস করে বলল, 'জানে বাঁচার জন্যে মিথ্যা কথা বলতে হয় ভাই সাহেব। এতে দোষ নাই। আপনি গলির ভেতর ঢুকে পড়েন। গলির ভেতর ঢুকে দৌড় দিয়া বের হয়ে যান।'

অনিল গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। ভদ্রলোক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে লজ্জিত ও বিব্রত মনে হচ্ছে।

অনিল এগুচ্ছে দ্রুত পায়ে। তার মাথায় ঝনঝন করে বাজছে — বিপদে মিথ্যা বলার নিযম আছে। বিপদে মিথ্যা বলার নিয়ম আছে।

সুরেশ বাগচী মিথ্যা বিষয়ে তাঁর ছেলেমেয়েদের একটি গল্প বলেছিলেন। মহাভারতেব গল্প। অশোক বনে শর্মিষ্ঠা নামের অতি রূপবতী এক রমণী কিছুকালেব জন্যে বাস করেছিলেন। একদিন মহারাজ যযাতি বেড়াতে বেড়াতে চলে এলেন অশোক বনে। শর্মিষ্ঠা তাঁকে দেখে ছুটে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আমার স্বামী নেই, আমি যৌবনবতী, আপনি আমার সঙ্গে রাত্রিযাপন করুন। আমার ঋতু বক্ষা করুন।' যযাতি বললেন, 'তা সম্ভব না।' তোমার সঙ্গে শয্যায গেলে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে। মহাপাপ হবে।' শর্মিষ্ঠা বললেন,

"নন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
ন স্ত্রীষু রাজন ন বিবাহকালে
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপথরে
পঞ্চান্তান্যাহুর পাতকানি"

তার মানে হল, পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না। পরিহাসে, মেয়েমানুষকে খুশি করায়, বিবাহকালে, প্রাণ সংশয়ে এবং সর্বস্ব নাশের সম্ভাবনায়। আপনি আমার সঙ্গে রাত্রিযাপন করলে আমাকে খুশি করবেন। কাজেই আপনার পাপ হবে না। এই কথায মহারাজ যযাতি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে রাত্রিযাপনে রাজি হলেন।

সুরেশ বাগচী বললেন, 'গল্পটা কেমন লাগল?'

অনিল, অতসী কেউ কিছু বলল না।

'মহারাজ যযাতির কাজটা কি ঠিক হয়েছে?'

অতসী বলল, 'ঠিক হয় নাই।'

'হ্যাঁ, ঠিক হয় নাই। ধর্মগ্রন্থে যাই থাকুক কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যায না। বাবারা, এটা যেন মনে থাকে।'

অনিল অসম্ভব ভীতু। কিন্তু বাবার চিঠি বুকে নিয়ে সে মিথ্যা বলতে পারছে না। তাকে সত্যি কথাই বলতে হবে। চিঠিটা কি ফেলে দেয়া ভালো না?

৪

আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানির হেড অফিস মতিঝিলে।

তাদের অফিস ছোট কিন্তু ব্যবসা ভালো। জাহাজের মালামাল ইন্সুরেন্স করাই এই কোম্পানিব ব্যবসা। এই ধরনের ব্যবসায় বিশাল অফিস লাগে না। একটা টেলিপ্রিন্টার, আন্তর্জাতিক টেলিফোন লাইন, উপরের মহলের সঙ্গে ভালো যোগাযোগই যথেষ্ট। অল্প কিছু কাজ জানা লোকই যথেষ্ট। কোম্পানির মালিক জোবাযেদ সাহেব। অবাঙালি। ১৯৫০ সালে বিহাব থেকে মোহাজেব হয়ে বাবা-মার সঙ্গে ঢাকা এসেছিলেন। তখন তাঁব বযস মাত্র একুশ বছব। সেই সময তাঁদের পরিবাবের সম্বল ছিল মাযেব আঠাব ভবি সোনার গযনা। মাত্র কুড়ি বছবের ব্যবধানে সেই বিত্ত ফুলে ফেঁপে একাকাব হযেছে। জোবাযেদ সাহেব আলফা ইন্সুবেন্সের একটা শাখা অফিস খুলেছেন কবাচীতে। খুব সম্প্রতি লন্ডনেও একটা অফিস নেয়া হযেছে। অফিস চালু হবার আগেই ঝামেলা লেগে গেল। তিনি ঠাণ্ডা মাথায ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য বাখছেন। এমনিতেই তাঁব মাথা ঠাণ্ডা। এখন তা আরো অনেক ঠাণ্ডা হযে গেছে।

অফিসেব কাজকর্ম নেই বললেই হয। টেলিপ্রিন্টাবেব খটখট বেশ কিছুদিন হল শোনা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক লাইন সব সময ব্যস্ত। লাইন চাইলেই পাওযা যায না। গতকাল সাবাদিন অপেক্ষা করে কবাচীর লাইন পেলেন। তাও কথাবার্তা পবিষ্কার না। কবাচী অফিসেব নবী বখশ বলল, 'বাঙালি কুত্তাগুলোব খবর কী? কুত্তাগুলোব ল্যাজ সোজা হযেছে?'

জোবাযেদ সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টে ব্যবসার কথা তুললেন। জানা গেল ব্যবসা মোটামুটি খুব খাবাপ না, আবার ভালোও না। নবী বখশ আবাব বাঙালি প্রসঙ্গ তুলল, ইংরেজিতে যা বলল তার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে — 'সব বাঙালি পুরুষগুলোব বিচি অপাবেশন করে ফেলে দেয দবকার। বিচি ফেলে দিলেই এরা ঠাণ্ডা হযে যাবে। বিচি গরম হওযায এবকম করছে। গরম দেশে গবম বিচি ভালো না।'

জোবাযেদ সাহেব চিন্তিত বোধ করছেন। পশ্চিমাদের মনোভাব এই হলে ঝামেলা মিটবে না। তারা বাঙালিদের যতটা তুচ্ছ করছে তত তুচ্ছ কবাব কিছুই নেই। বরং এরা জাতি হিসেবে ভযংকব। ইংবেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই বাঙালিগুলোই শুরু কবেছিল। যাদের বাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না তাবা যে পালিযে বাঁচল তা গান্ধিজীব জন্যে না। চবকা কাটা, দেশি লবণ খাওযা এগুলো ফালতু ব্যাপার। ব্রিটিশ সিংহ চবকা ভয পায না। ব্রিটিশ সিংহ ভয পেযেছিল ক্ষুদিরাম মার্কা ছেলেগুলোকে।

বাঙালিগুলো মহা অলস, একটু ভালো-মন্দ খেতে পাবলে মহা খুশি, গল্প করার সুযোগ পেলে খুশি, রাজনীতি নিযে দু একটা কথা বলতে পাবলে আনন্দে আত্মহারা, নিজেব বউ নিয়ে বেড়াতে যাবাব সময় আড়চোখে অন্যের স্ত্রীকে একটু দেখতে পাবলে মহা আনন্দিত তবে এদের রক্তের মধ্যে কিছু একটা আছে। বড় কোনো গণ্ডগোল আছে। মাঝে মাঝে এরা খেপে যায়। কিছু বুঝতে চায না, শুনতে চায না। সাহস বলে এক বস্তু যে এদের চবিত্রে নেই, সেই জিনিস কোথেকে চলে আসে।

জোবায়েদ বুঝতে পারছে সামনের দিন পাকিস্তানিদের জন্যে ভালো না। শুধু ভালো না বললে কম বলা হবে, সামনের দিনগুলো ভযংকর। আশ্চর্যের ব্যাপাব, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কেউ তা ধরতে পাবছে না। এরা এখন মোটামুটি সুপ্ত। দেশ দখলে নি

এসেছে। থানা পর্যায়ে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। চলে এসেছে মিলিশিয়া, বেঙ্গল পুলিশ। ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কমান্ডো গ্রুপের সুশিক্ষিত সৈন্য। আরো আসছে। জাহাজ আসছে।

সিগন্যাল কোরের কর্নেল এলাহীর সঙ্গে জোবায়েদ সাহেবের সুসম্পর্ক। কর্নেল এলাহীর এক শালাকে তিনি লন্ডন ব্রাঞ্চের অফিসের দায়িত্ব দিয়েছেন। এলাহী সাহেব মাঝে মাঝে জোবায়েদ সাহেবের অফিসে কফি খেতে আসেন। গল্প-গুজব করে বিদেয় হন। ব্যাপারটা জোবায়েদের পছন্দ না, কারণ শহরের মুক্তিবাহিনী নামক গেরিলারা তৎপর হচ্ছে। কর্নেল এলাহীর এখানে আগমন তাদের চোখে পড়তে পারে। অফিসে বোমা মেরে দেয়া বিচিত্র কিছু না। অবশ্যি জোবায়েদ সাহেব জানেন — গেরিলা তৎপরতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনার এখনো কোনো কারণ ঘটে নি। অল্পবয়েসী কিছু ছেলেপুলে এই কাজটা করছে। গেরিলা জীবনের রোমান্টিক অংশটাই তাদের আকৃষ্ট করছে। তবে এটাকে অবহেলা করাও ঠিক না। যুদ্ধে অতি তুচ্ছ ব্যাপারও অবহেলা করতে নেই। ঘোড়ার নালের জন্যে পেরেক ছিল না বলে রাজত্ব চলে গেল। গল্পের রূপক অংশটি অগ্রাহ্য করা ঠিক না।

জোবায়েদ সাহেব ঠিক নটার সময় অফিসে আসেন। তাঁর ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন। এক ঘণ্টা পরপর কফি খান। একটা কফি, একটা সিগারেট। বেলা একটার মধ্যে পাঁচটা সিগারেট এবং পাঁচ কাপ কফি খাওয়া হয়। একটা বাজার পাঁচ মিনিট পর তিনি অফিস থেকে বের হন। বাড়ি চলে যান। বাকি সময়টা বাড়িতেই থাকেন। বাড়ি থেকে বের হন না। গত দুমাস ধরে এই তাঁর রুটিন। এক মাস আগে পরিবারের সবাইকে করাচী পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা, এক সময় হঠাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার চাপ সৃষ্টি হবে। বিমানের টিকিট পাওয়া যাবে না। তাঁর ধারণা সচরাচর ভুল হয় না। তিনি নিজের যাবার কথা ভাবতে পারছেন না। কারণ তাঁর সম্পদ চারদিকে ছড়ানো। সিলেটে চা বাগানে ত্রিশ পার্সেন্ট শেয়ার কেনা আছে। দিলখুশা এলাকায় কিনেছেন পাঁচ বিঘা জমি। এই জমি সোনার খনির মতো। বিশ বিঘা জমি নারায়ণগঞ্জে কেনা আছে। একটা ফ্যাক্টরি দেবার কথা ভাবছিলেন। দুটি বাড়িও ঢাকা শহরে তাঁর আছে। সেই তুলনায় করাচীতে কিছুই নেই। তিনি অতি বিচক্ষণ লোক হয়েও এই বড় ভুলটি করেছেন। সম্পদ এই অংশে তৈরি করে যাচ্ছেন।

দেশ যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়ে যায় তাহলে কী হবে? ইন্ডিয়া দখল করে নেবে? সেই সম্ভাবনা কতটুকু? এখনো বুঝতে পারছেন না। ইন্ডিয়া কি এত বড় ভুল করবে? মনে হয় না। এই দেশের মানুষগুলোর ইন্ডিয়া প্রসঙ্গে কোনো মোহ নেই। যারা ইন্ডিয়ার আশ্রয় নিয়েছে, তাদের উপর দেশের মানুষ খানিকটা বিরক্ত বলেই মনে হয়।

বড় সাহেবের দরজার পর্দা ফাঁক করে মোবারক ঢুকল। হাসিমুখে বলল, 'কর্নেল সাব আয়া।'

জোবায়েদ সাহেব বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তির কারণ দুটি। এক, কর্নেল সাহেবের সঙ্গে তিনি কথা বলতে চাচ্ছেন না। দুই, মোবারক এখন আর বাংলা বলছে না। মোবারক অবাঙালি কিন্তু কথা বলত বাংলায়। নিখুঁত ঢাকাইয়া বাংলায়। কিছুদিন হল সে আর বাংলা বলছে না। দাঁত বের করে যখন-তখন হাসছে। মনে হচ্ছে পুরো দেশটা সে তার চকচকে গোলাপি শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে বসে আছে। এখন নিশ্চিত মনে জর্দা দিয়ে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা যায়।

জোবায়েদ সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমাকে কফি দাও।'

মোবাবক পান খাওযা লাল দাঁত বেব করে বলল, "কফি তুবন্ত আ যাযে গি।"

কর্নেল এলাহী শুধু হাতে আসেন নি। একটা চকলেটেব টিন নিয়ে এসেছেন। বিদেশি চকলেট, বেশ দামি জিনিস। তিনি কখনো খালি হাতে আসেন না। এর আগেব বার এসেছিলেন 'আতর' নিযে। তাঁদের ভেতব কথাবার্তা ইংরেজিতে হল।

এলাহী : তোমার মুখ এমন গম্ভীর কেন ? ব্যবসার হাল কি ভালো না?

জোবায়েদ : না। ব্যবসা মন্দা।

এলাহী : খুব সাময়িক ব্যাপার। কয়েকটা দিন যাক, দেখবে ব্যবসা হু হু করে বাড়বে।

জোবায়েদ : কয়েকটা দিন মানে কত দিন ?

এলাহী : এই ধব তিন মাস।

জোবাযেদ : তিন মাসে সব ঠিক হযে যাবে ?

এলাহী : ঠিক তো এখনই হযে গেছে। থানায থানায আমাদের লোক আছে। এখন হচ্ছে কম্বিং অপাবেশন। প্রতিটি মানুষকে এক এক কবে দেখা হচ্ছে।

জোবাযেদ : কম্বিং অপারেশনেব পব কী হবে ?

এলাহী কী হবে তা কর্তাব্যক্তিবা ঠিক কববেন। আমি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য। তবে আমাব যা অনুমান ওদেব শাযেস্তা কবাব পব একটা রাজনৈতিক সমাধানের দিকে যাওয়া হবে। এক ধবনেব আই ওযাশ আব কি। হা-হা-হা। তখন ওদেব যা বলা হবে তাতেই তাবা বাজি হবে। 'দুদু খাবে?' — বললে ওবা বলবে — 'খাব'। 'তামাক খাবে?'— বললেও ওবা বলবে, 'খাব।'

জোবাযেদ তোমাদেব অবস্থা তাহলে ভালো।

এলাহী : ভালো মানে ? একসেলেন্ট! Can not be better.

জোবাযেদ : শুনছি তোমবা মেযেদেব উপব অত্যাচার কবছ — এটা কি ঠিক ?

এলাহী . কোথেকে শুনছ! ইন্ডিযা বেতাব?

জোবাযেদ . হ্যাঁ, বিবিসিও বলছে।

এলাহী : তুমি কি আজকাল প্রপাগান্ডা নিউজ শোনা ধবেছ ? সবচে' বড় ক্ষতি করছে এই সব প্রপাগান্ডা নিউজ।

জোবাযেদ : তাহলে তোমরা মেযেদেব উপব কোনো অত্যাচাব কবছ না?

এলাহী : কিছু কিছু হযতো হচ্ছে। ওযাব ফেযারে এগুলো হয। আমবা তো হাডুডু খেলছি না। যুদ্ধ কবছি। এবা আমাদেব শত্রুপক্ষ। এই দেশের মেযেবা তো আমার শ্যালিকা নয। শ্যালিকাদেব সঙ্গেও যেখানে ফষ্টিনষ্টি কবাব সুযোগ আছে, সেখানে এদেব সঙ্গে কেন কবা হবে না তুমি আমাকে বলো।

কফি চলে এসেছে। কর্নেল এলাহী কফিতে চুমুক দিযে তৃপ্তির ভঙ্গি কবল। জোবাযেদ সিগাবেট ধরাল। এই সিগাবেটটা বাড়তি। আজ একটার ভেতব ছটা সিগাবেট খাওযা হযে যাবে। কফিও এককাপ বেশি খাওযা হবে। জোবাযেদেব বিবক্তি-ভাব বাড়ছে। সে সিগারেটে লম্বা টান দিযে বলল, 'কর্নেল এলাহী!'

'বলে ফেলো।'

'তুমি নিজে কি কখনো বাঙালি মেয়েকে রেপ করেছ? ঠিকঠাক জবাব দাও। তোমার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। আগুন হাতে নিয়ে মিথ্যা বলাটা ঠিক হবে না।'

'মিথ্যা বলতে চাচ্ছি এই ধারণা তোমার হল কেন? মিথ্যা বলার তো তেমন প্রয়োজন দেখছি না। মেয়েদের সঙ্গ পেয়েছি এবং পাচ্ছি। তবে আমি বাড়ি থেকে মেয়ে ধরে এনে 'রেপ' করি নি। উপহার হিসেবে আমার কাছে পাঠানো হচ্ছে।'

'কারা পাঠাচ্ছে?'

'এই দেশের মানুষই পাঠাচ্ছে। হা-হা-হা। হিন্দু মেয়েদের সম্পর্কে আমার খানিকটা আগ্রহ ছিল। 'কামসূত্রা'র দেশের কন্যা, না-জানি কি। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এরা হচ্ছে মোস্ট অর্ডিনারি। আরেক কাপ কফি দিতে বলো। তোমার এখানে দেখি অসাধারণ কফি তৈরি হয়।'

জোবায়েদ আবেক দফা কফি দিতে বলল। আজ সাত কাপ কফি খাওয়া হবে। সাত কাপ কফি, সাতটা সিগারেট। খুব খারাপ একটা দিনের শুরু হচ্ছে। খুব খারাপ দিন। কর্নেল এলাহী কতক্ষণ এখানে থাকবে বোঝা যাচ্ছে না। মানুষটাকে এই মুহূর্তে অসহ্য বোধ হচ্ছে।

'কর্নেল এলাহী!'

'ইয়েস মাই ফ্রেন্ড।'

'তুমি কফি খেয়েই বিদেয় হবে। আমাব অতি জরুরি কিছু কাজ আছে। তুমি না গেলে তা করতে পারছি না।'

'অফকোর্স বিদেয় হব। রাতে কি তুমি ফ্রি আছ?'

'কেন বল তো?'

'অফিসার্স মেসে ছোট্ট একটা পার্টি হবে। খুব এক্সক্লুসিভ।'

'পার্টিতে যেতে বলছ?'

'হ্যাঁ। তোমার মনমরা ভাব কাটানো দবকার। পার্টিতে সেই চেষ্টা সাধ্যমতো করা হবে। সন্ধ্যায় বাসায় থাকবে। আমি নিজে এসে নিয়ে যাব। চমৎকার কফি!'

অনিল বড় সাহেবেব জন্যে অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা কবছে। কর্নেল সাহেব বসে আছেন বলে যেতে পারছে না। কয়েকটি কাবণে বড় সাহেবের সঙ্গে তার দেখা হওয়া প্রয়োজন। হাতে টাকা-পয়সা নেই। কিছু যদি পাওয়া যায়। তাছাড়া বড় সাহেবকে সে পছন্দ করে। নিজেও জানে না। চাকরির ইন্টারভ্যু দিতে এসে সে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। প্রায় কুড়ি জন লোক বসে আছে চাকরির জন্যে। এই কুড়ি জনের মধ্যে তাব বিদ্যাই সবচে' কম।

ইন্টারভ্যু বোর্ডে জোবায়েদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সঙ্গে কি কোনো প্রশংসাপত্র আছে?'

অনিল প্রায় অস্পষ্ট করে বলল, 'একটা আছে কিন্তু আমি স্যার দিতে চাচ্ছি না।'

'কেন দিতে চাচ্ছেন না?'

'প্রশংসাপত্রটা আমার বাবার দেয়া। আমি কারো কাছ থেকে প্রশংসাপত্র জোগাড় করতে পারি নি, কাজেই বাবাই একটা লিখে দিলেন।'

'কী করেন আপনার বাবা?'

'স্কুল শিক্ষক।'

'প্রশংসাপত্রটা দেখি।'

অনিল খুবই অস্বস্তির সঙ্গে হাতে লেখা কাগজটা এগিয়ে দিল। তার ধারণা ছিল, প্রশংসাপত্রটা পড়ে তিনি হেসে ফেলবেন এবং বোর্ডের অন্য মেম্বারদের দেখাবেন। কারণ প্রশংসাপত্রে লেখা —

যাহার জন্যে প্রযোজ্য

একজন পিতাই তাহার পুত্রকে সঠিক চিনিতে পাবেন। মা ভালো চিনিতে পারেন না, কাবণ সন্তান নয় মাস গর্ভে ধাবণ কবিবাব কাবণে মায়ের চিন্তা ভালবাসায আচ্ছন্ন হইযা থাকে। ইহাই স্বাভাবিক। একজন পিতা সেই ক্রটি হইতে মুক্ত। আমি অনিল বাগচীব পিতা। সেই যোগ্যতায বলিতেছি — আমাব পুত্রেব ভেতর সততাব মতো বড় একটি গুণ পূর্ণমাত্রায আছে। সে তেমন মেধাবী নহে। তাহাব মেধা সাধারণ মানেব। ঈশ্বব মানুষকে পবিপূবক গুণাবলি দিযে পাঠান। সেই কারণেই আমার পুত্রেব মেধাব অভাব পূবণ করিযাছে তাহার সততা। অন্য কোনো গুণ আমি আমার পুত্রের ভেতব লক্ষ কবি নাই। যাহা লক্ষ করিযাছি তাহাই বলিলাম।

বড় সাহেব প্রশংসাপত্র ফিবিযে দিযে শুকনো গলায বললেন, 'আচ্ছা আপনি যেতে পাবেন।'

অনিল বাড়ি চলে এল। দশদিনের মাথায বেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি দিযে তাকে জানানো হল যে, চাকরি দেযা হযেছে। তাব পোস্টিং হবে লন্ডন ব্রাঞ্চে। তবে কাজ শেখাব জন্যে তাকে এক বছব ঢাকা অফিসে থাকতে হবে।

অনিল মুখ শুকনো কবে বলল, 'লন্ডনে আমি গিযে থাকব কী কবে? অসম্ভব। আমি এই চাকবি কবব না। মবে গেলেও না।'

এই সংসাবে না বলে সহজে পাব পাওযা যায না। সুবেশ বাগচী স্কুল থেকে রিটাযাব কবেছেন। সংসার অচল। অনিলকে ঢাকায আসতে হল।

মোবারক এসে অনিলকে বলল, 'কর্নেল সাহেব চলা গিযা।'

অনিল উঠল। বড় সাহেবেব সঙ্গে দেখা কববে। এমনিতেই অনেক দেবি হযে গেছে। দিনেব আলো থাকতে থাকতে টাঙ্গাইল পৌছানো দবকাব। বাস্তাঘাট কেমন কিছুই জানে না।

জোবাযেদ সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। অনিল বলল, 'স্যাব আসব?'

'আস।'

'স্যাব, আমি একটু দেশে যাব। ছুটি চাচ্ছি।'

' দেশে যাবাব মতো বাস্তাঘাট কি এখন নিবাপদ ?'

'নিবাপদ না হলেও যেতে হবে। আমাব বাবাকে স্যাব মিলিটারিরা মেবে ফেলেছে। বোনটা আছে অন্য এক বাড়িতে।'

'বস।'

অনিল বসল। জোবাযেদ সাহেব নিযম ভঙ্গ করে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধবাতে বললেন, 'আমি শুনেছি রাস্তাঘাট এখন মোটেই নিরাপদ না। আমি শুনেছি বাস থেকে যাত্রীদের নামানো হয। জিজ্ঞাসাবাদ কবা হয়। যাদের কথাবার্তায় এরা সন্তুষ্ট হয না, তাদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয। আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।'

'আমিও শুনেছি স্যার।'

'এই অবস্থায় রিস্ক নেয়া কি ঠিক ? বেঁচে থাকাটা জরুরি। ইচ্ছে করে রিস্ক নেয়া বোকামি।'

অনিল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার জায়গায় আপনি হলে কী করতেন স্যার? ঢাকায় বসে থাকতেন ?'

বড় সাহেব ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'না। আমি রওনা হয়ে যেতাম।'

'আমি তাহলে স্যার উঠি।'

'আগামীকাল গেলে কি তোমার চলে? তুমি যদি আগামীকাল যাও তাহলে মিলিটারির কাছ থেকে আমি একটা পাস জোগাড় করে দিতে পারি। কর্নেল এলাহী আমার বন্ধু।'

'মিলিটারির কাছ থেকে কোনো পাস নেব না স্যার।'

'ঠিক আছে। তাহলে দেরি কোরো না, রওনা হয়ে যাও। মে গড বি উইথ ইউ। এক প্যাকেট চকলেট আমার কাছে আছে, এটা নিয়ে যাও।'

অনিল হাত বাড়িয়ে চকলেটের টিন নিল।

'তোমার নিশ্চয়ই কিছু টাকা-পয়সা দরকার। ক্যাশিযারকে বলে দিচ্ছি, এক হাজার টাকা নিয়ে যাও। যদি আমরা দুজন বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে।'

'যাই স্যার।'

অনিল দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল। জোবাযেদ সাহেব বললেন, 'কিছু বলবে?'

অনিল না সূচক মাথা নাড়ল। জোবাযেদ সাহেব লক্ষ কবলেন ছেলেটি নিঃশব্দে কাঁদছে। কাঁদুক। কিছুক্ষণ কাঁদুক। তিনি অনিলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। সান্ত্বনার কিছু কথা বলা দরকার। একটি বাক্যও মনে আসছে না। তিনি আরেকটি সিগাবেট ধরালেন। আজ সব গণ্ডগোল হযে যাচ্ছে। তিনি একেব পর এক সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। মাথা ধরেছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।

'মোবারক।'

'ইযেস স্যার।'

'কফি।'

'কফি কামিং স্যার।'

ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না।

বাস শেষ পর্যন্ত ছাড়বে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এগারটায এই বাস ছাড়বে এমন কথা ছিল। যাত্রী উঠে বসে আছে। বাস ছাড়ছে না। এখন বাজছে একটা। সমস্যা কি তাও বোঝা যাচ্ছে না। ভুয়াপুর থেকে একটা বাস এসে পৌঁছেছে বারটায়। তার ড্রাইভার কানে কানে অন্য ড্রাইভারকে কি সব বলেছে। ড্রাইভাররা বাস ছাড়ছে না।

অনিল জায়গা পেয়েছে একেবারে পেছনের সিটে। এক কোনায় সে, বাকি সবটা জুড়ে এক পরিবার বসে আছেন। বোরকাপরা এক মহিলা, তাঁর স্বামী, এগার-বার বছরের একটি মেয়ে। আট বছর বয়েসী দুটি ছেলে, যমজ। অবিকল এক রকম দেখতে। এরা নিঃশব্দ, তবে খুব চালু। নিঃশব্দে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে চলছে। চার বছর বয়েসী একটি বাচ্চা মেয়ে। ভাইদের মারামারি সে আগ্রহ নিযে দেখছে এবং খুব মজা পাচ্ছে বলে মনে হয়।

পরিবারের কর্তা বসেছেন অনিলের পাশে। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশেব উপর। তিরিক্ষি মেজাজের মানুষ। প্রচুর কথা বলেন। মারামারিরত দুই পুত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, 'কর মারামারি কর। খামচাখামচি কর। খামচি দিয়ে একজন আরেকজনের চোখ তুলে ফেল। কিন্তু খবরদার, টুঁ শব্দ করতে পারবি না। শব্দ করলে কচুকাটা করে ফেলব। আমার নাম আযুব আলি। আমার এক কথা। গলা দিযে শব্দ বের করেছিস কি মরেছিস।'

বড় মেযেটি বাবার পাশে বসেছে। সে নিচু গলায বলল, 'মা বলছে তাব গবম লাগছে। বোরকা খুলে ফেলতে চায।'

'খবরদার, বোরকা যেমন আছে তেমন থাকবে। যখনকাব যে নিযম। এখনকার নিযম বোবকা। গরমে সিদ্ধ হলে উপায কিছু নেই। মিলিটাবিকে বলতে বলিস যে গরম লাগছে। মিলিটারি পাংখা দিযে হাওযা করবে।'

গাড়ি ছাড়বে কি ছাড়বে না কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ির হেল্লাব এসে বলে গেল— 'নাও যাইতে পারে। সামনে অসুবিধা আছে। মালিক আসতেছে, মালিক আসলে উনি যা বলবেন তাই হবে। উনি যাইতে বললে যাব। যাইতে না বললে নাই।'

যাত্রীরা সবাই বসে আছে। কেউ নড়ছে না। বোঝাই যাচ্ছে সবারই যাওযা প্রযোজন। ড্রাইভারের সিটেব ঠিক পেছনে বোরকাপবা দুজন মহিলা যাত্রী যাচ্ছেন। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক তাঁদের নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বোরকাপরা মহিলা দুজনেব একজনকে তাল পাখায ক্রমাগত হাওযা করছেন। মহিলাটি কাঁদছেন ফুঁপিযে। এক সেকেন্ডের জন্যেও থামছেন না। বোবকাপবা অন্য মহিলা গাড়িব জানালায় মাথা বেখে চুপচাপ বসে আছেন। কৌতূহলী যাত্রীবা বেশ কবাব জিজ্ঞেস করেছে কী হয়েছে। বৃদ্ধ কঠিন গলায বলেছেন, 'কিছু হয নাই।'

পুবো গাড়িতে অনিল ছাড়া যুবক কেউ নেই। যুবকবা বাসে-ট্রেনে চলাচল কবে না। প্রায স্টেশনেই ট্রেনের কামবা চেক করা হয। যুবকদের নামিযে নিযে যাওযা হয। জিজ্ঞাসাবাদ কবা হয। হাতেব মাসল টিপে দেখা হয — হাত শক্ত কিনা। শক্ত হলে অস্ত্র ট্রেনিং নিযেছে। সামান্যতম সন্দেহ হলে যুবকরা ফিরে আসে না।

বাসেব জন্যেও চেকপোস্ট আছে। মিলিশিযা নামের এক বস্তুব সম্প্রতি আমদানি হয়েছে। কালো কুর্তা পরে, কোমবে বাঁধা থাকে গুলির বেল্ট। এরা ইংবেজিও জানে না, উর্দুও জানে না। বিচিত্র ভাষায় কথা বলে। এবা ভযংকব চরিত্রের মানুষ; এই জাতীয কথা সারা দেশে ছড়িযে পড়েছে। কালো পোশাকেব মিলিশিযা চোখে পড়লে মানুষেব বুকে ধক করে ধাক্কা লাগে।

আযুব আলি বিড়ি ধরালেন। মেয়েটি বলল, 'বাবা, মা বিড়ি ফেলতে বলছে। বিড়িব গন্ধে মাব বমি আসতেছে।'

আযুব আলি মুখ বিকৃত করে বললেন, 'বমি আসলে বমি করতে বল। তোব মাযের হুকুমে এখন দুনিয়া চলবে না। সে জেনারেল টিক্কা খান না।'

আযুব আলি অনিলের দিকে ফিরে বললেন, 'ব্রাদাব, আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে?'

'না।'

'আপনাব অসুবিধা হলে ফেলে দিতাম কিন্তু পবিবাবেব কথায় আমি পযসায কেনা বিড়ি ফেলে দিব, তা হয না। আপনি যাবেন কই ?'

'রূপেশ্বব।'

'কোন রূপেশ্বর ?'

অনিল পুবো ঠিকানা বলল।

'টাঙ্গাইল পৌঁছতে পৌঁছতেই তো রাত হয়ে যাবে। রূপেশ্বর যাবেন কীভাবে?'
'রাতে রাতে যাব। হেঁটে চলে যাব।'
'এইটাই ভালো। রাতে রাতে যাওয়া ভালো। মিলিটারি বলেন আর মিলিশিয়া বলেন, সন্ধ্যার পর তারার পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর গলায় গামছা দিয়ে টেনেও এদের বের করতে পারবেন না।'
মেয়েটি বলল, 'বাবা, মা এইসব কথা বলতে নিষেধ করতেছে।'
'তোর মারে চুপ থাকতে বল। কী বলব কী বলব না সেটা আমার বিষয়। ভাই সাহেব, বিড়ি খাবেন?'
'জ্বি না।'
'খেলে খেতে পারেন। এক সুটকেস ভর্তি বিড়ি নিয়ে নিযেছি। এই যে যাচ্ছি যদি আটকা পড়ে যাই। কিছুই তো বলা যায় না।'
'যাচ্ছেন কোথায়?'
'শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। আমার এক শ্যালক বিয়ে করবে। আমি বড় জামাই। না গেলে বিয়ে হয না। তা ভাই বলেন, এটা কি বিযের সময়? মাছির মতো মানুষ মরতেছে আর তুই ব্যাটা বউয়ের সাথে... আচ্ছা যা, বিযে করবি কব। তা আমি এমন কী রসগোল্লা দুলাভাই যে আমি ছাড়া বিবাহ হবে না। আরে ব্যাটা, আমবা যে তোব কারণে এতগুলো মানুষ যাচ্ছি যদি পথে ভালো–মন্দ কিছু হয়! ধর্ যদি তোর বোনরে মিলিটারি পথে নামাযে বেখে দেয তখন কি অবস্থাটা হবে? আমাব শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ গাধা। একেবাবে গ আকারে গা, ধ আকারে ধা।'
মেযেটি বলল, 'বাবা, মা বলছে নিচে গিয়ে চা খেয়ে আসতে।'
স্ত্রীর এই পরামর্শ আযুব আলির মনে ধবল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। অনিলের দিকে তাকিযে বললেন, 'ব্রাদার, আসেন চা খাবেন।' অনিলও উঠে দাঁড়াল। ছেলে দুটিব একটি অন্যটির কান কামড়ে ধরেছে। ছেলেদেব মা কান ছাড়াবাব চেষ্টা করছেন। আযুব আলি নির্বিকাব ভঙ্গিতে বললেন, 'খেয়ে ফেল্। কামড় দিযে কান খেযে ফেল্। যন্ত্রণা কম্‌ক।'
আযুব আলি নামার সময সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকে দেখল। ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই সবার কৌতূহল আকর্ষণ করতে সমর্থ হযেছেন। ক্রন্দনবত বোবকাপবা মহিলার কাছে এসে তিনি থমকে দাঁড়িযে বললেন, 'মা, কান্নাকাটি যা কবার এখন করে নেন। মিলিটারি চেকিঙেব সময় গলা দিয়ে টুঁ–শব্দ বের করবেন না। এরা অনেক কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে। শেষে বিপদে পড়ে যাবেন। আর মা যদি কিছু মনে না করেন — ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে। যদি মোজা থাকে মোজা পরে নেন। সুন্দবী মেযে দেখলে হারামজাদাগুলোব হুঁশ থাকে না। যদি বেযাদবি কিছু কবে থাকি নিজগুণে ক্ষমা কবে দেবেন।'

বাস স্ট্যান্ডের লাগোযা দুটি স্টল। দুটিই ফাঁকা। একটিতে রেডিও বাজছে, খবর হচ্ছে। খুব চিকন গলায় একজন মহিলা খবর পড়ছেন। আযুব আলি সেটিতেই ঢুকলেন। অনিল পেছনে পেছনে গেল। রেডিওর প্রধান খবর হল, নদ নদীতে পানি বাড়ছে। কোনটিতে কত পানি বাড়ছে, তা বলা হল। বন্যাব সম্ভাবনা সম্পর্কে বলা হল। উরুগুয়েতে মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। রেক্টার স্কেলে যার মাত্রা ৩.৪, এই তথ্যও জানা গেল। তাবপব বলা হতে লাগল নিউ মেক্সিকোতে সড়ক দুর্ঘটনায এগার ব্যক্তি নিহত হবার সংবাদ।
আযুব আলি মুখ বিকৃত করে বললেন, 'শালা।'

অনিল বলল, 'কাকে বলছেন?'

'রেডিওটারে বললাম, নিজের দেশের খোঁজ নাই, অন্য দেশে এগারজন নিহত। আরে শালা, তোর দেশে কয়টা নিহত সেটা বল।'

অনিল হেসে ফেলল এবং খুবই আশ্চর্য হল যে এই অবস্থাতেও সে হাসতে পারছে। তার মধ্যে এই মুহূর্তে কোনো দুঃখবোধ আছে বলে মনে হচ্ছে না। পথের বিপদ নিয়েও সে ভাবছে না। কিছুই ভাবছে না। আয়ুব আলি স্টলের মালিকের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলেন, 'রেডিও 'বন' করেন।'

দোকানের মালিক ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'রেডিও খোলা রাখা লাগে। কোন সময় কী বলে জানা দরকার। ধরেন, হঠাৎ কার্ফ্যু দিল তখন কী করবেন? খাইবেন কি চা-নাশতা?'

'চা দাও। কাপ গরম পানি দিয়া ধুইয়া দিবা। চিনি কম।'

'যাইবেন কই আপনারা?'

'তা দিয়া আপনার প্রয়োজন নাই। চা দিতে বলছি, চা দেন। চা দিয়া দাম নেন। অধিক কথা বলার সময় এখন না।'

রেডিওতে নজরুল গীতি হচ্ছে। নজরুলের প্রেমের গান, 'নয়ন ভরা জল গো...'

বিপ্লবী গানগুলো বাজানো হচ্ছে না। স্বাধীন বাংলা বেতার বাজাচ্ছে বিপ্লবী গান।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী নজরুলের প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতে এখন খুব উৎসাহী। হামদ এবং নাতে উৎসাহী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে উৎসাহী।

আয়ুব আলি চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, 'ভাইসাব, আপনার নামটা তো জানা হল না। নাম জানা দরকার।'

'আমার নাম অনিল।'

'কী বললেন, অনিল!'

'জ্বি, অনিল বাগচী।'

'খাইছে আমারে। হিন্দু নাকি?'

'জ্বি।'

'সাহস তো কম না। হিন্দু হয়ে বাসে করে রওনা দিলেন! চেকিঙে ধরা পড়বেন। এরা চার কলমা জিজ্ঞেস করবে। প্যান্ট খুলে দেখে খৎনা হয়েছে কিনা। জানেন না?'

'শুনেছি।'

'আপনার কোনো দিকে যাওয়ার দরকার নাই — যেখানে ছিলেন সেখানে চলে যান। আর যদি ট্রেনে বাসে যেতেই হয় তবে আগে গোপনে খাৎনা করায়ে ফেলেন। এর মধ্যে লজ্জা-শরমের কিছু নাই। জান বাঁচানো ফরজ। আমি অনেক হিন্দু ছেলের কথা জানি, খাৎনা করায়ে ফেলেছে। চার কলমা মুখস্থ করেছে। আপনার কলমা কয়টা মুখস্থ?'

'একটা শুধু জানি।'

'আমি জানি মোট দুটা। চাপে পড়ে তিন নম্বরটা মুখস্থ শুরু করলাম — খালি বেড়াছেরা লাগে। তবে দুটা জানলেও চলে, এরাও দুটার বেশি জানে না। একটু সুর দিয়ে, দরদ-টরদ মাখায়ে কেরাতের মতো পড়লেই এরা খুশি। বেকুবের জাত তো। বেকুবের জাত অল্পে খুশি হয়, অল্পে বেজার হয়। ঠিক বললাম না?'

'জ্বি।'

'শুধু বেকুব না। এরা হল 'হায়ওয়ানে'র জাত। 'হায়ওয়ান' কী জানেন? 'হায়ওয়ান' হল পশু। এরা পশুর জাত। পশু না হলে প্যান্ট খুলে খাৎনা কেউ দেখে? বলেন আপনি, দেখে! এটা কি মানুষের কাজ, না পশুর কাজ? আমি তো ঠিক করে রেখেছি কেউ যদি

আমার প্যান্ট খুলতে বলে প্যান্ট খুলব, তারপর হিস করে হারামজাদার মুখে পেসাব করে দেব। এরপর যা হয়, হবে। মৃত্যু কপালে থাকলে হবে। কি বলেন।'

অনিল কিছু বলল না। আয়ুব আলি বিড়ির প্যাকেট বের করে বললেন, 'নিন, বিড়ি ধরান। বিড়িতে একটা টান দেন। মাথা পরিষ্কার হোক। হিন্দু মানুষ, সময়মতো হিন্দুস্থানে চলে গেলে ঝামেলা হত না। এতক্ষণ বাড়িতে বসে আরাম করে কচ্ছপের কোরমা খেতেন। ভালো কথা অনিল বাবু, কচ্ছপের কোরমা হয়?'

'জানি না, হয় কিনা।'

গভীর আগ্রহ নিয়ে আয়ুব আলি জিজ্ঞেস করলেন, 'কচ্ছপেব মাংস খেতে কেমন? গোশতের মতো না মাছের মতো?'

অনিল নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

'সময়টাই খারাপ রে ভাই, সময়টাই খারাপ। কারোর কথা বলতে ভালো লাগে না। আমি তো বলতে গেলে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি। চুপচাপ ঘরে থাকি। এর মধ্যে বড় শালার বিয়ে লেগে গেল। আরে ব্যাটা বলদ, এটা বিয়ে করার সময়? বড় শালী আবার একটা বাচ্চা দিয়ে ফেলল। মেযে বাচ্চা। নাম রেখেছে 'পি'। আমাকে বলল, দুলাভাই, নামটা সুন্দর না? আমি বললাম, 'পি' আবার কেমন নাম? পিসাব হলেও একটা কথা ছিল। বুঝতাম ঘন ঘন পিসাব হয বলে নাম পিসাব। এই শুনে সে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। মেয়ের আকিকা করেছে আমাকে বলে নাই। কত বড় ছোটলোকের জাত চিন্তা করে দেখেন।'

গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে। আয়ুব আলি উঠে দাঁড়ালেন। চায়ের দাম অনিল দিতে গেল। তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন অত্যন্ত আহত হযেছেন।

'চায়ের দাম দিবেন মানে? আমাব কি টাকার শর্ট নাকি? ভাই শুনেন, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনিও দেখলাম আমাব মতো কম কথার মানুষ। পথে যদি চেকিং হয — অনিল বাগচী নাম বলার কোনো প্রযোজন নাই। নাম জিজ্ঞেস কবলে বলবেন — মহসিন। মহসিন হল আমার বড় শ্যালকের নাম। যে গাধাটা বিযে করেছে ঐ গাধাটার নাম। বলবেন যে আপনি বিবাহ করতে দেশে যাচ্ছেন। কেউ বিযে-শাদী কবতে যাচ্ছে শুনলে এদের মন একটু নরম হয। মারধর করলেও গুলি করে মাবে না। নাম মনে থাকবে তো? মহসিন। বিপদের সময় মানুষ আসল নামই ভুলে যায, আর নকল নাম! গাড়িতে বসে কযেকবার মনে মনে বলেন — মহসিন, মহসিন, মহসিন। দানবীর হাজি মোহাম্মদ মহসিনের নাম ইয়াদ রাখবেন, তাহলেই হবে।'

বাসে উঠে নিজের জাযগায় বসতে বসতে আয়ুব আলি ছেলেমেযেদের দিকে তাকিযে বললেন, 'ইনি তোমার বড় মামা। ইনার নাম মহসিন।'

আয়ুব আলি সাহেবের স্ত্রী বোরকার পর্দা তুলে অবাক হয়ে তাকালেন অনিলের দিকে। আয়ুব আলি বললেন, 'ড্যাব ড্যাব কবে তাকাযে আছ কেন? ড্যাব ড্যাব করে তাকানোর কিছু নাই। বোরকার পর্দা ফেল।'

আয়ুব আলি সাহেবেব যমজ বাচ্চা দুটি এখন মারামারি করছে না। দুজনেবই মুখ এবং হাতভর্তি চকলেট। ছোট মেয়েটারও মুখভর্তি চকলেট। চকলেটেব রস গড়িযে তার জামা মাখামাখি হয়ে গেছে। বড় মেযেটা অনিলের দিকে তাকিযে বলল, 'এরা আপনার চকলেটের টিন খুলে ফেলেছে।'

অনিল বলল, 'ভালো করেছে। তুমি চকলেট খাও না? খাও, তুমিও খাও। তোমার নাম কি?'

'পাপিয়া।'

'কোন ক্লাসে পড় ?'

'সিক্সে।'

'খুব ভালো।'

পাপিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছি।'

'বলো কী! কী কর বৃত্তিব টাকা দিয়ে ?'

'কিছু করি না। বাবা টাকা নিয়ে যায়।'

'খুবই অনুচিত। তোমার নিজের টাকা অন্যে নিয়ে যাবে কেন ?'

আযুব আলি কোনো কথা বলছেন না, কাবণ কথা বলার মতো অবস্থা তাঁব নেই। তিনি ঘুমিযে পড়ছেন। তাঁব নাক ডাকছে।

বাসের ড্রাইভার বলল, 'সবাই বিসমিল্লাহ বলেন। গাড়ি ছাড়তেছি।'

সবাই শব্দ কবে বলল, 'বিসমিল্লাহ।'

গাড়ি ছেড়ে দিল।

ছোট্ট একটা শিশু কাঁদছে। দুমাস বযস। সেই তুলনায গলাব শক্তি প্রশংসনীয। শিশুটির কান্নার আওযাজ গাড়িব আওযাজ ছাপিযে উঠেছে। বাবা এবং মা দুজনেই তাকে নিযে খুব বিব্রতবোধ কবছে। এটিই তাদেব প্রথম সন্তান। কপালে বড় কবে কাজলের ফোঁটা দেযা। সেই কাজলে সমস্ত মুখ মাখামাখি হযে গেছে। বাচ্চাটিব বাবা তাকে কিছুক্ষণ কোলে রেখে শান্ত করার চেষ্টা কবছে, কিছুক্ষণ করছে মা। লাভ হচ্ছে না।

একজন বলল, 'ছোট শিশু সঙ্গে থাকা ভালো। শিশুব উপব আল্লাহপাকেব খাস বহমত থাকে। এই শিশুব কাবণে ইনশাআল্লাহ কারো কিছু হবে না। আমবা জাযগামতো নিবাপদে পৌছব।'

বাবাব মুখে আনন্দেব আভা দেখা গেল। মাব মুখেও নিশ্চযই আনন্দেব হাসি। বোবকাব কাবণে সে হাসি দেখা যাচ্ছে না। বাচ্চাব কান্না এখন আর কাবো খাবাপ লাগছে না, ববং ভালো লাগছে। কাঁদুক সে, কাঁদুক। গলা ফাটিযে কাঁদুক।

একজন জিজ্ঞেস কবল, 'ছেলে না মেযে ?'

বাবা লাজুক গলায় বলল, 'মেযে।'

কি নাম রেখেছেন মেযেব ?

বাবা খানিকক্ষণ ইতস্তত কবে বললেন, 'মুক্তি।' বলেই অস্বস্তি নিযে চারদিকে তাকালেন। সেই অস্বস্তি ছড়িযে পড়ল যাত্রীদের সবাব চোখে মুখে।

'ভালো নাম কি ?'

'ভালো নাম ফারজানা ইযাসমিন।'

'মিলিটারি নাম জিজ্ঞেস কবলে ভালো নামটা বলবেন। ডাকনাম বলার প্রযোজন নাই।'

বাচ্চাটা কান্না থামিযেছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গের বোবকাপবা মহিলার কান্না শোনা যাচ্ছে। বৃদ্ধ তাকে এখন আব পাখাব হাওযা করছেন না। গাড়িব ভেতর প্রচুর হাওযা। বৃদ্ধ চোখ বন্ধ কবে বসে আছেন। মনে হচ্ছে তিনিও ঘুমিযে পড়েছেন। আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। রোদে তেজ নেই। বাতাস আর্দ্র, বৃষ্টি আসবে বলে মনে হচ্ছে। রাস্তা ভালো না, গাড়ি খুব ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ঝাঁকুনিতে অনেকেরই ঘুম পেযে যাচ্ছে।

যাত্রীদের প্রায় সবার হাতেই কিছু না কিছু বই। বেশ কয়েকজনের হাতে কোরান শরীফ। অনেকের হাতে প্রচ্ছদে কায়দে আযমের ছবিওয়ালা বই। এইসব বই এখন খুব বিক্রি হচ্ছে। এইসব বই হাতে থাকলে একধরনের ভরসা পাওয়া যায়। মনে হয়, বিপদ হয়তো বা কাটবে।

প্রচণ্ড গরমে স্যুট পরা একজন বাসযাত্রী যাচ্ছেন। লাল রঙের টাই, থ্রি পিস স্যুট। কোটের পকেটে লাল গোলাপের কলি। তেকোনা লাল রুমাল। সঙ্গে একটা 'ব্রিফকেস।' তিনি ব্রিফকেস কোলে নিয়ে বসেছেন। একমুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করছেন না। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে গেলেন বখশিহাট বাজারের কাছে তাকে নামিয়ে দেয়া যাবে কিনা। তখনো ব্রিফকেস হাতে ধরা। ভদ্রলোককে খুব নার্ভাস মনে হচ্ছে, খুব ঘামছেন। একটু পরপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন, ঘাড় মুছছেন। জানালা দিয়ে ঘন ঘন থুতু ফেলছেন। তাঁর সঙ্গে পানির বোতল আছে। মাঝে মাঝে বোতল থেকে পানি খাচ্ছেন।

এই প্রচণ্ড গরমে স্যুট পরে আসার রহস্য হল তিনি শুনেছেন মিলিটারিরা ভদ্রলোকদের তেমন কিছু করে না। স্যুট পরা থাকলে খাতির করে। তারপরেও তিনি ঢাকা শান্তিকমিটির চেয়ারম্যানের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছেন। চিঠিতে লেখা — 'মোহাম্মদ সিবাজুল করিম, পিতা মৃত বদরুল করিম, গ্রাম বখশিহাট, আমাব পরিচিত। সে পাকিস্তানেব একজন খাদেম। দেশভক্ত এক ব্যক্তি। পাকিস্তানের অখণ্ডতা বক্ষায সে জীবন কোববান করতে সর্বদা প্রস্তুত। আমি তাহার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

এত কিছুর পরেও ভদ্রলোক স্বস্তি পাচ্ছেন না। এক সময দেখা গেল, গাড়ির জানালা দিযে মুখ বের করে তিনি বিকট শব্দে বমি করছেন।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি এগোচ্ছে। গাড়ির গতি বেশি না। এত খাবাপ বাস্তায গতি বেশি দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

ঢাকা থেকে বেরুবার মুখেই একটা চেকপোস্ট।চেকপোস্টে মিলিশিয়ার কিছু লোকজন। ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। যাত্রীরা শক্ত হয়ে বসে আছে। কেউ জানালা দিযে তাকাচ্ছে না। গাড়ির ভেতর কোনোরকম শব্দ নেই। শুধুমাত্র ঘুমন্ত আইযুব আলির নাক ডাকার শব্দ আসছে। বোরকাপরা মহিলাও কান্না থামিয়েছেন।

মিলিশিযাদের একজন হাত ইশারা করে গাড়ি চালিযে যেতে বলল। কেউ এসে গাড়িব ভেতর উঁকি পর্যন্ত দিল না। কী অসীম সৌভাগ্য! গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ছোট বাচ্চাটি কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদুক। ছোট বাচ্চারা তো কাঁদবেই।

রাস্তা এখন কিছুটা ভালো। ড্রাইভার গাড়িতে স্পিড দিতে শুরু করেছে। তাকে দ্রুত যেতে হবে। সন্ধ্যার আগে আগে টাঙ্গাইল পৌঁছতে হবে।

মুক্তি কাঁদছে। হাত-পা ছুড়ে কাঁদছে। মুক্তি যার নাম, অবরুদ্ধ নগরীতে যাব জন্ম, সে তো কাঁদবেই। কাঁদাটাই তো স্বাভাবিক।

৬

আয়ুব আলি অনিলের কাঁধে মাথা বেখে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর ছোট মেযেটি অনিলের কোলে, সেও ঘুমাচ্ছে। আয়ুব আলি সাহেবের স্ত্রী বোরকার পর্দা তুলে ফেলে কৌতূহলী হযে চারপাশ দেখছেন। তাঁর মুখভর্তি পান। এরা বেশ সুখে আছে বলেই অনিলেব মনে হল।

এই দেশ ছেড়ে সময়মতো চলে যেতে পারলে অনিলরাও কি সুখে থাকত? ১৯৬৫ সালে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে গেল। তখন অনেকেই চলে গেল। অনিলের ছোট কাকা

বরুণ বাগচী তাদের একজন। রূপেশ্বরে তিনি পাকা বাড়ি তুলেছিলেন, দোতলা বাড়ি। বাড়ির পেছনে পুকুর। চুপি চুপি সব বিক্রি করলেন। কেউ কিছুই জানল না। যে কিনল সেও কোনো শব্দ করল না।

ছোট কাকার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না। টুকটাক ব্যবসা করেই কী করে যেন ধাই করে একদিন তিনি বড়লোক হয়ে গেলেন। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক কমে গেল। তবু যাওয়া-আসা ছিল। কিন্তু তারা যে সব বিক্রি করে কোলকাতায় চলে যাচ্ছে, এই সম্পর্কে কিছুই বলে নি। যে রাতে যাবে সে রাতে বরুণ বাগচী একা তাদের বাড়িতে বেড়াতে এল। তেমন শীত না, তবু সারা শরীর চাদরে ঢাকা।

সুরেশ বাবু বাংলা ঘরে বসে ছাত্র পড়াচ্ছিলেন, সেখান থেকেই বললেন — 'কি খবর বরুণ?'

'তোমার সাথে একটু কথা আছে দাদা। ভেতরে আস।'

'ছাত্র পড়াচ্ছি তো।'

'একদিন ছাত্র না পড়ালে তেমন ক্ষতি হবে না। জরুরি কথা।'

সুরেশ বাগচী অপ্রসন্ন মুখে উঠে এলেন। বরুণ গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমার পুত্র-কন্যাদেরও ডাকো। কথাবার্তা সবার সামনেই হোক। এরা ছোট হলেও এদেরও শোনা দরকার। নয়তো বড় হয়ে আমাকে দোষ দিবে।'

'তোর ব্যাপার তো কিছুই বুঝতেছি না।'

বরুণ বসল খাটে পা তুলে। তার গলার স্বর এমনিতেই ভারি। সে রাতে আরো বেশি ভারি শোনাল।

'তোমরা ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার কথা কিছু ভাবছ ?'

সুরেশ বাবু অবাক হয়ে বললেন, 'শুধু শুধু ইন্ডিয়া চলে যাবার কথা ভাবব কেন ?'

'অনেকেই তো যাচ্ছে।'

'অনেকে কেন যাচ্ছে তাও তো বুঝি না।'

'কেন বুঝছ না। বেশিদিন মাস্টারি করলে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায় জানি, এতটা পায় তা জানতাম না।'

'মাস্টারির দোষ দেযার প্রয়োজন নাই। তুই কী বলতে চাস বল্।'

বরুণ চাপা গলায় বলল, 'এই দেশ আমাদের থাকার জন্য না।'

'কেন না? তুই তো ভালোই আছিস। ব্যবসা বাণিজ্য করছিস। দোতলা দালান দিয়েছিস।'

'তা দিয়েছি মনের শান্তির বিনিময়ে দিয়েছি। মনে শান্তি নাই।'

'শান্তি না থাকার মতো কী হল ?'

'দাদা, তুমি বুঝতে পারছ না, এই দেশে আমরা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন।'

সুরেশ বাগচী হাসতে হাসতে বললেন, 'নিজেকে সেকেন্ড ক্লাস ভাবলেই সেকেন্ড ক্লাস। তুই এ রকম ভাবছিস কেন ? আমাকে দেখ। আমি তো ভাবি না।'

'দাদা, সত্যি করে বল তো — তুমি কোনোরকম অনিশ্চয়তা বোধ করো না ?'

'না করি না। কেন করব ?'

'কী আশ্চর্য কথা! একটা প্রশ্ন করলেই তুমি উল্টা প্রশ্ন করছ। আমি তো তোমার ছাত্র না।'

'তোর হয়েছে কী সেটা বল।'

'দাদা, তোমাকে সত্যি কথা বলি, এই দেশে মনটা ছোট করে থাকতে হয।'

'যার মন ছোট, সে যে দেশেই যাক, তার মন ছোটই থাকবে।'

'খবরের কাগজে দেখেছ আরতী বালা নামের এক মেয়েকে কিছু প্রভাবশালী লোক ধরে নিয়ে গেছে, সাতদিন পর ছেড়েছে ?'

'শুধু হিন্দু মেয়েদের এ রকম হচ্ছে তা তো না, মুসলমান মেয়েদের বেলায়ও হচ্ছে। হচ্ছে না ? এমন যদি হত শুধু হিন্দু মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটছে; তাহলে ভিন্ন কথা হত। তা ঘটছে না। আরতী বালাকে নিয়ে খবরের কাগজে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। ব্যাপারটা সবার খারাপ লেগেছে বলেই হয়েছে।'

'এটা একটা জঘন্য দেশ দাদা।'

'তুই যেখানে যাচ্ছিস সেটা কি খুব উন্নত কিছু ? সেখানে এমন হচ্ছে না ? সমস্যা তো দেশের না, সমস্যা মানুষের। দেশ মন্দ হয় না। মাটি কি কখনো মন্দ হয় ?'

বরুণ রাগী গলায় বলল, 'আমাকে এইসব বড় বড় কথা বলবে না দাদা। আমার এইসব বড় বড় কথা শুনতে বিরক্ত লাগে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আর বড় বড় কথা বলব না। তুই একটু সহজ হয়ে বস তো। তোর মাথা গরম হয়েছে। গা থেকে গরম চাদরটা খোল। লেবুর শরবত খাবি ? অতসী তোর কাকাকে লেবুর শরবত করে দে।'

'আমি কিছু খাব না।'

'তুই কি অকারণে রাগারাগি করার জন্য এসেছিস ?'

বরুণ কঠিন গলায় বলল, 'দাদা, আমি ঠিক করেছি — কোলকাতা চলে যাব।'

'কী বললি ?'

'শুনলে তো কী বললাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোলকাতা চলে যাব।'

সুরেশ বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুই সিদ্ধান্ত নিয়েছিস। আমি কিছু বললে তো সিদ্ধান্ত পাল্টাবি না। আমাকে বলা অর্থহীন।'

'তোমাকে বলছি, কারণ তোমাকে খবরটা জানানো দরকার।'

'আচ্ছা যা, আমি জানলাম।'

'তোমাকে সবাই স্যার স্যার করে, খাতির করে, কাজেই তুমি আছ একটা ঘোরের মধ্যে। আসল সত্য তোমার অজানা। এই দেশের সেনাবাহিনীতে কোনো হিন্দু নেয়া হয় না, এটা তুমি জান?'

'না, জানতাম না।'

'এখন তো জানলে। এখন বল কী বলবে ?'

'এরা যে নিচ্ছে না, এটা এ-দেশের মানুষদের বোকামি। দেশের সব সন্তানের সমান অধিকার। অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এক ধরনের ভুল। সেই ভুলের জন্য দেশকে কেন দায়ী করব?'

'কাকে দায়ী করবে ?'

'যেসব মানুষ এই ভুল করছে তাদের দায়ী করব।'

'শুধু দায়ী করবে, আর কিছু না ?'

'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যেন তারা ভুল বুঝতে পারে।'

'ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রার্থনা শুনবেন ?'

'শোন বরুণ, আমি বুঝতেই পারছি না কেন তুই এত রেগে আছিস। কেউ কি তোকে কিছু বলেছে ?'

'না। দাদা, আমি চলে যাচ্ছি।'

'সেটা তো শুনলাম ; কবে যাচ্ছিস ?'

'আজই যাচ্ছি। আজ রাত এগারটায়।'

সুরেশ বাগচী দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'আজ রাত এগারটায় তুই চলে যাচ্ছিস আর আমাকে সে খবর দিতে এখন এসেছিস? বাড়িঘর কী করবি ?'

'বাড়িঘর বিক্রি করে দিয়েছি।'

'কখন বিক্রি করলি?'

'মাসখানেক হল। সব চুপি চুপি কবতে হল। জানাজানি হলে সমস্যা হবে।'

'আমাকেও জানালি না!'

'এক জন জানলে সবাই জানবে।'

সুরেশ বাগচী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই দেশেব কাউকেই তুই বিশ্বাস কবিস না। শ্রী রামকৃষ্ণের একটা কথা আছে না ? কচ্ছপের মতো মানুষ। তুই হচ্ছিস সে রকম। কচ্ছপ থাকে জলে কিন্তু ডিম পাড়ে ডাঙায়। তুই থাকিস এক দেশে, আব মন পড়ে থাকে অন্য দেশে। কাজেই তোব চলে যাওযাই ভালো। তবে তুই যে শেষ সময়ে আমাকে খবরটা দিতে এলি তাতে মনে দুঃখ পেযেছি।'

'তোমাকে আগে বললে লাভটা কী হত ?'

সুরেশ বাগচী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কোনো লাভ হত না। যাচ্ছিস যা। ঐখানে মন টিকবে না। মানুষ গাছের মতো। মানুষের শিকড় থাকে। শিকড় ছিঁড়ে যাওযা ভযংকব ব্যাপার। গাছ ছিঁড়লে যেমন মাবা যায, মানুষও মাবা যায। গাছেব মৃত্যু দেখা যায। মানুষেবটা দেখা যায না। তুই দুঃখ পাবি।'

'দুঃখ তুমিও পাবে দাদা। দুদিন পব বুঝবে কী বোকামি কবেছ। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগবে, ঘবে আগুন দিবে।'

'এইটা কখনো হবে না বরুণ। আমি কোনোদিন এদের অবিশ্বাস কবি নি। এবাও কববে না। তুই এখন যা, তোব সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

বরুণ তাবপবেও চুপ কবে খানিকক্ষণ বসে বইল। তাকাল অতসীব দিকে। নিচু গলায বলল, 'অতসী, আমি কি অতসীকে নিযে যাব ?'

'ওকে নিতে চাস কেন ?'

'ওর ভালো বিযে দেব। এই দেশে ওব জন্যে ছেলে পাবে না।'

'তুই চলে যা বরুণ। এগাবটাব সময যাবি দশটা প্রায বাজে।'

'তুমি আজ বুঝতে পাবছ না দাদা। একদনি বুঝবে। মর্মে মর্মে বুঝবে।'

বরুণ চলে গেল। সুবেশ বাবু বাবান্দায সাবা বাত বসে বইলেন। সেই বাতে তিনি উপবাস দিলেন। মন বিগড়ে গেলে শবীবকে কষ্ট দিযে মন ঠিক কবতে হয। সুবেশ বাগচী ঠিক কবলেন আগামী দিনও তিনি নিবম্বু উপবাস দেবেন।

বাসেব ঝাঁকুনিতে অনিলেবও ঘুম পেযে গেল। ঘুমের মধ্যেই মনে হল, সে দিন ছোট কাকাব সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে গেলে তাব বাবাব এই বিপদ হত না। বাবা বেঁচে থাকতেন। তবে অনিল এও জানে, কোনো উপায়ে সে যদি বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারত — 'বাবা, তোমার কি মনে হচ্ছে দেশ ছেড়ে গেলে তোমাব জন্যে ভালো হত? থেকে যাওযাটা বোকামি হযেছে।' তাহলে তিনি জবাব দিতেন — 'অনিল, এই বিপদ কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপব আসে নি, সাবা দেশের উপর এসেছে। আমার মৃত্যু এমন কোনো বড় ব্যাপার না বাবা। তাছাড়া তোমাব হেড স্যার কি তোমাকে লেখেন নি আমার মৃত্যু সংবাদে রূপেশ্বরের হাজার হাজার মানুষ চোখের জল ফেলেছে। মানুষের ভালবাসায আমার মৃত্যু। এই দুর্লভ সৌভাগ্য কজনের হয?'

৭

সবাই একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল। বাস প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বাম দিকে খানিকটা হেলে টালমাটাল অবস্থায় এগোচ্ছে। ড্রাইভার প্রাণপণে ব্রেক করতে করতে বলল, 'হারামির পুত তোর মারে আমি...'

বাসের একটা টায়ার ফেটে গেছে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারত, ঘটে নি। ফাঁকা রাস্তা বলেই সামলানো গেছে। হেল্পার বলল, 'সব নামেন, গাড়ি খালি করেন। যার যার পিসাব করা দরকার পিসাব করেন।'

অনিল নামল। আয়ুব আলি সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যাকে কোলে বসানোয় অনিলের পায়ে ঝিঁ–ঝিঁ ধরে গেছে। একটু হাঁটাহাঁটি করা দরকার। এত ঝাঁকুনিতেও আয়ুব আলির ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি। তিনি আরাম করেই ঘুমাচ্ছেন। বাকি যাত্রীরা সবাই নেমে পড়েছে। শুধ মহিলারা গাড়িতে বসা। অনিলের সঙ্গে পাপিয়ার নামার ইচ্ছা ছিল। বাবার ভয়ে নামতে পারে নি।

অনিল ঘাসের উপর বসে সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেটে টান দিয়ে সে টের পেল আজ সারা দিনে দুকাপ চা ছাড়া কিছু খায় নি। সিগারেটের ধোঁয়া পেটে পাক দিচ্ছে, বমি ভাব হচ্ছে। ভয়ংকর সময়েও ক্ষুধা নামক বিষযটি মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। ফাঁসির আসামী ফাঁসির তিন ঘণ্টা আগে খেতে চায়। ফাঁসির আসামীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয— 'শেষ ইচ্ছা কী? বেশির ভাগই নাকি খাবারেব কথা বলে।'

স্যুট পরা ভদ্রলোক হাতে ব্রিফকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে। একটা ট্রাক হর্ন দিল। তিনি ভযানক চমকে উঠলেন। অনিল তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সরে গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি কাবো সঙ্গে কথা বলতে চান না।

'মহসিন সাহেব। এই যে মহসিন।'

অনিল তাকাল। আয়ুব আলি তাকেই ডাকছেন। অনিলের মনে ছিল না তার নতুন নামকরণ হয়েছে। আয়ুব আলি বাস থেকে নেমেছেন। এখন তাঁব চোখে সানগ্লাস। এই সানগ্লাস আগে ছিল না।

'মহসিন।'

'আমাকে বলছেন ?'

'আপনাকে ছাড়া কাকে বলব ? এর মধ্যে ভুলে গেছেন? শুনে যান এদিকে, আর্জেন্ট কথা আছে।'

অনিল এগিয়ে গেল। আয়ুব আলি গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে বললেন, 'অবস্থা খুব খারাপ।'

'কেন ?'

'দুই বোরকাওযালীব সঙ্গে এক বুড়ো আছে না? এরা বিহারী!'

'কে বলল আপনাকে ?'

'আপনারা সব নেমে গেলেন। হঠাৎ শুনি এই দুই বোরকাওয়ালী বেহারী ভাষায় কথা বলছে। শুনেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আমি তো সহজ পাত্র না, কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম — আপনারা কি বিহারী ? কথা বলে না। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন কি করা যায় বলেন তো ?'

'করার কী আছে ?'

'বোকার মতো কথা বলবেন না। স্পাই যাচ্ছে বুঝতে পারছেন না। আমি কান্না দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম — এটা বাঙালি কান্না না। একেক জাতিব কান্না একেক রকম। বাঙালিব কান্না বিহারী কাঁদতে পারে না। কিছু একটা তো কবা দবকাব।'

'আপনি চুপচাপ থাকুন। কিছুই করার দবকার নেই।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম। পথে মিলিটারি, কিছু করা ঠিক হবে না। টাঙ্গাইলে নেমে না হয বুড়োকে কানে ধরে ওঠ-বস কবাব। ঘরেব শত্রু বিভীষণ।'

অনিল কিছু বলল না। শরীবটা খাবাপ লাগছে। এতক্ষণ বমি-বমি ভাব ছিল, এখন সত্যি বমি আসছে। বমি কবে ফেলতে পাবলে শবীবটা বোধহয ভালো লাগত। বমি হওয়ার জন্যেই অনিল আরেকটা সিগাবেট ধরাল।

'মহসিন সাহেব।'

'জ্বি।'

'ট্রিকস কবে বুড়োব কাছ থেকে জানব নাকি ব্যাপারটা কী ?'

'কী দবকার ?'

'তাও ঠিক। কী দরকাব? তার উপব আবার বুড়ো মানুষ। জোযান হলে পাছায লাথি দিযে নালায ফেলে দিতাম।'

বাসেব চাকা বদল কবা হচ্ছে। জ্যাকে কি এক সমস্যা। জ্যাক উপরে উঠছে না। ড্রাইভাব এবং হেল্পাব দুজনেই অনেক কাযদাকানুন কবছে। লাভ হচ্ছে না। পাপিযা জানালা দিযে হাত ইশাবা করে তার বাবাকে ডাকল। অপ্রসন্ন মুখে আযুব আলি এগিযে গেলেন। ফিবে এলেন তার চেযে অপ্রসন্ন মুখে। থু করে একদলা থুতু ফেলে বললেন, 'মেযেছেলে সঙ্গে নিযে কোথাও যাওযাই উচিত না। কথায আছে না — পথে নাবী বিবর্জিতা। এইসব কথা তো আব এমনি এমনি লোকজন বানায না। দেখেশুনে বিচাব-বিবেচনা কবে বানায।'

'কী হযেছে?'

'পাপিযাব মা নাকি আসাব সময পানি বেশি খেযেছিল, এখন বাথরুমে যাওয়া দরকাব। তাব জন্যে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট পথেব মাঝখানে বাথরুম বানিযে বসে আছে। আমি পাপিযাব মাকে বললাম — চুপ কবে বসে থাক। একটা কথা না। বেশি কথা আমি নিজে বলি না, বেশি কথা শুনতেও পছন্দ কবি না।'

অনিল বলল, 'বাস এখানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িযে থাকবে বলে মনে হয। কাছেই একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে সেখানে নিযে গেলে হয।'

'কে নিয়ে যাবে, আমি?'

'আপনি যেতে না চাইলে আমি নিযে যাই।'

'মহসিন সাহেব, আপনাব বযস অল্প। আপনাকে একটা কথা বলি। মেযেছেলেব সব কথাব গুরুত্ব দিবেন না। গুরুত্ব দিযেছেন তো মবেছেন। এদেব কথা এক কান দিযে শুনবেন, আরেক কান দিযে বেব করে দেবেন। আচ্ছা এই শালারা একটা চাক্কা বদল করতে গিযে ছয মাস লাগিযে দিচ্ছে ব্যাপার কী?'

অনিল, আয়ুব সাহেবের স্ত্রী, তাঁর দুই কন্যা এবং হাতাহাতি বিশারদ দুই পুত্রকে নিযে রাস্তার ওপারে বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে। ভদ্রমহিলা পুরো ব্যাপারটায় খুব লজ্জা পাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মেযে দুটি বাস থেকে বের হতে পেরে উল্লসিত। তারা ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। সেইসব কথা বোঝার উপায় নেই। অল্প বয়স্ক বালিকাদের যে সব কোড ল্যাংগুয়েজ আছে, তাই ব্যবহার করা হচ্ছে। ছেলে দুটি নীবব।

ভদ্রমহিলা কিছুটা গ্রাম্য টানা টানা স্বরে বললেন, 'পাপিয়ার বাবা আপনারে বিরক্ত করতেছে ?'

অনিল বলল, 'না।'

ভদ্রমহিলা নিচু গলায় বললেন, 'আপনে কিছু মনে নিয়েন না। মানুষটা পাগলা কিসিমের কিন্তু অন্তর খুব ভালো।'

'মনে করার কিছু নেই।'

'কথা বেশি বলে কিন্তু বিশ্বাস করেন খুব ভালো মানুষ।'

'আমি বিশ্বাস করছি। কেন বিশ্বাস করব না।'

পাপিয়া বলল, 'ছোটবেলায় বাবার টাইফয়েড হয়েছিল। তারপর থেকে বাবা কথা বেশি বলে।'

পাপিয়ার মা কড়া গলায় বললেন, 'চুপ কর।'

সম্পন্ন গৃহস্থের টিনের বাড়ি। কিন্তু বাড়িতে কোনো মানুষজনের সাড়া নেই। অনেক ডাকাডাকির পর কামলা শ্রেণীর একজন লোক বের হয়ে এল। তাব কাছ থেকে জানা গেল — রাস্তার দুপাশে অনেক দূর পর্যন্ত বাড়িঘরে কোনো মানুষ থাকে না। রাস্তা দিয়ে মিলিটারি যাতায়াত করে। বেশ কয়েকবার ট্রাক থামিয়ে তারা রাস্তার আশপাশেব বাড়িঘরগুলোতে ঢুকেছে।

অনিল বলল, 'বাড়িতে ঢুকে কী চায় ?'

লোকটা কিছু বলল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অনিল বলল, 'ওরা কি টাকা-পযসা চায় ?'

'না। মেয়ে ছেলের সন্ধান করে।'

'সে কী!'

'অছিমদ্দিন মেম্বার সাহেবের বউ আর ছোট শালীরে ট্রাকে উঠাযে নিযা গেছে। তাবাব আর কোনো সন্ধান নাই'।'

'অছিমদ্দিন মেম্বারের বাড়ি কোনটা ?'

'বাড়ি দূরে আছে। এইখান থাইক্যা ধরেন চাইর মাইল।'

'মিলিটারি কি রোজই যাতায়াত করে ?'

'হুঁ। যাতায়াত বাড়ছে।'

বাসের চাকা লাগানো হযে গেছে। বাস হর্ন দিচ্ছে। বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। বাসে ফিরতে ফিরতে সবাই আধভেজা হয়ে গেল। বাস যখন ছাড়ল তখন মুষলধারে বৃষ্টি। দুহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না এমন অবস্থা। আয়ুব আলি আনন্দিত গলায় বললেন, 'বৃষ্টিটা নেমেছে আল্লার রহমতের মতো। বৃষ্টিতে মিলিটারি বের হবে না। চেকিং-ফেকিং কিছুই হবে না। হুস করে পার হয়ে যাব।'

বাস চলছে খুব ধীরে। উইন্ড শিল্ড দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না, ধীরে চলা ছাড়া উপায় নেই। আয়ুব আলি বললেন, 'আমি সামনে গিয়ে বসি, এইখানে খুব ঝাঁকুনি। মহসিন সাহেব আপনি পা তুলে আরাম করে বসেন তো।'

অনিল পা তুলে বসল। তেমন আরাম হল না। ক্ষুধা কষ্ট দিচ্ছে। শরীর ঝিম ঝিম করছে। আয়ুব আলি সাহেবের স্ত্রী, বোরকার পর্দা তুলে দিয়েছেন। স্বামী পাশে নেই এখন একটু সহজ হওয়া যায়। তিনি অনিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পান খাইবেন ?'

'না।'

'একটা খান। মিষ্টি পান। জর্দা দেওয়া নাই।'

অনিল পান হাতে নিল। ভদ্রমহিলা সুখী সুখী গলায় বললেন, 'ভাইয়ের বিয়ায় যাইতেছি। শ্রাবণ মাসের দশ তারিখ বিবাহ।'

'আমি শুনেছি।'

'মেয়ে খুব সুন্দরী। ছবি আছে দেখবেন?'

'দেখি।'

'ও পাপিয়া তোর নতুন মামির ছবি দেখা।'

পাপিয়া ছবি দিল। পাপিয়ার মা হাসিমুখে বললেন, 'গায়ের রং খুব পরিষ্কার, ছবিতে তেমন আসে নাই।'

পাপিয়া বলল, 'তুমি তো দেখ নাই মা। সব শোনা কথা।'

'ছোট চাচা দেখছেন। ছোট চাচা বলছেন — বক পাখির পাখনার মতো গায়ের রং। ছোট চাচা মিথ্যা বলার মানুষ?'

অনিল ছবির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সুন্দর ছবি। গোলগাল মুখ। মাথা বাঁ পাশে হেলানো। বেণি বাঁধা চুল। টানা টানা চোখে রাজ্যের বিস্ময় ও আনন্দ। সামান্য ছবি, এত কিছু ধরতে পারে?

'সুন্দর না?'

'হ্যাঁ সুন্দর। খুব সুন্দর।'

'আমার ভাইও সুন্দর। ও পাপিয়া তোর মামার ছবি দেখা।'

পাপিয়া আগ্রহ করে মামার ছবি বের করল। অনিলের এই ছবিটি দেখতে ইচ্ছে করছে না। অসম্ভব রূপবতী তরুণীর পাশে কাউকে মানাবে না। পৃথিবীর সবচে' রূপবান তরুণকেও তার পাশে কদাকার লাগবে। কী আশ্চর্য মেয়েটাকে এখন অতসীদির মতো দেখাচ্ছে। অবিকল অতসীদির হাসির মতো হাসি। অতসীদির চোখের মতো চোখ। অতসীদির মতোই গোল মুখ। কে জানে হয়তো এই মেয়েটার নামও অতসী। অনিল পাপিয়াকে বলল, 'তোমার নতুন মামির নাম কি?' পাপিয়া হাসতে হাসতে বলল, 'অহনা।'

'কি নাম বললে, অহনা?'

'জ্বি। আমার আব্বা বলে— গহনা। হি-হি-হি . . .'

অনিলের এই সুখী পরিবারটিকে ভালো লাগছে। অসম্ভব ভালো লাগছে।

সবচে' দুঃখের সময় আনন্দময় কল্পনা করতে হয়। সুরেশ বাগচী বলতেন, 'বুঝলি অতসী, মানুষ কী করে জানিস? সুখের সময় সে শুধু সুখের কল্পনা করে। একটা সুখ তাকে দশটা সুখের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুঃখের সময় সে শুধু দুঃখই কল্পনা করে। এটা ঠিক না। উল্টোটা করতে হবে।'

অতসীদি বলল, 'তুমি বুঝি তাই করো?'

'সব সময় পারি না। তবে চেষ্টা করি। খুব আনন্দের কিছু যখন ঘটে, তখন তোর মার কথা ভাবি। ইশ্ বেচারি এই আনন্দ দেখার জন্যে নেই... তখন চোখে জল এসে যায়।'

'খুব আনন্দের কিছু কি তোমার জীবনে ঘটে বাবা?'

'অবশ্যই ঘটে। কেন ঘটবে না।'

'আমি তো আনন্দের ঘটনা কিছু ঘটতে দেখি না। কবে ঘটল বল তো? একটা ঘটনা বল।'

'ঐ তো সেদিনের কথাই ধর। তোরা দুই ভাইবোন খুব হাসাহাসি করছিস। দেখে আমার মনটা আনন্দে ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তোর মার কথা ভাবলাম। একা একা খানিকক্ষণ কাঁদলাম।'

'বাবা, তোমার কি কোনো গোপন দুঃখ আছে?'

সুরেশ বাগচী হাসতে হাসতে বললেন, 'না মা, আমার সব প্রকাশ্য দুঃখ। তোর বুঝি সব গোপন দুঃখ?'

অতসী হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। তারপরেই খিলখিল করে হেসে ফেলল।

অনিল তার দিদির অনেক গোপন দুঃখের খবর জানে না। শুধু একটি জানে। সেই দুঃখটা ভয়াবহ ধরনের। এই দুঃখের কথা পৃথিবীর কাউকেই জানানো যাবে না। কোনোদিন এটা নিয়ে আলোচনাও করা যাবে না। এই দুঃখ দূর করারও কোনো উপায় নেই। কিছু গোপন দুঃখ আছে; যা চিরকাল গোপন থাকে।

অতসীদিব বিয়ের কথা উঠলে সে বলবে, 'আমি কিন্তু বিয়ে কবব না। শুধু শুধু তোমবা চেষ্টা করছ।'

'কেন করবে না দিদি ?'

'কেন করব না, সে কৈফিযত তোব কাছে দিতে হবে। তুই কে ? তুই কি আমার গুরু মশাই। কবব না, করব না, ব্যস।'

'বিয়ে যদি ঠিকঠাক হয়ে যায় তুই কী করবি ?'

'আমি তখন ছেলেটাকে দশ লাইনের একটা চিঠি লিখব। বিযে ভেঙে যাবে।'

অনিল ঠিক জানে না, তবে তার অনুমান অতসীদি এরকম একটা চিঠি লিখেছে। নয়তো নেত্রকোনার উকিল সাহেবেব ছেলেব সঙ্গে বিয়ে ভেঙে যেত না। সব ঠিকঠাক। ওদের মেয়ে খুব পছন্দ। পণেব কোনো ব্যাপার নেই। উকিল সাহেব বিনা পণে ছেলেব বিয়ে দেবেন। তাঁদের বংশের এরকম ধারা। ছেলের মা এবং বোনবা এসে আশীর্বাদ করে গেল। ছেলের মা অতসীকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন এবং বললেন, 'এই মেয়েটা তো মানুষ না। এ তো দেবী দুর্গা। এখন থেকে এই মাকে আমি দুর্গা ডাকব।'

সেই বিয়ে ভেঙে গেল। ছেলে সুরেশ বাগচীকে লোক মারফত একটি চিঠি পাঠাল। তাতে লেখা—

প্রণাম নিবেন। বিশেষ কারণে আমার পক্ষে বর্তমানে বিবাহ করা সম্ভব হইতেছে না। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

সুরেশ বাগচী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কী? আমি তো কিছুই বুঝলাম না। ব্যাপারটা কী?'

বাস হর্ন দিচ্ছে। যাত্রীরা সচকিত হয়ে উঠেছে। সামনেই মিলিটারি চেকপোস্ট। দুজন মিলিটারি রেইন কোট গায়ে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। পরিষ্কাব দিন।

মুক্তি চেঁচিয়ে কাঁদছে। তাকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। মুক্তির বাবা মুক্তিকে কাঁধে নিয়ে দুলাচ্ছেন। কান্না কমার বদলে তাতে তার কান্না আরো বেড়ে যাচ্ছে।

স্যুট পরা ভদ্রলোক আবার বমি করছেন। এবার বমি করছেন গাড়ির ভেতর। তিনি গাড়ি প্রায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। বিকট শব্দ হচ্ছে।

কালো পোশাক পরা এক জন মিলিশিয়া উঁকি দিল। তার চেহারায় যথেষ্ট মায়া আছে। গলার স্বরও কোমল, অথচ সে কুৎসিত একটি বাক্য বলল, "শোয়ার কি বাচ্চা, সব উতারো।" ছাব্বিশ জন যাত্রী এই বাসে। ছাব্বিশ জনের ভেতর এক জনও বলতে পারল না

— কেন অকারণে গালি দিচ্ছেন। সবাই এমন মুখ করে আছে — যেন এই গালি তাদের প্রাপ্য। শুধু আয়ুব আলির চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। আয়ুব আলির স্ত্রী চাপা গলায় বললেন, 'তোমার পায়ে ধরি। তুমি উল্টাপাল্টা কিছু বলবা না। আমি তোমার পায়ে ধরি।' ভদ্রমহিলা সত্যি সত্যি স্বামীব পা চেপে ধবলেন। প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, 'পুলাপানেব কসম লাগে, উল্টাপাল্টা কিছু বলবা না।'

মহিলাযাত্রী ছাড়া বাকি সবাইকে লাইন কবে দাঁড় কবানো হয়েছে। স্যুট পবা ভদ্রলোক শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে পাবছেন না। তিনি ঝকঝকে স্যুট নিয়ে কাদাব উপব বসে আছেন। তাঁর হেঁচকি উঠছে। ব্রিফকেস এখনো তাব হাতে ধবা।

অনিল লক্ষ কবল, তল্লাশিব পুরো ব্যাপাবটা মিলিটাবিবা এক ধবনেব খেলাব মতো নিয়েছে। মজাব কোনো খেলা, যেখান থেকে আনন্দ পাওয়া যায়। অন্তত এবা সবাই যে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা কবছে, তা বোঝা যাচ্ছে। সবাব ঠোঁটেব কোণেই হাসি কিংবা হাসিব আভাস। এবা নিজেবা তীব্র ভযেব মধ্যে আছে। অন্যেব ভয থেকে আনন্দ পাওয়াব চেষ্টা তাবা কববে, তা বলাই বাহুল্য। ভীত মানুষকে আবো বেশি ভয পাইয়ে দেবাব প্রবণতাও মানুষেব মজ্জাগত।

মিলিটাবি দলেব প্রধান এক জন অল্পবয়স্ক অফিসাব। সে দূরে একটা টুলে বসে আছে। এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে তাব মাথাব্যথা নেই, এবকম একটা ভাব। তল্লাশি দলেব সঙ্গে একজন দোভাষী থাকে। এদেব সঙ্গেও আছে। এই দোভাষী বিহাবী নয, বাঙালি। চল্লিশ-পঁযতাল্লিশ বছব বযেসী একজন মানুষ। শার্ট-প্যান্ট পবা চোখে চশমা। তাকেও খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে। সে খানিকটা দূবে বসে কলা খাচ্ছে। তাব সামনে একটা মগ। মগভর্তি চা।

তল্লাশি দল স্যুট পবা মানুষটাব কাছে চলে এল। তাকেই যে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ কবা হবে তা বোঝাই যাচ্ছিল।

এক জন সুবাদাব শীতল গলায বলল, 'ডবতা কেঁউ?'

লোকটি সুন্দব উর্দুতে বলল, 'ভয পাচ্ছি না। আমাব শবীব খাবাপ। কয়েকবাব বমি হয়েছে। এই জন্যে দাঁড়াতে পাবছি না।'

কথাবার্তা সব উর্দুতে হল।

'তুমি বাঙালি।'

'জ্বি জনাব বাঙালি।'

'নাম?'

'আবু হোসেন।'

'কলেমা জানো?'

'জ্বি। চাব কলমা জানি।'

'নামাজ পড়?'

'নামাজ পড়ি।'

'উর্দু কোথায শিখেছ?'

'আমবা ছোটবেলায বাওযালপিন্ডি ছিলাম। বাবা বেলওযেতে কাজ কবতেন।'

'বাবাব নাম কি?'

'ইসমাইল হোসেন।'

'তুমি পাকিস্তান ভালবাস?'

'জ্বি বাসি।'

'ব্রিফকেসে কি আছে?'

'কিছু কাগজপত্র আছে। জমির দলিল।'

'ব্রিফকেস খোল।'

'ব্রিফকেসের চাবি আনতে ভুলে গেছি জনাব।'

সুবাদারের মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে কি যেন বলল। উর্দু নয়, অন্য কোনো ভাষায়। সম্ভবত পশতু। সে ব্রিফকেস নিয়ে গেল। ব্রিফকেস ভাঙা হতে লাগল। পুরো দলটি গভীর আগ্রহে ব্রিফকেস ভাঙা দেখছে। তাদের সবার চোখে মুখে স্পষ্ট আনন্দের ছাপ। টুলে বসে থাকা অফিসারও আগ্রহ বোধ করছে। সে উঠে এসেছে ব্রিফকেস ভাঙা দেখতে। স্যুট পরা লোকটি আবার বমি করছে। হড়হড় করে বমি। তার বমির দৃশ্যেও মিলিটারির দল আগ্রহ বোধ করছে। এতেও যেন তারা খানিকটা মজা পাচ্ছে।

ব্রিফকেস ভাঙা হয়েছে। একটা জমির দলিল, কিছু কাগজপত্র, দাড়ি সেভ করার যন্ত্রপাতি, একটা গায়ে মাখা সাবান। খামে ভরা কিছু টাকা। উল্লেখযোগ্য পরিমাণেব নয়। ছয় সাত শ' হবে। মিলিটারির তল্লাশি দলটির আশা ভঙ্গ হল। অফিসারটিও বিরক্ত হয়েছে। সে কঠিন গলায় বলল, 'এ মুসলমান কিনা ভালোমতো জিজ্ঞেস কব। চেহাবা হিন্দুর মতো।'

অফিসারের কথায় দলটির মধ্যে আবার খানিকটা আগ্রহ দেখা গেল। সুবাদাব বলল, 'কলেমায়ে শাহাদৎ বল।'

আবু হোসেন গড়গড় করে কলেমায়ে শাহাদৎ বলল।

'খাৎনা হয়েছে?'

'জ্বি।'

'প্যান্ট খোল।'

আবু হোসেন অতি দ্রুত প্যান্ট খুলে ফেলল। যেন এর জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। প্যান্ট খুলে দেখাতে পেরে যেন খানিকটা আরাম পাচ্ছে। বিপদ বুঝি–বা কাটল। সুবাদার সাহেব বলল, 'যাও ক্যাপ্টেন সাহেবকে দেখিয়ে আস।' আবু হোসেন প্যান্ট খোলা অবস্থাতেই ক্যাপ্টেন সাহেবের সামনে গেল। ক্যাপ্টেন সাহেব উদাস দৃষ্টিতে একবার তাকালেন, তারপর হাত ইশারায় চলে যেতে বললেন। আবু হোসেন তার ভাঙা ব্রিফকেস নিয়ে বাসে উঠল এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। এমন শান্তিব ঘুম সে অনেকদিন ঘুমায় নি।

জিজ্ঞাসাবাদ এখন বেশ তাড়াতাড়ি হচ্ছে। দু একটা কথা জিজ্ঞেস করেই ছেড়ে দেযা হচ্ছে। কারোর প্যান্ট খোলা হচ্ছে না। একজনকে শুধু বলা হল— এক শ বার কানে ধরে ওঠ–বস করতে। এবং যতবার উঠে দাঁড়াবে ততবার বলবে, 'জয় বাংলা'।

শুধুমাত্র একজন যাত্রীর জন্যে এটা কেন করা হল তা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত মজা করার জন্যেই ওঠ–বসের পর্ব সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হচ্ছে। যাকে ওঠ–বস করতে বলা হয়েছে, সে এই কাজটি বেশ আগ্রহ নিয়ে করছে বলে মনে হল। ক্যাপ্টেন সাহেব তেমন আগ্রহ বোধ করছেন না। তার চোখ বিষণ্ন।

অনিল এবং আয়ুব আলি লাইনের শেষ মাথায়। সুবাদাব সাহেব অনিলের পাশে এসে দাঁড়াল। বাঙালি দোভাষীর চা খাওয়া শেষ হয়েছে। সে এসে সুবাদারের কাছে দাঁড়াল।

'কি নাম?'

'অনিল। অনিল বাগচী।'

হতভম্ব আয়ুব আলি বললেন, 'ঠিক নাম বলেন। ঠিক নামটা স্যারকে বলেন। স্যার ইনার আসল নাম মোহাম্মদ মহসিন! বাপ–মা আদর করে অনিল ডাকে।'

'তোমার নাম মোহাম্মদ মহসিন?'

অনিল চুপ করে রইল। আয়ুব আলি হড়বড় করে বললেন, 'আমার খুবই পরিচিত স্যার। দূর সম্পর্কের রিলেটিভ হয়। খাঁটি মুসলমান।'

বাঙালি দোভাষী বলল, 'অনিল হইল হিন্দু নাম।'

আয়ুব আলি হাসিমুখে বললেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারির জন্যে এটা হয়েছে ভাইসাহেব। বাপ-মারা আদর করে ছেলেমেয়েদের বাংলা নাম রাখে। যেমন ধরেন— সাগর, পলাশ। ছেলেপুলের তো কোনো দোষ নাই, বাপ-মায়ের দোষ।'

বাঙালি দোভাষী এবার যথেষ্ট আগ্রহবোধ করছে বলে মনে হল। সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই দুইটাই হিন্দু। মিথ্যা কথা বলতেছে।'

ক্যাপ্টেনের চোখে মুখে খানিকটা উৎসাহ ফিরে এসেছে। সে অনিলের কাছে উঠে এল। ইংরেজিতে বলল, 'তুমি হিন্দু?'

অনিল বলল, 'ইয়েস স্যার।'

'তুমি মুক্তিবাহিনীর লোক?'

'না স্যার।'

'আওয়ামী লীগ?'

'না।'

'মুজিবের পা-চাটা কুকুর। মুজিবের পা কখনো চেটে দেখেছ? কেমন লাগে চাটতে?'

অনিল চুপ করে রইল। ক্যাপ্টেন বলল, 'একে ঘরে নিয়ে যাও।'

আয়ুব আলি ব্যাকুল গলায় বললেন, 'স্যার আমার একটা কথা শুনেন স্যার। যে কেউ একবার কলেমা পড়লেও মুসলমান হয়ে যায়। এটা হাদিসের কথা। মহসিন কলেমা জানে। তারে জিজ্ঞেস করেন। সে বলবে।'

ক্যাপ্টেন আয়ুব আলির দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, 'তুমি নিজে মুসলমান?'

'জ্বি জনাব, মুসলমান। সুন্নি মুসলমান। আমরা পীর বংশ। আমার দাদা মরহুম মেরাজউদ্দিন সরকার পীর ছিলেন।'

বাঙালি দোভাষী বলল, 'এই হারামিও হিন্দু। বিরাট ধড়িবাজ।'

আয়ুব আলির চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে ঘাড় ফিরিয়ে বাসের দিকে তাকাল। বাস থেকে এখানকার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। তবে বাসের প্রতিটি মানুষ ভীত চোখে এই দিকেই তাকিয়ে আছে। আয়ুব আলি সাহেবের স্ত্রী এবং বড় মেয়েটি কাঁদতে শুরু করেছে। সবচে' ছোট মেয়েটি জানালায় হাত বাড়িয়ে ভীত গলায় বলছে — 'আব্বু আস, আব্বু আস।'

বাঙালি দোভাষী আয়ুব আলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্যান্ট খোল্। প্যান্ট খুলে দেখা খাৎনা হয়েছে কিনা। স্যারকে দেখা।'

আয়ুব আলি কঠিন গলায় বললেন, 'প্যান্ট যদি খুলতে হয় তাহলে আমি তোর মুখে পিসাব করে দেব। আল্লার কসম, আমি পিসাব করব।'

অনেকক্ষণ পর ক্যাপ্টেন মনে হয় কিছুটা মজা পেল। সে শব্দ করে হেসে ফেলল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে অন্যরাও হেসে ফেলল। শুধু বাঙালি দোভাষী হাসল না। সে অন্যদের হাসির কারণও ঠিক ধরতে পারছে না। সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ। ক্যাপ্টেন আয়ুব আলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।'

আয়ুব আলি বললেন, 'স্যার, মহসিন সাহেবকে নিয়ে যাই?'

'ও থাকুক। তোমাকে উঠতে বলেছি, তুমি ওঠ।'

আয়ুব আলি ব্যথিত চোখে অনিলের দিকে তাকালেন। অনিল শান্ত গলায় বলল, 'আমার বড় বোন আছেন রূপেশ্বর হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে...'

আয়ুব আলি অনিলের কথা শেষ করতে দিলেন না। ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আল্লাহপাকের কসম খেয়ে বলতেছি, মাটির কসম খেয়ে বলতেছি, আপনার যদি কিছু হয়, আমি আপনার বোনকে দেখব, যতদিন বাঁচব দেখব। বিশ্বাস করেন আমার কথা। বিশ্বাস করেন।'

'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। আপনি আমার বোনকে বলবেন, আমি ভয় পাই নাই। আর তাকে বলবেন আমি বলে দিয়েছি — সে যেন তার পছন্দের ছেলেটাকে বিয়ে করে। কে কী বলে এটা নিয়ে সে যেন চিন্তা না করে।'

আয়ুব আলি গাড়িতে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদেব কান্না আরো বেড়ে গেল। বড় মেয়েটি বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছে। সে থর থর করে কাঁপছে।

বাস ছেড়ে যাবার আগ-মুহূর্তে ক্যাপ্টেন সুবাদারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যুটপরা লোকটাকে বেখে দাও। ঐটাও বদমাশ। ওর কিছু একটা মতলব আছে — টের পাওযা যাচ্ছে না।'

আবু হোসেন তার সমস্ত শক্তি দিযে বাসের হ্যান্ডেল ধরে আছে। কিছুতেই তাকে টেনে নামানো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে তাব গাযে অসুরের শক্তি। জীবন থাকতে সে বাসেব হ্যান্ডেল ছাড়বে না। আবু হোসেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে — 'ভাইসাহেব, আপনাবা আমাকে বাঁচান। ভাইসাব, আপনারা সবে মিলে আমাকে বাঁচানোব চেষ্টা কবেন।'

আবু হোসেনকে নামানো হযেছে। সে হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তাব পাশে পড়ে আছে। বাস ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন হাই তুলল। সুবাদারকে বলল, 'এই দুজনকে নদীর পাড়ে নিযে যাও।'

'এখন নিব?'

'না রাতে। রাতই ভালো।'

ক্যাপ্টেন আবার হাই তুলল। তার ঘুম পাচ্ছে।

৯

খুব জ্যোৎস্না হল সে বাতে। উথালপাথাল জ্যোৎস্নাব ভেতর তারা অনিলকে হাঁটিয়ে নিযে যাচ্ছে। আবু হোসেনকে নেয়া হচ্ছে না। কারণ তাকে নেয়ার প্রয়োজন নেই। মুগ্ধ হযে জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে অনিল যাচ্ছে। দোভাষী বাঙালি যাচ্ছে তার পাশে পাশে। অনিল তাকে বলল, 'কী সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে দেখেছেন ? এই সৌন্দর্যের ছবি আঁকা সম্ভব নয়। সৌন্দর্যের একটি অংশ আছে যার ছবি আঁকা যায় না।'

প্রচণ্ড জ্যোৎস্নার কারণেই বোধহয় কাকদের ভেতরে এক ধবনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। তারা ডাকতে লাগল — কা-কা-কা।

পাখি আমার একলা পাখি

আমি একটা খুন করব এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নিয়ে ফেললাম। কদিন খুব অস্থির অস্থির লাগছিল। সিদ্ধান্তটা নেয়ার পর অস্থির ভাব পুরোপুরি কেটে গেল। এক ধরনের আরামদায়ক আলস্যে মন ভরে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে টেবিল ঘড়ির দিকে তাকালাম। ভোর নটা পঁয়ত্রিশ। মিনিটের লাল কাঁটা সাতের ঘরে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত যে মুহূর্তে নেয়া হল, সেই মুহূর্তটা জানা থাকা দরকার। টেবিল ঘড়িতে সেকেন্ডের কাঁটা থাকে না। কাজেই মুহূর্তটা আরো সূক্ষ্মভাবে জানা গেল না। মনটা একটু খুঁতখুঁত করছে।

আমার চোখ টেবিল ঘড়ির লাল কাঁটায় আটকে গেছে। আমি তাকিয়েই আছি। একসময় রূপা আমার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'এই কী দেখছ?' রূপা আমার স্ত্রী। সে ধবধবে একটা সাদা চাদর গায়ে দিয়ে গুটিসুটি মেরে আমার পাশে শুয়ে আছে। সাদা চাদর গায়ে জড়ানো বলেই বোধহয় তাকে দেখাচ্ছে একটা বেড়ালের মতো। এমনিতে অবশ্যি তার চরিত্রে বেড়াল ভাব অত্যন্ত প্রবল। সে সারাক্ষণই আরাম খোঁজে। নটা সাড়ে নটার আগে কোনোদিনই বিছানা ছেড়ে নামে না। আজ ছুটির দিন। কাজেই দশটা পর্যন্ত শুয়ে থাকবে বলে মনে হচ্ছে। রূপা আবার আমার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'কী দেখছ?'

আমি হালকা গলায় বললাম, 'ঘড়ি দেখছি।'

'কটা বাজে?'

'নটা পঁয়ত্রিশ।'

রূপা হাই তুলে বলল, 'ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। আমি রাতে ঘুমোতে যাবার সময়ও দেখেছি নটা পঁয়ত্রিশ। চাবি দেয়া হয় নি।'

আমি আবার তাকালাম — রূপার কথাই ঠিক। মিনিটের লাল কাঁটা এখনো সাতের ঘরে স্থির হয়ে আছে। আমি কখন এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলাম তা জানা গেল না। মন আগে থেকেই খুঁতখুঁত করছিল। এখন বিরক্তিতে ভরে গেল। বিরক্ত হলেই আমার মুখে থুতু জমে। থুতু জমছে। মুখ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে থুতুতে।

রূপা বলল, 'ড্রেসিং টেবিলের ওপর আমার হাতঘড়ি আছে। সময় দেখতে চাইলে ঐ ঘড়িতে দেখ। তবে ছুটির দিনে এত কীসের ঘড়ি দেখাদেখি? ঘুমাও তো।'

এই বলেই সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়ল। রূপা অতি দ্রুত ঘুমোতে পারে। মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। তার সঙ্গে পরিচিত নয়

এমন কেউ হলে ভাবে হয়তো কথার খেই হারিয়ে থেমে গেছে। যারা তার সঙ্গে পরিচিত তারা সবাই জানে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ট্রেনে কোথাও যাবার সময় তাকে জানালার কাছের একটা সিট দিতে হয়। সে খোলা জানালায় মাথা রেখে ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে।

আমি বিছানা থেকে নামলাম। জমে থাকা থুতু জানালা দিয়ে ফেললাম। আমার ঘরটা ঠিক রাস্তার উপর। থুতু কারো মাথায় পড়ল কিনা কে জানে! পড়লে পড়ুক। ড্রেসিং টেবিলে রাখা রূপার হাতঘড়ি দেখলাম, সকাল সাতটা দশ। ছুটির দিনে এত ভোরে বিছানা ছাড়ার কোনো মানে হয়? রূপাকে জড়িয়ে ধরে আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকব? তেমন কোনো প্রবল ইচ্ছাও বোধ করছি না। তাছাড়া রূপার গা ঠাণ্ডা। ধাতুর নামে নাম রাখাব কারণেই বোধহয় তার বডি–টেম্পারেচার স্বাভাবিকের চেয়ে এক দু ডিগ্রি কম! রূপা চোখ বন্ধ করে ঘুম ঘুম গলায় ডাকল, 'এ্যই এ্যাই।'

'বল।'

'তুমি কি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছ?'

'না।'

'একটু যাও না, প্লিজ। মুনিযাকে বল আমাকে এককাপ কফি দিতে। তিন চামচ চিনি দিতে বলবে। দু চামচ উঁচু করে, এক চামচ সমান সমান। আর যদি ক্র্যাকার থাকে তাহলে একটা ক্র্যাকার। মাখন লাগিয়ে দিতে বলবে। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'ফ্রিজ থেকে খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানিও আনবে। আর শোন, পায়ের কাছের জানালাটা একটু বন্ধ করবে? ঘরে আলো আসছে।'

রূপা এই দীর্ঘ কথাবার্তায় একবারও চোখ মেলল না। মনে হচ্ছে সে ঘুমের মধ্যে কথা বলছে। রূপার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে গত আষাঢ় মাসে। এখন ফাল্গুন শুরু। প্রায় আট মাস হযে গেল। বিয়েব সময় তার মুখ ছিল লম্বাটে। শুধুমাত্র ঘুমিয়ে সেই মুখ এখন সে গোল করে ফেলেছে। গায়ের রঙও মনে হয় আগের চেয়ে ফর্সা হয়েছে। সাদা চাদরের আড়াল থেকে তার একটা পা বের হয়ে আছে। সে পায়ে শাড়ির আব্রু নেই। শঙ্খের মতো ধবধবে সাদা পা। মানুষের পা এত সাদা হয, রূপাকে বিয়ে না করলে জানতাম না।

'এ্যাই, এ্যাই।'

'বল।'

'পা–টা একটু ঢেকে দাও না।'

রূপা আমার চেষ্টা ছাড়াই তার নগ্ন পা চাদরের ভেতর টেনে নিতে পারে। তা সে করবে না। ঐ যে বললাম বেড়াল স্বভাব। সবার কাছ থেকে আদর নেবে। যত্ন নেবে। আদর পাবার সামান্যতম সুযোগও সে ছাড়বে না।

আমি চাদর দিয়ে তার পা ঢাকলাম। পায়ের কাছের জানালা বন্ধ করলাম। এখন আমার কফি এবং ঠাণ্ডা পানির সন্ধানে যাওয়া উচিত। যেতে পারছি না। রূপার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সব মেয়ে ঘুমোবার সময় চুল বেঁধে ঘুমায়। শুধু রূপার চুল থাকে ছাড়া। বালিশময় চুল ছড়ানো, মাঝখানে তার গোলাকার মুখ। সেই মুখ এতই সুন্দর যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। অসম্ভব সুন্দর সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের কম। কোনো সুন্দর জিনিসের দিকেই মানুষ বেশি সময় তাকিয়ে থাকতে পারে না। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আমাদের এ বাড়ির বারান্দা বেশ বড়। আজকালকার আর্কিটেক্টরা এই বারান্দা দেখলে চোখ কপালে তুলে বলবেন, ইশ কতটা জায়গা নষ্ট করা হয়েছে। কোনো মানে হয়?

এক সময় মুনিয়া বারান্দায় ফুলের টব বসিয়ে একটা কাণ্ড করতে চেয়েছিল। গোলাপের টব, অর্কিডের টব, এমন কি কাজি পেয়ারার টব। এখন মুনিয়ার টবপ্রীতি দূব হয়েছে। টব আছে, গাছ নেই। বর্তমানে বারান্দা হল আমাদেব ডাম্পিং গ্রাউন্ড। যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় আসবাব এখানে ডাম্প করা হয়। শুধু আসবাব না, কিছু অপ্রয়োজনীয় মানুষও আমরা বারান্দায় রাখি। এই মুহূর্তে বাবান্দাব শেষ মাথায় ক্যাম্প খাটে একজন অপ্রয়োজনীয় মানুষ শুয়ে আছেন। তিনি এসেছেন দেশেব বাড়ি কেন্দুয়া থেকে। মামলাব তদবিরে। ভদ্রলোকেব নাম রইসুদ্দিন। আমাদের অতি দূব সম্পর্কের আত্মীয়। কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হয় আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁকে যে আমরা বারান্দায় ফেলে রেখে অপমান করার চেষ্টা করছি, এটা তিনি বুঝেও না বোঝাব ভান করেন। বইসুদ্দিন চাচা আমাকে দেখেই উঠে বসলেন। ছোটখাটো মানুষ। মামলা মোকদ্দমা করে যেন আবো ছোট হয়ে গেছেন। গালভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি না থাকলে তাঁকে বাচ্চা ছেলের মতোই লাগত। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'আব্বাজীর ঘুম ভাঙল?'

তিনি আমাকে ডাকেন আব্বাজী, আমার বোন মুনিয়াকে আম্মা এবং রূপাকে ডাকেন আম্মাজী। আমার সবচে' ছোট ভাই বাবুকে শুধু নাম ধবে ডাকেন। তাব বেলায় এই ব্যতিক্রম কেন কে জানে। কাবণ একটা নিশ্চযই আছে। বইসুদ্দিন চাচাব মতো ধুবন্ধব লোক বিনা কারণে কিছু করবেন না। এঁরা প্রতিটি কাজকর্ম ভেবেচিন্তে কবেন।

তিনি আগেব প্রশ্নই আবাব কবলেন। এবাব মুখেব হাসি আগেব চেয়েও বিস্তৃত হল।

'আব্বাজীব ঘুম ভাঙল?'

'জ্বি।'

'ঘুম হইছে কেমন?'

'ভালো।'

'আমরাও ঘুম ভালো হইছে। ফুবফুবা বাতাস। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। কম্বল গায়ে দিয়ে লম্বা ঘুম দিলাম। শেষবাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন দেখাব পব মনটা আবো ভালো হয়ে গেছে। বড়ই মধুব স্বপ্ন।'

কেউ স্বপ্নের কথা বললে — কি স্বপ্ন দেখা হয়েছে জানতে চাওযাটা সাধাবণ ভদ্রতা। এই মানুষটাব সঙ্গে ভদ্রতা কবতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা কবছে না। তবু অভ্যাসেব বসে বললাম, কি স্বপ্ন দেখলেন?

'দেখলাম সাদা একটা সাপ। গ্রামদেশে এই সাপরে বলে দুধবাজ। এই সাপ আমাব হাঁটুতে একটা ছোবল দিল। বিষ যা ছিল সব ঢেলে দিল।'

মানুষেব কথা শুনে আমি কখনো বিস্মিত হই না। বিশেষ কবে এইসব ধুবন্ধব মানুষ কথাবার্তায় সবসময় অন্যদেব চমৎকৃত করতে চেষ্টা কবে। আমি বুঝতে পারছি রইসুদ্দিন চাচা কথাবার্তায় আমাকে কিছুক্ষণ আটকে রাখার চেষ্টা কবছেন। তিনি হয়তো ভাবছেন আমি অবাক হয়ে বলব — এরকম ভযাবহ একটা স্বপ্ন দেখে আপনার মনটা খুশি হয়ে গেল কেন? তার উত্তরে তিনি আরো চমকপ্রদ কিছু বলবেন। আমি তাঁকে সেই সুযোগ দিলাম না। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে গেলাম। সাপ কামড় দিয়েছে এই স্বপ্ন দেখে কেউ যদি আনন্দে আত্মহাবা হয — হোক। মুখে আবার থুতু জমেছে। এ তো বড় যন্ত্রণা হল!

রান্নাঘরে মুনিয়া ছাঁকনি দিয়ে অর্জুন গাছের রস ছাঁকছে। বাবার কবিরাজী ওষুধ। তাঁর হার্টের কি সব সমস্যা। কবিরাজ বলেছে অর্জুন গাছের ছাল সেদ্ধ কবে সেই বস খেতে। অর্জুন গাছেব সব ছাল নয়। গাছেব পুবদিকের ছাল, যেখানে সূর্যেব প্রথম রশ্মি পড়ে। মাখন বলে আমাদের যে কাজের ছেলেটি আছে, তার কাজই হচ্ছে সাইকেলে করে দূর-

দূরান্ত থেকে অর্জুন গাছের ছাল নিয়ে আসা। মাখনের কোনো কাজে উৎসাহ নেই। এই কাজটিতে খুব উৎসাহ। সে ঢাকা শহরের আশপাশের সব অর্জুন গাছের ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছে বলে আমার ধারণা। ছাল–ছাড়ানো অর্জুন গাছ দেখতে কেমন হয়? মাখনার সঙ্গে একদিন দেখে আসতে হবে।

মুনিয়াকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। মুখ শুকনো। চোখের নিচে কালি। মন হয়তো খারাপ। এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার না। মুনিযার মন বেশিরভাগ সময়ই খারাপ থাকে। বছর দুই হল স্বামীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আবার বিয়ে করেছেন। স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকা শহরেই থাকেন। তাদের সঙ্গে দেখা হযে যেতে পারে এই ভয়ে মুনিয়া ঘর থেকে বের হয় না। ঘরে থেকে থেকে বেচারি ফর্সা হযে গেছে।

মুনিয়া অর্জুন গাছের রস ছাঁকতে ছাঁকতে রোবটদেব মতো গলায বলল, 'ভাবীব ঘুম এখনো ভাঙে নি?'

'না। তোকে কফি আর একটা মাখন লাগানো ক্র্যাকাব পাঠাতে বলেছে। কফিতে তিন চামচ চিনি। দু চামচ উঁচু করে আর এক চামচ সমান সমান।'

'আর কিছু ?'

'ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি। আইস কোল্ড।'

মুনিযা মুখ টিপে হাসল। আমিও হাসলাম। মুনিযা আমাব পিঠাপিঠি। ওব সঙ্গে আমাব সহজ সম্পর্কের একটা ব্যাপার আছে। আমি ওব সামনের চেযাবে বসতে বসতে বললাম, 'মন খারাপ নাকি রে?'

মুনিযা হালকা গলায বলল, 'বাসিমুখে আমাব সামনে বসিস না। দেখেই বমি বমি লাগছে।'

আমি নড়লাম না। গলার স্বর অনেকটা নামিযে বললাম, 'আজ একটা দারুণ ডিসিশান নিলাম।'

'কী ডিসিশান?'

'একটা খুন করব?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, এটা হবে একটা পারফেক্ট মার্ডার। কেউ বুঝতেও পাববে না খুন হযেছে।'

মুনিযা মোটেও বিস্মিত হল না। সে যে বিস্মিত হবে না আমি জানতাম। সে ভাবছে আমি রসিকতা করছি। এটা ভাবাই যুক্তিযুক্ত। যে খুন কববে সে সবাইকে বলে বেড়াবে না।

'কাকে খুন করবি কিছু ঠিক করেছিস?'

'হ্যাঁ, সব ঠিক করা আছে।'

'আমার কাছে সাজেশান চাইলে দিতে পারি।'

'কী সাজেশান?'

'রইসুদ্দিন চাচাকে খুন করে ফেল।'

মুনিয়া কথা শেষ করে আমার দিকে তাকিযে রইল। সে আশা কবছে আমি বলব, রইসুদ্দিন চাচা কি করেছে?'

আমার কাছ থেকে কেউ যা আশা করে, আমি তা করি না। কাজেই কিছুই বললাম না। উদাস চোখে বারান্দা লাগোয়া সজনে গাছের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সজনে গাছটা মরতে বসেছে। গাছের মৃত্যুও একটা দেখার মতো ব্যাপার। কিছু কিছু গাছ হঠাৎ করে মরে যায়। ওদেরও মনে হয় হার্ট অ্যাটাকের মতো অসুখ আছে। আবার কিছু কিছু গাছ

দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করে মরে। এই গাছটা অল্প অল্প করে মরছে। গাছের কোনো ডাক্তার থাকলে তাকে এনে চিকিৎসা করাতাম।

'রইসুদ্দিন চাচা কি করেছেন জানিস?'

'না।'

'মতির মা আমাকে বলল, ওদের যে বাথরুম রইসুদ্দিন চাচাকেও সেই বাথরুম ব্যবহার করতে হয়। বাথরুমের দরজায় একটা ফুটো। মতির মা গোসল করছে, হঠাৎ দেখে সেই ফুটো দিয়ে রইসুদ্দিন চাচা তাকিয়ে আছেন। কি রকম ঘেন্নার কথা বল তো!'

'মতির মা কি ওনাকে কিছু বলেছে?'

'না। ভাবছি আমি বলব। অবশ্যি সবচে' ভালো হয় তুই বললে।'

'পাগল, আমি এইসব বলাবলির মধ্যে নেই। খুন করার কথা হলে ভিন্ন কথা।'

আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। রূপা এখনো শুয়ে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই বলল, 'কফির কথা বলেছ?'

'বলেছি।'

'পানি আন নি, ঠাণ্ডা পানি?'

'কফির সঙ্গে আসবে।'

'তাহলে দয়া করে একটা গান দাও তো। গান শুনতে ইচ্ছা করছে। এল. পি. টা দেখো টেবিলের ওপর — 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে', ঐটা দাও।'

আমি তাই করলাম।

রূপা হাসতে হাসতে বলল, 'গানটা শুনতে শুনতে তোমার পা একটু ধরতে চাই। কাছে এসো তো। ঠাট্টা না, সত্যি। কাছে এসো।'

আমি রূপার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

রূপা হাসছে। তাকে অসহ্য সুন্দর লাগছে। মানুষ এত সুন্দর হয় কী করে? চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারছি না। গান বাজছে। গানের কথাগুলো কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। — তবু পুরোপুরি অস্পষ্টও নয়।

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে — —

জীবন মরণ সুখ-দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ॥

স্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর —

নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার, ফেল না আমারে ছাড়ায়ে ॥

রূপার চোখ বন্ধ। মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিত হবার জন্যে আমি পর পর দুবার ডাকলাম, 'রূপা রূপা।' সে সাড়া দিল না। পাশ ফিরল। অথচ ট্রে হাতে মুনিয়া ঢোকামাত্র রূপা বলল, 'থ্যাংকস মুনিয়া।'

রূপা নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছিল না। কিংবা ঘুমের মধ্যেই এমন ব্যবস্থা ছিল যেন মুনিয়া ঢোকামাত্র সে জেগে যায়। কম্পিউটারাইজড কোনো সুইচিং ডিভাইস। রূপা বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, 'লাবণ্য কি করছে মুনিয়া? ওকে একটু পাঠাবে।'

মুনিয়া গম্ভীর মুখে বলল, 'ও বই নিয়ে বসেছে। ওকে এখন ডেকো না তো ভাবী।'

'আচ্ছা, ডাকব না।'

লাবণ্য মুনিয়ার একমাত্র মেয়ে। লাবণ্যর বয়স পাঁচ। সপ্তাহে অন্তত এক দিন তাকে তার বাবা দেখতে আসেন। সেই বিশেষ দিনে মুনিয়া তার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। সারাদিন কিছুই খায় না।

রূপার সঙ্গে লাবণ্যের অন্য এক ধরনের ভাব আছে। সেই ভাবের গুরুত্ব এত বেশি, যা মা হিসেবে মুনিয়া ঠিক সহ্য করতে পারে না। মুনিয়া চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য ঘরে ঢুকল। গম্ভীর গলায় বলল, 'পিরিচে করে চা খাব।'

রূপা তাকে পিরিচে চা ঢেলে দিল।

'কেমন আছ লাবণ্য?'

লাবণ্য গম্ভীর গলায় বলল, 'কি জানি কেমন আছি।'

'মনটা কি তোমার খারাপ?'

'হুঁ।'

'কী করলে মন ভালো হবে?'

'জানি না।'

'পিরিচে করে আরো চা খেলে কি ভালো হবে?'

'হুঁ।'

রূপা আরো খানিকটা চা ঢেলে দিল। মুনিয়া আবার ঘরে ঢুকল। এই পর্যায়ে মুখ কালো কবে বলল, 'ভাবী, তুমি ওকে আবাব চা দিযেছ? আমি তোমাকে বলি নি চা খাওযানোর অভ্যাস করবে না। এই দেখ, নতুন জামায চাযের দাগ লাগিযেছে।'

মুনিয়া মেযের হাত ধরে বের হযে গেল। তাব মুখ দেখে মনে হচ্ছে জামায চাযেব দাগ লাগার শোকে সে কেঁদে ফেলবে। আসলেই কাঁদবে। কারণে এবং অকাবণে কাঁদা তার শৈশবের অভ্যাস। এখন তাব কাঁদার অনেক বিষয় আছে।

আজ শুক্রবার।

মার হুকুমে শুক্রবার সকালে নাশতা সবাইকে একসঙ্গে খেতে হয। মা আজিমপুব গার্লস স্কুলে মাস্টারি করেন। মর্নিং শিফটের ক্লাস আটটায আরম্ভ হয। তাঁকে সাতটাব মধ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে রিকশা খুঁজতে হয। বাবার গাড়ি আছে। তিনি সেই গাড়িতে যাবেন না। বাবার টাকায় নিজের জন্যে কিছু কিনবেন না। সম্ভবত বছর পাঁচেক আগে তাঁদেব মধ্যে বড় ধরনের কোনো ঝগড়া হযেছে। সে ঝগড়ার জের এখনো চলছে। কে জানে হয়তো আরো বছর পাঁচেক চলবে। ঐ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। তা ছাড়া ঝগড়াব কারণে তাঁদের কথাবার্তা পুরোপুরি বন্ধ না। কাজ চালাবাব মতো কথা তাঁরা বলেন।

নাশতার টেবিলে বাবা মার দিকে তাকিযে বললেন — 'রইসুদ্দিনের ব্যাপারটা কি বল তো?'

মা জবাব দিলেন না। জবাব দেবার অবশ্যি কথাও না। বাবা রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বললেন, 'মতির মা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলল, বইসুদ্দিন নাকি বাথরুমেব ফুটো দিয়ে তাকিয়ে ছিল। কী বিচ্ছিরি কাণ্ড!'

মুনিয়া বিরক্ত গলায় বলল, 'ও কি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে নাকি? এটা কি জনে জনে বলে বেড়াবার মতো কথা?'

বাবা বললেন, 'না বলারই–বা কি আছে? তাব ওপব একটা অন্যায কবা হযেছে, সে বিচার দাবি করবে না? সেই অধিকার কি তার নেই?'

মুনিয়া কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিযে রূপা উঁচু গলায় বলল, 'বাথরুমেব ফুটো দিয়ে মতির মাকে দেখেছে, তাতে হয়েছেটা কি? মতির মার শবীর তো পচে যায নি।'

বাবা রূপার কথা শুনে হতভম্ব হযে গেলেন। তাঁর ছেলেব বৌ তার মুখের উপর এরকম কথা বলবে, তা তিনি হযতো কল্পনাও কবেন নি। রূপাব চোখ থেকে চোখ সরিযে

তিনি আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বলছে, এই বকম একটা মেয়েকে তুই বিয়ে করলি? রূপা যেন আবো বেফাঁস কিছু বলে না ফেলে, সে জন্যে টেবিলেব নিচে তার পায়ের পাতায় আমি ডান পা নিয়ে চাপ দিলাম। বসে আমার দিকে তাকিয়ে 'উফ্! কি কবছ?' বলে ধমক দিল। আমি হয়ে গেলাম অপ্রস্তুত। রূপা কোনো ব্যথা পায় নি। পুরো ব্যাপাবটা সে করল আমাকে অপ্রস্তুত করার জন্যে।

বাবা বললেন, 'বাথরুমেব ফুটো দিয়ে কোনো মহিলাব দিকে তাকানো জঘন্য অপবাধগুলোব একটি। বইসুদ্দিনকে বলতে হবে, সে যেন সকাল এগারটাব আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আব কোনো দিন যেন না আসে। এইসব ন্যুইসেন্সদেব বাড়িতে জায়গা দেযাই ঠিক না।'

রূপা বলল, 'আমার কিছু কথা আছে।'

বাবা বিস্মিত হয়ে তাকালেন। আমি খুব দ্রুত চিন্তা কবলাম, আবেকবাব পায়ে চাপ দিয়ে রূপাকে থামানোর চেষ্টা করাটা কি ঠিক হবে? সে অবশ্য আবাব 'উফ! কি কবছ?' বলে চেঁচিয়ে উঠতে পাবে।

মা বললেন, 'বৌমা, এই বিষয়ে তোমাব কিছু বলাব দবকাব নেই।'

'কেন মা?'

'তুমি সব ব্যাপাবে কথা বল, এটা ভালো না। তুমি বৌ মানুষ। সংসাবেব সব কিছুতে তুমি থাকবে কেন?'

'বৌরা কি সংসাবেব অংশ নয়?'

'অংশ তো ব'টই, তবে তাবা হচ্ছে সংসাবেব সৌন্দর্য, সংসাবের শোভা। তাবা নোংবা ঘাঁটাঘাঁটি কববে, এটা ঠিক না।'

'নোংবা ঘাঁটাঘাঁটি তো না মা। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হল, আমার ধাবণা মতিব মা মিথ্যা কথা বলছে।'

'মিথ্যা কথা বলছে?'

'হ্যাঁ।'

'এ বকম ধাবণা হবাব কাবণ কী?'

'বইসুদ্দিন চাচা কিছুদিন আগে বলছিলেন না — তাঁব পাঞ্জাবিব পকেট থেকে মতির মা পঞ্চাশ টাকাব একটা নোট সবিয়েছে। মতিব মা কান্নাকাটি করল। আপনাব হুকুমে মতিব মাব ট্রাঙ্ক খোলা হল। পঞ্চাশ টাকাব একটা নোট সেখানে পাওযাও গেল।'

'এত ফেনাচ্ছ কেন মা? যা বলতে চাও সহজ কেথায বল।'

'বেশ, সহজভাবেই বলছি। মতিব মা সেই অপমানেব প্রতিশোধ নিয়েছে, আব কিছুই না। বাহান্ন বছবের এক বুড়িব শবীব দেখাব জন্যে কেউ বাথরুমেব ফুটোয চোখ বাখে না।'

কেউ রূপাব কথা বিশ্বাস কবল কিনা জানি না, আমি করলাম। এবং মুনিযাব ঠোঁটেব কোণে হাসি দেখে মনে হল সেও কবল।

বাবা গলাব স্বর যথাসম্ভব গম্ভীব কবে বললেন, 'বৌমা, আমাব দৃঢ় বিশ্বাস মতিব মা সত্যি কথা বলছে। কে সত্যি বলছে, কে বলছে না সেটা আমি বুঝতে পাবি। তিরিশ বছব জজিযতি করেছি। তোমাকে আরেকটা কথাও বলি মা, পৃথিবীতে অনেক বিকাবগ্রস্ত মানুষ আছে। তারা বাথরুমে ফুটো দেখলেই চোখ রাখবে। বইসুদ্দিন এরকম এক জন বিকাবগ্রস্ত লোক। তাকে আজ সকাল এগারটার মধ্যে বাসা ছাড়তে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি আব কারোর কথা শুনতে চাই না।'

রূপা বলল, 'জাজ সাহেব হিসেবে আপনার দুপক্ষের কথাই শোনা উচিত। আসামিরও তো কিছু বলার থাকতে পারে।'

'বৌমা, তুমি আমার সামনে থেকে যাও।'

'আচ্ছা যাচ্ছি, না বললেও যেতাম। আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।'

রূপা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে গেল, যেন কিছুই হয় নি।

এগারটার আগেই রইসুদ্দিন চাচাকে তার সুটকেস, কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে রিকশায় উঠতে হল। মতির মাকে খুব উৎফুল্ল মনে হল। আমাকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'ভাইজান, দেখছেন, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়বে না তো কীসে নড়বে?'

'খুবই খাঁটি কথা ভাইজান। খুব খাঁটি কথা। লোকটারে প্রথম দিন দেইখ্যাই বুঝছি বদ লোক।'

'সেও তোমাকে দেখে প্রথম দিনেই বুঝে ফেলেছে, তুমি বদ মেয়েছেলে। দেখ না, এত লোক থাকতে তোমাকে চোর সাব্যস্ত করল। শুধু যে চোর সাব্যস্ত করল তা না, চোর প্রমাণও করে ফেলল। টাকা পাওয়া গেল তোমার ট্রাঙ্কে।'

মতির মা মুখ কালো করে ফেলল।

আমি বললাম, 'রইসুদ্দিন চাচাকে তুমি চেন না মতির মা। উনি বিরাট ঘুঘু লোক। প্রতি বছর ছয়-সাতটা করে মামলা করে। সে তোমাকে এত সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। মামলা-টামলা করে বসবে বলে আমার ধারণা।'

মতির মাকে পুরোপুরি ভ্যাবাচেকা খাইয়ে ঘরে এসে দেখি রূপা চাদর জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। নাশতা খেয়ে আবার বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়া রূপার পুরানো অভ্যাস। প্রথমদিকে অবাক হতাম। এখন আর হই না।

'রূপা ঘুমাচ্ছ নাকি?'

'না, চেষ্টা করছি।'

'তোমার যুক্তি কেউ বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয় না।'

'সবাই বিশ্বাস করেছে। লোকটাকে তোমরা কেউ সহ্য করতে পারছিলে না। একটা অজুহাত পেয়ে তাড়িয়েছ।'

'তুমি কি লোকটাকে পছন্দ করতে?'

'আরে দূর দূর। আমি পছন্দ করব কেন? মামলাবাজ লোক আমার অসহ্য। এই, একটা গান দাও না। গান শুনতে শুনতে ঘুমাই।'

'এখন গান দেয়া যাবে না। বাবা গান শুনলেই রেগে যান।'

'রেগে যান কেন?'

'জানি না কেন? ছোটবেলা থেকেই দেখছি গান শুনলে বাবার মেজাজ চড়ে যায়। মুনিয়া একদিন উঁচু ভল্যুমে অনুরোধের আসর শুনছিল বলে চড় খেয়েছিল।'

'তোমার বাবা লোকটাকে আমি খুবই অপছন্দ করি। তিনিও অবশ্যি আমাকে অপছন্দ করেন। কাজেই কাটাকাটি।'

'মা। মাকে পছন্দ কর?'

'মাই গড। ওনার ভেতর পছন্দ হবার মতো কী আছে?'

'কিছুই নেই?'

'না, কিছুই নেই। এই শোন, একটা গান দাও না। গান শুনতে শুনতে ঘুমানোর অন্য রকম মজা। ঘুমের মধ্যেও গান হতে থাকে।'

'না ঘুমিয়ে একটা কাজ করলে কেমন হয় রূপা?'

'কী কাজ?'

'চল না কোথাও বেড়াতে যাই।'

'পাগল হয়েছ। এই রোদে আমি ঘুরব? গায়ের রং নষ্ট হয়ে যাবে না?'

'বাবাকে বলে গাড়িটা নিয়ে যাই। গাড়িতে গেলে তোমার গায়ের রং নিশ্চয়ই নষ্ট হবে না?'

রূপা জবাব দিল না। আমি কয়েকবার ডাকলাম, 'এই রূপা, এই।' কোনো সাড়া নেই। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি কি করব ভেবে পেলাম না। চুপচাপ ঘরে বসে থাকব, নাকি বাইরে যাব। রূপাকে বিয়ের পর থেকে মোটামুটিভাবে আমি গৃহবন্দি হয়ে পড়েছি। বাইরে যেতে ভালো লাগে না। রূপার আশপাশে থাকতে ইচ্ছা করে। বেশিরভাগ সময় সে ঘুমিয়ে থাকে। আমি তার পাশে শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকি। রূপার গা ঘেঁষে শোয়া যায় না — তার গরম লাগে। তার গায়ে হাত রাখা যায় না — ভার লাগে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মুনিয়া প্রায়ই আমাকে ঠাট্টা করে বলে — 'ভাইয়া, তোকে তো ভাবী একেবারে মেষশাবক বানিয়ে ফেলেছে। মেরী হ্যাড এ লিটল ল্যাম্ব অবস্থা। মেরী যেখানে যায় মেষশাবক যায় তার পিছু পিছু।'

'ও তো যায় না কোথাও। শুয়ে থাকে, ঘুমায়।'

'পাগল হয়েছ ভাইয়া, চব্বিশ ঘণ্টা কেউ ঘুমোতে পারে! আমার ধারণা, ভাবী মোটেই ঘুমোয় না। মটকা মেরে পড়ে থাকে।'

'মটকা মেরে পড়ে থাকবে কেন?'

'তা জানি না। আমি আমার ধারণার কথা বললাম। তুমি হাঁ করে ভাবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাস, এটা ভাবী জানে বলেই চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে, যাতে মনের সাধ মিটিয়ে তুমি দেবীদর্শন করতে পার।'

'চুপ কর তো।'

'চুপ করছি। আমার ধারণা ভুল নাও হতে পারে ভাইয়া। ভাবী যখন ঘুমায়, তখন তুমি ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখো তো। সত্যি ঘুম কিনা।'

আমি সেই পরীক্ষাও করেছি।

ও যখন ঘুমোচ্ছে তখন পাশে বসে মজার মজার কয়েকটা জোক বলেছি। জেগে থাকলে তাকে হাসতেই হবে। সে হাসে নি। তার ঘুম যে নকল ঘুম না — আসল ঘুম, তা সে না হেসে প্রমাণ করেছে।

মুনিয়াকে আমি আমার এই পরীক্ষার কথা বলেছি। সে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারে নি। তার ধারণা, রূপার হাসি আসে নি বলে হাসে নি। সে বলল, 'জেগে থাকা অবস্থায় এ রসিকতাগুলো করে দেখো তো — ভাবী হাসে কিনা। আমার মনে হয় হাসবে না।'

এক দিন তাও করলাম। রূপা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। এমন হাসল যে তার চোখে পানি এসে গেল। হেঁচকি উঠতে লাগল। এই ব্যাপারটাও সন্দেহজনক, এত হাসবে কেন ? এত হাসির কী আছে ?

রূপা ঘুমোচ্ছে।

আমি তার খাটের পাশে রাখা টুলে বসে তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। এই ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সাধ্যও আমার নেই। আট মাস আমাদের বিয়ে হয়েছে। এই আট মাসে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ খানিকটা হলেও ফিকে হবার কথা। আমার তা হচ্ছে না — কারণ এই মেয়েটাকে আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না। প্রথম দিনে সে আমার কাছে যতটা অচেনা ছিল, আজো ঠিক ততটাই অচেনা আছে। কিংবা হয়তো আরো বেশি অচেনা হয়েছে।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

রূপা বলল, 'আহ্, সিগারেট ফেল তো। গন্ধে বমি আসছে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তুমি কি জেগে ছিলে নাকি?'

রূপা বিরক্ত গলায় বলল, 'জেগে থাকব কেন? সিগারেটের ধোঁযায ঘুম ভেঙেছে। দযা করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট শেষ করে এসো।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগারেট হাতে বারান্দায় চলে এলাম। সজনে গাছটাব দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হযে গেল। গাছটা মরে যাচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে মরছে। এত ধীবে মরছে যে অন্য কেউ তা বুঝতে পারছে না। গাছদেরও কি মৃত্যু-যন্ত্রণা আছে? জগদীশচন্দ্র বসু গাছের মৃত্যু-যন্ত্রণা নিয়ে কী বলে গেছেন?

আমার সিগারেট শেষ হবার আগেই বাবা বারান্দায এসে পড়লেন। আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় হাত থেকে সিগারেট ফেলে দিলাম। বাবা রাগী চোখে আমাব দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বললাম, 'কিছু বলবেন?'

সচরাচর বাবাকে তুমি করে বলি। মাঝে মাঝে বিশেষ অবস্থায আপনি বলি। বাবা তুই-তুমির মিশ্রণ ব্যবহার করেন, এই তুই এই তুমি।

বাবা বললেন, 'তোর সঙ্গে আমার অনেক কথাই আছে।'

'এখন বলবেন?'

'না।'

'বলতে চাইলে বলতে পারেন, আমার হাতে সময় আছে।'

বাবা ইংরেজিতে একটি দীর্ঘ বাক্য বললেন যাব বাংলাটা হল, মানুষ হিসেবে তুমি দ্রুত বদলে যাচ্ছ। তুমি নিজে তা বুঝতে পারছ কিনা তা আমি জানি না। তবে তোমাকে যতই দেখি ততই শঙ্কিত বোধ করি। তোমার কি রাতে ঘুম হয়?

আমি বললাম, 'হুঁ।'

'হুঁ কোনো জবাব না। ঘুম হয় কি হয না?'

'হয়।'

'শুনে সুখী হলাম। তোর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় তোব ইদানীং ঘুম হচ্ছে না। লজিক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তোর মধ্যে আত্মসম্মান বলতে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তোর স্ত্রী এমন অদ্ভুত আচরণ করল, আর তুই তাকিয়ে রইলি, কিছুই বললি না? তোর কি মনে হয় না — কিছু বলা উচিত ছিল?'

'রূপার কথা আমার কাছে বেশ লজিকেল মনে হয়েছে।'

'লজিকেল মনে হযেছে?'

'জ্বি।'

'আমার কথাগুলো কেমন মনে হয়েছে? আমার কথাগুলো কি পাগলের চেঁচামেচি বলে মনে হয়েছে?'

আমি জবাব দেবার আগেই রূপা বারান্দায় এসে বলল, 'তোমরা এত হৈচৈ শুরু করেছ! ঘুমোচ্ছিলাম তো।'

বলেই আবার ভেতবে ঢুকে গেল। শব্দ কবে দরজা বন্ধ কবল। বাবা হতভম্ব হয়ে বন্ধ দবজাব দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বোধহয় অনেকদিন এত বিস্মিত হন নি। বাবাব বিস্মিত চোখ দেখে মজা লাগছে। মানুষ খুব বেশি বিস্মিত হলে খানিকটা টিকটিকিব মতো হয়ে যায। কাবণ তার চোখ বড় বড় হয়ে যায এবং কোটর থেকে খানিকটা বেব হয়ে আসে। আমি কি বাবাকে বলব যে তাঁকে এখন কালো টিকটিকিব মতো দেখাচ্ছে? বলে আরো রাগিযে দেব? চূড়ান্ত বকম বেগে গেলে বাবা কী করেন তা কেন জানি দেখতে ইচ্ছা কবছে।

মাকে একবার চূড়ান্ত রকম বাগিযে দিযেছিলাম। এক সময লক্ষ কবলাম, তিনি থবথব কবে কাঁপছেন। ঠোঁটের দুই কোনায ফেনা জমছে। তিনি ক্ষীণ গলায বললেন, 'বঞ্জু, তুই যে খুব খারাপ ধরনের ছেলে, এটা কি তুই জানিস?'

আমি মাব প্রতি একটু করুণাই বোধ কবছিলাম। তবু বললাম, 'আমি যে খুব খাবাপ ধবনেব ছেলে তা আমি জানি, কিন্তু তুমি যে খুব খাবাপ ধবনেব একজন মা, তা কি তুমি জান ?'

'কী বললি? তুই কী বললি?'

'সত্যি কথা বললাম মা।'

'আমি খাবাপ ধবনেব মা?'

'হ্যাঁ। তুমি খাবাপ ধবনেব মা এবং খাবাপ ধবনেব স্ত্রী। মা হিসেবে তুমি যেমন ব্যর্থ, স্ত্রী হিসেবেও ব্যর্থ। আমাব ধাবণা, শিক্ষক হিসেবেও তুমি ব্যর্থ। স্কুলেব মেযেবা তোমাকে ডাইনী ডাকে। তুমিই এই কথা বলেছিলে। তোমাব কাছ থেকেই শোনা।'

এই পর্যাযে মা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। আমি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাকে দেখছি। খুব যে খাবাপ লাগছে তা না।

মা বললেন, 'তোব মাথা ঠিক নেই বঞ্জু। তোব মাথা ঠিক নেই। আমাব ধাবণা, কোনো একদিন তুই খুন-টুন কববি।'

আমি মাব কথায হেসে ফেললাম। মা এক অর্থে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, তিনি ঠিকই বলেছেন।

আজ ছুটিব দিন।

ছুটির দিনে সবাব নানান ধবনেব পবিকল্পনা থাকে। আমাব কোনো পবিকল্পনা নেই। কাবণ আমার ছুটি বলে কিছু নেই। গত দুবছব ধবেই আমার ছুটি। চাকরি-বাকবি নেই। তাব জন্যে চেষ্টাও নেই। ঢাকা শহরে আমাদেব যে দুটি বাড়ি আছে, তাব ভাড়াতে আমবা একটা জীবন মোটামুটি সুখে পাব কবে দিতে পাবি। এখন যে বাড়িতে আছি, এটা ভাড়া বাড়ি। বাবার বন্ধুব বাড়ি। শুনতে পাচ্ছি এটিও নাকি কেনা হবে। বাবা মৃত্যুব সময তিন বাড়ি তাঁর তিন পুত্র-কন্যাকে দিয়ে যাবেন।

সবচে' বড় বাড়ি ধানমণ্ডি তের নম্বরের 'গ্রিন কটেজ' পাবে বাবু। সব পবিবাবে একজন আদর্শ সন্তান থাকে, বাবু হচ্ছে সেই আদর্শ সন্তান। এম. এসসি. দিচ্ছে ফিজিক্সে। নির্ঘাৎ ফার্স্ট সেকেন্ড হবে। বাবু সেই ধরনের ছেলে, যারা ফার্স্ট সেকেন্ড ছাড়াও যে কিছু হওয়া যায় তা জানে না। এরা ছুটির দিনেও দরজা-জানালা বন্ধ করে পড়ে। বাথরুমে যাবার সময়ও বগলে করে পড়ার একটা বই নিয়ে যায়। ঈদের দিন ভোরবেলা বিস্মিত হয়ে বলে — 'আজ ঈদ ? জানতাম না তো? কী আশ্চর্য!'

বাবু চিলেকোঠার একটা ঘরে থাকে এবং তাকে বিরক্ত করা নিষেধ। ঘবে বসে পড়তে পড়তে তার যখন মাথা ধরে যায়, তখন সে বই হাতে ছাদে ঘুরে ঘুরে পড়ে। তখন ছাদে কেউ থাকলে সে বিরক্ত গলায় বলে, 'এইখানে কী?'

আমি বাবুর ঘরে চলে গেলাম। বাবু বই হতে বিছানায় শুয়ে ছিল। সে বিরক্ত গলায বলল, 'কী চাও দাদা?'

আমি হাই তুলে বললাম, 'তোর কাছে একটা পবামর্শের জন্যে এসেছি।'

সে বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমার কাছে কী পরামর্শ!'

'তোর কাছে কি পরামর্শের জন্যে আসা যায় না? সারা জীবন ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছিস — তোদের ব্রেইন হচ্ছে কম্পিউটারাইজড। সমস্যার খটাখট সমাধান কবে ফেলবি।'

বাবু আগের চেয়েও বিরক্ত গলায বলল, 'দাদা, মানুষেব ব্রেইন কম্পিউটারেব চেযে কোটিগুণ পাওযারফুল। কম্পিউটার মানুষেব তৈরী এটা ভুলে যাও কেন?'

'সবার ব্রেইন তো আর পাওযাবফুল না। কিছু কিছু ব্রেইন আছে ইটেব টুকবাব মতো। সলিড বক।'

'তোমার সমস্যাটা কী দাদা অল্প কথায বলে চলে যাও। আমি জটিল একটা বিষয পড়ছি — নন নিউটোনিযান ফ্লো প্যাটার্ন .... '

আমি বসতে বসতে বললাম, 'একটা খুন কবতে চাচ্ছি, বুঝলি — পাবফেক্ট মার্ডাব। কীভাবে করব বুঝতে পাবছি না।'

'ঠাট্টা করছ নাকি?'

'না। ঠাট্টা করব কেন। তুই ভেবেটেবে একটা কাযদা বেব কব তো।'

'কাকে খুন করবে?'

'আন্দাজ কর তো।'

'রূপা ভাবীকে?'

'ঠিক ধরেছিস।'

'রূপা ভাবীকে খুন কববে কেন?'

আমি সিগারেট ধবাতে ধবাতে বললাম, 'এত মানুষ থাকতে তোবই বা রূপাব কথা মনে হল কেন?'

বাবু থতমত খেযে গেল। আমি উঠতে উঠতে বললাম, 'খুব ভালোমতো চিন্তাভাবনা করে তারপর আমাকে বলবি। হুট করে কিছু বলবি না। খুনটা হবে টেক্সট বুক মার্ডাব। কোনো বকম ভুলচুক থাকবে না।'

বাবু বিড়বিড় কবে বলল, 'তোমাব মাথা আগেও খাবাপ ছিল এখন আবো বেশি খাবাপ হয়েছে। তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার। দাদা, তুমি কি ড্রাগ-ট্রাগ কিছু খাও?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'খাই না, তবে খেযে দেখব বলে ভাবছি। ইন্টারেস্টিং ড্রাগ কী আছে বল তো।'

আমাদের পরিবারের 'আদর্শ মানব' বাবু বিরক্ত মুখে বই পড়তে শুরু করেছে — নন নিউটোনিযান ফ্লো মেকানিক্স। অতি জটিল বিষয, সে নিশ্চযই জলেব মতো বুঝতে পাবছে। তবে সহজ জিনিস সে কিছু বোঝে না বলেই আমার বিশ্বাস। বাবু ভুরু কুঁচকে বলল, 'দাদা, এখন যাও তো। মূর্তির মতো বসে আছ, আমার খুব বিরক্ত লাগছে।'

আমি উঠে পড়লাম। আদর্শ মানবকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করা ঠিক না। সিঁড়ি দিযে নামার সময় দেখি, লাবণ্যও নামছে। চুল বেঁধে, মুখে পাউডার দিযে একেবারে পরীদের ছানা। পাযে লাল ভেলভেটের জুতা! আমি বললাম, 'এমন সেজেছিস কেন রে লাবণ্য?'

লাবণ্য হাসিমুখে বলল, 'বাবা আমাকে দেখতে এসেছে।'

'ও আচ্ছা। খুব আনন্দ হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'একা একা বাবার কাছে যেতে পারবি, নাকি আমাকে সঙ্গে যেতে হবে?'

'একা যেতে পারব।'

লাবণ্য রেলিং ধরে খুব সাবধানে নামছে। এই সাবধানতা তার নতুন জুতার জন্যে।

আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। লাবণ্যর বাবার গাড়ি এখানে থেকে দেখা যাচ্ছে। গাড়িতে রোগামতো একটি মেয়ে বসে আছে। এই বোধহয় ভদ্রলোকের নতুন স্ত্রী. মেয়েটা মাথায় ঘোমটা দিয়ে বৌ বৌ ভাব নিয়ে এসেছে।

আমি আবার আমার ঘরে ঢুকলাম। আমাদের বিছানায় মুনিয়া উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মুনিয়ার পিঠে হাত দিয়ে বসে আছে রূপা। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই রূপা তীব্রস্বরে বলল, 'প্লিজ লিব আস এলোন।'

এই ইংরেজি বাক্যটির সুন্দর বাংলা কী হবে — 'দয়া করে আমাদের একা থাকতে দাও' — নাকি 'পায়ে পড়ি আমাদের একা থাকতে দাও?'

২

রূপার সঙ্গে কী করে পরিচয় হল সেটা বলি।

আমার ছেলেবেলার বন্ধু সফিক। ভুল বললাম, বন্ধু বলে আমার কেউ নেই। যাদের আমি খানিকটা সহ্য করতে পারি তাদেরই বন্ধু বলার চেষ্টা করি স্কুলে এবং কলেজে যাদের সঙ্গে আমি পড়েছি তাদের মধ্যে একমাত্র সফিককেই খানিকটা সহ্য করতে পারি। তাও সব সময় নয়, মাঝে মাঝে। সে গত বছর ডাক্তারি পাস করেছে। এখনো বেকার। ডাক্তাররাও যে বেকার থাকে তা সফিকের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কোনোদিনও জানতাম না। তাকে ইদানীং দেখায় একজন লেখকের মতো। তার চুল লম্বা। গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে টায়ারের সোল লাগানো স্যান্ডেল। তাকে সারাক্ষণই খুব উত্তেজিত দেখা যায়। এক জায়গায় বসে একটা দীর্ঘ বাক্য সে বলতে পারে না, লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। আবার বসে।

একদিন সফিক এসে বলল, 'চট করে শার্টটা গায়ে দে তো' — কুইক।'

আমি বললাম, 'কেন?'

'পৃথিবীর সবচে' রূপবতী মেয়েটিকে দেখবি। হেলেন অব ট্রয় এই মেয়ের কাছে মাতারি শ্রেণীর।'

আমি চুপ করে রইলাম। হেলেন অব ট্রয় যে মেয়ের তুলনায় মাতারি তাকে দেখার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কেন জানি ইচ্ছা করছে না।

'দেরি করিস না। চট করে কাপড় পর।'

'না।'

'না মানে? আমি ঐ মেয়েকে দেখার জন্য সপ্তাহে একবার করে যেতে পারি, আর তুই একদিন যেতে পারবি না?'

'তুই প্রতি সপ্তাহে যাস?'

'অফকোর্স যাই। ইন্সপাইরেশনের জন্যে যাই। আমি লেখালেখির লাইন ধরব বলে ঠিক করেছি। উপন্যাসের ওয়ান ফোর্থ লিখেও ফেলেছি। রূপাকে পড়ে শোনালাম। রূপা বলল, ব্রিলিয়ান্ট!'

'রূপাটা কে? ঐ রূপবতী?

'হুঁ। চল যাই। আজো খানিকটা পড়ব — তুই শুনতে পারবি।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'উপন্যাস পড়তে বা শুনতে আমার ভালো লাগে না।'

'না লাগলেও চল। একটা রিকোয়েস্ট রাখ। একা যেতে ইচ্ছা করছে না।'

পুরানো ঢাকার যে বাড়ির সামনে নিযে সফিক আমাকে দাড়া কবাল তাব নিতান্তই ভগ্নদশা। রাজকন্যারা এ জাতীয বাড়িতে থাকে না। দোতলা বাড়ি। একতলার সব কটা দরজা-জানালা বন্ধ। একতলাটা মনে হয বসতবাড়ি না, দোকানপাট। একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে — নিউ হেকিমী দাওযাখানা। রেলিংঘেরা উঠানে পিঁয়াজুর দোকান। পিঁযাজু ভাজা হচ্ছে। দোতলায় উঠার সিঁড়ি লোহার। সেই সিঁড়ি যে এতদিনেও ভেঙে পড়ে যায নি কেন কে জানে। শুধু সিঁড়ি না, পুরো বাড়িটাই ছোটখাটো ভূমিকম্পেব জন্য অপেক্ষা কবছে। সিঁড়ির গোড়ায কলিং বেল আছে। সফিক অনেকক্ষণ ধরে কলিং বেল টেপাটিপি কবতে লাগল। বেল বাজছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আমি কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। সফিক হাসিমুখে বলল, 'অনেকক্ষণ ধবে বেল টেপাটিপি কবতে হয।'

বেল বাজাতে বাজাতে সফিক যখন ক্লান্ত হযে পড়ল তখন ন দশ বছবেব একটি ছেলে নামল। যাকে দেখেই মনে হল অসুস্থ। চোখ-মুখ ফোলা।

'কাবে চান?'

'রূপা আছে? আমরা রূপাব বন্ধু।'

'নাম কি?'

'আমার নাম বললেই হবে। গিযে বল সফিক।'

আমরা দোতলায উঠলাম না। একতলার বাবান্দায দাঁড়িযে রইলাম। সফিক বলল, 'একতলায রূপার নিজেব একটা ড্রযিং রুম আছে। খুব সুন্দব কবে সাজানো। টেলিফোন আছে, টিভি, ভিসিআর সবই আছে। রূপাব বাবা মেযেব যা লাগে সব দিযে বেখেছেন।'

'এটা তাহলে রূপাদের বাড়ি না?'

'আরে না। এটা রূপাব এক চাচাব বাড়ি।'

'তাদেব নিজেদেব বাড়ি নেই?'

'আছে। সেই বাড়ি সারা বছর তালাবন্ধ থাকে। রূপাব বাবা এক বছবে এগাব মাস থাকে বাইরে। একটা মেযে তো আর একা একা থাকতে পাবে না।'

'এগাব মাস বাইরে কী কবে?'

'ব্যবসা-ট্যবসা কবে বোধহয। বাবার সঙ্গে মেযেব সম্পর্কও ভালো না। অবশ্যি আমার আন্দাজ। আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নি।'

অন্য একটা ছেলে এসে একতলাব একটা রুম খুলে দিল। সফিকের কথাই সত্যি। গা ছমছমানো ড্রযিং রুম। সেখানেব সাজসজ্জা এমন যে কিছুতেই পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি বসা সম্ভব না। পুরো দেয়াল জুড়ে অনেক পেইনটিং। সবই বিদেশি ল্যান্ডস্কেপ। চেরী গাছ, সামার হাউস, স্নোফল . . .

সফিক বলল, 'ছবিগুলো দেখছিস?'

'হুঁ।'

'ভালো করে দেখে রাখ, পরে এই সম্পর্কে বলব। মনে কবিয়ে দিস। আজকাল কিছু মনে থাকে না। প্রাযই ব্রেইন শর্ট সার্কিট হয়ে যায।'

আমরা বসে আছি। সফিক নিচু গলায় বলল — 'রূপা যদি সত্যি সত্যি নেমে আসে, তাহলে ট্যাবা হয়ে যাবি। আই ডিফেক্ট হয়ে যাবে। এরকম মেয়ে চোখে দেখতে পাওযাও বড় ধরনের অভিজ্ঞতা। তবে নেমে আসে কিনা সেটাও একটা কথা। মাঝে মাঝে মেজাজ খারাপ থাকে। তখন দোতলা থেকে নামে না।'

আমি বললাম, 'এতো বিরাট অপমানের ব্যাপাব!'

সফিক বলল, 'দূব দূব, অপমানেব কিছু না। রূপার স্বভাবই এবকম। পবিচয হলেই তুই বুঝবি।'

'যখন দেখা করে না, তখন কী কবিস?'

'চা-টা খেযে চলে যাই। কী আব কবব। রূপাব একটা ভালো গুণ কি জানিস? কেউ তার সঙ্গে দেখা কবতে এলেই চা দিতে বলে। দেখা করুক আব না করুক। চাযেব সঙ্গে সমুচা থাকে। অপূর্ব! ববীন্দ্রনাথেব ছোটগল্পেব মতো। শেষ হযেও শেষ হয না, জিভে স্বাদ লেগে থাকে।'

'মেযেটা দেখা কবে না। তাবপবেও তুই এখানে আসিস?'

'হুঁ। এত সুন্দব মেযে, খানিকক্ষণ কথা বললে মনটা ভাল হয়ে যায। তাই আসি। এখানে এলে লেখাব একটা ইন্সপিবেশন হয। লেখকদেব জন্যে ইন্সপিবেশন খুব দরকার ইন্সপিবেশনেব জন্যে একজন লেখক যা ইচ্ছা কবতে পাবে। ইট ইজ অ্যালাউড।'

রূপা নামল না। তবে একজন কাজেব ছেলে ট্রেতে কবে চা এবং সমুচা নিয়ে এল সফিক বলল, 'তোকে বলেছিলাম না চা চলে আসবে। অবশ্যি এটা খাবাপ সাইন। তার মানে রূপা নামবে না। চা খা। চা খেযে চলে যাব। এই সমুচাগুলো এ বাড়িব স্পেশাল ভেবি ভেবি গুড। খেযে দেখ।

চা শেষ কববাব আগেই রূপা নেমে এল। আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে বইলাম। জীবনে এত অবাক হই নি। মানুষ এত সুন্দব হয! সফিক নিচু গলায় বলল, 'বলেছিলাম না ট্যাবা হয়ে যাবি? এইভাবে তাকিয়ে থাকিস না, চোখে লাগছে। খুব ক্যাজুয়েলি তাকিয়ে থাক। যেন কিছুই না।'

রূপা সফিকেব দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোনো কাজে এসেছেন, না চা সমুচা খাবাব জন্যে এসেছেন?'

'কাজে এসেছি।'

'বলে ফেলুন। আমি খুব বেশিক্ষণ সময দিতে পাবব না।'

সফিক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি আমাব এই বন্ধুকে বলেছিলাম — এমন একজন মেযেব কাছে তাকে নিয়ে যাব যাকে দেখলেই তাব চোখ ট্যাবা হয়ে যাবে।'

রূপা আমাব দিকে তাকিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'আপনাব চোখ কি ট্যাবা হয়েছে?'

আমি কিছু বললাম না। তাকিয়ে বইলাম।

মেযেটি সফিকেব কথায় মোটেও বিব্রত বোধ কবছে না। আমাব দিকে তাকিয়ে আছে অসঙ্কোচে। সে আমাব দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বলল, 'আচ্ছা আপনি কি কবি?'

আমি বললাম, 'না।'

'বাঁচালেন। কবি হলে খানিকটা সমস্যা হত।'

বলেই সে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা কবতে লাগল। আগ্রহেব কাবণ, সে অপেক্ষা কবছে আমি জিজ্ঞেস করব -- কী সমস্যা? আমি তা কবলাম না। রূপা বলল, 'কী সমস্যা

জানেন? কবি হলেই পরের দিন আপনি আবার আসতেন, পকেটে থাকত কবিতা। সেই কবিতা আমাকে নিয়ে লেখা। আমাকে শান্তমুখে সেই কবিতা শুনতে হত। এবং আবেগজর্জরিত কবিকে সমুচা খাওয়াতে হত। আপনি কি সমুচা খেয়েছেন?'

'হুঁ।'

'কেমন লাগল?'

আমি জবাব দিলাম না। রূপা বলল, 'সফিক সাহেবের মতে সমুচাগুলো রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মতো। আমি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়ি নি, কাজেই বলতে পারছি না ব্যাপারটা কী? আপনি পড়েছেন?'

'একটা পড়েছি।'

'শুধুই একটা?'

'হুঁ, হৈমন্তী। পাঠ্য ছিল।'

সফিক সিগারেট ধরাতে ধবাতে বলল, 'মজার ব্যাপার কি জান? হৈমন্তী গল্পটা বঞ্জুর মুখস্থ। দাঁড়ি সেমিকোলনসহ।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ, সত্যি। তাব যখন কিছু পছন্দ হয় সে মুখস্থ করে ফেলে। সে রবীন্দ্রনাথেব একটা গল্প পড়েছে, কিন্তু সেটা তার মুখস্থ।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না — সত্যি?'

আমি জবাব দিলাম না। সফিককে বললাম, 'চল উঠি।'

রূপা আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল, 'এখনই উঠবেন কি। বসুন। আবেক কাপ চা খান। হৈমন্তী গল্পটা মুখস্থ বলুন। প্লিজ। প্লিজ। বাসায় গল্পগুচ্ছ আছে, আমি বই নিযে মিলিযে দেখব। যদি সত্যি সত্যি পারেন তাহলে...'

'তাহলে কী?'

রূপা হাসতে হাসতে বলল, 'তাহলে আপনার জন্য একটা প্রাইজ আছে।'

সফিক বলল, 'ও পাঁববে, ওব স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ভালো। আমার ববাববই খাবাপ ছিল। এখন আরো খারাপ হযেছে। প্রাযই ব্রেইন শর্ট সার্কিট হযে যায।'

রূপা গল্পগুচ্ছ নিযে এল। হৈমন্তী গল্প বাব কবা হল। আমি রূপাব মুখেব দিকে তাকিয়ে গড়গড় করে বলে যেতে লাগলাম — 'কন্যাব বাপ সবুব কবিতে পাবিতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহেব বযস পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো বকমে চাপা দিবাব সময়টাও পাব হইযা যাইবে। মেযেব বযস অবৈধ বকমে বাড়িযা গেছে বটে। কিন্তু পণেব টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো কিঞ্চিৎ উপবে আছে, সেই জন্যেই তাড়া। ....'

রূপা বলল, 'থামুন। আপনি ভুল কবেছেন — 'এখনো তাহাব' এই দুটা শব্দ বাদ পড়েছে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণেব টাকাব আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপবে আছে, সেই জন্যেই তাড়া।'

আমি চুপ করে গেলাম। রূপা বলল, 'থামলেন কেন?'

আমি বললাম, 'আজ আর ইচ্ছা করছে না। আবেকদিন।'

রূপাদের বাড়ি থেকে বেব হযেই সফিক বলল, 'কী, আমাব কথা ঠিক হযেছে? দেখেছিস এমন রূপবতী মেয়ে?'

আমি বললাম, 'না, দেখি নি।'

'মেয়েটার চোখ নীল, তা লক্ষ করেছিস?'

'হু।'

'চোখ নীল কেন বল তো?'

'আমি কী কবে বলব?'

'রূপাব মা হচ্ছেন লেবানিজ মেয়ে। মেয়ে তাব মাব রূপ পেয়েছে। চোখ এই কারণেই নীল। ড্রয়িং রুমে যে সব ছবি দেখেছিস, সবই ওব মাব আঁকা।'

রূপাব সঙ্গে পবিচয়ের এই হচ্ছে শুরু। রূপাব চাচাব সঙ্গে কথা হয়েছে। ভদ্রলোক বোবট জাতীয। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, কিছুক্ষণ পব খুব দ্রুত খানিকক্ষণ চোখ পিটপিট কবেন, তাবপব আবাব তাকিয়ে থাকেন। কথাবার্তা বলেন না, বললেও এক অক্ষবে সীমাবদ্ধ থাকে। রূপা যখন বলল, 'চাচা, ইনাব নাম রঞ্জু।'

বোবট চাচা বললেন, হুঁ।

'উনি হলেন সফিক সাহেবেব বন্ধু। সফিক সাহেবকে তো তুমি চেন, চেন না?'

'হুঁ।'

'ঠিক আছে চাচা, তুমি এখন যাও। এবা দুজন এসেছেন ভিসিআরে একটা ছবি দেখতে — অ্যামেডিউস।'

'হুঁ।'

আমি বললাম, 'এই যে আমবা প্রাযই আসি আপনাব চাচা বিরক্ত হন না?'

'অবশ্যই হন। তবে বিবক্ত হলেও কিছু বলেন না, কাবণ আমাকে তাব বাড়িতে বাখাব জন্য তিনি মাসে দশ হাজাব কবে টাকা পান এবং বাবা তাঁকে বলে দিয়েছেন — আমাকে যেন আমাব মতো চলতে দেযা হয। চাচাব ভযঙ্কব মানসিক কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তিনি আমাকে আমাব মতো চলতে দিচ্ছেন।'

মোট কবাব গিয়েছি রূপাদেব বাড়িতে? অনেকবাব। তবে কখনো একা যাই নি। সব সময সফিক সঙ্গে ছিল। এবং মজাব ব্যাপাব হচ্ছে প্রতিবাবই রূপা বলেছে — 'দেখি আপনাব স্মৃতিশক্তি কেমন, হৈমন্তী গল্পটা আবাব বলুন তো। আমি মিলিয়ে দেখি। একটা না একটা ভুল আপনি প্রতিবারই কবেছেন। যেদিন কোনো ভুল কববেন না সেদিন আপনার জন্যে পুবস্কাব আছে।'

'কী পুবস্কাব?'

'তা বলব না। তবে খুব ভালো পুবস্কার। যা আপনি কখনো কল্পনাও করেন নি।'

সফিককে বাদ দিয়ে একবাব আমি গেলাম একা। আমাকে একা দেখে রূপা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল।

'কী ব্যাপার, একা যে! বন্ধু কোথায?'

আমি বললাম, 'ব্যক্তিগত প্রযোজনে এসেছি, কাজেই একা।'

রূপা আগেব চেয়েও বিস্মিত হযে বলল, 'কী প্রযোজন?'

'হৈমন্তী গল্পটা ভুল ছাড়া আপনাকে শোনাব।'

'ও আচ্ছা।'

'গল্পগুচ্ছ নিয়ে আসুন।'

'গল্পগুচ্ছ আনতে হবে না। আজ যে আপনি ভুল কববেন না তা আপনার চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। আপনাকে একটা চমৎকাব পুবস্কাব দেব বলেছিলাম। তা দিতে আমি প্রস্তুত আছি। পুবস্কারটা কী আপনি কি আন্দাজ কবতে পাবেন?

'না, আমি আন্দাজ করার চেষ্টাও কবি নি। কাবণ আপনি বলেছিলেন পুবস্কাবটা কী তা আমি কল্পনাও কবতে পারব না।'

রূপা বলল, 'কিছু কল্পনা তো তারপরেও করেছেন। করেন নি?'

'না।'

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

'বসুন চা খাই আগে, তারপর কথা হবে। আমি যে একটা সিনেমা করছি তা কি আপনি জানেন?'

'জানি — সফিক বলেছে। সজনে ফুল।'

'আজ সেই ছবির কিছু কাজ হবে বুড়িগঙ্গা নদীতে। বিকেল তিনটা থেকে শিফট। আপনি কি যাবেন?'

'না।'

'না কেন?'

'অনেক লোকজন সেখানে থাকবে। এত লোকজন আমাব ভালো লাগে না।'

'কি জন্যে লোকজনদেব ভিড় আপনার ভালো লাগে না? লোকগুলোকে আপনাব কি বোকা মনে হয়, না বেশি বুদ্ধিমান মনে হয?'

'বোকা মনে হয।'

রূপা হেসে ফেলল। নিজেই চা নিযে এল। টি পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বলল, আপনাকে যেমন বলেছি — 'এমন সুন্দব একটা উপহাব দেব যা আপনি কল্পনাও কবতে পারবেন না।' সে বকম কথা আমি অন্য পুরুষ মানুষদেরও বলেছি। এটা বললে পুরুষদেব মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হয। এই পবিবর্তন দেখতে আমার ভালো লাগে।'

'কাউকে কি পুবস্কাব দিযেছেন?'

'না। বাজি এমন বিষযে ধরি যা পূবণ কবা সম্ভব না। মুতালেব নামে আমাব একজন বন্ধু আছে, তাকে একটা অঙ্কেব ধাঁধা দিযেছি। সে এক বছব ধবে সেই ধাঁধাব জবাব বেব করার চেষ্টা কবছে — বিশেষ পুবস্কাবেব আশায, যে পুবস্কাবটা কী তা সে জানে না।'

'বের কবতে পারে নি?'

'কোনোদিন পারবেও না। এই ধাঁধাটাব কোনো উত্তব নেই। তবে আপনি পাববেন। আপনাব চোখ-মুখ দেখেই মনে হচ্ছে আপনি তৈরি হযে এসেছেন। তবে আজ হাতে একেবারেই সময নেই। কোনো একদিন আপনাকে খবর দেব। বাসায কি আপনাব টেলিফোন আছে? থাকলে নাম্বাবটা রেখে যান।'

তারপর এক দিন অদ্ভুত এক ব্যাপাব হল। দুপুবে ঘুমিযে আছি — মুনিযা এসে ডেকে তুলল, টেলিফোন। আমি বিবক্ত হযে বললাম, 'ঘুমোচ্ছি বলতে পাবলি না?'

'দিনে তো তুই কখনো ঘুমাস না। কাজেই ভাবলাম বোধহয মটকা মেবে পড়ে আছিস।'

'কে টেলিফোন কবেছে?'

'নাম জিজ্ঞেস কবি নি, তবে গলাব স্বব অসম্ভব মিষ্টি। আমি এবকম মিষ্টি গলাব স্বব এব আগে শুনি নি।'

আমি টেলিফোন ধরতেই ওপাশ থেকে রূপা বলল, 'আপনাব কি ইস্ত্রি কবা পাঞ্জাবি আছে? সাদা পাঞ্জাবি?'

'কেন?'

'আছে কিনা বলুন।'

'আছে।'

'পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে চলে আসতে পারবেন?'

'পারব, কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'আপনাকে বিয়ে করতে হবে।'

'বিয়ে করতে হবে মানে ?'

'অসহায় একজন তরুণীকে উদ্ধার করতে হবে। কিছু গুণ্ডাপাণ্ডা ধরনের ছেলে জোর করে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছে। তাদের একজন মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম,'কী বলছেন আপনি, এই যুগে এটা কি সম্ভব?'

'এই যুগেই সম্ভব। অন্য যুগ হলে সম্ভব ছিল না।'

'পুলিশে খবর দিতে বলুন।'

'পুলিশে খবর দেয়া হয়েছিল। পুলিশ ছেলের নাম শুনে পিছিয়ে গেছে। পুলিশ বলছে, এখনো তো কিছু ঘটে নি। ঘটলে দেখা যাবে। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে তো আমরা অ্যাকশান নিতে পারি না। এখন আপনি ভরসা।'

'আপনার কী করে ধারণা হল আমি অসহায় তরুণীদের উদ্ধারের ব্রত নিয়েছি?'

'তরুণীর নাম শুনলে আপনি খুব আগ্রহ করে এই ব্রত নেবেন বলে আমার ধারণা।'

'কি নাম?'

'তার নাম রূপা।'

আমি প্রথমে ভাবলাম এটা নিশ্চয়ই রূপার কঠিন কোনো রসিকতার একটি। তারপর মনে হল রূপা তো কখনো রসিকতা করে না। অন্যের রসিকতায় খিলখিল করে হাসে — নিজে তো কখনো করে না। রূপা তরল গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে কথা শুনে পাথর হয়ে গেছেন?'

'বুঝতে চেষ্টা করছি।'

'শুনুন, খুব মন দিয়ে শুনুন। আমার তালিকায় তিনটি নাম আছে। আপনি হচ্ছেন দুনম্বর। প্রথম জনকে টেলিফোনে পাই নি, ওদের টেলিফোন নেই। কাজেই আপনাকে টেলিফোন করলাম। আপনার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যে আপনাকে পেয়ে গেলাম। আপনি যদি রাজি না থাকেন, স্পষ্ট গলায় বলে দিন। আমি তৃতীয় জনকে টেলিফোন করব।' —

'ঠাট্টা করছেন?'

'না, ঠাট্টা করছি না।'

'প্রথম জনের নাম কি?'

'প্রথম জনকে আপনি চেনেন না। প্রথমজনের নাম জেনে কোনো লাভ নেই। তৃতীয় জনকে চেনেন, কিন্তু তার নামটা বলতে চাচ্ছি না। আপনাকে চিন্তা করার জন্য আধঘণ্টা সময় দিলাম। যদি রাজি থাকেন তাহলে আধঘণ্টা পর আমাদের বাসায় চলে আসবেন।'

'বিয়ে কি আপনাদের বাসায় হবে?'

'তা কী করে হয়! আমাদের বাসার চারদিকে মস্তান ঘুরঘুর করছে। সন্দেহ হলেই ককটেল ফোটাবে। ব্রাশ ফায়ার করবে।'

'সত্যি বলছেন?'

'এক রত্তি বানিয়ে বলি নি। আপনি যদি রাজি থাকেন চলে আসুন। আমি ইতিমধ্যে পুলিশকে টেলিফোন করছি। পুলিশের এক এআইজি আছেন বাবার বন্ধু। তাঁকে বলব — চাচা, আমাদের বিয়ে দিয়ে দিন।'

'আপনার বাবা? উনি কোথায়?'

'বাবা ইংল্যান্ডে। তাঁর সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছে।'

'উনি কি রাজি?'

রূপা হাসতে হাসতে বলল, 'আমি তো তাঁর কোনো মতামত চাই নি। ঘটনা বলেছি — এখন বলুন আপনি কি রাজি?'

'আমি রাজি আছি।'

'এত চট করে রাজি হবেন না। আধঘণ্টা সময় নিন। রাখি, কেমন?'

পুলিশের উপস্থিতিতে বিয়ে হল রূপার চাচার বাসায়। বিয়ের পর পুলিশের জিপে করেই আমরা বেরুলাম।

রূপা বলল, 'এখন থেকে তোমাকে তুমি করে বলব। শোন, আমার কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে, টুথব্রাশ, চিরুনি, ঘরে পরার শাড়ি। তোমার কাছে কি টাকা আছে?'

'না।'

'অসুবিধা নেই। আমার কাছে আছে। নতুন স্বামীরা স্ত্রীর টাকায় কিছু কিনতে চায় না বলেই জানতে চেয়েছি।'

'আমাকে নিয়ে তুমি সরাসরি তোমার বাসায় তুলবে?'

'হুঁ।'

'অসুবিধা হবে না তো? চিন্তা করে দেখ।'

'অসুবিধা হবে না।'

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে অসুবিধা হবে। তুমি বরং টেলিফোনে আগে কথা বলে নাও। ওরা খানিকটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে থাক।'

'টেলিফোন করার দরকার নেই।'

রূপাকে নিয়ে বাসায় উপস্থিত হলাম রাত আটটার দিকে। রূপার বাবার বন্ধু এআইজি খালেকুর রহমান পুলিশের জিপে আমাদের নামিয়ে দিলেন।

রাত সাড়ে নটায় বাবার একটা মাইল্ড স্ট্রোক হল। আমার বাসর রাত কাটল সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে।

আমি একা না, বাবুও সঙ্গে হাঁটছে। তাকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে। ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছে। বড় ভাই হিসেবে সে আমাকে খানিকটা সমীহ করত, সামনে সিগারেট খেত না। আজ সে সব কিছুই বোধহয় মনে নেই। তবে আমার ধারণা, বাবাকে নিয়ে সে যতটা না চিন্তিত তার চেয়েও বেশি চিন্তিত যে আজ রাতটা নষ্ট হল। রাতটা কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু সে নিশ্চয়ই পড়ে ফেলত নন নিউটোনিয়ান ফ্লো না কি যেন বলে ঐ সব।

'দাদা।'

'হু।'

'বিরাট ঝামেলা হয়ে গেল মনে হচ্ছে।'

'পড়াশোনার ক্ষতির কথা বলছিস?'

'সেই ঝামেলা তো আছেই। অসুখ-বিসুখ, হাসপাতাল-বাসা ছোটাছুটি। তার উপর তুমি আবার হুট করে বিয়ে করে ফেললে। ঐ নিয়ে বাড়িতেও নিশ্চয় টেনশন থাকবে।'

'তা কিছুটা থাকবে।'

বাবু সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'তুমি এই ঝামেলাটা আমার পরীক্ষার পরে করলেও পারতে। মারাত্মক একটা ডিসটার্বেন্স হবে পড়াশোনায়। ভাবী নিশ্চয়ই ছাদে ঘুরঘুর করবে। মেয়েদের একটা টেনডেনসিই থাকে ছাদে যাওয়া। কারণে অকারণে ছাদে যাবে।'

'আমি নিষেধ করে দেব।'

'ইমমেডিয়েটলি কিছু বলার দরকার নেই। কয়েকটা দিন যাক। বাবার অবস্থা তোমার কী রকম মনে হচ্ছে?'

'এ যাত্রা টিকে যাবেন বলে মনে হয়।'

বাবু শুকনো মুখে বলল, 'সব কটা ঝামেলা পরীক্ষার আগে শুরু হল। ধর ভালো-মন্দ কিছু যদি হয়, তাহলে এক মাস আর বই নিয়ে বসা যাবে না। আত্মীয়স্বজন.... বিশ্রী অবস্থা হবে .... আজকের পুরো রাতটা নষ্ট হল। কাল দিনটাও নষ্ট হবে।'

'কাল দিনটা নষ্ট হবে কেন?'

'রাত দুটা থেকে ভোর সাড়ে সাতটা — এই সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা না ঘুমোলে দিনে পড়তে পারি না। মাথা জাম হয়ে থাকে। এখন বাজে তিনটা। এক ঘণ্টা তো চলেই গেল। বিরাট সমস্যা।'

'সমস্যা তো বটেই।'

'আমরা এখন কী করব? বাকি রাত হাসপাতালের বারান্দাতেই হাঁটাহাঁটি করে কাটাব?'

'হুঁ।'

বাবু বিরক্ত মুখে বলল, 'আমরা হাঁটাহাঁটি করে তো বাবাকে কোনো ভাবে হেল্প করতে পারছি না। লাভটা কী হচ্ছে?'

'তুই কি চলে যেতে চাচ্ছিস?'

'আমি চলে গিয়েই বা করব কী? বাসায় ফিরতে ফিরতে ধর রাত সাড়ে তিনটা বেজে যাবে ... তারপর কি আর রেস্ট নেবার সময় থাকবে?'

আমি বললাম, 'চল চা খেয়ে আসি। হাসপাতালের আশপাশে চায়ের দোকান সারা রাত খোলা থাকে।' বাবু বিরস মুখে বলল, 'চল।'

চা খেতে খেতে বাবু বলল, 'মুনিয়া বলছিল, তুমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছ সে নাকি দারুণ রূপবতী।'

'তুই এখনো দেখিস নি?'

'না। ভাবীকে নিয়ে তুমি যখন এলে তখন আমি ফ্রি পার্টিকেল প্রবলেম সলভ করছিলাম — নিচে নামতে ইচ্ছা করল না।'

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, 'প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার উপকারিতাটা কী তুই আমাকে বল তো দেখি।'

বাবু বিস্মিত মুখে বলল, 'তোমার কথা কিছুই বুঝলাম না। ঠিক কী জানতে চাচ্ছ বুঝিয়ে বল তো।'

'বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। কথার কথা। চল খোঁজ নিয়ে দেখি। বাবার কী অবস্থা?'

বাবার অবস্থা ভালোই। বাবা সামলে উঠেছেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'হার্টের কিছু না। হঠাৎ ব্লাড প্রেসার সুট করেছে, তাই এ অবস্থা।'

বাবার কথা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ, তবু তিনি ক্ষীণ গলায় আমাকে বললেন, 'এই কাজটা তুই কী করে করলি? সাদা চামড়া দেখে সব ভুলে গেলি? কী আছে সাদা চামড়ায়? বল তুই, কী আছে?'

'কিছু নেই।'

'সুন্দর চেহারা? কী হয় সুন্দর চেহারায় তুই বল।'

'কিছুই হয় না।'

'তাহলে কী মনে করে তুই এই কাজটা করলি? কী জানিস তুই এই মেয়ে সম্পর্কে?'
'বিশেষ কিছু জানি না।'
'মেয়ের বাবা — উনি করেন কী?'
'বলতে পারছি না। ব্যবসা-ট্যবসা করেন বোধহয়।'
'উনার নাম কি?'
'নাম জানি না। কখনো জিজ্ঞেস করি নি। রূপাকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে বলব।'
বাবা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৩

আমাদের বারান্দায় দুটি ইজিচেয়ার ছিল। দুটি ইজিচেয়ারের একটি আমি আমার ঘরে নিয়ে এসেছি। বিয়ের পর আমার শোবার ঘরের পরিবর্তনের মধ্যে এই পরিবর্তনটা হয়েছে। ও আচ্ছা, আরেকটা পরিবর্তন হয়েছে — ইজিচেয়ারের পাশে বড় একটা টেবিল ল্যাম্প। এই টেবিল ল্যাম্প রূপাদের বাড়ি থেকে এসেছে। রূপার বাবা দেশে ফিরেই তাঁর কন্যার ব্যবহারী শাড়ি, গয়না, কিছু ফার্নিচার একটা পিক আপ ভর্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে আধ পৃষ্ঠার একটা চিঠি। ব্যক্তিগত চিঠি — তাঁর কন্যাকে লেখা। আমার পড়ার কথা না, পড়া উচিতও না। যেহেতু চিঠি দু দিন ধরে আমার টেবিলে পড়ে আছে কাজেই আমি পড়েছি।

মা রূপা,

তোমার শাড়ি, গয়না, পাস বই, চেক বই পাঠালাম। ছোট সুটকেসটায় কসমেটিকস। তোমার ড্রেসিং টেবিলে যা পেয়েছি সবই দিয়ে দিয়েছি। কাজগুলো দ্রুত করতে হয়েছে, কারণ আমি আবার মাস তিনেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি।বাড়ি তালাবদ্ধ থাকবে। চাবি তোমার রহমান চাচার কাছে থাকবে। প্রয়োজনে তার কাছ থেকে নিতে পার। তবে তাকে পাওয়া এক সমস্যা। তোমার ব্যবহারী জিনিসপত্র তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, তার মানে এই নয় যে হুট করে তুমি যে কাণ্ডটি করেছ তা ক্ষমা করা হয়েছে। তোমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল, তার থেকে বাঁচার জন্যে 'বিয়ে' নামক ব্যাপারটি ব্যবহার করেছ। বিয়ে সমস্যা থেকে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা নয়। তোমার মাও সমস্যা এড়াবার জন্যে আমাকে বিয়ে করে অনেক বড় সমস্যা তৈরি করেছিলেন। আমি দুঃখিত হয়ে লক্ষ করছি, তোমার মা যেসব ভুল তার জীবনে করেছিল, তুমিও একে একে তাই করতে যাচ্ছ। তোমার মা এক একটা ভুল করত, আর সেই ভুলকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার হাস্যকর চেষ্টা করত। তুমিও হয়তো তাই করবে। যে ছেলেটিকে তুমি ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করলে সে কেমন ছেলে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তুমিই ভালো বলতে পারবে। তার সঙ্গে দুদিন আমার দেখা হয়েছে। সামান্য কথা হয়েছে। আমার কাছে তাকে নির্বোধ বলে মনে হয়েছে। কে জানে, হয়তো নির্বোধ ছেলেই তোমার কাম্য।

ভালো থাক, এই শুভ কামনা। সব বাবার মতো আমিও তোমার মঙ্গল কামনাই করছি। তোমার বাইশ বছরের জীবনে আমি তোমার প্রতি ভালবাসার কোনো অভাব দেখাই নি। আমাকে তোমার অসহ্য বোধ হয়েছে জানার পর আমি তোমাকে অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তোমার মার মৃত্যুর পর আমি অনায়াসে আরেকটি বিয়ে

করতে পারতাম। তা করি নি। তোমার অযত্ন হবে, অবহেলা হবে, এই ভেবেই করি নি। তুমি আমার সেই ভালবাসা তুচ্ছ করেছ। এই স্বভাবও তুমি পেয়েছ তোমার মা'র কাছ থেকে। তোমার মা বেঁচে থাকলে হয়তো সে বলত — রূপা, তুমি যা করেছ ভালোই করেছ। আমি তা বলতে পারছি না। যাই হোক, শেষ কথাটি বলছি — আমার বাড়ির দরজা তোমার জন্যে সব সময় খোলা থাকবে, তোমার সব আশ্রয় নষ্ট হবার পর যদি ফিরতে ইচ্ছা করে ফিরতে পারবে।

তোমাব বাবা।

প্রথমে ভেবেছিলাম, রূপা ইচ্ছা করেই এই চিঠি টেবিলে ফেলে বেখেছে যাতে আমি পড়তে পাবি। সেই ধাবণা ঠিক না। রূপার স্বভাবই হচ্ছে এলোমেলো অগোছালো। গোসলখানায় গোসল করতে গিয়ে সে গলাব হার খুলে রেখে এসেছিল। মুনিয়া তাতে খুব হৈচৈ করছিল। রূপা অবাক হয়ে বলেছে — 'সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত হৈচৈ কেন?' মুনিযা বলল, 'ঘরে তিনটা কাজেব লোক, যদি চুবি হত?' রূপা বলল, 'চুবি হলে কি আব কবা। এমনিতেও তো অনেক সময হারায। হঠাৎ গলা থেকে খুলে পড়ে।'

'দামি একটা হার হঠাৎ গলা থেকে খুলে পড়বে?'

'দামি হার গলা থেকে খুলে পড়তে পাববে না এমন কোনো আইন তো নেই মুনিযা। মানুষ পর্যন্ত হাবিযে যায, আব সামান্য গলাব হাব।'

মুনিযাব ধাবণা, এসব হচ্ছে রূপাব চালবাজি কথা। আমি জানি চালবাজি কথা না। সে যা ভাবছে তাই বলছে। মন বেখে কথা বলাব বিদ্যা এখনো বোধহয শিখে উঠতে পাবে নি।

আমি ইজিচেযাবে বসে আছি। হাতে গতকালকেব পত্রিকা। পত্রিকা বেখেছি পড়াব জন্যে না। মুখ আড়াল কবে রাখাব জন্যে। মুখ আড়াল করে আমি রূপাব কথা শুনছি।

রূপা লাবণ্যেব সঙ্গে লুডু খেলতে খেলতে কথা বলছে। ভাঙা ভাঙা কথা, যা একমাত্র ছোটদের সঙ্গেই বলা যায।

'লাবণ্য সোনা, এই নাও চাব চাললাম। ওযান টু থ্রি ফোব। তোমাব দুই হযেছে, তুমি দুই চালবে। উহু, তুমি উল্টোদিকে চলেছ। সব খেলাব নিযম আছে। যে খেলাব যে নিযম সেই খেলা সেই ভাবে খেলতে হয। উল্টো খেলা যায না। আমি কী বলছি তুমি কি বুঝতে পাবছ লাবণ্য?'

'পারছি।'

'ভেবি গুড। ছোটবা খুব সহজে জটিল জিনিস বোঝে। বড়রা বুঝতে চায না। বুঝিযে দিলেও ভাব কবে যে বোঝে নি। ছোট থাকাই ভালো। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি ছোট থাকতে চাও?'

'চাই।'

'কিন্তু ছোট থাকাব সমস্যাও আছে। ছোটবা নিজেদেব পছন্দমতো জিনিস কখনো পায না। তাদের চলতে হয বড়দের পছন্দে। যেমন ধর, আমি এখন চা খাব। তুমি খাবে না।'

'আমিও পিবিচে ঢেলে চা খাব।'

'আচ্ছা, দেয়া হবে। যাও, চায়ের কথা বলে আস।'

লাবণ্য চায়ের কথা বলতে উঠে গেল। রূপা আমাব দিকে তাকিযে বলব, 'গতকাল সন্ধ্যায তোমাব ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথা হল। ছাদে গিযেছিলাম, সে বীতিমতো ধমক দিল — গাল ফুলিযে বলল, এখানে কী করছেন?'

আমি বললাম, 'হাঁটছি।'

সে বলল, সন্ধ্যাবেলা হাঁটছেন কেন?

আমি বললাম, সন্ধ্যাবেলা হাঁটা কি নিষিদ্ধ?

'ছাদে হাঁটা নিষেধ। আমার ডিসটার্ব হয়। পড়াশোনা করছি — এক মাসও নেই পরীক্ষার। ছাদে কেউ এলেই আমি ডিসটার্বড ফিল করি।'

আমি বললাম, 'আমি ছাদে হাঁটতে এসেছি, আপনি পড়ছেন — এতে আমিও ডিসটার্বড ফিল করছি। ঠিকমতো হাঁটতে পারছি না। আপনি বরং এক কাজ করুন, বই নিয়ে নিচে চলে যান, আমার হাঁটা শেষ হলে আবার আসবেন।'

আপনি আমাকে আপনি করে বলছেন কেন? আমি মুনিয়ারও ছোট।

ও আচ্ছা। বুড়োদের মতো দেখাচ্ছে বলে আপনি বলছি। আমি ভেবেছিলাম তুমি সবার বড়।

আমার গত ডিসেম্বরে ২৫ হয়েছে।

ডিসেম্বরের কত তারিখ?

'২৩শে ডিসেম্বর।'

'ঠিক আছে, পড়াশোনা করতে থাক, আমি নিচে যাই।' এই বলে আমি নিচে চলে এলাম। তোমরা ছিটগ্রস্ত পবিবার। তোমার ভাইয়েরও তোমাব মতো ব্রেইন এলোমেলো।'

আমি বললাম, 'আমার ব্রেইন কি এলোমেলো?'

'হ্যাঁ। এক ঘণ্টা ধরে বাসি একটা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধরে আছ। সাবাক্ষণ দেখি ইজিচেয়ারটায বসে আছ। কী আছে এই চেযারটায?'

'কিছু নেই।'

'তাহলে বসে থাক কেন?'

'বসে থাকতে ভালো লাগে, তাই বসে থাকি।'

'তোমার এই উত্তর আমাব পছন্দ হযেছে। যা করতে তোমার ভালো লাগে তা অবশ্যই করবে। কে কি·বলছে বা বলছে না, তা নিযে মাথা ঘামাবে না। কারণ একটা জিনিস মনে রাখবে — তুমি আছ বলেই এই পৃথিবী টিকে আছে। তুমি নেই পৃথিবীও নেই।'

'আমার কাছে নেই। অন্যের কাছে তো আছে।'

'অন্যের কাছে থাকলে তোমার কী? তোমাব কিছু যাচ্ছে আসছে না। শোন, তোমাব যা ভালো লাগে তুমি করবে। আমি কখনো বাধা দেব না। ঠিক একইভাবে আমি আশা করব আমি যা করব তা আমাকে করতে দেবে। বাধা দেবে না। এই একটা ব্যাপাব ঠিক করে নিলে আমাদের কখনো কোনো সমস্যা হবে না।'

'এইসব কথা তুমি কি তোমার মার কাছে শিখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কি সব সময় তোমাকে উপদেশ দিতেন?'

'মোটেও উপদেশ দিতেন না। তিনি তাঁর সব উপদেশ একদিন দিলেন। তাঁর উপদেশ দেয়ার ভঙ্গি ছিল অসাধারণ। শুনতে চাও?'

'চাই।'

'আমার তখন বযস বার। ঘুমোচ্ছি। রাত দুটার মতো বাজে। মা এসে আমাকে ডেকে তুললেন। আমি বললাম, কী ব্যাপার? মা বললেন — কফি খাবার জন্য ডাকলাম। আমি বললাম, রাত-দুপুরে কফি খাব কেন? মা বললেন, রাত-দুপুরে কফি খাওয়া যাবে না, এমন তো কোনো কথা নেই লিটল ডার্লিং।

আমি মার সঙ্গে কফি খেলাম। দুজন খানিকক্ষণ বারান্দায় হাঁটলাম। মা আমাকে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। ঘণ্টাখানিক উপদেশ দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন মার স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল। কোনো পরিশ্রম করতে পারেন না। সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না। তাঁকে ধরে ধরে দোতলায় তুলতে হয়।

পরদিন ভোরবেলা শুনলাম ঘুমের মধ্যে মা মারা গেছেন। হার্ট ছিল দুর্বল, অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। শরীর সহ্য করতে পারে নি।

যদিও আমার ধারণা এটা আত্মহত্যা, নয়তো আমাকে রাত দুটায় ঘুম থেকে তুলে উপদেশ দিতেন না। তোমার কি মনে হয় আমার অনুমান ঠিক আছে।

খবরের কাগজ হাতে আমি রূপার দিকে তাকিয়ে আছি। কোনো রকম দ্বিধা ছাড়া সে এই গল্প কী করে করল! লাবণ্যও পাশে বসে হাঁ করে কথা শুনছে।

আমি কিছু বলার আগেই মুনিয়া চা নিয়ে ঢুকল এবং গম্ভীর গলায় বলল, 'ভাবী, লাবণ্যকে তুমি কিন্তু চা দেবে না। ও আজেবাজে সব অভ্যেস করছে। আর শোন দাদা তুই একটু নিচে যা।'

আমি বললাম, 'কেন?'

'সফিক ভাই এসেছে। তোকে চাচ্ছে।'

'বলে দে বাসায় নেই।'

'একটু আগে বলেছি, তুই বাসায় আছিস।'

'এখন বলে দে — আমি বাসায় নেই।'

'মিথ্যা আমি বলতে পারব না দাদা তুই নিজে গিয়ে বলে আয় যে তুই বাসায় নেই।'

মুনিয়া শুকনো মুখে চলে গেল। রূপা বলল, আমি বলে আসি। উনি আসলে আমাকে দেখতেই এসেছেন। প্রতি দশ থেকে বার দিন পরপর উনি আমাকে দেখতে আসেন। এই চক্রটা আমি হিসেব করে বের করেছি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে এগার দিন আগে।

রূপা নিচে নেমে গেল। আমি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে রইলাম। লাবণ্য বলল, 'মামা লুডু খেলবে?'

আমি বললাম, 'না।'

'একটু খেল মামা। তুমি কালো আমি লাল।'

'না।'

'খেল মামা, খেল। খেলতেই হবে।'

আমি ইজিচেয়ার থেকে উঠে গিয়ে বেশ জোরেই তার গালে একটা চড় বসালাম। মেয়েটা মুহূর্তে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল। মুনিয়া ছুটে এসে বলল, 'কী হয়েছে?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'তেমন কিছু হয় নি। চড় মেরেছি। বড্ড বিরক্ত করছিল।'

মুনিয়া হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, 'এইভাবে তাকিয়ে থাকিস না মুনিয়া। তোকে কালো টিকটিকির মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তোর চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসবে।'

'ঠিক করে আমাকে বল তো দাদা, কেন মারলি?'

'আমাকে লুডু খেলতে বলছিল। খেলব না বলছি, তারপরেও জোর করছে। চড় মারার ফলে ভবিষ্যতে আর কখনো জোর খাটাতে আসবে না। একই সঙ্গে বুঝতে পারবে পৃথিবী জোর খাটানোর জায়গা নয়।'

'তোর মাথা খারাপ। তোর চিকিৎসা হওয়া দরকার।'

আমি আবার খবরের কাগজ চোখের সামনে মেলে ধরলাম। মুনিয়া হিসহিস করতে করতে বলল, 'আমাকে কালো টিকটিকি কেন বললি, গায়ের রং কালো বলে?'

'হুঁ।'

'ফর্সা রং দেখে মাথা আউলা হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীকে এখন কালো লাগছে।'

'সারা পৃথিবীকে লাগছে না, তোকে লাগছে।'

মুনিয়া দরজা ধরে কাঁদতে লাগল। আমি যা করেছি তা ঘোরতর অন্যায়। আমার কথায় মুনিয়া যে কাঁদছে, তাতে তাকে দোষ দেয়া যায় না। যে কেউই কাঁদবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার সামান্য হলেও অনুশোচনা এবং গ্লানি বোধ করা উচিত — তা কবছি না। বরং ইচ্ছা করছে এ বাড়ির প্রতিটি জীবন্ত প্রণীকে কাঁদিয়ে দিতে।

মাকে খুঁজে বের করে তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ ঝগড়া করলে কেমন হয়? না, ঝগড়া না, এই জিনিস আমি পারি না। মাকে কিছু কঠিন কথা শুনিয়ে আসা যায়। কিংবা দোতলায় উঠে বাবুকে বলে আসা যায়— বাবু শোন, তুই আসলে মহামূর্খ। কিছু জটিল ইকোয়েশন মুখস্থ করার বিদ্যা ছাড়া পরম করুণাময় ঈশ্বর তোকে আর কিছু দেন নি। তোকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে ফিজিক্সের একটা শুকনো বই বানিয়ে।

আমি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠলাম। যার সঙ্গেই প্রথম দেখা হবে, তাঁকে কিছু কথাবার্তা বলব। বাবার সঙ্গে দেখা হলে বাবাকে।

দেখা হল মার সঙ্গে। এই মহিলা বারান্দায় বসে আছেন। মতির মা চিরুনি দিয়ে তাঁব মাথার উকুন এনে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে কাজটিতে দুজনই খুব আনন্দ পাচ্ছে। প্রাণীহত্যা আনন্দজনক কাজ তো বটেই। প্রাণী যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তাকে হত্যায় আনন্দ আছে। উকুন এবং মশা প্রাণী হিসেবে কাছাকাছি — দুজনই রক্ত খায়। তাবপরেও উকুন মাবাব আনন্দ বেশি, কারণ এরা শব্দ করে মারা যায়। নখ দিয়ে এদেব ফুটানো হয়।

মা বললেন, 'রঞ্জু, বৌমা কার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলছে?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'সফিকের সঙ্গে।'

যার তার সঙ্গে তার এত কী কথা?'

আমি আবার হাই তুললাম, কোন লাইনে মাকে আক্রমণ কবা যায় ঠিক বুঝতে পাবছি না। মা'র ধারণা, মানুষ হিসেবে তিনি প্রথম শ্রেণীর। দয়ামায়ায় তাঁর অন্তর পূর্ণ। নামায রোজা করছেন। প্রয়োজনের বেশি করছেন। শুক্রবারে ফকির এলে ভিক্ষা না নিয়ে বিদেয় হয় না। মার নির্দেশ, শুক্রবারে ভিক্ষা চাইলে ভিক্ষা দিতে হবে। তাঁর সঙ্গে একবার গাড়ি করে পল্লবীর দিকে যাচ্ছি। সোনারগাঁ হোটেলের কাছে লাল লাইটে গাড়ি থামল। দুটা বাচ্চা ছেলে ছুটে এল ফুল বিক্রি করতে। আমি গলার স্বর যথাসম্ভব কর্কশ কবে বললাম, 'ভাগো।'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'ভাগো ভাগো বলছিস কেন? গরিব মানুষ না? শীতের সময খালিগায়ে ফুল বিক্রি করছে — আহা রে!' তিনি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দুজনকে দুটা টাকা দিলেন। গরিবের দুঃখে কাতর এই মার অন্য একটি ছবিও আছে, সেই ছবিও সবার চেনা, কিন্তু সেই ছবি কারো চোখে পড়ে না। জাহেদা নামে আমাদের একটা কাজের মেয়ে ছিল। কোলের একটা বাচ্চা নিয়ে সে কাজ করতে এসেছিল। বাচ্চাটা বেশির ভাগ সময় কাঁদত। খিদের যন্ত্রণাতেই কাঁদত। জাহেদা মাঝে মাঝে চুরি করে দুধ নিয়ে বাচ্চাটাকে খাওযাত। একদিন ধরা পড়ে গেল। মা রেগে আগুন। বিদায় হও। এক্ষুনি বিদায় হও। ঘরে চোর পুষছি। কী সর্বনাশের কথা! জাহেদা মার পা জড়িয়ে ধরল। দুগ্ধপোষ্য একটি শিশু নিয়ে মানুষের বাড়িতে কাজ পাওয়া তার সহজ হবে না।

মার মন গলল না। তাঁর এক কথা — বাড়িতে আমি চোর বাখব না। আমাদেব পরম করুণাময়ী মাতা চোব বিদায় কবে দিলেন।

চোর বিদাযেব কথা তুলব না অন্য কোনো প্রসঙ্গ তুলব বুঝতে পারছি না। চোব বিদায়ের প্রসঙ্গ তোলা ঠিক হবে না, কারণ এতদিন আগের কথা মাব মনে নেই। তাঁব স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। নামতা পর্যন্ত মনে থাকে না। ঐ দিন কি একটা জিনিসেব দাম ঠিক কবতে গিযে নামতা গণ্ডগোল হযে গেল। আমাকে বললেন, 'সাত আট কত বে বঞ্জু?' আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে বললাম, 'বাহান্ন।' মা বাহান্ন স্বীকার করেই চলে গেলেন। কাজেই চুরির প্রসঙ্গ থাক। অন্য কোনো প্রসঙ্গে আক্রমণ শুরু করা যাক।

মা বললেন, 'দাঁড়িযে আছিস কেন? ঐ মোড়াটায বোস না।'

আমি বসলাম। মা বললেন, 'তোব বাবা ঐ দিন বলছিলেন, বঞ্জুব যা স্বভাব, ও কোনো চাকরি-বাকবি করবে বলে তো মনে হয না। ওকে একটা ব্যবসায ঢুকিযে দিলে কেমন হয়। কি বে, কববি ব্যবসা? বিযেটিযে কবেছিস, এখন বোজগাবেব কথা চিন্তা কববি না? তোর শ্বশুব তো বিরাট পযসাওযালা লোক, ওঁকে বল তোকে কোনো একটা ব্যবসা শুরু কবিযে দিতে।'

আমি গম্ভীর ভঙ্গিতে বললাম, 'শিগগিবই বলব।'

'কোনো একটা ব্যবসা-ট্যবসা শুরু কবলে মন ভালো থাকবে। দিন-বাত ইজিচেযাবে শুযে থাকা তো কাজেব কথা না।'

'তা তো ঠিকই।'

'তোব বাবা বলছিলেন —বিনা কাবণে একটা মানুষ দিন-বাত শুযে থাকে কীভাবে?'

আমি শান্ত ভঙ্গিতে বললাম, 'বিনা কাবণে শুযে থাকি না তো। শুযে শুযে ভাবি।'

'কী ভাবিস?'

'একটা খুন কবাব কথা ভাবছি।'

'কী বলছিস তুই!'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'সত্যি কথা বলছি মা।'

'কাকে খুন কববি?'

'সেটা এখনো ফাইনাল কবি নি।'

৪

রূপাদেব বাড়ি থেকে একটা মাছ এসেছে। তাব আকৃতি হুলস্থুল ধরনের। মাছ বললে এই জলজ প্রাণীটির প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো হয না। মৎস্য বললে কিছুটা হয। সেই 'মৎস্য' দুজন ধরাধবি কবে বারান্দায এনে বাখল। আমাদের বাসাব সবাবই হতভম্ব হযে যাওযা উচিত ছিল — কেউ হতভম্ব হলাম না। বরং সবাই এমন ভাব করতে লাগলাম, যেন খুব বিবক্ত হযেছি। আমাদেব বাসার অলিখিত নিযম হচ্ছে — রূপাদেব প্রতিটি কার্যকলাপে আমবা বিবক্ত হব। রূপাদের কোনো আত্মীয টেলিফোন কবলে আমবা শুকনো গলায বলব, এখন কথা বলতে পারছি না, খুব ব্যস্ত, পরে করুন। এবপব আব টেলিফোন করা উচিত নয। তবু যদি লজ্জার মাথা খেযে কেউ করে, তখন বলা হয, বাসায নেই। কখন ফিরবে বলা যাচ্ছে না।

রূপার চাচা কিছুদিন আগে এসেছিলেন। তাঁকে বসার ঘরে একা একা ঘণ্টাখানিক বসিয়ে রাখা হল। আমাদের কাজের ছেলের হাতে চা পাঠিয়ে দেয়া হল। শেষ পর্যন্ত বাবা অবিশ্যি দেখা করতে গেলেন। কয়েকবার হাই তুলে বললেন, 'শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। প্রেসার বেড়েছে। আজ আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। আরেকদিন আসুন। চা-টা খেয়েছেন তো?'

প্রকাণ্ড পাংগাশ মাছ বরান্দায় পড়ে আছে। সবাই বিরক্ত মুখে দেখছে। শুধু আমাদের বেড়ালটা মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না, লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে। বেড়ালটাকে কেউ শিখিয়ে দেয় নি যে ও বাড়ির কোনো কিছুতেই এত আনন্দিত হতে নেই। আমার মা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'এই মাছ এখন কে কাটবে?'

যে লোক মাছের সঙ্গে এসেছে, সে হাসিমুখে বলল, 'আম্মা, মাছ কাটার লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছি, বঁটিও এনেছি। আগে সবাই দেখুন, তারপর কাটার ব্যবস্থা হবে।'

'মাছ কাটার লোক কোথায়?'

'গাড়িতে বসে আছে আম্মা, সবাইকে ডাকুন, সবাই দেখুক।'

মা বললেন, 'এত দেখাদেখির কী আছে? বড় মাছ কি আমরা আগে দেখি নি?'

লোকটি হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'অবশ্যই দেখেছেন আম্মা, অবশ্যই দেখেছেন। এই মাছটার ওজন হল এক মণ। এক সেব কম এক মণ। উনচল্লিশ সেব। আপাকে ডাকেন। আপা দেখুক, স্যাব বলে দিয়েছেন। আপাকে না দেখিয়ে মাছ যেন কাটা না হয।'

রূপাকে ডাকা হল। সে মুগ্ধ গলায় বলল, 'বাহ্, কী অদ্ভুত সুন্দর! রূপাব পাতের মতো ঝিকমিক করছে।'

আমি দোতলায উঠে এলাম। ঘবে ঢুকে বিছানায শুযে শুযে ভাবতে লাগলাম, মানুষেব সৌন্দর্যবোধেব নানা দিক আছে। মাছেব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হযে তাকে কেটেকুটে আমবা খেযে ফেলছি। এব কোনো মানে হয!

বাতে খেতে বসে রূপা বলল, 'এ কী, বড় মাছটা বান্না হয নি?'

মুনিযা বলল, 'না।'

'না কেন?'

'ডিপ ফ্রিজে রেখে দেয়া হযেছে। পবে বান্না হবে। আমাদেব নিজেদের বাজাব বান্না করা হযেছে।'

রূপা আর কিছু বলল না, কিন্তু তাব মুখ থেকে বিস্ময়ের ভাবটা দূব হল না। বড় মাছটা রান্না হয নি, এটা সে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পাবছে না। আমি বললাম, 'পাংগাশ মাছ কি তোমার খুব প্রিয?'

রূপা বলল, 'পাংগাশ মাছ প্রিয় হবে কেন? কোনো মাছই আমার প্রিয না। ইলিশ মাছের ডিম খানিকটা প্রিয়।'

'তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে — মাছটা রান্না না হওযায় আপসেট হযে পড়েছ।'

'আপসেট হবার কারণ আছে বলেই আপসেট হচ্ছি। তুমি যদি শোন, তুমিও আপসেট হবে। এই জন্যেই শোনাব না। কেন আপসেট হচ্ছি, পরশু বলব।'

'এখনি বল।'

'না।'

রূপা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। তাব মন খারাপ ভাব স্থায়ী হল না। ঘবে ঢুকেই গান চালিয়ে দিল। আমার দিকে তাকিযে বলল, 'সাজগোজ করলে কেমন হয?' আমি বিস্মিত হযে বললাম, 'রাত এগারটায!'

'হুঁ। রাত এগারটায সাজা যাবে না, এমন তো কোনো আইন নেই। আব এ রকম আইন থাকলেও আমি মানতাম না। আচ্ছা শোন, তুমি কি মানবেন্দ্রেব ঐ গানটা শুনেছ, ওগো সুন্দরী আজ অপরূপ সাজে, সাজো সাজো সাজো...

'না।'

'আমি যখন ছোট ছিলাম অর্থাৎ কলেজে যখন পড়তাম, তখন এই গানটা বাজাতে বাজাতে সাজতাম। আমাব তখন মনে হত কি জানো? মনে হত আমাব জন্যেই যেন গানটা লেখা হযেছে। অবশ্যি এই ব্যাপাবটা এখনো আমার মধ্যে আছে, কোনো কোনো গান শুনলেই মনে হয এই গান আমার জন্যে লেখা, অন্য কাবো জন্যে নয। তোমাব কি এবকম মনে হয?'

'না।'

'তুমি ক্যামেবাটা নিযে এসো তো, আমাব সাজগোজ শেষ হলে একটা ছবি তুলবে।'

ক্যামেবায ফিল্ম ছিল না বলে ছবি তোলা গেল না। রূপা করুণ গলায বলল, 'দোকানপাট নিশ্চযই বন্ধ হয়ে গেছে, এত বাতে কি আব ফিল্ম পাওয়া যাবে?'

'পাওয়া না যাবাবই কথা।'

'এসো তাহলে শুযে পড়ি, কী আব কবা।'

আমবা ঘুমোতে গেলাম বাবটাব দিকে। বাতি নিভিযে ঘব অন্ধকাব কবামাত্র রূপা বলল, 'মাছেব ব্যাপাবে কেন আপসেট হযেছিলাম তোমাকে বলেই ফেলি।'

'তোমাব বলতে ইচ্ছে না হলে বলাব দবকাব নেই।'

'ইচ্ছে হচ্ছে। আজ থেকে বাইশ বছব আগে বাবা বিশাল একটা পাংগাশ মাছ এনেছিলেন। মাছ নিযে ঘবে ঢোকামাত্র বাবা আমাব জন্মসংবাদ পেলেন। মাছটা রূপার মতো চকচক কবছিল। মাছেব রূপালি বং থেকে রূপা নাম নিযে বাবা আমাব নাম বাখলেন। সেই থেকে অলিখিত নিযমেব মতো হযে গেল, আমার জন্মদিনে বাজাবেব সবচে' বড় মাছটা আসবে। গতবাব এসেছিল চিতল মাছ। লম্বায প্রায আমাব সমান।'

'আজ কি তোমাব জন্মদিন?'

'ইযেস স্যাব। তুমি ইচ্ছে কবলে শুভ জন্মদিন বলতে পাব।'

'শুভ জন্মদিন রূপা।'

'থ্যাংক ইউ।'

'তোমাব জন্ম কি দেশে হযেছিল?'

'হ্যাঁ। মিটফোর্ড হাসপাতালে।'

'আমার ধাবণা, তোমাব জন্ম বিদেশে।'

'যতই দিন যাবে, দেখবে, আমাব সম্পর্কে তোমাব বেশিবভাগ ধাবণাই ভুল।'

'আজ যে তোমাব জন্মদিন আগে বললে না কেন?'

'আগে বলব কী কবে? আমাব নিজেবই মনে ছিল নাকি? মাছ দেখে মনে পড়ল।'

রূপা তবল গলায হাসল এবং প্রায সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিযে পড়ল। আমাব মন আসলেই খাবাপ হযে গেল। বেশ বুঝতে পারছি আজ আব ঘুম হবে না। এপাশ-ওপাশ কবে কাটাতে হবে। জন্মদিনেব খববটা কাল ভোরে দিলেও অনিদ্রাব হাত থেকে বাঁচতাম।

রূপাব বাবা ভদ্রলোককে যতটা খাবাপ শুরুতে ভাবছিলাম এখন মনে হচ্ছে ভদ্রলোক হয়তো ততটা খাবাপ নন। জন্মদিন মনে বাখছেন, বিশাল মাছ পাঠাচ্ছেন। তবে আমাব ধাবণা, ভদ্রলোকেব সীমা ঐ মাছ পর্যন্তই। কন্যার প্রতি ভালবাসাব আব কোনো লক্ষণ এখনো তিনি দেখান নি। বেশিবভাগ সমযই তাঁব কাটে দেশের বাইরে। কিছু দিনেব জন্যে

দেশে আসেন। টেলিফোন করেন। মেয়ের সঙ্গে খুবই সংক্ষিপ্ত কিছু কথা হয়। এই পর্যন্তই।

আমাদের বাড়িতে রূপাকে কেউ পছন্দ করে না। শুধু লাবণ্য পছন্দ করে। রূপার মতো লাবণ্যের ঘুমরোগ আছে। ঘুম পেলেই সে রূপার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়বে।

আমাদের বাড়িতে রূপাকে সবচে' বেশি অপছন্দ করে মতির মা। সে সবসময়ই গলা নিচু করে মাকে কিংবা মুনিয়াকে রূপা সম্পর্কে গুজগুজ করে কী সব যেন বলে। একদিন আমি খানিকটা শুনলাম—'আম্মা, গরিব মানুষ, আপনেরে একটা কথা কই — কিছু মনে নিয়েন না। দোষ হইলে ক্ষ্যামা দিযেন। কথাটা হইল নয়া বৌরে নিযা।'

মা গম্ভীর গলায় বললেন, 'কী কথা?'

'নয়া বৌয়ের সাথে জিন থাকে আম্মা। দুনিয়ায় যারা খুব সুন্দর মাইযা তারার সাথে দুইটা তিনটা কইরা পুরুষ জিন থাকে।'

'চুপ কর তো।'

'জানি আম্মা, আমার কথা শুনলে রাগ হইবেন। কিন্তু কথা সত্য। জিনের সব লক্ষণ নয়া বৌয়ের আছে — এই যে রাইত দিন ঘুমায়, এর কারণ কী? কারণ একটাই। কইন্যা ঘুমের মইধ্যে থাকলে জিন ভূতেব জন্যে খুব সুবিধা।'

এই জাতীয় কথা দাঁড়িয়ে শোনা অসম্ভব। আমি বাকিটা শুনি নি। তবে মা নিশ্চযই শুনেছেন। কিছুটা বিশ্বাসও করেছেন। মানুষ সত্যের চেযে অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে। মুনিয়ার কথাই ধরা যাক, সে একটি চমৎকার মেযে। তার স্বামী তাকে ছেড়ে দিযে অন্য একটি মেয়েকে বিযে করেছে। লোকজনকে বলেছে স্ত্রীব চবিত্রহানি ঘটেছিল, সম্পর্ক ছিল অন্য একজনের সঙ্গে। লোকজন এই অসত্যটাকে বিশ্বাস করেছে। শুধু লোকজন কেন, আমাদের নিকট-আত্মীযস্বজনদেরও সে রকম ধাবণা। অসত্য বৃক্ষের শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। অসত্য বৃক্ষকে সে কাবণেই সহজে উপড়ে ফেলা যায না।

৫

রূপা বলল, 'তুমি কি আমাকে সেগুনবাগিচায নামিযে দিতে পারবে ?' কিন্তু জিজ্ঞেস করাব সময় রূপা কখনো চোখের দিকে তাকায় না। প্রশ্নটা করছে আমাকে, অথচ সে তাকিযে আছে জানালার দিকে। শুরুতে খুব বিবক্তি লাগত। এখন লাগে না। বরং মনে হয এটাই স্বাভাবিক।

আমি রূপার প্রশ্নের জবাব দিই নি। গভীর মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছি, এমন একটা ভঙ্গি করার চেষ্টা কবছি।

'কথা বলছ না কেন, আমাকে সেগুনবাগিচায় নামিযে দিতে পারবে?'

'পারব।'

'তাহলে চট করে প্যান্ট পবে নাও। লুঙ্গি পরে নিশ্চযই যাবে না। শেভ করো। দুদিন ধরে শেভও করছ না।'

আমি বাথরুমে ঢুকে গেলাম। আযনায নিজেকে দেখে আঁতকে উঠলাম। দুদিন শেভ না করায় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। থুতনির কাছে চার পাঁচটা দাড়ি আবার সাদা। সাদা দাড়িগুলোর কল্যাণে চেহাবায প্রবীণ ভাব চলে এসেছে। শেভ করা মানে প্রবীণ ভাব

বিসর্জন দেয়া, এটা কি ঠিক হবে? চেহারায বুড়োটে ভাব আমাব ভালোই লাগে। বুড়ো লোকগুলো যখন চুলে কলপ দিয়ে, রঙচঙা শার্ট পরে তরুণ সাজতে চায তখন অসহ্য লাগে। ইচ্ছা করে হাসতে হাসতে বলি, পঞ্চাশ ক্রস করেছেন না? মৃত্যুর কিন্তু দেবি নেই, খুব বেশি হলে আর মাত্র দশ বছর। রঙচঙা জামা পবছেন, ভালো করেছেন। শখ মিটিযে নেয়াই ভালো।

বাথরুম থেকে বের হযে পাযজামা-পাঞ্জাবি গাযে দিযে একতলায এসে শুনলাম, রূপা রিকশা নিযে চলে গেছে। সে যে একা যাচ্ছে, আমাকে সঙ্গে নেবাব দবকার নেই, তা-ও বলে যায় নি। আমি দিব্যি সেজেগুজে নেমে এসেছি।

এরকম অবস্থায নিজেকে খানিকটা বোকা বোকা লাগে। আমাকেও নিশ্চযই লাগছে। আমি বোকা ভাবটা চেহারা থেকে ঝেড়ে ফেলাব জন্য সিগারেট ধবালাম। সিগাবেট নিয়ে মুখের ভাবভঙ্গি অনেকখানি বদলে ফেলা যায। মেযেবা এই খবরটা জানে না। জানলে পুরুষের তিনগুণ সিগারেট খেত।

সিগারেটে সবে তিনটা টান দিযেছি, মুনিযা এসে বলল, 'তোকে বাবা ডাকছেন। এক্ষুনি যেতে বললেন। এক্ষুনি।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগাবেট ফেলে দিলাম। এগিযে যাচ্ছি বাবাব ঘরের দিকে, মুনিযা তীক্ষ্ণ গলায বলল, 'তোব তো খুবই বিশ্রী স্বভাব, জ্বলন্ত সিগাবেটেব টুকরো ফেলে চলে যাচ্ছিস! নিভিযে যাবি না? ঐদিন লাবণ্য পা পুড়ে ফেলেছে?'

'খালি পায হাঁটাহাঁটি কবে কেন? ওকে না কবতে পারিস না খালি পায়ে যেন হাঁটাহাঁটি না করে।'

এই বলে আমি বাবাব ঘবে ঢুকে গেলাম।

বাবা অবেলায বিছানায় শুযে আছেন। বুকে ব্যথা সম্ভবত শুরু হযেছে। চোখ-মুখ দেখে কিছু অবশ্যি বোঝা যাচ্ছে না। শারীবিক যন্ত্রণা সহ্যেব ক্ষমতা তাঁব অসাধাবণ।

'বাবা ডেকেছ?'

'হু, বৌমা কোথায গেল?'

ঠিক প্রত্যাশিত প্রশ্ন নয। রূপা কোথায গেছে তা নিযে বাবাকে উদ্বিগ্ন হওযা মানায না। মুনিযা যদি বলত, ভাবী কোথায? সেটা মানিযে যেত কিংবা মা যদি বলতেন, অসময়ে বৌমা কোথায গেল তাও মানাত — কিন্তু বাবা জিজ্ঞেস করবেন কেন?

আমি বললাম, 'সেগুনবাগিচাব দিকে গেছে।'

'ঐখানে কী?'

'জানি না।'

'জিজ্ঞেস কবিস নি?'

'না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যা।'

বাবার ঘর থেকে বেব হযে এসে মনে হল সামান্য ভুল করা হয়েছে। আমার বলা উচিত ছিল, কী জন্যে জানতে চাচ্ছ? রূপাকে নিযে তুমি কি চিন্তিত? রূপা এমন কিছু কি করেছে যার জন্যে চিন্তিত বোধ করছ?

সমস্যা হচ্ছে বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন যে প্রযোজনীয কথা ছাড়া কোনো কথাই হয না। সেই কথাবার্তাও সাধারণত খুব সংক্ষিপ্ত ধরনেব। রূপা অবশ্যি হড়বড় কবে তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলে। জেদী গলায তর্ক করে। রূপার তর্ক কবাব ভঙ্গিটি খুব মজার, কিন্তু শুরুটা সে করে ভয়ঙ্কবভাবে। তার ভঙ্গি দেখে মনে হয প্রতিপক্ষকে সে

ছিড়ে–খুঁড়ে ফেলবে। প্রতিপক্ষ যখন পুরোপুরি ঘায়েল, তখন সে হঠাৎ গা এলিয়ে বলবে — অবশ্যি আপনার কথা ঠিক। প্রতিপক্ষ তখন হতচকিত। পুরোপুরি আনন্দিতও হতে পারছে না, কারণ সে জানে তর্কে জিততে পারে নি, আবার দুঃখিতও হতে পারছে না।

আমি চায়ের খোঁজে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি, বারান্দায় মার সঙ্গে দেখা। মা বললেন, 'বৌমা কোথায় গেছে রে?' আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি তোমার বৌমাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন?'

'সে তো বলল সেগুনবাগিচা গেছে।'

'তাহলে সেখানেই গেছে। আচ্ছা মা, ব্যাপারটা কী শুনি তো?'

মা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'বউমা নাকি সিনেমা করছে। নায়িকার বোনেব কি একটা চরিত্র।'

'বলল কে তোমাকে?'

'পত্রিকায় লেখা হয়েছে, ছবি ছাপা হয়েছে। তুই জানিস না কিছু?'

'জানি। তোমরা যা ভাবছ তা না। বিয়ের আগে ওরা কিছু বন্ধুবান্ধব মিলে শর্ট ফিল্ম বানানো শুরু কবেছিল। কাজ বন্ধ ছিল, এখন আবার শুরু হবার কথা।'

'বিয়ের পর আবার সিনেমা কী? বিয়ের আগে যা কবেছে, করেছে।'

'বিয়ে করে তো পাপ করে নি যে সব ছেড়ে দিতে হবে?'

'পাপ–পুণ্যের কোনো ব্যাপার না। তুই তোব বৌকে দিয়ে অভিনয় কবাতে চাস, করাবি। এটা তোর ব্যাপার। পত্রিকায যেসব লেখা ছাপা হয — পড়তে ভালো লাগে না। আত্মীয়স্বজনরা পড়ে। তাবা মজা পায়। হাসাহাসি করে।'

'কী লেখা হয়েছে?'

মা গম্ভীর গলায বলল, 'মুনিযাব কাছে কাগজটা আছে, পড়ে দেখ।'

আমি মুনিযাব কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে এলাম। নিজের ঘরে ঢুকে পাতা খুলে রীতিমতো চমৎকৃত — পুবো পাতা ভর্তি রূপাব ছবি। লেখার শিরোনাম হচ্ছে — তিনি নগ্ন হতে রাজি।

বেশ দীর্ঘ প্রতিবেদন, পুরো তিন কলাম ছাপা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক জানাচ্ছেন শর্ট ফিল্ম 'সজনে ফুল'–এর নির্মাণ-কাজ শেষ পর্যাযে। ছবিব তরুণ পবিচালক মুহাম্মদ জোবাযেদ এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন যে সামান্য কিছু প্যাচওয়ার্ক ছাড়া ছবিব সব কাজ শেষ হয়েছে। জুন মাস নাগাদ ছবিটি সেন্সর বোর্ডেব নিকট পাঠানো হবে। ছবিতে একটি খোলামেলা দৃশ্য আছে যে কারণে সেন্সর বোর্ড ছবিটির ব্যাপারে আপত্তি তুলতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা করছেন। তিনি বলেন, জাতীয় সেন্সব বোর্ডে কিছু তথাকথিত নীতিবাগীশ লোক আছেন যাঁরা পান থেকে চুন খসলেই "গেল, গেল" বলে হৈচৈ শুরু করেন। সহজ বাস্তবতাকে স্বীকার কবে নেবার মানসিকতা তাঁদেব নেই। আমাদের ছবিতে কিছু খোলামেলা দৃশ্য আছে, যা গল্পের প্রযোজনে এসেছে এবং খুব শিল্পসম্মতভাবেই এসেছে। কোনো মুক্তবুদ্ধির মানুষই এই দৃশ্য নিয়ে আপত্তি তুলবেন না। মুহাম্মদ জোবায়েদ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বর্তমান সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে 'মুক্তবুদ্ধি'র ব্যাপারটা একেবারেই নেই। তাঁদের দৃষ্টি একচক্ষু হরিণের মতো।

'সজনে ফুল' ছবির খোলামেলা দৃশ্য নিয়ে অভিনেত্রী রূপা চৌধুবীব সঙ্গে কথা বলে ছবিতে অভিনয় প্রসঙ্গে তাঁর মতামত জানতে চাওযা হলে রূপা চৌধুরী বলেন, নগ্ন হওয়াটাকে তিনি কিছু মনে করেন না। তিনি বলেন, "ঈশ্বর আমাদেব এই পৃথিবীতে নগ্ন করেই পাঠিয়েছিলেন, এই সত্যটি মনে রাখলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।" এই

ঠাট্টাচ্ছলে রূপা চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি নগ্ন হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারবেন? রূপা চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, আমি পারব তবে সেই দৃশ্য আপনারা সহ্য করতে পারবেন না।

পত্রিকায় রূপার যে ছবিটি ছাপা সেটি ভদ্র ছবি। তবে প্রতিবেদন পড়বার পর ছবিটির দিকে তাকালেই পাঠকদের চোখে একটি নগ্ন মেয়ের ছবিই ভেসে উঠবে। আমি পত্রিকা হাতে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলাম। এ কী সমস্যা! বাবু এসে বলল, 'দাদা, ভাবী নাকি সিনেমা করছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ছবিটা দেখতে চাচ্ছি। পরীক্ষার পর রিলিজ হবে তো?'

'জানি না।'

'কাহিনীটা কি তুমি জান?'

'না।'

রূপা এল সন্ধ্যার পর।

কুচকুচে কালো রঙের একটা টয়োটা গাড়ি রূপাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। রূপা দোতলায় উঠে এল লাবণ্যকে কোলে নিয়ে। বাইরে থেকে এলেই রূপা কিছুটা সময় লাবণ্যর সঙ্গে কাটাবে।

রূপা লাবণ্যকে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। লাবণ্যর সঙ্গে কথাবার্তা এবং হুটোপুটি হতে থাকল। আমি যে পাশেই আছি, তার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছি, এ নিয়ে রূপার কোনো মাথাব্যথা নেই ...

'ও লাবণ্য সোনা, ভুনভুনা, খুনখুনা, ঝুনঝুনা!'

'কি?'

'আপনি কী করছেন?'

'আমি কিছু করছি না।'

'কে আপনাকে আদর করছে?'

'তুমি।'

'তুমিটা কে?'

'তুমি হচ্ছ রূপা।'

'রূপাকে তুমি কী ডাক?'

'মামি ডাকি।'

'তোমার মামি কি সুন্দর?'

'হ্যাঁ।'

'অল্প সুন্দর না খুব বেশি সুন্দর?'

'খুব বেশি সুন্দর।'

'কীসের মতো সুন্দর?'

'চাঁদের মতো।'

'চাঁদের কবিতাটা বলেন তো লাবণ্য সোনা।'

'বলব না।'

'বলতে হবে।'

'না, বলব না।'

'বলতেই হবে, বলতেই হবে, বলতেই হবে।'

'বলব না, বলব না।'

'তাহলে একটু হাসেন।'

'হাসব না।'

'তাহলে একটু কাঁদেন প্লিজ, প্লিজ। প্লিজ লাবণ্য।'

'কাঁদব না।'

'তাহলে একটু নিচে গিয়ে বলুন তো আমাকে এক কাপ চা দিতে।'

লাবণ্য নিচে চলে গেল। আমার মনে হল আদরের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। রূপা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খবব কী?'

আমি বললাম, 'কোনো খবর নেই।'

'সারাদিন ঘরেই ছিলে, না কোথাও গিয়েছিলে?'

'ঘরেই ছিলাম। আচ্ছা রূপা শোন, তুমি আমাকে বললে সেগুনবাগিচায় নামিযে দিতে, তারপর আমাকে না নিযেই চলে গেলে!'

'শেষ মুহূর্তে তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করল না।'

রূপা বাথরুমে ঢুকে গেল। বাথরুম থেকেই বলল, 'সারাদিন ঘবে বসে আছ এটা তো ভালো কথা না। বাইরে থেকে ঘুরে-টুবে এসো।'

কোথায যাব?'

'কোনো বন্ধুব বাড়ি যাও। তাস-টাস খেলে এসো। সাবাক্ষণ ঘবে থাকলে কী হয জান? সবার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছা কবে। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ঝগড়া কবার প্রস্তুতি নিচ্ছ।'

অনেকদিন কারোর বাসায় যাওযা হয না। যেতে ইচ্ছে করে না। বন্ধুবান্ধব কাবোব সঙ্গে দেখা হলে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। বিকশায হুড উঠিযে চলাফেরা করি। সেদিন মজিদ বাসায এসেছিল। আমি বলে পাঠালাম, বাসায নেই। অথচ মজিদেব সঙ্গে কথা বলে আমি আরাম পাই। সে মজাব কথা বলে খুব হাসাতে পাবে। এবকম হচ্ছে কেন আমি জানি না। বিয়ের পর মানুষ খানিকটা বদলায, এতটা কি বদলায? মুনিযাব ধারণা, কাফকা'ব গল্পের নাযকের মতো আমাব মেটামরফসিস হচ্ছে — আমি ধীরে ধীবে মানুষ থেকে ফার্নিচার হয়ে যাচ্ছি। আমি বললাম, 'কী ফার্নিচাব হচ্ছি বলে তোব ধারণা?' সে বলল, 'তুমি খুব ধীরে ধীরে একটা ইজিচেয়ার হয়ে যাচ্ছ।'

সত্যি বোধহয় তাই হচ্ছি। ছিলাম মানুষ, হযে যাচ্ছি ইজিচেযাব।

আমি রূপাকে ঘরে বেখে অনেকদিন পব বাড়ি থেকে বেব হলাম। কোথায যাব ঠিক করা নেই। রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটব। মোড়ের সিগাবেটেব দোকান থেকে সিগাবেট কিনলাম। দোকানদার আমার চেনা। সে হাসিমুখে বলল, 'ভাইজানবে তো আইজকাইল দেখি না।'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ব্যাটা কি কথার কথা বলছে না সত্যি সত্যিই লক্ষ কবছে যে, আমি আজকাল ঘব থেকে কম বেরুচ্ছি।

'ভাইজানের শইল ভালো তো? আপনেবে কেমুন জানি কাহিল লাগতাছে।'

আমি এই কথাবও জবাব দিলাম না। তাব এই কথাটা সম্ভবত সত্যি, আমাকে কাহিল যে দেখাচ্ছে তা নিজেই বুঝতে পারছি। কারণ রাতে ভালো ঘুম হচ্ছে না। প্রায় জেগে জেগেই রাত পার করছি। আমাব পাশে শুয়ে রূপা এক ঘুমে বাত পার করে দিচ্ছে।

অনিদ্রার রোগীরা সাধারণত দিনে ঘুমিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়। আমার সেই অবস্থাও নেই। দিনে আমি কখনো ঘুমোতে পারি না।

সিগারেটের দোকানের সামনে থেকেই আমি রিকশা নিয়ে নিলাম। সেই রিকশা নিয়ে চলে গেলাম সফিকেব বাসায। জানি তাকে পাওয়া যাবে না। সে কখনো রাত দশটাব আগে বাসায় ফেরে না। সফিককে না পাওয়াই ভালো, পাওযা গেলে ঘণ্টা দুই সময নষ্ট হবে। দুঘণ্টার আগে সে ছাড়বে না। সফিক বাসায না থাকলেও জানবে আমি এসেছিলাম। এক ধরনেব সামাজিকতা বক্ষা হবে। আমি নিজেও খানিকটা স্বস্তি পাব যে অকারণে রিকশায করে ঘুরছি না। কাজে যাচ্ছি।

সফিক বাসায ছিল না। সফিকের ছোট বোন সুমি। দবজা খুলে বিস্মিত গলায বলল, 'ও মা কী সর্বনাশ, আপনি!'

সুমি এবাব ইন্টাবমিডিযেট পাস করেছে। ডাক্তারিতে ভর্তি হবাব জন্য দিনবাত পড়াশোনা করছে।

'কেমন আছিস বে সুমি?'

'আমি তো ভালোই আছি। আপনি এবকম কঙ্কাল হযে গেছেন কেন?'

'কঙ্কাল হযে গেছি?'

'হুঁ। আযনা নেই আপনাব ঘবে?'

'তুই নিজেও তো কঙ্কাল হযে গেছিস। হেভি পড়াশোনা হচ্ছে?'

'তা হচ্ছে। তবে লাভ হবে না। গোল্লা খাব।'

সফিককে ডেকে দে তো।

'ভাইযা বাসায নই। ঢাকাতেও নেই, টাঙ্গাইল গেছেন।'

'টাঙ্গাইল কেন?'

'সাহিত্য সভা, ভাইযা হচ্ছে বিশেষ অতিথি।'

'বলিস কী!'

'আমাকে নিযে যাবাব জন্যে খুব ঝোলাঝুলি কবছিল, আমি যাই নি।'

'খুব ভালো করেছিস। কোনো বুদ্ধিমান লোক সাহিত্য সভায যায না। আচ্ছা, সুমি, আমি যাই। প্রধান অতিথি সাহেবকে বলিস আমি এসেছিলাম।'

'এক সেকেন্ড দাঁড়ান। দাদার একটা নতুন বই বেব হযেছে। বইটা নিযে যান।'

'বই বেবিযেছে মানে! ও বই লিখল কবে?'

'বিযেব পব তো আপনি নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন — ভাইযা বই লিখে ছাপিযে ফেলেছে। বারশ কপি ছাপিয়েছে। বন্ধুবান্ধবকে ধরে ধরে জোব করে বই কেনাচ্ছে। আপনাব কাছে কি চল্লিশ টাকা আছে? চল্লিশ টাকা দিযে বই নিযে যান। বিনা পযসাতেই আপনাকে দিতাম। ভাইয়া শুনলে রাগ করবে।'

'চল্লিশ টাকা আমাব কাছে আছে — তুই বই নিয়ে আয।'

'চা খাবেন?'

'না।'

'খান একটু, কি হবে খেলে? আপনি তো আসেনই না, বিয়ের পর প্রথম এলেন। বিয়ের পর প্রথম এলে মিষ্টি খাওযাতে হয। ঘরে কোনো মিষ্টি নেই। চিনি খাবেন? এক চামচ চিনি এনে দিতে পাবি।'

ফাজলামি ধবনের কথা। সুমি আমার সঙ্গে ফাজলামি ধরনের কথা কখনো বলে না, আজ বলছে। চোখ-মুখ কঠিন করেই বলছে। তাকে ক্ষমা করে দিলাম কারণ অবিশ্বাস্য

হলেও সত্য, এই মেয়েটি দুবছর আগে ন পাতার একটি প্রেমপত্র লিখে রেজিস্ট্রি করে আমার নামে পাঠিয়েছিল। পুরো চিঠি পড়ার ধৈর্য ছিল না। দুতিন পাতা পড়েই আমার আক্কেল গুড়ুম। কী সর্বনাশ! সফিকের বাসায় তিন মাস যাওয়া বন্ধ রাখলাম। তিন মাস পর যখন গেলাম সুমির সঙ্গে খুব স্বাভাবিক আচরণ করলাম। সুমি চা দিতে এসে ক্ষীণ গলায় বলল, 'আপনি কি কোনো রেজিস্ট্রি চিঠি পেয়েছেন?'

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, 'আমাকে রেজিস্ট্রি চিঠি কে লিখবে?' সুমি বিস্মিত হয়ে বলল, 'কোনো চিঠি পান নি?'

আমি বললাম, 'না তো!'

সুমির প্রণয় উপাখ্যানের এইখানেই সমাপ্তি।

চায়ের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতেই সফিকের বাবা আইডিয়েল গার্লস স্কুলেব ইংরেজির শিক্ষক মোজাহার সাহেব এলেন। যতবার তাঁব সঙ্গে দেখা হয, ততবারই আমার মনে হয তাঁর বযস অনেকখানি বেড়েছে। আজ দেখি নিচেব পাটিব একটা দাঁত পড়ে গেছে। তিনি ভারি চশমার আড়ালে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিযে থেকে বললেন, 'কে বঞ্জু?'

'জ্বি।'

'সফিকের খোঁজে এসেছ?'

'জ্বি।'

'বাসায এসে তাকে পাবে না। বাসার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই। সে গ্রামেগঞ্জে সাহিত্য করে বেড়াচ্ছে। কেন্দুযা উপজেলায তার একটা চাকরি হযেছিল। উপজেলা হেলথ অফিসার। সে চাকবি নিল না। তাব নাকি ঢাকা ছেড়ে যাওযা সম্ভব না। তাতে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

আমি কিছু বললাম না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'হাবামজাদা এখন দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক দিন পবে দেখলাম — চিনতে পাবি নি। এই অবস্থা! আবার শুনেছি এর মধ্যে একটা বই লিখে ছাপিযে ফেলেছে। আবে ব্যাটা তুই হচ্ছিস ডাক্তার, তুই কববি ডাক্তাবি। তোব বই লেখালেখি কী? বই লেখাব টাকা কোথেকে পেয়েছে কে জানে। তোমার কাছ থেকে নিয়েছে নাকি?'

'জ্বি না।'

'আমার ধারণা ওর মার কোনো গযনা–টযনা নিয়ে বেচে ফেলেছে। ওর মা অবশ্য অস্বীকার করছে। ছেলে ওর চোখের মণি। সারাজীবন খালি ছেলে ছেলে কবেছে। এখন বুঝবে ছেলের মজা।'

সুমি চা এনে সামনে রাখল। মোজাহার চাচা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মনে হচ্ছে ইদানীং তিনি চোখেও কম দেখেন। যাবার সময দবজায় ধাক্কা খেলেন।

সুমি বই দিয়ে গেল। আমি তাকে চল্লিশটা টাকা দিলাম। সুমি বলল, 'পনেবটা বই আমার বিক্রি করার কথা। একটা মাত্র বিক্রি করলাম। আপনি কি আবেকটা কিনবেন?'

'আরেকটা দিয়ে আমি কী করব?'

'ভাবীর জন্যে নিযে যান। আপনি একটা পড়বেন, ভাবী পড়বেন আরেকটা।'

'আরেকদিন যখন আসব আরেকটা কিনে নিয়ে যাব। আজ টাকা নেই।'

'বাকিতে নিয়ে যান। পরে টাকা দেবেন।'

'আচ্ছা যা, নিয়ে আয়।'

সুমি আরেকটা বই এনে দিল। আমাকে বিদায় দিতে গেট পর্যন্ত এল। আমি যখন

বললাম, 'যাই সুমি', তখন সে নিচু গলায় বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলি, রাগ করবেন না তো?'

'না। কী কথা?'

'আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার নাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে?'

'কে বলল?'

সুমি চুপ করে রইল। আমিও খানিকক্ষণ চুপ থেকে রাস্তায় পা বাড়ালাম। এই নিয়ে সুমির সঙ্গে কথাবার্তা বলার মানে হয় না।

বাসায় সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম না। অকারণে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে রাত এগারটা বাজিয়ে ফেললাম। বাসায় ফিরে দেখি রূপা খাওয়াদাওয়া করে ঘুমোবার আয়োজন করে ফেলেছে। লাবণ্যকে নিয়ে এসেছে তার ঘরে। আমার জন্যে বিন্দুমাত্র উদ্বেগও লক্ষ করলাম না। এত দেরি কোথায় করলাম তা-ও জানতে চাইল না। আমি নিজ থেকে বললাম, 'সফিকের কাছে গিয়েছিলাম। ওর একটা বই বেরিয়েছে।'

রূপা মশারি ফেলতে ফেলতে বলল, 'আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বই ছাপাল আর আমাকে বলল না, আশ্চর্য তো!'

'তুমি টাকা দিয়েছ?'

'হুঁ। আচ্ছা লাবণ্যকে কি তার মার কাছে দিয়ে আসব, নাকি সে থাকবে আমাদের সঙ্গে? খাট তো বড়ই আছে। থাকুক, কি বল?'

'থাকুক।'

'তুমি কি খেয়ে এসেছ?'

'না।'

'খাবে না?'

'না।'

রূপা মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল।

আমি সফিকের বই খুলে কয়েক পাতা পড়তে চেষ্টা করলাম। চৈত্র মাসের দুপুরের কথা দিয়ে বইটার শুরু। একটা ছেলেকে দেখা যাচ্ছে ঝাঁ-ঝাঁ রোদে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ টায়ার ফেটে যাওয়ায় সে মহা বিরক্ত। এই ছেলেটিই বোধহয় নায়ক। তবে ছেলেটার নাম লোকমান। লোকমান নামের কেউ কি নায়ক হবে ? মনে হয় না। ঔপন্যাসিকরা বাস্তববাদী লেখা যতই লিখুন না কেন, নায়ক-নায়িকার নামের ব্যাপারে তাঁরা খুব সাবধান। নায়কের নাম তাঁরা রাখবেন — শুভ্র, নায়িকার নাম নীলাঞ্জনা।

'বাতি জ্বালানো থাকবে ?'

আমি বই থেকে চোখ না সরিয়ে বললাম, 'তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?'

'না। আলো-অন্ধকার কোনোটাতেই আমার অসুবিধা হয় না। তুমি কি বই শেষ করে তারপর শোবে?'

'বুঝতে পারছি না। ঘুম পেলেই শোব।'

রূপা হাই তুলতে তুলতে বলল, 'আজ কেন জানি আমার ঘুম আসছে না। এরকম আমার কখনো হয় না।'

আমি বললাম, 'এমন কিছু কি ঘটেছে যার জন্যে তুমি ডিসটার্বড হয়েছ?'

রূপা বলল, 'আমি কখনো ডিসটার্বড হই না।'

'কখনো না?'

'মাঝে মাঝে হয়তো হই। তাতে ঘুমের অসুবিধা হয় না। রূপবতী মেয়েদের ডিসটার্বনেসের প্রধান কারণ হল তার শরীর। সেই শরীরটাকে আমি তুচ্ছ করে দেখতে শিখেছি। এখন আমার অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া ... "

'তা ছাড়া কী?'

'থাক, অন্য একদিন বলব।'

রূপা পাশ ফিরল। হয়তো ঘুমিযেও পড়ল। লাবণ্য দুহাতে রূপার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে রেখেছে। আমি একই সঙ্গে সফিকের বই পড়ছি এবং রূপাকে দেখার চেষ্টা করছি। বই পড়ার এই হচ্ছে সমস্যা। বইয়ের দিকে তাকিয়ে পড়তে হয়। এমন কোনো ব্যবস্থা যদি থাকত যে যে কোনো দিকে তাকিযে বই পড়া যেত, তাহলে ভালো হত। গান শুনতে হলে গানের দিকে কান পেতে রাখতে হয না। অথচ বই পড়তে হলে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

'এ্যাই, শোন।'

রূপা উঠে বসেছে। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?'

'খুব ঠাণ্ডা পানি খাওয়াতে পারবে। ফ্রিজ থেকে।'

'ঘুম আসছে না?'

'আসছে। ঘুমোচ্ছিলাম, তৃষ্ণায ঘুম ভেঙে গেল।'

আমি পানি আনতে গেলাম। সিঁড়িব গোড়ায় বাবার সঙ্গে দেখা হযে গেল। বাবাব অনিদ্রা রোগ আছে। বাবার অনিদ্রা রোগটার একটা উপকারী দিকও আছে। গভীর রাতে তিনি যখন দেখেন তাঁর মতো অন্য একজনও জেগে আছে, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করেন। এবং খুশি মনে খানিকক্ষণ গল্প করেন।

আমার উপর বাবা অসম্ভব বিরক্ত। কারণ আমি দুবছব আগে পাস কবেছি, চাকবি-বাকরির কোনো চেষ্টা করছি না। বিযে করে ফেলেছি কাউকে কিছু না জানিযে। অত্যন্ত রূপবতী একজন তরুণী আমার স্ত্রী, যার হাবভাব কেউ কিছু বুঝতে পাবছে না। যার উপব প্রচণ্ড রকম রাগ করার কিছু পাচ্ছে না, আবার যাকে ভালবাসার মতোও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

সিঁড়ির গোড়ায় আমাকে দেখে বাবার মুখের কঠিন ভাব একটু নরম হল। তিনি বললেন, 'এখনো ঘুমোতে যাস নি?'

আমি বললাম, 'ঘুম আসছে না।'

বাবার মুখের কঠিন ভাব আরো নরম হয়ে গেল। তিনি আন্তরিক গলায বললেন, 'ঘুম না এলে অস্থির হবার কিছু নেই। প্রতিরাতে ছঘণ্টা ঘুমোতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। নেপোলিয়ান মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন। লা মিজারেবল-এর লেখক ভিক্টব হিউগো যখন লেখালেখি করতেন, তখন দৈনিক গড়ে দুঘন্টা ঘুমোতেন।'

আমি বললাম, 'ও, তাই নাকি?'

'সবাইকে যখন দেখি ঘুমের জন্যে মহা ব্যস্ত, তখন আমি মনে মনে হাসি — বৌমা কি ঘুমোচ্ছে নাকি?'

'হুঁ।'

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বৌমার কিছু ব্যাপার নিযে আমি তোর সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই। যদিও খুব ভালো করেই জানি ছেলের সঙ্গে এইসব ব্যাপার ডিসকাস কবা উচিত না। তবে ছেলের বয়স যখন একুশ ছাড়িযে যায তখন খানিকটা হলেও বন্ধুব পর্যায়ে আসে। আমি তোর সঙ্গে ডিসকাস করতে চাচ্ছি নট এজ ফাদার বাট এজ এ ফ্রেন্ড।'

'ডিসকাস করুন।'

'সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তো ডিসকাস করা যায় না। আয়, আমার ঘরে আয়।'

রূপার জন্যে পানি নিয়ে যাওয়া হল না। আমি বাবার ঘরে ঢুকলাম। বাবার ঘরটা এই বাড়ির সবচে' বড় ঘর। আগে এ ঘরে বাবা এবং মা ঘুমোতেন। এখন বাবা একাই ঘুমান। মা থাকেন একতলায় মুনিয়ার সঙ্গে। কারণ স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর মুনিয়া দুবার ঘুমের ওষুধ খাবার চেষ্টা করেছে। রাতে তাকে চোখে চোখে রাখতে হয়।

'বোস রঞ্জু।'

আমি বসলাম। আমার একটু গা-ছমছম করতে লাগল। বাবার এই ঘরে শৈশবে অনেকবার আসতে হয়েছে। প্রতিবারই শাস্তি ভোগ করার জন্যে। সেই শাস্তিও বিচিত্র — খাটের নিচে মাথা দিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

'রঞ্জু।'

'জ্বি।'

'তুই তোর শ্বশুরবাড়ির হিস্ট্রি কিছু জানিস?'

'না।'

'খোঁজ নেয়ার ইচ্ছা হয় নি?'

'না।'

'তোর শ্বশুর যে এক বিদেশি মহিলা বিয়ে করেছিলেন, সেটা জানিস?'

'জানি।

'ঐ বিদেশি মহিলার হিস্ট্রি জানিস?'

'না।'

'সে ছিল নর্তকী। নাইট ক্লাবে নাচত। খুব অথেনটিক সোর্স থেকে খবর পেয়েছি। আমার ছেলেবেলার বন্ধু রহমান ঐদিন কথায় কথায় বলল। বলতে চায় নি — আমিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করেছি। রহমান এবং তোর শ্বশুর একসঙ্গে বাইরে ছিল। সে রূপার মা সম্পর্কে যা বলল ... ভয়াবহ! সে সব বলতে চাচ্ছি না। নাইট ক্লাবের নর্তকী — এই একটা বাক্যই যথেষ্ট।'

'তাতে কিছু যায় আসে না বাবা।'

'কিছু যায় আসে না?'

'না। বাইশ তেইশ বছর আগের ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামানোর কী আছে?'

'ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু না থাকলে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়ানো হয় কেন? বর্তমানের ভিত থাকে অতীতে। এই যে তোর স্ত্রীর কথাই ধর — তার স্বভাব, তার মানসিকতা সে নিয়ে আসবে তার মা-বাবার কাছ থেকে।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'এটাও ঠিক না বাবা। আমাকে দিয়ে দেখ — আমি কি তোমার মানসিকতা পেয়েছি? তুমি যে রকম আমি মোটেও সে রকম না। কাজ ছাড়া তুমি এক সেকেন্ড থাকতে পার না, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে পারি। তুমি মুহূর্তের মধ্যে রেগে আগুন হও। আমি কখনো রাগি না।'

'তুই হচ্ছিস একটা 'মেষ'। মেরী হ্যাড এ লিটল ল্যাম্বের এক ল্যাম্ব।'

'এই কথাও তুমি আমাকে অসংখ্যবার বলেছ। আমি কখনো কথা শুনে রেগে যাই নি। এখনো যাচ্ছি না। যাই বাবা, ঘুম পাচ্ছে।'

বাবা হঠাৎ গলার স্বর বেশ কঠিন করে বললেন, 'আমি চাই না তুই তোর বৌ নিয়ে এই বাড়িতে বাস করিস। তুই অন্য কোথাও উঠে যা।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

'কথার কথা আমি বলছি না। আমি সত্যি সত্যি তাই চাচ্ছি।'

'শিগগিরই সব সমস্যার সমাধান করে ফেলব বাবা। এখন যাই।'

আমি উঠে চলে এলাম। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানির বোতল নিয়ে এসেছি। কিন্তু রূপা ঘুমোচ্ছে ... আহ, কী সুন্দর তাকে লাগছে!

বাবার ঘরে ডাক পড়েছে।

জজিয়তিযের অভ্যাস তিনি এখনো ছাড়তে পারে নি। কিছু দিন পর পব তিনি জাজ সাহেবের ভূমিকায় নামেন। অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে হলেও পুরো বিষয়টির নেপথ্যে যে রূপা আছে তা বুঝতে পাবছি। তবে কোন কোন বিষয় আলোচনা হবে তা বুঝতে পাবছি না। এ জাতীয় বিচার সভা এর আগেও হযেছে। শুরুটা হয আন্তরিক ভঙ্গিতে। টি পটে চা থাকে, চা খাওয়া হয। টুকটাক কথা হয। শীতকালে বলা হয় — বেশ শীত পড়েছে। গরমকালে অত্যধিক গরম নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ হয। চা শেষ হবাব পর বাবা তাঁব ইজিচেয়ারে আধশোয়া হযে বসেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বারান্দাব ইজিচেযাব এই উপলক্ষে বাবার ঘরে নেয়া হয়। খানিকক্ষণ তাঁর পা নাচে। এক সময় পা নাচা বন্ধ হয। তিনি চোখ বন্ধ করে বলেন — রঞ্জু, তোমাকে আমাব দুএকটা কথা বলার আছে। দেখা যায দুএকটা না, তাঁর অসংখ্য কথাই বলার আছে। বাবার স্মৃতিশক্তি খুব একটা ভালো বলে আমাব কখনো মনে হয় নি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাব বিষয়ে তাঁর স্মৃতিশক্তি অসম্ভব তীক্ষ্ণ। চার বছর বযস থেকে আমি কি কি অপরাধ করেছি তা এক এক কবে বলা হয। মোটামুটি চরিত্র বিশ্লেষণ যাকে বলে। সব অপরাধ নিয়ে কথা বলা শেষ হবার পব সেদিনের আলোচ্যসূচি আসে। ঘণ্টা দুই সময তাতে লাগে। এই দুঘণ্টা সময বাবা খুব উপভোগ করেন বলেই আমার ধারণা।

আজ বাবার বিখ্যাত বিচার সভা বসল বাত দশটায। এই জাতীয় সভায় পরিবাবের সকল সদস্যের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয। কিন্তু বাবু সভা শুরুর আগেই বলল, 'আমি থাকতে পারব না। পড়া ফেলে এসেছি।' বাবা বললেন, 'দশ পনের মিনিটে তোমার পড়া মাথায় উঠবে না। বোস।'

বাবু গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার পড়াশোনার ব্যাপারটা আমি দেখব। এই বিষযে কেউ কিছু বললে আমার ভালো লাগে না। আমি ঠিক ঘড়ি দেখে কুড়ি মিনিট থাকব। এব মধ্যে যার যা বলার বলে শেষ করতে হবে।'

বলেই বাবু হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখে নিল। বাবুর এই সব কাণ্ডকারখানা সভার চরিত্র খানিকটা বদলে দিল। সভা পুরানো রুটিন মতো অগ্রসর হল না। আমি অতীতে কি করেছি না করেছি তা আলোচনা করার সুযোগ বাবা পেলেন না। সবাসরি মূল বিষয়ে চলে গেলেন — 'আমি সবাইকে এখানে ডেকেছি বৌমা সম্পর্কে দুএকটা কথা বলার জন্য।'

বাবু বলল, 'ভাবীর প্রসঙ্গে কথা বলবেন — ভাবী কোথায়?'

মা বললেন,' তার এখানে থাকার প্রয়োজন নেই।'

'যার প্রসঙ্গে কথা সে এখানে থাকবে না, তা কী করে হয়?'

বাবা বললেন, 'তুই খুব বিরক্ত করছিস — তার এখানে থাকার প্রয়োজন কেন নেই তা কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবি। একটা সিনেমা পত্রিকায তাব একটা ছবি ছাপা হযেছে। সেটা নিযেই দুএকটা কথা বলতে চাই।'

বাবু বিস্মিত গলায় বলল, 'ভাবী ছবি করছে, কাজেই সিনেমা পত্রিকায তাব ছবি ছাপা হবেই। খেলাধুলা করলে স্পোর্টস পত্রিকায ছবি ছাপা হত।'

বাবা বললেন, 'তুই বেশি বকবক কবছিস। যা তুই, তোর ঘবে গিয়ে পড়াশোনা কব। চলে যা।'

বাবু ঘড়ি দেখে বলল, 'কুড়ি মিনিট এখনো হয নি। কুড়ি মিনিট হোক, তাবপব যাব।'

মা বললেন, 'যে রকম ছবি ছাপা হয়েছে কোনো ভদ্রঘবের মেযেব সে রকম ছবি ছাপা হয না। পুকুর থেকে উঠে আসছে সারা শরীর ভেজা। শাড়ি গাযে লেপ্টে আছে। ব্লাউজ নেই — আমাব বলতেও ঘেন্না লাগছে। এই পবিবারেব একটা সম্মান আছে। দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে আমাদেব থাকতে হয়। আমার বা তোর বাবাব বংশে এ জাতীয ঘটনা ঘটে নি।'

বাবু বলল, 'তোমাদেব বংশে কোনো অভিনেত্রী ছিল না বলে এ জাতীয ঘটনা ঘটে নি। অভিনেত্রী থাকলে ঘটত।'

'বাবু, 'তুই উঠে যা। তোব মাথা গবম হযে আছে।'

বাবু ঘড়ি দেখে বলল, 'এখনো দশ মিনিট আছে। দশ মিনিট পাব হোক, তাবপব যাব।'

দশ মিনিট কেউ কোনো কথা বলল না। চারদিক নিস্তব্ধ। দশ মিনিটকে মনে হল অনন্ত কাল। বাবু উঠে যাবাব পব মা বললেন, 'আমি এই বিষয নিযে বৌমাব সঙ্গে কথা বলেছি। বৌমা বলল, সে নাকি ছবি ছাপানোয সম্মানহানির কিছু দেখতে পায নি। আমি তাকে বললাম, এ বাড়িতে থেকে এসব জিনিস কবা যাবে না। সে বলল, এ বাড়িতে আমি বেশিদিন থাকব না। অল্প কটা দিন। এই কথাব মানে কী তাই আমি জানতে চাই। রঞ্জু, সে এই কথা কেন বলল?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

'সত্যি জানিস না?'

'না।'

'এখন তো জানলি। এখন কী কববি?'

'আমাব কবাব কিছু নেই। ও কী করবে না কববে সেটা ওব ব্যাপাব।'

'তুই তাকে কিছুই বলবি না?'

'না।'

'ও যে তোকে জাদু কবে বেখেছে তা তুই বুঝতে পাবছিস না?'

'না।'

বাবা বললেন, 'আমার এই বাড়িতে বাস কবে তুমি যে উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা বলছ তা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কব বলে মনে হচ্ছে। তুমি কী করবে না কববে তা তোমাব ব্যাপার। তবে আমি তোমার জায়গায হলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতাম।'

আমি বললাম, 'কী রকম শাস্তি? খুন করার কথা বলছেন?'

বাবা দীর্ঘসময আমার দিকে তাকিযে রইলেন। যাকে বলে বাক্যহাবা। মুনিয়া অস্বস্তি নিযে একবাব মাব মুখেব দিকে একবার বাবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বাবা বললেন,

'দেখি এক গ্লাস পানি।' মুনিয়া পানি আনতে গেল। তার ফিরে আসতে বেশ সময় লাগল। এই সময়টুকু বাবা চুপচাপ রইলেন। বোধহয় কী বলবেন, গুছিয়ে নিচ্ছেন।

'রঞ্জু!'

'জ্বি।'

'আমার অনেকদিন থেকেই মনে সন্দেহ তুমি মানসিক দিক দিয়ে ঠিক স্টেবল নও। আজ নিশ্চিত হয়েছি।'

'ও।'

'ইনসেনিটি এক ধরনের অসুখ যা দ্রুত বাড়তে থাকে।'

আমি হাসির একটা ভঙ্গি করলাম। বাবা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'হাসছ কেন? চুপ করে থাকবে না। বল কেন হাসছ?'

মুনিয়া বলল, 'বাবা তুমি বেশি রেগে যাচ্ছ। মা, মিটিংটা আজ থাক।'

বাবা বললেন, 'না আমার কথা শেষ হয় নি। এই বদছেলে সাদা চামড়াব এক মেয়ে বিয়ে করে ধরাকে সরা দেখছে। ওকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বল। সে যেন কালই তার বৌয়ের হাত ধরে বাড়ি থেকে বিদেয় হয।'

আমি শান্ত ভঙ্গিতে ঘরে ফিরে এলাম। রূপা বলল, 'কী ব্যাপাব তোমাদেব কীসেব মিটিং?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'তেমন কিছু না।'

'কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'না।'

'সমস্যা হলে আমাকে বলতে পাব। আমি যেহেতু তোমাদেব পবিবাবেব কোনো সদস্য না, আমি তোমাদের সমস্যা অবজেকটিভলি দেখতে পাবব।'

আমি সফিকের বই হাতে নিযে ইজিচেয়ারে গা এলিযে দিলাম। রূপা বলল, 'বইটা রাখ তো। আমার দিকে তাকাও।'

আমি তাকালাম।

রূপা বলল, 'বাবুর সঙ্গে আমাব কথা হচ্ছিল। সে বলল, তুমি নাকি একটা খুন কবতে চাও? এ পারফেক্ট মার্ডার। সত্যি?'

আমি জবাব দিলাম না।

রূপা বলল, 'কাকে খুন করতে চাও, আমাকে?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'আপত্তি না থাকলে বলতে পার। আমরা দুজন ব্যাপাবটা নিযে ডিসকাস কবতে পাবি। মানুষ হিসেবে তুমি বেশ অদ্ভুত। এই জন্যেই তোমাকে আমাব এত পছন্দ। তোমাকে যে আমি প্রচণ্ড রকম ভালবাসি সেটা কি তুমি জান?'

'না।'

'তুমি আসলে কিন্তু জান। শুধু মুখে বলছ না। তুমিও আমাকে প্রচণ্ড রকম ভালবাস, তবে ভালবেসে সুখ পাচ্ছ না। তাই না?'

আমি চুপ করেই রইলাম। রূপা বলল, 'সত্যিকার ভালবাসাব একটা বড় লক্ষণ কি জান? ভালবেসে সুখ পাওযা যায না, কখনো না। আমি সাবাক্ষণ তোমার পাশে থাকলেও তোমার মনে হবে — নেই নেই। পাশে কেউ নেই। আর তখনি ভালবাসার মানুষকে খুন করে ফেলার ইচ্ছা হয়।'

আলোচনা অগ্রসর হল না, লাবণ্য এসে ঢুকল। তার কোলে ছোট্ট বালিশ। রূপা বলল, 'কী খবর লাবণ্য?'

লাবণ্য গম্ভীর গলায বলল, 'তোমাদের বিছানায কি জাযগা আছে?'

'কেন বল তো?'

'আমি তোমাদের সঙ্গে ঘুমোব।'

'প্রচুর জায়গা আছে লাবণ্য, প্রচুর জাযগা।'

'আমি ঘুমিযে পড়লে মা যদি নিতে আসে তাহলে কিন্তু মাকে নিষেধ করবে।'

'অবশ্যই নিষেধ করব।'

লাবণ্য বিছানায ঘুমিযে পড়ল। এবং তার প্রায সঙ্গে সঙ্গেই মুনিযা উপস্থিত হল। সে তার মেযেকে নিযে যেতে এসেছে। রূপা বলল, 'মেযেকে তো দেযা যাবে না।'

'দেয়া যাবে না মানে?'

'ও ঘুমোতে যাবাব আগে বলে গেছে ওকে যেন তোমাব হাতে তুলে দেযা না হয। আমি ওকে কথা দিযেছি।'

'বাতে ঘুম ভাঙলে কাঁদবে।'

'কাঁদলে তোমার কাছে দিযে আসব। এখন তুমি একে নিতে পাববে না।'

'আমি আমাব মেযে নিযে যেতে পাবব না। তুমি কী বলছ?'

'আজ বাতে পাববে না। অসম্ভব।'

'সম্ভব অসম্ভব তুমি আমাকে শেখাতে এসো না।'

মুনিযা তাব মেযেকে তুলে নিযে গেল। রূপা আমাব দিকে তাকিযে সহজ গলায বলল, 'ঘুমোতে আস।'

আমি বললাম, 'তুমি ঘুমাও। আমি একটু পবে আসছি।' আমি সফিকেব উপন্যাস নিযে বসলাম।

উপন্যাসটা গত দশদিন ধবে পড়াব চেষ্টা কবছি। কযেক পাতা পড়াব পবই বাধা পড়ে, আবাব গোড়া থেকে শুরু কবি। প্রথম পাতা আমাব দশবাব পড়া হযেছে। এতে মজাব একটা ব্যাপাব হযেছে, কোন্ লাইনেব পব কোন্ লাইন আমাব জানা হযে গেছে। একটা পবিচিত গান শুনতে যেমন ভালো লাগে, পবিচিত উপন্যাস পড়তেও দেখি তেমনি আনন্দ।

রূপা বলল, 'সত্তব পৃষ্ঠাব একটা বই শেষ কবতে তোমাব এতদিন লাগছে?'

আমি বললাম, 'বইটা মুখস্থ কবার চেষ্টা কবছি।'

'ও আচ্ছা।'

রূপা বিছানায শুতে শুতে বলল, 'সফিক কি তোমাব খুব ভালো বন্ধু?'

'একসময ছিল, এখন না।'

'তোমাব বন্ধুবান্ধব তেমন নেই, তাই না?'

'কিছু কিছু আছে।'

'নাম বল তো।'

আমি চুপ কবে গেলাম। পড়াব মাঝখানে বাধা পড়েছে। আবাব গোড়া থেকে পড়া শুরু কবা দরকাব। ঠিক মন বসাতে পাবছি না। রূপা চুল আঁচড়াচ্ছে। বাব বাব ঐদিকে চোখ চলে যাচ্ছে।

রূপা বলল, 'চা খাবে?'

'না।'

রূপা বলল, 'মনে হচ্ছে উপন্যাসটা আবার গোড়া থেকে শুরু কবেছ।'

'হুঁ।'

'মুখস্থ হয়েছে খানিকটা?'

'এখনো না।'

'লিখে লিখে প্র্যাকটিস কর। তাড়াতাড়ি হবে।'

উপন্যাসটা খুব সুবিধার লাগছে না। নায়ক কোনো কাজকর্ম করে না। ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়ায়। কখনো সাইকেলে, কখনো পায়ে হেঁটে। মনে হচ্ছে তার হাঁটাতেই আনন্দ। ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে শুধু হাঁটে। মাঝে মাঝে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। তৃষিত নয়নে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ সেই বাড়ির বারান্দায় একজন রূপবতী তরুণীকে দেখা যায়। তাদের মধ্যে কোনো কথা হয় না। দেখা হল — এই একমাত্র আনন্দ। রূপবতী তরুণীব যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে রূপার খুব মিল। ব্যাপারটা অস্বস্তিকব। মিল আরেকটু কম থাকলে ভালো হত। বাঙালি মেয়ের নীলবর্ণ চোখ খুব বিশ্বাসযোগ্যও নয়।

বই বন্ধ করে আমি বারান্দায এসে দেখি অনিদ্রারোগে আক্রান্ত আমার জাজ সাহেব বাবা ইজিচেয়ারে বসে আছেন। বাবার ঘর থেকে ইজিচেযার আবাব ট্রান্সফাব হযেছে বারান্দায। বাবার হাতে চায়ের কাপ। তিনি নিঃশব্দে চা খাচ্ছেন। গভীব রাতেব এই চা তিনি নিজে বানান। তাঁব বানানো চা একদিন খেযে দেখতে হয। তাঁকে কি বলব, বাবা এক কাপ চা বানিযে দাও? যদি বলি তিনি কীভাবে রিএক্ট করবেন?

'রঞ্জু।'

'জ্বি।'

'আজ বাতে তোমাব সঙ্গে যেসব কথা বলেছি তার জন্যে আমি দুঃখিত। এবং খানিকটা লজ্জিত।'

'দুঃখিত এবং লজ্জিত হবাব কিছু নেই বাবা। আপনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন।'

'না ঠিক বলি নি। তোমাব উপর অবিচাব করা হযেছে। আই অ্যাম সবি। চেযাবটায বস।'

আমি বসলাম। বাবা চাযেব কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'তোমাব প্রতি আমাব যে বিশেষ এক ধবনের দুর্বলতা আছে তা—কি তুমি জান?'

'জানি।'

'না তুমি জান না। তবে তোমাব জানা থাকা প্রযোজন। জানলে পিতা-পুত্রেব সম্পর্ক সহজ হবে।'

'আমাদের সম্পর্ক সহজই আছে।'

'সম্পর্ক সহজ নেই, তা আমি যেমন জানি তুমিও জান। তোমার প্রতি আমাব বিশেষ দুর্বলতার কারণ বলি। তোমার জন্মের এক মাস পরেব ঘটনা। আমি তোমাকে কোলে নিয়ে হাঁটছি। ছোট বাচ্চা কোলে নিযে হাঁটাব অভ্যাস নেই। হঠাৎ কি যে হল তুমি আমাব কোল থেকে নিচে পড়ে গেলে।'

'এই ঘটনা আমি জানি, অনেকবার শুনেছি।'

'না শোনার কোনো কারণ নেই। এটা একটা ভয়াবহ ঘটনা। তোমার জীবন সংশয হয়েছিল। এরপর থেকে তুমি যখন উদ্ভট কিছু কর আমি নিজেকেই দোষ দেই। তোমাকে দেই না। তোমার বিচিত্র কাণ্ডকাবখানার জন্যে নিজেকে দাযী করি। আমাব মনে হয মাথায় আঘাত পাওয়ার ফলে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি ঠিকমতো বিকশিত হয় নি। এর ফল খুব শুভ হয় নি। তুমি ভয়াবহ ধরনের প্রশ্রয় পেযেছ। প্রশ্রযের ফল কখনো শুভ হয না। আমার কথা তো শুনলে — এখন তোমার কি কিছু বলার আছে?'

'আছে।'

'বল, আমি শুনব। খুব পেশেন্ট হিয়ারিং দেব।'

আমি সহজ গলায় বললাম, 'বাবা, আপনি কি আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াবেন?'

জাজ সাহেব বাবা হতভম্ব হয়ে আমাব দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাকিয়ে রইলাম সজনে গাছটার দিকে। গাছটা মবে যাচ্ছে। ধীরে ধীবে মবছে।

মুনিযাব ঘর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। মা তাকে সান্ত্বনা দিযে কি সব যেন বলছেন। লাবণ্যও জেগে উঠেছে। চেঁচিযে চেঁচিযে বলছে — 'মামিব ঘরে যাব। মামির ঘরে যাব।'

ছাদের সিঁড়িতে খটখট শব্দ কবতে কবতে বাবু নেমে এল। তাব চোখে মুখে চাপা আতংক। সে আমাব দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ গলায বলল,. 'দাদা তুমি কি আমাব ঘরেব দরজায কড়া নেড়েছ?'

'কখন?'

'এই ধর পাঁচ মিনিট আগে?'

'না।'

বাবু চোখ বড় বড় কবে বলল, 'দাদা, একটু আস তো আমাব ঘবে।'

বাবাকে ইজিচেযাবে বেখে আমি বাবুব সঙ্গে ছাদে উঠে গেলাম। বাবু বলল, 'ঘুমোচ্ছিলাম বুঝলে, কড়া নাড়াব শব্দে ঘুম ভাঙল। আমি বললাম, কে? কোনো উত্তব নেই। আবাব কড়া নাড়া। দরজা খুলে দেখি কেউ নেই। ব্যাপাব কী বল তো?'

আমি শান্ত স্ববে বললাম, 'ভূত বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'ভূত মানে? কী বলছ তুমি! ভূত আবাব কী?'

'ভূত হচ্ছে অশবীবী আত্মা। তোদের ফিজিক্স কি ভূত স্বীকাব কবে না?'

'দাদা তুমি আমাব সামনে থেকে যাও। উদ্ভট সব কথাবার্তা . . . ভূত! আমি কি কচি খোকা?'

আমি বললাম, 'তুই এক কাজ কব, বাতি নিভিযে দবজা বন্ধ কবে বসে থাক — ভূত হলে আবাব কড়া নাড়বে। ওব নিশ্চযই ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা আছে। তোব সঙ্গে ডিসকাস কবতে চায।'

'দাদা তুমি নিচে যাও। তোমাকে বলাই ভুল হযেছে।'

আমি আমাব ঘরে ঢুকে দেখি — রূপাও জেগে আছে। বাত তিনটা। এই সময়ে বাড়িব প্রতিটি মানুষ জেগে — ব্যাপাবটা আমাব কাছে খুব ইন্টাবেস্টিং মনে হচ্ছে।

৭

লাবণ্যকে তার বাবা নিযে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরত দিযে যাবাব কথা। ফেরত দেয নি। চাব ঘণ্টা পাব হযে গেছে। দুপুর একটার সময নিযেছে — এখন বাজছে পাঁচটা। শীতেব সময পাঁচটাতেই চাবদিক অন্ধকার। মুনিযাব মাথা খাবাপেব মতো হযে গেছে। আমি বললাম, 'চোব ডাকাত তো মেয়েকে নেয নি। মেয়ের বাবা নিযে গেছে। ফিরতে দেবি হচ্ছে। হয়তো ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়েছে।'

মুনিয়া তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়লে তিন ঘণ্টা লাগবে?'

'তাহলে অন্য কোনো ব্যাপার। তারা হয়তো ঠিক করেছে রাতে এক সঙ্গে ডিনার করবে। কোনো একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে . . .'

'চুপ কর। আমাকে না বলে চায়নিজ রেস্টুরেন্টে নেবে? মেয়ে তার না আমার?'

'দুজনেরই, ফিফটি ফিফটি।'

'আমি নমাস পেটে ধরলাম আর মেয়ে দুজনের ফিফটি ফিফটি?'

'অনুচিত ধরনের ভাগাভাগি তো বটেই। অনুচিত হলেও কিছু করার নেই — সমাজ ঠিক করে দিয়েছে।'

মুনিয়া এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন আমিই সেই সমাজ। এক্ষুনি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। তাকে দেখাচ্ছে বাঘিনীর মতো। আমি বললাম, 'তুই আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছিস কেন? সমাজের নিয়মকানুন তো আমার তৈরী না।'

'দাদা, তুই ওর খোঁজ নিয়ে আয।'

'কোথে কে খোঁজ আনব? বাসায যাব? তুই যেভাবে তাকাচ্ছিস তাতে মনে হয বাসায় যাওযাই উচিত। ঠিকানা দে ; যাচ্ছি।'

'ঠিকানা জানি না।'

'টেলিফোন নাম্বার?'

মুনিয়া কোনো কথা বলল না। দেখা গেল সে টেলিফোন নাম্বাবও জানে না। আমি বিস্মিত হযে বললাম, 'টেলিফোন নাম্বাব, ঠিকানা তুই কিছুই জানিস না?'

· 'ঐ পিশাচটার ঠিকানা আমি বাখব কেন?'

'তা তো বটেই। তার কোনো আত্মীযস্বজনেব ঠিকানা আছে? সেখান থেকে পিশাচ সাহেবের ঠিকানা বেব কবার একটা চেষ্টা চালানো যেতে পাবে।'

'কারো ঠিকানাই আমি জানি না। ওব এক মামা থাকে নারাযণগঞ্জে। কোথায জানি না। মোজা কারখানাব ম্যানেজাব।'

আমি বললাম, 'এই ক্ষেত্রে কিছুই কবার নেই। বাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা কব। এব মধ্যে এসে পড়বে। পিশাচ সাহেব নতুন সংসাব পেতেছেন। এব মধ্যে একটা মেযে নিযে ঢুকাবেন না। ঢুকালে তাঁবই যন্ত্রণা। মেযেকে তোব কাছেই দিযে যাবেন। অপেক্ষা কবতে থাক্।'

মুনিযা উঠে চলে গেল।

আমি অলস ভঙ্গিতে সফিকেব উপন্যাসেব পাতা উল্টাচ্ছি। আমাব কিছু কবাব নেই। রূপা খুব ভোরবেলায সেজেগুজে বের হযে গেছে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস কবি নি। সেও কিছু বলে নি। শুধু ঘব থেকে বেরুবার সময বলল, 'দুদিন ধরে তুমি দাঁড়ি গোঁফ কামাচ্ছ না। তোমাকে দেখাচ্ছে ব্যর্থ প্রেমিকেব মতো। আজ ফিবে এসে যেন তোমাকে ক্লিন শেভড দেখতে পাই।'

এই পর্যায়ে আমি খুব সহজেই বলতে পাবতাম, কখন ফিরবে?

বলি নি। বলতে ইচ্ছা করল না।

রূপা যখন ঘরে থাকে না তখন আমাবও ঘরে থাকতে ইচ্ছা করে না। তাবপরেও আজ সারাদিন ঘরেই ছিলাম। এখন আর ঘরে থাকতে ইচ্ছা করছে না। সফিকেব উপন্যাসের নায়কের মতো রাস্তায় নেমে পড়তে ইচ্ছা করছে। সাইকেল থাকলে ভালো হত। সাইকেলে করে ঘুরতাম। সফিকেব উপন্যাসের নাযক লোকমান রাতের বেলা সাইকেলে করে ঘুরে এবং মাঝে মাঝে সাইকেলের সঙ্গে গল্প করে। সাধারণত সাইকেলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা খুব দার্শনিক ধবনের হয। যেমন নায়ক বলল, 'পথের শেষ কোথায়?'

সাইকেল টুনটুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে ঘণ্টাতেই উত্তর দিল, 'পথের শুরুতেই হচ্ছে পথের শেষ।'

'তার মানে কী?'

'মানে খুব সহজ। শুরুই শেষ। আবার শেষই শুরু।'

'বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে না পারার কিছু নেই। পথ হচ্ছে জীবনের মতো। জীবনের শেষ হচ্ছে জীবনের শুরুতে। পথের বেলাতেও তাই।'

'তাহলে ভালবাসার শেষ কোথায়?'

'ভালবাসার শেষ হচ্ছে ঘৃণার শুরুতে . . .।'

লোকমান সাহেব এবং সাইকেলে কথাবার্তার এই হচ্ছে সামান্য নমুনা। উপন্যাস যত এগোতে থাকে কথাবার্তা ততই জটিল হতে থাকে। এমন দার্শনিক ধরনের সাইকেল লোকমান কোথায় পেয়েছে কে জানে।

আমি কাপড় পাল্টালাম। ঠিক করলাম রাত এগারটা পর্যন্ত বাইরে থাকব। বাসায় ফিরে এসে যেন দেখি লাবণ্য ফিরেছে, রূপাও ফিরেছে। মুনিয়া শান্ত হয়েছে।

বাড়ি থেকে বের হবার আগে বাবার ঘরে উঁকি দিলাম। বাবা অবেলায় বিছানায় শুয়ে আছেন। তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'কে?'

'বাবা আমি রঞ্জু।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনার কাছে কি হাজার তিনেক টাকা হবে?'

'কী জন্যে?'

'আমার একটু দরকার ছিল, ব্যক্তিগত প্রয়োজন।'

'আমার টাকা তোমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্যে তা মনে করার কোনো কারণ দেখছি না।'

'ও আচ্ছা, তাহলে থাক।'

'প্রয়োজনটা কী?'

'ভাবছি একটা সাইকেল কিনব।'

বাবা বিছানায় উঠে বসলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কী বললে?'

'একটা সাইকেল কিনব।'

'হোয়াই?'

'রাতে রাস্তায় ট্রাফিক কম থাকে। তখন সাইকেলে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব।'

'কেন?'

'রাতের বেলা সাইকেলে করে ঘুরে বেড়ানো খুব ইন্টারেস্টিং।'

'তোমাকে কে বলেছে?'

'লোকমান।'

'লোকমানটা কে?'

'সফিক একটা উপন্যাস লিখেছে তার নায়ক।'

'তুমি সামনের চেয়ারটায় বস।'

আমি বসলাম। বুঝতে পারছি বাবা নিজেকে গুছিয়ে নিতে সময় নিচ্ছেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

'রঞ্জু।'

'জ্বি।'

'তোমার ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এইসব কী বলছ? বাবুর কাণ্ডকারখানারও কোনো আগা মাথা পাচ্ছি না — সে দেখি বারান্দায় ক্যাম্পখাটে ঘুমোচ্ছে। তাকে বললাম, কী ব্যাপার? সে বলল, চিলেকোঠার ঘরে তাব নাকি একা ঘুমোতে ভয় লাগে। ভূতের উপদ্রব।'

আমি সহজ গলায় বললাম, 'একটা ভূত তাকে খুব বিরক্ত করছে। ঘুমোলেই কড়া নেড়ে ঘুম ভাঙিযে দেয। এ জন্যেই বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। বারান্দায় তো আর কড়া নাড়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।'

বাবা অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমাব দিকে তাকিযে থেকে বললেন, 'আচ্ছা তুমি যাও। তিন হাজার টাকা আমি তোমাকে দেব। এখন দিতে পারছি না। ব্যাংক থেকে তুলতে হবে। লোকমানের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও।'

লোকমানেব মতো আমি ঘণ্টাখানিক বাস্তায় হাঁটলাম। তাবপব গেলাম সফিকেব খোঁজে।

যথারীতি সফিক নেই। তার বোন সুমি বিস্মিত হযে বলল, 'আপনি? আপনি কোত্থেকে?'

আমি বললাম, 'যাচ্ছিলাম এইদিক দিযে। ভাবলাম, দেখি সফিক আছে কিনা। তাব বইটা পড়া ধরেছি। দশ পাতা পড়েছি।'

'এক সপ্তাহে মাত্র দশ পাতা?'

'ধীরে ধীরে পড়ছি। আমি তোদেব মতো দ্রুত পড়তে পাবি না। চা খাওযাতে পাবিস? বিকেলে চা খাওয়া হয নি।'

'এখন তো চা খাওযাতে পারব না। আমবা সব বিযেবাড়িতে যাচ্ছি। এমনিতেই আমাদের দেবি হযে গেছে।'

'ও আচ্ছা। আমি ভেবেছিলাম খানিকক্ষণ তোব সঙ্গে গল্প কবব।'

সুমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিযে বইল। কি একটা বলতে গিযেও বলল না। সে বিযেবাড়ি উপলক্ষে সাজসজ্জা করেছে। কিছু কিছু মেযে আছে যাদের সাজলে খারাপ দেখায। সুমি তাদেব একজন। তাকে বীতিমতো কুৎসিত দেখাচ্ছে।

সুমি বলল, 'আপনি কি বিশেষ কোনো প্রসঙ্গে আলাপ কবতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'আজ না। অন্য আবেকদিন আসুন। অবশ্যি আমাব মনে হয না আপনি আলাপ কবতে চান। আপনি কথাব কথা বলেছেন। কেউ যখন কথার কথা বলে তখন সেটা বোঝা যায। আচ্ছা আপনার কি কোনো কারণে মনটন খারাপ?'

'না তো।'

'আপনাকে কেমন যেন অসুস্থ লাগছে। আপনি বাসায চলে যান। বাসায গিযে আবাম করে ঘুমান। ভাবী কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'ভাবী সিনেমা করছেন এটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'আচ্ছা, উনি নাকি অসম্ভব রূপবতী। ভাইযা বলছিল হেলেন অব ট্রয তাঁকে দেখলে অপমানে গলায় দড়ি দিত। সত্যি?'

'সেটা হেলেন অব ট্রয়কে জিজ্ঞেস করাটাই কি উচিত না?'

'উনাকে তো পাচ্ছি না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।'

'হেলেন অব ট্রয় খুব সম্ভব ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। মেয়েরা সহজে গলায় দড়ি দেয় না।'

'ভাবীর সংগে আমার খুব কথা বলার শখ। একদিন যদি কথা বলার জন্যে আপনাদের বাসায় যাই উনি কি রাগ করবেন?'

'ও রাগ করতে পারে না। তবে মানুষদের খুব সহজে রাগিয়ে দিতে পারে। আচ্ছা সুমি যাই। তোর মনে হয় দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'আবার কবে আসবেন?'

'দেখি। এমন খারাপ করে সেজেছিস কেন? কুৎসিত লাগছে। তোকে তেলাপোকার মতো লাগছে।'

সুমি রাগ করল না। হাসল। সুমির সংগে এই একটা দিকে রূপার মিল আছে। রূপার মতো সেও রাগ করে না। আমি অনেকবার চেষ্টা করে দেখেছি। রাগাতে গেলে হাসে।

'যাই সুমি?'

'আচ্ছা যান। চা খাওয়াতে পারলাম না, কিছু মনে করবেন না।'

'তোকে কুৎসিত লাগছে এটা ঠিক না, ভালোই লাগছে। ঠাট্টা করে বলেছিলাম।'

সুমি চুপ করে রইল। আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না। নাটকীয় ভঙ্গিতে অবশ্যি বলতে পারি, বিয়ে কোথায় হচ্ছে আমাকেও নিয়ে চল্। বিয়ে বাড়িতে যত বেশি লোক নিয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। একজনকে দাওয়াত করলে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে যেতে হয়। যিনি দাওয়াত করেছেন তাঁর যেন আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, 'সুমি।'

'জ্বি।'

'আমাকেও সংগে নিয়ে চল্। অনেকদিন বিয়ে খাওয়া হচ্ছে না।'

'আপনার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? বাসায় যান তো।'

'আচ্ছা যাচ্ছি, কথা বলে যত সময় নষ্ট করলি এর মধ্যে এক কাপ চা খাইয়ে ফেলতে পারতিস।'

'বসুন তা হলে। দেখি ব্যবস্থা করা যায় কিনা। আমাদের অবশ্যি এমনিতেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। বাবা এখনো ফিরেন নি। উনি ফিরলেই রওনা হব।'

আমি বসলাম।

বসার ঘরটাকে এরা মোটামুটি আস্তাবল বানিয়ে রেখেছে। বিশাল এক খাট পাতা। খাটের উপর ময়লা তোশক। কোনো চাদর নেই। কেউ বোধহয় সকালে মুড়ি খেয়েছে। তোশকে এবং মেঝেতে মুড়ি পড়ে আছে। মেঝেতে তিন জায়গায় খবরের কাগজের তিনটা পাতা। টেবিল একটা আছে। সেই টেবিলে আধ খাওয়া চায়ের কাপে ভনভন করে মাছি উড়ছে। রাতের বেলা মাছি উড়ার কথা না, কিন্তু এ বাড়িতে উড়ছে।

চায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই সুমির বাবা এসে পড়লেন। এই কয়েকদিনে তিনি আরো বুড়ো হয়ে পড়েছেন। তাঁর আরেকটা দাঁত পড়ে গেছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, 'কে?'

'জ্বি আমি, আমার নাম রঞ্জু।'

'কোন রঞ্জু?'

'সফিকের বন্ধু।'

'ও আচ্ছা, সফিকের বন্ধু। হারামজাদা আছে কোথায় তুমি জান?'

'জ্বি না।'

'দেখা হবে তার সাথে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'দেখা হলে বলবে বাসায় যেন না আসে। বাসায় এলে জুতিয়ে হারামজাদার আমি.... '

'সফিক কি নতুন কিছু করছে?'

'বই লিখেছে জান না?'

'শুনেছি।'

'সেই মহান সাহিত্য আবার আমাকে উৎসর্গ করা হয়েছে। লেখা — আমার পরম পূজনীয় বাবাকে ... আরে ছাগল, বাপের উপর ভক্তিতে গলে যাচ্ছিস। বাপ সংসার টানতে টানতে ভারবাহী পশু হয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই? তোকে ডাক্তার বানাতে গিয়ে যে পথের ফকির হয়েছি সেদিকে খেয়াল আছে রে হারামজাদা? চাকরি পেয়েছে, চাকরি করবে না। সাহিত্য করবে। করাচ্ছি তোমাকে সাহিত্য। জুতিয়ে আমি তোমাব হাড্ডি ভেঙে দেব। সাহিত্য কত প্রকার ও কি কি হাড়ে হাড়ে বুঝবে।'

উনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। সুমি চায়ের কাপ হাতে ঢুকল এবং বলল, 'খুব তাড়াতাড়ি চা খেয়ে চলে যান। বাবার মেজাজ আকাশে উঠে গেছে। বিয়ের উপহাব কিনতে গিয়েছিলেন, পকেটমার হয়েছে।'

'তোদের তাহলে আর বিয়েতে যাওয়া হচ্ছে না।'

'মনে হয় না।'

বাসায় ফিরলাম রাত সাড়ে এগারটায়। রূপা ফেবে নি। লাবণ্যও ফেবে নি। মুনিয়া একবার ফিট হয়েছে। তার মাথায় বর্তমানে পানি ঢালা হচ্ছে।

লাবণ্যর বাবার মামা, যিনি নারাযণগঞ্জেব মোজা কাবখানাব ম্যানেজার তাঁব ঠিকানা পাওয়া গেছে। বাবুকে বলা হচ্ছে সেখানে গিয়ে লাবণ্যব বাবার ঠিকানা জোগাড় কবতে। বাবু বিস্মিত। এরকম অদ্ভুত প্রস্তাব কেউ যে তাকে করতে পারে তাই সে ভাবতে পারছে না।

'আমাকে নারায়ণগঞ্জে যেতে বলছ?'

মুনিয়া ক্ষীণ স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

'দশ দিন পর আমার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, এখন আমি যাব নারায়ণগঞ্জ?'

'হ্যাঁ।'

'ফাজলামি কথা আমার সঙ্গে না বললে ভালো হয়।'

মুনিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার মেয়ের কোনো খোঁজ নেই এটা কি কোনো ফাজলামি কথা?'

'আমাকে যে নারায়ণগঞ্জ যেতে বলা হচ্ছে এটাই ফাজলামি কথা, কারণ নারায়ণগঞ্জ কোথায় তাই আমি জানি না।'

আমি বললাম, 'কোনো সমস্যা নেই, আমি যাব নারাযণগঞ্জ। মুনিয়া, তুই কান্নাকাটি বন্ধ কর তো। যা ভাত আন। আমি ভাত খেয়েই রওনা হব।'

'ভাত খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, ভাত খাব না, ভালো কবে এক কাপ চা বানিয়ে আন। চা খেয়ে রওনা দি।'

নারায়ণগঞ্জ যেতে হল না। লাবণ্যর বাবা টেলিফোন করলেন। জানা গেল বিশেষ কাজে আটকা পড়েছেন বলে তিনি লাবণ্যকে দিয়ে যেতে পারেন নি। ভোরবেলা নিয়ে আসবেন। মুনিয়ার মুখে হাসি ফিরে এল।

রাত একটার মতো বাজে।

আমি বারান্দায় অলস ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছি। ভাব কবছি যেন কিছুই হয নি। ভাবুক ধরনের একজন মানুষ ঘুমোবার আগে নৈশ ভ্রমণেব একটা অংশ সারছেন। ভঙ্গিটাকে আরো জোরদার করার জন্য গুনগুন করে গান গাওয়া যায কিংবা শিস দেযা যায — অবশ্যি তাব এখন প্রযোজন নেই। কেউ আমাকে লক্ষ কবছে না। বাড়ি নিঝুম। সবাই ঘুমিযে পড়েছে।

কোনো কিছু চিন্তা না করে মানুষ কি হাঁটাহাঁটি কবতে পাবে? একটা মানুষ হেঁটে যাবে কিছুই ভাববে না। তাব মাথা থাকবে ফাঁকা, আমাব মনে হয এটা খুবই অসম্ভব একটা ব্যাপাব। মানুষ সাবাক্ষণই ভাবে। তাব মস্তিষ্ক কখনো বিশ্রাম নেয না। মস্তিষ্কেব বিশ্রাম গ্রহণেব কোনো ক্ষমতা নেই।

আমি হাঁটছি আর ভাবছি—কোনো কিছু নিযে চিন্তা করব না। পৃথিবী বসাতলে যাক — কিছুই যায আসে না। বাস্তবে তা হচ্ছে না, মাথাব ভেতরে রূপা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে ফেরে নি। কোথায গিযেছে তাও জানি না। মাথায বেশ কযেকটা সম্ভাবনা খেলা করছে। কোনোটাই খুব স্পষ্ট নয। স্বপ্ন দৃশ্যেব মতো অস্পষ্ট এবং দুর্বল যুক্তিব সম্ভাবনা। মাথাব ভেতব এক সংগে অনেকগুলো ভাবনা। একটা অন্যটাব ভেতব জড়িযে জট লেগে গেছে। খণ্ড খণ্ড দৃশ্য চোখেব সামনে ভাসছে, ভেসেই মিলিযে যাচ্ছে। কযেকটি দৃশ্যেব উল্লেখ কবা যাক।

দৃশ্য–১

সময : বাত ৩টা

পুলিশেব গাড়ি এসে থামল। দবজায নক। বুটেব লাথি। পুলিশ কখনো কলিং বেল বাজায না। কলিং বেল খুঁজে বেব কবাব মতো ধৈর্য এদের নেই। আমি দবজা খুলে দিলাম। পুলিশ অফিসাব বললেন, 'আপনি কি রূপাব স্বামী?' (এইখানে লজিক খুব দুর্বল। আমাকে দেখেই পুলিশ অফিসাব কী কবে বুঝবেন আমি রূপাব স্বামী? শার্লক হোমসেরও এটা বোঝার জন্যে সময লাগাব কথা। তবে অলস চিন্তায় দুর্বল লজিকও চলে যায।) আমি পুলিশ অফিসাবেব দিকে তাকিযে শীতল গলায বললাম, 'হ্যাঁ। আপনারা কী চান?'

'আপনাকে একটু আমাদেব সঙ্গে থানায যেতে হচ্ছে।'

'কেন বলুন তো?'

'থানায গিযেই বলব।'

আমি তাদেব সংগে জিপে উঠে বসলাম, জিপ উড়ে চলল। পথ ফুরাচ্ছেই না। আমি ঝিম ধবে বসে আছি।

দৃশ্য–২

সময : ভোব ৯টা

আমি চা খাচ্ছি। মুনিযা খবরের কাগজটা আমার কোলে ফেলে দিয়ে বলল, এই নে কাগজ। আমি চাযে চুমুক দিতে দিতে চোখ বুলাচ্ছি। হেডিং পড়বার পর কোনো খবরই বিস্তারিত পড়তে ইচ্ছা করছে না। একটা খবরে হঠাৎ চোখ আটকে গেল। 'অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীব লাশ উদ্ধার।' যুবতীব বর্ণনা পড়ে মনে হচ্ছে — এ রূপা। রূপা ছাড়া আব কেউ নয . . .

দৃশ্য–৩

সময় : দুপুর

আমি ঘুমোচ্ছি। টেলিফোন এল। টেলিফোন ধরলাম। ও–পাশ থেকে রূপা বলল, 'কে? তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো আছ?'

'আছি।'

'তোমাকে একটা জরুবি বিষয বলার জন্যে টেলিফোন করেছি।'

'বল।'

'তোমার সংগে আর জীবনযাপন করতে পাবছি না। আমি দূবে সবে গেলাম। কিছু মনে করো না।'

'আচ্ছা।'

'টেলিফোন রাখি, কেমন?'

খট করে টেলিফোন নামিয়ে বাখার শব্দ। দৃশ্যের সমাপ্তি। আমি আবাব এসে বিছানায শুযে পড়লাম। ভাঙা ঘুম জোড়া লাগাবার চেষ্টা কবছি।

যে তিনটি খণ্ড দৃশ্যের কথা উল্লেখ কবলাম তা থেকে কি আমাব মানসিক অবস্থা বোঝা যাচ্ছে? আমাকে কি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে? আমি জানি, তা মনে হচ্ছে না। আমি প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা ভোগ কবছি না। এক ধরনেব শূন্যতা বোধ কবছি।

আমাদের বাসাব অন্য সবাইও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। যে বাড়িব বৌ কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে — বাত একটা বেজে গেছে এখনো ফিবছে না, তাদেব এত নিশ্চিন্তে ঘুমানোর প্রশ্ন ওঠে না। তারা তা কবতে পাবছে, কাবণ আমি তাদেব দুশ্চিন্তা দূব করেছি। খুব ভালোভাবেই দূব করেছি।

লাবণ্যব সমস্যা মিটে যাবার পর মা যখন অত্যন্ত চিন্তিত গলায বললেন, 'কি বে বউমা আসছে না কেন?' তখন আমি বিস্মিত গলায বললাম, 'আসবে কেন? বান্ধবীব জন্মদিনে গেছে, সেখান থেকে বাপের বাড়িতে চলে যাবে। তাব কোনো এক মামাতো বোন এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। তাব সংগে সারাবাত গল্প বলাব প্ল্যান।'

'তোকে নিয়ে গেল না কেন?'

'দুবোন গল্প করবে, সেখানে শুধু শুধু আমাকে নিয়ে যাবে কেন?'

মা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হযে চলে গেলেন। মানুষের দুশ্চিন্তা কত সহজেই না দূব কবা যায়! এখন যদি কেউ টেলিফোন কবে আমাকে শুধু বলে রূপা বিযেবাড়িতে গিযে আটকা পড়েছে, ভোরবেলা ফিরবে। আমি নিশ্চিন্ত হযে ঘুমোতে যাব। আমাব সুনিদ্রা হবে। সুন্দব কিছু স্বপ্নও দেখে ফেলতে পাবি।

রাত দুটার দিকে ঘুমোতে গেলাম। ভালো ঘুম হল। আশ্চর্যের ব্যাপাব, স্বপ্নও দেখলাম। স্বপ্নে দাড়িওয়ালা এক লোকের সংগে খুব গল্প হচ্ছে — কিছুক্ষণ পবপর সে বলছে, ভাইজান, ভাইজান। বলেই আবার খানিকক্ষণ পর পর হাসছে — সেই হাসি মেয়েলি গলার হাসি। গলাটাও চেনা চেনা, রূপার গলার সংগে মিল আছে। ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখি হাসছে রূপা। রূপা লাবণ্যকে কাতুকুতু দিচ্ছে, লাবণ্য হাসছে, রূপাও হাসছে। দুজনই আমার বিছানায। রূপা আমার দিকে তাকিযে বলল, 'বাবুব ঘুম ভাঙল?'

আমি কিছু বললাম না। রূপা বলল, 'আমরা দুজন আধ ঘণ্টা ধরে তোমার বিছানাব পাশে হাসাহাসি করছি তাবপরেও তোমার ঘুম ভাঙছে না, আশ্চর্য ঘুম তো তোমাব!' আমি

হাই তুলে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। প্রায় জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, কখন এসেছ? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম। থাক। ছাড়া ছাড়া ভাবটাই ভালো। রূপা আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এই শুনছ?'

'শুনছি।'

'কাল যা বিপদে পড়েছিলাম — মাই গড!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ডেমরার কাছে আমাদের জিপ একাটা ভিখিরিকে হিট কবল। বেচারাব মাথা ফেটে রক্তাবক্তি। পাবলিক ফিউরিযাস। কেলেংকারি হয়ে যাবাব অবস্থা। আমাদেব সঙ্গে আকবর ছিল। আকবর যে কোনো সিচুযেশন ম্যানেজ করতে পাবে। সে সিচুযেশন ম্যানেজ করে ফেলল। আমরা ভিখিরিকে হাসপাতালে নিযে এলাম। থানা পুলিশ। ভিখিরি এই মবে, সেই মরে। আমরা চলে আসতে পাবতাম। আমার কাছে ব্যাপাবটা খুব ইনহিউম্যান মনে হল। আমি আব আকবব দুজন বযে গেলাম। তিনবাব টেলিফোন করলাম, কেউ টেলিফোন ধরে না।'

'ভিখিবির অবস্থা কেমন ?'

'এখন একটু স্টেবল। ডাক্তাববা বলছেন আউট অব ডেনজাব। চা খাবে ?'

'খেতে পারি।'

'মুখ ধুযে এস। চা আসছে। মুনিযাকে চা দিতে বলে এসেছি। সে এক্ষুনি আনবে।'

রূপা আবার লাবণ্যকে হাসাতে লাগল। তাদেব দুজনেব মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হচ্ছে। কথাবার্তা হচ্ছে সাংকেতিক ভাষায যাব মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝলাম না। কথাবার্তা এ বকম,

রূপা : কিটেমন ইটাছ?

লাবণ্য : ভিটালো ইটাছি।

রূপা : তিটুমি ইটামাকিটে ভিটাল বিটাস?

লাবণ্য : বিটাসি।

আমি ওদের অদ্ভুত ভাষাব কথাবার্তা শুনছি। মজাই লাগছে। এই ভাষার ওপব মনে হয এদেব দুজনেবই বেশ দখল। দ্রুত কথা বলে যাচ্ছে। এমন মজাব কথাবার্তাব মাঝখানে হাসপাতাল থেকে খবর এল ভিখিরি মাবা গেছে। রূপা কাঁদতে শুরু কবল। হৈচৈ ধবনেব কান্না। মা বিস্মিত হযে বললেন, 'বৌমা কাঁদছে কেন?'

আমি বললাম, 'একজন ভিখিবি মাবা গেছে তাই কাঁদছে।'

'তামাশা করছিস নাকি?'

'না, তামাশা কবছি না। শুধু শুধু তামাশা কবব কেন?'

মা কঠিন দৃষ্টিতে আমাব দিকে তাকিযে বইলেন।

৮

আজ মাসেব প্রথম শুক্রবাব।

মাসেব প্রথম শুক্রবারে মা কিছু এতিম খাওযান। বেজোড় সংখ্যক এতিম — তিন, পাঁচ, কিংবা সাত। কোন হাদিসে তিনি পড়েছেন আল্লাহ্ নিজে যেহেতু বেজোড় তিনি বেজোড় সংখ্যা পছন্দ কবেন। বেজোড় সংখ্যাব উপব আল্লাহ্‌ব খাস বহমত।

কাজের ছেলে মাখন গিয়েছে এতিমের সন্ধানে। বাসায় তেহারী রান্না হচ্ছে। মা নিজেই রাঁধছেন। বাজারও তিনি নিজেই তাঁর রোজগারের টাকায় করে নিয়ে এসেছেন। কুটা বাছা সব নিজে করবেন। এতিমদের পরিবেশনার দায়িত্বও তাঁর নিজের। সোয়াবের ভাগ অন্য কাউকে দেবেন না। সবটাই তাঁর।

এতিম খাওয়ানোর দিনে আমরা একটু ভয়ে ভয়ে থাকি কারণ মার মেজাজ থাকে খুব খারাপ। তিনি খিদে সহ্য করতে পারেন না, এই দিনে তিনি রোজা রাখেন বলে মাথা ঠিক থাকে না।

আজ তাঁর মাথা অন্যদিনের চেয়েও খারাপ কারণ কাজের ছেলে খুঁজে পেতে মাত্র দুজন এতিম ধরে এনেছে। বেজোড় আনার কথা, জোড় এনেছে। তাদের খেতে দেয়া হয় নি, বসিয়ে রাখা হয়েছে। মাখন আবারো গেছে। তার ফেরার নাম নেই। আড়াইটা বেজে গেছে। আমাদের খাবার দেয়া হচ্ছে না, কারণ এতিম দুজন অতিথি। এরা খাওয়া শেষ করলে আমরা খাব।

এতিম দুজনের মধ্যে একজন উসখুস করছে। চলে যেতে চাচ্ছে। মনে হয় এ তেমন ক্ষুধার্ত না, কিংবা নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার মতো সাহস তার আছে। শূন্য থালা সামনে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকা যায় ?

পৌনে তিনটায় সাইকেলের পেছনে বসিয়ে মাখন তৃতীয় এতিম নিয়ে উপস্থিত হল। মাখনের মুখ ভর্তি হাসি। মা বললেন, 'একটা এতিম জোগাড় কবতে এতক্ষণ লাগল?'

মাখন দাঁত বের কবে বলল, 'আসল নকল বিচার কইরা আনা লাগে না? নকল এতিমে ঢাকা ভর্তি।'

'যেটা এনেছিস সেটা আসল?'

'বাজাইযা আনছি আম্মা।'

মা তিনজনকেই বসে বসে খাওযালেন। 'আবেকটু নাও', 'আরেকটু নাও', বলে খাদিমদারি করলেন। খাওয়ার শেষে পান সুপারি এবং তিনটা করে টাকা দেয়া হল। মা আনন্দিত মনে ঘরে ঢুকলেন। আর তখনি রূপার সঙ্গে তাঁর বড় ধরনের ঝামেলা বেধে গেল। ঝামেলার শুরুটা আমি জানি না। বাথরুমে ছিলাম, শুনতে পাই নি। যা শুনলাম তা হল — মা রাগী গলায বলছেন,

'তোমার ধারণা আমার এই এতিম খাওযানো ব্যাপারটা হাস্যকব?'

'জ্বি মা, আমার তাই ধারণা। খুব হাস্যকর।'

'দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষকে ভরপেট খাওয়ানো তোমার কাছে হাস্যকর?'

'যে ভঙ্গিমায় খাওয়াচ্ছেন তা হাস্যকর। আয়োজনটা হাস্যকর।'

'কেন?'

'ক্ষুধার্ত মানুষ, ভিখিরি এদের জন্যে আপনার আসলে তেমন কোনো মমতা নেই। এতিম খাওয়ানো উপলক্ষে হৈচৈ করতে পারছেন — এটাই আসল।'

'এই বযসে আসল নকল জেনে বসে আছ ? দুদিনেব মেযে, আমার ভুল ধরতে আস? নিজের ভুলগুলো চোখে পড়ে না?'

রূপা শান্তগলায বলল, 'আমাব কী ভুল মা?'

এর উত্তরে মা কিছু ভয়ংকর কথা বলে ফেললেন। তাঁকে ঠিক দোষ দেয়া যায না। সারাদিনের পরিশ্রমে এবং উপবাসে তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। তাছাড়া এই কঠিন কথাগুলো তাঁর মনে ছিল। বলার মতো পরিস্থিতি হয় নি। কে জানে মা হযতো এই পরিস্থিতিকেই কাজে লাগালেন। প্রতিটি মেয়েই নিষ্ঠুর হবার অসীম ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়।

মা বললেন, 'তোমার ভুল আমাকে বলে দিতে হবে? তুমি নিজে তা জান না? সিনেমা করার নামে রাজ্যের পুরুষদের সঙ্গে যে মাখামাখিটা কর তা তুমি নিজে জান না? নাকি নিজের অজান্তে কর? আর করবে নাই বা কেন? রক্তের টান আছে না? মার কাছ থেকেই তো শিখেছ? তোমাব মাও তো ক্লাবে ক্লাবে নেচে বেড়াত। কোন ধরনের মেয়ে ক্লাবে ক্লাবে নেচে বেড়ায় তা কি আমি জানি না? নাকি তুমি ভেবেছ আমিও বঞ্জুর মতো গাধা?'

রূপা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আমি বিস্মিত হয়ে ঘবে উপস্থিত অন্য মানুষগুলোর দিকে তাকালাম। কেউ কিছু বলছে না। কেউ মাকে থামাবার চেষ্টা করছে না। বাবা এমন ভাব করছেন যেন তিনি কিছুই শুনতে পান নি। মুনিযা তার মেয়ের মুখে তেহারী তুলে দেযায অতিবিক্ত বকমেব ব্যস্ত। আদর্শ মানব বাবু একমনে খেযে যাচ্ছে। আমার ধারণা মাযেব কোনো কথাই তাব কানে ঢোকে নি। তাব প্লেটের কাছে একটা বই খোলা। তার সমস্ত ইন্দ্রিয বইযে নিবদ্ধ। আগামীকাল থেকে তাব পরীক্ষা শুরু।

রূপা বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, কিছু কিছু জিনিস আমি আমাব মাযেব কাছ থেকে পেযেছি। আপনাকে বাগিযে দেবাব জন্যে দুঃখিত। আসুন, খেতে আসুন।'

মা চেঁচিযে বললেন, 'খেতে আসব মানে ? তুমি কি জান না আমি বোজা?'

'না, আমি জানতাম না।'

'এখন বল — বোজা রাখাও একটি হাস্যকব ব্যাপাব।'

রূপা তাব জবাব না দিযে আমার দিকে তাকিযে বলল, 'খেতে বস। তুমি না বললে তোমার ক্ষিধে পেযেছে?'

আমি খেতে বসলাম। লক্ষ করলাম রূপা খেতে পাবছে না। ভাত মাখাচ্ছে, মুখে তুলতে পারছে না। তাব চোখ ভেজা। আমি রূপাকে কখনো কাঁদতে দেখি নি। আজ কি সে কাঁদবে? রূপা কিছু কিছু জিনিস তাব মাযের কাছ থেকে পেযেছে। কঠিন আঘাতে না কাঁদাব স্বভাবও কি তাব মাযেব কাছ থেকে পাওযা?

বাবা খুব সম্ভব প্রসঙ্গ পাল্টাবাব জন্যে বললেন, 'বিবিযানী এবং তেহাবী এই দুটা জিনিসেব মধ্যে ডিফারেন্সটা কী?'

আদর্শ মানব বাবু অবাক হযে বলল, 'আমাকে কিছু বলছেন?'

'বিবিযানী এবং তেহাবী এই দুয়েব মধ্যে ডিফারেন্সটা কী?'

'আমাকে জিজ্ঞেস কবছেন কেন? আমি কি বাবুর্চি? আমাকে এমন জিনিস জিজ্ঞেস কববেন যাব উত্তব আমি জানি। যেমন ধরুন, আমাকে যদি জিজ্ঞেস কবেন — ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এবং কোযান্টাম মেকানিক্স এই দুযেব মধ্যে প্রভেদ কী তাহলে আমি বলতে পাবব। সেটা কি জানতে চান?'

বাবা অসম্ভব বিবক্ত হলেন। বাবু তাকাল রূপার দিকে।

'ভাবী, তুমি জানতে চাও?'

'চাই।'

'সত্যি চাও না কথার কথা?'

'সত্যি চাই।'

'ঠিক আছে বলছি। নিউটনেব নাম শুনেছ তো ভাবী? নিউটনের গতিসূত্র দিযে শুরু করা যাক . . .'

বাবু বক বক করে যাচ্ছে। রূপা মনোযোগী ছাত্রীর মতো তাকিযে আছে বাবুব দিকে। আমি তাকিযে আছি রূপার চোখের দিকে। দেখতে চাচ্ছি তাব ভেজা চোখ কি

শুকিয়ে যাবে? নাকি শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে সামলাতে পারবে না? কতটুকু শক্ত এই মেয়ে!

খাওয়া শেষ করে ঘরে এসেছি। রূপা পান চিবুতে চিবুতে ঘরে ঢুকল। হাসিমুখে বলল, 'মা মিষ্টি পান আনিয়েছেন। পান খাবে?'

আমি পান নিলাম।

'তুমি বিছানায় বস তো। আমি তোমার ইজিচেয়ারটায় বসে দেখি কেমন লাগে।'

আমরা জায়গা বদল করলাম। রূপা বলল, 'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি মুনিযার হাসবেন্ড অর্থাৎ এক্স হাসবেন্ড টেলিফোন করেছিলেন। তোমার সঙ্গে তাঁর নাকি ভীষণ জরুরি কথা আছে। ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন। দেখা করতে বললেন।'

'কবে দেখা করতে হবে?'

'আজ। বিকেলে চলে যেও।'

'আচ্ছা।'

'তুমি কি ঘুমোবে? ঘুমোতে চাইলে চাদর গায়ে শুয়ে পড়। আমি ইজিচেযাবে শুযে শুয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি।'

'ঘুম পাচ্ছে না।'

রূপা হাসল। আমি বললাম, 'হাসছ কেন ?'

রূপা হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার পড়ুয়া ভাইকে কিছুক্ষণ আগে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করলাম। সে ধাঁধা শুনে পুরোপুরি ভড়কে গেছে — আমার ধারণা পড়াশোনা বাদ দিয়ে এখন সে এইটা নিযেই ভাববে।'

'কী ধাঁধা?"

'খুব সহজ ধাঁধা। দুজন ছেলেকে তাদের বাবারা কিছু টাকা দিযেছিলেন। একজন তাঁর ছেলেকে দিলেন ১৫০ টাকা, অন্যজন দিলেন ১০০ টাকা। ছেলে দুজন তাদের টাকা গুনে দেখল একত্রে তাদের টাকা হযেছে মাত্র ১৫০। কী করে সম্ভব হল? তুমি কি পারবে?'

'না।'

'বাবুও পারবে না। কিছু কিছু মানুষ আছে যাবা সহজ জিনিসগুলো খুব জটিলভাবে চিন্তা করে। তাদের পক্ষে এই ধাঁধার উত্তর বের করা অসম্ভব।'

আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

রূপা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার মুখের ভাব সহজ। চোখেব দৃষ্টি স্বাভাবিক। যেন কিছুই হয নি। দুপুরের ঘটনাটা সে মাথা থেকে দূর করে দিয়েছে। রূপা বলল, 'চা খাবে?'

'না।'

'খাও একটু। মতির মাকে চা দিতে বলেছি। সে চা নিযে আসবে।'

'আচ্ছা।'

মতির মা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমি এবং রূপা চা খাচ্ছি। চা খেতে খেতে রূপা বলল, 'আমি যখন কোনো কথা বলি তখন কি তুমি মন দিযে শোন, না শুধু তাকিযে থাক?'

'মন দিয়ে শুনি। সবার কথাই আমি মন দিয়ে শুনি।'

'তোমার মা আজ ভাত খাবার সময় যে কথাগুলো বলেছিলেন তুমি কি তা মন দিয়ে শুনেছ?'

'হুঁ।'

'আমার মা সম্পর্কে তিনি যা বললেন সেগুলো কি তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে?'

'না।'

'যদি বিশ্বাসযোগ্য মনে না হয়ে থাকে তাহলে কেন তুমি তোমার মাকে চুপ করতে বললে না? আমি যে কী ভয়ংকর লজ্জা পাচ্ছিলাম তা তোমার চোখে পড়ে নি?'

'চোখে পড়েছে।'

'তাহলে চুপ করে ছিলে কেন? প্রতিবাদ কর নি কেন?'

রূপার গলার স্বর বদলে যাচ্ছে। চোখের তারায় অন্য এক ধরনের আলো। সে আজ বিশেষ কিছু বলবে। সেই বিশেষ কথাগুলো শোনার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি। রূপা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ঠোঁট মুছল, তারপর আগের চেয়েও নিচু গলায় বলল, 'প্রতিবাদ আমি নিজেও করতে পারতাম। ভণ্ডামি, ভান এইসব আমার ভালো লাগে না। যেখানে এইসব দেখেছি কঠিন গলায় প্রতিবাদ করেছি। তোমার মার কথার কোনো প্রতিবাদ করতে পারলাম না, কারণ তিনি যা বলেছেন সত্যি বলেছেন। এক বিন্দু মিথ্যা নয়।'

'তাতে কিছু যায় আসে না।'

'সবটা শোন তারপর বল, "তাতে কিছু যায় আসে না"। আমার মা আর্ট স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। অহংকারী জেদী একটি মেয়ে। অসম্ভব রূপবতী। আমি বলেছি না মার কিছু কিছু জিনিস আমি পেয়েছি। রূপ হচ্ছে তার একটা। কিন্তু মা ছিলেন দরিদ্র। তাদের পুরো পরিবারটাই দরিদ্র। দুবেলা খাবার সামর্থ্যও এই পরিবারের ছিল না। এমন একটা পরিবারে রূপবতী মেয়ে হয়ে জন্মানোর হাজারো সমস্যা। মা আর্ট স্কুলের পড়ার খরচ চালাতে পারেন না। অনাহারের কষ্টও এক সময় অসহ্য বোধ হল। এক সময় দেখা গেল ছুটির দিনে নাইট ক্লাবগুলোতে তিনি নাচতে শুরু করেছেন। বাড়তি কিছু টাকা আসছে।'

আমি বললাম, 'থাক এসব।'

রূপা বলল, 'থাকবে কেন? আমি তো বলতে লজ্জা পাচ্ছি না। তুমি শুনতে লজ্জা পাচ্ছ কেন? আমার মা প্রতিটি ঘটনা আমাকে বলেছেন। যখন বলেছেন তখন আমার বয়স খুব অল্প। তিনি বলতে লজ্জা পান নি, আমিও মার কথা শুনে লজ্জা পাই নি। তুমি কেন পাবে? মা বলতেন — শরীর এবং মন আলাদা আলাদা। শরীর অশুচি হলেই মন অশুচি হয় না। এটা হয়তো তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলতেন।'

'মা ভয়ংকর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। আমার বাবা তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। বিয়ে করেন। দেশে নিয়ে আসেন। মার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কেমন লাগছে তোমার গল্পটা?'

'ভালো?'

'শুধু ভালো? এটা কি চমৎকার একটা গল্প না?'

'হ্যাঁ চমৎকার গল্প।'

'এই চমৎকার গল্পের একটা ভয়ংকর অংশ আছে। সেই অংশটা এখন আমি তোমাকে বলব।'

'বল।'

'বাবা যখন আমার মাকে বিয়ে করেন তখন আমার মা অন্তঃসত্ত্বা। আমার মা ঠিক জানেন না -- আমার বাবা কে। এইসব কিছুই আমি তোমাকে বলি নি। এখন বললাম, কারণ পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। আমার চাচারা বাবার সম্পত্তির জন্যে মামলা মোকদ্দমা

করবেন। একজন অবৈধ কন্যা বিপুল সম্পত্তি পাবে তা তো হয় না। বাবার শরীর অসুস্থ। তিনি যে দীর্ঘদিন বাইরে থাকেন চিকিৎসার জন্যে থাকেন। সম্পত্তি নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় এসে গেছে।'

আমি চুপ করে আছি। দেখছি রূপাকে। মানুষ কী করে এত সুন্দর হয়!

রূপা বলল, আমি এখন যে কথাগুলো বললাম তা কি তুমি তোমার বাবা, মা, ভাইবোন — এদের বলতে পারবে?

'না।'

'আমার ধারণা হয়েছিল পারবে। আমি এমন একজনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম যে সবকিছু তুচ্ছ করে আমাকে গ্রহণ করতে পারবে। আমার চারপাশে অনেকেই ছিল। তিনজনের একটা তালিকা তৈরি করেছিলাম। তুমি ছিলে দুনম্বরে।'

'এক নম্বরে কে ছিল?'

'সফিক ছিল এক নম্বরে।'

রূপা হাই তুলতে তুলতে বলল, 'আমি ঘুমোব। আমাকে একটু জায়গা দাও তো।' সে এসে আমার পাশে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত জেগে তার পাশে বসে রইলাম। সে গভীর ঘুমে অচেতন। ঘুমের মধ্যেই হাসছে, স্বপ্ন দেখছে হয়তো।

সন্ধ্যা মিলাবার পর বেরুলাম। মুনিয়ার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেখান থেকে একবার যাব সফিকের কাছে। তারপর? তারপর কি আমি জানি না। একটা সাইকেল থাকলে ভালো হত। সাইকেলে করে সারা শহর চক্কর দেয়া যেত।

৯

মুনিয়ার স্বামী আজহার সাহেব আমাকে একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘ ভণিতার পর যা বললেন তা হচ্ছে — তিনি ভুল করেছেন। ভুল সংশোধন করতে চান। মুনিয়া এবং লাবণ্যকে নিয়ে আবার সংসার শুরু করতে চান। আমি বললাম, 'যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছেন তার কী হবে?' তিনি বিরক্ত মুখে বললেন — 'ও চুলোয় যাক। হু কেয়ারস? আপনি ভাই একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব। মানুষ ভুল করে না? আমি একটা ভুল করে ফেলেছি . . .'

আমি হালকা গলায় বললাম, 'আপনি দেরি করে ফেলেছেন।'

'দেরি মানে?'

'মুনিয়ার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

'সে কী?'

'সে কী বলছেন কেন? তার এমন কী বয়স। সে বিয়ে করবে না? মোটামুটি বেশ ভালো একটা ছেলের সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছেলেটিকে তার খুব পছন্দ।'

'আমি তো এইসব কিছু জানি না।'

'আপনার জানার কথাও না। ছেলেটিকে তার পছন্দ, কারণ প্রায়ই দেখি দুজন চায়নিজ-টায়নিজ খেতে যায়।'

'কী বলেন এসব! মুনিয়া এটা করতে পারে না।'

'পারছে তো?'

'ঐ ছেলের ঠিকানা কী?'

'এখন আপনাকে ঠিকানা দেব না। ঠিকানা দিলে ঝামেলা করতে পাবেন। বিয়ে হোক, তারপর ঠিকানা পাবেন। আমি ববং মুনিযাকে বলব সে যেন তাব স্বামীকে নিয়ে আপনাদের বাসায় বেড়াতে যায।'

আজহার সাহেব অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁব ভুবন ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম — 'যাই? আমাব এক বন্ধুব সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

সফিককে দেখে চিনতে পাবছি না।

ইযা দাড়ি — ইযা বাবরি চুল। গায়ে চক্রাবক্রা শার্ট, কাঁধে কাপড়েব ব্যাগ এবং চোখে কালো চশমা। সফিক বলল, 'কি ব্যাপাব বাক্যহাবা হযে গেলি?'

আমি বিস্মিত গলায় বললাম, 'দাড়ি কবে বাখলি?'

'দাড়ি কবে বাখলি মানে? এই দাড়িব বযস চাব মাস। গত চাব মাসে খুব কনজাবভেটিভ এস্টিমেট নিলেও তোব সঙ্গে তিনবাব দেখা হযেছে। এখন তুই জিজ্ঞেস কবছিস দাড়ি কবে রাখলি?'

'সরি, আগে লক্ষ কবি নি।'

'তোব মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাব তো মনে হচ্ছে তুই আমাকে চিনতে পাবছিস না। বল তো আমি কে? ঠাট্টা না। আই অ্যাম সিবিযাস, বল, আমি কে?'

সফিকেব কথ'ব জবাব দিলাম না। সে আমাকে তাদের বাসাব সামনেব চাযেব দোকানে নিযে গেল। হাসিমুখে বলল, 'তোকে বাসায নেযা যাবে না, আমাব কোনো বন্ধুবান্ধব বাসায গেলেই বাবা প্রায় লাঠি নিযে মাবতে আসে। মনে হচ্ছে উনার ব্রেইন শর্ট সার্কিট হযে গেছে।'

সফিক পরপব দুকাপ চা খেল। সিগাবেট ধবাল না। জানলাম সে সিগাবেট ছেড়ে দিযেছে। আজকাল নাকি আব সিগাবেটেব ধোঁযা সহ্য করতে পাবছে না। আমি বললাম, 'চোখে সানগ্লাস কেন?'

সে ক্লান্ত গলায বলল, 'আমাব প্যাঁচার স্বভাব হযে গেছে। চোখে আলো সহ্য হয় না। এজন্যেই চারদিক অন্ধকাব কবে বাখি। শুনলাম পব পব দুদিন তুই আমাব খোঁজে বাসায গিযেছিলি। কারণ কী?'

'কাবণ নেই।'

'অকাবণে তুই আমার খোঁজে যাবি, এটা বিশ্বাসযোগ্য না। কাবণটা কী বল।'

'তোর বইটা পড়লাম। ভাবলাম কথা বলি।'

'তুই আমাব বই পড়েছিস? এটাও বিশ্বাসযোগ্য না।'

'আজকাল অনেক অবিশ্বাস্য কাণ্ডকাবখানা কবছি। তোব বই সত্যি পড়েছি।'

'শেষ পর্যন্ত পড়েছিস?'

'না। প্রথম চৌদ্দ পাতা।'

সফিক আহত চোখে তাকিযে রইল। তার অতি প্রিয বন্ধু চৌদ্দ পাতার বেশি পড়ে নি এই কঠিন সত্য সে মেনে নিতে পারছে না। আমার মনে হল সে খানিকটা বাগও কবছে। বার বাব জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছে। প্রচণ্ড বেগে গেলে সে এই কাজটি করে। আমি তাব রাগ কমানোর জন্যে বললাম, 'চৌদ্দ পাতা পড়লেও পড়েছি খুব মন দিযে।'

'মন দিয়ে পড়েছিস?'

'হুঁ। আমার মতো মন দিয়ে কেউ পড়েছে বলে মনে হয় না।'

সফিক থমথমে গলায় বলল, 'ইচ্ছা করছে তোকে মেরে তক্তা বানিয়ে দেই। ফাজলামির একটা সীমা আছে।'

আমি হাই তুলে বললাম, 'তুই শুধু শুধু রাগ করছিস। আমি সত্যি খুব মন দিয়ে পড়েছি। মুখস্থ বলতে পারব।'

'ও আচ্ছা। মুখস্থ বলতে পারবি ? ছোটলোক কোথাকার।'

'আগেই গালাগালি করছিস কেন? আগে দেখ পারি কিনা।'

আমি চোখ বন্ধ করে বলা শুরু করলাম। যেহেতু চোখ বন্ধ কবে আছি, সফিকেব রিঅ্যাকশন ধরতে পারছি না। তবে বেশ বুঝতে পারছি — তাব আক্কেল গুড়ুম। তাব নিজের বই সে নিজেও মুখস্থ বলতে পারবে না। বলতে পারাব কোনো কাবণ নেই।

দম নেবার জন্য থামতেই সফিক বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে থাম তো। আমার গাযেব লোম খাড়া হয়ে গেছে। তুই দেখি সত্যি সত্যি মুখস্থ কবে বসে আছিস। অকল্পনীয ব্যাপার।'

'তুই খুশি হয়েছিস তো?'

'খুশি হব কেন? এটা কি খুশি হবাব কথা? এসব পাগলেব লক্ষণ, তুই পুবোপুবি পাগল হযে গেছিস। তোর চিকিৎসা হওয়া দরকাব। কোনো সুস্থ মানুষ উপন্যাস মুখস্থ কবে ? রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তী হলেও কথা ছিল। অবশ্যি হৈমন্তী মুখস্থ করাও এক ধবনের পাগলামি। পৃথিবীতে কেউ উপন্যাস মুখস্থ কবে না।'

'করে না বুঝি?'

'না করে না। যারা মেন্টাল কেইস তাবাই করে। তুই দেবি না কবে ডাক্তাবকে দিযে মাথাটা পরীক্ষা করা। ওষুধপত্র খা। রাতে ঘুম হয ?'

'না।'

'ঘুমেব ওষুধ খা। দশ মিলিগ্রাম করে বিলাক্সেন। সকাল দশটাব দিকে একবাব, বাতে ঘুমোতে যাবার সময় একবাব।'

আমি সিগারেট ধবাতে ধবাতে বললাম, 'তুই প্রেসক্রিপশন দিচ্ছিস যে ? তুই কি ডাক্তার নাকি?'

সফিক হতভম্ব হযে বলল, 'কী বলছিস তুই? আমি ডাক্তার না? মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করি নি? তোর কী হযেছে বল তো?'

'মনে ছিল না।'

'সামথিং ইজ ভেবি বং। তুই কাল বাসায থাকিস। এগাবটাব দিকে এসে আমি তোকে নিয়ে যাব। ভালো একজন সাইকিয়াট্রিস্ট তোকে দেখুক। রূপার সঙ্গে তোব সম্পর্ক কেমন যাচ্ছে?'

'ভালো।'

'তার সঙ্গেও কথা বলা দবকার। চল যাই রূপাব সঙ্গে কথা বলি, ওব সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় নি তো?'

'ছাড়াছাড়ি হবে কেন?'

'বাজারে অনেক ধরনের গুজব, এই জন্যেই জিজ্ঞেস করলাম। ওর নাকি তিনটা চয়েস ছিল। তুই ছিলি দুনম্বর। সত্যি নাকি?'

'জানি না — ওকে জিজ্ঞেস কর।'

'চক্ষুলজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারি না। মনে ক্ষীণ আশা যে আমার নাম এক নম্বরে কিংবা তিন নম্বরে ছিল। তুই আবার রাগ করছিস না তো?'

'না।'

'চল ওঠা যাক। কাল বাসায় থাকবি। কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

রাত দশটার দিকে বাসায় ফিরতেই দেখি মা-বাবা দুজনেরই মুখে হাসি। আজহার সাহেব নাকি বাসায় এসেছিলেন। সব মিটমাট হয়ে গেছে। তিনি মুনিয়াকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। মা বললেন, 'রঞ্জু, তুই থাকলে মুনিয়ার কাণ্ড দেখতি। খুশিতে এই হাসছে, এই কাঁদছে।'

আমি বললাম, 'যে মেয়েটাকে আজহার সাহেব বিয়ে করেছেন তার কী হবে?'

মা রাগী গলায় বললেন, 'তার কী হবে তা নিয়ে আমাদের কিসের মাথাব্যথা? যা হবার হবে।'

'তোমরা সবাই খুশি?'

'খুশি হব না? তোর কি ধরনের কথাবার্তা? তার উপর জামাই বলল, তুই নাকি উল্টাপাল্টা কি সব বলেছিস। মুনিয়ার বিয়ে হচ্ছে এইসব।'

'ঠাট্টা করে বলেছি।'

'তোর মাথাটা খারাপ রঞ্জু। তুই একজন ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করা।'

'করাব। কাল সফিক আমাকে একজন পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। তাঁকে বলব ভালোমতো চিকিৎসা করাতে। মুনিয়া কোথায় মা?'

'ও আজহারের সাথে বের হয়েছে। রাতে বোধ হয় বাইরে খাবে।'

'ভালোই তো।'

'লাবণ্য সঙ্গে যাবার জন্যে ঘ্যান ঘ্যান করছিল। যেতে দেই নি। ওরা দুজন একা একা কথা বলুক। কি বলিস রঞ্জু?'

'ভালো কাজ করেছ মা। খুব ভালো করেছ। বেজোড় সংখ্যক এতিম খাওয়ানোর ফল হাতে হাতে পাওয়া গেছে ?'

আমি আমার ঘরে ঢুকে জানলাম রূপা চলে গেছে। আমি তেমন অবাক হলাম না। সে চলে যাবে জানতাম। আজই যে যাবে তাও জানতাম।

লাবণ্য পা ঝুলিয়ে আমার খাটে বসে আছে। তার মুখ গম্ভীর। আমি অবিকল রূপার মতো গলায় বললাম — 'কিটেমন ইটাছ?'

লাবণ্যর বলা উচিত, ভিটালো ইটাছি। সে কিছু বলছে না।

'মন খারাপ লাবণ্য?'

'না।'

'লুডু খেলবে? যাও লুডু নিয়ে আস, আমরা দুজন লুডু খেলব।'

'না।'

রাতে ভাত খেতে বসলাম শুধু আমি আর বাবা। তাঁর মেজাজ খুব ভালো। তিনি কোমল গলায় বললেন, 'শুনলাম বৌমা নাকি রাগ করে বাবার বাড়িতে চলে গেছে?'

আমি ভাত মাখতে মাখতে বললাম, 'চলে গেছে এইটুকু জানি। রাগ করে গেছে কিনা তা তো জানি না।'

'চিঠিপত্র কিছু লিখে যায় নি?'

'না।'

'দুপুরবেলা তোর মা খানিকটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'

আমি কিছু বললাম না। বাবা বললেন, 'ওদের বাসায় টেলিফোন করে দেখ্। চিন্তা করিস না।'

'চিন্তা করছি না।'

'ও আচ্ছা, ভালো কথা তোর ঐ তিন হাজার টাকা এনে রেখেছি। নিয়ে যাস।'

রূপাদের বাসায় টেলিফোন করলাম। রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না। তার বাবা নিশ্চযই দেশের বাইরে। রূপার চাচার বাসায় টেলিফোন করলাম। টেলিফোন ধরল। আমি সহজ গলায় বললাম, 'রূপা আছে?'

'না।'

'সে কি এসেছিল?'

'না। আপনি কে বলছেন?'

'আমি রূপার খুব পবিচিত একজন। ওকে কোথায পাওযা যাবে বলতে পাবেন?'

'ওর শ্বশুর বাড়িতে খোঁজ করুন।'

'আচ্ছা।'

নিজের ঘরে এসে সিগাবেট টানছি। বাবু ঢুকল। তাব চোখ-মুখ শুকনো। দেখাচ্ছে খুব কাহিল। আমি হাসিমুখে বললাম, 'কী খবব?'

বাবু কাঁপা গলায বলল, 'সর্বনাশ হযে গেছে দাদা।'

'কী সর্বনাশ?'

'ভাবী কি একটা ধাঁধা দিযে গেছে। কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পাবছি না। পড়তেও পারছি না। কাল পরীক্ষা। ভাবীব কাছ থেকে উত্তবটা জানতে এসেছি।'

'ও তো বাসায় নেই।'

'দাদা তুমি উত্তবটা জান? দুজন ছেলেকে তাদেব বাবাবা কিছু টাকা দিযেছিলেন। একজন তাঁর ছেলেকে দিলেন ১৫০ টাকা ...'

আমি বাবুকে থামিযে দিযে বললাম, 'এব উত্তব আমি জানি না।'

'এখন তাহলে কী করব?'

'বাবাকে জিজ্ঞেস কবে দেখ্। জ্ঞানী মানুষ, উনি পাববেন।'

বাবু ঘর থেকে বের হযে গেল।

অনেক রাতে ঘুমোবার আযোজন কবছি, মা লাবণ্যকে কোলে নিযে উপস্থিত। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?' মা বললেন, 'আজ তোর সঙ্গে থাক।'

'কেন?'

'ওর বাবা আজ থাকবে এ বাড়িতে। কোথায আব ঘুমোবে? মুনিযাব ঘরেই থাকবে। অসুবিধা তো কিছু নেই। স্বামী স্ত্রী ছিল — সামযিক সমস্যা গেছে। আবার তো বিযে হচ্ছে, তাই না?

'তা তো ঠিকই।'

মা লাবণ্যকে আমার পাশে শুইযে দিলেন। একবারও জানতে চাইলেন না রূপা কোথায়।

১০

যে ডাক্তারের কাছে আমাকে সফিক নিয়ে গেল, আমি তাঁর বেশিরভাগ প্রশ্নের জবাব দিলাম না। অবশ্যি ভদ্রলোক বলে দিয়েছিলেন কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে না চাইলে দেবেন না। আমার দিকে তাকিয়ে হাসবেন। আমি বুঝব আপনি জবাব দিতে চাচ্ছেন না। ডাক্তাবেব সঙ্গে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল।

ডাক্তার : কেমন আছেন?

আমি : ভালো।

ডাক্তার : কী রকম ভালো?

আমি : বেশ ভালো।

ডাক্তাব : বাতে ঘুম হয?

আমি : হয।

ডাক্তাব : আপনাব নিজের কি ধাবণা, আপনাব কোনো সমস্যা আছে?

আমি : আছে। একটাই সমস্যা।

ডাক্তাব : বলুন তো শুনি।

আমি : আমি একটা খুন কবাব পবিকল্পনা কবেছি।

ডাক্তাব : তাই নাকি?

আমি : হ্যাঁ তাই।

ডাক্তাব : কী ধবনেব পবিকল্পনা?

আমি : ব্লু প্রিন্ট বলতে পাবেন। দিনক্ষণ, মার্ডাব উইপন সব ভেবে বেখেছি।

ডাক্তাব : কাকে খুন কববেন ?

আমি : (ডাক্তাবেব দিকে তাকিয়ে হাসলাম)

ডাক্তাব : কবে নাগাদ খুনটা কববেন?

আমি : (আবাব হাসি)

ডাক্তার : মেযেদেব প্রতি কি আপনাব কোনো বিদ্বেষ আছে?

আমি : আবাবো হাসি।

ডাক্তাব : শুনেছি আপনাব স্মৃতিশক্তি দুর্বল হযে গেছে। আপনাব বন্ধু আমাকে টেলিফোনে বলেছেন। কথাটা কি সত্যি?

আমি : কথা সত্যি নয। আমি সফিকেব লেখা একটা উপন্যাস মুখস্থ বলতে পাবি। পুবোটা না, প্রথম পনব পাতা — শুনবেন ?

ডাক্তাব : দেখি মুখস্থ বলুন তো শুনি।

আমি বলতে শুরু কবলাম। ডাক্তাব হতভম্ব হযে তাকিয়ে বইলেন। মনে হয আমাব মতো বোগী তিনি এব আগে পান নি। কিছুক্ষণেব ভেতরেই আমাকে থামিযে দিযে বললেন, 'উপন্যাসটা কেন মুখস্থ করেছেন? খুব ইন্টাবেস্টিং?'

'না।'

'তাহলে? মুখস্থ কবাব কাবণ কী?'

'এমনি কবলাম।'

'ও আচ্ছা। আপনি আগামী ববিবাবে আসতে পাববেন? আবো কিছু পবীক্ষা করব।'

'আসব। ববিবাবে আসব।'

ডাক্তাবেব ঘব থেকে বেব হযে সফিক বলল, 'তোব অবস্থা খুবই খাবাপ। মনে হয ব্রেইনেব নাট বল্টু সব খুলে পড়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'এই ডাক্তার নিশ্চয়ই সব আবার জোড়া লাগিয়ে দেবেন।'

'তা দেবেন। খুব ভালো ডাক্তার। ভাবছি বাবাকে একবার দেখাব।'

'উনারও কি নাট বল্টু খুলে পড়ে গেছে?'

'হুঁ। আজ বাসায় বিশ্রী এক কাণ্ড করেছেন। সুমিকে মেবে তক্তা বানিয়ে ফেলেছেন। একেবারে রক্তারক্তি। এত বড় মেয়েকে কেউ মারতে পারে?'

'কী জন্যে মারলেন?'

'জিজ্ঞেস করি নি। মনে হয় মেডিক্যাল অ্যালাও হয় নি। মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। একটা ভালো ছেলে পেলে সুমির বিয়ে দিয়ে দিতাম। আচ্ছা শোন, বাবু কি সুমিকে বিয়ে করবে? তোর কি মনে হয়?'

'জানি না। জিজ্ঞেস কবে দেখতে পাবি।'

'বাবু তো এবার এমএসসি দিচ্ছে তাই না?'

'দিচ্ছে না। ফার্স্ট পেপাব পরীক্ষায় অর্ধেকটা প্রশ্ন আনসার করে হল থেকে বের হযে এসেছে।'

'বলিস কী, কেন?'

'রূপা ওকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করে । ঐ ধাঁধা তাব মাথায ঘুবছে। ধাঁধাব উত্তব না জানা পর্যন্ত সে পরীক্ষা দিতে পাববে না

'রূপাব কাছ থেকে জেনে নিলেই হয।'

'তা হয। কিন্তু রূপাকে সে পাবে কোথায ?

'তাব মানে ?'

'ওকে পাওযা যাচ্ছে না। কোনো ট্রেস নেই কোথায আছে কেউ কিছু বলতে পাবছে না

সফিক হতভম্ব হযে দাঁড়িযে আছে। আমি বললাম, 'আমাব সঙ্গে একটু আয, একটা সাইকেল কিনব।'

'সাইকেল দিযে কী কববি?'

'তোব উপন্যাসেব নায়ক লোকমান সাহেবেব মতো ঘুবে বেড়াব।'

১১

আমরা একটা সাইকেকল কিনেছি। গভীব বাতে সাইকেলে করে দুজন ঘুরে বেড়াই। সফিক প্যাডেল করে, আমি বসে থাকি পেছনেব ক্যাবিযাবে। মাঝে মাঝে রূপাদেব বাড়িব সামনে থামি। বাড়ি তালাবদ্ধ। অনেকদিন ধরেই নোটিশ ঝুলছে, "বাড়ি বিক্রয হইবে।" নোটিশটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিযে থেকে আবার সাইকেলে চড়ে বসি। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা তেমন হয় না। নীরবতা অসহ্য বোধ হলে সফিক টুনটুন কবে ঘণ্টা বাজায। আমি বিরক্ত হযে বলি, 'আহ্ থামা তো।' সফিক ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করে। মাঝে মাঝে চাঁদনি রাতে আমরা শহর ছেড়ে দূরে চলে যাই। রাস্তা ফাঁকা থাকলে সফিক সাইকেল চালায় ঝড়ের বেগে। জোছনা দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে যাই . . . আমি চাপা গলায বলি — 'আরো তাড়াতাড়ি প্যাডেল কর, আরো দ্রুত।' সফিক হাঁপাতে হাঁপাতে প্যাডেল করে, পেছনে পড়ে থাকে চাঁদের আলোয ঢাকা আশ্চর্য শহর।

পিটার ব্লেটির পিশাচ কাহিনীর ভাবানুবাদ

দি একসরসিস্ট

প্রস্তাবনা

উত্তর ইরাকের মরুভূমি।

খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শেষ।

আজ বাতেই তাঁবু গুটিযে সবাই চলে যাবে। জিনিসপত্র যা পাওয়া গেছে বসে বসে এখন তাব তালিকা তৈবি কবছেন কিউরেটব। কিছু গহনা, ভাঙা হামানদিস্তা, হাতিব দাঁতেব বাক্স — খুব অসাধাবণ কিছু নয। জিনিসগুলো একটি লম্বা টেবিলে সাজানো। এবপব নম্বব দিযে দিযে বাক্সে সিল কবা হবে।

একজন বৃদ্ধকে এগিযে আসতে দেখা যাচ্ছে। শান্ত পাযে তিনি আসছেন। হাঁটছেন খানিকটা ঝুঁকে ঝুঁকে। লম্বা বোগা এক জন মানুষ। তিনি টেবিলেব পাশে এসে থমকে দাঁড়ালেন। টেবিলে বাখা একটি মূর্তিব দিকে তিনি এখন এক দৃষ্টিতে তাকিযে আছেন। তিনি প্রায অস্পষ্ট স্ববে বললেন, 'আমি কি এই মূর্তিটি একটু হাতে নিতে পাবি?'

কিউরেটর বললেন, 'অবশ্যই পাবেন। ফাদার মেবিন, এটি শযতান পাযুযুর মূর্তি। পিশাচ।'

'আমি জানি।'

ফাদার মেবিন মূর্তি হাতে নিতে গিযেও নিলেন না। ছোট্ট নিশ্বাস ফেললেন. এই অশুভ শক্তিটির সঙ্গে তাঁব যে আবাব দেখা হবে এই বিষযে তিনি এখন নিশ্চিত।

সূর্য এখন মাথার উপর, মরুভূমিব অসহনীয তাপ। তবু ফাদাব মেবিনেব শীত লাগতে শুরু কবল। তিনি শীতে অল্প অল্প কাঁপছেন।

কিউবেটব অবাক হযে বললেন, 'কি হয়েছে আপনার, ফাদাব?'

জবাব না দিযে আকাশের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। তাঁর মনে হল, হা-হা শব্দে কি একটা যেন উড়ে গেল মাথার উপব দিযে। তিনি আকাশ থেকে চোখ নামিযে কিউবেটবেব মুখেব দিকে তাকালেন, শান্ত স্বরে বললেন, 'আমাকে অনেক — অনেক দূব যেতে হবে।'

সূচনা

১

আইভি লতায় ছাওয়া লাল ইটের প্রকাণ্ড এক পুরানো ধাঁচের বাড়ি। সামনের ছোট রাস্তাটি পার হলেই জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়। পেছনে ব্যস্ত এম স্ট্রিট। তারো পেছনে ঘোলা পানির ছোট্ট নদী 'পটোমাক'।

বাড়িটি নীরব। রাত প্রায় বারটা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিত্রনাট্যের সংলাপ মুখস্থ করছে ক্রিস ম্যাকনীল। কাল ভোরেই শুটিং। ছবিটিতে তার ভূমিকা মধ্যবয়সী এক শিক্ষিকার, যিনি সাইকোলজি পড়ান।

ক্রিসের হাই উঠছে। চিত্রনাট্য পড়তে আর ভালো লাগছে না, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। পাশ ফিরে শুতে যাবে, তখনই শুনল কোথায় যেন খট খট শব্দ হচ্ছে।

কীসের শব্দ ? কান খাড়া করল ক্রিস।

শব্দটা থামছে না। অবিরাম হয়েই চলছে। রেগানেব ঘর থেকে আসছে কি ? ক্রিস বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বেগানের ঘরটি অন্য প্রান্তে। এত রাতে কী কবছে ও ? আশ্চর্য তো ?

ক্রিস ঘর থেকে বেরিয়ে হালকা পায়ে এগুল। প্যাসেজেব বাতি নেভানো। কেন জানি ক্রিসের ভয় ভয় লাগছে। অকারণ ভয়। রেগানের ঘরেব সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে একটানে দরজা খুলে ফেলল। আব আশ্চর্য, চারদিক চুপচাপ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কোনোই শব্দ নেই — নিঝ্‌ঝুম।

'এসব কী হচ্ছে ?'

রেগান কুণ্ডলী পাকিয়ে আরাম কবে ঘুমিয়ে আছে। এগাব বছর আন্দাজে কিছুটা বাড়ন্ত দেখালেও রেগান এখনো খুব ছেলেমানুষ। কোলের পাশে কান ছেঁড়া তুলো ভবা ভালুক নিয়ে শুয়ে থাকার এ দৃশ্যটি দেখলেই তা বোঝা যায়। ক্রিস মৃদু স্বরে ডাকল, 'বেগান জেগে আছ?'

কোনো সাড়া নেই। নিশ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছে শুধু। গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকলে যে রকম হয়। ঘরে হালকা নীলাভ আলো। দেয়ালে রেগানের বড় একটি ছবি। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য খেলনা। ক্রিস ভ্রূ কুঁচকে ভাবল, রেগান আমাকে বোকা বানানোব জন্যে ঘুমের ভান করছে না তো? অসম্ভব নয়, আজ পয়লা এপ্রিল। কিন্তু এই ধারণা স্থায়ী হল না। রেগানের স্বভাব এ রকম নয়। ও খুব শান্ত মেয়ে। এ ধরনের দুষ্টুমি কখনো কববে না। তাহলে শব্দটা কি পানির পাইপ থেকে আসছিল? বিচিত্র নয়। পাইপ থেকে এ বকম শব্দ হয়। কিংবা কে জানে — হয়তো ইঁদুর। ক্রিস ছাদের দিকে তাকাল। ইঁদুর হওয়াই সম্ভব। নিশ্চয়ই ইঁদুর। অস্বস্তির ভাবটা ওর নিমেষে কেটে গেল। আর ঠিক তখনই অনুভব করল, রেগানের ঘরটা অস্বাভাবিক শীতল। বরফের মতো ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা হবার তো কথা না!

ঘরের হিটারটা কি কাজ করছে না? না, তা নয়, হিটার বেশ গরম। ঘরেব দুটি জানালাই বন্ধ। তাহলে এমন ঠাণ্ডা লাগছে কেন?

ক্রিস রেগানের গালে হাত রাখল, উষ্ণ ঘামে ভেজা নরম গাল। নিচু হয়ে রেগানের কপালে চুমু খেল। 'আমি তোমাকে বড্ড ভালবাসি, মা', মৃদুস্বরে এই কথা কটি বলেই ক্রিস ভাবল, আমারই কোনো অসুখ করেছে নিশ্চয়। এজন্যেই এমন ঠাণ্ডা লাগছে।

ক্রিস দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। ভালোমতো পড়া দরকাব চিত্রনাট্যটি। কিন্তু পড়তে মোটেই ভালো লাগছে না। ছবিটা একেবারেই হালকা ধরনের

কমেডি, সেই 'মিঃ স্মিথ গোজ টু ওয়াশিংটন'–এর পুনর্নির্মাণ। অতি বাজে স্ক্রিপ্ট। বিরক্তিকব, উদ্ভট ডায়ালগ।

পড়তে পড়তে এক সময় ক্রিসের চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। হাই ওঠে। তাবপর সে ঘুমিয়ে যায়। গাঢ় ঘুম নয়। অস্বস্তি ভরা ছাড়া ছাড়া ঘুম। সেই সঙ্গে কিসব আজেবাজে স্বপ্ন। কেউ যেন ধারালো ছুরি হাতে ওকে মারতে আসছে। আর ও প্রাণপণে ছুটছে, চিৎকার করছে, 'বাবা, বাবা, আমাকে বাঁচাও! আমার কাছে আসতে দিও না! আমি মরতে চাই না! কিছুতেই না! প্লিজ, বাবা, আমাকে বাঁচাও!' কোথায় যেন আবাব বিকট শব্দে বাজনা হচ্ছে। স্নায়ুতন্ত্রীগুলো ঝনঝন করছে সেই শব্দে। কী কুৎসিত, কী তীব্র সে শব্দ! ক্রিস ঘেমে নেয়ে জেগে উঠল। বুক কাঁপছে ওর। গলা শুকিয়ে কাঠ। মাথার কাছে বাখা টেলিফোন বাজছে। বেজেই যাচ্ছে। টেলিফোন ধরামাত্র সহকাবী পবিচালকেব ভারি গলা শোনা গেল; 'হ্যালো, ক্রিস ?'

'হ্যাঁ।'

'আজ শুটিং, মনে আছে তো ?'

'আছে। বাজে কটা ?'

'ভোব হয়েছে, ক্রিস। কী ব্যাপাব, তোমার শবীর খাবাপ নাকি ?'

'না তো!'

ক্রিস বিশ্রী স্বপ্নটাকে মন থেকে তাড়াতে পাবছে না। এমন অস্বাভাবিক স্বপ্ন! যেন ঘুমেব মধ্যে নয়, জেগে জেগে দেখা। চোখে–মুখে পানি দিয়ে সে নিচে নেমে এল।

'গুড মর্নিং, ক্রিস।'

'গুড মর্নিং, উইলি।'

উইলি কমলাব রস তৈরি করছিল, ক্রিসকে দেখে এগিযে এল। 'কফি এনে দেব?'

'না, থাক। আমি নিয়ে নেব।'

ক্রিস অবাক হযে দেখল, এই সাতসকালে রেগান ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আছে। কী অপূর্ব লাগছে ওকে! শান্ত গভীর চোখ। মসৃণ গোলাপি গাল। মাথাভর্তি সোনালি চুল চকচক কবছে ভোরের আলোয। ক্রিসের আচমকা মনে হল জ্যামির কথা। ছেলেটাও এমনি ছিল। যেন পথ ভুলে আসা স্বর্গেব দেবশিশু। তিন বছর বযসে মারা গেল হঠাৎ। ক্রিস তখন অখ্যাত এক নর্তকী। থাক, সেসব পুরানো কথা। ক্রিস অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা সিগাবেট ধবাল। কমলালেবুর শরবতের গ্লাস এনে সামনে রাখল উইলি। ক্রিসেব মনে পড়ল গত বাতেব ইঁদুবেব কথা।

'কার্ল কোথায়, উইলি?'

'ম্যাডাম, আমি এখানে।'

পেন্ট্রি রুমের দরজার পাশে দেখা গেল কার্লকে। গালে এক টুকবো টিস্যু পেপার চেপে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে আছে। শেভ করতে গিযে বোধহয় গাল কেটে গেছে। এমনিতে কার্লের চোখ অস্বাভাবিক তীব্র। খাড়া নাক। মাথায চুলের চিহ্নমাত্র নেই।

'কার্ল, আমাদের ঘরভর্তি ইঁদুর। ওগুলো মারার ব্যবস্থা কর।'

'ম্যাডাম, এ বাড়িতে কোনো ইঁদুর নেই।'

'আছে। কাল রাতে আমি নিজে ইঁদুরের শব্দ শুনেছি।'

'আমার মনে হয আপনি পানির নলেব শব্দ শুনেছেন। পানি আসার সময় এক ধবনের শব্দ হয।'

'কার্ল, তুমি কি আমার সঙ্গে তর্ক বন্ধ করবে ?'

'অবশ্যই ম্যাডাম। আমি এখনই গিয়ে ইঁদুর মারা কল কিনব।'

'এখন যেতে হবে না। দোকানপাট এখনো খোলে নি।'

'না খুলুক, আমি এখনই যাব।'

কার্ল দ্রুত বেরিয়ে গেল। ক্রিস তাকাল উইলির দিকে। উইলি বিড়বিড় করে বলল, 'লোকটা বড় অদ্ভুত!' কথাটা পুরোপুরি সত্যি। তবে খুব কাজেরও। অত্যন্ত অনুগত। কিন্তু এমন কিছু আছে লোকটির মধ্যে যা ক্রিসের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি জাগিয়ে তোলে। ভালো লাগে না। কী আছে কার্লের মধ্যে ? অবাধ্যতা ? না অন্য কিছু ? নিশ্চয়ই এমন কিছু — যা ঠিক বোঝা যায় না। কার্ল আর উইলি দুজনেই প্রায় ছ বছর হলো এখানে কাজ করছে। কিন্তু এই ছ বছরেও কার্লকে ঠিক বুঝতে পারা গেল না। লোকটি যেন মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। সত্যি চেহারাটা চোখে পড়ে না।

জর্জটাউন ক্যাম্পাসে শুটিং হওয়ার কথা। ক্রিস যখন পৌঁছল তখন চমৎকার রোদ উঠেছে। ঝলমল করছে চারদিক। সকাল আটটায় প্রথম শট নেয়ার কথা। আটটা এখনো বাজে নি। ক্রিসের মনের চাপা অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেছে। লোকেশনে গিয়েই স্ক্রিপ্ট নিয়ে একটা ঝগড়া শুরু করল ও, 'বার্ক, তুমি কি এই ঘোড়ার ডিমের ডায়ালগগুলো পড়ে দেখেছ?'

পরিচালক ডেনিংস বার্ক এক চোখ ছোট করে বলল, 'খুব মজাদার বুঝি ?'

'এমন কুৎসিত জিনিস আমি জীবনেও পড়ি নি। কোন্ গাঁজাখোর লিখেছে বল তো ?'

'ক্রিস, আমার ময়না পাখি, কোন্ জায়গাটা তোমার পছন্দ হয় নি শুনি ?'

'কোন জায়গাটা নয়, বল! আগাগোড়া একটা যাচ্ছেতাই লেখা।'

বার্ক চোখ নাচিয়ে বলল, ' লেখককে তাহলে খবর দিয়ে আনানো দরকার, কী বল ?'

'সে আছে কোথায়? পালিয়েছে নাকি ?'

একটি ইঙ্গিত করে বার্ক বলল, 'ওই শালা এখন প্যারিসে, খুব ইয়ে করে বেড়াচ্ছে।'

শুটিং শুরু হওয়ার সময় ক্রিস আবার বেঁকে বসল। মুখ সরু করে বলল, 'দালানের ভেতর আমার দৌড়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। খামাখা এটা করব কী জন্যে?'

'স্ক্রিপ্টে আছে তা-ই করবে।'

'এতে কাহিনী বা ঘটনার কিছু আসবে যাবে না।'

'না যাক, তুমি দৌড়ে যাও তো, লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কণা, শটটা শেষ করি।'

ক্রিস হেসে ফেলল। শট নেয়া শুরু হবে এবার। মাথা ঘুরিয়ে দেখল লাইট ঠিক করা শুরু হয়েছে। টেকনিশিয়ানরা ছোটাছুটি করে এক্সট্রাদের একপাশে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। ক্রিস অবাক হয়ে দেখল কালো পোশাক পরা এক পাদ্রী দাঁড়িয়ে আছে ভিড়ের মধ্যে। অল্প বয়েসী কোনো ফাদার। কিন্তু এখানে কী জন্যে? পাদ্রীরা ছবির শুটিং দেখবে কেন?

অবশ্যি এই পাদ্রীটি মাথা নিচু করে কেমন যেন দিশেহারা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। বৃষ্টি হবে কি হবে না তাই বোধহয় দেখছে।

বার্ক বলল, 'ক্রিস, তুমি রেডি?'

'রেডি।'

'লাইট... সাউন্ড... রোল...'

ক্রিস মুখের রেখায় একটা কঠিন ভাব ফুটিয়ে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলো এসে পড়ল ওর মুখের ওপর। বার্কের চিৎকার শোনা গেল। 'স্পিড... অ্যাকশন!'

ক্রিস দৌড়ে গেল খানিকটা, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। ওর পিছে পিছে স্ক্রিপ্ট হাতে ছুটছে প্রম্পটার, মৃদুস্বরে ডায়ালগ মনে করিয়ে দিচ্ছে। এত ব্যস্ততার

মধ্যেও এক ফাঁকে চোখ সরিয়ে ক্রিস দেখল, ভিড়ের মধ্যে থেকে পাদ্রীটি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকেই। পাদ্রীর চোখে-মুখে এক ধরনেব বিষণ্নতা।

বিকাল চারটে পর্যন্ত শুটিং চলল। তারপর মেঘ জমতে শুরু করল আকাশে। ঘন কালো মেঘ। এত কম আলোয় শুটিং হয না। আজকের মতো প্যাক-আপ কবা ছাড়া উপায় নেই।

ক্রিস ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। শরীরে চটচটে ঘাম। এতটুকু হেঁটে বাড়ি ফিবতেও কষ্ট হচ্ছে। ছত্রিশ নম্বর সড়কেব মাথায আসতেই চোখে পড়ল ক্যাম্পাসেব লাগোযা ক্যাথলিক চার্চটি পাদ্রীতে গিজগিজ করছে। পেছন থেকে দ্রুত পাযে কালো পোশাক পবা একজন পাদ্রী এগিযে এসে ক্রিসকে পেছনে ফেলে হাঁটতে লাগল। বাচ্চা বযস ছেলেটির। গালভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। হাত দুটি পকেটে ঢুকিযে কেমন যেন হড়বড় কবে হাঁটছে।

ক্রিস একটু অবাক হযেই তাকিযে বইল তার দিকে। চার্চে না ঢুকে পাদ্রীটি যাচ্ছে ধবধবে সাদা রঙেব একটা কটেজের দিকে। অন্য একজন পাদ্রী ইতিমধ্যে কটেজেব দরজা খুলে বাইরে এসেছে, কী যেন কথা হল দুজনেব মধ্যে। দ্বিতীয পাদ্রীটিব মুখ লম্বাটে ও মলিন। কেমন যেন দিশেহাবা ভঙ্গি। আবাব কে একজন কটেজের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আশ্চর্য, সেও একজন পাদ্রী। কী হচ্ছে এখানে আজকে? ক্রিস তীক্ষ্ণ চোখে তাকিযে বইল। শুটিংযের সময এই পাদ্রীই দাঁড়িয়ে ছিল না? বিষণ্ন চোখে এই তো তাকিযে ছিল তার দিকে!

আকাশে ঘনঘন বিজলি চমকাচ্ছে। অনেক দূব থেকে আসছে মেঘ ডাকাব গম্ভীব শব্দ। বাতে নিশ্চযই খুব ঝড়বৃষ্টি হবে। হোক, ঝড় হোক। বৃষ্টিতে ভাসিযে নিযে যাক সবকিছু।

ক্রিস মিনিট পাঁচেকেব মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেল। গোসল সেবে বান্নাঘবে গিযে দেখে শ্যাবন স্পেনসাব বসে আছে। গত তিন বছব ধবে শ্যাবন ক্রিসেব সেক্রেটারি আব বেগানেব টিউটব হিসেবে কাজ কবছে।

'কেমন কাটল, ক্রিস?' শ্যাবনেব মুখে-চোখে চাপা হাসি।

'বোজ যেমন কাটে। তা, কোনো খবব আছে আমাব?'

শ্যাবন বহস্যময ভঙ্গিতে বলল, 'হোযাইট হাউজে প্রেসিডেন্টেব সঙ্গে ডিনাব খেতে চাও? সামনেব হপ্তায?'

'জানি না খেতে চাই কিনা। বেগান কোথায?'

'নিচে। খেলছে।'

'এখন আবাব কী খেলা?'

'মূর্তি বানাচ্ছে। তোমাকে উপহাব দেবে।'

ক্রিস পট থেকে কফি ঢেলে বলল, 'হোযাইট হাউজে ডিনারেব ব্যাপাবটা সত্যি, না ঠাট্টা কবছ?'

'বা-বে, ঠাট্টা কবব কেন? সামনেব বিষ্যুদবাবে, বিকেল তিনটেয।'

'বড় পার্টি নাকি?'

'না, খুব বড় নয।'

'সত্যি? বাহ্!'

ক্রিস খুশি হল তবে তেমন অবাক হল না। অনেকেই ওর সঙ্গ পছন্দ করে। সে সুন্দবী, নামি অভিনেত্রী। তাব ফ্যানদের মধ্যে ট্যাক্সি ড্রাইভার, ভবঘুবে কবি থেকে শুরু কবে প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীরাও আছে। হোযাইট হাউজেব ডিনার খুব বড় ব্যাপাব না। ক্রিস মৃদু স্ববে বলল, 'বেগানের পড়াশুনা কেমন চলছে?'

শ্যাবন একটা সিগারেট ধরিয়ে হালকা সুরে বলল, 'অঙ্ক নিযে আবাব খানিকটা ঝামেলা হযেছে।'

'আবারো ?'

'হ্যাঁ, আশ্চর্য হওয়ারই কথা। অঙ্ক ওর পছন্দের বিষয় ছিল। আর এখন সামান্য জিনিসও...!'

'মা!' রেগান হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। মাথার ঝাঁকড়া চুল পেছনে টেনে বেঁধে 'পনি টেল' করেছে। আনন্দ-উত্তেজনায় চোখ-মুখ ঝলমল করছে। ক্রিস মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। 'আজ কী করেছ সারাদিন, মামণি ?'

'কিচ্ছু করি নি।'

'কিছুই না ?'

'দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। হুঁ... পড়েছি।'

'আর ?'

'ছবি এঁকেছি।'

'আর ?'

'আর — আর কিছু করি নি।'

ক্রিস হাসিমুখে বলল, 'কই, আমার জন্যে মূর্তি বানাও নি?'

রেগান কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর শ্যাবনের দিকে তাকাল খানিক রাগের দৃষ্টিতে। তার গোপন ভাস্কর্যের কথা এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়বে, সে ভাবে নি।

'ওটা এখনো শেষ হয় নি। রং করতে হবে।' রেগান আদুরে গলায় বলল, 'বড় খিদে পেয়েছে, মা। চল না আজ বাইরে গিয়ে খাই।'

ক্রিস নরম গলায় বলল, 'বেশ তো, চল আজ বাইরেই খাব। জামাটা বদলে আস।'

'আমি তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি, মা।'

'আমিও তোমাকে ভালবাসি, মামণি। নতুন যে জামাটা কিনে দিয়েছি সেদিন, নীল রঙের, ঐটা পরবে, কেমন?'

রেগান ঘর ছেড়ে চলে যেতেই শ্যাবন বলল, 'এগার বছরের খুকি হতে ইচ্ছে করে তোমার?'

'আমার এখনকার যে বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তাই নিয়ে, না এগার বছরের মেয়ের বুদ্ধি নিয়ে?'

'এখনকার বুদ্ধি, আর তোমার যত স্মৃতি আছে সব নিয়ে।'

'উহুঁ, কাজটা বড় কঠিন।'

'ভেবে দেখ।'

'ভাবছি।'

ক্রিস সকালের ডাকে আসা চিঠিপত্র উল্টে দেখতে লাগল। একটা মোটামতো খাম হাতে নিয়ে বলল, 'এটা কী শ্যারন? কোনো নতুন স্ক্রিপ্ট? বলেছি তো আমি আর কোনো নতুন স্ক্রিপ্ট এখন নেব না। আমি সত্যি খুব ক্লান্ত। আর পারছি না।'

'ওটা পড়ে দেখ, ক্রিস। মন দিয়ে পড়।'

'তুমি পড়েছ ?'

'হ্যাঁ, আজ সকালে পড়লাম।'

'ভালো ?'

'ভালো বললে কম বলা হয়। অসম্ভব ভালো।'

'অর্থাৎ আমাকে কোনো গির্জার সিস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে ?'

'উহুঁ। তোমাকে অভিনয় করতেই হবে না।'

'মানে?'

'মানে, ওরা তোমাকে ছবিটা পরিচালনা করতে বলছে।'

'ঠাট্টা করছ?'

'মোটেই না।' ক্রিস অবাক হয়েই পড়ল চিঠিটা। এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপারও ঘটে? সত্যি সত্যি ছবি পরিচালনার অনুরোধ। ছবিটা হবে আফ্রিকাতে। সন্ধ্যার পর তাঁবুর সামনে বসে থাকা। অন্ধকার নামবে ধীরে ধীরে। দূরের বনভূমি থেকে হিংস্র জন্তুর ডাক ভেসে আসবে। আহ্, অদ্ভুত!

'মা, আমার নতুন জামাটা খুঁজে পাচ্ছি না।' রেগান ওপর থেকে চেঁচিয়ে ডাকল।

'ড্রয়ারগুলো খুঁজে দেখ।'

'দেখেছি, কোথাও নেই।'

'দাঁড়াও, আমি আসছি।'

ক্রিসের সঙ্গে সঙ্গে শ্যারনও উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে উঠতে হয়, ক্রিস। আমার এখন ধ্যান করার সময়।'

ক্রিস বাঁকা চোখে তাকাল শ্যারনের দিকে। ধ্যানের ব্যাপারটা ইদানীং শুরু হয়েছে। এর শুরু সেই লস অ্যাঞ্জেলেসে। প্রথম দিকে শুধু আত্মসম্মোহনের ব্যাপারটাই ছিল। আজকাল আরো অনেক কিছু যোগ হয়েছে। ঘর বন্ধ করে মন্ত্রতন্ত্র পড়া হয়। ধূপকাঠি জ্বালানো হয়। ক্রিসের এসব ভালো লাগে না। আজো লাগল না। শুকনো গলায় বলল, 'এইসব করে তোমার কি কোনো লাভ হয়?'

'না, তবে মনের শান্তি হয়।'

ক্রিস কঠিন স্বরে বলল, 'মনের শান্তি হলে তো ভালোই।'

ক্রিস ওপরে উঠে দেখে রেগান তার ঘরের বাইরে পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। 'কী হয়েছে, রেগান?'

'আমার ঘরে কি যেন হয়েছে, মা।'

রেগান ভীত গলায় বলল, 'কি জানি কী। কেমন যেন শব্দ হচ্ছে।'

'কই আমি তো শুনছি না!'

'এখন হচ্ছে না। আগে হচ্ছিল।'

'ইঁদুর শব্দ করছে। খুব ইঁদুরের উপদ্রব হয়েছে।'

'জামাটা এই ঘরে নেই। পুরো ঘর খুঁজে দেখেছি।'

'ভালো করে খোঁজ নি। তুমি আজকাল কোনো কাজ ভালোমতো করতে পার না রেগান।'

নীল জামাটা পাওয়া গেল না। কোথাও নেই। রেগান গম্ভীর হয়ে বলল, 'এখন বিশ্বাস হল তো?'

'হুঁ। খুব সম্ভব উইলি ধুতে দিয়েছে।'

'নতুন জামা ধুতে দেবে কেন?'

'ঠিক আছে এটা পর। এটাও চমৎকার।'

ওরা খেতে গেল হট শপ-এ। ক্রিস শুধু সালাদ খেল। রেগান নিল স্যুপ, চারটা রোল, ফ্রাইড চিকেন, একটা চকলেট শেক, আর সবশেষে কফি আইসক্রিমের সঙ্গে অর্ধেক ব্লুবেরি পাই। এত জিনিস ও খায় কী করে! এইটুকু তো মোটে শরীর!

'চমৎকার ডিনার হয়েছে, মা।'

ক্রিস সস্নেহে তাকাল মেয়ের দিকে। তাকিয়েই চমকে উঠল। মেয়েকে অবিকল হাওয়ার্ডের মতো লাগছে দেখতে। বাবার এতোটা ছায়া যে মেয়ের মধ্যে আছে তা হঠাৎ হঠাৎই শুধু চোখে পড়ে। সব সময় চোখে পড়ে না।

মেয়ের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ক্রিস সহজ স্বরে বলল, 'আরো কিছু নেবে ?'

'উহুঁ!'

বাড়ি ফিরেই রেগান চলে গেল নিচের তলায় ওর খেলার ঘরে। পাখির মূর্তিটা শেষ করতে হবে।

রান্নাঘরে বিরস মুখে উইলি কফি বানাচ্ছিল। সন্ধ্যার দিকে গিয়েছিল কার্লের সঙ্গে সিনেমায়। উইলির ইচ্ছা ছিল বিটলসদের ছবি দেখে, কিন্তু কার্লের পাল্লায় পড়ে কি একটা আর্ট ফিল্ম দেখে এসেছে। উইলি মুখ কুঁচকে বলল, 'কার্ল একটা গর্দভ বিশেষ।'

ক্রিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'রেগানের নতুন জামাটা কোথাও দেখেছ? নীল রঙেরটা ?'

'হ্যাঁ, আজ সকালেই রেগানের ড্রয়ারে দেখেছি।'

'তারপর কোথায় নিয়ে রেখেছ ?'

'কোথায় আবার রাখব ? ড্রয়ারেই আছে।'

'ভুল করে লন্ড্রিতে পাঠাও নি তো ?'

'না তো!'

'ওটা কোথাও খুঁজে পাওযা যাচ্ছে না।'

উইলি কিছু একটা বলতে গিযেও বলল না। বিবক্ত মুখভঙ্গি কবে কফিতে চুমুক দিল।

'গুড ইভনিং, ম্যাডাম।'

ক্রিস দেখল কার্ল লম্বা মুখটাকে আবো লম্বাটে বানিযে ঘবে ঢুকছে। গম্ভীব গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ইঁদুর মারা কলগুলো পাতা হযেছে, কার্ল?'

'ম্যাডাম, এ বাড়িতে কোনো ইঁদুর নেই।'

আমি জানতে চাইছি কলগুলো পাতা হয়েছে কিনা।'

'জ্বি, হযেছে।'

'তোমরা ছবি দেখতে গিয়েছিলে শুনলাম। কেমন ছবি ?'

'চমৎকার।'

'ইঁদুর মারা কল কিনতে তো কোনো অসুবিধা হয নি ?'

'জ্বি না।'

'ভোর ছ টায় দোকান খোলা ছিল ?'

'কোনো কোনো দোকান চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে।'

'ও, আচ্ছা।'

ক্রিস বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে ভিজল। তাবপর গাযে তোয়ালে জড়িয়ে শোবাব ঘরে গিয়ে ড্রয়ার খুলতেই দেখে, আশ্চর্য। বেগানেব হারানো জামাটা পড়ে আছে তাব ড্রয়াবেব এক কোণে। অনেকটা অজ্ঞাতসাবেই ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। জামাটার তো এখানে আসাব কথা নয়।

ক্রিস পোশাক পরে চিন্তিত মুখে নিচের স্টাডিরুমে নেমে এল। স্ক্রিপ্টটা ওর হাতে। পড়া দরকার ভালোমতো। ডায়ালগগুলো কিছুতেই মুখস্থ হচ্ছে না।

ফায়ারপ্লেসের সামনের সোফায় বসে দুচার পাতা উল্টাচ্ছে; তখনই খবর হল বার্ক ডেনিংস এসেছে। লোকটি নিঃসঙ্গ : প্রাযই আসে ক্রিসেব এখানে।

ঘরে ঢুকেই বলল, 'ক্রিস, আমি কিন্তু কিছুটা মাতাল — প্রচুর পান করে এসেছি।'

ক্রিস দেখল, বার্কের হাত দুটো রেন-কোটের পকেটে। মাথা খানিকটা নিচু। চাউনি কেমন এলোমেলো। এই চাউনি ক্রিসের চেনা। লাউসান-এ ছবিব শুটিঙের সময় দেখেছে। ওরা ছিল জেনেভা হ্রদের পাবে ছোট্ট একটা হোটেলে। ক্রিসের ঘুম আসছিল না। ভোর পাঁচটার দিকে ও নেমে এল লবিতে, যদি চা বা কফি কিছু পাওয়া যায়। তখন দেখল হ্রদের পাব ঘেঁষে বার্ক দ্রুত পাযে হেঁটে আসছে। লবিতে ঢুকেই সে খিস্তি কবল, 'একটা বেশ্যা মেয়েলোকও পাওয়া গেল না। শালার একটা শহর! থু থু!'

সেদিন বার্কের চোখে এ বকমই অস্বাভাবিক দৃষ্টি ছিল। তবে আজ সে অনেক শান্ত। কতক্ষণ শান্ত থাকে সেটাই কথা। বার্ক বলল, 'ক্রিস, আমার ড্রিংকস ?'

'আসছে। তুমি শান্ত হযে বস।'

'বেশ, বসলাম।'

'আর শোন, একটা খিস্তিও কববে না কিন্তু, প্লিজ।'

'ঠিক আছে, ঠোঁট ফাঁকই করব না। নীববে পান কবব।'

ক্রিস গ্লাসে ধীরে ধীবে ভদকা ঢালছিল। এক ফাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞেস কবল, 'আচ্ছা বার্ক, কখনো কি মৃত্যুব কথা ভেবেছ? মানে মববার পব কী হয এই সব ?'

'কী বললে ?'

'তুমি কি কখনো মৃত্যুব কথা ভাব না ?'

'তোমাব হযেছে কি, ক্রিস ?'

'না মানে, আজ ভোববাতে একটা খুব খাবাপ স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম — আমি যেন মরে যাচ্ছি।'

বার্ক সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'মৃত্যু খুব শান্তিময একটা ব্যাপাব। মৃত্যুব স্বপ্ন দেখে ভয পাওযা কোনো কাজেব কথা নয।'

'আমি মবতে চাই না। সাবাজীবন আমি বেঁচে থাকতে চাই।'

'তুমি বেঁচে থাকবে ঠিকই। তোমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেঁচে থাকবে।'

'দূব! তুমি দেখি মদ খেযে পাদ্রীদেব মতো কথা বলতে শুরু কবেছ।'

বার্ক আব কিছু বলল না। আরক্ত চোখে তাকিযে বইল। ক্রিস বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। পাদ্রীরাও কি মদ খায ?'

বার্ক বলল, 'আমাকে আরেক গ্লাস ভদকা দাও তো, ক্রিস!'

ক্রিস বলল, 'আচ্ছা, ওরাও কি পাপ করে আমাদের মতো ?'

'আমি জানব কী কবে ?'

'তোমাব তো জানাব কথা। এক সময পাদ্রী হওযার জন্যে তুমি চার্চে ঘোবাফেরা শুরু কবেছিলে।'

'ক্রিস, আমাকে আবেক গ্লাস দাও।'

'না, আর না। কফি খাও ববং।'

'উহুঁ, কফি নয। কফি আমি খাই না।'

ক্রিস এবাব গ্লাসে জিন ঢালল। তাবপর নরম গলায বলল, 'জান, মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা হয ওদের আমার এখানে চা খেতে বলি।'

'কাদের?'

'পাদ্রীদেব।'

বার্ক এবার খুব বিচ্ছিরি একটা খিস্তি করল। ক্রিস দেখল, বার্কের চোখ–মুখ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে। বোঝা গেল এখনই সে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়বে। ক্রিস প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল খুব তাড়াতাড়ি। ছবি পরিচালনার যে অফার ও পেয়েছে সে কথা তুলল, 'বার্ক, আমি পারব কিনা কে জানে।'

'যদি আমার মতো একটা গাধা–মার্কা লোক ছবি পরিচালনা করতে পারে তবে দুনিযাব যে কেউ পারবে।'

'কিন্তু বার্ক, ছবি পরিচালনার তো আমি কিছু জানি না।'

'জানার কোনো দরকারও নেই। তুমি এক জন ভালো ক্যামেরাম্যান, এক জন ভালো এডিটর, আর কযেক জন ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটার নাও। দেখবে তারাই তোমাকে পার কবে নেবে। তোমাকে একটা জিনিস শুধু করতে হবে। অভিনেতা–অভিনেত্রীদেব খুব সাবধানে বেছে নিতে হবে।'

মাতাল হোক আর দুশ্চরিত্রই হোক, বার্ক ডেনিংস যে সেরা চিত্র পরিচালকদের এক জন তা ক্রিস ভালো করেই জানে। মন দিযে তাই ক্রিস তাব কথাগুলো শুনছে।

টেকনিক্যাল স্টাফদের নানা খুঁটিনাটি বোঝাতে শুরু করল বার্ক। ক্রিস লক্ষ কবল, বার্কের চোখ থেকে সেই রাগী ভাবটা দূর হযে যাচ্ছে। ভাগ্যিস সমযমতো প্রসঙ্গ পবিবর্তন কবা হযেছে।

'ম্যাডাম, আপনাদেব কিছু লাগবে।'

ঘাড় ফিরিযে বার্ক দেখে, দরজার কাছে গম্ভীর মুখে কার্ল দাঁড়িযে আছে।

বার্ক নতুন এক খেলা শুরু করল। কার্লকে দেখলেই এই খেলা খেলতে ইচ্ছে করে। 'ও, তোমাব নামটা যেন কি ? থর্নডাইক, নাকি হেনবিখ? কিছুতেই আমাব মনে থাকে না।'

'আমার নাম কার্ল।'

'ও, কার্ল। ঠিক বলেছ, কার্ল। তুমি জার্মান গেস্টাপোব সঙ্গে ছিলে না ?'

'আমি জার্মান নই, সুইস।'

'হ্যাঁ, তাই তো। তাই তো। তুমি তাহলে গোযেবল্সেব সঙ্গে ফুটবল খেল নি ?'

কার্ল আহত চোখে তাকাল ক্রিসের দিকে। বার্কেব মজা করা ফুবোয না, 'তুমি নিশ্চযই রুডলফ হেসের সঙ্গে প্লেনেও চড় নি ? নাকি চড়েছ ?'

কার্ল বার্ককে অগ্রাহ্য কবে ক্রিসের দিকে তাকাল। 'ম্যাডাম, আপনাব কি কিছু লাগবে?'

ক্রিস বলল, 'না, আমার কিছু লাগবে না। বার্ক, তোমাব কিছু লাগবে ? কফি ?'

'কফি ? আমি খাব কফি ? কেন আমি কি...'

বার্ক খিস্তিটা সজোরে ঝাড়তে গিযে হঠাৎ থেমে গেল। তারপব প্রায ঝড়েব বেগে বেরিযে গেল ঘর ছেড়ে। ক্রিস পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে কার্লেব দিকে তাকিযে বলল, 'রেগান কোথায়, কার্ল?'

'খেলার ঘবে। ডেকে আনব ?'

'না, আমিই যাচ্ছি। আব শোন, বার্কেব ব্যবহাবেব জন্যে আমি খুব দুঃখিত। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

'উনি কী বলেন তাতে আমি কখনো কান দেই না, ম্যাডাম।'

'দাও না বলেই সে আরো বেশি করে।'

ক্রিস নিচের তলায় নেমে এল।

'রেগান, তোমার পাখি বানানো শেষ হযেছে ?'

'হ্যাঁ, মা। দেখ, তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'বাহ্। ভারি সুন্দর হয়েছে।'

উজ্জ্বল চোখে হাসল রেগান। খেলাব ঘবটাও নিজেব মতো কবে সাজিয়েছে। চাবদিকের দেয়ালে নিজের আঁকা সব ছবি ঝোলানো। মাঝখানে একটা রেকর্ড প্লেযাব। দুটো খেলাব টেবিল। মূর্তি বানাবাব জন্যে একটা ছোট্ট টেবিল। বেগান বলল, 'পাখিটা তাহলে তোমাব পছন্দ হয়েছে, মা?'

'খুব, খুব পছন্দ হয়েছে। তা এ পাখিব নিশ্চযই একটা নাম আছে?'

'আছে।'

'খুব সুন্দর নাম নিশ্চযই?'

'জানি না সুন্দর কিনা।'

'এব নাম বাখা যাক বোকা পাখি। কি — ঠিক আছে নাম?'

বেগান খিলখিল কবে হাসল। 'আমাব ঘবে সাজিযে বাখব এই বোকা পাখিকে, কেমন?'

পাখিটা সাবধানে নামিযে বাখতে গিযে ক্রিস দেখল টেবিলে একটা ওইজা বোর্ড সাজানো। এটা এখানে এল কীভাবে? বোর্ডটা ও কিনেছিল কযেক বছব আগে। সে সময খুব শখ হযেছিল প্ল্যানচেটেব। অনেকবাব বন্ধুদেব নিযে বসেছে; যদি সত্যি সত্যি পবকালের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। না, কোনো কাজ হয নি। বোর্ডেব বোতামে আঙুল দিযে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বসে থাকলেও বোতাম নড়ে না। বন্ধুদেব সঙ্গে প্ল্যানচেট কবতে বসলেই শুধু হাসাহাসি আব অশ্লীল কথা হয। ভূতবা যেসব খবব দেয সেগুলোও মাত্রাছাড়া অশ্লীল। যাবা প্ল্যানচেট কবতে বসে তাদেবই কেউ যে আঙুল দিযে বোতাম ঠেলে ঠেলে নেয, তা বলাই বাহুল্য।

'এই ওইজা বোর্ড নিযে খেলছিলে নাকি, বেগান?'

'হ্যাঁ।'

'জান কী কবে খেলতে হয?'

'হুঁ, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি।'

বেগানেব উৎসাহ দেখে ক্রিস গম্ভীব গলায বলল, 'যতদূব জানি দুজন লাগে এতে।'

'না মা, এক জনেও হয। আমি তো সব সময একা একাই কবি।'

ক্রিস চেযাব টেনে বসল। হালকা স্ববে বলল, 'এস দুজনে মিলেই কবি।'

বেগান খানিকক্ষণ ইতস্তত কবে বসে পড়ল মাযেব সামনে। আঙুল বাখল বোতামে। ক্রিস নিজেও তর্জনী বাড়িযে বোতাম স্পর্শ কবতেই সেটি কেমন যেন নড়ে উঠে বোর্ডে যেখানে 'না' লেখা সেখানে স্থিব হল। বেগান লাজুক হেসে বলল, 'আমি ববং নিজে নিজেই কবি?'

'তুমি আমাব সঙ্গে কবতে চাও না, বেগান?'

'চাই, খুব চাই। কিন্তু দেখছ না, ক্যাপ্টেন হাউডি কেমন মানা কবছে?'

'লক্ষ্মী মা, ক্যাপ্টেন হাউডিটা কে?'

'আমি যখন প্রশ্ন কবি তখন সে-ই তো উত্তব দেয!'

'তাই?'

'হ্যাঁ মা। ক্যাপ্টেন হাউডি খুব ভালো। খুবই ভালো। আমাব সঙ্গে কত কথা হয!'

ক্রিস চেষ্টা কবল এমন ভাব কবতে যাতে রেগান ওব মনেব অস্বস্তিটা বুঝতে না পারে। তাব এই বাচ্চা মেয়ে কি খানিকটা বদলে গেছে? বাবাব খুব ভক্ত ছিল বেগান। তবু ওদেব যখন ছাড়াছাড়ি হল, আলাদা হয়ে গেল ক্রিস ও হাওযার্ড, তখনো বেগান সবকিছু বেশ সহজভাবেই নিল।

ক্রিসের ব্যাপারটা একটুও ভালো লাগে নি। সব সময় ভেবেছে কোনো না কোনো দিন চেপে রাখা দুঃখ ভেসে উঠে সব গোলমাল করে দেবে। এই যে আজ ক্যাপ্টেন হাউডি নামের এক কাল্পনিক সঙ্গী হয়েছে রেগানের, আসলে সে কে ? বাবার হাওয়ার্ড নাম থেকেই কি হাউডি নাম আসে নি? ক্রিস হালকা গলায় গলল, 'ক্যাপ্টেন হাউডি বলে ডাকছ কেন, রেগান?'

'তাহলে কী বলে ডাকব ? ওর নাম তো হাউডি!'

'কে বলেছে ওর নাম হাউডি ?'

'ও নিজেই বলেছে।'

'আর কী বলেছে।'

'অনেক কিছু।'

'শুনি, কী বলেছে ?'

'বললাম তো অনেক কিছু!'

'যেমন ?'

'ঠিক আছে, তুমি নিজের কানেই শোন। আমি ওকে এখনই প্রশ্ন কবছি।'

'বেশ, প্রশ্ন কর।'

ওইজা বোর্ডের বোতামটা আঙুল দিয়ে চেপে ধবে রেগান গম্ভীর স্ববে প্রথম প্রশ্নটি কবল, 'ক্যাপ্টেন হাউডি! তোমার কি মনে হয আমাব মা খুব সুন্দবী?' বেগানেব সমস্ত চোখে- মুখে গভীর একাগ্রতা। একদৃষ্টে তাকিযে আছে ও। এক সেকেন্ড... পাঁচ সেকেন্ড... দশ... বিশ...

'ক্যাপ্টেন হাউডি! ক্যাপ্টেন হাউডি!'

ক্রিস খুব অবাক হল। ভেবেছিল, রেগান হয়তো নিজেই ঠেলে ঠেলে বোতামটা 'হ্যাঁ'ব ঘবে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে রকম কিছু হল না। চোখ–মুখ লাল কবে গম্ভীব হয়ে বসে আছে রেগান। এক সময ফিসফিস করে বলল, 'ক্যাপ্টেন হাউডি! ভালো হচ্ছে না কিন্তু। মাব সামনে তুমি খুব অভদ্র ব্যবহাব করছ।'

ক্রিস বলল, 'লক্ষ্মী মা, রেগান, একটা কথা শোন। আমাব মনে হয বেচাবা ক্যাপ্টেন হাউডি ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'এত সকালেই ?'

'হ্যাঁ। আমার তো মনে হয তোমারও ঘুমানো উচিত।'

'এখনই ?'

ক্রিস রেগানকে ওর শোবার ঘরে নিয়ে আদর কবে বলল, 'রোববাবে আমরা সবাই খুব ঘুরব, কী বল ?'

'কোথায় যাব ?'

'এখন তো চেরী ফুল ফুটেছে। পার্কে গিযে চেবী ফুল দেখতে পারি, তাবপব বাতে একটা সিনেমাও দেখা যেতে পারে।'

'আমি তোমাকে খু–উ–ব ভালবাসি, মা।'

'আমিও তোমাকে খুব ভালবাসি, মামণি।'

'তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমি মিঃ বার্ককেও সঙ্গে নিতে পার।'

ক্রিস রীতিমতো যেন চমকে গেল, 'বার্ক ? ওকে কেন ? ওকে সঙ্গে নেব কেন ?'

রেগান চাপা গলায় বলল, 'ওকে তো তুমি পছন্দ কর। কর না ?'

'হাঁ, তা করি। তুমি কর না ?'

রেগান কোনো জবাব দিল না। ক্রিস বলল, 'বল তো মা, তুমি এমন গম্ভীর হয়ে আছ কেন ?'

'তুমি ওকে বিয়ে করবে, তাই না মা ?'

ক্রিস এবার খিলখিল করে হেসে উঠল, 'কী যে তোমার কথা। ওকে আমি বিয়ে কবব কোন দুঃখে ?'

'ওকে তুমি পছন্দ কর, তাই বিয়ে কববে।'

'আমি তো অনেককেই পছন্দ করি, তাই বলে কি সবাইকে বিয়ে কবতে হবে? ও আমার বন্ধু, এর বেশি কিছু না।'

'আব্বুকে তুমি যতটা ভালবাসতে ওকে ততটা বাস না, তাই না ?'

'তোমার আব্বুকে আমি খুবই ভালবাসতাম, এখনো বাসি, সব সময়ই বাসব। বার্ক এখানে প্রাযই আসে, একা একা থাকে তো, তাই। এব বেশি কিছু না।' একটু যেন হাসি ফুটল রেগানের ঠোঁটে। মনে হল মাযেব সব কথা ও মেনে নিচ্ছে। তাব মুখেব গম্ভীব ভাব এখন আব নেই।

'এসব নিযে কখনো চিন্তা কববে না। যাও, ঘুমাও এখন।'

ক্রিস মেযেব কপালে চুমু খেযে দবজা বন্ধ কবে দিল। বাচ্চাবা কোথেকে যে অদ্ভুত সব ধাবণা পায কে জানে। অবশ্যি বেগান জানে, ডিভোর্সের মামলাটা ক্রিসই দাযেব কবেছে, ওব বাবা কবে নি। কিন্তু ও কি জানে এতে ওব বাবা একটুও আপত্তি কবে নি? স্ত্রীব অসামান্য খ্যাতি কিছুতেই সহ্য কবতে পাবছিল না হাওযার্ড। হযতো নামি-দামি তাবকাদেব স্বামী হওযা খুব কষ্টকব একটা ব্যাপাব।

স্টাডিরুমে ফিবে এসে বাতি জ্বালাতেই ক্রিস দেখল, বেগান নেমে এসেছে সিঁড়িব কাছে।

'কী ব্যাপাব, বেগান ?'

'কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে আমাব ঘবে!'

'কী বকম শব্দ ?'

'কেউ যেন দবজায নক কবছে। বড্ড ভয লাগছে, মা।'

'ইঁদুব শব্দ কবছে। ভযেব কিছু নেই। যাও ঘুমিযে পড়।'

'ঘুমাবাব আগে খানিকক্ষণ গল্পেব বই পড়ি ?'

'বেশ তো।'

লক্ষ করল, বেগান সিঁড়ি বেযে ওপবে উঠে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ওব পা দুটো যেন চলতে চাইছে না। একটু যেন দিশেহাবা ভাব। যেন যেতে চাচ্ছে না।

'ঘরে কিন্তু ইঁদুর নেই, ম্যাডাম।'

ক্রিস ভীষণ চমকে প্রায় চেঁচিযেই উঠতে যাচ্ছিল। কার্ল খুব নিঃশব্দে চলাচল কবে। কোথেকে এসে একেকবার আচমকা কথা বলে দারুণ ভয পাইযে দেয।

'কার্ল, তুমি আবাবো ভীষণ চমকে দিযেছ আমাকে। চোরেব মতো এ বকম চুপি চুপি হাঁট কেন ?'

'ম্যাডাম, আমি খুবই দুঃখিত।'

'ভবিষ্যতে আর এ রকম করবে না।'

'ঠিক আছে, ম্যাডাম।'

'শোন, ইঁদুর মাবা কলগুলো পেতেছ ?'

'ঘরে ইঁদুর নেই।'

'আবারো সেই এক কথা! কলগুলো পেতেছ কিনা বল।'
'জ্বি, পেতেছি।'
'বেশ। এখন যাও এখান থেকে।'
'কফি আনব আপনার জন্যে ?'
'না, তুমি যাও।'

খুব ভোরে ক্রিসের ঘুম ভেঙে গেল। অবাক হয়ে দেখল, বেগান ওব পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। মনে হল জেগেই আছে।

'কী ব্যাপার, রেগান? এখানে তুমি কী করছ ?'

'মা, আমার বিছানাটা খুব কাঁপছিল... তাই...'

'বিছানা কাঁপছিল মানে? কী যে তুমি বল!'

'সত্যি বলছি, মা। বড্ড ভয় করছিল আমার।'

ক্রিস মেয়ের কপালে চুমু খেল। চাদবটা গাযে তুলে দিযে গাঢ় স্ববে বলল, 'ঘুমাও, এখনো ভালোমতো ভোর হয নি।'

যাকে মনে হচ্ছিল দিনের সূচনা — আসলে তা ছিল এক অন্তহীন বাতের শুরু।

২

নিউইযর্ক সাবওযে প্ল্যাটফর্মেব এক প্রান্তে ফাদাব ডেমিযেন কাবাস চুপচাপ দাঁড়িযে আছেন। বিকট শব্দ কবে ট্রেনগুলো আসছে, যাচ্ছে। তিনি নিশ্চল মূর্তিব মতো দাঁড়িযে আছেন -- একটুও নড়ছেন না। অন্ধকার টানেলেব ভেতর ছোট ছোট ভৌতিক আলো। তাঁব মনে হল, এইসব আলোর যেন নিজস্ব কোনো গোপন কথা আছে।

পাশ থেকে বিকট স্ববে কে যেন কাশল। ঘাড় ফিরিযে ফাদার দেখলেন, বিকলাঙ্গ একটা লোক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। তাব চোখ দুটো কেমন হলুদাভ। শার্ট-প্যান্ট বমিতে মাখামাখি। উগ্র গন্ধ আসছে। আহ্‌, কী কুৎসিত! ফাদাবের মনে হল, 'ঈশ্বর বলে কি সত্যি কেউ আছেন? যদি থাকেন তাহলে পৃথিবীতে কি এ ধবনের বীভৎসতা থাকা সম্ভব ?'

'ফাদার, এই পঙ্গু মানুষটিকে দয়া করুন।'

লোকটা আবার মুখ ভবে গলগলিয়ে বমি কবছে। উঠে দাঁড়াতে পারছে না, বাব বাব ঢলে ঢলে পড়ছে।

'ফাদার, প্রভু যীশুর দোহাই, দয়া করুন।'

ট্রেন আসছে। সট সট শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ফাদাব দেখলেন লোকটা পড়ে যাচ্ছে। তার চোখে-মুখে মাতালের ভরসা হারানো দৃষ্টি।

অজ্ঞান হযে গেল নাকি ? এপিলেপ্সি ? এগিযে গিযে লোকটাকে ধবে ফেললেন ফাদাব। সাবধানে বসালেন সামনের একটা বেঞ্চিতে। একটা ডলার বের কবে গুঁজে দিলেন তার বমি-ভেজা পকেটে।

ট্রেন এসে প্লাটফর্মে দাঁড়াতেই ফাদার নিঃশব্দে ট্রেনে উঠে বসলেন। ফাঁকা ট্রেন। সিটে হেলান দিয়ে দুচোখ বন্ধ করলেন। কোনো কোনো সময এইভাবে চোখ বুজে ভাবতে বেশ ভালো লাগে।

ট্রেন থেকে নেমে ফাদারকে ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত হেঁটে যেতে হল। তিনি গরিব মানুষ, দান করা ডলারটি ছিল তাঁর ট্যাক্সি ভাড়া।

পরদিন আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনেব সেমিনাবে ফাদার ডেমিয়েন স্পিরিচুয়ালিজমের ওপর একটি পেপাব পড়লেন। সভা শেষ হওয়ামাত্র মাকে দেখতে ছুটে গেলেন। ম্যানহাটানের একুশ নম্বব স্ট্রিটে ছোট্ট একটি অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর মা একা থাকেন।

ছেলেকে দেখেই মা দৌড়ে এসে কপালে চুমু খেলেন। তারপর বাচ্চা মেয়ের মতো দ্রুত পাযে ছুটে গেলেন কফি বানাতে। ফাদাব ডেমিয়েনের মনে হল, মাকে ছেড়ে যাওয়া তাঁব কিছুতেই উচিত হয নি। তিনি অবশ্যি মাকে প্রাযই চিঠি লেখেন, যদিও সেসব চিঠি তাঁর ইংরেজি না–জানা মা পড়তে পাবেন না। না, মাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত হয় নি।

বেলা এগারটার দিকে ফাদার মাযেব কাছ থেকে বিদায নিলেন। যাবার সময বললেন, 'খুব শিগ্‌গির আবার আসব, খুব শিগ্‌গিব।'

ওযেগেল হলে নিজেব ঘবে ফিবে তিনি ভাবলেন, মেবিল্যান্ড অঙ্গবাজ্যেব প্রধান পাদ্রীকে একটি লম্বা চিঠি লিখবেন। আগেও লিখেছেন। বক্তব্য একটিই; তাঁকে নিউইযর্কে বদলি কবা হোক। আব বর্তমান দাযিত্ব থেকে অব্যাহতি দিযে শিক্ষকতাব কাজে লাগানো হোক। এব কাবণ ছিল দুটো। এক, মাযের কাছে থাকতে পাবা। দুই, বর্তমান কাজে তাঁব অক্ষমতা। মাযেব কাছে থাকতে চাওযাব বিষযটি সবাই বুঝতে পারে, কিন্তু বর্তমান দাযিত্বে অক্ষমতাব বিষযটি কেউ বুঝতে রাজি নয। তিনি নিজেও ব্যাখ্যা কবতে পাবেন না।

কেউ জানে না ফাদাব ডেমিযেনেব মনে একটি সন্দেহ দানা বেঁধে আছে। একটি নিষিদ্ধ সন্দেহ। দিন–বাত সর্বক্ষণ তিনি ঈশ্ববের দযা কামনা কবেন। ঈশ্ববকে বুঝতে চান। তবু বুঝতে পাবেন না। একটি অশুভ সন্দেহ তাই তাঁকে সব সময আচ্ছন্ন কবে বাখে। 'ঈশ্বব কি সত্যি আছেন?'

'হে ঈশ্বব, তুমি নিজেকে প্রকাশ কব আমাব কাছে। দূব কব আমাব সমস্ত সংশয। তোমাব অস্তিত্বেব একটি প্রমাণ তুমি আমাকে দাও। দযা কব, দযা কব।'

৩

১১ এপ্রিল ভোববেলা ক্রিস ফোন কবল তাব পুরানো এক ডাক্তাব বন্ধুকে। তাব এক জন ভালো সাইকিযাট্রিস্ট দবকাব; যে রেগানকে দেখবে।

'মার্ক, তুমি তেমন কাউকে চেন?'

'আগে বল ব্যাপার কি। কী হযেছে?'

ক্রিস পুবো ঘটনাটাই খুলে বলল। রেগানের জন্মদিন গেছে কযেকদিন আগে। জন্মদিনে সব সময তাব বাবা তাকে ফোন করে, এবার করে নি। এরপর থেকেই বেগান কেমন যেন একটু অন্য রকম। বাতে তেমন ঘুমায না। স্বভাব হযেছে ঝগড়াটে। জিনিসপত্র লাথি মেবে ছুড়ে ফেলছে। সে আগে খেতে পছন্দ করত, এখন খাওয়াদাওয়া প্রায বন্ধ। সবচেযে বড় কথা, মনে হয হঠাৎ যেন ওর শরীরে খুব শক্তি হযেছে। সাবাক্ষণ দৌড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে। স্কুলের পড়াশোনাতেও খুব খারাপ করছে। তাব ওপর এখন একটা কিছু কবে লোকজনেব দৃষ্টি আকর্ষণ করাব ঝোঁক হযেছে।

'দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হল না।'

ক্রিস বলল, 'সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই ও এখন বলে তার ঘরে নাকি রাত্রিবেলায় খট খট শব্দ হয়। কিন্তু আমার মনে হয় শব্দটা রেগানই করে। কারণ কেউ ঘরে যাওয়ামাত্র শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। ইদানীং ও জিনিসপত্র হারাচ্ছে — বই, জামা, টুথব্রাশ — এসব। গতকাল থেকে আবার বলছে, কারা নাকি ওর ঘরের আসবাবপত্র নাড়াচ্ছে। যখন ও ঘুমিয়ে থাকে তখন নাকি তারা ঘরের আসবাবপত্র নাড়ায়। আমার ধারণা আসলে রেগান নিজেই এসব করছে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে।'

'ক্রিস, তুমি কি বলতে চাও ও ঘুমের মধ্যে এসব করছে ?'

'উহুঁ। দিব্যি জেগে জেগেই করছে। সবার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যেই করছে। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

ক্রিস বিছানা নাড়ার ঘটনাটাও বলল। এ পর্যন্ত রেগান দুবার বলেছে যে, তাব বিছানা আপনা আপনি কাঁপতে থাকে।

এই বলে সে ঘুমাতে আসে মাযেব ঘরে। নিজের ঘরে ঘুমাতে তখন তার খুব ভয করে।

'ক্রিস, শাবীবিক কারণেও বিছানা কাঁপতে পারে। যদি রেগানেব ক্রনিক স্পাজম থেকে থাকে তাহলে...'

'না মার্ক, আমি বলি নি যে বিছানা কাঁপে। এটা বেগানেব কথা।'

'অর্থাৎ ও মিথ্যা বলছে! বিছানা আসলে কাঁপছে না ?'

'না, তাও আমি জানি না।'

'গায়ে জ্বব আছে ?'

'না।'

'তুমি বলছিলে স্কুলে পড়াশোনা ভালো পারছে না। অঙ্ক কেমন পাবছে? সাধাবণ গণিতের কথা বলছি।'

'কেন, এ কথা জিজ্ঞেস কবছ কেন ?'

'আগে বল, অঙ্কটা কেমন পারছে ?'

'খুবই খারাপ। ইদানীং খারাপ হযেছে। অঙ্কের কথা কেন জিজ্ঞেস কবলে?'

'অঙ্কে খারাপ কবা হচ্ছে একটা বিশেষ লক্ষণ ?'

'কীসের লক্ষণ ?'

'শুধুমাত্র অনুমানের ওপর আমি কিছু বলতে চাই না। তোমাব কাছে কি পেনসিল আছে? আমি একজন ডাক্তারের নাম বলছি, লিখে নাও।'

'মার্ক, তুমি নিজে কি একবার আসতে পার না ? প্লিজ।'

'না, আমাব আসার দরকাব নেই। যার ঠিকানা দিচ্ছি সে অত্যন্ত ভালো ডাক্তাব, তোমার খুব কাছেই আছে।'

ক্রিস ঠিকানা লিখল। ডাঃ স্যামুয়েল ক্লীন, অবলিংটন।

'ওকে বলবে, পরীক্ষা টরীক্ষা শেষ করে যেন আমাকে ফোন করে।'

'মার্ক, তুমি কি নিশ্চিত যে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে না ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত। উদাহরণ দিযে তোমাকে বোঝাচ্ছি। মনে কর, একজন লোক হঠাৎ বলছে সে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখে। কারা যেন তাকে ডাকে। সে সারাক্ষণ ভযে ভযে থাকে। রাতে ঘুমায় না। দুঃস্বপ্ন দেখে। তুমি কি তাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিযে যাবে ?'

'নিয়ে যাওয়াই তো উচিত।'

'ভালো করে ভেবে দেখ।'

'ভেবেই বলছি।'

'না। প্রথমে দেখতে হবে লোকটির ব্রেন টিউমার হয়েছে কিনা। কাবণ লক্ষণটা হচ্ছে ব্রেন টিউমারের। কাজেই, যে কোনো অসুখে সবাব আগে দেখতে হয় কোনো শাবীবিক অসুবিধা আছে কিনা।'

ডাঃ ক্লীনকে টেলিফোন করে ক্রিস বিকেলের জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কবল। এখন তাব হাতে প্রচুর সময়। শুটিং শেষ, এখন এডিটিং চলছে। কিছু প্যাচ ওয়ার্ক বাকি, তবে সেসবে ক্রিসেব কোনো ভূমিকা নেই।

রেগানকে অন্য ঘবে পাঠিয়ে ডাঃ ক্লীন রোগেব ইতিহাস জানতে লাগলেন। মাঝে মাঝে নোট নেয়া আর মাথা নাড়ানো ছাড়া তিনি কোনো সাড়াশব্দ কবলেন না। ক্রিস যখন বিছানা কাঁপাব কথা বলল তখন ডাক্তারেব ভ্রূ কুঁচকে উঠল। ক্রিস সবশেষে বলল, 'ডাক্তার মার্কেব ধাবণা, বেগান যে হঠাৎ অঙ্কে খাবাপ করছে এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমি বুঝতে পাবছি না কেন।'

'আপনি কি স্কুলের লেখাপড়া সম্পর্কে বলছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'অঙ্কে কি সে খুবই খাবাপ করেছে ?'

'খুবই।'

'মিসেস ম্যাকলীন, আপনাব মেয়েকে আগে ভালোভাবে পবীক্ষা কবতে হবে। হুট কবে কিছু বলা ঠিক হবে না।'

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনেকগুলো পরীক্ষা কবা হল। তাবপব একদিন ডাঃ ক্লীন হাসিমুখে বেগানের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধবে কথাবার্তা বললেন। তাবপব প্রেসক্রিপশন লিখতে বসলেন। 'আমাব মনে হচ্ছে আপনাব মেযেব যা হযেছে তাকে হাইপাব কাইনেটিক বিহেভিযাব ডিসঅর্ডাব বলা যেতে পাবে।'

'কী বললেন ?'

'এটা নার্ভেব একটা অসুখ। এখনো আমবা ভালো জানি না। সাধাবণত বযঃসন্ধিব সময়টায় অসুখটা হতে দেখা যায়। বেগানেব মধ্যে এই অসুখেব সব লক্ষণই আছে। অতিবিক্ত জীবনীশক্তি, বাগ, অঙ্কে খাবাপ কবা...'

'এত জিনিস থাকতে অঙ্ক কেন ?'

'এই অসুখেব একটি বড় লক্ষণ হচ্ছে মনঃসংযোগে অক্ষমতা। অঙ্ক হচ্ছে মনঃসংযোগেব ব্যাপাব।' ডাক্তার ক্লীন প্রেসক্রিপশনটি ক্রিসের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। 'আমি ওকে দিয়েছি 'মিথাইলফেনিডেট'। ওতেই দেখবেন কাজ হবে।'

'ওতেই হবে ?'

'হ্যাঁ, ওতেই হবে। দশ মিলিগ্রাম কবে দিনে দুবাব।'

'এটা কি ট্রাংকুলাইজাব ?'

'না, এক ধবনেব স্টিমুলেন্ট।'

'স্টিমুলেন্ট ?'

'হ্যাঁ। ওর স্টিমুলেন্টেরই প্রযোজন। অসুখটা হযেছে মানসিক ডিপ্রেশনেব জন্যে। উত্তেজনা দিযে তা নষ্ট কবতে হবে।'

'তাহলে ওকে কোনো সাইকিযাট্রিস্টের কাছে নেযার দরকার নেই ?'

'না, তেমন দরকার আছে বলে মনে করি না।'

'ওষুধটা কতদিন খাওয়াতে হবে?'

'দুসপ্তাহ। এর মধ্যেই দেখবেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।'

'আপনার ধারণা এটা নার্ভের অসুখ ?'

'আমার সেই রকমই সন্দেহ।'

'আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন ও ইদানীং যেসব মিথ্যা কথা বলছে সেসবও সেবে যাবে ?'

ডাঃ ক্লীন এই প্রশ্নের উত্তর না দিযে নিজেই আচমকা এক প্রশ্ন করলেন, 'বলুন তো, রেগান কি আগে অশ্লীল কথা বলেছে ?'

ক্রিস অবাক হয়ে বলল, 'না তো, কখনো না। ও সে রকম মেয়েই নয।'

'এই তো মিলে যাচ্ছে। অশ্লীল কথা বলাটাও মিথ্যা বলা শুরু করার মতো ব্যাপাব। এই জাতীয অসুখে...'

ডাক্তারের কথার মাঝখানেই কঠিন স্বরে ক্রিস বলল, 'বেগান অশ্লীল কথা বলেছে... এসব আপনি বলছেন কেন ? ও কি আপনাকে কিছু বলেছে ?'

ডাক্তার আমতা-আমতা কবতে লাগলেন।

'বলুন, ও কী বলেছে ?'

'হ্যাঁ, তা বলেছে... তবে এই জাতীয অসুখে...'

'ও কী বলেছে তা আমি জানতে চাই, ডাঃ ক্লীন।'

'কী বলেছে সেটা মোটেই জরুবি নয, মিসেস ম্যাকনীল।'

'আমাব কাছে জরুবি। আপনি বলুন।'

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি যখন ওকে পবীক্ষা করছিলাম, তখন হঠাৎ ও বলল, আমি যেন পবীক্ষা কবার ছলে ওর পেন্টির ভেতব হাত ঢোকাবার চেষ্টা না করি।'

'হায়, ঈশ্বর! এসব কী বলছেন আপনি!'

'সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা কবাব কিছু নেই। দুসপ্তাহ পব আবাব ওকে দেখব।'

'ঠিক আছে।'

'আমি তাহলে লিখে রাখছি ২৬ তারিখ বিকেল তিনটা।'

বাড়ি ফেরার পথে রেগান জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তার তোমাকে কী বলেছে, মা?'

'বলেছে, তুমি খুব নার্ভাস।'

'আর কিছু না ?'

'না।'

'তুমি কি তাকে কিছু বলেছ ?'

'না তো! আমি কিছুই বলি নি!'

মানসিক স্থবিরতা কাটানোর জন্যেই ক্রিস ছোটখাটো একটা পার্টির ব্যবস্থা করল। কিছু অন্তরঙ্গ লোকজন এসে হৈচৈ করলে মন ভালো থাকবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই পার্টি নিযেও যথেষ্ট দুশ্চিন্তা হচ্ছিল ওর। সব ঠিকমতো হবে তো? নিমন্ত্রিত লোকজন আসবে তো সবাই? এছাড়া টাকাপয়সা নিযেও ইদানীং বেশ চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে। গত বছর ও উপার্জন করেছে মোট চার লক্ষ ডলার। ক্রিসেব ম্যানেজারেব ধারণা, এই টাকা যথেষ্ট নয়। এ বছর আরো বেশি রোজগার হওয়া দরকার। ক্রিস যদিও সবকিছু নিয়ে বেশ কিছুটা অন্যমনস্ক তবু খুব লক্ষ বাখল যাতে রেগান তার ওষুধ ঠিকমতো খায়।

রেগানের অবশ্যি তেমন কোনো উন্নতি দেখা গেল না। বরং ক্রিসের মনে হল, অবস্থা আগের চেয়েও খানিকটা খারাপ হয়েছে। 'বিছানা কাঁপছে' জাতীয় কথাবার্তা এখন বলছে না, কিন্তু নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে আরেকটা। প্রায়ই বলেছে, ওর ঘরে নাকি কেমন বাজে একটা গন্ধ পাওয়া যায়। রেগানের পীড়াপীড়িতে ক্রিস একদিন ওর ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ থাকল। কোনো গন্ধ পাওয়া গেল না। রেগান অবাক হয়ে বলল, 'সত্যি কোনো গন্ধ পাচ্ছ না?'

'না তো!'

'বল কী, মা! আমি তো পাচ্ছি!'

'কী রকম গন্ধ, রেগান?'

'কাপড় পোড়ালে যে গন্ধ হয় সেই গন্ধ।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কেন গন্ধটা পাচ্ছ না?'

'হ্যাঁ, মানে, তা খানিকটা যেন পাচ্ছি।'

আসলে ক্রিসের নাকে কোনো গন্ধ আসছিল না। রেগানের মন রাখতে ওইটুকু মিথ্যে বলল। ও ঠিক করেছে, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত রেগান যা বলবে তাতেই সায় দিয়ে যাবে।

ডিনার পার্টির আগের রাতে ক্রিস কেমন এক চাপা অস্বস্তিতে ভুগতে লাগল। হাওয়া যেন হঠাৎ ভারি হয়ে উঠেছে। যেন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এ বাড়িতে।

মাঝরাতের দিকে আবার রেগানের ঘর থেকে শব্দ আসতে লাগল। বন্ধ জানালাটা কোনো কারণে কি হঠাৎ খুলে গেছে? হাওয়া কাঁপছে? ক্রিস গায়ে রোব জড়িয়ে রেগানের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। ওর কেন যেন মনে হল, দরজা খোলামাত্র দেখবে অচেনা কোনো এক লোক রেগানের বিছানায় বসে আছে। ক্রিসের দরজা খুলতে রীতিমতো হাত কাঁপল। রেগান হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। জানালাটা বন্ধ। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ক্রিস। কেমন শীত করতে লাগল ওর। রেগানের ঘরটা এত ঠাণ্ডা কেন? হিটার চালু আছে। তারপরেও এত ঠাণ্ডা!

৪

অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে ক্রিস দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, তার গায়ে হাল্কা সবুজ রঙের একটা স্কার্ট। নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। প্রথমে এলেন প্রতিবেশী মেরি জো পেরিন, সঙ্গে তাঁর তের বছরের ছেলে রবার্ট। আর সবার শেষে এলেন ফাদার ডাইয়ার। ছোটখাটো মানুষ। এসেই হাসিমুখে বললেন, 'আমি আমার নেকটাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এই জন্যে দেরি হল।'

ফাদার ডাইয়ারের কথার ভঙ্গিতে ক্রিস হো-হো করে হেসে উঠল, ওর মনের উদ্বেগ অনেকখানি কেটে গেল। পার্টি জমে উঠল দেখতে দেখতে। বুফে ডিনার। খাবার নিয়ে সবাই এক এক দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গল্পগুজব জমে উঠছে ক্রমে ক্রমে।

'রান্না চমৎকার হয়েছে, ক্রিস!'

'সত্যি, অপূর্ব।'

'রেঁধেছে কে, উইলি ? বাহ্, ভালো রাঁধুনি পেয়েছ!'

আলোচনা জমেছে মেরি জো-কে ঘিরে। উনি এক জন নামকরা মিডিয়াম। প্রেততত্ত্ব নিয়ে খুব পড়াশোনা করেছেন। বেশ হাসিখুশি মহিলা। ক্রিসের চমৎকার লাগল মহিলাকে। এদিকে ফাদার ডাইয়ার ঘোষণা করেছেন, খানাপিনা শেষ হলে সবাইকে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে শোনাবেন। ক্রিস হঠাৎ খাপছাড়াভাবে ফাদারকে জিজ্ঞেস করল, 'ফাদার, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'কী কথা ?'

'চার্চের পেছনে যে ছোট্ট সাদা রঙের একটা বাড়ি আছে...'

'হলি ট্রিনিটি ?'

'হ্যাঁ, হলি ট্রিনিটি। কী হয ওখানে, ফাদার?'

ফাদার জবাব দেযার আগেই মেরি জো বললেন, 'শুনেছি ওখানে শযতানেব উপাসনা হয়।'

'কীসের উপাসনা ?'

'শয়তানের। ওদের ব্ল্যাক মাস বলে সবাই।'

'সত্যি বলছেন ?'

'সত্যি-মিথ্যে আমি জানি না, ক্রিস। সত্যি হতেও পাবে।' মিসেস জো বললেন, 'তবে ফাদাব ভালো বলতে পারবেন। কয়েকদিন আগেই নাকি ওখানে ও বকম উপাসনা হযেছে?'

ফাদার ডাইযার বললেন, 'এই আলোচনাটা এখন বন্ধ থাক।'

ক্রিস বলল, 'বন্ধ থাকবে কেন, বলুন না ? আমার জানতে ইচ্ছে কবছে।'

'ওসব অসুস্থ লোকজনের কাণ্ড, মিসেস ম্যাকনীল। না শোনাই ভালো।'

ক্রিস বলল, 'এমন কি গোপন ব্যাপার যে বলতে পাবছেন না ? আমি একজন ফাদাবকে ওই বাড়িতে প্রায়ই যেতে দেখি। বাদামি রং, লম্বা।'

'ও, ফাদার কারাস।'

'কী করেন উনি ?'

'উনি আমাদের একজন উপদেষ্টা। বেচাবা খুব আঘাত পেযেছে।

'কেন, কী হযেছে ?'

' সেদিন তাঁর মা মারা গেছেন হঠাৎ।'

'ও।'

'ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক। ভদ্রমহিলা কখন কীভাবে মারা গেছেন কেউ জানত না। রাতদিন ২৪ ঘণ্টা ঘরে রেডিও বাজছে বলে পাশের অ্যাপার্টমেন্টের কে যেন পুলিশে খবব দিয়েছিল। পুলিশ এসে দেখে এই ব্যাপার।'

ক্রিসের সত্যি সত্যি খারাপ লাগল। নিঃসঙ্গ মৃত্যুর চেযে কষ্টকর কি আর কিছু আছে ?

'এই মার্ক, হিটলারের স্পাই। তোর পাছায় আমি একটা আস্ত বাঁশ...'

ক্রিসের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। বার্ক ডেনিংস এসে গেছে। বদ্ধ মাতাল। তেড়িয়া মূর্তি ধরে হলঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে। কার্ল আর শ্যারন তাকে সামলাতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। ক্রিস প্রায দৌড়ে ছুটে গেল। বার্কের মুখে খিস্তি-খেউড়ের বান ডেকেছে।

'এসব কী হচ্ছে, বার্ক ?'

বার্ক হাসিমুখে বলল, 'কিছুই না।'

'এ রকম অসভ্য কথাবার্তা কী করে বল তুমি ?'

'হা-হা-হা, সাহস করে বলে ফেলি।'

'বার্ক, তুমি তো মনে হচ্ছে বদ্ধ মাতাল।'

'আমি খুব ক্ষুধার্ত ক্রিস।'

ক্রিস শান্ত স্বরে বলল, 'লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার। এখানে দুজন ফাদার এসেছেন।'

'বাবাজীরাও এসেছেন তাহলে ?'

'দয়া করে ভদ্র ব্যবহার কর। প্লিজ। শ্যাবন তোমাকে খাবার দিচ্ছে; রান্নাঘরে বসে খাও। আমি রেগানকে শুইয়ে দিয়ে এসে তোমার খোঁজ নেব।'

রেগান আজ সারাদিন নিচের তলার ঘরে একা একা খেলেছে। হৈচৈ চেঁচামেচি কিছুই করে নি। ক্রিস গিয়ে দেখল, একটা চেয়ারে মাথা নিচু করে রেগান চুপচাপ বসে আছে। চোখ-মুখ কেমন যেন অন্যবকম। ওর এমন গুমোট ভাবটা দূর করবার জন্যেই ক্রিস তাকে বসার ঘরে নিয়ে এল। অতিথিদেব একজন অবাক হয়ে বললেন, 'বাহ্, কী মিষ্টি মেয়ে!'

রেগান সবাব সঙ্গে কল্পনাতীত ভালো ব্যবহাব করল। শুধু মিসেস জোর সামনে এসে কাঠেব পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। মেবি জো হাত বাড়ালেন, কিন্তু কেমন সরু চোখে তাকিয়ে বইল বেগান, নিজে হাত বাড়াল না।

মেবি জো হাসতে হাসতে বললেন, 'খুব সম্ভব আপনাব মেয়ে টেব পেয়ে গেছে, আমি এক জন ভণ্ড মিডিয়াম।' হাসিমুখে এই কথা বলে মিসেস জো নিজেই এগিয়ে এসে বেগানের হাত ধবলেন। ক্রিস লক্ষ করল, হাতটা ধরেই কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন মেবি জো। বেগানকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। যেন কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করছেন। ক্রিস ক্ষমা চাওযাব ভঙ্গিতে বলল, 'ওর শবীবটা ভালো নেই।'

'হ্যাঁ, যান — ওকে শুইয়ে দিন।'

বেগানকে নিয়ে ক্রিস দোতলায় উঠে গেল। মিসেস জো অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে বইলেন রেগানের দিকে। তাঁব চোখে-মুখে কেমন এক আশঙ্কাব ছাযা ফুটে উঠেছে, ভুরু কুঁচকে আছে।

ক্রিস বেগানকে বিছানায শুযে গাযে চাদব টেনে দিল. .কোমল স্বরে বলল, 'ঘুমাতে পাববে তো, মামণি?'

দেযালেব দিকে তাকিয়ে বেগান শান্ত স্ববে বলল, 'ঘুম? আমি জানি না, মা। ইদানীং আমাব ঘুম আসে না।'

বেগানেব মাথায চুমু খেযে ক্রিস বলল, 'ঘুমাও, মামণি।'

ক্রিস ঘবের আলো নিভিযে দিল। এখন শুধু জিরো পাওযারের একটি নীল আলো জ্বলছে। রেগান মুহূর্তের মধ্যেই কেমন নিঃসাড় হযে গেল। ক্রিস ভাবল, হয়তো ঘুমিযে পড়েছে। কিন্তু নিঃশব্দে ঘব থেকে যখন ও বেরিয়েছে ঠিক তখনই রেগান ফিসফিস করে বলল, 'আমাব কী হযেছে মা?'

ক্রিস কযেক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না। কী গাঢ় বিষাদ বেগানেব কণ্ঠস্বরে! কী শূন্যতা! অনেক সময লাগল ক্রিসের নিজেকে সামলাতে। এক সময থেমে থেমে বলল, 'কিছু হয নি। নার্ভের অসুখ। সেবে যাবে মামণি। এই তো, অনেকখানি সেবেছে।'

বেগান জবাব দিল না। ক্রিস ডাকল, 'মা, মামণি!'

কোনো জবাব নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে রেগান। ক্রিস হঠাৎ খেয়াল কবল, ঘরটি ভীষণ ঠাণ্ডা। হিটিং কাজ করছে না তাহলে?

'মামণি, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না তো ?'

কোনো জবাব নেই। রেগান গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। নিচে হলঘরে তখন খুব ফুর্তির ব্যাপার হচ্ছে। ফাদার ডাইয়ার মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গান ধরেছেন,

"আবার যখন দেখা দুজনাতে
দেখা হবে দুজনাতে, দেখা হবে..."

ক্রিস ফাদার ডাইয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সিনেটর আর তাঁর বউ পথরোধ করে দাঁড়ালেন । তাঁদের এখন যেতে হচ্ছে।

'এত সকাল সকাল যাবেন ?'

'খুব দুঃখিত, ক্রিস। যেতেই হচ্ছে, মার্থার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

ক্রিস দরজা পর্যন্ত তাঁদের এগিয়ে দিতে গেল। সেখান থেকেই দেখতে পেল, কার্ল আর শ্যারন ঠেলাঠেলি করে বার্ককে ট্যাক্সিতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করছে। বার্ক হাত-পা ছুড়ে সমানে চেঁচাচ্ছে। কার্ল ধাক্কা দিয়ে তাকে ট্যাক্সির মধ্যে ধপাস করে ফেলে দিতেই সে গলা বের করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল, 'শালা, তোর মাকে আমি...'

ক্রিস দ্রুত ঘরে চলে এল। ফাদার ডাইয়ার ওকে দেখে হাসিমুখে বললেন, 'তোমাব জন্যে কী গান গাইব, ক্রিস? আমি এখন শুরু করেছি অনুরোধের আসর।'

ক্রিস হাসতে হাসতে বলল, 'শয়তানের উপাসনা নিযে কোনো গান যদি আপনার জানা থাকে তাহলে গাইতে পারেন।'

ফাদার একটু অবাক হয়েই বললেন, 'এইসব নিয়ে হঠাৎ তুমি মাথা খারাপ কবছ কেন, বল তো ?'

'কে যেন বলছিল অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস পাওযা গেছে ওই হলি ট্রিনিটিতে।'

'অদ্ভুত, না নোংরা ? নোংরা সব জিনিসপত্র।'

ক্রিস বলল, 'এই নোংরা জিনিসপত্র দিযে কী হয় ওখানে, ফাদাব ?'

'আমি ঠিক জানি না। ফাদার কারাস জানেন কিছু কিছু।'

'ফাদার কারাস ? যার মা মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'উনি জানেন ?'

'জানেন। উনি কিছুদিন আগে সাইকোলজিস্টদের এক সেমিনাবে এ বিষয়ে একটা পেপার পড়েছিলেন।'

'উনি কি সাইকোলজিস্ট ?'

'হ্যাঁ।'

'শযতানের উপাসনাটা কি রকম, ফাদার ?'

ফাদার ডাইয়ার কিছু বলার আগেই মিসেস জো বললেন, 'ক্রিস, দেখুন কে এসেছে!'

ক্রিস তাকিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কেমন ঘোর-লাগা অবস্থায রেগান দাঁড়িযে আছে। গায়ের পাতলা নাইট গাউন ভেজা। কার্পেটের অনেকটাও ভিজে আছে। ক্রিসের মুখে রক্ত উঠে গেল। রেগান কি এইখানে এসে প্রস্রাব করল ? হা ঈশ্বর। কী হচ্ছে এসব!

ক্রিস দৌড়ে গিযে জড়িয়ে ধরল মেয়েকে। 'কী হয়েছে, মামণি তোমার? আস, আমার সঙ্গে আস।'

অতিথিদের কারো মুখেই কথা নেই।

ক্রিস ধরা গলায় বলল, 'আমার মেয়েটি অসুস্থ, দয়া কবে কিছু মনে কববেন না।'

রেগান হঠাৎ এক জনকে লক্ষ করে তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি মরবে, তুমি মাবা যাবে আকাশে!'

যাকে বলা হল তিনি অ্যাপোলো মিশনের একজন নভোচারী। খুব শিগ্‌গিরই তিনি একটা মিশনে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। ক্রিস মেয়েকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এই কথা তুমি কেন বললে, রেগান? কেন এই কথা বললে?'

উত্তরে রেগান বিড়বিড় করে কী যেন বলল। তারপর মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়ছে। ক্রিস তাকে নিয়ে উপরে উঠে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল রেগানের ঘরে। তারপর এক সময় নিচে ফিরে এসে দেখে, অনেকেই বিদায় না জানিয়েই চলে গেছে। যারা আছে তারা ক্রিসকে সমবেদনা জানাতে রয়ে গেছে। রেগান যে এমন অসুস্থ তা তারা জানত না।

'রেগানের কি ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস আছে, মিসেস ম্যাকনীল?'

'না, কখনোই না। আজই প্রথম দেখলাম।'

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ বয়সটায় এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়।'

মিসেস জো কিন্তু কোনো কথা বললেন না। তিনি ফায়ারপ্লেসের সামনে চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁব ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন আগুনেব মধ্যে কোনো এক অলৌকিক দৃশ্য দেখছেন।

নভোচাবী ভদ্রলোক এক সময় বিদায় নিলেন। তাঁকে যেতে দেখে অনেকেই উঠে দাঁড়ালেন যাওযার জন্যে। পার্টিব সুব কোথায যেন কেটে গেছে। সবার মুখ গম্ভীব। একমাত্র হাসিমুখ ফাদাব ডাইযারের। তিনি বিদায নেযার আগে বহস্যময ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনার কোনো ছবিতে যদি এমন কোনো পাদ্রীর দবকাব হয় যে খুব খাট আর পিযানো বাজাতে পারে, তাহলে দয়া করে কিন্তু আমাকে জানাবেন!'

সবাব শেষে উঠলেন মেরি জো পেরিন। ক্রিসের মনে হল তিনি যেন কি একটা বলতে চান। কিন্তু বলতে ইতস্তত কবছেন খুব। ক্রিস এক সময় বলল, 'রেগান যে প্রাযই প্ল্যানচেট নিযে মেতে থাকে ওতে কি কোনো ক্ষতি হতে পাবে ওর?'

মিসেস মেবি দৃঢ় স্ববে বললেন, 'রেগানেব কাছ থেকে ওইজা বোর্ডটা অবশ্যই নিযে নেবেন।' ছেলেকে গাড়ির চাবি দিযে মিসেস জো গাড়ি স্টার্ট দিতে বললেন। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। গাড়ি স্টার্ট দিযে গবম করা প্রযোজন। চাবি নিযে ছেলেটা চলে যেতেই মেবি জো বললেন, 'ক্রিস, আমাব সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন জানি না। তবে অনেকেই মনে কবে আমাব কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে। কথাটা হযতো সত্যি। আমাব মনে হয, মাঝে-মাঝে আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি। আমি কখনো পরকাল নিয়ে চর্চা করি না। ওটা খুব বিপজ্জনক। প্ল্যানচেটও কিন্তু এক ধরনের পরকাল বিষযক সাধনা।'

ক্রিস সহজ স্ববে বলল, 'মিসেস জো, প্ল্যানচেট একটা ছেলেমানুষি খেলা। মানুষের অবচেতন মনের কাণ্ডকাবখানা।'

'হয়তো তাই, মিসেস ম্যাকনীল। পরকালের সব চর্চাই হযতো আসলে অবচেতন মনেবই একটা কিছু, তবু কিছু একটা হয — কিছু একটা আছে এর মধ্যে। হযতো এই খেলা থেকেই অবচেতন মনের একটা নিষিদ্ধ দরজা খুলে যায। অনেক অদ্ভুত ব্যাপাব হয তখন।'

'আপনি আমাকে ভয পাইযে দিচ্ছেন।'

'ছি ছি, ভয পাবেন কেন ? আমি আজ আসি। খুব চমৎকার পার্টি হযেছে আপনাব। আব বেগান কেমন থাকে জানাবেন।'

ক্রিস ক্লান্ত হযে ঘুমাতে গেল অনেক রাতে। বসার ঘরে কার্ল তখন কার্পেটেব ভেজা জাযগাটা ভিনেগার দিয়ে ঘষছে। উইলি দাঁড়িয়ে আছে পাশে। সে বলল, 'কার্ল, থাক আজকের মতো। রাত হযেছে, চলো ঘুমাতে যাই।'

কার্ল ঘষতেই থাকল।

ক্রিস নাইট গাউন পরে বিছানায় এলিয়ে পড়ার আগে রেগানের ঘরে উঁকি দিল। অকাতরে ঘুমাচ্ছে রেগান। ওইজা বোর্ডটি পাশের টেবিলে পড়ে আছে। ওটা সরিয়ে ফেলা কি উচিত হবে ? মেরি জো পেরিন ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। ক্রিস ইতস্তত করতে লাগল। বোধহয় এখন না নেয়াই উচিত। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। হঠাৎ করে সরিয়ে ফেললে রেগানের মনের ওপর চাপ পড়তে পারে। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ক্রিস নিজের ঘরে ফিরে গেল। ঘুমিয়েও পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ধড়ফড় করে জেগে উঠতে হল পরমুহূর্তেই। পাশের ঘর থেকে আর্তস্বর ভেসে আসছে। অদ্ভুত জান্তব স্বরে রেগান চিৎকার করে চলেছে। ভয়ংকর চিৎকার।

ক্রিস প্রায় অন্ধের মতো ছুটে গেল। রেগানের ঘরে আবছা অন্ধকার। প্রথমে ক্রিস ভালো করে কিছু দেখতেই পেল না।

'কী হয়েছে মামণি? কী হয়েছে ?'

ক্রিস কাছে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখল, উপুড় হয়ে রেগান বিছানায় শুয়ে সমানে কাঁপছে। মাকে দেখে সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বিছানাটা কাঁপছে। থামাও মা, থামাও। প্লিজ।'

রেগানের ছোট্ট বিছানাটা সত্যিই ভয়ংকরভাবে কাঁপছে।

প্রান্ত-স্পর্শ

১

তাঁর কবর হল একটা ঘিঞ্জি গোরস্থানে। সারাটা জীবনই তিনি নিঃসঙ্গ কাটিয়েছেন, মরণের পর তিনি অনেক সঙ্গী সাথী পেলেন। সাবি সারি কবর চারদিকে।

ফাদার ডেমিয়েন আচ্ছন্ন হয়ে আছেন গভীর বিষাদে। সান্ত্বনা জানাতে তাঁর বৃদ্ধ চাচা মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমার মা এখন সুখে আছে, ডেমিয়েন। কবরে শুয়ে থাকার চেয়ে সুখ আর কিছুতে নেই।'

ফাদার ডেমিয়েন কিছু বললেন না, ছোট্ট নিশ্বাস ফেললেন। 'হ্যা, মা হয়তো সুখেই আছে। হে পরম করুণাময় ঈশ্বর, তুমি সুখ দাও এই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাকে। ইহজগতের সমগ্র দুঃখ ও বেদনার উর্ধ্বে যে প্রগাঢ় সুখ, সেই সুখ করুণাধারার মতো নেমে আসুক। দয়া কব, প্রভু দয়া কর।'

ফাদার ডেমিয়েন যখন জর্জটাউনে ফিরে এলেন তখন দুপুর। সারাদিন অভুক্ত, এক গ্লাস পানিও মুখে দেন নি। সন্ধ্যাবেলা অনেকে এসে সমবেদনার কথা বলল। তিনি শুনলেন চুপ করে। শান্ত ভঙ্গিতে সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন। ঘুমাতে গেলেন অনেক রাতে। ঘুম ঠিক এল না। এক ধরনের অবশ আচ্ছন্নতার মধ্যে বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন। যেন তিনি ম্যানহাটানেব এক বহুতল ভবনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। নিচে রাস্তায় অসংখ্য লোকজন যাওয়া–আসা করছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, এক বৃদ্ধা রাস্তার মাঝখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। দিশেহারা ভঙ্গি। হঠাৎ বৃদ্ধা 'ডেমিয়েন' 'ডেমিয়েন' করে ডাকতে শুরু করল। যেন সে কোনো কারণে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। বৃদ্ধা হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। আধো ঘুমের মধ্যেই ফাদার ডেমিয়েন 'মা' 'মা' করে ডাকতে লাগলেন। ঘুম ভেঙে দেখেন, চোখের পানিতে বালিশ ভিজে গেছে।

তিনি বাকি রাত জেগে কাটিয়ে দিলেন। পরদিন সারা সকাল ঘর থেকে বেরোলেন না। যেন তাঁর কিছুই করার নেই, কোথাও যাওয়ার নেই। দুপুরে লাঞ্চ খেতে গিয়েও গলা দিয়ে কিছু নামাতে পারলেন না। সব কিছুই কেমন যেন বিস্বাদ। ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকলেন।

সন্ধ্যার দিকে হলি ট্রিনিটির প্রধান যাজক এলেন ফাদার ডেমিয়েনকে সমবেদনা জানাতে। ভদ্রলোক অত্যন্ত বৃদ্ধ। কিন্তু গলার স্বর যুবকের মতো। 'তোমার মায়ের জন্যে আমি আজ বিশেষ প্রার্থনা করেছি, ডেমিয়েন।'

'ধন্যবাদ, ফাদার। আপনার অসীম করুণা।'

'কত বয়স হয়েছিল তোমার মায়ের ?'

'সত্তর।'

'বেশ বয়স হয়েছিল তাহলে। একটা সমৃদ্ধ জীবন কাটিয়ে গেছেন।'

ফাদার ডেমিয়েন কিছুই বললেন না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। বৃদ্ধ যাজক হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'আমাদের হলি ট্রিনিটিতে গত রাতেও কারা যেন শয়তানের উপাসনা করেছে।'

'অ্যাঁ।'

'হ্যাঁ, মা মেরিকে একটা বেশ্যার মতো করে এঁকে তারপর উপাসনা করা হয়েছে। লাতিন ভাষায় লেখা টাইপ করা একটা কাগজ পাওয়া গেছে।'

'কী লেখা ?'

'দারুণ অশ্লীল কথাবার্তা। মা মেরির সঙ্গে মেরি মাগদালেনের সমকামী সম্পর্ক নিয়ে যাচ্ছেতাই বর্ণনা...'

'তাই ?'

'হ্যাঁ। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জান ডেমিয়েন, লেখাটি চমৎকার, নিখুঁত লাতিনে লেখা। আমার পড়ে মনে হল, যারা এসব করছে তাদের মধ্যে এক জন নিশ্চয়ই পাদ্রী। সে অত্যন্ত জ্ঞানীও। এত চমৎকার লাতিন যে কেউ লিখতে পারে না। মনে হয় মানসিকভাবে অসুস্থ কোনো পাদ্রী আছে এই দলে। তোমার কী মনে হয়, ডেমিয়েন?'

'বিচিত্র নয়। থাকতেও পারে। মানসিক ভারসাম্যহীন অনেকেই আছে আমাদের চারপাশে, তারা সুস্থ মানুষের মতোই ঘুরে বেড়ায়।'

'ডেমিয়েন ?'

'বলুন।'

'তোমার কি সন্দেহ হয় কাউকে ?'

ফাদার ডেমিয়েন অবাক হয়ে বললেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, কারণ তুমি এক জন সাইকোলজিস্ট। অসুস্থ কোনো পাদ্রী যদি থাকে, তাহলে তুমি সহজেই তাকে ধরতে পারবে। এখানে যারা আছে তাদের সবাইকে তো তুমি চেন। তাছাড়া অনেকেই তোমার কাছে আসে।'

ফাদার ডেমিয়েন খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'মনের একটা বিশেষ অবস্থায় এ ধরনের জিনিস করা যায়, তাকে বলে 'সমনামবুলিজম' — স্বপ্নচারিতা। এটা ধরা খুব মুশকিল। যারা এর রোগী তারা নিজেরাও জানে না কী করছে।'

'হুঁ। আচ্ছা ডেমিয়েন, তুমি লাতিন কেমন জান ?'

ফাদার ডেমিয়েন শান্ত স্বরে বললেন, 'লাতিন আমি বেশ ভালো জানি।'

এর দুদিন পর ফাদার ডেমিয়েন কারাসকে উপাসনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হল। তাঁকে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলে সাইকোলজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে বলা হল। এই দায়িত্ব পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বলা হল, ফাদার ডেমিয়েনের কিছুদিন 'বিশ্রাম' নেয়া প্রয়োজন।

২

রেগান ডাঃ ক্লীনের চেম্বারে একটা বড় বিছানায় শুয়ে আছে। ওর একটি পা দুহাতে ধরে বাঁকিয়ে ফেললেন ডাঃ ক্লীন। ধরে রাখলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর ছেড়ে দিলেন। সহজভাবেই পা ফিরে গেল আগের অবস্থায়।

পরীক্ষাটি বেশ কয়েকবার বিভিন্নভাবে করা হল। ফল একই। ডাঃ ক্লীনকে মনে হল তিনি ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। হঠাৎ এক সময় উঠে বসে রেগান একদলা থুতু ছিটিয়ে দিল ডাক্তারের মুখে। এক জন নার্সকে ডেকে এনে রেগানের পাশে থাকতে বলে ডাক্তার ক্রিসের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন।

'মিসেস ম্যাকনীল, বিছানাটা কি সত্যি সত্যি নড়ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ ধরে ?'

'ঠিক জানি না। দশ থেকে পনের সেকেন্ড হযতো।'

'কখন থামল ?'

'এক সময় রেগান হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। তারপর বিছানা ভিজিয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ল। বিছানা কাঁপাও বন্ধ হল সঙ্গে সঙ্গে।'

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ?'

'সমস্ত রাত, পরের দিন দুপুর পর্যন্ত।'

ডাক্তার চিন্তিত মুখে ভ্রূ কুঁচকাল।

'কী হয়েছে ওর, ডাক্তার ?'

'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বিছানা কাঁপার ব্যাপারটি হচ্ছে ক্রনিক কন্ট্র্যাকশনের জন্যে। শরীরের পেশী যদি কিছুক্ষণ পরপর শক্ত ও নরম হতে থাকে তাহলে এ রকম হয়। মস্তিষ্কে যদি কোনো প্রদাহ হয় তখনো এটা হতে পারে।'

'তাহলে আপনি বলছেন ওই সময় রেগানের মাংসপেশীতে...'

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না। পরীক্ষা করে তেমন কিছু পাওয়া গেল না। আচ্ছা, রেগান কি কখনো মাথায় আঘাত পেয়েছিল ?'

'না। আমার তো মনে পড়ে না।'

'অল্প বয়সে কোনো বড় অসুখ বিসুখ হয়েছিল?'

'বাচ্চাদের যেসব অসুখ হয় ওইসব হয়েছিল — মামস, চিকেন পক্স এই সব।'

'ঘুমের মধ্যে হাঁটার ঘটনা কখনো লক্ষ করেছেন?'

'না, কখনোই না। ওই পার্টির দিনই প্রথম দেখলাম।'

'মিসেস ম্যাকনীল, আপনি কী করে বুঝলেন যে পার্টির দিন ও ঘুমের মধ্যে হাঁটছিল?'

'কারণ, পরদিন আর ওর কিছু মনে ছিল না। ও যে পার্টিতে গিয়ে একা একা হাজির হয়েছিল এই কথাটাই মনে করতে পারল না।'

'এরকম আরো কিছু লক্ষ করেছেন ?'

ক্রিস জবাব দিতে কিছুটা সময় নিল। যেন বলার ইচ্ছা নেই, তবু বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। 'ওর বাবা ওকে টেলিফোন করেছিল। সেটা ওর একেবারেই মনে নেই।'

'কবে হয়েছে ঘটনাটা ?'

'ওর জন্মদিনে।'

'কী কথাবার্তা হয়েছে ?'

ক্রিস অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'রেগান ওর বাবাকে অত্যন্ত কুৎসিত একটা কথা বলে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে।'

'কী কথা ?'

'সেটা আমি বলতে চাই না। প্লিজ, ডাক্তার।'

ডাক্তার ক্লীন এবার চিন্তিত মুখে বললেন, 'তাহলে ও যে বলছে কারা যেন ওর ঘরের আসবাবপত্র নাড়াচাড়া করে, তা সত্যি ?'

'কী বলছেন, ডাক্তার ? আসবাবপত্র ও নিজেই রাত্রিবেলা নাড়ায়, কিন্তু পরে আর তা মনে থাকে না। মেডিক্যাল সায়ান্সে একে বলে অটোমেটিজম। ঘোর-পাওয়া একটা অবস্থা। রোগী বুঝতে পারে না সে কী করছে, পরে তার মনেও থাকে না।'

'আমার মনে হয়, আপনার কথাটা ঠিক নয়। রেগানের ঘরে কাঠের যে আলমারিটা আছে তার ওজন কম হলেও এক টন। ওটা ও নাড়াবে কী করে ?'

'ঘোর-পাওয়া রোগীর মধ্যে প্রচণ্ড শারীরিক ক্ষমতা দেখা যায়। আর কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা লক্ষ করেছেন ?'

'গতকাল সকালে রেগান ওর ঘরে বসে ক্যাপ্টেন হাউডির সঙ্গে কথা বলছিল।'

'কী নাম বললেন ?'

'ক্যাপ্টেন হাউডি। প্ল্যানচেটে যে প্রেতাত্মাটি আসে বলে ওর ধারণা।'

ডাঃ ক্লীন মাথা নাড়লেন। তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল।

'ও কি এখন কোনো গন্ধ পায় ?'

'ও তো সারাক্ষণই ঘরে একটা খারাপ গন্ধ পায়।'

'যেন কোনো কিছু পুড়ছে। পোড়া গন্ধ ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন ?'

'মিসেস ম্যাকনীল, এইসব লক্ষণ এক ধরনের অসুখের। একে বলে মস্তিষ্কের কেমিকোইলেকট্রিক্যাল অ্যাকটিভিটির বিশৃঙ্খলা। মস্তিষ্কের ভেতরকার টেম্পোরাল লোবের প্রদাহ থেকে এটা হয়। আমি আপনার মেয়ের ই. ই. জি. নেব।'

'কী নিবেন ?'

'ইলেকট্রন এনসিফ্যালোগ্রাফ। মস্তিষ্ক তরঙ্গের প্যাটার্ন পরীক্ষা।'

'পরীক্ষাটা কি এখনই করতে চান ?'

'হ্যাঁ, ঘুমের ওষুধ দিয়ে পরীক্ষাটি চালাতে হবে। নড়াচড়া করলে কিছু বোঝা যাবে না। ওকে আমি পঁচিশ মিলিগ্রাম লিব্রিযাম দিতে চাই।'

ক্রিস শুধু ঢোঁক গিলল কয়েকবার। ওর গলা-বুক শুকিয়ে এসেছে।

ক্রিসকে নিয়ে ডাক্তার রেগানের ঘরে ঢুকলেন। হাতে সিরিঞ্জ। রেগান তাকাল রাগী চোখে। ফিসফিস করে বলল, 'এই ডাক্তার' এই কুত্তা! এই শুয়োরের বাচ্চা'!'

ক্রিস অসহায়ভাবে শুধু ছি ছি করে উঠতে পারল। ওর একদম স্বর ফুটছিল না।

ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। বলে গেলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবেন। নার্স ঘরে ই. ই. জি-র যন্ত্রপাতি আনতে শুরু করল। ডাক্তার যখন ফিরলেন তখনো লিব্রিয়ামের কোনো প্রভাব পড়ে নি রেগানের ওপর। বেশ অবাক হয়ে গেলেন তিনি।

'পঁচিশ মিলিগ্রাম লিব্রিয়ামেও কিছু হয় নি!'

আরো পঁচিশ মিলিগ্রাম দেয়া হল রেগানকে।

ডাক্তার ক্লীন ই. ই. জি-র পদ্ধতি ব্যাখ্যা করলেন, 'আমরা মস্তিষ্কের বাঁ ও ডান দুদিকের তরঙ্গই মিলিয়ে দেখব — কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য আছে কিনা। কারণ এমন অসামঞ্জস্য থাকলেই দেখা যায় রোগী এমন অনেক কিছুই শোনে বা দেখে — যার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই।'

পরীক্ষায় কিছুই পাওয়া গেল না। ডাঃ ক্লীন আরো অবাক হলেন। তরঙ্গগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণই আছে।

ডাঃ ক্লীন দীর্ঘ সময় নিঃশব্দে বসে রইলেন। ক্রিস জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখলেন ডাক্তার?'

'ই. ই. জি-তে কিছু পাওয়া যায় নি। অবশ্য এ থেকে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলাটা ঠিক হবে না। অনেক সময়...'

'ওর অসুখটা তাহলে কী ?'

'এটাকে কোনো অসুখ বলা ঠিক হবে না।'

'তাহলে?'

'রেগানের আসলে এপিলেন্সি — মৃগীরোগ হয়েছে।'

'হায় ঈশ্বর! আপনি এসব কী বলছেন ?'

'মিসেস ম্যাকনীল, অনেকের মতো দেখছি আপনারও রোগটা সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে। এটা এমন কোনো ভয়ংকর রোগ নয়। মূর্ছা যাওয়ার প্রবণতা সব মানুষের মধ্যেই আছে। আবার এর প্রতিরোধের ক্ষমতাও মানুষের জন্মসূত্রেই পাওয়া। কারো কারো ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ক্ষমতাটি কম। এটা কোনো অসুখ নয়।'

'চিকিৎসা নেই এর ?'

'আছে, নিশ্চয়ই আছে। অনেক ধরনের এপিলেন্সি আছে। ধরুন আমার কথা শুনতে শুনতে মুহূর্তের জন্যে আপনি অন্য রকম হয়ে গেলেন। আমি কী বললাম তার কিছুই শুনতে পেলেন না। এটাও এক ধরনের এপিলেন্সি।'

'আগে তো রেগানের এসব ছিল না!'

'এখন হয়েছে। এটা হতে পারে অনেক কিছু থেকেই; চিন্তা, মানসিক আঘাত, ক্লান্তি, ভয় এসব থেকে এপিলেন্সি শুরু হতে পারে। এরকম নজিরও আছে যে, কোনো বিশেষ ধরনের শব্দ শুনেই রোগী মূর্ছা গেছে।'

'কিন্তু তাই বলে রেগান এরকম বদলে যাবে কেন ?'

'চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলে যাওয়ার বিষয়টি খুবই সাধারণ। এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। দুতিনশ বছর আগে কারো যদি এ রকম অবস্থা হত তাহলে সবাই ভাবত রেগানকে বোধ হয় ভূতে পেয়েছে। তখন ওঝা ডেকে আনত।'

ক্রিস অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'আমি এসব আর শুনতে চাই না, ডাক্তার।'

'এখনই এতটা ভেঙে পড়বেন না, মিসেস ম্যাকনীল। ওকে আমরা এক্স-রে করে দেখব। তারপর আমার পরিচিত এক জন নিউরোসার্জন আছেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব। দেখবেন সব ঠিক করে ফেলব।'

'কখন করবেন এক্স-রে?'

'এখনই করতে চাই — যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।'

'যা ভালো মনে হয় করুন। প্লিজ, ডাক্তার, মেয়েটাকে সুস্থ করে দিন।'

ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন ক্রিস সন্ধ্যার দিকে ঘরে ফিরল। এক্স-রে রিপোর্ট পাওয়া যাবে দুদিন পর। লিব্রিয়ামের প্রভাবে রেগান আচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়েছে। ওকে বিছানায় শুইয়ে ক্রিস এল রান্নাঘরে। শ্যারন বলল, 'কফি দেব?'

'দাও।'

'মনে হচ্ছে একটা ধকলের দিন গেছে আজ?'

'হ্যাঁ। কেউ খোঁজ করেছিল?'

'তোমার এজেন্ট ফোন করেছিল। ছবি পরিচালনার ব্যাপারে তুমি এখনো কিছু বলছ না দেখে সে খুব চিন্তিত।'

ক্রিস গোপনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। কিছুই ভালো লাগছে না ওর।

শ্যারন বলল, 'মিসেস মেরি জো পেরিন রেগানের খোঁজ নিতে এসেছিলেন। একটা বই দিয়ে গেলেন — একটা চিঠিও'

ক্রিস উল্টেপাল্টে দেখল বইটা। বেশ মোটা বই। নামটা ক্রিসকে কৌতূহলী করে তুলল, 'প্রেত-পূজা ও প্রসঙ্গ কথা'। চিঠিতে মেরি জো লিখেছেন —

প্রিয় ক্রিস,

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে হঠাৎ গিয়েছিলাম, সেখানে বইটা পেয়ে নিয়ে এলাম আপনার জন্যে। শয়তানের উপাসনা সম্পর্কে বইটিতে কয়েকটা অধ্যায় আছে। আপনি কিন্তু পুরো বইটাই পড়বেন; হয়তো অন্যান্য অংশও আপনার কাছে আকর্ষণীয় লাগবে। শিগ্‌গিরই দেখা হবে।

মেরি জো

ক্রিস বইটা শ্যারনের দিকে এগিয়ে দিল। বলল, 'পড়ে শোনাও তো দেখি ব্যাপারটা কি?'

'রাতে দুঃস্বপ্ন দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছে নাকি?'

শ্যারন টেবিলের ওপর থেকে বইটা তুলেও দেখল না। চলে যাওয়ার সময়ও সঙ্গে নিতে ভুলে গেল। আসলে আজ রাতে বইটা পড়ে কাল সকালে ক্রিসকে শোনাবে এটাই ছিল শ্যারনের ইচ্ছা। টেবিলে বইটা পড়ে থাকতে দেখে ক্রিস নিজেই পড়বে বলে ভাবল, কিন্তু না — খুব অবসন্ন বোধ করছে ও। ওপরে গিয়ে রেগানকে দেখে এল, অঘোরে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। কিছুক্ষণ টিভি দেখল চুপচাপ, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে কিন্তু প্রেত-উপাসনা সংক্রান্ত বইটা আর দেখা গেল না। কখন সেটা অদৃশ্য হয়েছে কেউ লক্ষ করে নি।

৩

এক্স-রে প্লেটগুলো সারি করে সাজানো। ডাঃ ক্লীন ও নিওরোলজিস্ট দুজনেই গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছেন প্লেটগুলো। তাঁদের লক্ষ্য এমন কিছু দেখা যায় কিনা যার দ্বারা মনে হতে পারে 'পিনিয়াল গ্ল্যান্ড' নড়ে গেছে। তেমন কিছু অবশ্য দেখা গেল না। কোথাও এমন

কোনো ইঙ্গিত নেই যা থেকে বোঝা যেতে পারে রেগানের মস্তিষ্কে কোনো রকম চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

না, কোনো কিছু নেই। সব স্বাভাবিক। নিওরোলজিস্ট এক সময় চশমা খুলে পকেটে রেখে শান্ত স্বরে বললেন, 'ডাঃ ক্লীন, আমি তো কিছুই দেখলাম না!'

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন ডাঃ ক্লীন।

'কিছু একটা তো দেখতে পাওয়া উচিত!'

'আরেক দফা এক্স–রে নেয়ার কি কোনো দরকার আছে?'

'উহুঁ। তার চেয়ে বরং একটা এল. পি. করা যাক।'

'হ্যাঁ, সেটা করা যেতে পারে।'

নিউরোলজিস্ট হঠাৎ বললেন, 'মেয়েটাকে আমি একবার দেখতে চাই।'

'নিশ্চযই নিশ্চয়ই। আজ কি আপনার সময় আছেন?'

'না আজ একটু...'

নিউরোলজিস্টের কথা শেষ হওয়ার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল।

'ডাঃ ক্লীন?'

'হ্যাঁ, কী ব্যাপার?'

'মিসেস ম্যাকনীল আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। খুব নাকি জরুবি।'

'কোন্ লাইনে আছে?'

'বার নম্বরে।'

'ঠিক আছে।'

ডাঃ ক্লীন বোতাম টিপলেন, 'মিসেস ম্যাকনীল, আমি ক্লীন বলছি। কী ব্যাপার?'

'ডাঃ, আপনি কি এই মুহূর্তে একবার আসতে পারেন?' ক্রিসের কণ্ঠস্বর খুব উত্তেজিত শোনাচ্ছে। গলার স্বর কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে।

'কী হয়েছে?'

'হায় ঈশ্বর — আপনি এখনই চলে আসুন। রেগান যেন কেমন করছে!'

'রেগান?'

'হ্যাঁ, আমি বলতে পারছি না। আপনাকে আসতে হবে। এখনই আসতে হবে। প্লিজ, ডাক্তার, প্লিজ।'

ডাঃ ক্লীন ও নিউরোলজিস্ট দুজনেই চার–পাঁচ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হলেন। শ্যারন দরজা খুলে দিল। রেগানের ঘর থেকে তখন এক ধরনের বীভৎস আওযাজ আসছে। অনেকটা যন্ত্রণাকাতর পশুর আর্তনাদের মতো। শ্যারনের মুখ কাগজের মতো সাদা। সে ঠিকমতো কথাও বলতে পারছে না।

'আমি...আমি...শ্যারন স্পেনসার। ক্রিস ওপরে আছে। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।'

রেগানের ঘরের দরজার কাছে আসতেই ক্রিস বেরিয়ে এল। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের চেহারা। চোখে–মুখে দিশেহারা ভাব।

'ডাঃ ক্লীন, আসুন — নিজের চোখে দেখুন।' বলতে বলতে ক্রিস কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ডাঃ ক্লীন ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন একটা ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন।

রেগান তার বিছানা থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে, আবার নেমে আসছে। একবার দুবার নয়, বার বার। কেউ যেন ওকে দুহাতে সজোরে ধরে ওপরে তুলছে, আবার ছুড়ে ফেলে

দিচ্ছে নিচে। আর্তস্বরে কাকুতি-মিনতি করছে রেগান, 'ও আমাকে মেরে ফেলবে! ওকে থামাও! ওকে থামাও! মা, প্লিজ, ওকে থামাও!'

ডাক্তার দুজন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল নিউরোলজিস্টের কপালে। ডঃ ক্লীন বার বার ঢোঁক গিলছেন।

ক্রিস দুহাতে চোখ ঢেকে রুদ্ধস্বরে বলল, 'ডাক্তার, দয়া করে বলুন — এসব কী!'

ক্রিসের কথা শেষ হওয়ামাত্র হঠাৎই যেন অদ্ভুত ব্যাপারটা থেমে গেল। বেগান কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে গিয়ে কেমন নিঃস্পন্দ হয়ে গেল। তার কাঁপা গলা শোনা গেল, 'আমাকে পুড়িয়ে ফেলছে! উহ্, আমাকে পোড়াচ্ছে! মা — মা — '

ডাক্তার দুজন এগিয়ে গেলেন। রেগান তখন বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল — সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো ভাষায়, বিচিত্র এক সাপ-খেলানো সুরে, 'মিযানখযেছিয়ে...মিয়ানখয়েছিযে...'

ডাঃ ক্লীন নিচু হয়ে রেগানের হাত ধরলেন। কোমল স্বরে বললেন, 'লক্ষ্মী মেযে, দেখি এখন তোমার অসুবিধাটা কোথায?'

সঙ্গে সঙ্গে রেগান ঝটকা মেরে সোজা হয়ে উঠে বসল। দেখতে দেখতে তার সুন্দর মুখে কদাকার একটা ছাপ পড়ল। কথা বলে উঠল কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে। ভারি ও গম্ভীর স্বর, তাতে ঘৃণা আর বিদ্বেষ মেশানো। 'এই মেয়েটা আমার। এই মেয়ে আমার।'

বলতে বলতে হা-হা করে হাসল রেগান। বীভৎস এক কুৎসিত হাসি। পর মুহূর্তেই মুখ থুবড়ে বিছানায় পড়ে গেল, যেন কেউ ওকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

তারপর একটানে নাইট গাউন খুলে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ নগ্ন হযে পড়ল। ডাক্তার দুজনের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাল। হিস্ হিস্ কবে বলল, 'কি, কেমন দেখছিস আমাকে ? শুতে চাস আমার সঙ্গে? আয। কাপড় খুলে বিছানায আয। খুব মজা পাবি। হি-হি-হি।'

ক্রিস এ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারল না। ঘর থেকে ছুটে বেরিযে গেল। ডাঃ ক্লীন সহজ ভঙ্গিতে রেগানের হাত ধরতেই ও ফুঁপিযে উঠে বলল, 'প্লিজ, ওকে থামান! ও আমাকে মেরে ফেলছে! ওকে থামান! আমি শ্বাস নিতে পারছি না! প্লিজ, প্লিজ!'

ডাঃ ক্লীন ব্যাগ খুললেন। ইনজেকশন দিযে রেগানকে ঘুম পাড়ানো দরকার। নিউরোলজিস্ট দেখলেন, রেগানের সারা শরীর অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাঁকা হতে শুরু করেছে। এ রকম দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা অস্বাভাবিক একটা ব্যাপাব। রেগানের মুখ থেকে আবারো সেই বিচিত্র ভাষার তুবড়ি ছুটল। ডাঃ ক্লীন বললেন, 'ওকে আমি লিব্রিয়াম দিচ্ছি। পঞ্চাশ মিলিগ্রাম। আপনি শক্ত করে ধরুন।'

লিব্রিয়াম দেয়ার আগেই রেগান জ্ঞান হারাল।

ডাঃ ক্লীন বললেন, 'মূর্ছা গেছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ, সে রকমই লাগছে।'

'কী মনে হয আপনার?'

'নিউরাসথেনিয়া হতে পারে।'

'হিস্টিরিয়া নয়। হিস্টিরিয়াতে শরীর এ রকম বাঁকতে পারে না।'

'এটা প্যাথলজির কেস।'

'আমারও তাই ধারণা। লক্ষণ মিলে যাচ্ছে।'

ইনজেকশন শেষ করে ডাঃ ক্লীন কপালের ঘাম মুছলেন। থেমে থেমে বললেন, 'আমি একটা এল. পি. করব, এখনই, এই অজ্ঞান থাকতে থাকতেই। এল. পি. থেকে কিছু নিশ্চয বোঝা যাবে।'

নিউরোলজিস্ট মাথা নাড়লেন। 'চলুন, আগে ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলি।'

ক্রিস চোখে রুমাল দিয়ে তখনো কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ডাক্তারদের আসতে দেখে নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'মিসেস ম্যাকনীল, আপনার মেয়ে এখন ঘুমিয়ে আছে।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।'

'ওকে বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। চব্বিশ ঘণ্টার মতো ঘুমাবে।'

'ভালো করেছেন, ডাক্তার। আমি লজ্জিত, এ রকম ছেলেমানুষের মতো কান্নাকাটি করেছি। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।'

'না, না। এতে লজ্জিত হওয়ার কী আছে ? মা কাঁদবেন স্বাভাবিক কারণেই। গোটা ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত। আমি আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি ডাক্তার ডেভিড। নিউরোলজিস্ট।'

ক্রিস বলল, 'বলুন ডাক্তার, আপনি কী দেখলেন? আমার মেয়ে এখন পুরো উন্মাদ। ওকে কি কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিতে হবে ?'

ডাঃ ডেভিড শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনার মেযের অসুখটা অস্বাভাবিক। এই রকম অবস্থায় সবার আগে সাইকিয়াট্রিস্টের কথাই মনে পড়ে। তবে আমাব ধারণা, এটা প্যাথলজিরই একটা ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, কিন্তু এখন কী করতে চান ?'

'আমরা একটা এল. পি. মানে লাম্বার ট্যাপ করব।'

'কী করবেন ?'

'স্পাইনাল কর্ড থেকে রস নিয়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখব।'

ক্রিস হঠাৎ খাপছাড়াভাবে বলল, 'আমাকে একটা কথা শুধু বোঝান। কী করে ও বিছানা থেকে অমন করে ওপরে ওঠে আর নিচে নামে?'

জবাব দিলেন ডাক্তার ক্লীন, 'এর উত্তর তো আপনাকে আগেও দিয়েছি। এক্সিলারেটেড মটর ফ্যাংশান।'

'এর কারণ আপনারা জানেন ?'

'না, আমরা জানি না।'

'লাম্বার ট্যাপ কখন করতে চান ?'

'এখনই। আপনার আপত্তি নেই তো ?'

'আপনাদের যা ইচ্ছা করুন। শুধু আমার মেয়েটাকে ভালো করে দিন। আমি আর কিছুই চাই না।'

'আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে টেলিফোন করছি।'

ক্রিস বলল, 'কফি খান। কফি দিতে বলি।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'লাম্বার ট্যাপের ফলাফল কখন জানব ?'

'আজই।'

ডাক্তার ক্লীন টেলিফোনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে স্টাডিতে এসে বসলেন। কফির কাপে চুমুক দিয়ে ক্রিসের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। রেগানের এই অবস্থা হল কখন থেকে তা জানতে চাইলেন। ক্রিস শান্ত স্বরে বলতে শুরু করল। 'আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে। এর আগের দুদিন ও বেশ ভালোই ছিল। আমি ভাবলাম ওষুধ কাজ করছে। তারপর মঙ্গলবার দিন সকালে, আমি রান্নাঘরে বসে কফি খাচ্ছি, তখন হঠাৎ ছুটে এল রেগান। ওকে

নাকি তাড়া করছে ক্যাপ্টেন হাউডি। কাঁদতে কাঁদতে বলল, ও বিছনায শুযে ছিল, হঠাৎ ক্যাপ্টেন হাউডি এসে ওকে চিমটি কাটতে লাগল, তারপর নাকি ওর প্যান্ট টেনে খুলে ফেলতে লাগল। ও তখন আমার কাছে ছুটে পালিযে এল।'

'আপনি কী করলেন ?'

'আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম — কিচ্ছু না। কিচ্ছু হয নি। তখন ও রান্নাঘবেব দরজা দেখিয়ে চেঁচাতে লাগল — ঐ যে দাঁড়িযে আছে দবজাব কাছে, ঐ যে।'

ডাঃ ডেভিড শুকনো গলায বললেন, 'খুবই অদ্ভুত কেস। আচ্ছা মিসেস ম্যাকনীল, সে সময রেগানের গায়ে জ্বর ছিল?'

'আমি জানি না। আমি বলতে পাবব না।'

'চোখ লাল ছিল ?'

'এসব আমাকে শুধু শুধু জিজ্ঞেস কবছেন। আমাব কিছুই খেযাল নেই।'

ডাঃ ক্লীন বললেন, 'তারপর কী হল বলুন।'

ক্রিস ফুঁপিযে কেঁদে উঠল। ডাঃ ক্লীন তাঁব ব্যাগ খুলে একটা ট্যাবলেট বেব কবলেন, 'এটা খেযে নিন, ভালো বোধ করবেন।'

'ট্রাংকুলাইজার ?'

'হ্যাঁ।'

ক্রিস ট্যাবলেটটা হাতে নিযে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল, তাবপব মৃদুস্ববে বলল, 'বেগান তখন অন্য বকম গলায কথা বলতে লাগল।'

'পুরুষের গলায ?'

'হ্যাঁ। খুব ভাবি গলা। যেন বাগী কোনো পুরুষেব কণ্ঠ।'

স্পইনাল ফ্লুইড নেযা হল সহজেই। বেগান কোনো বকম নড়াচড়া কবল না। ডাঃ ক্লীন বললেন, 'সাবা বাতে আর জাগবে বলে মনে হয না। তবুও যদি জেগে ওঠে তাহলে ওকে থোবাজাইন ইনজেকশন দিতে হবে। আমি প্রেসক্রিপশন লিখে যাচ্ছি, আনিযে রাখবেন। আব এক জন নার্স রাখা দবকাব ইনজেকশন দেযার জন্যে।'

শ্যাবন বলল, 'ইনজেকশন আমি দিতে পাবি, ডাক্তাব।'

'খুব লক্ষ রাখতে হবে যাতে সিরিঞ্জে কোনো বাতাসেব বুদ্বুদ না থাকে।'

'আমি অনেক ইনজেকশন দিযেছি। আমি জানি।'

'তাহলে তো ভালোই হল।'

বসলিন মেডিক্যাল বিল্ডিঙের একটা ঘবে ডাঃ ক্লীন বেগানেব স্পাইনাল ফ্লুইড পরীক্ষা করছিলেন। প্রথমে দেখলেন প্রোটিনেব পবিমাণ কত।

স্বাভাবিক।

ব্লাড সেলের সংখ্যা ?

স্বাভাবিক।

কোনো ফাংগাস ইনফেকশন হযেছে কি?

না, তা কিছু হয় নি।

আর চিনির পরিমাণ ?

ঠিকই আছে। রক্তের দুই-তৃতীযাংশ পরিমাণ চিনি আছে।

ডাঃ ক্লীন গম্ভীর হয়ে গেলেন। ক্রিস সারাক্ষণই পাশে ছিল। ডাক্তাবেব ভাবান্তর ওর চোখ এড়াল না। বলল, 'কিছু বলবেন কি ?'

'মিসেস ম্যাকনীল, আপনার ঘরে কি ড্রাগস আছে ? এল. এস. ডি. জাতীয় ড্রাগস? কিংবা এমফিটামিন ট্যাবলেট ?'

'না, ডাক্তার। এগুলো আমি রাখি না।'

ডাঃ ক্লীন শুকনো মুখে বললেন, 'আমার মনে হয়, এখন আমাদের এক জন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমরা কিছু ধরতে পারছি না।'

ক্রিস বাড়ি ফিরল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। ক্লান্ত, বিরক্তও কিছুটা। বাড়িতে কেউ নেই। কয়েকবার 'শ্যারন, শ্যারন' বলে ডাকাল, কোনো জবাব নেই। উইলি আর কার্লকে ছুটি দেয়া হয়েছে। ওরা ফিরবে রাত আটটার দিকে। কিন্তু শ্যারন রেগানকে ফেলে কোথায় গেল?

দোতলার ঘরে গিয়ে ক্রিস দেখে, রেগান গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘরের বড় জানালাটি হাট করে খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। নিশ্চযই শ্যারনের কাজ। জানালাটা খুলে রাখা ওব উচিত হয নি। জানালা বন্ধ করে ক্রিস নিচে নেমে এসে দেখে, উইলি ফিরেছে।

'কোথায় গিয়েছিলে উইলি ?'

'ম্যাডাম, কিছু কেনাকাটা ছিল। তাবপর একটা ছবি দেখলাম। কার্ল আজকে আমাকে বিটলসদের ছবিটা দেখতে দিয়েছে। ও অবশ্য অন্য একটা ছবি দেখতে গেছে।'

'ভালো, কার্লের তাহলে সুবুদ্ধি হচ্ছে।'

ক্রিস টেলিফোন করতে বসল ওর এজেন্টকে। এ কদিনে সবার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আফ্রিকায ছবি পবিচালনাব ব্যাপারটার কতদূর কী হল সে খোঁজ নেযা দরকার। এজেন্টকে পাওয়া গেল না। রাত আটটায শ্যারন ঘরে ফিরল।

'কোথায় ছিলে, শ্যারন ?'

'ও তোমাকে কিছু বলে নি ?'

'কে? কী বলবে ?'

'বার্ক — বার্ক ডেনিংস।'

'বার্ক! সে আবার এল কোথেকে? আমি তো এসে কাউকে দেখলাম না।'

শ্যারন অবাক হয়ে বলল, 'বার্ক এসেছিল তোমার খোঁজে। আমি তাকে বসিয়ে রেখে ফার্মেসিতে গেলাম থোরাজাইন ইনজেকশন কিনতে। বলে গেলাম, আমি না আসা পর্যন্ত যেন কোথাও না যায়।'

ক্রিস অত্যন্ত বিরক্ত হল। কঠিন স্বরে বলল, 'বার্ককে তুমি এখনো চিনতে পারলে না? ওর মতো লোককে কোনো দায়িত্ব দিতে আছে কখনো? তুমি যেই বেরিয়েছ অমনি হয়তো সেও বেরিয়ে গেছে।'

ক্রিস আবার এজেন্টকে টেলিফোন করল। এবারো তাকে পাওয়া গেল না।

উইলি বলল, 'ম্যাডাম, আপনি কিছু খাবেন? স্যান্ডউইচ?'

'হ্যাঁ, তা আনতে পার।'

'কফি দেব সঙ্গে ?'

'দাও।'

অনেকদিন পর ক্রিস টেলিভিশনের সামনে বসল। অতি বাজে প্রোগ্রাম, তবু সে নড়ল না। কার্ল ফিরল রাত সাড়ে নটার পর। তার মুখের ভাব কী কারণে যেন খানিকটা বিষণ্ন। ক্রিস ঘুমাতে যাওয়ার জন্যে টিভি বন্ধ করে যখন উঠে দাঁড়াল তখন ঘড়িতে রাত পৌনে বারটা, আর ঠিক তখনি টেলিফোন বেজে উঠল।

ফোন করেছে বার্ক ডেনিংসের ইউনিটের এক সহকারী পরিচালক। তার গলার স্বর ভাঙা।

'ক্রিস, খবর পেয়েছ?'
'কী খবর?'
'খুব খারাপ খবর। বার্ক ডেনিংস মারা গেছে।'
'কী বললে?'
'বার্ক মারা গেছে, ক্রিস। তোমার বাড়ির উল্টো দিকের রাস্তায এম স্ট্রিটে তাব লাশ পাওয়া গেছে। ঘাড় ভাঙা। তোমার বাড়ির পেছনে যে খাড়া সিঁড়ি আছে, মনে হয সেখান থেকে পা পিছলে পড়ে গিযেছিল।'

ক্রিসের হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেগানের ঘব থেকে ক্রুদ্ধ কর্কশ আওয়াজ ভেসে এল। তারপর মনে হল সিঁড়ি বেযে কেউ যেন ভারি পাযে নেমে আসছে। ক্রিস ভযে আতঙ্কে চেঁচিযে উঠল, 'ডাঃ ক্লীনকে টেলিফোন কর। শ্যাবন, ডাঃ ক্লীনকে বল তিনি যেন এখনই আসেন। এখ্খনি!'

কিন্তু শ্যারনের দিকে তাকিযে আর কথা বলতে পারল না ক্রিস, একটু নড়তেও পাবল না। যেন জমাট বেঁধে গেছে ওর সারা শরীর। শ্যাবনেব পেছনে রেগান কখন এসে পড়েছে। ধনুকের মতো তাব সারা শবীর বাঁকা, মাকড়সাব মতো হাতে-পাযে হেঁটে ও শ্যারনকে অনুসবণ করে চলছে। লকলক কবছে বেগানের জিভ, আর হিসহিস একরকম শব্দ কবছে।

'শ্যারন!' কোনো রকমে উচ্চারণ করল ক্রিস, ওর দৃষ্টি তখনো স্থিব হযে আছে রেগানের দিকে।

টেলিফোনেব দিকে হাত বাড়াতে গিযে থামল শ্যাবন, দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছন ফিরে তাকিযে অবশ্য কিছু দেখতে পেল না সে, কিন্তু পরক্ষণেই ওব পাযেব গোড়ালির কাছে রেগানের জিভেব ছোবল এসে পড়ল। শ্যাবন আর্তস্বরে চেঁচিযে উঠল।

ক্রিস ব্যাকুল হযে চিৎকার কবছে, 'ডাক্তাবকে ডাক, আসতে বল তাকে — এখনই।'

যখন যেদিকে শ্যারন চলতে থাকে, বেগানও অনুসরণ কবে চলে সেদিকে। কী ভযংকর দৃশ্য!

৪

শুক্রবার। ২৯ এপ্রিল।

এক জন অত্যন্ত বিখ্যাত নিউরোসাইকিযাট্রিস্ট এবং ডাঃ ক্লীন রেগানকে পরীক্ষা কবছেন। ক্রিস তার বসাব ঘরে বসে আছে।

ডাক্তাররা প্রায আধঘণ্টা পরীক্ষা করলেন। এই আধঘণ্টাই বেগান বিকট চিৎকাব করল। মাঝে মাঝে কুৎসিত গালাগাল। দুবার নিজের দুকান চাপ দিযে থরথব কবে কাঁপতে লাগল, যেন হঠাৎ কোনো প্রচণ্ড শব্দ শুনছে। দুচোখ ওর গাঢ় রক্তবর্ণ।

সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ ক্লীনকে বললেন, 'মেযেটাকে ট্রাংকুলাইজার দিন। তারপর আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

রেগানকে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম থোরাজাইন দেযা হল। তেমন কাজ হল না। আবো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম দেয়ার পর সে অনেকটা আচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়ল। অবাক হযে তাকাল ডাক্তারদের দিকে। ভয় পাওয়া গলায বলল, 'আমার মা কোথায়?'

'উনি আসবেন এক্ষুনি। আমরা দুজন ডাক্তার।'

কান্না-কান্না গলায় রেগান ডাকল, 'মা! মা!'

'কাঁদছ কেন ? তোমার কি ব্যথা লাগছে ?'

'লাগছে।'

'কোথায় বল তো ?'

'সবখানে — সারা শরীরে আমার ব্যথা! উহ্ কী যন্ত্রণা!'

ক্রিস এসে মেয়েকে কোলে তুলে নিল ফোঁপাতে-ফোঁপাতে রেগান বলল, 'ও আমাকে খুব ব্যথা দেয়। মা ওকে তোমরা থামাও, প্লিজ!'

সাইকিয়াট্রিস্ট অত্যন্ত নরম গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা কী বল তো, রেগান ?'

'আমি জানি না। আগে ও আমাকে কত পছন্দ করত, এখন খালি ব্যথা দেয়।'

'কে সে ?'

'ক্যাপ্টেন হাউডি। আর... আর...'

'বল রেগান। বল, আর কী ?'

'মনে হয আরো কে যেন আমার ভেতরে আছে, আমাকে দিযে সে অনেক কিছু কবায়!'

' সে কি ক্যাপ্টেন হাউডি ?'

'জানি না।'

'অন্য কেউ ?'

'জানি না। আমি সত্যি জানি না!'

সাইকিযাট্রিস্ট এগিযে এসে বেগানের হাত ধরলেন। মিষ্টি গলায বললেন, 'বেগান, আমি একটা বেশ মজার খেলা জানি। তুমি কি সিনেমাতে কখনো হিপনোটাইজ কবা দেখেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি খুব সহজেই মানুষকে হিপনোটাইজ করতে পাবি। এখন তোমাকে হিপনোটাইজ কবব। কেমন? এতে তুমি ভালো হযে যাবে। এই দেখ তোমাব মা বসে আছেন, ভযেব কিছু নেই।'

ক্রিস বলল, 'ভযের কিছু নেই, মামণি, ডাক্তার যা বলছেন শোন। লক্ষ্মী, মা আমাব।'

রেগান আব কোনো আপত্তি জানাল না।

জানালায় পর্দা টেনে ঘরকে অন্ধকার করা হল। সাইকিযাট্রিস্ট পকেট থেকে বের করলেন একটা সোনার চেন। চেনের মাথায গোল একটা চকচকে জিনিস। সেটা দেখিযে সাইকিয়াট্রিস্ট রেগানকে বললেন, 'এই চেনটা আমি দোলাব, তুমি চেযে থাকবে এই গোল জিনিসটার দিকে। কেমন ?'

রেগান মাথা নাড়ল।

তিনি এক হাতে দোলাতে লাগলেন চেনটা, আর অন্য হাতে ছোট্ট একটা পেন টর্চলাইটের আলো ফেললেন রেগানের চোখে। ভারি ও গম্ভীর গলায বলতে লাগলেন সম্মোহিত করার কথাগুলো, 'রেগান, তাকিয়ে থাক। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তোমার চোখের পাতা ভারি হয়ে আসবে। ঘুম পাবে। খুব ঘুম। খুব শান্তির ঘুম...'

রেগান মুহূর্তের মধ্যে ঘুমে নেতিয়ে পড়ল। সাইকিয়াট্রিস্ট অবাক হয়ে বললেন, 'এত সহজে ঘুমিয়ে পড়বে ভাবি নি।'

রেগান বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল। ক্রিস পাশেই পাংশু মুখে বসে। ডাঃ ক্লীন সিগারেট ধরালেন। সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, 'এখন তোমার ভালো লাগছে, রেগান ?'

'হ্যাঁ।' ওর গলার আওয়াজ স্পষ্ট ও নরম, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

'তোমার বয়স কত, রেগান?'
'বার।'
'তোমার ভেতরে কি কেউ থাকে ?'
'মাঝে মাঝে থাকে।'
'সে কি কোনো লোক ?'
'হ্যাঁ।'
'সে কে ?'
'জানি না।'
'সে কি ক্যাপ্টেন হাউডি ?'
'জানি না।'
'সে কি এক জন পুরুষ ?'
'জানি না।'
'এখন সে কি তোমার মধ্যে আছে ?'
'জানি না।'
'রেগান, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তুমি কি তাব সঙ্গে কথা বলতে দেবে আমাকে ?'
'না।'
'কেন দেবে না ?'
'আমার ভয় করে।'
'কীসেব ভয় ?'
'জানি না।'
'আমি যদি ওর সাথে কথা বলি তাহলে ও তোমাকে ছেড়ে দেবে। তুমি কি চাও ও তোমাকে ছেড়ে দিক ?'
'হ্যাঁ, চাই।'
'বেশ, তাহলে ওকে কথা বলতে দাও।'
'না।'
'দাও, লক্ষ্মী মেয়ে। তোমাব ভালো হবে। ও ছেড়ে যাবে তোমাকে।'
'আচ্ছা।'
সাইকিয়াট্রিস্ট বিবতি নিলেন কিছুক্ষণেব। তাবপব গম্ভীর গলায় বললেন, 'রেগানের ভেতরে যে আছে — আমি এখন তাব সঙ্গে কথা বলছি। তুমি যদি থেকে থাক তাহলে তুমিও এখন সম্মোহিত হয়ে আছ। তাহলে অবশ্যই আমার প্রশ্নেব জবাব তোমাকে দিতে হবে।'
বেগানের ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কোনো শব্দ হল না। সাইকিযাট্রিস্ট আবার বললেন, 'তুমি যদি থেকে থাক তাহলে অবশ্যই তোমাকে আমার সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তুমি আছ? জবাব দাও, তুমি কি আছ ?'
নীরবতা। একটা অদ্ভুত কিছু যেন হচ্ছে রেগানেব মধ্যে। ওর ঠোঁট দুটো বেঁকে যাচ্ছে। গালেব চামড়া কুঁচকে উঠছে। প্রকাণ্ড একটা হাঁ কবল রেগান। ওর জিভ ক্রমশ বেব হযে আসছে। কাঁপছে। ধীরে ধীরে দূষিত হয়ে উঠছে ঘবেব বাতাস। পচা উগ্র একটা গন্ধ বেবিযে আসছে রেগানের হাঁ-কবা মুখ থেকে।
ক্রিসের নড়বার শক্তি নেই। ফিসফিস করে শুধু বলল —
'হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর!'

সাইকিয়াট্রিস্ট এবার প্রশ্ন করতে লাগলেন অনেকটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে, 'তুমিই কি থাক রেগানের মধ্যে ?'

রেগান মাথা নাড়ল।

'তুমি কে ?'

'মিয়াউকেয়ান।'

'এটা কি তোমার নাম ?'

রেগান মাথা নাড়ল।

'তুমি কি পুরুষ ?'

'আনহ।'

'তুমি কি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছ ?'

'আনহ।'

'এ কথার অর্থ যদি 'হ্যাঁ' হয় তাহলে মাথা নাড়।'

রেগান মাথা নাড়ল।

'তুমি কি কোনো বিদেশি ভাষায় কথা বলছ ?'

'আনহ।'

'কোথে কে তুমি এসেছ ?'

'রশ্বঈ।'

'তুমি বলছো হ্রস্ব ই থেকে এসেছ।'

'আনমিয়াছিসেয়েরশ্বঈকেথে।'

সাইকিয়াট্রিস্ট খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'এখন থেকে তোমাকে যখন প্রশ্ন করব তখন তুমি মাথা নেড়ে উত্তর দেবে। একবার মাথা নাড়লে 'হ্যাঁ', আর দুবার নাড়লে 'না'। বুঝতে পেরেছ?'

রেগান একবার মাথা নাড়ল।

'তোমার উত্তরগুলোর কোনো অর্থ আছে?' — 'হ্যাঁ।'

'তোমাকে কি রেগান আগে চিনত?' — 'না।'

'তোমাকে কি রেগান কল্পনা করেছে?' — 'না।'

'তুমি সত্যি আছ?' — 'হ্যাঁ।'

'তুমি কি রেগানের একটা অংশ?' — 'না।'

'তুমি কি কখনো রেগানের অংশ ছিলে?' — 'না।'

'তুমি কি রেগানকে পছন্দ কর?' — 'না।'

'অপছন্দ কর?' — 'হ্যাঁ।'

'ঘৃণা কর?' — 'হ্যাঁ।'

'রেগানের বাবা-মার ডিভোর্সের জন্যে তুমি কি রেগানকে দায়ী কর ?' — 'না।'

'রেগানের বাবা-মার সঙ্গে কি তোমার কোনো সম্পর্ক আছে ?'- 'না।'

'ওর কোনো বন্ধুর সঙ্গে ?' — 'না।'

'তবু তুমি রেগানকে ঘৃণা কর ?' — 'হ্যাঁ।'

'তুমি তাকে শাস্তি দিতে চাও ?' — 'হ্যাঁ।'

'মেরে ফেলতে চাও ?'- 'হ্যাঁ।'

'তাকে মেরে ফেললে তুমি নিজেও কি মরে যাবে না?' — 'না।'

সাইকিয়াট্রিস্ট কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন বলে মনে হল। প্রশ্নোত্তরগুলো তাঁর মনমতো হচ্ছে না। ব্যাপারটা তিনি গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করলেন।

‘এমন কি কিছু আছে যা করা হলে রেগানকে ছেড়ে যাবে?’ — ‘হ্যাঁ।’
‘তুমি কি বলতে পার তা কি ?’ — ‘হ্যাঁ।’
‘তুমি কি বলবে ?’ — ‘না।’

কথাটা শেষ করার আগেই সাইকিয়াট্রিস্ট হঠাৎ অস্ফুট চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন। পরমুহূর্তেই একটা বিকট চিৎকার। দুই হাতের বজ্রমুষ্ঠিতে রেগান চেপে ধরেছে সাইকিয়াট্রিস্টের অণ্ডকোষ। হাতে তার অসুরের শক্তি। ক্রিস স্তম্ভিত হয়ে দেখল, দুজনে বিছানার ওপর দাপাদাপি শুরু করেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন সাইকিয়াট্রিস্ট, ‘ডাঃ ক্লীন, আমাকে বাঁচান! মেরে ফেলল, আমাকে মেরে ফেলল!’

রেগান হঠাৎ ঘর ফাটিযে হা-হা কবে হেসে উঠল।

ক্রিস লাফিয়ে উঠল। বিছানাটা ভযংকরভাবে কাঁপছে। ডাঃ ক্লীন দৌড়ে গিযে বাতি জ্বালালেন। প্রায সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভযংকর কিছু যেন ঘর ছেড়ে চলে গেল। রেগান আবাব নেতিযে পড়ল। ডাঃ ক্লীন পরীক্ষা করে দেখলেন রেগান ঘুমিয়ে পড়েছে। সাইকিযাট্রিস্টেব মুখ কাগজের মতো সাদা। ক্রিস ফুঁপিযে উঠল, ‘বলুন আপনাবা, আমার মেযের কী হযেছে?’

‘মিসেস ম্যাকনীল, আসুন আমরা নিচে গিয়ে কথা বলি।’

ক্লান্ত পাযে নিচে নেমে এল সবাই। কেউ কারো মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারছে না।

‘এখন আপনারা বলুন, আমার মেয়ের কী হয়েছে ? আপনারা তো নিজের চোখেই সব দেখলেন, এখন বলুন।

‘মিসেস ম্যাকনীল, পুরো ব্যাপারটাই বেশ জটিল।’

‘তবুও কিছু একটা তো বলবেন?’

‘আমার ধারণা, বেগানের হিস্টিবিয়া হযেছে।’

‘হিস্টিরিযা?’

‘হ্যাঁ, হিস্টিরিয়া।’

‘এই যে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ কথা বলছে রেগানের মুখ দিযে, এটাও হিস্টিরিযা? কী বলছেন আপনাবা?’

সাইকিযাট্রিস্ট রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। শান্ত স্বরে বললেন, ‘রেগানেব মনে একটা অপরাধবোধ আছে। সেই অপরাধবোধের জন্যেই ও নিজেকে নিজে শাস্তি দিতে চায। এজন্যেই ও ক্যাপ্টেন হাউডিকে তৈরি করেছে। এই কাল্পনিক হাউডি এখন শাস্তি দিচ্ছে ওকে।’

‘অপরাধবোধটা আসবে কোত্থেকে ?’

‘বাবা-মার ডিভোর্সের জন্যে শিশুরা সব সময়ই নিজেদের দোষী ভাবে। অপরাধবোধটা আসে সেখান থেকেই।’

ক্রিস ক্লান্ত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাল একটা। বলল, ‘তাহলে আপনার ধারণা ওর হিস্টিরিযা হযেছে ?’

‘হিস্টিরিয়া হওয়ারই সম্ভাবনা।’

‘রোগটা কী রকম একটু বুঝিযে বলুন।’

‘মনের অসুখের শারীরিক অসুখ হয়ে যাওয়াকেই বলে হিস্টিরিয়া। হিস্টিরিয়া রোগীর মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব দেখা যায়। অনেক রকম অস্তিত্বহীন জিনিস ওরা দেখে। রেগানের সঙ্গে এসব লক্ষণ কিন্তু বেশ মিলে যায়, মিসেস ম্যাকনীল।’

'এখন আসল কথা বলুন। ওর কী চিকিৎসা করবেন?'

ডাক্তার দুজনেই চুপ করে থাকলেন। ক্রিস অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'চুপ করে আছেন কেন? বলুন, এখন কী করতে হবে?'

'আমার মতে বেশ কয়েক জন এক্সপার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার। সপ্তাহ তিনেকের জন্যে হাসপাতালে রেখে ভালমতো পরীক্ষা করতে হবে। ডেটনের বেরিঙ্গার ক্লিনিক হবে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা, মিসেস ম্যাকনীল।'

ক্রিস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আরেকটা সিগারেট ধরাল। ডাঃ ক্লীন বললেন, 'ক্লিনিকে দিতে আপনার কোনো আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি কীসের? তবে আমি ভরসা হারিয়ে ফেলছি, ডাক্তার।'

সাইকিয়াট্রিস্ট টেলিফোন করলেন বেরিঙ্গার ক্লিনিকে। তারা জানাল পরদিন ভোরে এসে রেগানকে নিয়ে যাবে। আরো মিনিট দশেক চুপচাপ বসে থেকে ডাক্তাররা বিদায় নিলেন।

বেরিঙ্গার ক্লিনিকে যাওয়ার জন্যে কোন্ পোশাক পরতে হবে ক্রিস তাই দেখছিল। নূতন একটা পরচুলা আনিয়েছে সেদিন, ওটা পরলে কেউ আর ওকে চিনতে পারে না সহজে। নামি অভিনেত্রীদের কোথাও যাওয়াও এক ঝামেলা। কার্ল এসে বলল, 'এক জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'বল, দেখা হবে না। আমি ব্যস্ত।'

'ভদ্রলোক এক জন ডিটেকটিভ।'

'ডিটেকটিভ?'

'হ্যাঁ। উইলিয়াম কিন্ডারম্যান। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের লেফটেন্যান্ট।'

'আমার সঙ্গে তার কী দরকার?'

'আমি জিজ্ঞেস করি নি, ম্যাডাম। পরে আসতে বলব?'

'না, আমি যাচ্ছি।'

ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের ওপর। মোটাসোটা ভারিক্কি মানুষ। চোখের দৃষ্টি চকচকে। হাসিহাসি মুখ। পুলিশের লোক বলে মনেই হয় না। ক্রিসকে দেখামাত্র হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার সৌভাগ্য যে মুখোমুখি আপনার সঙ্গে দেখা হল। আপনাকে আমি পর্দায় অসংখ্যবার দেখেছি?'

'আমি কী করতে পারি আপনার জন্যে বলুন?'

'কিছুই না। একদম কিছুই না। রুটিন মাফিক দুই একটা প্রশ্ন কবব শুধু।'

'করুন।'

'আপনি ব্যস্ত থাকলে আরেকদিন আসব। যেদিন বলবেন সেদিন আসব। আমাব কোনো তাড়া নেই।'

কিন্ডারম্যান চলে যাওয়ার ভঙ্গি করল। ক্রিস বলল, 'ব্যাপারটা কি বার্ক ডেনিংস সম্পর্কিত?'

'হ্যাঁ, তাই। একটা লজ্জার ব্যাপার, তাই না?'

'বার্ক কি খুন হয়েছে? সেই জন্যেই কি এসেছেন আপনি?'

কিন্ডারম্যান সহজভাবে হাসল। 'না, না, সেসব কিছুই না। রুটিন জিজ্ঞাসাবাদ। এক জন বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু তো, কাজেই পরিচিত দু এক জনকে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করা শুধু।'

'বার্কের টাকাপয়সা কি চুরি গেছে?'

'উহুঁ, একটা পয়সাও না। অবশ্য আজকাল এমন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে যে, খুন করতে কোনো মোটিভ লাগে না। আসল জিনিস হচ্ছে ড্রাগস, এল. এস. ডি. বুঝলেন ?'

কিন্ডারম্যান সরুচোখে তাকাল ক্রিসের দিকে। কি যেন লক্ষ করল। তারপর আবার সহজ ভঙ্গিতেই বলল, 'আমি নিজে এক জন পিতা, তাই যখন দেখি আজকালকার ছেলেমেয়েদের কী অবস্থা তখন বুকটা ফেটে যায়। আপনার ছেলেমেয়ে আছে ?'

'হ্যাঁ, একটা।'

'ছেলে না মেয়ে ?'

'মেয়ে।' ক্রিস বলল, 'আসুন বসার ঘরে। সেখানে বসে যা জিজ্ঞেস করার করবেন।'

'কিচ্ছু জিজ্ঞেস করার নেই আমার। রুটিন ব্যাপার। ইয়ে, মানে, মিসেস ম্যাকনীল...'

'বলুন।'

'আপনাকে একটু কষ্ট দিতে পারি?'

'বলুন, কী ব্যাপার ?'

'বদহজম হয়েছে আমার। বয়স হলে যা হয়। আপনার ঘরে কি সেভেন আপ জাতীয় কিছু আছে? না থাকলে অসুবিধা নেই। কোনোই অসুবিধা নেই।'

'আছে, আমি এনে দিচ্ছি।'

'না, না, আপনাকে উঠতে হবে না। ফ্রিজ কোথায় বলুন, আমি নিয়ে আসছি। রান্নাঘরে?'

'আপনাকে উঠতে হবে না। আমি দিচ্ছি।'

'মানুষকে বিরক্ত কবতে খুব খারাপ লাগে আমাব।'

'বিবক্তিব কিছু নেই।'

কিন্ডারম্যান কিন্তু ক্রিসের সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে গেল। আচমকা বলল, 'একটা মাত্র মেয়ে আপনার, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'বয়স কত ?'

'কয়েক দিন আগে বার হয়েছে।'

'তাহলে আপনার চিন্তার কিছু নেই। বয়স বেশি হলেই মুশকিল। দুনিয়া আগের মতো নেই, মিসেস ম্যাকনীল। আমি আমার স্ত্রীকে সেদিন কথায় কথায় বললাম — মহা প্রলযেব আর বেশি বাকি নেই।'

রান্নাঘরে কার্ল কী একটা পরিষ্কার করছিল। সে ফিরেও তাকাল না। কিন্ডাবম্যান কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগল কার্লকে।

'মিসেস ম্যাকনীল, সত্যি বড় লজ্জা লাগছে। আপনার মতো এক জন বিখ্যাত অভিনেত্রীর সঙ্গে আজ আমার প্রথম দেখা, আর আজকেই কিনা আমি চাইলাম সেভেন আপ।'

'বরফ লাগবে, মিঃ কিন্ডারম্যান ?'

'না, না, তার দরকার নেই।'

ক্রিস বোতলের মুখ খুলল। কিন্ডারম্যান কথা বলছে ক্রিসের সঙ্গে, কিন্তু চোখ বাখছে কার্লের ওপর।

'মিসেস ম্যাকনীল, আপনার ছবি 'দ্য এনজেল' আমি ক বার দেখেছি জানেন ? ছয় বার। বিশ্বাস হয় ? একবার নয়, দুবার নয়, ছয়বার।'

'ভালো লেগেছিল ?'

'ভালো মানে? আমি হাউমাউ করে কেঁদেছি। বড্ড ইমোশনাল ছবি। অবশ্য সামান্য একটু ত্রুটি আছে। খুবই সামান্য। আমি কিন্তু সাধারণ এক জন দর্শক হিসেবে বলছি। অন্য কিছু ভাববেন না আবার। আপনার কি মনে হয় না ছবিটার আবহ-সঙ্গীত বড্ড চড়া ?'

'ওসব আমি বুঝি না। তবে ছবিটা যে আপনার ভালো লেগেছে তা জেনে খুব খুশি হলাম।'

আবার বসার ঘরে এসে কিন্ডারম্যানের চোখে পড়ল, টেবিলের ওপর একটা পাখির মূর্তি। নখ দিয়ে মূর্তির গায়ে আঁচড় কাটল সে। ক্রিস তাকাতেই লজ্জিত হয়ে হাসল। 'চমৎকার পাখি, মিসেস ম্যাকনীল। কে বানিয়েছে ?'

'আমার মেয়ে।'

'চমৎকার। খুব চমৎকার।'

'আপনি কী জানতে চাইছিলেন, বলুন।'

'কিচ্ছু না। বলতে গেলে বলা যায় জিজ্ঞেস যা করার তা করা হয়েছে। হা-হা-হা। এমনি একটু গল্পগুজব করছি আর কি। শুধু একটা কি দুটো প্রশ্ন। না করলেও হয়। তবু এসেছি যখন, কী বলেন ?'

'জিজ্ঞেস করুন, আমি বলছি।'

'বার্ক ডেনিংস যে রাতে মারা যান সে-রাতে তিনি কি এ বাড়িতে এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কখন ?'

'বার্ক এসেছিল সাতটার দিকে।'

'ব্যস, এখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় পা ফসকে... পানির মতো পরিষ্কার। শুধু রেকর্ড ঠিক রাখার জন্যে আর একটা প্রশ্ন।'

'বলুন।'

'কটার সময় তিনি বিদায় নিয়েছিলেন ?'

'আমি ঠিক জানি না। তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না, ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।'

'তাহলে কী করে জানলেন তিনি সাতটার সময় বিদায় নিয়েছেন ?'

'শ্যারনের কথা থেকে অনুমান করেছি।'

'শ্যারন!'

'শ্যারন স্পেনসার। আমার সেক্রেটারি। বার্ক যখন এসেছিল তখন ও বাড়িতে ছিল।'

'বার্ক ডেনিংস কি শ্যারনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ?'

'না, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। শ্যারন তাকে বসিয়ে রেখে ওষুধ কিনতে বাইরে যায়। এর পর আমি ফিরে আসি।'

'কটা বাজে তখন ?'

'সাড়ে সাতটার মতো হবে।'

'আপনার সেক্রেটারি কখন ওষুধ কিনতে যান ?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না।'

'মিঃ ডেনিংস যখন এ বাড়িতে ছিলেন তখন কে ছিল তাঁর সঙ্গে ?'

'আমার মেয়ে ছিল। আর কেউ ছিল না।'

'আপনার কাজের লোকজন নেই ?'

'আছে, উইলি আর কার্ল। স্বামী-স্ত্রী। তখন ওরা বাড়িতে ছিল না। ওদের আমি ছুটি দিয়েছিলাম।'

'ওদের কি আপনি প্রায়ই ছুটি দেন, না শুধু ওইদিনই দিয়েছিলেন ?'

'প্রায়ই ছুটি দিই।'

ক্রিসের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু হলেও এখন যা শুরু হয়েছে তা নিখুঁত তদন্ত। কিন্তু কেন? ক্রিস দেখল, কার্ল রান্নাঘরের সামনে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের জিনিসটা পরিষ্কার তবু কার্ল এত ঘষাঘষি করছে কী জন্যে ?

কিন্ডারম্যান একটা সিগাবেট ধরিয়ে ঠাণ্ডা গলায বলল, 'মিসেস ম্যাকনীল, তাহলে দেখা যাচ্ছে একমাত্র আপনাব মেয়েই বলতে পারবে কখন মিঃ ডেনিংস বিদায নিয়েছেন।'

'না, সে বলতে পাববে না। সে খুব অসুস্থ। ওকে ঘুমেব ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বাখা হয়েছে।'

'কী অসুখ জানতে পারি?'

'না, আমরা নিজেরাই এখনো জানি না।'

'ঠাণ্ডা বাতাস থেকে হয এইসব। ঠাণ্ডা বাতাসে থাকে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেবিযা। খুব লক্ষ রাখতে হবে।'

ক্রিস সরু চোখে তাকিয়ে রইল।

'আপনার মেযের ঘবটা কোথায?'

'দোতলায। শেষ মাথায।'

'ওব ঘরের জানালা বন্ধ রাখবেন। ঠাণ্ডা বাতাস হচ্ছে সমস্ত অসুখেব মূল। এখন আমি কার্লকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তারপব শেষ। পুলিশেব চাকরি যে কী যন্ত্রণা, মিসেস ম্যাকনীল!'

কার্ল নিজে থেকেই সামনে এগিযে এল।

'মিঃ কার্ল, আপনি কাল কটায বাড়ি ফিবেছেন?'

'আমি সিনেমা দেখে বাড়ি ফিবেছি ঠিক নটা পঁযত্রিশে।'

'কী ছবি দেখেছেন ?'

'লিযাব। ক্রেস্ট মুভি হাউসে।'

'আমি ছবিটা দেখেছি। চমৎকাব ছবি।'

'ছবি শুরু হযেছে ঠিক ছটায। শেষ হযেছে আটটায। শেষ হওয়ামাত্র আমি বাসে উঠলাম...'

'না, না, এতসব বলতে হবে না। কোনো প্রযোজন নেই।'

'প্রযোজন না থাকলেও আমি বলতে চাই। আমি এম স্ট্রিটে বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ি ফিরেছি।'

'আহা, কে জানতে চাচ্ছে এসব ? ছবিটা কেমন ছিল সেটা বলুন।'

'ছবিটা ভালো।'

'আপনার স্ত্রী, তিনি কি আপনাব সঙ্গে ছিলেন ?'

'না, সে অন্য ছবি দেখেছে।'

'কী ছবি দেখেছেন তিনি ?'

'বীটলসদেব একটা ছবি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। মিসেস ম্যাকনীল, আজ তাহলে উঠি। যদি দবকাব হয তাহলে পরে আবার টেলিফোন করব।'

'আমি কিন্তু কিছুদিন এখানে থাকব না। ডেটনে যাচ্ছি।'

'আমার কোনো তাড়া নেই। আমি অপেক্ষা করব।'

কিন্ডারম্যান সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে চিন্তিত সুরে বলল, 'আপনার মেয়ের জন্যে কি ভালো ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছেন?'

'হ্যাঁ, ওকে আমি একটা ক্লিনিকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'ক্লিনিকটা কোথায়?'

'ডেটনে — এই যে বললাম আমি যাচ্ছি সেখানে।'

'ও। তাহলে আজ উঠি। মিসেস ম্যাকনীল। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

কিন্ডারম্যান চিন্তিত মুখে তার গাড়ির দিকে এগুল। গাড়িতে উঠে সে বাতি জ্বালাল। গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলে ছোট্ট একটা ছুরি বের করে তার নখের ডগায় লেগে থাকা বং চেঁছে চেঁছে তুলতে লাগল। রং লেগেছে রেগানের বানানো পাখির মূর্তি থেকে। ছোট্ট একটা খামেব ভেতব রঙের গুঁড়োগুলো বেখে সেটাব মুখ বন্ধ করে দিল কিন্ডারম্যান। এগুলো পাঠাতে হবে পরীক্ষার জন্যে। কার্ল লোকটার ব্যাপাবে আরো খোঁজখবব নিতে হবে। বয়স বেশ হয়ে গেলেও ব্যাটা এখনো দিব্যি গাট্টাগোট্টা। বউটা তো বুড়িয়ে গেছে। দেখলে কে বলবে ওবা স্বামী-স্ত্রী! গাড়ির ড্রাইভাবকে কিন্ডাবম্যান বলল মর্গে নিয়ে যেতে। মর্গের ৩২ নম্বব লকাবে বার্ক ডেনিংসের লাশ রাখা আছে। সেটা আরেকবাব দেখা প্রয়োজন।

কিন্ডারম্যান অনেকক্ষণ ধবে বার্ক ডেনিংসের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থাকল। আগেও সে দুবার দেখেছে আব প্রতিবারেই তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছে। বার্ক ডেনিংসেব মাথাটা এমনভাবে ঘোরানো যেন কেউ মুচড়ে সেটা ঘুরিয়ে তাকে মেবেছে। কুৎসিত ব্যাপাব! কিন্ডারম্যান মৃদুস্বরে বলেই ফেলল, 'পুলিশেব চাকবিব মতো খাবাপ চাকবি আব নেই।'

৫

ফাদার ডেমিয়েন কারাস সুতির একটা টি-শার্ট আর খাকী বঙের প্যান্ট পরে দৌড়াচ্ছিলেন। তিনি রোজ ঘণ্টাখানেক এ রকম দৌড়ান। উপাসনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওযাব পব এই হয়েছে তাঁর নতুন রুটিন। আজ তিনি দৌড়াচ্ছেন এসট্রনমিক্যাল অবজারভেটরির দিকে। গা বেয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। পায়ের পেশীগুলো টনটন করছে। তবু অবজারভেটরি পর্যন্ত না পৌঁছে তিনি থামবেন না।

মেডিক্যাল স্কুলের কাছে এসে ফাদার কারাস বাঁ দিকে মোড় নিলেন। তখনই তাঁর চোখে পড়ল সামনের দিকে বেঞ্চে বসা এক লোক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ করছে। লোকটিব গায়ে ওভারকোট, মাথায় ফেল্ট হ্যাট। মুখের ভাব কিছুটা যেন বিষণ্ন।

কাছাকাছি আসতেই ওভারকোট পরা লোকটা উঠে দাঁড়াল। ভাঙা গলায় শুধাল, 'ফাদাব কারাস?'

কারাস মাথা নাড়লেন। একটুখানি হাসলেন। থামলেন না, কিন্তু গতিবেগ কমিয়ে দিলেন যাতে লোকটা তাঁকে ধরতে পারে। বললেন, 'আমি থামতে পারছি না। দয়া করে এগিয়ে আসুন।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমি আসছি।'

লোকটা এবার দৌড়াতে শুরু করল। ফাদার কারাস জিজ্ঞেস কবলেন, 'আপনাকে কি আমি চিনি ?'

'না, ফাদার। আমার নাম উইলিয়াম কিন্ডাবম্যান। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে আছি।'

'আমার কাছে কী দরকার বলুন তো ?'

'ফাদার, আমি শুনেছিলাম আপনি দেখতে এক জন বক্সারের মতো। আসলেও তাই। আপনাব গালে একটা কাটা দাগ পর্যন্ত আছে। তা সত্যি সত্যি কি বক্সিং করেন ?'

'মাঝে মাঝে করি।'

'আপনার বাড়ি কোথায ফাদার ? বসতবাড়ি ?'

'নিউইযর্ক।'

'গোল্ডেন গ্লোভসে, তাই না ?'

'হ্যাঁ। আপনি তো সব খোঁজখবব নিযেই এসেছেন মনে হচ্ছে!'

'ফাদার, দযা করে একটু আস্তে হাঁটতে পাববেন? বযস হযে গেছে তো, এখন আব আগের মতো দৌড়াতে পাবি না।'

'আমি দুঃখিত।' ফাদাব কাবাস গতিবেগ অনেকখানি কমিযে দিলেন।

'আপনি সিগাবেট খান, ফাদাব ?'

'হ্যাঁ, খাই।'

'উচিত নয। ক্যানসার, বুঝলেন, ক্যানসাব।'

'আমার কাছে কেন এসেছেন তা কিন্তু এখনো বলেন নি।'

'আপনি তো ব্যস্ত, তাই না, ফাদাব ?'

'না।'

মুখ কাঁচুমাচু কবে কিন্ডারম্যান বলল, 'ব্যস্ত থাকলে অবশ্য অন্য সময আসব ।'

কাবাস এবার হেসে ফেললেন, 'কী বলবেন, বলে ফেলুন তো দেখি।'

'আমি আপনার কথা ঠিক ধবতে পাবছি না।'

কাবাস শব্দ কবে হাসলেন। তাবপব হাসি থামিযে বললেন, 'কথা ধবতে না পাবাব লোক আপনি নন, সব কিছুই আপনি ঠিকঠাক ধবতে পাবেন।'

কিন্ডারম্যান একটু অপ্রস্তুত হল। সামলে নিযে বলল, 'ভুলেই গিযেছিলাম আপনি এক জন সাইকিযাট্রিস্ট। বোকা সেজে কথা বলা আমাব অভ্যাস, ফাদার। এতে অনেক বেশি ফল পাওযা যায। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি কোনো ভান কবব না।'

'আপনি প্রেত-তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে এসেছেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ, ফাদার। কিন্তু এর বাইরেও কিছু আছে।'

'কেউ কি খুন হযেছে ?'

'কী করে অনুমান করলেন ?'

'আপনি হোমিসাইড থেকে এসেছেন তো, তাই অনুমান করছি।'

'ফাদার, আপনি একটু বেশি বুদ্ধিমান।'

'মিঃ কিন্ডারম্যান, আপনি আমাব কাছে কেন এসেছেন তা এখনো বুঝতে পাবি নি। কাজেই যত বুদ্ধিমান আপনি আমাকে ভাবছেন আসলেই ততটা আমি নই।'

'ফাদার, একটা গোপন কথা বলতে পারি আপনাকে ? খুবই গোপন ?'

'বলুন।'

'আপনি কি বিখ্যাত চিত্র পরিচালক বার্ক ডেনিংসের নাম শুনেছেন ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি। তাঁকে আমি দেখেছিও।'

'দেখেছেন? কীভাবে তিনি মারা গেছেন তা জানেন?'

'পত্রিকায় পড়েছি। সিঁড়ি থেকে পা ফসকে...'

'তাহলে সবটা জানেন না।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। আপনি খুব অল্পই জানেন। আচ্ছা, অন্য একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি। আপনি কি ডাইনী, শয়তান... এইসব বিষয়ে কিছু জানেন?'

'কিছুটা।'

'কিছুটা মানে কতটুকু?'

'একবার এসবের ওপর একটা রিসার্চ পেপার তৈরি করেছিলাম।'

'বাপ রে, আপনি তো তাহলে রীতিমতো এক জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি!' কিন্ডারম্যান উৎসাহের চোটে ফাদারের হাত চেপে ধরল। 'বুঝলেন ফাদার, আমি কিছুই জানি না। বলতে গেলে আমি এক জন অশিক্ষিত লোক। মহা মূর্খ। তাছাড়া এইসব জটিল বিষয় বুঝতে হলে মাথার মধ্যে যেসব জিনিস থাকতে হয়...'

'মিঃ কিন্ডারম্যান, আপনি কিন্তু আবাব বোকার ভান করছেন।'

'দুঃখিত, ফাদার, আমি দুঃখিত। এখন থেকে আমি সবকিছু সবাসবি বলব। একেবাবে দিব্যি দিয়ে বলছি।'

'সেটাই ভালো।'

'হলি ট্রিনিটিতে মা মেরির মূর্তিকে রং করে একটা বেশ্যার মূর্তি বানানো হয়েছে। মলমূত্র এনে রাখা হযেছে তার সামনে। এসব কি কোনো প্রেতপূজার সঙ্গে যুক্ত?'

'হযতো।'

'চমৎকার, এখন আসুন বার্ক ডেনিংস প্রসঙ্গে। সে কীভাবে মারা গেছে জানেন?'

'ওই পত্রিকায় যা পড়েছি...'

'আচ্ছা, একটা গোপন কথা বলছি এবার। কিন্তু কোথাও বসতে হবে আপনাকে। আর দৌড়াতে পারছি না। বয়স হয়েছে আমার, ফাদার, আগের দিন আব নেই।'

কারাস অগত্যা একটা বেঞ্চে বসলেন। হাসিমুখে বললেন, 'এবাব বলুন আপনার গোপন কথা।'

'বলছি, বলছি।'

কিন্ডাবম্যান হাঁপাতে লাগল। সে সত্যি সত্যি কাহিল হয়ে পড়েছে। টপটপ করে ঘাম পড়ছে। মিনিট দুই চুপ কবে থেকে সে টেনে টেনে বলল, 'বার্ক ডেনিংসের মৃতদেহ পাওযা গেছে সাতটা পাঁচ মিনিটে। সিঁড়িগুলোর নিচে। তার ঘাড় ছিল ভাঙা। মাথাটা সম্পূর্ণ পেছন দিকে ঘোরানো।'

'তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, সিঁড়ি থেকে পড়ে এমন একটা অবস্থা হতে পারে না?'

'হতেও পারে। জাযগাটা বেশ উঁচু। তবে ফাদার...'

'সম্ভাবনা খুব কম?'

'হ্যাঁ, খুবই কম। এখন বলুন প্রেততত্ত্বে এ ধরনের মৃত্যুর কথা কি আছে?'

'আছে। বলা হয়েছে — শয়তান যখন কাউকে মারে তখন এইভাবে মারে।'

'এখন ফাদার, আপনি কি চার্চের ওই প্রেতপূজা আর বার্ক ডেনিংসের মৃত্যু — এই দুয়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ দেখতে পাচ্ছেন?'

কারাস কিছু বললেন না। কিন্ডারম্যান সিগারেট ধরিয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'আপনার কি মনে হয় না, মানসিকভাবে অসুস্থ কোনো লোক হলি ট্রিনিটিতে শয়তানের পূজা করছে? বার্ক ডেনিংসের মৃত্যুর পেছনে তাঁর কি কোনো হাত থাকতে পারে না ?'

'হয়তো পারে।'

'চমৎকার। এখন যে লোকটা শয়তানের পূজা করছে সে চার্চ সম্পর্কে ভালো জানে, লাতিন জানে, উপাসনার নিয়মকানুন জানে। কাজেই সে নিজেও এক জন পাদ্রী হতে পাবে। পারে না ?'

'পারে।'

'ফাদার, আপনি তো সবাইকে চেনেন। তারপর আপনি এক জন সাইকিযাট্রিস্ট, নামকরা একজন সাইকিযাট্রিস্ট। আপনার পক্ষে, আমি মনে কবি, কোন্ পাদ্রীটি মানসিকভাবে অসুস্থ তা অনুমান করা খুব সহজ।'

'না, সব সময তেমন অনুমান কবা যায না। মাঝে মাঝে দারুণ অসুস্থ লোকও দিব্যি ভালোমানুষেব মতো ঘুরে বেড়ায। পৃথিবীর সেরা সাইকোলজিস্টদেরও ধবার সাধ্য নেই ওরা অসুস্থ কিনা। এ ছাড়া মিঃ কিন্ডাবম্যান, আমি জানলেও বলব না। ডাক্তারদেব আব ফাদারদের অনেক কিছু গোপন রাখতে হয। আমাদের কিছু নীতি মেনে চলতে হয।'

'এব ফলস্বরূপ অসুস্থ ব্যক্তিবা আবার অপবাধ করাব সুযোগ পায, পায না?'

ফাদার চুপ করে রইলেন।

'বলুন, পায না ?'

'তা হযতো পায।'

কিন্ডাবম্যান দৃঢ় স্বরে বলল, 'কিছুদিন আগে ক্যালিফোর্নিযায এক জন সাইকিযাট্রিস্টেব ছয বছরের জেল হযেছে। কারণ সে তাব এক জন বোগী সম্পর্কে পুলিশকে কোনো তথ্য দেয় নি। পত্রিকায আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন খববটা।'

'আমাকে ভয দেখাচ্ছেন ?'

'ছি ছি, ফাদার। ভয দেখাব কি — আপনি আমাকে লজ্জায ফেললেন।'

'ফাদাবেব কাছে কেউ যদি 'কনফেশন' করে তাহলে ফাদারবা তা গোপন বাখতে পারেন। আইন তাঁদের সে অধিকাব দিয়েছে।'

'নিশ্চযই, নিশ্চযই।'

'আমি মনে করি, মানুষের একটা আশ্রয় থাকা প্রযোজন — যেখানে সে নির্ভযে তার অপরাধ স্বীকার করে মন হাল্‌কা কবতে পাবে।'

'কিন্তু ফাদার, অপরাধ স্বীকাব কবাব পরও তো একজন আবার অপরাধ করতে পাবে। আমাদের কি উচিত নয় ওদের খুঁজে বের করা ?'

'অবশ্যই উচিত। তবে, মিঃ কিন্ডাবম্যান, আমি এ বকম কাউকে চিনি না। চিনলেও আপনাকে বলতাম না। আমাদের উর্ধ্বতনকে জানাতাম।'

'আচ্ছা, ফাদার, আপনি তো অনেককেই নিয়মিত দেখছেন। ওদেব দিকে, মানে পাদ্রীদের দিকে একটু লক্ষ রাখবেন কি ?'

'মিঃ কিন্ডারম্যান, উপাসনার দাযিত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দেযা হয়েছে। অনেকের সঙ্গে এখন আমার আর দেখা হয না।' কিন্ডারম্যান কী একটা বলতে গিযেও থেমে গেল। তাবপব হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'আপনি কি সিনেমা দেখেন ফাদাব ?'

'দেখি।'

'লিযার দেখেছেন ?'

'না।'

'আমার সঙ্গে যাবেন ছবি দেখতে? একা একা ছবি দেখতে আমার ভালো লাগে না একটুও। আমার স্ত্রী আবার সঙ্গে যেতে চায় না। অথচ আমার ইচ্ছে করে কাউকে সঙ্গে নিয়ে দেখি। যাবেন, ফাদার?'

'কবে ?'

'সে আমি ঠিক করব। আমি ঠিক করে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'বেশ তো। আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন ?'

'না, না।'

'আমি কি যেতে পারি এখন ?'

'নিশ্চয়ই। তবে ফাদার, আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস নিতে চাই।'

'কী ?'

'হলি ট্রিনিটিতে একটা টাইপ করা কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। অনেক অশ্লীল কথাবার্তা লেখা, সেই কাগজটা —'

'কী করবেন সেটা দিয়ে? আঙুলের ছাপ তো পাবেন না। অনেকের হাত পড়েছে তাতে।'

'তবু একটু দেখতে চাই।'

'বেশ তো, আসুন আমার সঙ্গে।'

সন্ধ্যা সাতটা তেইশ মিনিটে কিন্ডারম্যান একটা স্পেকটোগ্রাফিক অ্যানালিসিস কবল। দেখা গেল, যে রং রেগানের বানানো পাখিতে ছিল, সেই রংই শযতান উপাসকরা মাতা মেরির গাযে মাখিয়েছে।

রাত আটটা সাতচল্লিশ মিনিটে কার্লকে দেখা গেল শহরের একটা বস্তি অঞ্চল থেকে চুপিসারে বেরোতে। মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে সে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এসে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর হঠাৎ হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। তাব আশপাশে কেউ ছিল না। লেফটেন্যান্ট কিন্ডারম্যান তখন ছবি দেখছিলেন মাইল খানেক দূরের একটা প্রেক্ষাগৃহে।

৬

মে মাসের ১১ তাবিখ বুধবার বিকাল তিনটায রেগানকে ডেটন থেকে ফিরিযে আনা হল। ডাক্তাররা রেগানের ঘরেব বড় জানালাটা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিল। আর ঘর থেকে সরিযে নিল সবগুলো আয়না ও কাচের জিনিস।

ডাঃ ক্লীন এসে অনেকক্ষণ ধরে ক্রিসকে শেখালেন কীভাবে নাকের ভেতর নল দিযে খাবার খাওয়াতে হয। এখন রেগানের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে এই পদ্ধতি ছাড়া খাবার খাওয়ানোর অন্য উপায় নেই। ডাঃ ক্লীন বললেন, 'মিসেস ম্যাকনীল, লক্ষ রাখবেন তরল খাবার যেন ফুসফুসে চলে না যায। খুব সাবধানে ব্যবহার করবেন এটা।'

ডাঃ ক্লীন চলে যেতেই ক্রিস তার এজেন্টকে ফোন করল। জানিযে দিল, ছবি পরিচালনার দায়িত্ব সে এখন নিতে পারবে না। মিসেস জো পেরিনকেও ফোন করল ক্রিস, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না।

কার্ল শক্ত নাইলনের দড়ি দিযে বিছানার সঙ্গে রেগানকে বাঁধল। তার মুখ তখনো অভিব্যক্তিহীন। এক সময় শুধু বলল, 'ম্যাডাম, আমাদের রেগান কি ভালো হবে ?'

ক্রিস তার কোনো উত্তর দিল না।

কার্লের মধ্যে রেগানের জন্যে গাঢ় মমতা আছে। ক্রিস দেখেছে, কার্ল প্রায় সাবাক্ষণই রেগানের ঘরে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

ক্রিসের জীবনযাত্রা সঙ্গত কারণেই বদলে গেছে। তার অনুভূতিগুলো কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে ইদানীং। বসার ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে এক সময ভাবল, বাইবেল পড়লে কেমন হয় ? কিন্তু ঘরে বাইবেল নেই। ধর্মীয কোনো কিছুই নেই। ক্রিস অলস চোখে তাকাল বইয়ের তাকের দিকে — একী! মেবি জো-ব পাঠানো বইটা এখানে কেন? এটা না তার শোবার ঘরে ছিল!

ক্রিস তাক থেকে বইটা নামিয়ে আনল। এখানে কে আনল এটা ?

শ্যারনকে ডেকে এ কথা সে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কবেই ক্রিস বইটাব প্রসঙ্গ তুলল। 'বইটা পড়েছ ?'

'না, এ ধরনেব বই পড়তে আমার ভালো লাগে না। ভূত-প্রেতেব বই আমি পড়ি না। রাতে ঘুম হয় না — বিচ্ছিরি লাগে।'

বই হাতে ক্রিস উপরে উঠে গেল।

'কার্ল, কার্ল!'

'কী হযেছে, ম্যাডাম ?'

'এই বইটা কি তুমি বসার ঘরে রেখেছ ?'

'না, ম্যাডাম।'

'উইলি কোথায ?'

'বান্নাঘরে। ডিনার তৈবি কবছে।'

নিচে নেমে এল ক্রিস। তাব মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। হযতো বেগান পড়েছে এই বই, বেরিঞ্জাব ক্লিনিকেব ডাক্তারবা যা বলেছেন হযতো তাই সঠিক। রেগান সম্ভবত এই অবস্থায এসেছে অটোসাজেশনেব মাধ্যমে। এই বইটাই হযতো সবকিছুব মূলে।

'উইলি?'

'ম্যাডাম।'

'এই বইটা কি তুমি বসাব ঘবে বেখেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায পেয়েছিলে এটা ?'

'রেগানের শোবার ঘরে।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম। রেগানেব ঘরেব মেঝেতে পড়ে ছিল। ঘব পবিষ্কাব করতে গিযে হঠাৎ দেখলাম।'

'ঠিক আছে, যাও।'

উইলিকে বিদায দিযে চিন্তিত মুখে ক্রিস বইটা নিযে বসল। ডাইনীতন্ত্র। ভূতে পাওয়া। শযতানেব উপাসনা। অনেকগুলো অধ্যায আছে বইটিতে। মিসেস জো পেবিন এই বইটা তাকে পড়তে দিলেন কেন ?

'ক্রিস!'

'কি ?'

'ডিটেকটিভ মিঃ কিন্ডারম্যান তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।'

'ওকে চলে যেতে... না, না, আসতে বল শ্যারন, আসতে বল।'

'মিসেস ম্যাকনীল।'

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

'কেমন আছেন আপনি ?'

'ভালো। ধন্যবাদ।'

'আর আপনার মেয়ে ? সে কেমন আছে ?'

'আগের মতোই।'

'আ–হা, বড় দুঃখের ব্যাপার। বাচ্চা–কাচ্চার শরীর খারাপ থাকলে কেমন লাগে আমি জানি। আমার মেয়ে রুথের যখন অসুখ হল, ওহ্ . . .'

'দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? বসুন।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। অবশ্যি আপনি ব্যস্ত থাকলে আরেকদিন আসতে পারি। কোনো তাড়া নেই আমার।'

'না, ব্যস্ত না। কী যেন বলছিলেন ?'

'রুথের কথা বলছিলাম। আমার বড় মেয়ে। থাক সেসব। আবেকদিন বলব। আপনি ব্যস্ত। আমার নিজের জীবনের কথাই বলব। অদ্ভুত। আপনি ইচ্ছা কবলে একটা ছবি বানাতে পারেন। আমার মাযের কথাই ধরুন। তাঁর জন্যে আমরা সপ্তাহে ছদিন গোসল করতে পারতাম না। গোসল হত শুধু শুক্রবারে। বাকি ছদিন গোসল বন্ধ। বলতে পারেন কেন ?'

'ভারি আশ্চর্য তো! কেন ?'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যের ব্যাপাবই। ওই ছদিন আমার মা বাথটাবে একটা কাতলা ছেড়ে রাখতেন। জ্যান্ত মাছ। তাঁর ধারণা ছিল, মাছটা বাথটাবেব সব দূষিত জিনিস খেয়ে ওটাকে জীবাণুমুক্ত রাখবে। এখন আপনি বুঝুন অবস্থাটা।'

ক্রিস কোনো কথা বলল না। কিন্ডারম্যানের দিকে তাকিযে রইল। কেমন বিমূঢ় ওব চাহনি। কিন্ডারম্যান কিন্তু হঠাৎ উৎসাহী হয়ে নড়েচড়ে বসল। 'মিসেস ম্যাকনীল, আপনাব হাতের এই বইটা প্রেতপূজার ওপর লেখা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো ছবির গল্পের জন্যে পড়ছেন ?'

'না, এমনি।'

'বইটা ভালো ?'

'মিঃ কিন্ডারম্যান, আপনি ঠিক কী জন্যে এসেছেন বলুন তো ?'

'এই দেখুন কিচ্ছু মনে থাকে না। আসল কথাই ভুলে গেছি। তবে তেমন কিছু না, এই যা। না এলেও হত, কিন্তু...'

'কিন্তু কী ?'

কিন্ডারম্যান প্রসঙ্গ পাল্টে হঠাৎ শ্যারনের দিকে তাকিযে বলল, 'আপনার সঙ্গে বোধহয আমার পরিচয হয নি।'

'আমি শ্যারন স্পেনসার। ক্রিসের সেক্রেটারি।'

'খুব আনন্দ হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে মিস স্পেনসার। আমি আবাব লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পছন্দ করি। বকবক করা আমার স্বভাব।'

'কিছু জিজ্ঞেস করতে চান আমাকে ?'

'মিঃ ডেনিংসকে এ বাড়িতে রেখে আপনিই তো ওষুধ আনতে গিযেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

তাঁকে একা রেখে গিয়েছিলেন ?'

'না, একা নয়, রেগান ছিল।'

'তাঁকে রেখে কখন আপনি ঘর ছেড়ে যান? '

'সাড়ে ছটা হবে। তখন টিভির ছনম্বর চ্যানেলে খবর হচ্ছিল।'

ক্রিস হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'আপনি এতসব জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

'একটা হিসাব মিলছে না, মিসেস ম্যাকনীল। তাই খোঁজখবর নিতে হচ্ছে। যেমন ধরুন, মিঃ ডেনিংস আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখা না করেই দশ মিনিটের মধ্যে চলে গেলেন অথচ ঘরে তখন গুরুতর অসুস্থ একটা মেয়ে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয় ?'

ক্রিস শুকনো গলায় বললেন, 'বার্ককে তো আপনি জানেন না, ও খুব খামখেয়ালী।'

'মিসেস ম্যাকনীল, আরো একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে।'

'বলুন।'

'মিঃ ডেনিং এ শহরে তাঁর গাড়ি নিয়ে আসেন নি। আমি খোঁজ নিয়েছি, তিনি কোথাও যেতে হলে সব সময় টেলিফোন করে ট্যাক্সি আনেন। ঠিক না ?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'কাজেই তাঁর উচিত ছিল এখান থেকে ট্যাক্সির জন্যে ফোন করা। কিন্তু প্রতিটা ট্যাক্সি কোম্পানিতে খোঁজ নিয়েছি এ রকম কোনো রেকর্ড তাদেব কাছে নেই।'

ক্রিসের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। কিন্ডারম্যান ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে, মিসেস ম্যাকনীল।'

'জটিল ?'

'প্যাথলজিস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী মিঃ ডেনিংসের মৃত্যু দুর্ঘটনার জন্যে হলে হতেও পাবে। কিন্তু...'

'আপনি কি বলতে চান ওকে খুন করা হয়েছে ?'

কিন্ডাবম্যান আমতা-আমতা কবে বলল, 'আমি বুঝতে পাবি, সমস্ত ব্যাপারটাই আপনার জন্যে অত্যন্ত দুঃখজনক।'

'হোক দুঃখজনক, আপনি বলে যান।'

'মিঃ ডেনিংসের মৃতদেহ পরীক্ষা করলে প্রথমে মনে হয় কেউ যেন ওকে... তার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

শ্যারনের দিকে ফিরল কিন্ডারম্যান। 'মিস স্পেনসার, আপনি যখন ওষুধ আনতে যান তখন মিঃ ডেনিংস কি রেগানের ঘবে ছিলেন ?'

'না, বসাব ঘরে।'

'এমন কি হতে পারে না যে তিনি এক সময় উঠে গিয়েছিলেন রেগানের ঘরে?'

'এই কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন ?' ক্রিস শুকনো গলায় বলল।

'আপনাব মেয়ের হয়তো মনে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করতে পারলে...'

'আমি তো আপনাকে আগেও বলেছি সে অত্যন্ত অসুস্থ, তাকে ঘুম পাড়িয়ে বাখা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা ঠিক। আগেই বলেছেন।'

'আপনি এতসব জিজ্ঞেস করছেন কেন ? বলুন তো ?'

'মিসেস ম্যাকনীল, একটা নতুন সম্ভাবনার দিকে আমার চোখ পড়েছে। এমন কি হতে পারে না যে মিঃ ডেনিংস সেদিন খুব বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিলেন আব ওই অবস্থায় আপনাব

মেয়ের ঘরে হাজির হলেন, তারপর সেখান থেকে জানালা দিয়ে নিচে পড়ে মারা গেলেন — হতে পারে না এ রকম ?'

'না। প্রথমত, জানালাটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বার্ক কখনো বেসামাল মাতাল হত না, যদিও প্রচুর মদ খেত।'

'তাই কি ?'

'হ্যাঁ। ছবি পরিচালনার সময় সে থাকত পাঁড় মাতাল, কিন্তু তাতে ছবি পরিচালনায় কোনো অসুবিধা হত না।'

'আচ্ছা বেশ, তাহলে বলুন ওই রাতে কি অন্য কারো এ বাড়িতে আসার কথা ছিল ?'

'না।'

'আপনার এমন কোনো বন্ধু কি নেই যে খোঁজখবর ছাড়াই হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় ?'

'এ রকম বন্ধু আমার এক জনই — বার্ক।'

কিন্ডারম্যান গম্ভীর মুখে মাথা চুলকাতে লাগল। তারপর নিচু গলায় হেসে বলল, 'মিসেস ম্যাকনীল, পুরো ব্যাপারটাই জট পাকিয়ে গেছে। আমি বলতে গেলে অথৈ সমুদ্রে পড়ে গেছি। এক জন লোক এল আপনার সঙ্গে দেখা করতে। পনের মিনিট অপেক্ষা করেই, অত্যন্ত অসুস্থ একটা মেয়েকে ঘরে একা ফেলে সে চলে গেল! আশ্চর্য নয় কি ?'

ক্রিস কথা বলল না। কিন্ডারম্যান গলার স্বর আর এক ধাপ উঁচুতে তুলে বলল, 'আমার কী মনে হয় জানেন ? এক জন অত্যন্ত বলশালী লোক মিঃ ডেনিংসকে খুন করেছে। তারপব আপনার মেয়ের ঘরের জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছে।'

ক্রিস বিবর্ণ হয়ে গেল। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমল তার কপালে।

'এই জন্যেই আমি জিজ্ঞেস করছি। মিসেস ম্যাকনীল, কে আসতে পাবে? ভালো কবে চিন্তা করুন।'

'না, না, এখানে আমার খোঁজে কেউ আসে না।'

'কার্ল বা উইলি — তাদের খোঁজেও কেউ আসে না ?'

'না, ওদের কোনো পরিচিত লোকজন নেই। ওরা নিজেদের মতো থাকে।'

'তা এমনও তো হতে পারে — কেউ কিছু হয়তো দিতে এসেছে, একটা পার্সেল কিংবা দোকানেব কোনো অর্ডার ?'

'তাতে কী ?'

'হয়তো কোনো একটা কারণে সেই পিযন বা মেসেঞ্জারের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল মিঃ ডেনিংসের। তাঁর মেজাজ, আমি যতদূব খবর নিয়েছি, খুবই উগ্র ধরনের ছিল। মিসেস ম্যাকনীল, এমন কেউ কি এসেছিল?'

'আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, আপনি কার্লকে বরং জিজ্ঞেস করতে পারেন। ডাকব কার্লকে।'

'না থাক। উঠব এবার, ঘরে আপনার অসুস্থ মেয়ে। তাকে অবশ্য দুএকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারলে... খুবই মামুলি কথা...'

'কোনো কথা বলার অবস্থা আমার মেয়ের নেই।'

'হ্যাঁ, খুব দুঃখের ব্যাপার। আচ্ছা মিস স্পেনসার, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। আজ উঠি। গুড নাইট।'

'গুড নাইট, মিঃ কিন্ডারম্যান।'

ক্রিস বলল, 'আসুন আপনাকে এগিয়ে দেই...।'

'না, না, তার কোনো দরকার নেই।'

দরজা পর্যন্ত গিয়ে কিন্ডারম্যান হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মুখে লজ্জিত ভঙ্গি। 'মিসেস ম্যাকনীল, একটা অনুরোধ করতে চাই আপনাকে, যদি কিছু মনে না করেন।'

'না, মনে করার কিছু নেই। বলুন।'

'মানে... আমার মেয়ের জন্যে একটা অটোগ্রাফ...'

সংকোচের সঙ্গে কাগজ ও কলম বের করল কিন্ডারম্যান। ক্রিস হাসিমুখে বলল, 'বলুন, আপনার মেয়ের নাম কি?'

'মিসেস ম্যাকনীল...আসলে হয়েছে কি...মানে আপনাকে সত্যি কথাই বলি... অটোগ্রাফটা আমি নিজের জন্যেই চাইছি। আমি আপনার এক জন ফ্যান...আপনার 'এনজেল' ছবিটা আমি ছবার দেখেছি।'

ক্রিস খসখস করে লিখল, 'উইলিযাম কিন্ডারম্যানের জন্যে ভালাবাসা', তারপর নাম সই করল।

'মিসেস ম্যাকনীল, আপনি না, খুব ভালো! আচ্ছা চলি, গুড নাইট।'

ক্রিস দরজা বন্ধ করেছে, তখনই কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে ক্রিস দেখে কিন্ডারম্যানই দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় চুলকে কিন্ডারম্যান বলল, 'মিসেস ম্যাকনীল, ইযে... মানে... লজ্জার মাথা খেয়ে আবার বিরক্ত করতে হচ্ছে! একটা কথা মনে পড়ে গেল কিনা, তাই...'

'বলুন।'

'আপনার ওই কার্লের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। কোনো পার্সেল-টার্সেল এসেছিল কিনা এই ব্যাপারে একটু নিঃসন্দেহ হওয়া আর কি! জিজ্ঞেস না করলে বুকের মধ্যে কেমন খচখচ করবে। অবশ্য জানি কেউ আসে নি তবু...'

'আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি কার্লকে ডেকে দিচ্ছি।'

'না, না, আমি বসব না। চট করে কথাটা জিজ্ঞেস কবেই চলে যাব। আপনাকে আর কষ্ট করে থাকতে হবে না। প্লিজ!'

'ঠিক আছে।'

কার্ল এল প্রায সঙ্গে সঙ্গে, তাব মুখ যথারীতি ভাবলেশহীন, তবে চোখেব দৃষ্টি অস্বাভাবিক শীতল।

'মিঃ কার্ল এঙ্গস্ট্র্ম?'

'বলুন।'

'আইন মোতাবেক আপনি আমার কথাব জবাব ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে এক জন এটর্নির মাধ্যমেও আমাব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।'

'কী জানতে চান, বলুন।'

'আপনি যা বলবেন, প্রয়োজন হলে তা আমি কোর্টে আপনার বিপক্ষে ব্যবহাব করতে পারি। ঠিক আছে?'

ঘাড় নাড়ল কার্ল।

'আপনি আগে বলেছিলেন এপ্রিলের আটাশ তারিখ রাতে মিঃ ডেনিংসের মৃত্যুর সময আপনি ছবি দেখছিলেন ক্রেস্ট সিনেমা হলে।'

'হ্যাঁ।'

'কখন সিনেমা হলে ঢুকলেন ?'

'ঠিক মনে নেই।'

'কিন্তু আগে বলেছিলেন ছটার সময ঢুকেছেন।'

'হ্যাঁ ছটার সময়ই হবে।'
'আপনার ছবিটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন ?'
'হ্যাঁ।'
'ছবি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হল থেকে বেরিয়ে আসেন ?'
'হ্যাঁ।'
'আগে বেরোন নি তো? মনে করে দেখুন —'
'না, পুরো ছবিটাই দেখেছি।'
'কখন ফিরে আসেন বাড়িতে ?'
'ঠিক সাড়ে নটায়।'
'আর আপনি বলছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিটা দেখেছেন ?'
'হ্যাঁ। আমি তো বললামই।'
'দেখুন মিঃ কার্ল, আপনার সমস্ত কথাবার্তা আমি টেপ করছি। কাজেই ঠিকঠাক বলাই ভালো।'
'আমি ঠিকঠাক বলছি।'
'তাহলে আপনাব নিশ্চয়ই মনে আছে, ছবি শেষ হওযার মিনিট দশেক আগে একটা লোক হলে বেশ হৈচৈ করেছে ?'
'মনে আছে।'
'হৈচৈ এর কারণটা বলতে পারেন ?'
'মাতাল ছিল লোকটা।'
'তাকে কী করা হয় তখন ?'
'বের করে দেযা হয়।'
'ছবি শেষ হয কখন ?'
'ঠিক আটটায।'
'তার আগে নয় ?'
'না, ঠিক আটটায়।'
কিন্ডারম্যান সিগারেট ধরিযে এবাব ঠাণ্ডা চোখে তাকাল কার্লেব দিকে। দেখল মূর্তির মুখের মতো অভিব্যক্তিহীন একটা চেহারা।
'মিঃ কার্ল?'
'বলুন।'
'ও রাতে সিনেমা হলে কোনো গণ্ডগোল হয নি। আমি আপনাকে ঘটনাটা বানিযে বললাম। আপনার কিছু বলার আছে?'
'না।'
'হলের প্রজেকশন রুমের লগবুক আমি পরীক্ষা করেছি। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে ওই রাতে ছবি শেষ হয়েছে আটটা পনেরয। কাজেই ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখে থাকলে ঠিক সাড়ে নটায় আপনি ফিরতে পারেন না।'
কার্ল বরফশীতল চোখে তাকিয়ে রইল, কোনো জবাব দিল না।
'মিঃ কার্ল ?'
'বলুন।'
'কোথায় ছিলেন ওই রাতে ?'
'আমি ছবি দেখছিলাম।'

কিন্ডারম্যান হাসিহাসি মুখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কার্লের দিকে। কার্ল ফিসফিস করে বলল, 'আপনি কি আমাকে অ্যারেস্ট করবেন ?'

'না, এত সহজে কাউকে অ্যারেস্ট করি না আমি। গুড নাইট, মিঃ কার্ল।'

'গুড নাইট।'

'বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে, কি বলেন ?'

'হ্যাঁ।'

দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল কিন্ডারম্যান।

বাত দশটার মতো বাজে। শ্যারন ঘুমাতে গেছে। রেগানের ঘরের বাইরে এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল কার্ল। সে-ও এক সময় নিজের ঘরে চলে গেল। ক্রিস পরপর দুপেয়ালা কফি খেয়েছে। না, ঘুম আসছে না কিছুতেই। রেগানের ঘরও সাড়াশব্দহীন। তার মানে এখনো জেগে ওঠে নি ও। ডাক্তারের কথাই ঠিক, রেগান আজ রাতে আর জাগবে না।

রাত এগারটার দিকে ক্রিস মেয়েকে দেখতে গেল। ঘরের ভেতর নীল আলো। ভয়ানক নীববতা। বাতাস কেমন যেন ভারি হয়ে আছে। ক্রিস মৃদুস্বরে ডাকল, 'রেগান, মামণি।'

কোনো সাড়া নেই।

ক্রিস খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে ঠিক তখনই ভারি গলায় কে যেন ডাকল, 'চলে যাচ্ছ কেন? এস, ফিরে এস, ময়না সোনা চাঁদের কণা।'

কয়েক মুহূর্ত ক্রিস স্পষ্টভাবে কিছু চিন্তাও করতে পাবল না। বার্ক ডেনিংসেব গলা ভেসে আসছে বেগানের ঘর থেকে —। কিন্তু তা কী করে সম্ভব!

'আমি তোমার মেয়ের সঙ্গেই আপাতত আছি। যাব কোথায় বল? কী হল, ভেতরে আসছ না কেন ?'

ক্রিস বিকৃত স্ববে ডাকল, 'কার্ল, কার্ল!'

'আহ, আবার কার্লকে ডাকা কেন ? ভয় লাগছে ? ভয়ের কিছু নেই।'

ক্রিস খোলা ঘরেব দিকে তাকাল। বেগানের কাত হয়ে থাকা মাথাটা দেখা যাচ্ছে। ও কি জেগে আছে ? খুটখুট কবে শব্দ হল। কীসের শব্দ? ক্রিস তাকাল বন্ধ জানালার দিকে। তখনই চোখে পড়ল ওটা, কিন্তু কী ওটা ?

চিৎকার করে উঠল ক্রিস, আর ওই চিৎকাবের মধ্যেই জ্ঞান হাবাল। —

অতল গহ্বর

ক্রিস একজনেব জন্যে অপেক্ষা করছিল।

অফিস ছুটির সময়। সবাই ঘরে ফিরছে, রাস্তাঘাটে প্রচণ্ড ভিড়। ক্রিস এমন ভাবভঙ্গি করছে যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে সে কারো জন্যে অপেক্ষা করছে।

এক জনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ওর দিকে। কিন্তু এ সে নয়। যে আসছে সে কিছুতেই ফাদার ডেমিয়েন কারাস হতে পারে না। লোকটার পরনে আধময়লা খাকি প্যান্ট। গায়ে নীল রঙের সোয়েটার। সে ক্রিসের দিকে বারবার তাকাচ্ছে।

যে জায়গাটায় ক্রিস দাঁড়িয়ে আছে তা নদীর পারে, অপেক্ষাকৃত নির্জন। কিন্তু লোকটা এমনভাবে দ্রুত পা ফেলে আসছে যে ক্রিসের আশঙ্কা হল, তার মতলব ভালো না-ও হতে পারে।

'আপনি মিসেস ম্যাকনীল? আমি ফাদার ডেমিয়েন কারাস।'

নিজেকে সামলাতে ক্রিসের একটু সময় লাগল। তাড়াতাড়ি সানগ্লাস খুলে ফেলল। প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল ভেবে এখন ওর দারুণ লজ্জা লাগছে।

'আমাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে ভয় পেয়েছিলেন নাকি?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারি নি আপনি ফাদার কারাস।'

'তাই? আমি অবশ্য ইচ্ছা করেই পাদ্রীদের পোশাকটা পরে আসি নি। আপনি বলেছিলেন গোপনে কথা বলতে চান, সেজন্যেই....'

'ফাদার কারাস, আপনাকে আগে এক দিন আমি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দেখেছি। তব আজ চিনতে পারি নি। আপনার কাছে সিগারেট আছে?'

'আছে, ফিল্টার ছাড়া, চলবে?'

'আজ আমি যে কোনো সিগারেট খেতে পারি।'

'মিসেস ম্যাকনীল, হঠাৎ কী দরকার পড়ল আমার — যা আবার খুব গোপনীয়?' কারাস সিগারেট বের করলেন।

'শুনলাম আপনি এক জন নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট।'

'ঠিকই শুনেছেন। নামকরা কিনা জানি না, তবে সাইকিয়াট্রিস্ট।'

'আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন?'

'হার্ভার্ড আর জন হপকিন্সে, তারপর বেলেভ্যুতে।'

'আশ্চর্য তো! আমি কিন্তু আপনাকে একজন সাধারণ পাদ্রীই মনে করেছিলাম!'

'আমি আসলে তাই, মিসেস ম্যাকনীল।'

'আপনি ফাদার ডায়ারকে চেনেন?'

'হ্যাঁ, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'তিনি আমার বাড়িতে এক দিন এসেছিলেন।'

ডেমিয়েন কারাস জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। ক্রিস থেমে থেমে বলল, 'তিনি কি আমাব বাড়ির পার্টি সম্পর্কে কিছু বলেছেন আপনাকে?'

'না তো!'

'আমার মেয়ের সম্বন্ধে কিছু?'

'না। আমি জানিই না আপনার কোনো মেয়ে আছে।'

'ফাদাররা তাহলে সত্যি সত্যি মুখ বন্ধ করে রাখতে পারেন!'

'সবাই পারেন না, কেউ কেউ পারেন।'

'ফাদার কারাস, কেউ যদি আপনার কাছে গোপন কিছু বলে আপনি কি তা গোপন রাখেন?'

'তা রাখি।'

'আচ্ছা ফাদার, ধরুন, এক জন খুব খারাপ লোক, এক জন খুনী —সে যদি আপনার কাছে সাহায্যের জন্যে আসে, তাহলে কি তাকে সাহায্য করবেন?'

'কী ধরনের সাহায্য?'

ক্রিস আচমকা বলল, 'কারো ওপর যদি শয়তান বা পিশাচের ভর হয় তাহলে কী করে তাড়ানো যায় জানেন?'

'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ধরুন, কারো ওপর শয়তানের আছর হয়েছে।'

'মিসেস ম্যাকনীল, এসব আজকাল হয় না।'

'হয় না? কখন থেকে হয় না ?'

'যখন থেকে আমরা জানতে পারলাম যে মানসিক অসুখ বলে একটা জিনিস আছে।'

ক্রিসের চোখে-মুখে হতাশার ভাব জাগতে দেখে ফাদার কারাস যেন অবাক হলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'আজকাল অনেক ফাদার শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। শয়তানে বা পিশাচে পাওয়া বিশ্বাস করা তো অনেক দূরের ব্যাপার।'

'আপনি কি সত্যি সত্যি এক জন পাদ্রী ? বাইবেলে তো মানুষের ওপর শয়তানের ভর হওয়ার অনেক অনেক কাহিনী আছে। প্রভু যীশুখ্রীস্ট সেসব শয়তান তাড়িয়েছেন।'

'মিসেস ম্যাকনীল, আসলে ওদের স্কিজোফ্রেনিয়া ছিল। শয়তান বা পিশাচের কোনো ব্যাপার নয়।'

ক্রিস আচমকা বলে ফেলল, 'ফাদার কারাস আমার একমাত্র মেয়ের ওপর পিশাচের ভর হয়েছে। আপনি কি কোনোভাবে এই পিশাচকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতে পারেন ?'

'আপনি এক্সরসিজমের কথা বলছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না এক্সরসিজমে ভালোর চেয়ে মন্দ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'কেন ? মন্দ হবে কেন ?'

'এক্সরসিজমের পুরো ব্যাপারটাই দারুণ সাজেসটিভ। মনের ওপর খুব প্রভাব ফেলতে পারে। তাছাড়া গির্জার অনুমতি প্রয়োজন। সে অনুমতি সহজে পাওয়া যাবে না। প্রথমে ওরা নিশ্চিত হতে চাইবে যে সত্যি আপনার মেয়েকে পিশাচে পেয়েছে। সেটা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।'

'আপনি কি এক্সরসিজম করতে পারেন ?'

'পারি। সব ফাদারই পারেন। তবে গির্জার অনুমতি লাগবে। তাছাড়া হবে না।'

'আপনি কি একবার দেখবেন আমার মেয়েকে প্লিজ ?'

'নিশ্চয়ই দেখব। এক জন সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে দেখব।'

'ফাদার কারাস, আমি অনেক সাইকিয়াট্রিস্ট আর ডাক্তার দেখিয়েছি। এখন আমার এক জন ফাদারের সাহায্য চাই। ফাদার, প্লিজ!'

ফাদার কারাসকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ক্রিস হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত স্বরে কারাস বললেন, 'চলুন, আপনার মেয়েকে দেখে আসি।'

ডেমিয়েন কারাস নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলেন। বাড়ির সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। একটা কিছু যেন অনুভব করলেন। সারা শরীর তাঁর ঝিমঝিম করে উঠল। কিছু একটা... কিছু একটা আছে!

সিঁড়ি দিয়ে রেগানের ঘরের দিকে উঠতে উঠতে যেন অপার্থিব কোনো কণ্ঠ শুনলেন কারাস। ভারি গম্ভীর গলা। ঘৃণা আর ক্রোধ মেশানো। ভ্রূ কুঁচকে গেল তাঁর। কিন্তু তারপরই হাসির শব্দ। হা-হা শব্দে হাসি। শ্লেষ্মা জড়ানো বৃদ্ধের ক্রূর হাসি।

কার্ল দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল ফাদার কারাসের দিকে। ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এক জন ফাদার ?'

'হ্যাঁ।'

'যান, ভেতরে যান। দেখুন।'

কারাস ক্রিসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভদ্রলোকটি কে? আপনার মেয়ের সঙ্গে যে কথা বলছে?'

'ও ঘরে ভদ্রলোক টদ্রলোক কেউ নেই। রেগান একাই আছে। আপনি যান, আমি যাচ্ছি না।'

ফাদার কারাস দরজার হাতল ধরতেই ভেতরের সমস্ত শব্দ থেমে গেল। সুনসান নীরবতা। ঘরের ভেতরে ঢুকে অনেকক্ষণ ফাদার কারাস কোনো কথা বলতে পারলেন না।

কংকালসার যে আকৃতিটা বিছানায় দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই কি বার বছরের রেগান? এ তো এক বৃদ্ধার কুৎসিত অবয়ব! তবে চোখ দুটো চকচক করছে। তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে। সেই দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি খুব স্পষ্টভাবেই দেখা যায়, কিন্তু কী ভয়ংকর চাহনি!

ফাদার কারাস বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে নরম সুরে বললেন, 'কেমন আছ, রেগান?'

কারাস চেয়ার টেনে রেগানের সামনে বসলেন। আগের মতোই রেগান তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে তাঁকে দেখছে।

'আমি তোমার মায়ের এক জন বন্ধু। তোমার মা বললেন, তুমি একটু অসুস্থ। তাই তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

রেগানের মুখে বিদ্রুপের হাসি দেখা গেল। যেন বহু কষ্টে সে নিজেকে হা-হা অট্টহাসি থেকে বিরত রাখছে।

রেগান বলল, 'শেষ পর্যন্ত তোমাকে ধরে এনেছে?'

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে সাহায্য করার জন্যে এসেছি।'

'ভালো। আমার কিছু সাহায্য দরকার এই মুহূর্তে। দড়ির বাঁধনগুলো খুলে দাও তো দেখি।'

'ওগুলো খুব কষ্ট দিচ্ছে বুঝি?'

'কষ্ট-টষ্ট না, বিরক্তিকর ব্যাপার। মহা বিরক্তিকব।'

'বাঁধন খুললে তুমি নিজেকে ব্যথা দিতে পার, রেগান।'

'আমি রেগান নই।'

'ও, তুমি রেগান নও? আমি বুঝতে পারি নি। আমাদেব পরিচয় হয নি। আমার নাম ডেমিয়েন কারাস। তোমার নাম?'

'আমি পিশাচ। শয়তানও বলতে পার।'

'ভালো, খুব ভালো। একজন পিশাচের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। তাহলে কিছু কথাবার্তা বলা যাক।'

'কথা বলতে চাও বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো। কথা বলব। কিন্তু এ রকম বাঁধা অবস্থায় আমি কথা বলতে পারি না। কথা বলার সময় হাত-পা নাড়ানো আমার পছন্দ। পুরানো অভ্যেস। এখন দযা কবে বাঁধনগুলো খুলবে?'

ডেমিয়েন কারাস কথার বাঁধুনি দেখে অবাক হলেন। চেয়ার নিযে রেগানের কাছে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। তাঁর কৌতূহল ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

'তুমি তাহলে শয়তান?'

'হ্যাঁ, এ বিষয়ে তুমি একশ ভাগ নিশ্চিত থাকতে পার।'

'শয়তান হলে তো তুমি নিজেই দড়ির বাঁধন খুলে ফেলতে পার। শয়তানের ক্ষমতা তো কম নয়। ইচ্ছা করলেই দড়িগুলো তুমি শূন্যে মিলিযে দিতে পার।'

'তা পারি। তবে ক্ষমতাব নমুনা দেখাতে পছন্দ করি না। ব্যাপারটা তাহলে স্থূল হয়ে পড়ে। আমি সব কিছুতেই সূক্ষ্মতা পছন্দ করি। কারণ আমি একজন শিল্পী, বুঝলে ?'

'হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি।'

'তাছাড়া আমি যদি তোমাকে বাঁধন খুলতে না দেই তাহলে একটা সৎকাজ করার সুযোগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করা হয়।'

'শয়তানের কাজই হচ্ছে মানুষকে ভালো কাজ করা থেকে বিরত রাখা। কাজেই তোমার চেষ্টা করা উচিত যাতে আমি কোনোভাবে ভালো কিছু করতে না পারি। তাই না ?'

'হা-হা-হা, ডেমিয়েন কারাস, তুমি দেখছি শেয়ালের মতো ধূর্ত। তা শোন, যদি বাঁধনগুলো তুমি খুলে দাও, তাহলে তোমাকে আমি তোমার ভবিষ্যতেব সব কিছু বলে দেব।'

'ভবিষ্যৎ বলে দেবে ? প্রমাণ কি যে তুমি ভবিষ্যৎ বলতে পার ?'

'আমি শয়তান। আমি পাবি।'

'একটা প্রমাণ দাও।'

'প্রমাণ দিয়েও লাভ হবে না। তোমাব মধ্যে বিশ্বাস খুব কম। তুমি তো ঈশ্বরেও বিশ্বাস কব না।'

কাবাস চমকে উঠলেন। রেগানের ভুরু নাচছে। চোখ দুটো ঝলসে উঠছে বিদ্রূপে। মনের ভাব লুকিয়ে কাবাস সহজভাবে কথা বলে যেতে চেষ্টা করলেন, 'একটা সহজ প্রমাণই নাহয় দেখাও তুমি আমাকে। তুমি যদি শযতান হও তাহলে তো তুমি সব কিছুই জান।'

'উঁহু, সবকিছু না, প্রায সবকিছু। দেখলে তো, আমি আমার অক্ষমতাও স্বীকার কবি।'

'আমি ভাবছিলাম তোমার জ্ঞানের গভীরতাটা পরখ করব।'

'তাব দরকার নেই, আমি নিজে থেকেই বলছি। দক্ষিণ আমেরিকাব সবচেয়ে বড় হ্রদেব নাম টিটিকাকা। সেটা পেরুতে। ঠিক আছে ?'

'না, আমি এমন একটা কিছু জিজ্ঞেস কবব যাব উত্তর শুধু শযতানের পক্ষেই জানা সম্ভব। আচ্ছা বল তো রেগান এখন কোথায ?'

'এখানেই আছে সে।'

'তাকে দেখতে চাই আমি।'

'কেন দেখতে চাও?'

'তাহলে আমি বুঝতে পাবব তুমি সত্যি কথা বলছ।'

'ওহে, ডেমিয়েন কাবাস, তুমি ওর সঙ্গে কিছু করতে টরতে চাও নাকি? তাহলে প্যান্ট খুলে চলে আস না। দড়িগুলো খুলে দাও, তারপর দেখ মজাসে কেমন ফূর্তি হয। বেগানেব সঙ্গে কথা বলে কী করবে? ও কথাবার্তা তেমন পাবে না।'

'তাব মানে তুমি জান না বেগান এখন কোথায। অর্থাৎ শযতান তুমি নও।'

'জানি হে, জানি।'

'তাহলে দেখাচ্ছ না কেন ?'

'আচ্ছা, আরেকটা কাজ কবলে হয না? আমি ববং তোমার মনের কথা বলে দেই ? সেটাও একটা প্রমাণ হবে। এক থেকে দশ পর্যন্ত একটা সংখ্যা ভাব তো মনে মনে, আমি বলে দিচ্ছি।'

'না, ওতে কিছু প্রমাণ হবে না।'

'তা অবশ্যি হবে না। শোন, বাপু কারাস, তোমাকে আমি তেমন কোনো প্রমাণ দেব না। বিশ্বাস আর অবিশ্বাস এই দুয়ের মধ্যে তোমাকে আটকে রাখব আমবা।'

'আমরা বলছ কেন? আর কে আছে তোমাদের সঙ্গে ?'

'এই কুত্তী মাগীটার মধ্যে এখন আমরা অনেকেই আছি। হা-হা-হা। পরে তোমাকে বলব কে কে আছি, তার আগে আমার একটা হাত শুধু খুলে দাও। শরীরে বড্ড চুলকানি হয়েছে। চুলকাতে হবে।'

'জায়গাটা দেখিয়ে দাও, আমিই চুলকে দিচ্ছি।'

'হুঁ, বলেছি না, তুমি শেয়ালের মতো ধূর্ত!'

'বেশ রেগানকে একবার দেখাও, তারপর একটা বাঁধন নাহয় খুলে দেব।'

মুহূর্তের মধ্যে কিছু একটা হল। কারাস দেখলেন, গাঢ় দুঃখ মাখা একজোড়া সজল চোখ। ব্যথাকাতর এক বালিকার ম্লান মুখ। কিন্তু তা মুছে গেল সঙ্গে সঙ্গে, তারপরই শোনা গেল ক্রুদ্ধ গর্জন, 'এখন নিশ্চয়ই বাঁধনটা খুলবে ?'

কারাসের আচ্ছন্নভাব তখনো কাটে নি। রেগানকে দেখা গিয়েছিল কি ? ব্যথায় ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন ওই মেয়েটাই তবে রেগান!

'ফাদার, ফাদার, দয়া করুন! এই পঙ্গুকে দয়া করুন!'

কারাস চমকে তাকিয়ে দেখেন, রেগানের ক্রূর চোখে বিদ্রূপ ঝিলিক দিচ্ছে। কথাটা কোথায় শুনেছেন যেন ? হ্যাঁ, নিউইয়র্ক সাবওয়েতে। লোকটাকে একটা ডলার দিয়েছিলেন তিনি।

'ওহে কারাস, তোমার মা কিন্তু এখানেই আছেন। হা-হা। কোন খবরাখবর থাকলে দিতে পার।'

কারাসের সহজ চিন্তাশক্তিও লোপ পেল। থেমে থেমে কোনোরকমে বললেন, 'আমার মা? উনি যদি এখানে থাকেন তাহলে তুমি তাঁর ডাকনাম নিশ্চয়ই জানবে। বল তাঁর নাম কি? বল!'

'কাছে আস, বলছি।'

কারাস খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

'আরো কাছে, ফিসফিস করে বলব আমি।'

আরো খানিকটা এগুতেই রেগান মুখ ভর্তি করে তাঁর ওপর বমি করল। কারাস নড়লেন না। শান্ত স্বরে বললেন, 'বল, আমার মায়ের নাম বল।'

রেগান খিলখিল করে হাসতে লাগল। কারাস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সহজভাবেই বাথরুম কোন্‌দিকে জানতে চাইলেন। ক্রিস মুখ কালো করে বলল, 'ফাদার, আমি খুব লজ্জিত।'

'লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। আপনার মেয়েকে কি কোনো ঘুমের ওষুধ দেয়া হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ, লিব্রিয়াম।'

'কতটুক করে দিচ্ছেন ?'

'দৈনিক চারশ মিলিগ্রাম।'

'বলেন কী! মিসেস ম্যাকনীল, আমার মনে হয় ওকে কোনো হাসপাতালে রাখা খুব দরকার।'

'তা সম্ভব নয় ফাদার। রেগান একটা মারাত্মক অপরাধ করেছে। বাইরে রাখলেই তা জানাজানি হয়ে যাবে। আমি কিছুতেই সেটা হতে দিতে পারি না।'

'মিসেস ম্যাকনীল, আপনি নিচে গিয়ে বসুন। আমি হাতমুখ ধুয়ে আসছি।'

ফাদার কারাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রেগানের অসুখের সমস্ত ইতিহাস শুনলেন। দুএকটি ঘটনা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইলেন। ক্রিস বলল, 'ওর কী হয়েছে, ফাদার ?'

'একটু কঠিন ভাষায় বলতে হয় — মনের ওপর চেপে থাকা গ্লানি থেকে দ্বৈতসত্তার উদ্ভব ঘটেছে ওর মধ্যে। সেই সঙ্গে মানসিক অসুস্থতাজনিত হিস্টিরিয়া।'

'এসব ফালতু কথা অনেক শুনেছি, ফাদার!'

'আমাদের মানসিক হাসপাতালে যেসব রোগী আছে, তাদের তো আপনি দেখেন নি, আমি দেখেছি। তারা রেগানের চেয়েও অনেক বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা করতে পারে।'

'বেশ, তাহলে ফাদার আপনি বলুন, রেগানের ঘরে যেসব শব্দ হয় সেগুলো কেমন করে হয় ?'

'কই, আমি তো কোনো শব্দ শুনি নি?'

'আপনি না শুনলেও বেরিঙ্গার ক্লিনিকের ডাক্তাররা সবাই শুনেছেন।'

'হয়তো শুনেছেন, কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। একে বলে সাইকোকাইনেসিস।'

'কী ?'

'বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের মধ্যে যদি ঘোরতর মানসিক অস্থিরতা থাকে তাহলে এসব হতে দেখা যায়। কোনো অজানা শক্তি এর মূলে আছে, তবে তা ভৌতিক কিছু নয়।'

'রেগানের অবস্থা নিজের চোখে দেখেও এইসব বলছেন ?'

'মিসেস ম্যাকনীল, অনেক সময় খুব জটিল কোনো জিনিসের ব্যাখ্যা খুব সহজ হয়ে থাকে।'

'ফাদার কারাস, আমি এসব কিছু বুঝি না, আমি কোনো থিওরি শুনতে চাই না। দ্বৈতসত্তা— দ্বৈতসত্তা ? কী সেটা? বলুন আপনি? বোঝান আমাকে? আমি কি এতই অজ্ঞ মূর্খ যে আপনাদের এইসব বুঝব না ?'

'মিসেস ম্যাকনীল, পৃথিবীর কেউই এসব বোঝে না। আমরা শুধু জানি এটা হয়। জিনিসটা এইভাবে দেখুন, আমাদের মাথায় প্রায় সতের বিলিয়ন কোষ আছে। তারা প্রতি সেকেন্ডে একশ মিলিয়ন অনুভূতির আদান-প্রদান করে। মাথার প্রতিটা কোষের একটা স্বাধীন সত্তা আছে, যার জন্যেই এটা সম্ভব। এখন মানুষের মাথাটাকে একটা সমুদ্রগামী জাহাজ মনে করুন। কল্পনা করুন, মাথার প্রতিটা কোষ এক জন নাবিক। তাদের এক জন ক্যাপ্টেন আছে। সে ঠিক জানে না অন্য নাবিকরা কখন কী করছে কিন্তু জানে যে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছে। এখন যদি জাহাজে কোনো বিদ্রোহ ঘটে আর অন্য এক নাবিক ক্যাপ্টেনের স্থান নেয় তখন সেই নাবিকটা হবে দ্বিতীয় সত্তা।'

ক্রিস একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কারাসের কথা শেষ হতেই বলল, 'আমি আমার মেয়েকে চিনি। তার যত পরিবর্তনই হোক, তাকে আমি চিনব। অবিকল রেগানের মতো লক্ষ কোটি মেয়েকে আমার সামনে এনে দাঁড় করালেও আমি আমার মেয়েকে চিনে বের করতে পারব। ফাদার, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন, দোতলায় যে এখন শুয়ে আছে সে সত্যিই রেগান নয়।'

কারাস শান্ত স্বরে বললেন, 'চট করে কিছু ভেবে বসা ঠিক হবে না।'

'চট করে আমি কিছু বলছি না। ওই জিনিসটার সঙ্গে তো আপনি নিজেও কথা বলেছেন। ওর অস্বাভাবিক বুদ্ধি লক্ষ করেন নি ?'

'দ্বিতীয় সত্তাটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমান হয়। প্রফেসর জাং, ফ্রয়েডের বিখ্যাত ছাত্র, একথা লিখে রেখে গেছেন।'

'রাখুন আপনার জাং আর ফ্রয়েড! আমি এসব আর শুনতে চাই না। যথেষ্ট শুনেছি।'

কারাস হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আজ উঠব। আমার একটা লেকচার আছে। তবে আবার আসব। যতদিন না আপনার মেয়ে সুস্থ হয়, আপনি আমাকে পাবেন।'

ক্রিস কিছু বলল না।

'আপনি আমাকে রেগানের মেডিক্যাল রেকর্ড দিতে পারেন ?'

'দেখুন ফাদার, আমি ওসব এক দফা শেষ করে এসেছি।'

'শেষ করলেও আমার লাগবে। ধর্মীয় পদ্ধতিতে শয়তান তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হলেও ওর মেডিক্যাল রেকর্ড আমার লাগবে। গির্জার অনুমতির জন্যে আমার প্রমাণ করতে হবে রেগানের মধ্যে সত্যি কিছু একটা ভর করেছে। কবে নাগাদ আনতে পারবেন সেসব ?'

'তাড়াতাড়ি আনাবার জন্যে যদি আমার একটা প্লেনও ভাড়া করতে হয় আমি তা করব, ফাদার।'

'আর ওর কথাবার্তার টেপ দরকার। আগে ওর কথা কেমন ছিল আমি শুনতে চাই।'

'আমি এনে দিচ্ছি। জন্মদিনে ওর বাবাকে পাঠাবার জন্যে ও একটা ক্যাসেট টেপ করেছিল।'

বিদায় নেয়ার আগে কারাস বললেন, 'আচ্ছা মিসেস ম্যাকনীল, আপনি কি জানেন যে কিছুদিন আগে আমার মা মারা গেছে ?'

'জানি। আমি খুব দুঃখিত, ফাদার।'

'আপনার মেয়ে কি জানে ?'

'না তো! সে জানবে কোত্থেকে ?'

কারাসের ভ্রূ কুঁচকানো দেখে ক্রিস উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল, 'এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

ঘর থেকে বেরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে কারাস রেগানের জানালার দিকে তাকালেন। তিনি অকারণেই কেমন অস্থিরতা অনুভব করলেন। তাঁর মনে হল পর্দা ঘেরা ওই বন্ধ জানালাটার ওপাশ থেকে কেউ যেন তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। অনেকক্ষণ অভিভূতের মতোই দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

কারাস সরাসরি নিজের ঘরে গেলেন না। প্রথমে গেলেন জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে। গাদাখানেক বই আর পত্রপত্রিকা ইস্যু করলেন। তারপর ঘরে ফিরে সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসলেন।

রেগানের যা হয়েছে তাকে কি সত্যি সত্যি হিস্টিরিয়া বলা চলে ? সে কী করে তাঁর মায়ের কথা জানল! কী করে নিউইয়র্ক সাবওয়ের সেই বিকলাঙ্গ ভিখিরির গলায় কথা বলল! চিন্তিত মুখে কারাস লাইব্রেরি থেকে আনা বইগুলোর পাতা উল্টাতে লাগলেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একসময় 'দ্য রোমান রিচুয়াল্‌স্‌' বইটা খুলে শয়তান সম্পর্কিত অংশটিতে চোখ বুলাতে লাগলেন :

'কেউ যেন প্রথমে ভূতে পাওয়ায় বিশ্বাস না করেন। শয়তানের ভর সত্যি সত্যি হয়েছে কিনা তা আগে সঠিকভাবে জানতে হবে। লক্ষণসমূহ বিশ্লেষণ করতে হবে। যখন কাউকে শয়তানে ধরে তখন সে সাধারণত বিচিত্র ভাষায় কথা বলতে পারে এবং ভবিষ্যতের ঘটনাসমূহ বলতে পারে। শয়তান অবশ্যই তার অস্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় দেবে। সেই সঙ্গে তার ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রমাণও পাওয়া যাবে...'

ভূতে পাওয়ার এই লক্ষণগুলো রেগানের লক্ষণগুলোর সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু ক্রিস বলেছে — পরকাল বিষয়ক একটা বই পড়েছে রেগান। সে বইটা কি রেগানের দুর্বল মনে কোনো প্রভাব ফেলে নি ? আচ্ছা, রেগানের অস্বাভাবিকতাগুলোকে একটা একটা করে বিশ্লেষণ করা যাক। কারাস কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন।

১। রেগানের চেহারার বিকৃতি : অসুখের জন্যে হতে পারে। শরীর মনের ছায়া। শারীরিক অসুস্থতা চেহারায় ধরা পড়বেই।

২। রেগানের গলার স্বরের পরিবর্তন : আগেকার গলার স্বর শোনা হয় নি। কাজেই কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। তাছাড়াও দিনরাত বিকট স্বরে চিৎকার করলে স্বরতন্ত্র মোটা হবেই।

৩। রেগানের কথা বলার ধরন এবং সাধারণ জ্ঞানের নতুন বিস্তৃতি : ক্রিপটোমেনসিয়া।

৪। রেগান তাঁকে পাদ্রী হিসেবে চিনতে পেরেছে, যদিও তাঁর গায়ে কোনো পোশাক ছিল না : অনুমান করে বলেছে। সৌভাগ্যক্রমে এই ক্ষেত্রে অনুমান সত্যি হয়েছে।

৫। রেগান ধরতে পেয়েছে যে তাঁর মা মারা গেছে : এটাও অনুমান। আমাব বয়স চল্লিশ, আমার মা বেঁচে না থাকারই কথা।

৬। কথাবার্তায় রেগানের ক্ষুরধার বুদ্ধি : দ্বৈতসত্তার আবির্ভাব ঘটলে দ্বিতীয় সত্তাটি সচবাচর অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়। এ বিষয়ে জাং-এর অভিমত সঠিক।

কারাস কাগজ-কলম সরিয়ে বেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বেগানের কথার যে টেপটি এনেছেন সেটা রেকর্ডারে চালু করলেন। বেগানের গত জন্মদিনে টেপটা কবা হয়েছিল তাব বাবাকে পাঠাবার জন্যে। রিনরিনে মিষ্টি গলা :

'বাবা, আমি কথা বলছি (হাসি)। কিছু মনে আসছে না। মা, কী বলব ? (হাসি) (মাযেব গলা) বল, সারাদিন কী করলে। (হাসি) বাবা শোন, উম্‌ম্, শোন আমাব ...কথা শুনতে পাচ্ছ ? (হাসি) কোথায় গিয়েছিলাম জান তুমি? ... আচ্ছা, প্রথম থেকে শুরু কবি, উম্‌ম্ (হাসি)।

টেপ বন্ধ করে কারাস নিজের মনেই বললেন, 'রেগানের ঘবে যে বসে আছে সে বেগান নয়, হতেই পাবে না।'

বাত বাবটার দিকে কারাস সিগাবেট ধরিয়ে বারান্দায এসে বসলেন। তাঁর মাথায একটা পবিকল্পনা এসেছে। বেগানের গাযে যদি 'হলি ওযাটাব' নাম দিয়ে সাধারণ কিছু পানি ছিটিযে দেযা হয তাহলে কী হবে ? যদি সত্যি সত্যি শযতান হযে থাকে তাহলে সে জানবে ওটা কিছুই না, কাজেই হলি ওযাটারের কোনো প্রভাব পড়বে না। কিন্তু যদি এটা কোনো মানসিক অসুখ হয, যদি এই শযতান হয়ে থাকে বেগানেব মনেব কল্পনা, তাহলে সে সাধাবণ পানিকেই 'হলি ওযাটার' মনে কববে, আব যন্ত্রণায চিৎকাব শুরু কববে। কারাস খুশিমনে আরেকটা সিগারেট ধরালেন। নিখুঁত পরিকল্পনা।

কারাস ভোববেলায ক্রিসের বাড়িতে গিযে উপস্থিত হলেন। তাঁব পরনে পাদ্রীদেব পোশাক। দবজা খুলে দিল উইলি।

'মিসেস ম্যাকনীল কোথায ?'

'ওপবে আছেন।'

ক্রিস রেগানের ঘরের সামনে চেযারে মাথা নিচু করে বসে ছিল। এত ভোবে কাবাসকে আসতে দেখে সে খুবই অবাক হল।

'গুড মর্নিং, মিসেস ম্যাকনীল।'

'গুড মর্নিং।'

'বাতে বোধহয় আপনার ভালো ঘুম হয় নি ?'

'না ফাদার, একেবারেই ঘুম হয নি। সারারাত রেগান বড় বিবক্ত করেছে।'

'আপনার কাছে কোনো টেপ রেকর্ডার আছে, মিসেস ম্যাকনীল? আমি ওর কথা টেপ কবতে চাই।'

কথাটা শুনেই ক্রিসের কেমন ভাবান্তর ঘটল। প্রথমে আপত্তি জানাল, কিন্তু কারাসেব পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বাজি হল। 'দাঁড়ান, পাঠাচ্ছি', বলেই ক্রিস ছুটে বেরিয়ে গেল। কারাস অবাক হযে সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন। ক্রিসের আচরণ খানিকটা অন্যরকম লাগছে।

তিনি লক্ষ করলেন, রেগানের ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। অস্বাভাবিক নীরবতা। কারাস দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। পানির বোতলটা তাঁর পকেটেই আছে।

ঘরের ভেতর তীব্র কটু একটা গন্ধ। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। কারাসের অবশ্য কোনো ভাবান্তর হল না। তিনি তাকালেন বিছানার দিকে। সেই ক্রূর হাসি শোনা গেল আবার। চাপা, ঘৃণা মাখানো হাসি।

'কেমন আছ, ডেমিয়েন কারাস ?'

'তুমি কেমন আছ ?'

'ভালো। বেশ আনন্দে আছি। তোমাকে দেখে আজ খুব আনন্দ হচ্ছে। তা পোশাক-টোশাক জড়িয়ে এসেছ দেখছি। ঘরে একটু দুর্গন্ধ আছে। তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'না।'

'তুমি মহা মিথ্যুক।'

'তাতে কি তোমার খারাপ লাগছে ?'

'কিছুটা লাগছে।'

'কিন্তু শযতানরা তো মিথ্যাবাদীদেরই পছন্দ করে।'

'করে। তবে আমি যে শয়তান সে খবর তুমি পেলে কোথেকে ?'

'তুমি শযতান নও ?'

'মোটেও না। এত বড় সৌভাগ্য কি আমার হতে পারে ?'

'তাহলে তুমি কে ?'

'আমাকে একটা ক্ষুদে শযতান বলতে পার। হা-হা-হা। ভালো কথা, ভূত তাড়ানোর জন্যে আজকের দিনটা খুব চমৎকার, তাই না ?'

কারাস অবাক হযে রেগানের ঝকঝকে চোখের দিকে তাকিযে রইলেন।

'তাড়াতাড়ি শুরু করা দরকার, ফাদার। যত তাড়াতাড়ি হয ততই ভালো।'

'কিন্তু তাতে তো তোমাকে চলে যেতে হবে, তা জান নিশ্চয়ই ?'

'হা-হা-হা। ভুল বললে। এতে তোমাকেও পাব আমাদের মধ্যে।'

কারাস এবার রীতিমতো চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হল কেউ যেন তাঁকে পেছন থেকে বরফশীতল হাতে স্পর্শ করেছে। রেগান ঘর ফাটিযে হেসে উঠল।

'তুমিও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে ফাদার, দিতেই হবে। অবিশ্বাসীদের এ ছাড়া পথ নেই। তোমার সঙ্গে কথা বললে বড় আনন্দ হয, কারাস...'

রেগান হঠাৎ থেমে গেল। যেন শুনতে পেল কেউ এক জন আসছে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিযে আছে। কারাসও তাকালেন। একটা টেপরেকর্ডাব হাতে কার্ল এসে ঢুকল। রেকর্ডারটি চলছে। মাইক্রোফোন স্ট্যান্ডটা টেবিলের ওপর রেখে কার্ল ঘর ছেড়ে চলে গেল।

'এসব কী হচ্ছে, কারাস ? আমাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা রেকর্ড করে ফেলছ মনে হচ্ছে?'

'কিছুমাত্র না। অভিনয করতে আমার চমৎকার লাগে ?'

'নাম কি তোমার ?'

'নাম? নাম-টাম কিছু নেই।'

'তুমি কি গ্রীক ভাষা জান ?'

'চমৎকার জানি।'

উৎসাহিত হয়ে কারাস ক্লাসিক গ্রীক ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন,

'পম এগনোকাস হতি প্রেসবিটেরস এই নিই ?'

'আমার কথা বলার মুড নেই।'

'তার মানে তুমি গ্রীক জান না ?'

'বললাম তো, আমার মুড নেই।'

এই সময় ড্রেসারের একটা ভারি ড্রয়ার হঠাৎ শব্দ করে খানিকটা বেরিয়ে এল। কারাস চমকে উঠে বললেন, 'ড্রয়ারটা তুমি বের করলে ?'

'নিশ্চয়ই। ক্ষমতার সামান্য একটু নমুনা দেখালাম।'

'আবার করতে পার ?'

'পারি, কিন্তু করব না। তোমাকে সব সময় খানিকটা সন্দেহের মধ্যে রাখা দরকার। হা-হা-হা।'

আবার কে যেন হিমশীতল হাতে কারাসের ঘাড় স্পর্শ করল। চমকে উঠলেন তিনি। এক সীমাহীন আতংক যেন তাঁকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে।

'ভয় পেলে নাকি, কারাস?'

কারাস চট করে নিজেকে সামলে নিলেন। সহজভাবে কথা বলতে চেষ্টা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বলতে পার এই মুহূর্তে আমি কী চিন্তা করছি?'

'তোমার চিন্তায় আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'তার মানে তুমি আমার মনের কথা বলতে পার না।'

'তা ভাবতে তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে তাই।'

'তুমি যে-ই হও, তুমি অদ্ভুত।'

'তা ঠিক। প্রিয় কারাস, খুব সত্যি কথাই বলেছ।'

'তোমার নাম কি?'

'নামে কি আসে যায়, বন্ধু?'

কারাস পকেটে হাত দিয়ে পানির বোতলটা বের করলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে রেগান বলল, 'ওটা কী?'

'চিনতে পারছ না? হলি ওয়াটার!'

মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা প্রলয় ঘটে গেল। বিকট স্বরে চিৎকার করতে লাগল রেগান : 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! পুড়িয়ে ফেলছে, পুড়িয়ে ফেলছে! উঃ পুড়িয়ে ফেলছে!' চেঁচাতে চেঁচাতে সে নিথর হয়ে পড়ল। বিচিত্র অচেনা ভাষায় বিড়বিড় করতে লাগল।

কারাস বললেন, 'তুমি কে?'

'মিয়াউকেইন।'

'এটা কি তোমার নাম?'

বিড়বিড় করে এর উত্তর দেয়া হল।

'আমার কথা কি বুঝতে পারছ?'

অস্পষ্ট উত্তর। সেই অচেনা ভাষা।

কারাস আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। বিড়বিড় করতে করতে রেগান এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

কারাস নিচে নেমে এসে দেখেন, সোফায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে ক্রিস। দুচোখ বোজা। পায়ের শব্দে জেগে উঠে বসল সঙ্গে সঙ্গে।

'ফাদার, আপনাকে কফি না চা দেব ?'

'না, ধন্যবাদ। মিসেস ম্যাকনীল, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলুন।'

'আপনার মেয়ের অসুখটা সম্পূর্ণ মানসিক। শয়তান টয়তান কিছু নয়। এক্সরসিজম করার পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে।'

'আজ হঠাৎ এই কথা বলছেন কেন ?'

'আমি ওর গায়ে হলি ওয়াটার ছিটিয়ে দিতেই ও বিকট চিৎকার শুরু করে দিল।'

'তাতে হয়েছে কী ?'

'আসলে ওটা হলি ওয়াটার ছিল না। সত্যিকার শয়তান হলে প্রভেদটা বুঝতে পারত।'

'হয়তো এই শয়তানটা দুয়ের মধ্যে প্রভেদ জানে না।'

'মিসেস ম্যাকনীল, আপনি তাহলে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন যে রেগানের মধ্যে সত্যি সত্যি শয়তান আছে?'

'ফাদার, আপনি করেন না? সত্যি করে বলুন, করেন না ?'

কারাস কোনো জবাব দিলেন না। ক্রিস কাঁদতে শুরু করল। তখন ক্রিসের হাতের ওপর একটা হাত রেখে কারাস কোমল স্বরে বললেন, 'রেগানের রিপোর্টগুলো আমার হাতে আসার পর আমি চার্চের কাছে পুরো বিষয়টা তুলে ধরব। মিসেস ম্যাকনীল, গোটা ব্যাপারটাই বড় রহস্যময়। একবার আমার মনে হয়, এটি একটি ভয়ংকর মানসিক অসুখ: আবার মনে হয়, মেয়েটির মধ্যে শয়তান থাবা মেলে বসে আছে।'

ঘর থেকে বেরিয়েই কারাস এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখলেন। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে কার্ল একদৃষ্টে রেগানের ঘরের বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। কারাসকে দেখেই সে চমকে উঠল।

'কেমন আছ, কার্ল ?'

'ভালো। আমি ভালো আছি।' বলেই দ্রুতপায়ে সে হাঁটতে শুরু করল যেন সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। কারাস বেশ অবাক হলেন।

কার্ল প্রথমে গেল বাসস্ট্যাণ্ডে, সেখান থেকে বাসে উঠে, দুতিনবার বাস বদলে শহরের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে এসে উপস্থিত হল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে শেষ পর্যন্ত থামল সে জায়গাটা শহরের দরিদ্রতম অঞ্চল। চারদিকে জীর্ণ কদাকার সব ফ্ল্যাট বাড়ি। রাস্তার দুপাশে আবর্জনার স্তূপ।

একটা ভাঙাচোরা দোতলা বাড়ির লোহার সিঁড়ির নিচে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সে ক্লান্ত পায়ে ওপরে উঠতে থাকল। তারপর একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে ডাকল, 'এলভিরা, এলভিরা।'

দরজা খুলে আলুথালু পোশাকের বিশ–একুশ বছরের একটা মেয়ে মুখ বের করল। ঘরের ভেতর থেকে কর্কশ পুরুষ গলা শোনা গেল, 'বিদায় কর, মাগী! পয়সা দিয়ে এসেছি।'

এলভিরা কড়া ধমক লাগাল, 'চুপ কর। আমার বাবা এসেছে।'

কার্ল ধরা গলায় বলল, 'কেমন আছিস, মা?'

'ভালো। ভেতরে এস না কিন্তু, হারামজাদাটা নেংটো হয়ে বসে আছে। তুমি টাকা এনেছ।'

কার্ল পকেট থেকে টাকা বের করল। এলভিরা ছোঁ মেরে টাকাগুলো নিয়ে নিল।

'ওইসব আজেবাজে ইনজেকশনগুলো নিস না। তোকে আমি নিউইয়র্কের একটা ক্লিনিকে নিয়ে যাব। ওরা সারিয়ে দেবে। তখন ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে পারবি।'

'আহ্ কী ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শুরু করলে? এখন যাও তো, ঘরে আমার লোক আছে।'

'মা, লক্ষ্মী মা আমার, কথা শোন....' কার্ল মেয়ের হাত ধরে ফেলল।

এলভিরা ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'কী যে ঝামেলা কর প্রতিবার!'

ভেতর থেকে লোকটি চেঁচাল, 'ঘাড় ধরে বের করে দে না!'

এলভিরা সঙ্গে সঙ্গে কার্লের মুখের ওপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে কার্ল দেখে, রাস্তার অন্য পাবে কিন্ডারম্যান দাঁড়িযে আছে। কার্লকে দেখে সে গম্ভীর স্বরে বলল, 'মিঃ কার্ল, এখন মনে হয় আপনি আমাব সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারেন, তাই না?'

কিন্ডারম্যানের হাত দু'টি পকেটের ভেতর। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ন।

২

কাবাস দেখা করতে গেলেন ভাষা ইনস্টিটিউটেব পবিচালক ম্যাক ফ্রাঙ্কেব সঙ্গে। বেগানেব অদ্ভুত ভাষায় কথার টেপটা তিনি বাজিযে শোনালেন তাঁকে।

'ফ্রাঙ্ক, এটা কি কোনো ভাষা, না প্রলাপ ?'

টেপ শেষ না হওযা পর্যন্ত ম্যাক ফ্রাঙ্ক চোখ বন্ধ করে শুনলেন। তাঁব মুখেব ভঙ্গিতে বিস্ময ফুটে উঠল।

'এটা তুমি কোথায় পেয়েছ ?'

'পেযেছি এক জাযগায়। এখন বল এটা কী ? কোনও প্রাচীন ভাষা ?'

'হতে পারে। আমি কখনো শুনি নি। আরেকবাব বাজাও তো শুনি।'

দ্বিতীযবার বাজান হল টেপটা।

'খুবই অদ্ভুত। আমার কাছে বেখে যাও। আমি দেখব কিছু করা যায কিনা।'

'ফ্রাঙ্ক, আমার আরেকটা ব্যাপাব জানতে হবে।'

'বল, আমি একই লোকের দুধরনের কথা তোমাকে শোনাব। তুমি কি কোনোভাবে বলতে পারবে একই লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ দুই ভঙ্গিতে কথা বলা সম্ভব কিনা ?'

'হ্যাঁ, পারব। একই লোক হলে বলে দিতে পারব।'

'কীভাবে?'

'আমি টাইপ টোকেন অনুপাত বের করব। ধর, এক হাজার শব্দের ভেতব কোনো একটা বিশেষ শব্দ কতবার আসছে তা দেখা আর বাক্য গঠনরীতি পরীক্ষা করা।'

'ফ্রাঙ্ক, তোমার কি মনে হয় এই পদ্ধতিটা নির্ভুল?'

'অবশ্যই। তুমি টেপটা রেখে যাও। আমি ইন্সট্রাকটরকে বলব পরীক্ষা করতে।'

'ফ্রাঙ্ক, তোমাকেই এ কাজটা করতে হবে, আর আজই করতে হবে। খুবই জরুরি। প্লিজ ফ্রাঙ্ক।'

'ঠিক আছে।'

বাকি দিনটা কারাস কাটালেন জর্জটাউন লাইব্রেরিতে। সাইকোকাইনেটিক বিষয় সম্পর্কে যত বই পাওয়া গেল সব নামিযে এনে বসলেন। বিকাল চারটের দিকে তিনি নিশ্চিত হলেন যে সাইকোকাইনেটিক ব্যাপারটা কোনো মনগড়া কিছু নয়। বহু দলিলপত্র, প্রমাণাদি আছে এর। বয়ঃসন্ধিকালে সুতীব্র মানসিক দুঃখ-বেদনা, রাগ-অভিমান সাইকোকাইনেটিক

শক্তির (যার ধরন এখনো অজানা) জন্ম দিতে পারে। ফলস্বরূপ দেখা যায় রোগীর চারপাশে টেবিল-চেয়ার নড়ছে। কাগজপত্র, কলম, কলমদানি শূন্যে উড়ছে।

কারাস সন্ধ্যাবেলায় ক্রিসের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ক্রিস তখন নিচতলায় ঘর অন্ধকার করে বসে ছিল। কোনো কিছুতেই তার মন নেই।

'মিসেস ম্যাকনীল, ক্লিনিকের সব কাগজপত্র আমাকে পাঠিয়েছে।'

'পড়েছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। লাইব্রেরিতেও কিছু পড়লাম।'

'এখন আপনি কী বলতে চাইছেন ?'

'রেগানের অসুস্থতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া অসম্ভব নয়, মিসেস ম্যাকনীল।'

'আপনি এখনো এসব বলছেন ?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় রেগানকে বেশ কিছুদিন কোনো ক্লিনিকে রাখা উচিত। আপাতত এক্‌সরসিজম করা ঠিক হবে না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ক্রিস।

'আপনার কি শরীর খারাপ, মিসেস ম্যাকনীল ?'

'না, আমার শরীর ভালোই আছে। ফাদার, আপনাকে আজ একটা কথা বলি। রেগান এক জন মানুষ খুন করেছে। তার নাম বার্ক ডেনিংস। সেই বার্ক ডেনিংস প্রায়ই হাজির হয় রেগানের মধ্যে। আমি যদি ওকে আজ ক্লিনিকে নিয়ে যাই তাহলে কালই সব প্রকাশ হয়ে যাবে। ওরা রেগানকে স্রেফ মেরে ফেলবে। কিংবা বাকি জীবনের জন্যে সেলে বন্ধ করে রাখবে।'

কারাস স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ক্রিস উঁচু গলায় বলল, 'আপনি কি তাই চান, ফাদার? বলুন, আপনি তাই চান?'

'মিসেস ম্যাকনীল, আপনি শান্ত হন।'

'বলুন কীভাবে? কীভাবে আমি শান্ত হব ?'

ক্রিস এবার হু-হু করে কেঁদে ফেলল। তারপর চোখে রুমাল চেপে বাথরুমে চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কার্ল এসে বলল, 'আপনার টেলিফোন, ফাদার।'

টেলিফোন এসেছে ম্যাক ফ্রাঙ্কের কাছ থেকে। মনের উত্তেজনা গোপন করে কারাস সহজ সুরে বললেন, 'ফ্রাঙ্ক, কিছু পেয়েছ ?'

'তা পেয়েছি। টাইপ টোকেন অনুপাত বের করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস দুরকম স্বরের কথা যা টেপে আছে তা এক জনের নয়, দুজনের। একই লোকের হওয়ার সম্ভাবনা কম।'

'ফ্রাঙ্ক, তুমি কি পুরোপুরি নিশ্চিত নও ?'

'না। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আমাদের অনেক বেশি ডাটা দিতে হবে। তুমি সামান্য কিছু দিয়েছ।'

ফ্রাঙ্ক হাসতে লাগলেন।

'হাসছ কেন? হাসির কী হল ?'

'ফাদার কারাস, আমার বিশ্বাস তুমি টেপগুলো মিশিয়ে-টিশিয়ে ফেলেছ।'

'ফ্রাঙ্ক, আমাকে সোজাসুজি বল ওটা কি কোনো ভাষা।'

'হ্যাঁ, ভাষা তো বটেই।'

'কোন্ ভাষা ?'

'আমাদের ভাষা — যে ভাষায় আমরা কথা বলি।'

'ফ্রাঙ্ক, তুমি কি রসিকতা করছ ?'

'না, রসিকতা নয়। ভাষা ঠিকই আছে, শুধু উল্টো করে বলা। তোমার টেপে যদি রিভার্স প্লে পজিশন থাকে তাহলে উল্টোদিক থেকে বাজালেই তুমি বুঝতে পারবে।'

'বল কী!'

'খুবই মজার ব্যাপার। এ ব্যাপারে পরে এক সময় তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

কারাস লক্ষ করলেন, কার্ল তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। টেলিফোনের কথাবার্তা সে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছে তা বলাই বাহুল্য। কারাস তার দিকে তাকাতেই সে বলল, 'ফাদার, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন। মেয়েটির জন্যে আপনি যা করছেন তার ফলস্বরূপ ঈশ্বর অবশ্যই আপনার মঙ্গল করবেন।'

কারাস দেখলেন কার্লের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

'কার্ল, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়ই ফাদার, নিশ্চযই।'

'হ্যাঁ, শোন, আমি রাতের দিকে একবার আসব।'

'ম্যাডামকে ডেকে দেব ?'

'না থাক। তাঁব বিশ্রাম দরকার।'

ঘর থেকে বেরিয়েই কারাসের বুকটা ছ্যাঁৎ কবে উঠল।

কিন্ডাবম্যান রাস্তার ওপাশে পাযচারি করছে। সে কি এ বাড়িব ওপব লক্ষ্য বাখতে শুরু করেছে?

'ফাদার কারাস না ?'

'হ্যাঁ। কেমন আছেন, মিঃ কিন্ডারম্যান?'

'ভালো। আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম। ভাবছিলাম আপনাব বাসায যাব। যাক, দেখা হয়ে ভালোই হল।'

'কোনো কাজ ...'

'না না, কোনো কাজ নয। ওই যে এক দিন আপনাকে বলেছিলাম — আমাব সঙ্গে সিনেমা দেখতে — ওই ব্যাপাবে।'

'কী ছবি ?'

'খুব ভালো ছবি। ক্রেস্ট সিনেমা হলে নতুন চলছে।'

'কবে দেখতে চান ?'

'আজ যাবেন, ফাদার ?'

'না, আজ আমাব খানিক কাজ আছে।'

'ফাদার, আপনি কি ইদানীং রাত জাগছেন ?'

'কেন বলুন তো ?'

'চোখের নিচে কালি পড়েছে, তাই বললাম। বাত জাগা ঠিক নয। শরীর একবার নষ্ট হলে সব নষ্ট।'

'মিঃ কিন্ডারম্যান, আপনার কেসটার কোনো কিনারা হল ?'

'কোন্ কেসের কথা বলছেন, ফাদার ?'

'বার্ক ডেনিংস।'

'ও, আচ্ছা। সেইটা। আর জিজ্ঞেস করবেন না। ওটা নিয়ে আমি মোটেও ভাবছি না। আমাব মনে হয় সমস্তটাই একটা ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্ট। আপনি কী বলেন ?'

'এসব তো আপনাদেরই ভালো জানা উচিত। গুড নাইট, মিঃ কিন্ডারম্যান।'

'গুড নাইট, ফাদার। গুড নাইট।'

রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে কারাস মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন কিন্ডারম্যান তখনো দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মনে হল, যে কোনো সময় কিন্ডারম্যান হয়তো ক্রিসকে বলবে, 'আমি রেগানের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' এখনো কেন যে বলছে না কে জানে। বলবে সে নিশ্চয়ই। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

রেগান সম্পর্কিত সমস্ত কাগজপত্র ফাদার কারাস টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন। বেরিঞ্জার ক্লিনিকের কাগজপত্র, ডাঃ ক্লীনের রিপোর্ট, সাইকিয়াট্রিস্টের রিপোর্ট, আর তাঁর নিজের নোট। অনেক রাতে টেপ রেকর্ডার নিয়ে বসলেন। খুব ঠাণ্ডা মাথায় তিনি রেগানের বিচিত্র ভাষার মর্ম উদ্ধার করতে চান। টেপ রেকর্ডারের রিভার্স প্লে'র বোতাম টিপে তিনি কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন

'.... ভয়। বিপদ এখনো নয়। (অস্পষ্ট)। মারা যাব। এখন হচ্ছে (অস্পষ্ট)। চারদিকে শূন্যতা। আমার ভয় হয়। সময় চাই। (অস্পষ্ট)। (অস্পষ্ট)। এ সে নয়। এ অন্য (অস্পষ্ট)। সে অসুস্থ। আহ্ কী মিষ্টি, শরীরের রক্ত কী মিষ্টি! আমাকে (অস্পষ্ট) দাও।'

যে জায়গায় কারাস জিজ্ঞেস করলেন —'কে তুমি ?' তার উত্তরে বলা হল — 'আমি কেউ নই, আমি কেউ নই।' তারপর কারাস জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি তোমার নাম ?' উত্তর হল, 'আমার কোনো নাম নেই। আমি কেউ না। অনেকেই। শরীরের উষ্ণতায় থাক। শরীর থেকে মহাশূন্যতায় (অস্পষ্ট)। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। মেরিন, মেরিন। মেরিন (অস্পষ্ট)।'

কারাস অসংখ্যবার টেপটা বাজালেন। অস্পষ্ট শব্দগুলো ধরতে চেষ্টা করলেন। ধরা গেল না। সে রাতে তাঁর একটুও ঘুম হল না। রেগানের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা তাঁকে পুরোপুরি অভিভূত করে ফেলল।

পরদিন সকাল নটায় ফাদার কারাস জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে একটি এক্সরসিজম করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁকে অনুমতি দেয়া হল।

সকাল দশটায় তিনি বিশপের কাছে গেলেন। বিশপ গভীর মনোযোগের সঙ্গে কারাসের বক্তব্য শুনলেন। এক সময় বললেন, 'আপনি কি নিশ্চিত? সত্যিই কি শয়তানের আছর হয়েছে মেয়েটার ওপর ?'

সরাসরি কোনো উত্তর দিলেন না কারাস। শান্তস্বরে শুধু বললেন, 'আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে বুঝেছি, এক্সরসিজমই হচ্ছে এখন সবচেয়ে ভালো পথ।'

'আপনি নিজেই তা করতে চান ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার স্বাস্থ্য কেমন ?'

'ভালো।'

'এ ধরনের কিছু আগে কখনো করেছেন ?'

'না।'

'ঠিক আছে, আপনি এখন যান। আমরা আপনাকে খবর দেব। তবে আমাদের মনে হয়, এমন কাউকে সঙ্গে নেয়া উচিত যার এ ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।'

'আপনার পরিচিত এমন কেউ কি আছেন ?'

'হ্যাঁ, ফাদার মেরিন — ল্যাংকাস্টারে আছেন।'

'ফাদার মেরিন ? তিনি ইরাকে আছেন বলে জানতাম।'

'ছিলেন। এখন উডস্টকে আছেন।'

'তাঁর তো অনেক বয়স ?'
'হ্যাঁ, অনেক। স্বাস্থ্যও দুর্বল। তবু তাঁকে বলতে হবে। এটাই নিয়ম।'
উডস্টক সেমিনারী। মেরীল্যাণ্ড।

বৃদ্ধ ফাদার মেরিন মৃদুপায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। বড় বড় গাছে জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন। ফাদার মেরিন লক্ষ করলেন, সেমিনারীর এক জন ছাত্র তাঁর দিকে আসছে। ছাত্রটি টেলিগ্রামের লাল খাম ফাদার মেরিনের হাতে দিতেই তিনি মৃদুস্বরে তাকে ধন্যবাদ জানালেন।

টেলিগ্রামটা তিনি পড়লেন না। পকেটে রেখে আগের মতো হাঁটতে থাকলেন। তিনি জানেন টেলিগ্রামটিতে কী লেখা। অনেক দিন ধরেই এর জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করে আছেন। দেখা হবে, আবার দেখা হবে।

ছোট্ট একটা পাখি গলা কাঁপিয়ে গান করছে। ফাদার মেরিন গাঢ় ভালবাসা নিয়ে পাখিটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ।

কান্নার সমর্পণ

১

'একজন লম্বামতো বুড়ো লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

ক্রিস বেশ অবাক হল। এত রাতে কে আসবে? ফাদার কারাস সন্ধ্যাবেলাতেই এসেছেন। তিনি আছেন রেগানের ঘরে। কিন্ডারম্যান নয় তো? পুলিশ অফিসারটি যে তার বাড়ির ওপর কড়া নজর রাখছে, তা ক্রিস বেশ বুঝতে পারে। কয়েকবার দেখা হয়েছে রাস্তায়। কিন্ডারম্যান এমন ভাব করেছে যেন এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখা। কিন্তু যে এসেছে সে কিন্ডারম্যান নয়। কিন্ডারম্যান বেঁটে, বুড়ো অনেক লম্বা। ক্রিস দরজার কাছে এসে অপরিচিত লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। লোকটা অন্ধকারে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় লম্বা একটা টুপি। তাতে মুখ ঢাকা পড়ে আছে।

'কী করতে পারি আপনার জন্যে ?'

'মিসেস ম্যাকনীল ?'

'হ্যাঁ।'

লোকটা মাথার টুপি খুলে ফেলল। ক্রিস স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল। লোকটির চোখ দুটো কী শান্ত! মুখাবয়বে গাঢ় বিষাদ ও প্রশান্তি। যেন ইনি পৃথিবীর সাধারণ মানুষ হয়েও পৃথিবীর নন।

'মিসেস ম্যাকনীল, আমি ফাদার মেরিন ল্যাংকাস্টার।'

সম্বিত ফিরে পেতে ক্রিসের বেশ কিছু সময় লাগল। ইনিই ফাদার মেরিন! কী আশ্চর্য!

'ফাদার, আমি বুঝতেই পারি নি আপনি এত তাড়াতাড়ি আসবেন! আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো আসবেন পরশু নাগাদ।'

'আমি জানি।'

ফাদার মেরিন ঘরে ঢুকলেন। ক্রিসের মনে হল ঘরে পা দিয়েই তিনি কী যেন বুঝতে চাইছেন, অনুভব করতে চাইছেন। মনে মনে যেন কিসের হিসেব মিলাচ্ছেন। তাঁর কপালে সূক্ষ্ম একটা কুঞ্চন।

'ফাদার মেরিন, আপনার সুটকেসটা বরং আমার হাতে দিন।'

'না, ঠিক আছে। ফাদার কারাস কি এ বাড়িতে আছেন ?'

'হ্যাঁ, এতক্ষণ রেগানের ঘরে ছিলেন, এখন রান্নাঘরে। ফাদার, আপনি কি রাতের খাবার —'

'না, আমি খেয়ে এসেছি।'

'চা কিংবা কফি ?'

'না, মিসেস ম্যাকনীল। আমার জন্যে ভাববেন না।'

'আমি যদি জানতাম আপনি আসছেন তাহলে স্টেশনে থাকতাম।'

'আমার কোনো অসুবিধা হয় নি।'

'আপনার জন্যে একটা ঘর আমরা গুছিয়ে রেখেছি। এখন বিশ্রাম নিন। নাকি ফাদার কারাসের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'আমি আপনার মেয়েকে একটু দেখব।'

'এখনই ?'

'হ্যাঁ।'

'ফাদার, রেগান এখন ঘুমাচ্ছে। তাকে লিব্রিযাম দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই ঘুম পাড়ানো হয়েছে।'

'আমার তা মনে হয না, মিসেস ম্যাকনীল, ও জেগেই আছে।'

ফাদার মেরিনের কথা শেষ হওযার আগেই রেগানের ঘব থেকে বিকট চিৎকার ভেসে এল। প্রচণ্ড সেই আওয়াজে ঘরের কাচের জানালায় যেন ধাক্কা লাগল। দ্বিতীযবাব চিৎকাবের সঙ্গে সঙ্গে রেগানের ঘর থেকে ভাঙা গলায কেউ এক জন ডাকল 'মেবিন...মেবি...ই-ই-ই-ন!'

ফাদার মেরিন মাথা তুলে দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ দেখে ক্রিসেব মনে হল, তিনি জগৎ-সংসার ভুলে গেছেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন ফাদার মেবিন। ইতিমধ্যে কারাস রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ক্রিসের পাশে দাঁড়িয়েছেন। রেগানের ঘর থেকে তখন হাঁ-হাঁ জাতীয় একটা বিকট শব্দ ভেসে আসছে।

ফাদার মেরিন রেগানের ঘরে ঢোকামাত্র চারদিক নিস্তব্ধ হযে গেল। দুজন দুজনেব দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল। এক সময রেগানের মুখ থেকে কঠিন স্বরে কেউ এক জন কথা বলল, 'মেরিন, তুমি তাহলে এসেছ?'

ফাদার মেরিন কোনো উত্তর দিলেন না।

'মেরিন, এইবার তুমি হারবে। নিশ্চয়ই হারবে।'

ফাদার নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা টেনে দিলেন। দ্রুত পাযে নিচে নেমে এসে হাসিমুখে বললেন, 'আপনি বুঝি ফাদার ডেমিযেন কারাস?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'ফাদার কারাস, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। এখনই শুরু করতে হবে। আপনাকে একটা লিস্ট দিচ্ছি, এই জিনিসগুলো নিয়ে আসুন।'

'ফাদার মেরিন, আপনি এখনই শুরু করতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে ওর এই অবস্থা হল তা শুনবেন না?'

'না, কোনো প্রয়োজন নেই।'

ফাদার কারাস বেশ অবাক হলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, এই দুর্বল বৃদ্ধের মধ্যে কী প্রচণ্ড ক্ষমতা লুকানো রয়েছে, যেটা স্পষ্ট অনুভব করা যায।

'আমি এখনই জিনিসগুলো নিয়ে আসছি।'

ক্রিস এগিয়ে এসে বলল, 'আপনাকে বড্ড ক্লান্ত লাগছে, ফাদার মেরিন। আপনি কি একটুও বিশ্রাম নেবেন না?'

'না।'

'একটু গরম কফি খান, প্লিজ।'

'বেশ তো, খাওয়া যাবে।'

কার্ল ছুটে গেল কফি তৈরি করতে। ক্রিস লক্ষ করল ফাদার মেরিনের মুখে একটা হাসি হাসি ভাব। ক্রিসের দিকে তাকিয়ে তিনি হঠাৎ বললেন, 'আপনার নামটা ভারি সুন্দর— ক্রিস্টিন ম্যাকনীল।'

ক্রিস হেসে বলল, 'আপনাব নামটা কিন্তু বেশ অদ্ভুত।'

'আমার মা রেখেছিলেন। এটা আসলে একটা জাহাজের নাম — মেরিন ল্যাংকাস্টার। কেন যে তিনি এ রকম একটা জাহাজের নাম রাখলেন কে জানে?' ফাদাব মেবিন কফিতে চুমুক দিযে হালকা সুবে বললেন, 'কত সুন্দর সুন্দর নাম থাকে মানুষেব। যেমন ধরুন ডেমিযেন কারাস। এ রকম একটা নাম যদি আমার থাকত।'

'এ নামটা কোত্থেকে এসেছে, ফাদার?'

'এক জন ফাদারের এই নাম ছিল। তিনি মোলোকাই দ্বীপে কুষ্ঠরোগীর সেবা করতেন। শেষ পর্যন্ত কুষ্ঠ হয়ে মারা যান। পৃথিবীতে তাঁর মতো দরদী মানুষ খুব কম জন্মেছে, মিসেস ম্যাকনীল, খুব কম।'

কফি শেষ কবে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার। ক্রিসকে বললেন, 'আপনি আমার ঘর দেখিয়ে দিন। ফাদার কারাস না আসা পর্যন্ত আমি একটু একা থাকতে চাই।'

ফাদার কারাসেব ফিরতে ঘণ্টা দুযেক দেবি হল। তিনি এসে দেখেন ফাদাব মেবিনের ঘব অন্ধকাব। হয়তো ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছেন। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলেন কাবাস। না, ঘুম নয়। ফাদাব মেরিন প্রার্থনা করছেন। শান্ত সমাহিত ভঙ্গি। কারাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, কী কবে মানুষ এত গভীরভাবে ঈশ্বরেব সান্নিধ্য পায? কোত্থেকে আসে এমন সমর্পণ!

ফাদার মেরিন প্রার্থনা ছেড়ে উঠতেই কারাস বললেন, 'যা যা বলেছেন সবই এনেছি। আপনাব জন্যে একটা গবম সোযেটারও এনেছি। মেযেটার ঘ' খুব ঠাণ্ডা।'

'ভালো কবেছেন। ফাদার কাবাস।'

'বলুন।'

'আপনি নিশ্চয়ই নিয়মকানুন সব জানেন ?'

'জানি।'

'একটা জরুরি কথা আপনাকে জানিযে রাখি। শযতানের কথাব কোনো উত্তর দেবেন না। মনে রাখবেন শযতান হচ্ছে মিথ্যেবাদী। কিন্তু তার সমস্ত মিথ্যাই সত্য দিযে ঢাকা। কাজেই বোঝা যাবে না সে সত্য বলছে কি মিথ্যা বলছে। সে চেষ্টা করবে আমাদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলতে। খুব সাবধানে থাকবেন।'

কারাস কিছু বললেন না।

ফাদার মেরিন বললেন, 'আপনি কি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান ?'

'না, ফাদাব। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না রেগানের ইতিহাস জানা থাকলে আপনার সুবিধে হবে? ওর মধ্য দিয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব কথা বলে।'

'তিনটি নয ফাদার, একটিই। ওকে আমি চিনি। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে আগে। চলুন, যাওয়া যাক।'

ক্রিস হলঘরে অপেক্ষা করছিল। শ্যারনও তার কাছে দাঁড়িয়ে। ফাদার মেরিন বললেন, 'আপনারা না এলেই ভালো। প্রয়োজন হলে আমরা ডাকব।'

'ঠিক আছে, ফাদার।'

'আপনার মেয়ের পুরো নামটা কি?'

'রেগান টেরেসা ম্যাকনীল।'

'আহ্, কী চমৎকার নাম! কী সুন্দর!'

দরজা খুলে কারাস দেখলেন এক বীভৎস দৃশ্য। রেগান জিভ বের করে শুয়ে আছে। ঘন কালো রঙের জিভ, মুখ থেকে অনেকখানি বেরিয়ে আছে। চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে। ভারি গম্ভীর গলায় রেগান বলল, 'তাহলে এসেছিস শেষ পর্যন্ত? দে ছিটিয়ে দে, তোর পেচ্ছাব এই মেয়েটির গায়ে ছিটিয়ে দে। তোর গায়ের বোঁটকা ঘাম দিয়ে এই মেয়েটিকে পবিত্র কর। প্যান্ট খুলে তোর ওই জিনিসটাও বের কর। মেয়েটা আদব করে চুমু খাবে, চুমু খেয়ে সে পবিত্র হবে। হা-হা-হা।'

ফাদার মেরিন একটা প্রচণ্ড ধমক লাগালেন, 'চুপ!'

চুপ হয়ে গেল চারদিক। রেগান ঝকঝকে বেড়াল-চোখে অপলক তাকিয়ে রইল। তার কালো জিভটা লকলক করতে লাগল। ফাদার মেরিন বিছানার পাশে আসন পেতে বসতেই রেগান থু করে একদলা থুতু ফেলল। যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে ফাদার মেরিন প্রার্থনা শুরু করলেন :

'হে পরম করুণাময় ঈশ্বর। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মহাজ্ঞানী প্রভু। আমরা তোমার করুণা ভিক্ষা করছি। তুমি তোমার অসীম শক্তির মহিমায় পবিত্র কর আমাদের। হে করুণাময় ঈশ্বর, পবিত্র কর এই শিশুটিকে। রেগান টেরেসা ম্যাকনীল, আজ সে আমাদের আদিম শত্রুর ছায়ায় আবদ্ধ। হে, প্রভু...'

ফাদার মেরিন চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করে যেতে লাগলেন। কারাসের মনে হল একটা কিছু ঘটছে। প্রার্থনার কথাগুলো তিনি ঠিক শুনতে পারছেন না। মন লাগছে না। অসহনীয় এক অস্থিরতা অনুভব করছেন। মেরিন প্রার্থনার বইটি বন্ধ করে ডাকলেন, 'ফাদার কারাস!'

'বলুন।'

'আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুন।'

'হে প্রভু, রক্ষা কর তোমার সন্তানদের, যারা শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় আশ্রয়ভিক্ষা করে তোমার কাছে। তোমার পবিত্র মঙ্গলময় হস্ত তুমি প্রসারিত কর...'

একটা অব্যক্ত ধ্বনি উঠল। কারাসের চোখ থমকে গেল রেগানের মুখের ওপর। এসব কি তিনি সত্যি সত্যি দেখছেন? না চোখের ভুল? তাঁর প্রার্থনায় গণ্ডগোল হয়ে যেতে লাগল। হিসহিস্ শব্দ হচ্ছে চারদিকে। ফাদার মেরিন চাপা স্বরে বললেন, 'ফাদার ডেমিয়েন কারাস?'

'জ্বি।'

'দয়া করে আমার সঙ্গে যোগ দিন। প্রস্তাবনায় অংশ নিন। আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন — শত্রুর ওপর তোমার জয় হোক।'

'শত্রুর ওপর তোমার জয় হোক।'

'আমার প্রার্থনা তুমি গ্রহণ কর, প্রভু।'

'আমার প্রার্থনা তুমি গ্রহণ কর, প্রভু।'

'নরকের শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর এই শিশুটিকে।'

'নরকের শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর এই শিশুটিকে।'

ফাদাব মেরিন রেগানের মুখের ওপর ক্রস এঁকে পবিত্র জল ছিটিযে দিলেন। প্রার্থনার প্রথম অংশ শেষ হয়েছে।

ফাদার মেরিন হাত-মুখ পরিষ্কার করবার জন্যে ঘর থেকে বেরোতেই রেগানেব মুখ থেকে খিকখিক হাসির আওয়াজ হল। সে হাসি থামতেই কেউ এক জন ফিসফিস করে বলল, মেরিন হারতে শুরু করেছে। হারতে শুরু করেছে। এই কুত্তী মাগীর মরবাব সময এসে গেছে। দেখ কারাস দেখ্। তুই তো আবার ডাক্তার, ওর নাড়ি পরীক্ষা কবে দেখ্।'

কারাস দেখলেন নাড়ির গতি অত্যন্ত ক্ষীণ।

'দেখলি? এই শুরু। এই কুত্তীকে এখন থেকে আর আমি ঘুমাতে দেব না। তার ফল কী হবে জানিস তো? তা জানবি, তুই তো আবার ডাক্তার।'

কারাস শিউরে উঠলেন। ঘুম না হলে কার্ডিযাক অ্যাফেক্ট হবে। ঘুমের দরকার খুব। ক্রিস দরজা খুলে উঁকি দিল। ভযে তার মুখ সাদা হযে গেছে।

'এই যে এসেছে, ধাড়ী কুত্তীটা এসেছে। আয আয, দেখে যা, তুই নিজেব মেয়েকে কী কবেছিস! তোবই জন্যে এই অবস্থা হযেছে, বুঝলি? তুই পাগল বানিযেছিস, তুই!'

ক্রিস থরথব করে কাঁপতে লাগল। কাবাস বললেন, 'ওব কথা শুনবেন না। ওব কথায কান দেবেন না।'

'শুনবে, এই হাবামজাদী শুনবে। ও জানে, আমি যা বলছি তা সব সত্যি।'

'মিসেস ম্যাকনীল, আপনি চলে যান। এক মুহূর্তও থাকবেন না।'

ক্রিস ছুটে বেরিযে গেল। ফাদাব মেবিন প্রায সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেন। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কিছু হযেছে কি?'

'ফাদাব মেবিন, রেগানেব এখন ঘুমানো দবকাব। কিন্তু এই জিনিসটা বলছে, ওকে সে ঘুমাতে দেবে না।'

'ফাদার কাবাস, আপনি কোনো ওষুধ দিতে পাবেন?'

'প্রচুব লিব্রিযাম দেযা হযেছে, আব দেযা ঠিক হবে না।'

বেগানেব কণ্ঠ থেকে বার্ক ডেনিংসের স্বর ভেসে এল।

'ওহে শুনছ, পাদ্রী সাহেববা, তোমাদেব নিযে দেখি মহা বিপদ হল! মেযেটা তো মবতে বসেছে, এখন আমবা যাই কোথায? জাযগাব বড় টানাটানি। তাছাড়া এখানে থাকার অধিকাব আছে আমাব। এই শালীব বাচ্চা শালীই তো আমাকে মেবেছে!'

কাবাস জিজ্ঞেস কবলেন, 'কীভাবে মেরেছে ?'

'সে তো, ভাই, লম্বা গল্প। দিব্যি স্টাডিতে বসে পান করছিলাম, হঠাৎ শুনি খটখট শব্দ। ভয ধবে গেল, বুঝলে? আস্তে আস্তে উঠলাম দোতলায। উঠে দেখি ....'

'কী দেখলেন?'

ফাদাব মেবিন কড়া গলায বললেন, 'কাবাস, প্লিজ; কথা বলবেন না প্লিজ।'

'আহ্, এই বুড়ো শালাকে নিযে যন্ত্রণা। তুই চুপ থাক না, শালা।'

ফাদাব মেবিন আবাব প্রার্থনা শুরু কবলেন। অসম্ভব শীতল হযে গেল ঘর। গবম কোটেব নিচেও ঠকঠক কবে কাঁপতে লাগলেন কাবাস। ঘবেব উজ্জ্বল আলোও কেমন যেন কমে আসছে বলে মনে হল। ভয-পাওয়া গলায বললেন, 'যে কবেই হোক, ওকে ঘুম পাড়াতে হবে।' ফাদাব কাবাস এক সময ঘুমেব জন্যে নিজের অজান্তেই প্রার্থনা শুরু কবলেন, 'ঘুম দাও, হে পবম প্রভু, এই মেযেটাব চোখে ঘুম দাও। ঘুম দাও। হে মহাশক্তিধব পবম পবিত্র জগৎ-প্রভু, ঘুম দাও।'

ঘুম কিন্তু এল না।

ভোর হল। আবার সন্ধ্যা হল। আবার এল রাত।

ফাদার মেরিন এক সময় বললেন, 'আপনাকে বড়ই ক্লান্ত মনে হচ্ছে, কারাস।'
'আমি এর আগেও দুরাত ঘুমাতে পারি নি, ফাদার।'
'আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আসুন।'
রেগান এই সময় বৃদ্ধার গলায় কথা বলে উঠল, 'ডিমি, ও ডিমি, তুই কেন আমাব সাথে এ রকম করলি! কেন আমাকে ফেলে গেলি? কী করেছিলাম আমি? ও বেটা, ও ডিমি, কেন এ রকম করলি? এখন আমার যাওয়ার জাযগা নেই। আমি শুধু ঘুরি! ডিমি!'
কারাস চমকে গেলেন। রেগানের কণ্ঠে তাঁর মায়ের স্বর।
ফাদার মেরিন কঠিন স্বরে বললেন, 'শুনবেন না, ওর কথা শুনবেন না, আপনি বিশ্রাম নিয়ে আসুন। যান।'
কারাস ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কফি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু তার চেয়েও অনেকক্ষণ ধরে গোসল করার বেশি ইচ্ছা হচ্ছে। সারা শরীরে কেমন যেন অশুচির স্পর্শ। নিজেব ঘবে গিযে গোসল সেরে এক কাপ কফি খেয়ে ফিরবেন, কিন্তু এত রাতে ক্রিসকে বিরক্ত কবতে ইচ্ছা হল না।

রেসিডেন্স হলের রিসেপশন রুমে কিন্ডারম্যান বসে ছিল। ফাদার কারাসকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল।
'মিঃ কিন্ডারম্যান, এত রাতে আমাব কাছে?'
'হ্যাঁ ফাদার, আপনার কাছেই।'
'কী ব্যাপার বলুন তো?'
'আপনাকে একটা প্রশ্ন কবতে এসেছি ফাদাব। প্রশ্নটা কববাব আগে আমার এক খালাব গল্প বলছি। এই খালা তার স্বামীকে দারুণ ভয পেত। স্বামী বাগারাগি কবত, বকাঝকা করত, আর আমার খালার কাছে যখন সেসব অসহনীয মনে হত তখন সে দৌড়ে চলে যেত তার আলনার কাছে। আলনাব ঝুলন্ত কাপড়গুলোকে তার দুঃখেব কথা বলে মনে শান্তি পেত। আমারও ঠিক সেই রকম অবস্থা। কাউকে আমাব কিছু বলা দরকাব, ফাদার।'
'তাহলে আমি এখন আপনার আলনার কাপড়?'
'হ্যাঁ, কিন্তু এই কাপড়কে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'
'বলুন, শুনি।'
'ফাদার, মনে করুন আমি একটা খুন নিয়ে তদন্ত করছি। খুনটা হয়েছে অদ্ভুতভাবে।'
'আপনি কি বার্ক ডেনিংসের কথা বলছেন?'
'না ফাদার, এটা কাল্পনিক খুন।'
'বেশ।'
'ধরুন, যে বাড়িতে খুন হয়েছে সে বাড়িতে পাঁচটি মানুষ আছে এবং তাদেরই কেউ এক জন খুন করেছে। যাবতীয় প্রমাণ পরিষ্কার করে বলে — খুনটি করেছে বার বছরেব একটা বাচ্চা মেয়ে। আপনাব কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। সেই বাড়িতে এক জন ফাদার প্রায়ই যান। তিনি বিখ্যাত মানুষ। নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট। আমাব কাছে যেসব প্রমাণ আছে তা বলে — এই ফাদার সেখানে যান; কারণ বাচ্চা মেযেটা অসুস্থ। এখন ফাদার, আপনি বলুন, আমি কী করব? আমি কি পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাব, না আমাব ওপরওয়ালাকে জানাব? ফাদার, আপনি আমার এই প্রশ্নের জবাব দিন।'
ফাদার কারাস নরম সুরে বললেন, 'আমি যদি কিন্ডারম্যান হতাম তাহলে ওপরওয়ালাকেই বোধহয জানাতাম।'

কিন্ডারম্যান রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। শুকনো গলায় বলল, 'আমি জানতাম আপনি এই কথা বলবেন। গুড নাইট, ফাদার।'

'গুড নাইট।'

'ফাদার, আমার খুব শখ একদিন আপনার সঙ্গে একটা ছবি দেখি। ক্রেস্ট সিনেমা হলে ওথেলো হচ্ছে। চমৎকার ছবি।'

'যাব, একদিন নিশ্চয়ই যাব।'

'সব সময় আপনি বলবেন — এখন নয়, যাব একদিন। আপনার কি সত্যি সময় হবে কখনো?'

'হবে, একদিন হয়তো হবে।'

ফাদার কারাসের হঠাৎ এই ক্ষুরধার ডিটেকটিভকে ভালো লেগে গেল। তিনি তাঁর কাঁধে হাত রেখে অল্প হাসলেন। কিন্ডারম্যান হাঁটতে শুরু করল। কারাস তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। নির্জন রাস্তায় মোটাসোটা মানুষটা থপ্থপ্ করে পা ফেলে হাঁটছে — ছবিটাতে এক ধরনের বিষণ্ণতা আছে।

ক্রিসের বাড়িতে যখন কারাস ঢুকলেন তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। শ্যাবনেব সঙ্গে বসবার ঘরে দেখা। সে বলল, 'সব কিছু আগের মতোই আছে।'

রেগানের ঘর থেকে জান্তব চিৎকার ভেসে আসছে। কফির সন্ধানে বান্নাঘবে এসে কাবাস দেখেন রেগানের একটা অ্যালবাম হাতে নিয়ে ক্রিস বসে আছে। তাব চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে।

'ফাদার, আমি আপনাকে কফি দিচ্ছি। হাত-মুখ ধুযে আসি। আপনি বুসন।'

ক্রিস বেরিযে .গল। কারাস উঁকি দিযে দেখেন অ্যালবামের যে পৃষ্ঠাটা খোলা, সেখানে রেগানের একটা ভারি সুন্দর ছবি। ছবির পাশে কাঁচা হাতে লেখা একটা কবিতা।

ছেলেমানুষি রচনা, কিন্তু কবিতাটা পড়ামাত্র ফাদার কারাস অন্তবেব গভীবতম কোণে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলেন। ব্যথা এবং ক্ষোভ। সে ক্ষোভ কুশ্রিতাব বিরুদ্ধে, অন্যাযেব বিরুদ্ধে। তাঁব আর কফির জন্যে অপেক্ষা করতে ইচ্ছা হল না। ক্লান্ত পাযে বেগানেব ঘরে গিযে ঢুকলেন। ঢোকাব আগমুহূর্তে শুনলেন শযতান টেনে টেনে বলছে, 'মেবিন, তুই ফিরে আয। তোর সঙ্গে বোঝাপড়া হয নি।'

কারাস ঘরে ঢুকলেন, কিন্তু তাঁর দিকে ফিরেও তাকাল না রেগান। সে তাকিযে আছে মেঝের দিকে। কী আছে সেখানে? ফাদার মেরিনইবা কোথায? কাবাসেব বুঝতে বেশ সময লাগল যে, ফাদার মেরিন মেঝেতে পড়ে আছেন। তাঁর শবীর ববফশীতল। কাবাস একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তাঁর কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠতে লাগল। কিন্তু তিনি আবেগশূন্য ভঙ্গিতেই ফাদার মেরিনের হাত দুটো ক্রুসের ভঙ্গিতে রাখলেন। শযতান হাসতে শুরু করল। খলখল হাসি। ফাদার কারাসের সহজ জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেল। তিনি বিকট স্ববে চেঁচিযে উঠলেন, 'আহ্ পিশাচ, আহ্ শয়তান!'

খলখল হাসি থেমে গেল। রেগান কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে এখন।

'ওহে কারাস, তুমি কি বুঝতে পারছ তুমি হেরে যাচ্ছ ? হা-হা-হা।'

'চুপ, শয়তান! চুপ!'

ক্রিস আর শ্যারন কফির কাপ হাতে বসে ছিল। তারা ফাদার কাবাসেব প্রচণ্ড চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল। ক্রিস শুনল — কারাস বললেন, 'চুপ, শযতান — চুপ!' তারপর শযতানটা কিছু বলল। এর পর আবার চেঁচিযে উঠলেন কারাস, 'না, আমি তোকে নিকেশ না করে ছাড়ব না। তুই আর কারো কোনো ক্ষতি করতে পারবি না। না!'

ঠিক তার দুএক সেকেন্ডের মধ্যে রেগানের ঘরের জানালাটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ল। কোনো ভারি জিনিস কেউ যেন ছুড়ে ফেলল নিচে। ক্রিস আর শ্যারন ছুটে গেল দোতলায়। ফাদার কারাসের দেহটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে এম স্ট্রিটের মাঝামাঝি। তার চারপাশে লোকজন জমতে শুরু করেছে। অ্যামবুলেন্সের জন্যে ছুটোছুটি হচ্ছে। ক্রিস চেঁচিয়ে উঠল, 'শ্যারন, আমি বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে। ফাদার কারাস কি মারা যাচ্ছেন? ওহ্ শ্যারন, ওহ্!'

শ্যারন হাঁটু গেড়ে ফাদার মেরিনের মাথার পাশে বসল। আর ঠিক তখুনি মিষ্টি গলায় রেগান ডাকল, 'কী হচ্ছে এসব, মা? এ রকম করছ কেন তোমরা? আমার বড্ড ভয় লাগছে।

এ কি সত্যি সত্যি রেগান? ক্রিস অবাক হয়ে দেখল দড়ি দিয়ে বাঁধা বাচ্চা মেয়েটা অবাক হয়ে তাকাচ্ছে তার মুখের দিকে। ভয়-পাওয়া বড় বড় দুটো ঘন কালো চোখ।

ক্রিস ছুটে গেল মেয়ের দিকে।

প্রচণ্ড ভিড় জমেছে ফাদার কারাসের চারপাশে। ভিড় ঠেলে যিনি অগ্রসর হতে চাচ্ছেন তিনি ফাদার ডায়ার। শ্যারন তাঁকে খবর দিয়েছে। তিনি ফাদার কারাসের মাথার পাশে দাঁড়ালেন। এখনো প্রাণ আছে। তিনি প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে বললেন, 'ফাদার কারাস, আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন?'

কারাস মাথা নাড়লেন। তিনি বুঝতে পারছেন।

ফাদার ডায়ার তাঁর মাথা কোলে তুলে নিলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনি কি ঈশ্বরের কাছে শেষবারের মতো ক্ষমা ভিক্ষা করতে চান?'

কারাস মাথা নাড়লেন — তিনি চান।

'আপনি কি আপনার সমস্ত পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কবেছেন?'

মাথা অল্প নড়ল — তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

'বেশ এখন আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন, 'ইগো তে এবসলভো....'

ফাদার কারাসের ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তাঁর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানি বেরিয়ে এল। তিনি কী যেন বলতে চাইলেন, পারলেন না। ফাদার ডাযার গাঢ় স্বরে বললেন, 'বন্ধু, আপনাব যাত্রা শুভ হোক। বিদায়।'

পরিশিষ্ট

ফাদার কারাস ও ফাদার মেরিনের মৃত্যুর ছসপ্তাহ পর ডিটেকটিভ কিন্ডারম্যান তার রিপোর্ট পেশ করল। সেই রিপোর্টে বার্ক ডেনিংসের মৃত্যুকে বলা হল একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা। কিন্ডারম্যানের ভাষায়, 'যাবতীয় প্রমাণ বিশ্লেষণপূর্বক এই সিদ্ধান্তে আসা হইয়াছে।' কিন্ডারম্যান দ্বিতীয় কেসটা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। ফাদার কারাসের কেস। রেগান ফাদার কারাসকে ছুড়ে ফেলে নি, কারণ সে বাঁধা ছিল। ফাদার কারাস যে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে লাফিয়ে পড়েছেন তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ দরজা খোলা ছিল, সেই দরজা দিয়ে তিনি সহজেই বেরোতে পারতেন। একটি সম্ভাবনা আছে, ফাদার মেরিনের মৃত্যু দেখে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন...কিন্ডারম্যান ভাবে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবে।

ক্রিস তার এই বাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছে। সে ফিরে যাচ্ছে তার স্বামীব কাছে। হাওয়ার্ড নিতে এসেছে সবাইকে। ওদের হাসিখুশি মুখ দেখে এখন বিশ্বাসই হয় না কী প্রচণ্ড দুঃস্বপ্নের দিন গিয়েছে। ওরা প্রথমে যাবে লস অ্যাঞ্জেলেস্। প্লেন ছাড়ার খুব একটা দেরি নেই। কিন্তু রেগানের জিনিসপত্র এখনো গোছানো হয নি। ক্রিস তাড়া দিতে গিযে দেখে সমস্ত বিছানাময় অসংখ্য জিনিসপত্র ছড়ানো, মাঝখানে রেগান মুখ কালো করে বসে আছে।

'মা, এই সুটকেসে তো সব ধরছে না!'

'যেগুলো ধরছে না সেগুলো কার্ল নিয়ে আসবে। এখন থাক।'

'ঠিক আছে, মা।'

অত্যন্ত ব্যস্ততার সময়টাতে ফাদার ডায়াব এলেন বিদায জানাতে। ক্রিস হাসিমুখে বলল, 'আপনি না এলে আমি নিজেই যেতাম, ফাদার। বসুন।'

'এই ব্যস্ততার মধ্যে আমি আর বিরক্ত করব না।'

'না ফাদার, আপনাকে আমাদের সঙ্গে এক কাপ কফি খেতে হবে। আসুন।'

কফি পান নিঃশব্দে হল। ক্রিস এক সময বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ফাদার?'

'করুন।'

'আমি শুনেছি ফাদাব কারাস নাস্তিক ছিলেন, এটা কি সত্যি?'

'কিছুটা ছিলেন।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয না ফাদার। আমার মনে হয তাঁব মতো বড় ঈশ্বর–বিশ্বাসী ব্যক্তি কেউ নেই।'

বলতে বলতে ক্রিস রুমাল দিয়ে চোখ ঢাকল।

ক্রিসের কাছ খেকে বিদায নিযে ফাদার ডাযার এম স্ট্রিটের মাথায এসে দেখেন কিন্ডারম্যান দাঁড়িয়ে আছে। সে সম্ভবত তাঁব জন্যেই অপেক্ষা কবছিল। তাঁকে দেখেই দ্রুত এগিযে এল কাছে।

'ফাদার ডাযার ?'

'বলুন।'

'আপনি কি ওদের বিদায জানাতে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ছোট মেযেটা এখন ভালো আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব খুশি হলাম। খুবই আনন্দের কথা।'

'হ্যাঁ, খুব আনন্দের কথা।'

'আচ্ছা ফাদার, আপনি কি সিনেমা দেখেন ?'

'মাঝে মাঝে দেখি।'

'আপনি কি একদিন আমার সঙ্গে দেখবেন ? ওথেলো হচ্ছে খুব ভালো ছবি।'

ফাদার ডাযার মৃদু হাসলেন। অনেক দিন আগে ডেমিয়েন কারাস ঠিক যেভাবে হাত রেখেছিলেন, ঠিক একইভাবে কিন্ডারম্যানের ঘাড়ে হাত রেখে নরম স্বরে বললেন, 'দেখব, একদিন নিশ্চয়ই দেখব।'